প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

৪২শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক—চৈত্র

১৩৪৯

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত

বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা আট আনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

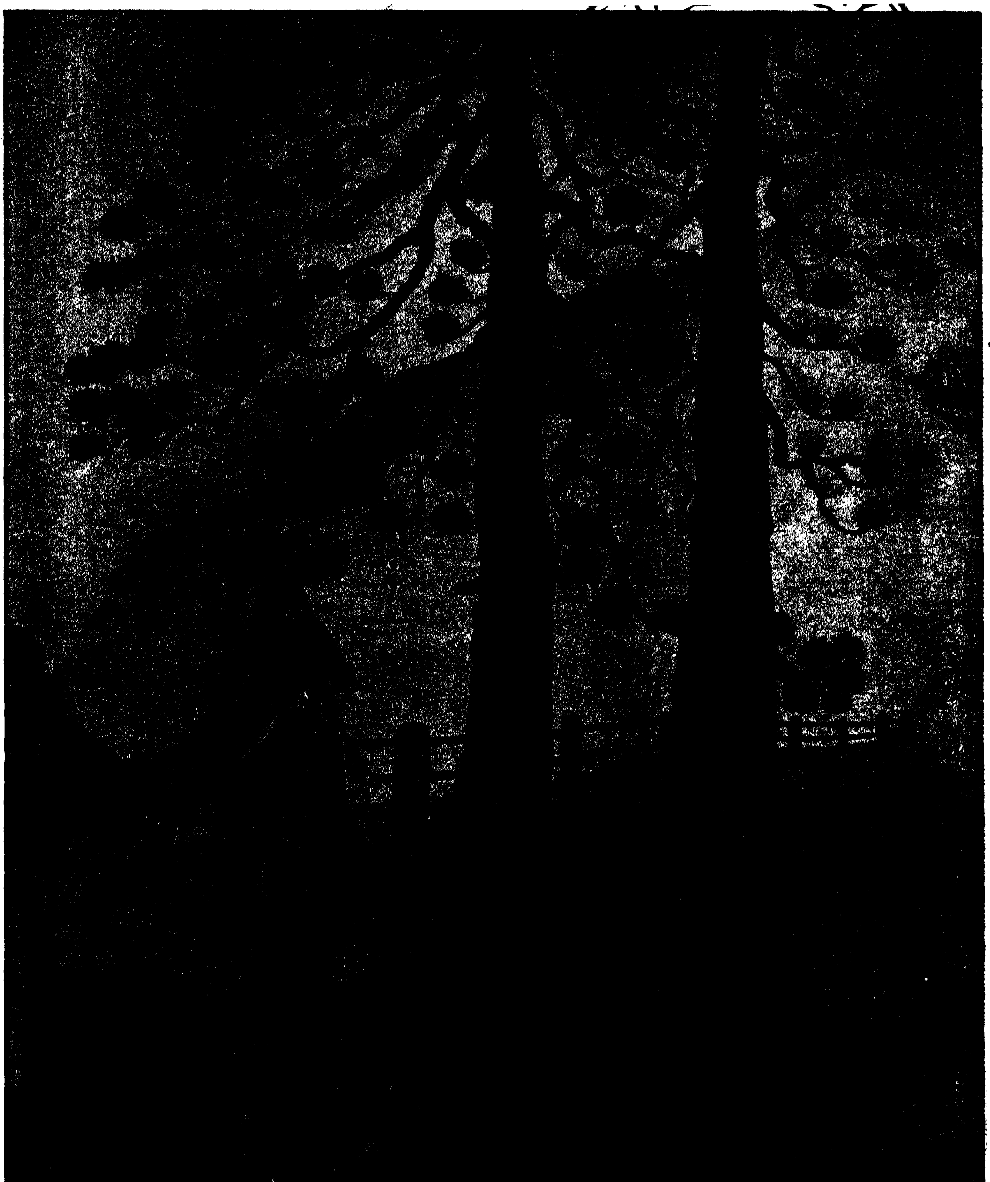
বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র



ধাত্রী পান্না

শ্রীসোমেন্দ্রনাথ রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৩শ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৫০ ১ম সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

[বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে লিখিত]

প্রবীণ সাহিত্যিক ও কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন। বিজয়চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা সুলেখিকা সুনীতি দেবী যে চিঠিগুলি রক্ষা পেয়েছে সেগুলি নকল ক'রে আমাদের পাঠান, সেজন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁর সৌজন্যে বিজয়বাবুর অধুনা-অপ্রচলিত কিছু বই দেখেছি এবং তার একটি তালিকা দিলাম; যদিও সবগুলির তারিখ ঠিক করা সম্ভব হয় নি। তাঁর তরুণ জীবনে গভীর প্রভাব পড়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের এবং তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে রচিত কবিতাটি (পৌষ ১২৯০ = ১৮৮৪) ছাপা হয় বিজয়চন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত "কবিতা" (১২৯৬) পুস্তকে। ১৮৮৭ সালে দেখি তিনি সংস্কৃতে "ঈশস্তুতি" লেখেন এবং পরে সংস্কৃত ও পালি ভাষায় কিছু রচনা করেন। সেকালের তাঁর গদ্য রচনা 'বিদ্রূপ ও বিকল্প' (১৮৯০) হাস্যরসে ভরপুর এবং বিজয়চন্দ্র ক্রমশঃ নব্যভারত, ভারতী, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় লেখা ছাপেন ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের বন্ধুত্ব লাভ করেন। ফুলশর (১৮৯২), কথা ও বীথি (১৮৯৩), কথা নিবন্ধ, যজ্ঞভস্ম (১৯০৪), পঙ্কমালা (১৯১০), তপস্যার ফল (১৯১২) ইত্যাদি গ্রন্থের মধ্যে গদ্য ও পদ্য রচনার অনেক ভাল নমুনা পাই। বিজয়চন্দ্র পণ্ডিত কবি, তাই তাঁর কাছে পেয়েছি জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও থেরীগাথার পূর্ণ অনুবাদ ও অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যের খণ্ডানুবাদ। হেঁয়ালী (১৯১৫) প্রকাশের সময় তিনি অন্ধ হয়ে যান, কিন্তু অপূর্ব্ব স্মৃতিশক্তি ও একনিষ্ঠ সাধনার বলে বহু প্রবন্ধ, কবিতা ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা ক'রে যান। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যাপনা করতে আমন্ত্রণ করেন। প্রাচীন সভ্যতা (১৯২০), জীবনবাণী (১৯৩৩) প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর গভীর গবেষণার প্রমাণ মেলে। তাঁর শেষ কবিতা-পুস্তক রুচিরা (১৯৩৭)। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য ইতিহাস পরিচয় ও ইতিহাসের গল্প, ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং খেলাধুলা ও ছিটেফোঁটা রচনা ... 'কল্লোল' পত্রিকা ... আছে। তাঁর ইংরেজী প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, উড়িয়া, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অবলম্বনে রচিত। সোনপুর ও উড়িষ্যার ইতিহাস রচনায় তিনি পথিকৃৎ। The History of the Bengali Language, Elements of Social Anthropology ও Typical Selections from Oriya Literature" (তিন খণ্ডে) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পত্র ব্যবহার কবে থেকে জানা নেই। তবে প্রথম সংখ্যার চিঠির তারিখ ১৪ বৈশাখ ১৩০৯ :—যখন সদ্য স্ত্রী-বিয়োগের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকার সাংঘাতিক রোগ নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত। সেই বঙ্গদর্শন নবপর্য্যায়ের যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও আদর্শ কবির মনকে খুব নাড়া দিয়েছিল, এবং পরে তার প্রকাশ হ'ল 'তপোবন' ও 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধগুলিতে। ৮ নং চিঠি যে 'সবুজপত্র' যুগে লেখা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যদিও এই মূল্যবান চিঠিখানি তারিখবর্জ্জিত। এ চিঠিগুলি ছাড়া একখানি সুন্দর চিঠি রবীন্দ্রনাথ লেখেন বিজয়চন্দ্রের আদর্শ সাহিত্য প্রবন্ধটি পাঠ ক'রে, সে চিঠি 'জীবন বাণী'র গোড়ায় ছাপা হয় (১৩৪০): "আপনি সাহিত্যের যে আদর্শ আলোচনা করিয়াছেন এখনকার দিনে তাহা অনাদৃত। সূর্য্যকে মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকে, তাই বলিয়া সূর্য্যকে অবিশ্বাস করা চলে না ..."।

শ্রীকালিদাস নাগ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর
ই. আই. আর
লুপলাইন

যায় তবে সেটা লইয়া মনে মনে এবং কখনও প্রসঙ্গ ক্রমে প্রবন্ধে আলোচনা করিয়া থাকি—তাহা হইতে আমার গবেষণা সম্বন্ধে লোকের ভ্রান্ত ধারণা হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি—সেজন্য আমি কুণ্ঠিত। তথাপি যদি এইরূপ ফাঁকির সুযোগে আপনার সহিত আলাপ হইবার উপলক্ষ্য ঘটে তবে আমি লাভবান হইব।

প্রাচীন সাহিত্য হইতে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলনের প্রতি আমার যথেষ্ট ঔৎসুক্য আছে। আমার নিজের সাধ্য নাই। যোগ্য ব্যক্তিরা এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন সেই প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া আছি। বাল্মীকি রামায়ণ সম্বন্ধে দীনেশবাবু* কিছুকাল হইতে যথেষ্ট মনোযোগের সহিত আলোচনা করিতেছেন তাঁহার সহিত আপনার যদি পরিচয় না থাকে পরিচয় করাইয়া দিতে পারিব—তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিবেন। বাল্মীকি রামায়ণের একটি সুবিস্তৃত সূচিপত্র সাহিত্য-পরিষৎ সভা হইতে বাহির করিবার সংকল্প হইয়াছে—তাহার বৃহৎ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া গেছে। যাঁহারা রামায়ণ আলোচনা করিবেন তাঁহাদের পক্ষে,এই গ্রন্থখানি অত্যাবশ্যক হইবে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকে ঐতিহাসিক সন্ধানপরতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন—তাঁহার সঙ্গেও আপনার আলাপ প্রয়োজন হইবে।

আমি সাধারণতঃ বোলপুরে আমার একটি বিদ্যালয়ের ভার লইয়া কালযাপন করি। অক্টোবর মাসে কলিকাতায় থাকিবার সম্ভাবনা আছে। যদি নিতান্ত না থাকি, লুপ মেলে বোলপুর কলিকাতা হইতে তিন ঘণ্টার রাস্তা—আপনি এখানে আসিলে বড় আনন্দিত হইব। ইতি ২৭শে ভাদ্র ১৩০৯

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

আবার আমি পলাতক। সম্প্রতি আমি পদ্মানদীর উপরে বোটে। বিশ্রাম এবং স্বাস্থ্যের প্রত্যাশায় আসিয়াছি। আজ আপনার চিঠি পাইলাম। লিখিয়াছেন "কৃষ্ণলীলা" প্রবন্ধটি পাঠাইয়াছেন—আশা করিতেছি সেটি [illegible] পাইব। [illegible] পল্লীগ্রামে একটি [illegible]

লীলার ঐতিহাসিক রহস্য মনে মনে আলোচনা করিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম বৌদ্ধদের যজ্ঞে ভারতবর্ষে যখন ধর্ম্মের খিচুড়ি পাকাইতেছিল তখন বেদের রুদ্র কিরাতের ধূর্জ্জটিকে ও বেদের বহ্নিশিখা শবরের চণ্ডীকে আশ্রয় করিল এবং আভীর পল্লীতে বেদের বিষ্ণুর কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইল। তখন আর্য্যেরা যেমন গোলেমালে অনার্য্যদের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল, আর্য্যের দেবতারাও তাহাদের অনুসরণ করিল। শিব, কালী এবং কৃষ্ণ এই তিন দেবতারই আচার ব্যবহার এবং ভাবগতিক সমস্তই আর্য্যরীতির বহির্ভূত। সমস্তের মধ্যেই যেন ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ আছে। শিবের চালচলন আর্য্যসমাজ বিগর্হিত—কালীর ত কথাই নাই। কৃষ্ণেরও তথৈবচ। লোকরীতির সহিত দেবরীতির এরূপ পার্থক্য - পার্থক্য কেন, এমন বিরোধ আমার কাছে অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়। শিব এবং কৃষ্ণ সামাজিকভাবে হিন্দুর আদর্শ নহেন, বরং তাহার বিপরীত। এই দেবতারা যে অনার্য্যের দেবতা এবং তাহারা যে সূর্য্যবংশাভিমানী অনার্য্য রাজপুতের মত গায়ের জোরে বৈদিক প্রাচীনত্ব গ্রহণ করিয়া আর্য্যসমাজে মিশিয়া গেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মাঝে ভারতবর্ষে একটা অন্ধকার রাত্রি আসিয়াছিল। যখন ইতিহাসের অরুণোদয় হইল তখন দেখা গেল ঋষিবংশীয় ব্রাহ্মণের স্থানে আচারভ্রষ্ট প্রতিমাপূজক ব্রাহ্মণরা দেখা দিয়াছে, আর্য্য ক্ষত্রিয়ের স্থানে বিজাতীয় রাজপুত ক্ষত্রিয়পদ গ্রহণ করিয়াছে, অনার্য্যদেবতারা কেবল যে আর্য্যদেবতার স্থান লইয়াছে তাহা নহে তাহাদের নাম পর্য্যন্ত দখল করিয়া বসিয়াছে, ভারতবর্ষের যে অন্ধতমসাচ্ছন্ন নিশীথে এই সকল বিপর্য্যয় ব্যাপার ঘটিতেছিল সেই রাত্রির রহস্যকথা না পাইলে আধুনিক ভারতের ইতিহাস কবন্ধের মত মুণ্ডহীন হইয়া থাকে। এই অন্ধকারভেদের জন্য আপনি মশাল হাতে বাহির হইয়াছেন বলিয়া আপনার প্রবন্ধ আমার কাছে এমন ঔৎসুক্যজনক হইয়াছে।

মৈথিলী ভাষা সম্বন্ধে গ্রিয়ার্সনের যে দুই খণ্ড বহি এসিয়াটিক্ সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আপনার পড়া দরকার। শান্তিনিকেতনে আমাদের গ্রন্থালয়ে সে দুটি বই আছে। যদি ব্যবহার করিতে গিয়া হারাইয়া না ফেলেন তবে ৭ই পৌষের সময় সেখানে গিয়া আপনাকে [illegible]

…গে স্মরণ করাইয়া দেন তবে বইগুলি আপনাকে …ঠাইব। ইতি ২২শে অগ্রহায়ণ ১৩১০

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

…দ্ধাস্পদেষু

বাংলায় কথার ভাষা আর লেখার ভাষা নিয়ে যে তর্ক কিছুকাল চলছে আপনি আমাকে সেই তর্কে যোগ …তে ডেকেছেন। আমার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত বলে …কাজে আমি উৎসাহ বোধ করছি নে। সংক্ষেপে দুই …কটা কথা বলব।

কর্ণ অর্জ্জুন উভয়ে সহোদর ভাই হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যখন জাতিভেদ ঘটেছিল, একজন রইল ক্ষত্রিয় আর একজন হ'ল সূত, তখনি দুই পক্ষে ঘোর বিরোধ বেধে গেল। বাংলা লেখায় আর কথায় আজ সেই দ্বন্দ্ব বেধে গেছে। এরা সহোদর অথচ এদের মধ্যে ঘটেছে শ্রেণীভেদ; একটি হলেন সাধু, আর একটি হলেন অসাধু। এই শ্রেণীভেদের কারণ ছিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। সে কথাটা খুলে বলি।

এক সময়ে বাংলায় পদ্য সাহিত্যই একা ছিল; গদ্য ছিল মুখে; লেখায় স্থান পায় নি। পদ্যের ভাষা কোনো এক সময়কার মুখের ভাষার কাছ-ঘেঁষা ছিল সন্দেহ নেই— তার মধ্যে "করিতেছিলাম" বা "আমারদিগের" "এবং" "কিম্বা" "অথবা" "অথচ" "পরন্তু"র ভিড় ছিল না। এমন কি "মুই" "করলুঁ" "হৈনু" "মোসবার" প্রভৃতি শব্দ পদ্য ভাষায় অপভাষা বলে গণ্য হয় নি। বলা বাহুল্য, এ সকল কথা কোনো এক সময়ের চলতি কথা ছিল। হিন্দী সাহিত্যেও দেখি কবীর প্রভৃতি কবিদের ভাষা মুখের কথায় গাঁথা। হিন্দীতে আর একদল কবি আছেন, যাঁরা ছন্দে ভাষায় অলঙ্কারে সংস্কৃত ছাঁদকেই আশ্রয় করেছেন। পণ্ডিতদের কাছে এঁরাই বেশি বাহবা পান। ইংরেজিতে যাকে snobbishness বলে এ জিনিষটা তাই। হিন্দী প্রাকৃত যথাসম্ভব সংস্কৃত ছদ্মবেশে আপন প্রাকৃতরূপ ঢাকা দিয়ে সাধুত্বের বড়াই করতে গিয়েচে। তাতে তার যতই মান বাড়ুক না কেন, মথুরার রাজদণ্ডের ভিতর ফুঁ দিয়ে সে বৃন্দাবনের বাঁশি বাজাতে পারে নি।

যা হোক, যখন বাংলা ভাষায় গদ্য সাহিত্যের অবতারণা হ'ল তার ভার নিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। দেশের ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে প্রতিদিন যে গদ্য বাণী প্রবাহিত হচ্চে তাকে বহুদূরে রেখে সংস্কৃত সরোবর থেকে তাঁরা নালা কেটে যে ভাষার ধারা আনলেন তাকেই নাম দিলেন সাধুভাষা। বাংলা গদ্য সাহিত্যিক ভাষাটা বাঙালীর প্রাণের ভিতর থেকে স্বভাবের নিয়মে গড়ে ওঠে নি, এটা ফরমাসে গড়া। বাঙালীর রসময় রসনাকে ধিক্কার দিয়ে পণ্ডিতের লেখনী বলে উঠল গদ্য আমি সৃষ্টি করব। তলব দিলে অমরকোষকে, মুগ্ধবোধকে। সে হল একটা অনাসৃষ্টি। তার পর থেকে ক্রমাগতই চেষ্টা চলচে কি ক'রে ভাষার ভিতরকার এই একটা বিদ্‌ঘুটে অসামঞ্জস্যটাকে মিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বিদ্যাসাগর তাকে কিছু পরিমাণে মোলায়েম ক'রে আনলেন—কিন্তু বঙ্গবাণী তবু বল্লেন "এহ বাহ্য।" তারপরে এলেন বঙ্কিম। তিনি ভাষার সাধুতার চেয়ে সত্যতার প্রতি বেশি ঝোঁক দেওয়াতে তখনকার কালের পণ্ডিতেরা দুই হাত তুলে বোপদেব অমরের দোহাই পেড়েছিলেন। সেই বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর ভাষাও আজ প্রায় মরা গাঙের ভাষা হয়ে এসেচে—এখনকার সাহিত্যে ঠিক সে ভাষার স্রোত চলচে না। অর্থাৎ বাংলা গদ্যসাহিত্যের গোড়ায় যে একটা original sin ঘটেছে কেবলি সেটাকে ক্ষালন করতে হচ্চে। কৌলিন্যের অভিমানে যে একটা হঠাৎ সাধুভাষা সর্ব্বসাধারণের ভাষার সঙ্গে জল-চল বন্ধ ক'রে কোণ-ঘেঁষা হয়ে বসেছিল, অল্প অল্প ক'রে তার পংক্তিভেদ ভেঙে দেওয়া হচ্চে। তার জাত যায়-যায়। উভয় ভাষায় কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে অসবর্ণ বিবাহ হতে সুরু হয়েচে। এখন আমরা চলিত কথায় অনায়াসে বলতে পারি "ম্যালেরিয়ায় কুইনীন ব্যবহার করলে সদ্য ফল পাওয়া যায়।" পঞ্চাশ বছর আগে লোকের সঙ্গে ব্যাভার ছাড়া ব্যবহার কথাটা অন্য কোনো প্রসঙ্গেই ব্যবহার করতুম না। তখন বলতুম, "ম্যালেরিয়ায় কুইনীনটা খুব খাটে।" আমার মনে আছে আমার বাল্যকালে আমাদের একজন চাকরের মুখে "অপেক্ষা" কথাটা শুনে আমাদের গুরুজনরা খুব হেসেছিলেন। কেন-না, কেউ অপেক্ষা করচেন, একথাটা তাঁরাও বলতেন না,—তাঁরা বলতেন "অমুক লোক তোমার জন্যে বসে আছেন।" আবার এখনকার লেখার ভাষাতেও এম্‌নি করেই মুখের ভাষার ছাঁদ কেবলি এগিয়ে চলছে। এক ভাষার দুই অঙ্গের মধ্যে অতি বেশি প্রভেদ থাকলে সেই অস্বাভাবিক পার্থক্য মিটিয়ে দেবার জন্যে পরস্পরের মধ্যে কেবলি রফা চলতে থাকে।

এ কথা সত্য ইংরেজিতেও মুখের ভাষায় এবং লেখা…

ভাষায় একেবারে ষোলো আনা মিল নেই। কিন্তু মিলটা এতই কাছাকাছি যে পরস্পরের জায়গা অদলবদল করতে হ'লে মস্ত একটা লাফ দিতে হয় না। কিন্তু বাংলায় চলতি ভাষা আর কেতাবী ভাষা একেবারে এপার ওপার;—ইংরেজিতে সেটা ডান হাত বাঁ হাত মাত্র—একটাতে দক্ষতা বেশি আর একটাতে কিছুকম—উভয়ে একত্র মিলে কাজ করলে বেমানান হয় না। আমি কোনো কোনো বিখ্যাত ইংরেজ লেখকের ডিনার-টেবিলের আলাপ শুনেছি, লিখে নিলে ঠিক তাঁদের বইয়ের ভাষাটাকেই পাওয়া যেত, অতি সামান্যই বদল করতে হ'ত। এই জাতিভেদের অভাবে ভাষার শক্তিবৃদ্ধি হয় আমার ত এই মত। অবশ্য মুখের ব্যবহারে ভাষার যে ভাঙচুর অপরিচ্ছন্নতা ঘটা অনিবার্য্য সেটাও যে লেখার ভাষায় গ্রহণ করতে হবে আমি তা মানি না। ঘরে যে ধুতি পরি সেই ধুতিই সভায় পরা চলে কিন্তু কুঁচিয়ে নিতে একটু যত্নের প্রয়োজন হয়, আর সেটা ময়লা হ'লে সৌজন্য রক্ষা হয় না। ভাষা সম্বন্ধেও সেই কথা। ইতি

ভবদীয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চিম্‌নির সিপাহী-জীবন

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

সন্তোষকে খাকি পোষাক পরিয়া বাড়ী আসিতে দেখিয়া যেদিন তাহার আত্মীয়বর্গ চেঁচামেচি করিয়া, কাঁদিয়া তাহার পিতাকে টেলিগ্রাম করিয়া চরাচর চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার পর প্রায় তিন-চার মাস কাটিয়া গিয়াছে। তাহার পিতা পত্নীবিয়োগের শোক ভুলিয়া তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে সৈন্যদল হইতে ছাড়াইয়া লইবার বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সন্তোষ তাঁহাকে এ চেষ্টায় কোন সাহায্য করে নাই। ফলে সন্তোষ কলিকাতায় দিনকতক থাকিয়া কিছু দিন হইল শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য পঞ্জাব-প্রদেশে আসিয়া পুরাদমে কুচকাওয়াজ করিয়া দিন কাটাইতেছে। তাহার পঞ্জাবী শিক্ষকদের মধ্যে কেহ তাহাকে লম্বু বলিয়া সম্বোধন করে, কেহ নাম দিয়াছে বুদ্ধু। কিন্তু হঠাৎ এক দল নতুন আগন্তুকের মধ্যে তাহার এক পুরাতন বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইতেই শীঘ্রই তাহার চিম্‌নি নামটা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া পড়িল। অল্প দিনের মধ্যেই সকলে বুঝিয়া লইল এই বিরাট্ আকৃতি যুবকের মনটা শিশুর মত এবং সকলে চিম্‌নি চিহ্‌মনি অথবা শুম্‌নিকে ট্রেনিং ক্যাম্পের ম্যাসকট বলিয়া ধরিয়া লইল। সে প্যারেডের সময় লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া সঙ্গের লোকদের পিছনে ফেলিয়া আগে চলিয়া যাইত; অর্ডার্ আর্ম্ হইতে শোল্ডার্ আর্ম্ করিতে তাল কাটিয়া ফেলিত। পট্টি বাঁধিতে গিয়া পায়ের অনেকটা খালি রাখিয়া বাহির হইয়া পড়িত এবং জুতার পালিশ ও জামার বোতাম তাহার কদাপি ঠিকমত ঘষা-মাজা থাকিত না। ইহার জন্য তাহাকে প্রায়ই ফেটিগ ডিউটি ও অন্যান্য প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত; কিন্তু সকলে তাহাকে বিশেষ সহানুভূতির চক্ষে দেখিত।

"আরে শুনেছ? কাল ইনস্‌পেকশনের সময় চিম্‌নির পায়ের পট্টিটা খুলে ঝুলে ছিল। ক্যাপ্টেন হগ ত ক্ষেপে লাল! বললে, 'এই জিরাফের মত লম্বা জানোয়ারটা কে? সরিয়ে নিয়ে যাও, সরিয়ে নিও যাও!' এন্. সি. ও. বললে, 'কল্ আউট্ চিম্‌নি!' চিম্‌নি এক লাফে আরও সামনে এগিয়ে এল। হগ ত 'মাই গড্, মাই গড্!' ক'রে হাত দিয়ে চোখটা ঢেকে পেছন ফিরে দাঁড়াল। সবাই মিলে তাড়াতাড়ি চিম্‌নির পট্টি বেঁধে ওকে ফের খাড়া করে দিলে। হগ বললে কি, 'ওকে দু-কাঁধে দুটো বন্দুক দিয়ে এক পাশে দাঁড় করিয়ে রাখ।' সমস্ত সকাল চিম্‌নি ঐ রকম ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। ডিসমিস হবার পর আলি বর্জ্জন খাঁ গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'আরে শুম্‌নি, তুম্ পট্টি কেঁও নাহি ঠিকসে লাগায়া?' চিম্‌নি বললে, 'কিসের পট্টি?' আলি বর্জ্জন ত 'তোবা, তোবা' করতে করতে চলে গেল।"

সকলে হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল, "ও পল্টনে এল কেন?"

"কি জানি বাবা! যে যাই বলুক, রাগ নেই, বিরক্তি নেই, একেবারে ভোলা মহেশ্বর।"

"সত্যিকার লড়াইয়ে গেলে ওর মুশকিল হবে। ওকে ত

ছেলেধরায় ধরে নিয়ে যেতে পারে ত দুটো-একটা জার্ম্মান কি ইটালিয়ান এসে পড়লে ও কি করবে?"

"আরে তুইই বা কি এমন করবি? সবাই লড়লে ও কেমন না লড়তে পারবে?"

ইত্যাকার আলোচনার কারণ যে-চিম্‌নি সে ততক্ষণ হয়ত কোথাও সহিসদের ছেলেদের ডাণ্ডাগুলি খেলা দেখিতে ব্যস্ত থাকে। বিউগ্‌ল্ বাজিলে আবার উঠিয়া যথাস্থানে গমন করে।

* * *

এই রকমে আরও কয়েক মাস কাটিয়া গেল। সন্তোষ এখন চলে ফেরে প্রায় সৈনিকের মতই; কিন্তু স্বভাব তাহার একই রকম। এক দিন জন দুই-চার বন্ধুর সহিত ছুটি লইয়া বাজারে গিয়াছিল সন্ধ্যার সময়। এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া অন্ধকার হইয়া আসিল। সকলে ক্যাম্পের দিকে ফিরিয়া চলিল। মধ্যপথে এক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড বাগানের মত জায়গা ছিল। সেখানে আসিতেই হঠাৎ পাঁচ-ছয় জন লোক দৌড়িয়া আসিয়া তাহাদের আক্রমণ করিল। উদ্দেশ্য পয়সা-কড়ি থাকিলে কাড়িয়া লইবে। উভয় পক্ষে খুব ধস্তাধস্তি সুরু হইল। সন্তোষের চেহারাটা বড় বলিয়াই সম্ভবত দুই জন লোক একত্রে তাহাকে চাপিয়া ধরিল। এক বন্ধু চীৎকার করিয়া বলিল, "চিম্‌নি মার বেটাদের!" সন্তোষ ধৃত অবস্থায় দাঁড়াইয়া "আরে, আরে, আমায় ধরছ কেন?" বলিতে থাকিল। লোকগুলো তাহাকে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "পয়সা দে দেও!" সন্তোষ বলিল, "পয়সা চাও ত ধাক্কাধাক্কি কেন; ছাড় দিচ্ছি।"

সম্ভবত সন্তোষ উহাদের নিজ হাতে পয়সা বার করিয়া দিয়া দিত কিন্তু একটা গুণ্ডা হঠাৎ একটা ইট তুলিয়া অরুণ বলিয়া একজন যুবককে মাথায় সজোরে মারিয়া বসিল। তাহার মাথা কাটিয়া রক্ত পড়িতে আরম্ভ করিল। সন্তোষ চীৎকার করিয়া উঠিল, "আরে, এই, মারলি কেন?" বলিয়া এক ঝট্‌কায় যে দুই জন তাহাকে ধরিয়াছিল তাহাদের দূরে নিক্ষেপ করিয়া, এক লম্ফে ইট-হস্তে লোকটার পাগড়ি ও চুল ধরিয়া তাহাকে জমি হইতে এক হাত শূন্যে তুলিয়া ফেলিল। লোকটা এই রকম আক্রমণে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। বিড়াল যেমন ইন্দুর ধরিয়া ঝট্‌কা দেয়, সন্তোষ সেরূপে লোকটাকে তিন-চার ঝটকা দিয়া, "আর মারবি?" বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। সে উঠিয়া তীরবেগে পলায়ন করিল ও তাহার সহিত বাকি গুণ্ডারাও অন্তর্হিত হইল।

সেদিন ক্যাম্পে ফিরিতেই সকলে সন্তোষকে খুব তারিফ করিতে আরম্ভ করিল। "চিম্‌নি, তুই নাকি গোটা পাঁচ-ছয় গুণ্ডাকে খুব মেরেছিস?"

সন্তোষ বলিল, "বা রে, আমি ওদের মারব কেন? ওরাই ত অরুণকে ইট দিয়ে মারলে।"

এক দিন হঠাৎ সাড়া পড়িয়া গেল আগামী কল্য তাহাদের রেজিমেণ্টের কোন অজানা জায়গায় যাইতে হইবে বলিয়া হুকুম আসিয়াছে। সারা দিন তাঁবু খোলা মালপত্র বাঁধা-ছাঁদা চলিল এবং রাত্রিকালে সকলে মার্চ করিয়া দূরবর্ত্তী এক রেল স্টেশনে গিয়া গাড়ীতে সওয়ারী হইয়া বসিল। সারা রাত গাড়ীর ঝাঁকানি ও পরস্পরের কাঁধে মাথা রাখিয়া ঢোলার পালা চলিল। ভোরবেলা রেলগাড়ী একটা অস্থায়ী রকমের স্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। দূরে সমুদ্র। কেহ বলিল করাচি, কেহ বা বলিল বোম্বাই। স্টেশনে কোন নামধাম লেখা ছিল না এবং সামরিক কর্ম্মচারী ব্যতীত জনমনুষ্যের চিহ্ন দেখা গেল না। সকলে নামিয়া পড়িয়া সেইখানেই প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার মার্চ সুরু করিল। ঘণ্টাধিক কাল চলিবার পরে সকলে সমুদ্রের ধারে আসিয়া পৌঁছাইল। সেখানে অনেকগুলি বড় বড় নৌকা ছিল, তাহাতে আরোহণ করিয়া অদূরে নোঙর-করা একখানা জাহাজ, তাহাতে গিয়া পৌঁছাইল। জাহাজের খালাসি প্রভৃতির নিকটও কোন খবর পাওয়া গেল না যে তাহারা কোথায় আসিয়াছে বা কোথায় যাইতেছে। সকলে গন্তব্য সম্বন্ধে নির্ব্বিকার হইয়া নিজ নিজ স্থান খুঁজিয়া লইল ও অন্তত কিছু কালের জন্য প্যারেড হইতে মুক্তি পাওয়া গেল, এই ভাবিয়া খুশী হইয়া উঠিল। কিন্তু এ আনন্দ তাহাদের ক্ষণস্থায়ী হইল মাত্র। জাহাজে চড়িবার পরেই তাহাদিগকে ডেকের উপর সারিবন্দি করিয়া দাঁড় করাইয়া বুঝান সুরু হইয়া গেল যে জাহাজের কোন বিপদ হইলে কি প্রকার সঙ্কেত করা হইবে এবং তৎপরে কে কি করিবে, কোথায় যাইবে, কেমন করিয়া লাইফ-বেল্ট পরিবে ও কোন্ নৌকায় কি ভাবে চড়িয়া জলে নামিয়া পড়িবে। জাহাজ অতঃপর দুই দিন ছাড়িল না। এই সময়টা সকলে ক্রমাগত জাহাজযাত্রী সেনাদলের কর্ত্তব্য শিক্ষা করিতে লাগিল। বোট্ ড্রিল, অ্যাবান্‌ডন্ শিপ্ ইত্যাদি বহু কথা স্থল-প্যারেডের বিভিন্ন সূত্রের সহিত জড়াইয়া গিয়া নবীন সেনানীদিগের মস্তিষ্ক গরম করিয়া তুলিল।

অরুণ বলিল, "ডাঙায় ছিলাম ভাল বাবা! এবারে খালি ডুবুরির কাজ ছাড়া আর সব কিছু শিখতে হবে দেখছি।"

একজন বলিল, "সাঁতার জানিস ?"

"সাঁতার ত জানি কিন্তু সমুদ্রে ক-শ মাইল সাঁতার দিবি, জাহাজ ডুবলে ?"

সন্তোষ বলিল, "হাঙ্গর, তিমি মাছ আরও কত কি আছে ; দু-মিনিটে গিলে ফেলবে।"

"তুই হাঙ্গরগুলোকে বলিস, কেন ভাই আমায় গিলছ ; আমি ত তোমাদের কিছু করি নি !"

সন্তোষ বলিল, "যাঃ।"

ভোঁ-ভোঁ করিয়া কর্ণপটাহ ফাটাইয়া দুই দিন পরে জাহাজ ছাড়িল। বন্দরের শান্ত জলরাশি ছাড়িয়া জাহাজ বাহির সমুদ্রে যাইতেই ভীষণ দোল খাইতে আরম্ভ করিল। ফলে বেশীর ভাগ লোকই মাথা ঘুরিয়া, গা গুলাইয়া বিছানার আশ্রয় গ্রহণ করিল। সকলেই পরস্পরকে ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিল, "কি হে মাথা ঘুরছে ত।" উত্তরে বুক ফুলাইয়া, "হ্যাঁ, আমার ওসব মাথা-টাথা ঘোরে না।" বলিয়াই ভীষণ মুখ বিকৃত করিয়া উত্তরদাতা দৌড়াইয়া রেলিঙের ধারে গিয়া দাঁড়ায়। এই প্রকারে একে একে প্রায় সকলেই শয্যা গ্রহণ করিল। খালাসিরা বলিতে লাগিল, "এই রকম ঠাণ্ডা দরিয়া, এতেই এরা মাথা ঘুরে শুয়ে পড়ছে, ঝড়-বাদল হ'লে কি করত ? খুব পল্টন করেছে !"

সন্তোষ সঙ্গীর অভাবে একেলা ডেকে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। বসিলেই মাথা কেমন করে বলিয়া সে জাহাজের দুলুনির সহিত তালে তালে ঢুলিয়া চলিতে অভ্যাস করিয়া ফেলিল। খালাসিরা তাহার চেষ্টা দেখিয়া হাসিলেও বলিতে বাধ্য হইল, "হ্যাঁ, এই লম্বা লোকটা নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে বটে।" অপর যাহারা অসুস্থ হইয়া অতি শীঘ্র উঠিয়া আসিল তাহাদের মধ্যে সন্তোষের বন্ধু অরুণ একজন। যে দুই-তিন দিন সকলে শুইয়া রহিল, সন্তোষ ও অরুণ ক্রমাগত জাহাজের ডেকে-এধার-ওধার করিয়া হাঁটিয়া ও গল্প করিয়া সময় কাটাইত। কথা অবশ্য বেশীর ভাগ অরুণই বলিত ও সন্তোষ অবাক হইয়া এই অদ্ভুত প্রতিভাবান যুবকের কথা শুনিতে থাকিত। এই ছেলেটি সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্টবাদী। সুখ-দুঃখ, মরা-বাঁচা, যশ-কলঙ্ক, দারিদ্র্য-ঐশ্বর্য্য, সকল কিছুই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। ভারতের যে সকল জাতি মগজের ক্ষেত্রে যশ অর্জ্জন করিতে পারে নাই, তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙালী অপেক্ষা উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে শুধু এই কারণে যে, বাঙালী তাহার মগজের সাহায্যে পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া শুষ্ক স্থানে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জীবন কাটাইয়া দেয় এবং অপরাপর জাতিরা চোখ বন্ধ করিয়া শুধু অদৃষ্টমাত্র সম্বল করিয়া দ্রুত আগাইয়া চলে। জীবন গতির ক্ষেত্র, সেখানে মাপিয়া-জুখিয়া অঙ্ক কষিয়া কেহ বেশী দূর যাইতে পারে না।

সন্তোষ বলিত, "হ্যাঁ ভাই, তা হ'লে কলেজ ছেড়ে দিয়ে ভালই করেছি, না ?"

অরুণ উত্তর দিত, "কলেজে প'ড়ে কে কবে কোন্ বড় কাজটা করেছে ? দুনিয়াই হ'ল সব থেকে বড় কলেজ। সেখানে বেরিয়ে এসে যে-শিক্ষা লাভ করা যায়, তাই আসল শিক্ষা। কর্ণ, অর্জ্জুন, বিক্রমাদিত্য, রাণা প্রতাপ, রণজিৎ সিং, বাবর, আকবর, এঁরা কি কলেজে পড়েছিলেন ? না, বুদ্ধদেব, যিশুখ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ এঁরাই পড়েছিলেন ?"

সন্তোষ বলিত, "ঠিক বলেছিস ভাই। কলেজে পড়ে কোন লাভ নেই।"

জাহাজখানা তিন-চারি দিন চলিবার পরে অসুস্থ সৈনিকের দল ক্রমশঃ টলিতে টলিতে ডেকে আসিয়া উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল। যেন বহুকাল ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া উঠিয়াছে এই প্রকার চেহারা। কিন্তু দুই দিন যাইতে-না-যাইতে প্রায় সকলেই পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল। সমুদ্রের হাওয়ায় ক্ষুধা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল এবং সকলের ক্ষুধার তাড়নায় রন্ধন-বিভাগের কর্ম্মচারীরা ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

একটা সঙ্কীর্ণ জলপথ অতিক্রম করিয়া জাহাজখানা পুনরায় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত জলক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল। এখানে দুই পার্শ্বে দূরে স্থল দেখা যায়। অল্প উচ্চ লালাভ পাহাড়ের সারি। হরিতের আভা মাত্র নাই। দেখিলেই বুঝা যায় শুধু শুষ্ক পাথর আর বালি। এইখানে আসিতেই জাহাজের ড্রিল প্রভৃতি হঠাৎ চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। দিন রাত সকল সময় সঙ্কেত আর ড্রিল। সকলে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া কি যেন একটা অজানা আতঙ্কে চঞ্চল হইয়া উঠিল। মাঝে মাঝে দ্রুতগামী শিকারী কুকুরের মত এক একটা যুদ্ধ জাহাজ আসিয়া সৈন্যবাহী জাহাজটাকে দুই পাক ঘুরিয়া অন্তর্হিত হইতে লাগিল। সুদূর আকাশে বহু ঊর্দ্ধে দুই চারিটা যুদ্ধ-বিমানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি শ্যেন পক্ষীর ন্যায় ভাসিয়া ভাসিয়া পাহারা দিতে আরম্ভ করিল। জাহাজের স্থানে স্থানে ছদ্মবেশ ছাড়িয়া ফেলিয়া কয়েকটা ঊর্দ্ধ ও নিম্নমুখী কামান বাহির হইয়া পড়িল। তাহাতে গোলা ভরিয়া গোলন্দাজগণ অষ্টপ্রহর সজাগ হইয়া কাহাকে যেন মারিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়া

রহিল। কোন অদৃশ্য শত্রুর ভয়ে যেন সকলে নিদ্রাহীন ও বিক্ষুব্ধচিত্ত।

দুই-তিন দিন এই ভাবেই কাটিয়া গেল। রাত্রে জাহাজের কোথাও তিলমাত্র আলোকের চিহ্ন থাকে না। দিবানিশি সকলে লাইফ বেল্ট পরিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে জাহাজ ছাড়িয়া নৌকায় আশ্রয় লইবার জন্য প্রস্তুত থাকে। অথচ হয় না কিছুই। বিপদ হইতে বিপদের আতঙ্ক মানুষকে অধিক ভীত চকিত করিয়া তোলে। এই সংশয়-শঙ্কিত অবস্থায় সকলের সুখ-শান্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইতে বসিল। মেজাজও বিশেষ রুক্ষ ভাব ধারণ করিল।

তৃতীয় দিবসের সূর্য্যাস্তের সময় জাহাজের উপরের ডেকে যে-সকল লোক সমুদ্র ও আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পাহারা দিতেছিল তাহাদের মধ্যে একজন অস্তগামী সূর্য্যের দিকে হঠাৎ চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "অনেকগুলো কালো কালো দাগের মত কি নড়ছে চড়ছে দেখ ত!" অপর দুই তিন ব্যক্তি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হাওয়াই জাহাজ বলে মনে হচ্ছে।" এক জন দৌড়িয়া গিয়া নিজ উপরওয়ালা কর্ম্মচারীকে বলিল যে কয়েকটা বিমান সূর্য্যের কোল ঘেঁষিয়া এই দিকে আসিতেছে। কর্ম্মচারী তাড়াতাড়ি সেই দিকে দেখিয়া অপরাপর দুই চারি জন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া দেখাইলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে কি জল্পনা করিয়া তাঁহারা বিপদের সঙ্কেত করিতে আদেশ দিলেন। ভোঁ ভোঁ ভোঁ আওয়াজে জাহাজ ক্ষণিকের মধ্যে সজাগ চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিমান-ধ্বংসী কামানের গোলন্দাজরা কামানগুলির মুখ ফিরাইয়া বিমান-আগমন-পথের আকাশে তাক করিতে আরম্ভ করিল। জাহাজের উপরের ডেক হইতে অতিরিক্ত লোকেদের নীচে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বেতারে ঘন ঘন বিপদের কথা ছড়াইয়া দেওয়া হইতে লাগিল যাহাতে রক্ষী যুদ্ধজাহাজগুলি সাহায্যের জন্য শীঘ্র আইসে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্রোধোন্মত্ত একটা রাক্ষুসে ভীমরুলের মত গোঁ গোঁ করিতে করিতে একখানা বিমান আকাশের ঊর্দ্ধদেশ হইতে গোঁৎ খাইয়া জাহাজখানার উপর আক্রমণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে চার পাঁচটা বিমান-ধ্বংসী কামান কর্কশ কণ্ঠে জাগিয়া উঠিল। বিমানটা জাহাজের ডেকের প্রায় তিন চার শত ফুটের মধ্যে আসিয়া দুই তিনটা বোমা ফেলিয়া রুক্ষ গর্জ্জনে আকাশ ফাটাইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল। বোমা কয়টাই জাহাজের আশে-পাশে পড়িয়া শত শত মণ জল উৎক্ষিপ্ত করিয়া জাহাজের ডেক ভিজাইয়া দিল। জাহাজটা সে-সব বিস্ফোরণের ধাক্কায় কাঁপিয়া উঠিল কিন্তু অন্যভাবে জখম হইল না। তার পর একটার পর একটা বিমান প্রথমটার অনুকরণে জাহাজের উপর আসিয়া পড়িয়া বোমা ফেলিয়া অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তদুপরি মেশিন গান চালাইয়া জাহাজের ডেকে শিলাবৃষ্টির মত গুলি ছড়াইয়া সকলের জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিল। গোলন্দাজ দুই তিন জন মরিল এবং অনেকে জখম হইল। একটা বোমা জাহাজের অগ্রভাগে পড়িয়া কয়েকটা নৌকা ও ডেকের অনেকাংশ উড়াইয়া দিল। সেখানে আগুন লাগিয়া গেল কিন্তু আগুন নিবানর সুব্যবস্থায় তাহা সত্বর নিবিয়া গেল। বিমানগুলি পুনর্ব্বার উচ্চ হইতে আরও উচ্চে উঠিয়া আর একটা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে দূরে দুইটা ব্রিটিশ রণতরী দেখা গেল এবং তিন-চারখানা বিমানও দূরাকাশে ভাসিয়া উঠিল। শত্রুবিমানগুলি এই সব দেখিয়া আর আক্রমণ না করিয়াই আকাশের অপর এক প্রান্তে চলিয়া গিয়া অল্পক্ষণের মধ্যে দৃষ্টির বাহিরে মিলাইয়া গেল। যুদ্ধ-জাহাজগুলিও নিকটে আসিয়া সকল খবর লইয়া চলিয়া গেল। জাহাজখানা পুনরায় যেন কিছু হয় নাই এই ভাবে চলিতে লাগিল।

এই আক্রমণের পরে প্রহরী যুদ্ধ-জাহাজ ও বিমানগুলি আরও সতর্ক হইয়া সদা-সর্ব্বদা জাহাজখানার কাছাকাছি ঘোরাফেরা করিতে লাগিল ও শীঘ্রই সকলে নিরাপদে একটা বন্দরে আসিয়া পৌঁছাইল। এখানেও জাহাজ হইতে নৌকা করিয়া সকলে স্থলে অবতীর্ণ হইল এবং কিছু দূর মার্চ্চ করিয়া অস্থায়ী রকম একটা সেনানিবাসে গিয়া উপস্থিত হইল। ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার সময় যেরূপ কেহ জানিতে পারে নাই যে কোথা হইতে কোথায় যাওয়া হইতেছে, এখানেও সেইরূপ কেহ জানিল না যে কোথায় আসা হইল এবং কোথায় বা যাওয়া হইবে। এখানকার বাসিন্দাদিগের মধ্যে যাহাদের দেখা গেল তাহাদের ভাষা কেহই বুঝিতে পারিল না, সুতরাং বিষয়টা আরও অজানা থাকিয়া গেল।

কয়েক সপ্তাহ এইখানেই কাটিয়া গেল। হঠাৎ সাধারণ ড্রিল প্রভৃতি স্থগিত রাখিয়া সৈন্যগণকে পথহীন প্রান্তরের উপরে মাইলের পর মাইল লইয়া যাওয়া আরম্ভ হইল। এই সকল কসরতের সময় তাহাদের লড়াইয়ের সাচ্চা মাল-মশলা বহিয়া চলিতে হইত। শত্রুর আক্রমণ হইতে বাঁচিবার বিভিন্ন উপায়, যথা গাছ ঢাকা দিয়া অগ্রসর

হওয়া, দ্রুত ছড়াইয়া পড়া ও একত্র হওয়া, নানা দিক হইতে শত্রুর উপর অগ্নিবর্ষণ কেন্দ্রীভূত করা, ধোঁকা দেওয়া, বোমা ছুঁড়িয়া শত্রু নিপাত ইত্যাদি বহুবিধ যুদ্ধ-কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র আয়ত্ত করা হইতে লাগিল।

কিছু দিন গত হইলে এক দল গোলন্দাজ সৈন্য আসিয়া ইহাদের সহিত মিলিত হইল। কয়েকটা বিমানও আসিয়া জুটিল। অতঃপর কামান ও বিমান সহযোগে যুদ্ধ অভ্যাস চলিল। ইহার মধ্যে দুই-একবার শত্রু-বিমানের আবির্ভাবে সকলকে গা ঢাকা দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অদৃশ্য হইয়া থাকিতে হইত। খাওয়া, শোওয়া, রাত্রে পাহারা দেওয়া ও দিনে কঠোর রৌদ্রে প্রায় এক মণ মালপত্র বহন করিয়া বিশ-ত্রিশ মাইল দৌড়ধাপ; এই ভাবেই জীবন কাটিতে লাগিল। সকলে এই দুর্দান্ত জীবনযাত্রার ফলে লোহার মত শক্ত হইয়া উঠিল। অরুণ বলিল, "দু-চার ব্যাটা ইটালিয়ান কি জার্মান পেলে হাতটা আরও পাকান যেত। এ যেন আমিষের মধ্যেও নিরামিষের গন্ধ।" সত্যেন বলিল, "দাঁড়াও বন্ধু! যথাসময়ে যথাস্থানে দেখা পাবে এখন। এ আমাদের গোকুলে বাড়ান হচ্ছে। হঠাৎ গিয়ে যখন ব্যাটাদের ঘাড়ে পড়ব তখন বুঝিয়ে দেব বাদাম চালের ধাক্কা কত দূর পৌঁছয়।" সন্তোষ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইটালিয়ান আর জার্মানরা কি করেছে?"

সবাই "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তাও জানিস না, চিম্‌নি? ওরা লাখখানেক ইহুদীকে কেটে রান্না ক'রে খেয়েছে।"

"মানুষের মাংস খায়? আরে রাম রাম!"

"ওদের হাতে ধরা পড়লে আর নিস্তার নেই; তোকে দিয়ে স্রেফ কচি পাঁঠার ঝোল রেঁধে ফেলবে।"

সকলে বিকট হাস্যে বন্দী সন্তোষের পরিণতি সম্বন্ধে নিজেদের অভিমত জানাইয়া দিল। সন্তোষ বলিল, "আমায় ধরতে পারবেই না!"

মাসাধিক কাল গত হইলে এক দিন সকলে তাঁবু প্রভৃতি উঠাইয়া মার্চ করিয়া পুনরায় সমুদ্রের কিনারায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই-তিন খানা ছোট ছোট জাহাজে নৌকার সাহায্যে আরোহণ করিয়া যাত্রা আরম্ভ হইল। দুই দিন পরে সন্ধ্যার অন্ধকারে জাহাজগুলি তীরের দিকে অগ্রসর হইল। জাহাজের সকল নৌকা কপিকলে টানিয়া নামাইবার জন্য প্রস্তুত করা হইল। তার পর হুকুম হইল "যে যাহার স্থানে নৌকায় চড়িয়া ব'স।" সকলে বসিলে পরে নৌকাগুলি জলে নামাইয়া দেওয়া হইল। দূরে বেলাভূমির উপর ঢেউ ভাঙিয়া পড়ার "ক্রম" "ক্রম" শব্দ কানে আসিতে লাগিল। চারি দিক নিস্তব্ধ অন্ধকার। তীরের এক জায়গা হইতে কাহারা বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে সঙ্কেত করিতেছিল। ঢেউয়ের ঝাপটায় হাবুডুবু খাইয়া নৌকাগুলি একে একে বালির উপর গিয়া পড়িতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যগণ লাফ দিয়া জলে নামিয়া ডাঙায় উঠিয়া পড়িতে লাগিল। সকল সৈন্য অবতীর্ণ হইলে পর সারবন্দি হইয়া সকলে সমুদ্রতট হইতে আরও ভিতরে চলিয়া গিয়া দাঁড়াইল। কাহারও কোন শব্দ করা অথবা আলো দিয়াশলাই জ্বালা বারণ। সন্তোষ ফিস ফিস করিয়া অরুণকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই ইটালিয়ানদের দেশ নাকি?" অরুণ বলিল, "না, চিত্রগুপ্তের সদর মুল্লুক। চুপ ক'রে থাক্ চিম্‌নি!"

রাত্রি গভীর হইল। সকলে যে যেখানে ছিল বিস্কুট চিবাইয়া বোতল হইতে জল খাইয়া শুইয়া পড়িল। চতুর্দিক নিঃশব্দে পাহারা চলিতে লাগিল। সারা রাত্রি মাল-মশলা, কামান গোলা প্রভৃতি নিঃশব্দে জাহাজ হইতে তীরে নামান চলিতে লাগিল। ভোরের আলো যখন অন্ধকারকে শুধু অল্প মাত্র হাল্কা করিয়া তুলিয়াছে, তখন সকলে রন্ধন-বিভাগের লোকেদের অদৃশ্য হস্তে এক এক মগ কোকো পাইল এবং উহা গলাধঃকরণ করিবার পরেই নিজ নিজ কর্ম্মচারীর নিঃশব্দ আদেশে ধীর গতিতে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। মাইল চার-পাঁচ পার হইবার পর হঠাৎ দূরে বামে একটা বন্দুকের শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে শত মেশিন গানের কর্কশ কলরবে ভোরের শান্ত-স্নিগ্ধ আবহাওয়া নিমেষে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সৈন্যগণ যে যেখানে ছিল সটান মাটিতে শুইয়া পড়িল ও হামা দিয়া ঝোপঝাড় উইঢিপি যাহা পাইল তাহার অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিল। শত্রুপক্ষের মেশিন গানের গুলিবর্ষণে কাহারও কিছু হইল না, কারণ তাহারা এখনও আক্রমণকারী সৈন্যদলের অবস্থিতি সম্বন্ধে কোন সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করে নাই।

দুই-চারি মিনিট গত হইলেই বাহির-সমুদ্রের পথে 'শাঁই শাঁই' শব্দ শুনা গেল ও যুদ্ধজাহাজ হইতে নিক্ষিপ্ত গোলাগুলি সৈন্যদলের মাথার উপর দিয়া শত্রুর এলাকায় পড়িয়া ফাটিতে আরম্ভ করিল। পর-মুহূর্ত্তে রণতরীর কামানের গম্ভীর গর্জ্জনে চরাচর কম্পিত হইয়া উঠিল। হুকুম আসিল নিজ নিজ স্থানে খনন করিয়া পাকা হইয়া বসিবার। অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় খনন-কার্য্য সুরু হইল এবং শীঘ্রই সকলে প্রায় কোমর অবধি গর্ত্ত খুঁড়িয়া

ফেলিল। শত্রুপক্ষও এতক্ষণে দিবালোকে দেখিতে পাইল যে আক্রমণকারীরা কোথায় আছে এবং অবিলম্বে তাহাদের মেশিন গান, বন্দুক প্রভৃতি যথাস্থানে গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিল।

ইটালিয়ানগণ এই অঞ্চলে কোন আক্রমণ আশঙ্কা করে নাই এবং এই কারণে এই স্থলে তাহাদিগের সৈন্য ও অস্ত্রবল যথেষ্ট ছিল না। অল্প যাহা কিছু ছিল তাহারই সাহায্যে ঘণ্টাধিক কাল আক্রমণকারীদিগের উপর অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ করিল, কিন্তু প্রত্যুত্তরে চার-পাঁচ-খানা রণতরী হইতে গোলা বৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মানে মানে পিছু হটিয়া সরিয়া পড়িল। আকাশে বিমানে বিমানে দুই-চারিটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝুটাপুটি হইয়া গেল ও তাহাতে একখানা ইটালীয় ও একখানা ব্রিটিশ বিমান আহত হইয়া কোন মতে ভূতলে নামিয়া আসিল। রণতরীর গোলা দূর হইতে আরও দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া অবশেষে আর শত্রুর নাগাল পাইল না। বেলা তখন তিনটা চারটা। হঠাৎ একটা শেষ গর্জ্জন করিয়া গোলাবর্ষণ থামিয়া গেল।

পদাতিক বাহিনীর কর্ম্মচারী অতঃপর এদিক ওদিক ধাবমান হইয়া দেখিতে লাগিলেন নিজেদের হতাহতের সংখ্যা কত হইল। সৌভাগ্যক্রমে দুই চারি জন ব্যতীত কাহারও কোন প্রকার সাংঘাতিক চোট লাগে নাই। অতঃপর নির্ব্বিবাদে জাহাজ হইতে আরও যাহা কিছু মালপত্র ছিল তাহা নামান হইল এবং এই স্থলে পরিখা খনন করিয়া, কাঁটাতারের বেড়া দিয়া ও অন্যান্য বিলি-ব্যবস্থা করিয়া পাকা একটা আস্তানা গড়িয়া তোলা আরম্ভ হইল। দুই-চারি দিনের মধ্যে বড় বড় কামান, বেতার, রেলের লাইন, মাটির নীচে বোমা হইতে নিরাপদ গুদাম, দপ্তর, হাসপাতাল প্রভৃতি রীতিমত বসান ও গঠিত হইতে আরম্ভ করিল। একটা জাহাজ আসিয়া অনেকগুলি সাঁজোয়া গাড়ী ও ছোট বড় ট্যাঙ্ক নামাইয়া দিয়া গেল।

সাত-আট দিন কাটিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে লৌহবর্ম্ম-রক্ষিত রথে এক এক দল খবর-সংগ্রহণকারী সৈন্য বহুদূর অবধি ঘুরিয়া আসে ও তৎপরে সেনাপতিদের সভা বসিয়া যায়। বিমান হইতেও শত শত ফোটো তুলিয়া আনা হয় ও সকল বার্ত্তা বিচার করিয়া জল্পনা হয় কোন্ পথে শত্রুনিপাতে অগ্রসর হওয়া সমীচীন। অবশেষে এক দিন মূল শিবির সুরক্ষিত রাখিয়া, ডাহিনে বামে ও অগ্রে প্রহরীবাহিনী আগাইয়া দিয়া অভিযান আরম্ভ হইল।

অরুণ সন্তোষকে বলিল, "এই ত যুদ্ধ। বাংলার কোন গাঁয়ে এক সপ্তাহ থাকলে এতক্ষণ অর্দ্ধেক লোক জ্বরে কাঁপতে আরম্ভ করত আর ডজন দুই পিলের ঠেলায় ম'রে বসে থাকত। তা ছাড়া ওলাউঠা, বসন্ত, টাইফয়েড আরও কত কি! এ ঢের ভাল। কপালে থাকে ত ধাঁইসে লাগবে আর মরবে, নয়ত রাখে কৃষ্ণ…ইত্যাদি ইত্যাদি।"

সন্তোষ বলিল, "শত্রুই নেই ত যুদ্ধ কি হবে? আমি ত গর্ত্তের মধ্যে ব'সে বেশ ক-ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলাম।"

ধীরমন্থর গতিতে, পদে পদে অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা বিচার করিয়া অভিযান অগ্রসর হইতে লাগিল। বহু স্থলে ঘাঁটি বাঁধা হইল, যদি ফিরিয়া আসিতে হয়। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদল দূর দূরান্তরে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, যদি শত্রু পিছন হইতে ঘুরিয়া আসিয়া আক্রমণ করে। পিছনে রাস্তা সাফ করিতে এবং যুদ্ধোপকরণ ও রসদ সরবরাহের কার্য্য বজায় রাখিতে লোক লাগিয়া গেল। টেলিফোনের তার বসিল, মালবাহী লরী ছুটিতে লাগিল, আরও কত কিছু ব্যবস্থা হইল। যুদ্ধকার্য্য সকল কার্য্যের সেরা। ইহার শাখা-প্রশাখা অসংখ্য এবং রীতি-নীতি কঠোর ক্ষমাহীন ভাবে নিখুঁত। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শত শত হুকুম চলিতেছে ও কলের মত কাজ হইতেছে। কোথাও কাহারও মনে দ্বিধা নাই, স্বেচ্ছাচার নাই, কার্য্যে ফাঁকি নাই।

জাহাজ হইতে নামিবার পরে পঁচিশ দিন কাটিয়া গিয়াছে। শত্রু চিরপলাতক। কোথাও তাহার দেখা পাওয়া গেল না, কিন্তু তাহার শ্যেন দৃষ্টি অভিযানের উপর স্থিরনিবদ্ধ নিঃসন্দেহ।

ভোর বেলা। আকাশ কুয়াশায় আধ-ঢাকা। হঠাৎ একটা ঝোপঝাড় ও উইঢিপির অন্তরাল হইতে মেশিন গানের আওয়াজ ধ্বনিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ-ত্রিশ জন সৈন্য হতাহত হইয়া ধরাশায়ী হইল। ক্ষণিকের মধ্যে নিকটস্থ সৈন্যদল ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল ও শত্রুর আস্তানার উপর গুলিবর্ষণ আরম্ভ হইল। কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া শত্রুর মেশিন গান গর্জ্জাইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে আরও গভীর গর্জ্জনে মর্টার কামান হইতে বড় বড় বোমা উৎক্ষিপ্ত হইয়া অভিযানের উপর পড়িতে আরম্ভ করিল। সেনাপতি মহলে সাড়া পড়িয়া গেল। জল্পনা আরম্ভ হইল শত্রু কত জন আছে এবং তাহাদের নিপাত করিয়া অভিযান অগ্রসর হইবার সহজ উপায় কি ইত্যাদি। বহু পরামর্শের পরে স্থির হইল যে এক দল সৈন্য কয়েক মাইল ঘুরিয়া শত্রুর আস্তানা পিছন হইতে আক্রমণ করিবে এবং সেই সময় সম্মুখের সৈন্যদলও শুইয়া পড়িয়া অগ্রসর হইয়া উহাদিগের

উপর বোমাবর্ষণ করিবে। দুই-তিন ঘণ্টা আয়োজনে কাটিয়া গেল এবং তৎপরে পিছন হইতে আক্রমণটা আরম্ভ হইল। বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া এক দল সৈন্য পিছন হইতে সেই ঝোপঝাড় ও উইটিপির গড়ের উপর হানা দিল। গোলাগুলির আওয়াজে চতুর্দ্দিক ভরিয়া উঠিল। অরুণ ও সন্তোষদের কোম্পানির উপর হুকুম হইল হামা দিয়া অগ্রসর হইবার। সকলে সরীসৃপের মত ধীর গতিতে মাটির সহিত মিশিয়া পড়িয়া আগাইয়া চলিল। আধ ঘণ্টার পর সকলে শত্রুর অতি নিকটে আসিয়া পৌঁছাইলে পর বোমা ছুঁড়িবার আদেশ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ-ত্রিশ জন সৈন্য হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া কয়েক পদ দৌড়িয়া গিয়া বোমা ছুঁড়িয়া নিমেষের মধ্যে মাটিতে শুইয়া পড়িয়া গা ঢাকা দিল। বিস্ফোরণের শব্দ ও হতাহতের কাতর আর্ত্তনাদ মিলিয়া একটা ভয়াবহ কোলাহলের সূচনা হইল।

অরুণ বোমা-নিক্ষেপকারীর দলে ছিল। তাহার উৎসাহ কিছু অধিক থাকায় সে শত্রুপক্ষের অতি নিকটে গিয়া বোমা ফেলিয়া শুইয়া পড়িল। সে আবার উঠিয়া বোমা ছুঁড়িবে ইতিমধ্যে তিন-চারি জন ইটালিয়ান লাফ দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া তাহার উপর পড়িল। এক জন সঙ্গীন দিয়া তাহাকে আঘাত করিয়া ফেলিয়া দিল ও অপর দুই জন তাহার কাপড় ধরিয়া হিঁচড়াইয়া টানিয়া বন্দী করিয়া লইয়া চলিল। ইহা দেখিয়া সন্তোষ সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া "এই, এই, মারলি কেন" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল ও কয়েক লম্ফে বহু গজ পথ অতিক্রম করিয়া শত্রুদের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। সে বন্দুকের নলের দিকটা ধরিয়া লাঠির মত করিয়া বন্দুক ঘুরাইয়া ক্ষণিকের মধ্যে ইটালিয়ানদিগকে প্রচণ্ড আঘাতে ধরাশায়ী করিয়া দিল ও অরুণকে তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আরও পাঁচ-সাত জন শত্রুপক্ষের লোক দৌড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়া সন্তোষকে আক্রমণ করিল। "তবে রে!" বলিয়া সন্তোষ অরুণকে ছাড়িয়া আবার বন্দুকের আঘাতে সকলকে বিচলিত করিয়া তুলিল এবং অচিরাৎ ইটালিয়ানগণ ছিটকাইয়া এদিকে-ওদিকে পড়িতে লাগিল। শত্রুপক্ষ নিজেদের লোকের গুলি লাগিবে আশঙ্কায় সন্তোষের উপর গুলি চালাইতে পারিতেছিল না এবং সন্তোষও বিদ্যুৎচালিত তালবৃক্ষের ন্যায় বন্দুক-গদা হস্তে উন্মত্ত আবেগে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। পুনরায় কয়েক জন ইটালিয়ান এই দীর্ঘকায় উন্মাদটাকে বন্দী করিবার জন্য দৌড়িয়া আসিল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সন্তোষ, ইটালিয়ান ও বন্দুক-সঙ্গীনের মিশ্রণে এক অপূর্ব্ব চলচ্চিত্র প্রাণবান হইয়া উঠিল। সন্তোষ কাহাকেও লাথি, কাহাকেও বন্দুকের আঘাত করিয়া সকলকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল।

কি হইত বলা যায় না কিন্তু "চিম্‌নি"র বিপদ দেখিয়া তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এতক্ষণে সজাগ হইয়া উঠিল। তার পরেই অকস্মাৎ "চিম্‌নি মার্ বেটাদের, মার্ বেটাদের" শব্দে গগন কাঁপাইয়া প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন সৈনিক বোমা ও বন্দুক হস্তে নিমেষের মধ্যে মধ্যস্থিত জমি পার হইয়া ইটালিয়ানদের উপর গিয়া পড়িল এবং অচিরাৎ সন্তোষের কয়েক জন আক্রমণকারীকে শেষ করিয়া টিপিগুলার অন্তরালস্থিত শত্রুদের উপর একাধারে শতাধিক বোমা নিক্ষেপ করিয়া লাফ দিয়া টিপির সারি টপকাইয়া অপর পার্শ্বে হাজির হইল। ইটালিয়ানগণ এইরূপ একটা তীব্র আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাহারা সন্তোষের লীলা দেখিতেই ব্যস্ত ছিল। এই আক্রমণে তাহারা টিপিদুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু তাহাদের বেশী দূর যাইতে হইল না। চারিদিক হইতে বেষ্টিত হইয়া তাহারা আত্মসমর্পণ করিল।

সেদিন সন্ধ্যায় আরও পনের-বিশ মাইল ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া যখন সকল সৈন্য রাত্রের মত আস্তানা গাড়িল তখন ঘন ঘন বিউগ্‌ল্ ধ্বনিতে সকল সেনাকে একত্র করিয়া একটা ভারি রকম সভা হইল। সেখানে সেনাপতিদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন তিনি সকল সৈন্যদের, তাহাদের সাহস ও যুদ্ধদক্ষতা সম্বন্ধে বহু প্রশংসা করিলেন। সর্ব্বশেষে তিনি বলিলেন, "এই অভিযানের দ্রুত অগ্রসর হইবার পথে আজ যে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা প্রধানতঃ একজন সৈনিকের বেপরোয়া বীরত্বের জন্যই সত্বর সরাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়। তাহাকে আমি তাহার বীরত্বের জন্য হাবিলদার পদে উন্নীত করিলাম এবং আমার রিপোর্টে যাহাতে সে বীরত্বের জন্য উপযুক্তরূপে সম্মানিত হয় ও মেডাল পায় সে কথা লিখিব। এই বীর সৈনিকের নাম তোমরা সকলেই জান।" সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল "চিম্‌নি! চিম্‌নি!"

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

বহির্জগতের নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ঘটনাও কবির অন্তর্লোকের অনুভূতিতে উত্তীর্ণ হয়ে কি ভাবে কবিতার প্রেরণা জুগিয়ে থাকে, সে-রহস্য আমাদের অজ্ঞাত এবং বোধ করি, কবির নিজের কাছেও সব সময় সুস্পষ্ট থাকে না। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আনন্দ বেদনা, তা নিজেরই হোক কিংবা অপরেরই হোক, যদি হৃদয়ের তন্ত্রীতে একটি বিশেষ উপলব্ধির সুর ঝঙ্কৃত ক'রে তুলতে পারে, তবেই সুরু হয় কাব্যসৃষ্টি। তার পর সেই উপলক্ষ্য মুছে যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে, ব্যক্তিগত অনুভূতি বিশ্বজনীনতার রসে-রঙে অনুরঞ্জিত হয়ে প্রকাশিত হয় অমর বাঙ্ময় মূর্ত্তিতে। কাব্যের এই রসোত্তীর্ণ প্রকাশেই কবিতার সার্থকতা, তার উৎসমূলে রসোদ্রেক করেছিল যে-উপলক্ষ্য, তা একেবারেই গৌণ, এমন কি, পাঠকের আলোচ্যই নয়। কিন্তু তথাপি কবিতা লেখার উপলক্ষ্যকে আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না, তার সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক কৌতূহলও কম থাকে না। রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখাই দর্শকের উদ্দেশ্য, কিন্তু সুযোগ পেলেই মঞ্চের অন্তরালে সাজঘরে কি উদ্যোগ-আয়োজন চলছে, সেদিকে উঁকিঝুঁকি দিতেও কেউই ছাড়ে না। কাব্যপাঠের পথে তার রচনার বাহ্য ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা প্রকৃষ্ট পন্থা না হ'তে পারে, কিন্তু গঙ্গোত্রীতে একবার পৌঁছতে পারলে গঙ্গার ধারা অনুসরণ করা অনেক সময়ই যে সহজসাধ্যও হয়ে পড়ে, তাও অস্বীকার করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা রচনার উপলক্ষ্য বর্ণনা করার কৈফিয়ৎ স্বরূপই এই ভূমিকার অবতারণা করা গেল। 'বীথিকা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত "নিঃস্ব" নামক কবিতার কথা বলতে চাই।

শান্তিনিকেতনে "রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা" নামক একটি প্রতিষ্ঠান ছিল, এখনও তা সক্রিয় আছে কি না জানি না। তার উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কর্ম্মধারার আলোচনা ও তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ সংস্থাপন। উহার অন্তর্গত নানা বিভাগের মধ্যে "পত্রিকা" বিভাগের তরফ থেকে 'রবীন্দ্র-পরিচয়-পত্রিকা' নামক হস্তলিখিত একখানি পত্রিকা আশ্রমে প্রকাশিত হ'ত। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, আর্থিক চাঁদা আদায়ের কাজ আমাদের দেশে কম দুরূহ নয়, বিশেষতঃ, পত্রিকা যদি ছাপাখানার কৌলীন্যবর্জ্জিত হয়। একবার এই লেখা সংগ্রহের ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হলাম, বললাম, "একটা কবিতা লিখে দিতে হবে।" 'রবীন্দ্র-পরিচয়-পত্রিকা'তে রবীন্দ্রনাথকেই লেখক হ'তে বলা নিতান্তই স্ব-বিরোধী প্রস্তাব, এই আপত্তি দেখিয়ে আমাদের দাবী তিনি উড়িয়ে দিতে চাইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ আপত্তি খণ্ডন করার মত যুক্তির অভাব আমাদের ছিল না। প্রেসিডেন্সি কলেজের 'রবীন্দ্র-পরিষদে' এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে অন্যত্রও যখন তিনি বক্তৃতা ও লেখা দিতে ইতস্ততঃ করেন নি, তখন আমরা বঞ্চিত হব কোন্ ন্যায়সঙ্গত কারণে? অতএব নিরস্ত না হয়ে পত্রিকার জন্য নির্দ্দিষ্ট কাগজ একখণ্ড তাঁর টেবিলের উপর রেখে কাগজের দু-পাশে কতখানি জায়গা ফাঁক রাখতে হবে, তাই দেখিয়ে দিলাম।

হয়ত আমাদের দাবী তাঁর সহানুভূতি উদ্রেক করল। বললেন, "দ্যাখো, তোমরা কাছে এসেছ জীবনের অপরাহ্ণ বেলায়, অসময়ে। একদিন ছিল, যখন ফরমাস মত কবিতার পর কবিতা লিখে দিয়েছি নিতান্ত সহজে। আশ্রমে ইংরেজ কবিদের কাব্য আলোচনাচ্ছলে সঙ্গে সঙ্গে, মুখে মুখে তার ছন্দোবদ্ধ তর্জ্জমা ক'রে দিয়েছি অতি স্বচ্ছন্দে, তার জন্য আগে থেকে কিছুমাত্র প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজনও অনুভব করি নি। লিখতে বসলেই লেখা যায়, তারও যে ব্যতিক্রম থাকতে পারে, সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে তখনও বাকি ছিল।"

সেই স্মরণীয় এবং লোভনীয় কালের আশ্রমিকদের সৌভাগ্যের কথা ভেবে মনে মনে ঈর্ষ্যা অনুভব করছিলাম, কিন্তু মুখে পুনরায় কবিতার দাবী জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

বিকেলবেলা চর এসে উপস্থিত, ডাক পড়েছে 'শ্যামলী'তে। গিয়ে দেখি, আমাদের দাবী স্পর্শ করেছিল কবি-চিত্তকে, রচিত হয়েছে "নিঃস্ব" নামক কবিতা।

এই হ'ল সংক্ষেপে গোড়াকার কথা। এবার কবিতাটির দিকে নজর দিলে সহজেই বুঝতে পারা যাবে, সূচনাতে একটা সাময়িক ফরমাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকলেও উৎসারিত রস আপন আনন্দে সর্ব্বকালের সর্ব্বলোকের চিত্তজয়ী অনবদ্য রূপ গ্রহণ করেছে স্বচ্ছন্দগতিতে। এই ধরণের "ফরমাস" সম্বন্ধে 'মহুয়া'র পাঠ-পরিচয়ে কবি

বলেছেন—"ফরমাস ব্যাপারটা মোটর গাড়ীর স্টার্টার-এর মতো। চালনাটা সুরু করে দেয় কিন্তু তার পর মোটরটা চলে আপন মোটরিক প্রকৃতির তাপে। প্রথম ধাক্কাটা একেবারেই ভুলে যায়। মহুয়ার কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমাসের ধাক্কা নিঃসন্দেহই সম্পূর্ণ ভুলেছে—কল্পনার আন্তরিক তড়িৎ-শক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে। প্রথম হাতল ঘোরানো হোতেও পারে বাইরের থেকে, কিন্তু সচলতা সুরু হবামাত্রই লেখবার আনন্দই সারথী হয়ে বসে।" বস্তুতঃ, লেখবার আনন্দ যদি সারথী হয়ে না বসে, তবে কি অনির্ব্বচনীয়ের ব্যঞ্জনায় কোন কবিতাই নিবিড় হয়ে উঠতে পারে?

এবার কবিতাটির ভাবধারা অনুসরণ করা যাক।

আনন্দোৎসবের উদ্বোধন-সঙ্গীত রচনায় আবার ডাক পড়েছে কবির। কিন্তু হায়! কবি আজ নিঃস্ব! বিমুখ বাণীর প্রসাদলাভের ব্যাকুল প্রত্যাশা রুদ্ধ মন্দিরের দ্বারে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছে বারে বারে। গ্রীষ্মের রৌদ্র-দগ্ধ, স্নেহছায়াহীন, শুষ্ক অশোক-তরুতলের মত কবি আজ রিক্ত, হৃতগৌরব। আনন্দের কোলাহল নিয়ে উৎসবের দল এসেছে, কিন্তু কোথায় রচিত হবে উৎসবের মণ্ডপ? শূন্য শাখায় শাখায় হাহাকার নিয়ে ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়িয়ে আছে কুণ্ঠিত অশোক-তরু, কোথায় সেই সুরসভার অপ্সরার বহুবাঞ্ছিত চরণঘাত, যার স্পর্শে কুঞ্জে কুঞ্জে ফুটে উঠবে ফুল, আতিথ্যের আয়োজনে নবোদ্গত পাতার ছায়ায় ছড়িয়ে দেবে শ্যামশোভা? কবি আক্ষেপ করে বলছেন—

"কী আশা নিয়ে এসেছ হেথা উৎসবের দল।
অশোক তরুতল
অতিথি লাগি' রাখে নি আয়োজন।
হায় সে নির্জ্জন
শুকানো গাছে আকাশে শাখা তুলি'
কাঙাল সম মেলেছে অঙ্গুলি;
সুরসভার অপ্সরার চরণঘাত মাগি'
রয়েছে বৃথা জাগি'।"

কিন্তু তার এই দৈন্য চিরদিন ছিল না। ঐশ্বর্য্যের দিনও দেখা দিয়েছিল অতীতে, তার স্মৃতি আজ মনে জাগছে—

"আরেক দিন এসেছ যবে সেদিন ফুলে ফুলে
যৌবনের তুফান দিল তুলে'।
দখিন বায়ে তরুণ ফাল্গুনে
শ্যামল বন-বল্লভের পায়ের ধ্বনি শুনে
পল্লবের আসন দিল পাতি';
মর্ম্মরিত প্রলাপ-বাণী কহিল সারারাতি।"

সেদিন অভাব ছিল না, আতিথ্যের আয়োজনে উজাড় করে দিয়েছিল নিজের সর্ব্বস্ব। সেই পুরানো দিনের কথা স্মরণ ক'রে আজ আবার আনন্দ লাভের আশায় নিভৃত প্রাঙ্গণে এসেছ যদি, তবে একেবারে হতাশ হয়ে ফিরে যেয়ো না—

"যেয়োনা ফিরে, একটু তবু রোসো,
নিভৃত তার প্রাঙ্গণেতে এসেছ যদি বোসো।"

তোমাদের সেই চিরপরিচিত অশোক-তরুতলের উৎসব-প্রাঙ্গণ আজ শুষ্ক. ফুলে ফুলে যৌবনের তুফান আজ হিল্লোলিত হয়ে ওঠে না। কিন্তু তোমাদের প্রীতি দেওয়ার জন্য আজও সে তেমনি ব্যাকুল। তার এই নীরব আবেদন পুরানো দিনের বিস্মৃতপ্রায় আনন্দদানের স্মৃতিকে তোমাদের মনে যেন জাগিয়ে তোলে—

"ব্যাকুল তার নীরব আবেদনে
যেদিন গেছে সেদিন খানি জাগায়ে তোলো মনে।
যে দান মৃদু হেসে
কিশোরী-করে নিয়েছ তুলি' পরেছ কালো কেশে
তাহারি ছবি স্মরিয়ো মোর শুকানো শাখা আগে
প্রভাত বেলা নবীনারুণ রাগে।
সেদিনকার গানের থেকে চয়ন করি কথা
ভরিয়া তোলো আজি এ নীরবতা।"

ভাবনা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

এ অসহায় মনেরে তুমি করেছ যে নিরুপায়;
সুখ-আশা হরিয়া।
ছলনা তব সহে না হৃদে প্রাণ যে প্রাণেরে চায়,
প্রেম দিয়ে বরিয়া।
আজিকে ধরা আঁধারে ম্লান আকাশে জ্বলে না তারা
জীবনে ব্যথা পাই।
পড়ে না চোখে পাদপ-বীথি, প্রভাত জীবন-হারা
স্মরণে কিছু নাই।

এবার মোরে চলিতে পথে বাধা পেতে হয় শেষে
ভাবনা আসে মনে,
সুদূরে তুমি লুকায়ে আছ—দেখা দিতে যদি এসে
এ দুর্যোগ ক্ষণে!
এত যে ভয় ছেয়েছে মোরে রহিত না নিশিদিন
তব কর-পরশে,
তোমারি সাথে চলিতে পথ সব বাধা হ'ত লীন
গান গেয়ে হরষে।

প্রশ্ন

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

২১

রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে—আজ এত রাত্রেও অবনী বাসায় ফিরিয়া যায় নাই। দেশবন্ধু পার্কের পুকুরটির পশ্চিম ধারে যে উঁচু মাটির ঢিবি তাহারই আড়ালে নরম ঘাসের উপরে ছিল শুইয়া।

এদিকে সে সাধারণত: বেড়াইতে আসে না, কিন্তু আজ হঠাৎ এই দিকে যে কি ভাবিয়া সে আসিল তাহা নিজেই জানে না। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে এখানে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। তখন দলে দলে লোক এই বিশাল পার্কের রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

দক্ষিণ দিকের মাঠটায় দলে দলে যুবক, ছেলেমেয়ে ব্যায়াম করিতেছিল। পুকুরটির ঠিক ধারে ধারে পাঁচ-ছয় জন মিলিয়া এক-একটি করিয়া যুবকের দল বসিয়া কত হাসাহাসি ঠাট্টা-তামাশা করিতেছিল। রাত্রির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে পার্ক জনহীন হইয়া উঠিতে লাগিল—পুকুরের ওধারে কি যেন একটা ফুলের গাছ তাহারই তলায় বসিয়া একজন অনেকক্ষণ ধরিয়া বাঁশী বাজাইতেছিল—অবনী অনেকক্ষণ তাহার বাঁশীর সুরে মজিয়াছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে বাঁশীও নীরব হইয়া গেল। অবনী নরম লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে শুইয়া পড়িয়াছিল। সারা পার্কটায় বুঝি একটা মানুষও নাই—পার্কের ধারের বাড়ীগুলির আলোও একে একে নিবিয়া গেল শুধু দক্ষিণ দিকের আয়ুর্ব্বেদ হাসপাতালটির ঘরে ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে। মাঝে মাঝে নার্স কিংবা ছাত্র বোধ হয় এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করিতেছিল। অবনী একমনে সেই দিকে তাকাইয়া কত কি যেন ভাবিয়া যাইতেছিল। পার্কের ভিতরে তাহারই পাশের রাস্তা দিয়া দুই জন পাহারা পুলিস হাঁটিয়া গেল—তাহাদের জুতার মশমশ শব্দ অবনীর কানে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভাসিয়া আসিতেছিল। সে মাটির ঢিবির অন্তরালে ছিল বলিয়া কেহ তাহাকে দেখিল না। পার্কের মালী আসিয়া সম্মুখের গেটটি বন্ধ করিয়া গেল। অবনীর লম্বমান দেহের উপর দিয়া একটা সাপ যেন সর সর করিয়া জলের দিকে চলিয়া গেল—সে সহসা লাফাইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া আবার তেমনি করিয়া সেখানেই শুইয়া পড়িল—সাপটি তাড়া পাইয়া বোধ হয় জলের মধ্যে গিয়া ডুব দিল। কিছুক্ষণ পরে একটি ব্যাঙ লাফাইয়া একেবারে তাহার গায়ের উপরে উঠিয়া কট্‌কট্ করিয়া কয়েক বার ডাকিয়া আবার লাফাইয়া নামিয়া গেল—অবনী বাধাও দিল না—ভ্রূক্ষেপও করিল না। কি যেন সে ভাবিতেছিল আর এক এক বার বিড়্‌বিড়্ করিয়া কি বলিতেছিল।

এমনি কিছুক্ষণ কাটিবার পর পকেট হইতে একটি মোড়ক বাহির করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু ভাবনা তাহার কমিল না—আবার গালে হাত দিয়া সেখানেই বসিয়া পড়িল। কয়েক মিনিট এমনি কাটিবার পর পুনরায় বিড়্‌বিড়্ করিয়া আপন মনে কি যেন কহিল। তাহার পর উঠিয়া মোড়কটি খুঁজিয়া আনিল।

ধীরে ধীরে সে মোড়কটি খুলিয়া এক বার পিছনের দিকে তাকাইয়া দেখিল—তার পর ঊর্দ্ধে কতক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—কয়েক ফোঁটা অশ্রু পড়িল চোখের কোণ বাহিয়া। এক বার অস্ফুট স্বরে মুখ দিয়া বাহির হইল—ভগবান্!

মুহূর্ত্তমধ্যে মোড়কের মধ্যের পদার্থটুকু মুখের মধ্যে দিল ফেলিয়া, সঙ্গে সঙ্গেই একটি চীৎকার—উঃ মাগো! মোড়কের পদার্থটুকু হায়ড্রোসায়েনিক এসিড—সে আজ তার কোন বন্ধুর নিকট হইতে কৌশলে বিষটুকু সংগ্রহ করিয়াছিল। তার পর মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার—এই সময়টুকুতেই সব শেষ হইয়া গেল। অবনী লম্বা লম্বা ঘাসের নরম বিছানায় দেহ দিল এলাইয়া—চক্ষু দুইটি বন্ধ করিল চিরদিনের মত। মুখের দুই কস্ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল কয়েক বিন্দু লাল রক্তের মত পদার্থ।

অনুকূল বাতাসে যে তরী ভাসিয়া যাইতে পারিত সাগরের পরপারে, ঘূর্ণীহাওয়ায় তাহাই গেল অতল জলে তলাইয়া; পিছনে পড়িয়া রহিল—মা, বোন, লতিকা আর বন্ধুর দল।

২২

কাল সারা রাত্রি নিরাপদ ও মালতী অবনীর প্রতীক্ষা করিয়া কাটাইয়াছে। রাত্রে মালতী রান্না শেষ করিয়া খাবার ঢাকা দিয়া মণিয়ার মার ঘরে গিয়া বসিয়াছিল। নিরাপদ ছিল নিজের ঘরের বিছানায় শুইয়া, কিন্তু কাহাকেও আর সারা রাত্রির মধ্যে উঠিতে হয় নাই, তাই আহারও হয় নাই। অন্নব্যঞ্জন যেমনই ঢাকা দেওয়া তেমনই ছিল। অবনী কিংবা পরেশ কেহ বাহিরে থাকিলে কখনও কাহাকেও রাখিয়া নিরাপদ আহারে বসিত না। কাজেই অবনীর প্রতীক্ষায় সারা রাত কাটিয়া গেল—অবনী আসিল না। পরের দিন সকালে উঠিয়া নিরাপদর শরীর ও মন দুই-ই হইয়া গেল অত্যন্ত বিষণ্ণ! অবনী সারা রাত্রি ধরিয়া কোথায় রহিল—অথচ কিছুই বলিয়া গেল না। সে ভাবিল সকালেই কিছু আহার করিয়া যাইবে অবনীর খোঁজে। মালতী ভিতরে স্টোভ জ্বালিয়া কিছু খাবার করিয়া দিতেছিল—নিরাপদ গিয়াছিল স্নান করিতে।

এক বিপদ অন্য বিপদকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে। নিরাপদ স্নান সারিয়া ঘরে ঢুকিতেছিল, এমন সময় পিছনে জুতার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখে একজন পুলিসের লোক। নিরাপদ জিজ্ঞাসু নেত্রে তাহার দিকে তাকাইল। লোকটি আগাইয়া আসিয়া পরিচয় দিলেন তিনি মাণিকতলা থানার সাব-ইন্সপেক্টর—নিরাপদ চ্যাটার্জ্জি নামে কোন লোককে খুঁজছেন। নিরাপদ বলিল আমারই নাম নিরাপদ চট্টোপাধ্যায়।

—আপনিই—অবনী নামে কাউকে চেনেন?

—হাঁ চিনি।

—কে হয় আপনার।

—আমার বন্ধু। কিন্তু কেন বলুন ত—নিরাপদ ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিল।

—আপনি কাপড় ছেড়ে স্থির হন, বলছি।

নিরাপদ তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। এদিকে পুলিসের লোক দেখিয়া মালতী উঠিয়াছিল রীতিমত ভীত হইয়া—না জানি আবার কি দুর্ঘটনা ঘটে। স্টোভের উপরের প্যানটি নামাইয়া সে আসিয়া দাঁড়াইল দরজার অন্তরালে।

নিরাপদ বাহিরে আসিয়া বলিল—অবনীকে কেন, কি হয়েছে বলুন!

—আপনার খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধুই ছিলেন বোধ হয় তিনি, কিন্তু মশায় আমি বড় একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি!

নিরাপদ উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করিল—কি দুঃসংবাদ?

—কাল রাত্রে অবনীবাবু দেশবন্ধু পার্কে আত্মহত্যা করেছেন।

—আত্মহত্যা করেছে? অবনী?

—হাঁ! আপনার নামে একখানি চিঠি লিখে রেখে-ছিলেন এই ঠিকানায়—চিঠিখানা তাঁর জামার পকেটে পাওয়া গিয়েছে। আপনাকে একবার যেতে হবে পুলিস মর্গে লাস সনাক্ত করতে—চিঠিখানিও সেখানেই দেখতে পাবেন। কিন্তু এত কথার একটিও বুঝি নিরাপদর কর্ণে প্রবেশ করিল না। সে দেওয়ালের উপরে হেলান দিয়া কয়েক মিনিট চোখ বুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিল—ব্যাপারটি সে ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিতেছিল না।

তৈরি আহার্য্য রহিল পড়িয়া—মালতীর সহিত একটি কথা বলিবার অবসরও তাহার আর হইল না—ধীরে ধীরে উন্মাদের মত টলিতে টলিতে নিরাপদ সাব্-ইন্সপেক্টরটির সহিত গেল মর্গের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া।

অবনীর বিশাল দেহ টেবিলের উপর ছিল পড়িয়া। এই কয় ঘণ্টায় দেহের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই—কে বলিবে অবনী ঘুমায় নাই—মরিয়াছে? নিরাপদ অবনীর দেহের দিকে তাকাইয়া দুই চক্ষের জল ছাড়িয়া দিল। এই দেহের অন্তরালে যে-প্রাণ যাহা প্রতি দিন তাহাদিগকে হাসাইয়া মাতাইয়া রাখিত—একটুতেই যে উঠিত উত্তেজিত হইয়া, একটুতেই যে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিত—সে আজ কোথায় গেল। নিরাপদ, পরেশ ইহাদের কথা সে একবারও ভাবিল না—ভাবিল না আপনার মা-বোনের কথা—ভাবিল না অনাদিবাবুর কন্যা লতিকার কথা!

নিরাপদর নামে যে-পত্রখানি সে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল সেখানি নিরাপদ পাইল। মাত্র দুটি ছত্র—"ভাই নিরাপদ, আমি চলিলাম। তোমরা দুঃখ পাইবে জানি, কিন্তু জীবনের ভার আর বহিতে পারিলাম না বলিয়াই চলিলাম। মায়ের চিঠি তুমি দেখিয়াছ—২০০৲ টাকা না হইলে বোনের বিবাহ হইবে না, যদি সম্ভব হয় দুই শত টাকা তাহাদিগকে দিও। সে হতভাগিনীদের আর কেহ রহিল না। বিদায়—তোমাদের অবনী।"

যথারীতি মৃতদেহ সনাক্ত করিয়া নিরাপদ বাহিরে

আসিল। তাহার পর হইল ডাক্তারী পরীক্ষা। নিকটে নিরাপদর একটি পরিচিত ছাত্রাবাস ছিল—কলেজের কতকগুলি ছেলে থাকিত সেখানে। তাহারা এই দুঃসময়ে তাহার সাহায্য করিল—মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া গেল গঙ্গার ঘাটে, তাহারাই দিল ঘাটের কড়ি।

ঘণ্টাখানেক হইল সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এমন সময় স্খলিত-পদে ভিজা কাপড়ে নিরাপদ বাসায় আসিয়া পৌছিল।

ঘরের ভিতরে একটি ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছিল। তাহারই আধা-আলো আধা-অন্ধকারে মণিয়ার মা আর মালতী চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া ছিল। নিরাপদর সাড়া পাইয়া দুই জনেই উঠিয়া বাহিরে আসিল, আলোটি দিল উস্কাইয়া। মালতী তাড়াতাড়ি শুষ্ক কাপড় জামা আনিয়া দিল নিরাপদকে। নিরাপদর এমন মূর্ত্তি মালতী কোন দিন দেখে নাই—দুই চক্ষু জবাফুলের মত রক্তবর্ণ, সারা মুখখানা অসম্ভব রকমের গম্ভীর। এ মূর্ত্তি দেখিয়া মালতী ভয় পাইল। কাল দ্বিপ্রহর হইতে এ পর্য্যন্ত নিরাপদর পেটে এক কণা আহার্য্যও পড়ে নাই, কিন্তু তবু মালতী আহারের জন্য অনুরোধ তাহাকে করিতে কোন মতেই সাহস পাইল না। কাপড় ছাড়িয়া নিরাপদ নিজের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। কেহ আর একটা কথাও কহিল না। মালতী, মণিয়ার মা ধীরে ধীরে ঘর হইতে গেল বাহির হইয়া। এই ঘর—ঐ বিছানা—এই আসবাবপত্র ইহার যেদিকেই দৃষ্টি পড়ে সব দিকেই অবনীর ছাপ সুস্পষ্ট!

দূরে ভাঙা টেবিলটার উপরে অবনীর সুটকেসটি পড়িয়াছিল, তাহার নীচে অর্দ্ধেক-চাপা-দেওয়া একখানি কাগজ—বাতাসে সেখানি মাঝে মাঝে ফর্ ফর্ করিয়া শব্দ করিয়া উঠিতেছিল। নিরাপদ উঠিতেছিল বারে বারে চম্‌কাইয়া—ঐ বুঝি অবনীর কণ্ঠস্বর—ঐ বুঝি অবনী আসিয়া ঘরে ঢুকিল। পর-পর দুইখানি চৌকিতে বিছানা ঠিক আগের মতই পাতা রহিয়াছে, কিন্তু নাই পরেশ—নাই অবনী!

আজ এই সন্ধ্যায় নিরাপদ পেচকের মত অন্ধকারে মুখ লুকাইয়া আছে—একটি কথা বলিবার কেহ নাই—আপনার বলিতেও কেহ নাই। কিন্তু এমনি প্রতি সন্ধ্যা-বেলা অবনী, পরেশ আর সে এই ক্ষুদ্র ঘরখানি মাতাইয়া তুলিয়াছে। উৎসাহের প্রাবল্যে, ভাবপ্রবণতায় অবনী ছিল একাই এক-শ। তর্ক করিয়া হাসিয়া রাগিয়া সারা বস্তিটি করিয়া তুলিত সরগরম। পরেশ ছিল অন্য ভাবের—তাহাকে টিটকারী দিয়া ঠাট্টা করিয়া রগড় দেখিত। পরক্ষণেই তাহাদের নালিশ সুরু হইত নিরাপদর কাছে। তাহার মধ্যস্থতায় আবার তিন বন্ধুর প্রীতি আসিত ফিরিয়া—অবনীর উত্তেজনা স্বভাবে ফিরিয়া আসিত। কিন্তু কাল যে ছিল এমনি সুস্থ সবল প্রাণ লইয়া বর্ত্তমান—তাহাকে আজ এমন করিয়া হারাইতে হইল? ইহা অসম্ভব—অবনী হয়ত এখানেই কোথায়ও আছে, খুঁজিলে হয়ত এখনই পাওয়া যাইবে। উত্তেজনায় নিরাপদ উঠিল বিছানার উপরে বসিয়া। কিন্তু হায়—এই ত ক্ষণপূর্ব্বে অবনীর সেই দেহ জলন্ত আগুনে তিল তিল করিয়া পোড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়া আসিয়াছে—এতটুকুও তাহার আর অবশিষ্ট নাই। বেদনার ভারে সারাদেহ উঠিল ভারাক্রান্ত হইয়া, নিরাপদ আবার তেমনি করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

এমনি করিয়া কখন যেন তাহার তন্দ্রার মত ভাব আসিয়াছিল, জাগিয়া দেখে মালতী তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতেছে।

নিরাপদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল—তুমি দিদি এত রাত্রে এখানে বসে আছ?

—না বড়দা, রাত খুব বেশী হয় নাই, বোধ হয় ১২টা হবে।

—তা হোক, তুমি শুতে যাও বোন!

—কিন্তু আপনাকে যে কিছু মুখে দিতে হবে বড়দা, তা না হ'লে আমি যাব না।

—মুখে ত দিতেই হবে বোন—নইলে ত বাঁচবো না, কিন্তু আজ এত রাত্রে আর কোন হাঙ্গামে কাজ নাই—কাল যা-হয় হবে।

মালতী সাহস পাইয়া বলিল—কোন হাঙ্গাম নয় বড়দা—একটু দুধ গরম ক'রে এনেছি সেইটুকু শুধু চুমুক দিয়ে খেতে হবে।

নিরাপদ বলিল—বেশ দাও।

সকাল বেলা উঠিয়া নিরাপদ ভাবিতে লাগিল কেমন করিয়া দুই শত টাকা যোগাড় করা যায়। ইহাই এখন তাহার প্রথম কর্ত্তব্য—অবনীর শেষ অনুরোধ! এই কলিকাতা শহরে যেন তাহার শ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছিল—আর এক মুহূর্ত্তও তাহার এখানে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। আজ তাহার মন হইয়াছে অত্যন্ত উদার—কোন পক্ষের দোষ-ত্রুটি হিসাব না করিয়া তাহার মন চাহিতেছিল তাহার কাকার নিকটে ছুটিয়া যাইতে। যত দোষ সব নিজের ঘাড়ে চাপাইয়া

লইয়া তাঁহার পা ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে। কিন্তু বাড়ী গিয়া যে টাকা লইয়া অবনীর বাড়ী যাইবে সে সময়ও আর নাই। কাল অবনীর ভগ্নীর বিবাহের দিন। আজ বিকালের দিকে যে ট্রেন সেইটিতেই রওনা হইতে হইবে। নিরাপদ ভাবিতেছিল—এখানকার কোন বন্ধুবান্ধবকে ধরিয়া টাকাটা যোগাড় করা যায় কি না! এমন সময় হঠাৎ তাহাদের গলির ভিতরে ঘোড়ার গাড়ীর শব্দে চাহিয়া দেখিয়া নিরাপদ একেবারে অবাক হইয়া গেল। গাড়ী হইতে আগে নামিলেন তাহাদের বাড়ীর বহু পুরাতন কর্ম্মচারী বিশ্বম্ভর ও পরে তাহার কাকীমা। অন্য দিন হইলে নিরাপদর সমস্ত হৃদয় আনন্দে উঠিত নৃত্য করিয়া, কিন্তু আজ আর তাহার কোন উচ্ছ্বাস চোখে মুখে খেলিল না।

বিশ্বম্ভর আগে আগে পথ দেখাইয়া আসিলেন, পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকিলেন তাহার কাকীমা। কিন্তু নিরাপদ না পারিল তাহার আসন হইতে উঠিতে—না পারিল কহিতে একটি কথা! এ সে কি দেখিতেছে—তাহার ছোট-মার পরিধানে সাদা থানের কাপড়—সিঁথিতে নাই সিন্দুরের রেখা—হাত দুখানি শূন্য।

নিরাপদ সকলই বুঝিল, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ঘাড় গুঁজিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাকীমা তাহার নিকটে আসিয়া সস্নেহে হাত দুখানি সরাইয়া লইয়া ডাকিলেন—নীরো—আমি এসেছি রে।

—কিন্তু এ বেশ নিয়ে তুমি কেন এলে ছোটমা! আমি পাপিষ্ঠ—আমার মুখ আর তোমরা দেখো না।

—ছিঃ বাবা, ও কথা কি বলতে আছে—তিনি মরার সময় তোকে একবার শেষ দেখা দেখতে চেয়েছিলেন, সেই আশাই শুধু তাঁর পূর্ণ হ'ল না। আমার উপরে আদেশ দিয়ে গেছেন তোকে ফিরিয়ে আনতে—তাঁর হ'য়ে তোর কাছে ক্ষমা চাইতে।

নিরাপদ তাহার ছোটমার পায়ের উপর উবু হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল—বলিল অমন কথা তুমি আমায় ব'লো না ছোটমা—যে অপরাধ করেছি তারই বুঝি প্রায়শ্চিত্ত নাই।

—সে কথা ভুলে যা বাবা—ভুল হয়ত তাঁরও হয়েছিল, তোরও হয়েছিল—শেষ পর্য্যন্ত তোমরা দুজনেই নিজেদের ভুল দেখতে পেয়েছ এইটাই আনন্দের কথা। আজ তিনি নাই—তাঁর আদেশ মাথা পেতে নে—বাড়ী ফিরে চল।—বলিয়া তিনি নিরাপদকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। নিরাপদ বলিল—তাই চল ছোটমা। ইতিমধ্যে মালতী আসিয়া কখন ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়া সকলই দেখিতেছিল—নিরাপদর কাকীমা এতক্ষণ তাহাকে লক্ষ্য করেন নাই, এখন তাহার উপরে দৃষ্টি পড়িতেই কহিলেন—এ মেয়েটি কে নীরু! নিরাপদ মাথা তুলিয়া বলিল—ওটি আমার ছোট বোন মা, এর বেশী পরিচয় আজ আর তোমাকে দিতে পারলাম না—পরে সব জানাব।

পরে মালতীর দিকে ফিরিয়া বলিল—মালতী, ইনি আমার—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কাকীমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—কি বলবো? কাকীমা—না মা?

—তোর যা খুশী বল নীরু!

ততক্ষণ মালতী আসিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাকীমা তাহাকে নিজের কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—তোমার নাম কি মা?

—মালতী!

নিরাপদ বলিল—তোমাকে আজ হতে আর একজনের মা হতে হবে মা। মালতীর বোঝাও চিরকাল তোমাকে বয়ে বেড়াতে হবে।

—সে কি রে—এত দিন ধরে এই বিদ্যে শিখেছিস্ তুই—সন্তান কি কখন মার কাছে বোঝা হয়? বলিয়া তিনি মালতীকে তাহার পাশে টানিয়া আনিয়া এক হাত নিরাপদর স্কন্ধে, অপর হাত মালতীর স্কন্ধে দিয়া মনে মনে স্নেহাশীষ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

নিরাপদ বলিল—কিন্তু মা আজই আমাকে দু-শ টাকা দিতে হবে—তা না হ'লে কিন্তু যেতে পারবো না।

—কেন রে হঠাৎ দু-শ টাকা দিয়ে কি করবি শুনি?

—সে কথা পরে বলব মা, কিন্তু অত টাকা সঙ্গে আছে ত?

বিশ্বম্ভর হাসিয়া বলিল—মার অন্নপূর্ণার তবিল—মোটে দু-শ কেন দাদাবাবু—চাও ত আরও দিতে পারি।

* * *

মেল ট্রেনখানা ছুটিয়া চলিয়াছে ঝড়ের মত। নিরাপদ একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বসিয়া শূন্যমনে বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে। মাঝের স্টেশনে কাকীমারা নামিয়া গিয়াছেন। সে যাইতেছে অবনীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে। সেখানে হয়ত বিবাহের কত আনন্দ-উৎসব চলিতেছে—আর তাহারই ফাঁকে ফাঁকে দুইটি নারী অবনীর আশায় পথপানে বারে বারে চাহিতেছে। কিন্তু

আজ নিরাপদ সেখানে কি সংবাদ তাহাদিগকে শুনাইবে? তাহার মন আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না—সে ফিরিয়া যাইতে পারিলে বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু তবু যাইতে হইবে—সত্য গোপন করিতে হইবে এবং বিবাহের খরচ ২০০ টাকা হাতে তুলিয়া দিতে হইবে। ইহাই যে অবনীর শেষ অনুরোধ। নিরাপদ বুক-পকেটে হাত দিয়া দেখিল সেখানে ২০০ টাকার নোট ঠিক বাঁধা আছে। সমাপ্ত

যুদ্ধের দক্ষিণা

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

যুদ্ধকালীন অর্থনীতির মারপ্যাঁচ না জানিলেও, আমরা দেখিয়া, শুনিয়া ও ঠেকিয়া ইহা বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারি যে, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অসংখ্য মানুষ ও জিনিসের মূল্য দিবার অর্থ গবর্ণমেণ্ট সংগ্রহ করেন প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে; যথা, কর-নির্ধারণ, ঋণ-গ্রহণ ও নূতন অর্থ সৃষ্টি (inflation)। ইহাদের সঙ্গে একটি ফেউ বা ফাও আছে, তাহার নাম চাঁদা অর্থাৎ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দান। বর্তমান সময়ে যুদ্ধের দরুণ ইংলণ্ড ২৫ কোটি টাকা ও ভারতবর্ষ প্রায় ২ কোটি টাকা দৈনিক ব্যয় করিতেছে, এইরূপ আমরা সাময়িক পত্রিকাদি মারফৎ প্রাপ্ত সংবাদ হইতে অনুমান করিতে পারি। ইহাও অনুমান করিতে পারি যে, উভয় দেশই এই বাবদ নিজ নিজ দেশের বার্ষিক আয়ের (national income or dividendএর) প্রায় অর্ধেক টাকা প্রতি বৎসর ব্যয় করিতেছে। বার্ষিক আয় বলিতে সেই দেশের বার্ষিক মোট উৎপাদনের মূল্য (value of total physical output) বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য, গ্রেট ব্রিটেনের বার্ষিক আয়ের সহিত ভারতের বার্ষিক আয়ের কোনো তুলনাই হইতে পারে না। গ্রেট ব্রিটেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পরেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনশালী দেশ। আর ভারতবর্ষের অবস্থা ঠিক বিপরীত; প্রসারে ও গভীরতায় এই দেশের লোকের দারিদ্র্যের তুলনা অন্যত্র মেলা ভার।

আমরা যে কথা বলিতেছিলাম; জাতীয় আয়ের অর্ধেক টাকা যুদ্ধের দরুণ ব্যয় করার অর্থ এই যে, আমরা জাতীয় উৎপাদনের অর্ধেকই যুদ্ধের জন্য দান করিতেছি। অর্থাৎ যাহারা পণ্যোৎপাদন বা দেশের সম্পদ সৃষ্টি করে, তাহাদের অর্ধেক নরনারীই আজ যুদ্ধের কর্মে নিয়োজিত, এবং সেই জন্যই সাধারণের ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বেলায় আজ এতটা টানাটানি। কারণ ইহার অর্ধেকই আজ লোপ পাইয়া যুদ্ধের জন্য স্থানান্তরিত বা রূপান্তরিত হইতেছে। তাহা হইলে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, যুদ্ধের ব্যয় যতই বাড়িতে থাকিবে সাধারণের ব্যবহার্য মোট জিনিসের অভাবও ততই বৃদ্ধি পাইবে এবং মূল্যও ততই চড়িতে থাকিবে। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, মূল্য চড়িবে কেন? তার উত্তর এই যে, যুদ্ধের জন্য যত মানুষ ও জিনিসের প্রয়োজন তাহা আমরা স্বেচ্ছায় ত্যাগ বা দান করিতে প্রস্তুত নই। যদি প্রকাশ্য নীলামে জিনিস বিক্রয়ের মত গবর্ণমেণ্ট ও সর্বসাধারণের মধ্যে দেশের মোট পণ্য-সম্পদ ও শ্রম-সম্পদ নিয়া ডাক চলিতে থাকে, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত এক পক্ষে গবর্ণমেণ্ট ও অপর পক্ষে শক্তিশালী ও ধনীদের মধ্যে পাল্লা চলিবে এবং গরিবকে বহু পূর্বেই নিরাশ হইয়া ডাক ক্ষান্ত করিতে হইবে। শেষাশেষে, গবর্ণমেণ্টের নোট ও ক্রেডিটের নিকট ধনীদিগকেও আংশিক পরাজয় স্বীকার করিয়া ভোগের দাবী কিঞ্চিৎ হ্রাস না করিলে চলিবে না। কিন্তু এই শোকে সান্ত্বনা পাইবেন তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সৃষ্ট ও ব্যয়িত নূতন টাকার একটা মোটা অংশ লাভ করিয়া। ভোগের শোক টাকার স্বপ্নে তাঁহারা হয়ত একেবারেই ভুলিবেন; কিন্তু যাহারা অতিরিক্ত অর্থও পাইতেছে না, অথচ শুধু অন্ন-বস্ত্রের জন্য তিন-চার গুণ মূল্য দিতেছে তাহাদের সান্ত্বনা কোথায়? তাঁহারা যদি দেশ-প্রেমিক হন, তবে তাঁহাদের একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, যুদ্ধের যজ্ঞে দরিদ্র হইলেও তাঁহাদের ত্যাগই সর্বাধিক। আসল কথা হইতেছে, যুদ্ধ যখন পুরাদমে চলিতে সুরু করে, তখন দেশে বেকার নর-নারী কিংবা অকেজো জিনিস কিছুই পড়িয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু সমস্ত গ্রাস করিয়াও যখন গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধকালীন দারুণ ক্ষুধা মিটিতে চাহে না, তখন সর্বসাধারণের ভোগ-সামগ্রীর উপর ভাগ

বসাইতে হয় এবং তার জন্য মূল্য চড়াইয়া দিয়া একটা বিরাট মানব-সমাজকে বঞ্চিত না করিয়া উপায় থাকে না। সেই জন্যই এই সব বৃহৎ যুদ্ধের সময় ভোগ প্রবৃত্তি ও ব্যয়-প্রবণতাকে দমন করিতে হয়; অন্যথা অর্থ-স্ফীতি (inflation) ঘটাইয়া পণ্য-মূল্য চড়া করিয়া দিয়া এই উদ্দেশ্য সফল করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের পর ইনফ্লেশনের মারাত্মক কুফল দেশে দেশে এমন পরিস্ফুট হইয়া উঠে যে বর্তমান যুদ্ধে কার্যত দায়ে পড়িয়া যে যাহাই করুন না কেন, মুখে কিন্তু ইহার নাম উচ্চারণ করিতেও সাহস পাইতেছেন না।

ইনফ্লেশনের দুর্গুণ সম্বন্ধে এখানে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, ইহা ধনীদের স্বার্থ-হানি অপেক্ষা গরিবদের ক্ষতি অধিক পরিমাণে করিয়া থাকে; অধিকন্তু উচ্চ মূল্য দ্বারা ইহা ধনীদের ধনোপায়ের সুযোগ ও সুবিধা বর্ধন করে, এবং গরিবদের স্বল্প আয় হইতে একটা অংশ অপহরণ করে। কি প্রকারে তাহার আভাস পূর্বেই খানিকটা দিয়াছি। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। পণ্য মূল্য যদি মাত্র দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াও ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলের ভোগ-সামগ্রী অর্ধেক হ্রাস পাইয়াছে অনুমান করিলেও দুই কারণে দরিদ্রের প্রতি অন্যায় অবিচার হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, মূল্য দিবার ক্ষমতা সম্পর্কে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে প্রভেদ রহিয়াছে তাহার প্রতি ইহা দৃষ্টিপাত করে না। দ্বিতীয়তঃ, ধনীদের ভোগ-সামগ্রীর বিরাট্ বহর হইতে ত্যাগের যে পরিমাণ সুযোগ আছে, দরিদ্রের তাহা নাই। সুতরাং উভয়ের উপর সমান স্বার্থত্যাগের দাবী করিতে হইলে দরিদ্রের তুলনায় ধনীর অনেক বেশী ভোগ-সামগ্রী পরিহার করা কর্তব্য। ইহাকেই অর্থশাস্ত্রে ক্রমবর্ধমান নীতি (Progressive principle) বলা হয়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য অবস্থায় এই নীতির গুরুতর ব্যতিক্রম ঘটিতে থাকে। অধুনা সর্ববাদিসম্মত ক্রমবর্ধমান নীতি দ্বারা বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, প্রত্যেক ইংরেজ তাহার গড়পড়তা ২০০০ টাকা (আনুমানিক) বার্ষিক আয় হইতে যুদ্ধের জন্য যদি অর্ধেক ব্যয় করে, তাহা হইলে ভারতবাসীকে তাহার বার্ষিক আয়ের অর্ধেকের বহু কম ব্যয় করিতে হয়। কারণ অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে তাহার বার্ষিক গড়পড়তা আয় ১০০ টাকার অধিক নহে; অর্থাৎ ইংরেজের $\frac{১}{২০}$ অংশ মাত্র। একই দেশের বিভিন্ন অবস্থার লোকের মধ্যেও ত্যাগের এই ক্রমবর্ধমান নীতি অনুসৃত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনফ্লেশন প্রায় তেলা মাথায় তৈল দান করিয়া ইহার ঠিক বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই ইনফ্লেশনের একটি মস্ত গুণ আছে। আর্থিক জগতে মরীচিকার মায়াজাল বুনিয়া ছলনা দ্বারা যদি লোককে ঐশ্বর্য-বিভ্রান্ত করিতে হয়, তাহা হইলে ইহার মত এমন ম্যাজিক দেখাইবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। যুদ্ধের আকস্মিক কর্ম-প্রবণতার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিহেতু ব্যাঙ্ক-ক্রেডিট অনেকটা আপনি বাড়িয়া চলিতে থাকে। তার উপর নূতন নোট ছাপিবার মুদ্রাযন্ত্র আসিয়া যোগদান করে। ফলে বাজারে টাকার অত্যধিক ছড়াছড়ি হইয়া এক দিকে মুদ্রামূল্য কমিতে ও পণ্য-মূল্য চড়িতে থাকে; অন্য দিকে অনেকের শূন্য পকেট (অত্যধিক লাভ বা প্রফিটিয়ারিঙের দরুণ) এই সময়ে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং পূর্ণ পকেট ছিঁড়িয়া পড়িবার মত হয় এবং চারিদিকে একটা কর্ম-ব্যস্ততা ও প্রাচুর্যের হাওয়া বহিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই মিথ্যা ঐশ্বর্যের বহিঃচাক্‌চিক্যের মধ্যেও একদল মানুষ যে ঠাকুর পূজার উচ্চ-দক্ষিণা দিয়াও ভোগের প্রসাদ পায় নাই এবং নিরুপায় হতাশার মধ্যে দিন কাটাইতেছে ইহার জন্য ভাবিবার বড় একটা অবকাশ যুদ্ধের দুর্দিনে কাহারও হয় না। সুতরাং বৃহৎ ব্যাপারের দীয়তাং ভুজ্যতাং ডাক-হাঁকের নীচে ইহাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপা পড়িয়া যায় এবং মোটের উপর বাহিরে বেশ একটা উল্লাসের সুর পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যাহারা এই মহাযজ্ঞে উৎসর্গের জন্য চিহ্নিত, তাহারাও ফুল, বেলপাতা ও চন্দনে পূজা লাভ করিয়া বলির কথা প্রায় ভুলিয়া যায় এবং অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হইবার সাহস লাভ করে। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ অর্থনীতিবিদ মিঃ কেইন্‌স্ সত্যই বলিয়াছেন:—"It (inflation) greatly benefits some important interests. It oils the wheels everywhere, and a regime of rising wages and profits spreads an illusion of prosperity." (অর্থাৎ ইহা কতকগুলি বৃহৎ কায়েমী স্বার্থের বিশেষ উপকার সাধন করে, সকল চরকাতেই খানিকটা তৈল দান করে, এবং ঊর্ধ্বগামী মজুরি ও লাভের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া চারিদিকে সম্পদের একটা কুহেলিকা বিস্তার করে।) এইখানেই ইহার গুণের শেষ নহে। ইহার সব চেয়ে বড় গুণ হইতেছে, ইহার জন্য কাহাকেও ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না, স্পষ্টত কাহাকে দায়ী করাও চলে না। ইহা অনেকটা নির্দায়িত্বে ও নিশ্চেষ্টায় স্বকাজ সাধন করে, এবং এই

জন্যই এই অর্থ-সম্প্রসারণ নীতির প্রতি রাষ্ট্রপতিগণের একটা সহজাত আনুকূল্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গত যুদ্ধে ইহার শেষ ফল চিন্তা করিয়া অর্থ-শাস্ত্রের এই লোভনীয় গোপন কলা-কৌশলটির অপপ্রয়োগ পরিহার করিয়া চলিবার চেষ্টা এবার প্রথম দিকে সকলেই করিতে-ছিলেন বলিয়া মনে হয়। এক দিকে সাপে কাটিবার, অপর দিকে বাঘে খাইবার আশঙ্কা ঘটিলে একেবারে সম্মুখে যে মৃত্যু-দূত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলাই যেমন স্বাভাবিক, তেমনি এক্ষেত্রেও যুদ্ধের সম্মুখ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আগ্রহে ভবিষ্যৎকে ইহারা কতটা বাঁচাইয়া চলিতে পারিতেছেন তাহা জানেন যবনিকার অন্তরালে যাঁহারা কাজ করিতেছেন তাঁহারা—আর জানেন ভগবান। আমরা বাহিরের ফলাফল দেখিয়া খানিকটা আঁচ করিতে পারি মাত্র। সম্প্রতি আমাদের দেশে পণ্য-মূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা সত্যই আশঙ্কা-জনক। ইংলণ্ডেও তদনুপাতে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে কিনা তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। গত যুদ্ধের পর জার্মানীর আর্থিক অবস্থা আজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গল্পের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবাধ নোট প্রচলন বা অর্থ-স্ফীতির ইহা চিরদিন "ক্লাসিক্যাল" দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে। এই দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের গবর্ণমেণ্টের সময় থাকিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। যুদ্ধের পর জার্মানীর মুদ্রা প্রথমে শুধু কাগজের বস্তায়, পরে ব্যাঙ্কের খাতার অঙ্কে পর্যবসিত হইয়া এমনি মূল্যহীন হইয়া গিয়াছিল যে এক পেয়ালা চা পান করিতে হইলে সেখানে এক মিলিয়ন (দশ লক্ষ) মার্ক দিতে হইত! যুদ্ধের পূর্বে বা প্রারম্ভে যাঁহারা ব্যাঙ্কে লক্ষ মার্ক জমা রাখিয়া ঐশ্বর্যের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, যুদ্ধের পরে দেখা গেল তাহার মূল্য একটি কাণাকড়ি মাত্র। ইহার ফলেই সেখানে "ন্যাশন্যাল সোশ্যলিজ্‌ম্" ও নাৎসীবাদের উদ্ভব। যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় ফ্রান্সের অবস্থা এত দূর গড়ায় নাই সত্য, কিন্তু মুদ্রামূল্য সেখানেও $\frac{4}{5}$ অংশ হ্রাস পাইয়াছিল। ইহার ফলে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়া আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দলাদলি সুরু হয়, যাহার জন্য আজ তাহাকে অভাবনীয় অপমান ও পরাজয়ের কলঙ্ককালিমা মাথায় তুলিয়া লইতে হইয়াছে। যুদ্ধের সময় সর্ব-সাধারণ কর্তৃক পণ্যের চাহিদা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া সর্বপ্রথম প্রয়োজন; এবং এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই ইন্‌ফ্লেশনের সহজ পন্থা অবলম্বন করিয়া, নোট ছাপাইয়া ও ক্রেডিট বাড়াইয়া, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু এই পথের শেষ কোথায় তাহা আমরা দেখিয়াছি। সুতরাং এই 'আপাত মধুর পরিণামে বিষ' ফলের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে আমাদিগকে শেষ পর্যন্ত যথাসম্ভব inflation-এর পথ এড়াইয়া চলিতে হইবে।

কিন্তু তাহার পূর্বে মানুষকে মহাত্মা ভাবিয়া একটি কাল্পনিক আদর্শ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যাক্‌। আমরা গোড়াতেই দেখিয়াছি, যুদ্ধের জন্য বাহ্যত গবর্ণমেণ্টকে আমরা অর্থ দান করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তন্মূল্যের ভোগ-সামগ্রীই দিয়া থাকি। আমরা ইহাও উল্লেখ করিয়াছি যে আমাদের মোট আয়ের অর্ধেক টাকা যুদ্ধের জন্য ব্যয় করার অর্থ হইতেছে আমাদের ভোগ-সামগ্রীর অর্ধেক ব্যয় করা। এই যদি অবস্থা হয়, তাহা হইলে যুদ্ধের সময় আমরা আমাদের অভাবকে স্বেচ্ছায় যতই সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে পারিব ততই যুদ্ধকালীন সমস্যাকে সরল করিয়া আনা হইবে। বলা বাহুল্য, গরিবের পক্ষে ভোগের প্রান্ত-সীমা এমনি অতি সঙ্কীর্ণ। সুতরাং ত্যাগের দায়িত্ব তাহাদেরই তত বেশী যাহাদের ভোগের পরিমাণ যত বেশী। এই নীতি মানিয়া লইয়া দেশের সকল লোক যদি আপন ইচ্ছায় তাহাদের অবস্থানুযায়ী (অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান নীতি অনুযায়ী) ভোগ-বিলাস পরিহার করিয়া চলে এবং এই ব্যয় সঙ্কোচের দরুণ তাহাদের যে-অর্থ বাঁচিবে তাহা গবর্ণমেণ্টকে দান করে কিংবা কর-স্বরূপ দেয়, তাহা হইলে যুদ্ধের দরুণ দেশের লোকের উপর মোট দাবীর পরিমাণ হ্রাস না পাইলেও এই দাবী সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। কারণ এরূপ অবস্থায় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পাইবার কোনো কারণ ঘটিবে না এবং তদ্দরুণ যুদ্ধ-কালীন এক দল পকেট-মারেরও সৃষ্টি হইতে পারিবে না। শুধু যুদ্ধের নিমিত্ত দেশের যে অর্ধেক লোক ও জিনিষের প্রয়োজন তাহার উপর আমাদের দাবী গবর্ণমেণ্টের অনুকূলে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট যাহাতে মূল্য দিয়া সেই মানুষ ও জিনিস পাইতে পারেন তজ্জন্য আমাদের বার্ষিক খরচ হইতে এই ভাবে উদ্বৃত্ত অর্ধেক টাকাটাও উঁহাকে দিয়া দিতে হইবে। ইহার জন্য ধনীদের বহু রকমের খেয়াল ও বিলাস বর্জন এবং দরিদ্রদিগকে তাহাদের সামান্য সম্বল হইতে আরও কিছু পরিহার করিতে হইবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ত্যাগের ক্রমবর্ধমান নীতি যদি ঠিকমত প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ অবস্থানুযায়ী কাহাকে কি পরিমাণ ত্যাগ করিতে হইবে ইহা যদি ঠিকমত নির্ধারিত হয়, তাহা হইলে ধনীরা শাঁখের করাতের মত যাইতে আসিতে উভয় দিকে আর কাটিতে পারিবেন না, এবং

ঘোরতর শ্রেণী-বৈষম্যের অনাচার ও পিত্তজ্বালা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিবে না। এখানে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই ব্যবস্থাতেও নূতন অর্থ-সৃষ্টি (inflation) একেবারে বাদ দিয়া চলা সম্ভবপর হইবে না। কারণ যুদ্ধের পূর্বকার উৎপাদন অপেক্ষা যুদ্ধ সময়ের উৎপাদন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং এই অতিরিক্ত উৎপাদন সম্ভব হয় বেকার বা অবসরভোগী নরনারীর নিয়োগ ও অব্যবহৃত নৈসর্গিক সম্পদ হইতে। সুতরাং এই বর্ধিত সম্পদ বা সরঞ্জামের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়; কিন্তু তাহার সৃষ্টিতে কোনো দোষ হয় না। কারণ এই ক্ষেত্রে মোট পণ্য-সম্পদের অনুপাতে মোট অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না এবং তজ্জন্য পণ্য-মূল্যের বৃদ্ধি কিংবা মুদ্রামূল্যের হ্রাস ঘটিতে পারে না। প্রকৃত ইনফ্লেশন তাহাকেই বলা হয় যে অর্থ দেশবাসীর ভোগ সঙ্কোচের দরুণ তাহাদের সঞ্চয় হইতে প্রাপ্ত নয় কিংবা বর্ধিত পণ্যোৎপাদনের হারকে ছাড়াইয়া যায়। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, যুদ্ধের ব্যয় বহন করিবার জন্য এমন একটি পরিকল্পনা করা যায় যাহাতে পণ্যমূল্য চড়ক গাছ ও মুদ্রামূল্য ধরণীপাত হইবে না, যাহার ফলে রাতারাতি ধনী ও রাত্রিশেষে ফকির হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, যাহাতে ধনীর সুযোগ ও গরিবের দুর্যোগ আর অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারিবে না, পরন্তু ধনীকে সত্যই কষ্ট অনুভব করিবার মত ত্যাগ স্বীকার করিতে হইলেও গরিবের আসনেও নামিয়া আসিতে হইবে না।

কিন্তু এই কল্পনানুযায়ী কাজ হইবার পক্ষে দুইটি বাধা আছে—তার মধ্যে প্রথমটি হইতেছে, মানুষের ষড়রিপুর অন্যতম—লোভ। মানুষ তাহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে যত দিন শুভ বুদ্ধি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া স্বেচ্ছায়, অথবা রাষ্ট্রদ্বারা অনুশাসিত হইয়া অনিচ্ছায়, সমষ্টির মধ্যে লয় প্রাপ্ত হইতে না দিবে, তত দিন সে সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই নিজের কোলে ঝোল টানিতে চেষ্টা করিবে। কেহ মনে করিবেন না আমি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিপক্ষে কিছু বলিতেছি। আমার বলিবার বিষয় এই যে, পরোপকারই মানুষের ধর্ম এবং পরার্থে জীবন উৎসর্গ করাই মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য, ইহা যদি আমরা জীবনে পালন করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে মানব-সমাজে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রশ্ন লইয়া তর্কের বা বিরোধের কোনো অবকাশই থাকে না। যাহা হউক, এই আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক্। মানুষের ধাতুগত এই লোভ ও স্বার্থপরতাকে অনেকটা দমন করিয়া ভাগ্যবান ও দুর্ভাগাদের মধ্যে নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচার রাষ্ট্রের পক্ষে খানিকটা সম্ভবপর বটে, কিন্তু সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র, এই বিপরীত দুইটি সামাজিক আদর্শের মধ্যে কোন্ আদর্শে কোন্ রাষ্ট্র গঠিত তাহার উপর এই নিরপেক্ষ নীতির আন্তরিক ও ব্যাপক প্রয়োগ বিশেষভাবে নির্ভর করে। আমাদের জীবনমরণ সংগ্রামে রুশিয়া আজ সর্বাপেক্ষা বড় সহায় ও আশা-ভরসাস্থল হইলেও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শে ইহা হইতে আমরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমরা অ্যাংলো-আমেরিকান কর্তৃত্বাধীনে গণ-তন্ত্রের পতাকাবাহী ধন-তন্ত্রীর দলে। সুতরাং আমরা যে আদর্শ পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছি তাহাকে আপোষে কিম্বা রাষ্ট্রের শাসনে কোনো প্রকারেই পুরাপুরি কাজে লাগান সম্ভবপর নহে। তথাপি ইহার অনুকূলে জনমত যে ধীরে ধীরে আজ গড়িয়া উঠিতেছে তাহার কারণ হইতেছে এই যে, ধনতান্ত্রিকদের মধ্যেও অনেকেই আজ বুঝিতে পারিতেছেন, এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে ইহাকে যথাসম্ভব গণযুদ্ধে পরিণত করিতে হইবে। সেই জন্যই আইনের অনুশাসনে ও অর্থের লোভে লোকাভাব বা পণ্যাভাব না ঘটিলেও, উৎপাদনক্ষেত্রে কিম্বা সমরক্ষেত্রে শক্তি পরীক্ষার সময়ে দেশাত্মবোধশূন্য, আদর্শহীন, বেতনভোগী শ্রমিক ও সৈনিকের সাহায্যে যুদ্ধ জয় করা যাইবে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় বর্তমান যুদ্ধে খুশিমত অর্থ-বৃদ্ধি করিয়া ধন-বৈষম্য না বাড়াইয়া প্রধানতঃ করের সাহায্যে যুদ্ধের টাকা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা চলিয়াছে, এবং করনির্ধারনের বেলায়ও ধনীদের উপর পূর্বাপেক্ষা অধিক নজর দেওয়া হইতেছে। ইহা দ্বারা আমাদের আদর্শের পিণ্ডরক্ষা হইতেছে সত্য, কিন্তু শেষ রক্ষা হইতেছে কিনা তাহা এখনও বলা শক্ত।

আমরা যে প্রথম বাধাটির কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা মানসিক; দুর্লঙ্ঘ্য হইলেও বুদ্ধির দিক্ দিয়া অলঙ্ঘ্য নহে। কিন্তু দ্বিতীয় বাধাটি একেবারে অলঙ্ঘ্য, যদি যুদ্ধের ব্যয় এত দূর পর্যন্ত গড়ায় যে দেশের সকল লোক দীনোপযোগী জীবনযাত্রার সংস্থান রাখিয়া অবশিষ্ট সব দান করিবার পরেও টাকার অকুলন হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ অবস্থা সকল ব্যবস্থা বা চিকিৎসার বাহিরে—যথেচ্ছ ঋণ-গ্রহণ, কর-আদায়, এমন কি ইনফ্লেশন, কোন কিছুতেই আর তখন শেষরক্ষা হইতে পারে না এবং সেই দেশের তখন ভাঙিয়া পড়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। এরূপ অবস্থা যে আমাদের নিছক কল্পনা না-ও হইতে পারে তাহার

প্রমাণ গত যুদ্ধে জার্মানী আমাদিগকে ভাল করিয়া দিয়াছে। অধুনা এ দেশে অত্যাবশ্যক পণ্যমূল্য যেভাবে চড়িতেছে তাহা যদি প্রতিরোধ করা না যায় তাহা হইলে আমাদেরও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ ব্যয়-বহন দেশের সাধ্যায়ত্ত ততক্ষণ পর্যন্তই কোন্ ব্যবস্থা কম অহিতকর কিংবা অধিকতর ন্যায়সঙ্গত তাহা দেখিবার প্রয়োজন বা সার্থকতা থাকে। সাধ্যাতীত অবস্থায় পথের বিচার নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং সময় থাকিতে সাধ্যায়ত্ত অবস্থায় কোন্ পথে চলিতে হইবে তাহাই আমাদের বিচার্য। ইন্‌ফ্লেশনের বিষয় পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এখন কর-আদায় ও ঋণ-গ্রহণ এই দুইটির গুণাগুণ ও ভেদাভেদ সংক্ষেপে বিচার করিতেছি। প্রথম কথা, মানুষ কর দেওয়া পছন্দ করে না; কিন্তু ধার দেওয়া পছন্দ করে। তাহার কারণ কর বাধ্যতামূলক, ও প্রতিদানের প্রতিশ্রুতিবিহীন। কিন্তু ধার স্বেচ্ছামূলক* ও সুদসহ পরিশোধনীয়। দ্বিতীয় কারণ, কর হইতেছে কণ্টিকারীর কাঁটা, অতি সুস্পষ্ট, কোনরূপ অন্তরাল নাই—ঔষধের গুণ থাকিলেও সোজা গিয়া মর্মে বিদ্ধ হয়। আর ধার হইতেছে গোলাপের কাঁটা, বাহিরে লোভনীয়, অন্তরে কণ্টকাকীর্ণ। ইহা ধনীকে প্রলুব্ধ করিয়া, বর্তমানকে লোভ দেখাইয়া, ভবিষ্যতের অদৃষ্টকে বাঁধা রাখে। ইহাই হইল আনাড়ীর দৃষ্টিতে বাহ্যিক প্রভেদ, কিন্তু পণ্ডিতের অন্তর্দৃষ্টিতে দুইয়ের মধ্যে নাকি কোন প্রভেদ নাই। কারণ দুইয়েরই উদ্দেশ্য হইতেছে—দেশবাসীর হাত হইতে অর্থ টানিয়া নিয়া তাহাদের খরচের বহর খাটো করা এবং সেই অর্থ দ্বারা সর্বসাধারণের ভোগ হইতে গৃহীত মানুষ ও জিনিসগুলিকে লড়াইয়ে নিয়োজিত করা। (আমরা দেখিয়াছি inflation এই উদ্দেশ্যই জিনিসের মূল্য চড়াইয়া দিয়া সাধন করিবার চেষ্টা করে।) যে পরিমাণ টাকা গবর্ণমেণ্ট কর কিংবা ঋণ বাবদ গ্রহণ করিতেছেন, উভয় ক্ষেত্রেই সেই পরিমাণ টাকার ভোগ-সামগ্রী হইতে দেশবাসীকে মোটের উপর বঞ্চিত হইতে হইতেছে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, ঋণকে বিশ্লেষণ করিলে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায়—ঋণ = ভবিষ্যৎ কর + সুদ = গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকম্। ফলের দ্বারা বিচার করিলে ঋণ হইল এক প্রকার বর্ণচোরা কর, যাহা বর্তমানের বোঝা ভবিষ্যতের উপর চাপাইয়া ভাবী-মানবের জন্য কর-শয্যা বিছাইয়া যায়। এই সব যুদ্ধ-বিগ্রহের দরুণ আজ পর্যন্ত ভারতের* ও অন্যান্য দেশের ঋণের অঙ্ক এমন আকার ধারণ করিয়াছে যে তাহার জের টানিতে গিয়া মানুষের মাথা বিকাইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে এবং অনেক জাতির পক্ষে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দাঁড়ান অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এক কলমের খোঁচায় ইহাদিগকে শেষ করিয়া ফেলিয়া নূতন খাতায় জীবনের নূতন পরিচ্ছেদ সুরু করিতে পারিলে মানুষ বাঁচিয়া যাইত; কিন্তু পুঁজিবাদীদের ইহাতে বিষম আপত্তি। তাই ইহাদের পৃষ্ঠপোষিত অর্থ-শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ জাতির ভাল-মন্দের বিচার করিবার সময় সমষ্টিগত মঙ্গলামঙ্গলের দ্বারাই উহার বিচার ও নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু তাহার অন্তরালে, এমন কি তাহারই চাপে যদি বৃহত্তর শ্রেণীর মঙ্গল নিষ্পেষিত হইয়াও যায় তথাপি পারতপক্ষে উহা বিবেচনা করেন না। কিন্তু শ্রেণীবৈষম্য হেতু সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও সংঘর্ষ আজ এমন একটা পরিস্থিতিতে মানব জাতিকে লইয়া চলিয়াছে যে এখন শুধু সমগ্র ভাবে একটা দেশ বা জাতির মঙ্গলামঙ্গল দেখিলেই চলিবে না, তাহার অন্তর্ভুক্ত সকলের হিতাহিত যাহাতে সমভাবে বিবেচিত ও সুরক্ষিত হয়, তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুতরাং অর্থনৈতিকের দৃষ্টিতে দেশের বা জাতির মোট স্বার্থত্যাগ, কর ও ধার এই উভয় বিধানে সমান হইলেও, বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী ত্যাগস্বীকার করিতেছে, না, ধনীর তুলনায় দরিদ্র অধিক ক্লেশ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহাও যথাসম্ভব দেখিতে হইবে।

সেই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, কর অপ্রিয় হইলেও সর্বাপেক্ষা অনুকূল ও সাম্যবাদী—যদি কর্তৃপক্ষের অনুরূপ উদ্দেশ্য থাকে। পক্ষান্তরে ধার ধনীর পৃষ্ঠপোষক; কিন্তু সেই ধার যদি বিদেশ হইতে করা হয়, তাহা হইলে অধমর্ণ দেশের ধনী-নির্ধনের অবশ্য একই অবস্থা দাঁড়ায়। সকল দিক বিবেচনা করিয়া সর্বাপেক্ষা উপযোগী হইলেও করের বিপদ এই যে, প্রত্যক্ষ আয়-করই হউক, কিংবা পরোক্ষ পণ্য-শুল্কই হউক, দিবালোকের মত ইহার নিষ্ঠুর নিরাভরণতা ধনী-দরিদ্র সকলকেই উত্যক্ত করিয়া তোলে এবং ইহাকে অতিরিক্ত মাত্রায় সহ্য বা হজম করিবার শক্তি ও মনোবৃত্তি কাহারও নাই। সেই জন্যই আধুনিক কালের কল্পনাতীত সামরিক ব্যয় শুধু করের সাহায্যে

* অবশ্য বাধ্যতামূলকও হইতে পারে, যথা, compulsory saving.

* ভারতের সরকারী ঋণের পরিমাণ এই যুদ্ধের পূর্বে ১২০৮ কোটি টাকা ছিল।

সংগ্রহ করা বিত্তশালী দেশের পক্ষেও কষ্টসাধ্য, এমন কি অসাধ্য—যদি ইহার তিক্ততাকে ঋণ ও ইনফ্লেশনের মিষ্টরসের সহিত পাক দিয়া খানিকটা সরস ও সহনীয় করিয়া না লওয়া হয়।* ইহার ভিতরেও সেই বৈদ্যেরই বাহাদুরি সর্বাপেক্ষা অধিক যিনি রোগীর অবস্থা বুঝিয়া প্রত্যেক অনুপানের মাত্রা ঠিক করিয়া এই পাঁচন তৈরি করিতে পারেন। এই সম্পর্কে বৈদ্যকে ইহাও বিশেষভাবে দেখিতে হইবে যে যুদ্ধের প্রবল আক্রমণ হইতে রোগী কোন রকমে রক্ষা পাইবার পরে শান্তির হাওয়া লাগিয়া যেন মারা না পড়ে।

অবশ্য সব চেয়ে বড় সমস্যা হইয়াছে, সব রকম বিধানের সম্মিলিত প্রয়োগ করিয়াও যুদ্ধের সময়কার আর্থিক ফাঁড়া কাটাইয়া উঠা। কারণ এই লড়াই, যতই দিন যাইতেছে ততই দেখা যাইতেছে, বীরের লড়াই নহে, টাকার লড়াই; রূপান্তরে, জল-জাহাজ, উড়ো-জাহাজ, সাঁজোয়া গাড়ী, বর্ম গাড়ী, কামান-বন্দুক, গোলা-বারুদের লড়াই—এক কথায়, যন্ত্র-দানবের লড়াই। যে যত অধিক পরিমাণ ও শক্তিশালী মারণ-যন্ত্র সৃষ্টি করিয়া সমরক্ষেত্রে ছাড়িতে পারিবে, তাহার তত জয়ের সম্ভাবনা বাড়িয়া যাইবে। মানুষও এই যন্ত্রেরই একটা অংশমাত্র। সুতরাং যুদ্ধ যখন নির্দিষ্ট দেশের ও স্থানের সীমানা অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে তখন এক পক্ষ তড়িৎবেগে স্থানবিশেষে জয় লাভ করিলেও যুদ্ধের শেষ মীমাংসা হয় না এবং যুদ্ধের ফলাফল তখন শৌর্যের উপর ততটা নির্ভর না করিয়া যন্ত্র-সরঞ্জামের প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে। শৌর্য ও কর্মকুশলতা গৌণ-ভাবে অনেকটা সহায়তা করে নিশ্চয়ই; কিন্তু শেষ রক্ষা শুধু তাহাতে হয় না,—যদি না তাহার সহিত থাকে দীর্ঘ দম। এই দীর্ঘ দম নির্ভর করে দীর্ঘ টাকার থলির উপর; আর দীর্ঘ টাকার থলি নির্ভর করে প্রচুর মানুষ ও প্রভূত ভূমির কর্তৃত্বের উপর। সেই জন্যই আজ নিরীহ, নির্বিরোধী দেশগুলিরও যুধ্যমান কোনো দেশের কবল হইতেই এই যুদ্ধে নিস্তার নাই। বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর গ্রেট ব্রিটেন, বিপুল স্বর্ণাধিপতি যুক্তরাষ্ট্র ও অপূর্ব শৌর্যশালী রুশিয়ার সহিত জার্মানী ও জাপানের এত দিন লড়াই করা অসম্ভব হইত, যদি জার্মানী ইয়োরোপের অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশ এবং জাপান দূর প্রাচ্যের নৈসর্গিক সম্পদে পরিপূর্ণ বিস্তৃত ভূখণ্ড প্রথম দিকে বিদ্যুৎবেগে নিজ অধিকারে আনিতে সক্ষম না হইত। বিপুল বিশ্বের সব গ্রাস করিয়াও যুধ্যমান দেশ কয়টি এই মহা নর-মেধ যজ্ঞের ব্যয় বহন করিতে হিমসিম খাইয়া যাইতেছে। আজ যদি ইহাদিগকে শুধু নিজের দেশের লোক ও সম্পদ লইয়া লড়িতে হইত তাহা হইলে কবে এই কালান্তক যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইয়া সব চুকিয়া যাইত। কিন্তু তাহা করিতে হয় নাই বলিয়াই রঙ্গমঞ্চের শেষ যবনিকা এখনও পড়ে নাই। তবে ইহা অনুমান করা কঠিন নহে যে, আমরা এই বিষম বিয়োগান্ত নাটকের পঞ্চমাঙ্কে এখনও না আসিয়া থাকিলেও চতুর্থ অঙ্কে নিশ্চয়ই পৌঁছিয়াছি। কারণ যেমন দেখা যাইতেছে, যজ্ঞকাষ্ঠ যোগাইবার ক্ষমতার প্রান্তসীমা হইতে কেহই আর বড় বেশী দূরে নাই। রাম না হইতে রামায়ণ রচনা করা বাল্মীকি-প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব; কিন্তু উহা নিয়ম বহির্ভূত। তাই এই যুদ্ধের ব্যয়-রহস্যও নাটকের পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হইবে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, এরূপ ব্যয়-সাপেক্ষ যুদ্ধ ১৯৪৩ সালে শেষ না হইলেও ১৯৪৪ সালে শেষ হইবেই; কারণ তত দিনে যুদ্ধের দক্ষিণা দিবার উপায় নির্ধারণ সম্বন্ধে সকল পণ্ডিতের সকল পাণ্ডিত্যকে সম্ভবতঃ হার মানিতে হইবে। এখন আমরা শঙ্কিত-চিত্তে শুধু ইহাই ভাবিতে থাকিব—মানব জাতির দশা সেই সময়ে ইতঃভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ না হয়।

*ভারত সরকার সম্প্রতি যে বাজেট পেশ করিয়াছেন তাহাতে আগামী বর্ষে ৬৫ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে অনুমান করিয়া ২০ কোটি তন আয় কর ও পণ্য কর সাহায্যে এবং ৪০ কোটি ঋণ করিয়া তুলিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। যে সরকারী বৎসর এই মার্চ মাসে শেষ হইবে তাহাতেও ৯৫ কোটি টাকা ঘাটতি দেখা যাইতেছে। উহার অধিকাংশও ঋণ করিয়াই পূরণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। অর্থস্ফীতি বাজেটে ীকার্য ব্যাপার নহে। উহা সকল গবর্ণমেণ্টের গোপন অস্ত্র পূর্বেই লেখ করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের বংশলতায় অসঙ্গতি-মূলক ভ্রম

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

Calcutta Municipal Gazette-এর Tagore Memorial Special Supplementএ ঠাকুর-পরিবারের বংশলতায় লিখিত হইয়াছে, কলিকাতার ঠাকুর-পরিবারের 'গাঁই'—'বন্দ্যোপাধ্যায়'। কিন্তু কুলশাস্ত্রে জানা যায়, ঐ পরিবারের গাঁই 'কুশারি', কারণ উঁহার আদিপুরুষ 'দীন' (বা 'কোয়') 'কুশারি'। এক পরিবারের দুই গাঁই নিতান্ত অসম্ভব, সুতরাং ইহা বিষম ভ্রম, এই সিদ্ধান্ত করিয়া, আমি শ্রীযুত অমল হোম মহাশয়কে পত্রে জানাইয়াছিলাম। হোম মহাশয়, যে কারণেই হউক, তাহার উত্তর দেন নাই। পরে 'রবীন্দ্র-কথা'র সঙ্কলয়িতা ঠাকুর-বংশের তত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এ বিষয় লিখিলে, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক উত্তরে জানাইয়াছেন, কলিকাতার ঠাকুর-বংশীয়দের 'কুশারি' গাঁই, সুতরাং আমার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। বিশ্বকবির বংশ-পরিচয়ে কোন অসঙ্গতিমূলক ভ্রম-প্রমাদ থাকে, ইহা বিচারসঙ্গত মনে হয় না। এই হেতু ঐ পরিচয়ের মধ্যে যে যে বিষয়ে ঐরূপ ভ্রম বুঝিতে পারা গিয়াছে, সংশোধনের আশায় তাহা ক্রমে ক্রমে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১। "ঠাকুর-পরিবার 'বন্দ্যোপাধ্যায়'"—বংশ-পরিচয়ে জানা যায়, ঠাকুর-পরিবার পিঠাভোগের 'কুশারি'-গাঁই শ্রোত্রিয় জমিদার জগন্নাথের বংশধর। 'কুশারি'-গাঁইএর আদিপুরুষ দীন (বা কোয়) 'কুশারি'। ইনি শাণ্ডিল্য-গোত্রজ রাঢ়ীয়শ্রেণী ভট্টনারায়ণের ত্রয়োদশ পুত্র। রাজার নিকটে বাসার্থ ইনি 'কুশারি' গ্রাম প্রাপ্ত হন, তদনুসারে ইঁহার অধস্তন সন্তানগণের গাঁই 'কুশারি'। পক্ষান্তরে, ভট্টনারায়ণের প্রথম পুত্র বরাহ 'বন্দ্য' গ্রামে বাস করেন, এই হেতু তাঁহার পরপুরুষগণের গাঁই 'বন্দ্য, বন্দ্যঘটীয় বা বন্দ্যোপাধ্যায়'। এইরূপ আদিপুরুষানুযায়ী সম্বন্ধে, 'কুশারি' ও 'বন্দ্যোপাধ্যায়' গাঁই স্বতোবিরোধী, অর্থাৎ 'কুশারি', 'বন্দ্যোপাধ্যায়' নহেন এবং 'বন্দ্যোপাধ্যায়', 'কুশারি' হইতে পারেন না। অতএব, কলিকাতার ঠাকুর-পরিবারের গাঁই 'কুশারি', 'বন্দ্যোপাধ্যায়' নহে। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধবিশেষে* নিজ নামের পরিবর্ত্তে 'বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়' লিখিয়াছেন, সত্য, কিন্তু আমার বোধ হয়, তিনি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়াই ঐরূপ উপাধি-ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আদিপুরুষানুসারে গাঁইএর বা উপাধির অনুসন্ধান করেন নাই।

২। "ভট্টনারায়ণ প্রথম 'কুশারি'!"—ভট্টনারায়ণের ত্রয়োদশ পুত্র দীন 'কুশারি'-গাঁইএর আদিপুরুষ, ইহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে; সুতরাং, দীন 'কুশারি'র পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা ভট্টনারায়ণ প্রথম 'কুশারি' ইহা নিতান্ত সঙ্গতিহীন ও ভ্রমজনক।

৩। "যশোহরের গুড়ি শুকদেব 'আদি পীরালী'র অন্যতম"—খান জাহান আলী নামে এক ব্যক্তি সুন্দরবন আবাদ করিবার সনন্দ লইয়া যশোহরে উপস্থিত হন। মামুদ তাহির তাঁহার উজীর ছিলেন। তাহির পূর্ব্বে এক কুলীন ব্রাহ্মণের নাতি ছিলেন, এক মুসলমানীর রূপে মুগ্ধ হইয়া মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্ব নিবাস 'পিরলিয়া' গ্রাম; এই নিমিত্ত, অথবা মুসলমান-ধর্ম্মে গোঁড়ামির জন্য, ইঁহাকে সকলেই 'পীর আলী' বলিয়া ডাকিত। কাশ্যপগোত্রীয় রাঢ়ীয়শ্রেণী দক্ষের প্রথম পুত্র 'ধীর', রাজার নিকট বাসার্থ 'গুড়' গ্রাম প্রাপ্ত হন; তদনুসারে ইঁহার 'গাঁই'—'গুড়'। ধীর গুড়ের অধস্তন একাদশ পুরুষ দক্ষিণডিহি-নিবাসী দক্ষিণানাথ রায়চৌধুরী। দক্ষিণানাথের চারি পুত্র—কামদেব, জয়দেব, রতিদেব ও শুকদেব। কামদেব ও জয়দেব তাহিরের প্রধান কর্ম্মচারী বা দেওয়ান ছিলেন। এই তাহিরই ইঁহাদিগকে কৌশলক্রমে বলপূর্ব্বক মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করান। ইঁহাদের মুসলমানী নাম কামালউদ্দীন খাঁ চৌধুরী ও জামালউদ্দীন খাঁ চৌধুরী। অতএব, ইঁহারাই 'পীর আলী' কর্ত্তৃক মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত 'আদি পীরালী' (original Pirali)। ইঁহাদের স্ত্রী-পুত্রাদি দক্ষিণডিহির পৈতৃক বাটীতে রতিদেব ও শুকদেবের সহিত কিছুকাল অবস্থান করেন এবং সেই সূত্রে ও পৈতৃক সম্পত্তির তত্ত্বাবধান হেতু কামালউদ্দীন ও জামালউদ্দীন পৈতৃক বাটীতে যাতায়াত করিতেন; এই হেতু রতিদেব ও শুকদেব সমাজচ্যুত হন। সুতরাং, গুড়ি শুকদেব 'আদি পীরালী' নহেন, 'পীরালী' ভ্রাতাদের যাতায়াতে 'পীরালী' দোষে দূষিতই

---

* দ্রষ্টব্য—'প্রবাসী, ১৩৩৪ সাল, শ্রাবণ, ৫১৩—৫১৮ পৃষ্ঠা,—"রেভারেণ্ড টম্সনের বহি" প্রবন্ধ।

হইয়াছিলেন, বলাই সঙ্গত। পিঠাভোগের জগন্নাথ কুশারি গুড়ি শুকদেবের কন্যা বিবাহ করিয়াই ঐরূপই 'পীরালী'-দোষে দূষিত হন; সুতরাং জগন্নাথের বংশধর ঠাকুর-পরিবারও ঠিক 'পীরালী' নহেন, 'পীরালী'-দোষে দূষিত মাত্র।

৪। "পঞ্চানন 'ঠাকুর'"—দীন কুশারির অধস্তন পুরুষ জগন্নাথ কুশারি; ইঁহার পরবর্ত্তী সপ্তম পুরুষ পঞ্চানন। পঞ্চানন যশোহরের বাটী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়মের নিকটস্থ গোবিন্দপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। গোবিন্দপুরের স্থানীয় বণিকেরা পঞ্চাননকে 'ঠাকুর মশাই' বলিতেন। 'ঠাকুর মশাই'এর অর্থ 'পূজনীয় ব্রাহ্মণ',—ইহার ইংরেজী অনুবাদ 'Revered Sir' ঠিক বলিয়া মনে হয় না, 'Revered Brahmin' হইলেই, বোধ হয় ভাল হয়। পল্লীগ্রামে এখনও ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণকে "ঠাকুর মশাই" বলিয়া সম্বোধন করেন। এই বর্ণবাচক 'ব্রাহ্মণ'-অর্থে 'ঠাকুর' শব্দ হইতে 'ঠাকুর' বা ইংরেজী 'Tagore' পরে উপাধিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, আদিপুরুষ 'দীন কুশারি' বা 'জগন্নাথ কুশারি'র গাঁই-অনুসারে মৌলিক পরিচয় 'কুশারি' গাঁইএর আর কোন চিহ্নই নাই, ফলে, ঠাকুর-পরিবার 'পীরালী বামন' এইমাত্র পরিচয়েই সাধারণের বিদিত, বস্তুতঃ, ঠাকুর-পরিবার তাদৃশ নগণ্য পরিচয়ের ব্রাহ্মণ নহেন। পরিচয়ে গাঁইএর উল্লেখ থাকিলেই বংশের আদির বা গোড়ার কথা সুস্পষ্ট থাকিত, এরূপ নগণ্যতার স্থান থাকিত না। মূলে ভুল হইলে, কুলনির্ণয় এইরূপই দুরূহ হইয়া পড়ে।

পথিক

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

পথিক, ওরে পথিক, রে পথিক,
পায়ের পথের ধূলো তোরে
পায়ে-পায়ে বরণ করে'
তীর্থপথের বার্ত্তা বলে' দিক্।

নিঃশরণী সরণিতে
কেউ নাহি তোর, অভয় দিতে
এগিয়ে নিতে নাইক কারো রথ,
বৎসরে বা যুগান্তরে
কেউ র'বে না আশা ধরে'
সাথী শুধু পায়ের তলার পথ!

শঙ্খ-হাতে গৃহদ্বারে
চাইবে না কেউ পথের ধারে,
বাতায়নে পলক-হারা আঁখি,
যাত্রাপথের রাত্রি-শেষে
দেশে কিম্বা দূর বিদেশে
বন্ধু বলে' কেউ ল'বে না ডাকি'!

পথিক, ওরে একলা ও পথিক,
আপন পায়ের পথের ধূলি
আপ্‌নি নে তুই মাথায় তুলি'—
সেই তোরে তোর আশীর্ব্বাদী দিক্।

সকল সীমার সীমা-ছাড়া,
পায়ের পাতার পরশ-হারা
যে পথে কেউ লোক চলে নি আর,
নাম-না-জানা সেই উজানী
বক্ষে যদি লয় সে টানি'
সেই বাণী তোর পরম পুরস্কার!

সেই মিলনের আশা ধরে'
সকল বাধা তুচ্ছ করে'
শক্ত পায়ে চল্ এগিয়ে ভাই;
আসে যদি আসুক্ মরণ,
বলিস্ তা'রে—"মনোহরণ,
ওগো নূতন, তোমায় আমি চাই!"

দুঃসাহসী ওরে ও পথিক,
অচিন্ পথের যাত্রা তোরে
পা-দুটো তোর ধূলোয় ভরে'
অমর লোকের যাত্রী ক'রে নিক্॥

"পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা—"

শ্রীজিতেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চাঁদপুরযাত্রী স্টীমার; ফার্স্ট ক্লাসের সামনে ডেক্‌চেয়ারে বসে অরুণ সামনের তরঙ্গ-উদ্বেলিত জলরাশির দিকে চেয়ে আছে; পাশে টুলের উপর একখানা বড় ইংরেজী বই—তাতে একটা লাল নীল পেন্সিল গোঁজা, বইখানা কোন আন্তর্জাতিকতাবাদী মনীষীর লেখা। অরুণ এই বিষয় নিয়েই গভীর চিন্তায় মগ্ন। কেমন ক'রে ক্ষুদ্র দেশ ও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম ক'রে আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে বিশ্বমানবতার সীমাহীন বিস্তৃতির মধ্যে ভবিষ্য মানব-মনের মুক্তি ঘটবে অরুণ এই নিয়ে অনেক দিন থেকে পড়াশুনা করছে, গভীর ভাবে চিন্তা করছে। জাহাজের সংঘর্ষে ফেনিলোচ্ছল পদ্মার শব্দায়মান জলস্রোতের দিকে চেয়ে তার মনে হচ্ছে বর্ত্তমান পৃথিবীতে নানা বিপরীতমুখী আদর্শের সঙ্গে সংঘর্ষে নিখিল মানব-মন এমনি বিক্ষুব্ধ চঞ্চল হয়ে রয়েছে। কবে আসবে সেই মহান্ প্রশান্তি, সর্ব্বদেশ সর্ব্বজাতি সমন্বয়ে যে অপরূপ সংস্কৃতি গড়ে উঠবে সেই দেশ-কাল-জাতি-গোত্রহীন বিশ্বমানবতার পরম আশীর্ব্বাদ।

হঠাৎ তার চিন্তাধারায় ব্যাঘাত ঘটল, একটি খদ্দরধারী যুবক এসে তার কাছে অনুমতি চাইলে "ডেকে" ব'সে একটু পড়াশুনা করবার। অন্যত্র দাঁড়াবার জায়গা আছে বটে, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর পক্ষে একটু শান্তিতে ব'সে কোন কিছু গভীর ভাবে চিন্তা করা সম্ভব নয়। অরুণ ও তার সহযাত্রীর কোন আপত্তি নেই জেনে ছেলেটি ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল।

অরুণ আবার চিন্তা ক'রে চলেছে কি কি গলদ থাকায় লীগ্ অব্ নেশুনস দ্বারা বিশ্বমৈত্রী সম্ভব হ'ল না। কোন্ উপায়ে সার্ব্বজনীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় পৌছান যায়।

ডেকে সতরঞ্চ ও সুজনির বিছানা পেতে ছেলে দু-জন মিলে কি আলোচনা করছিল ও লিখছিল, তাদের মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত হ'ল একটি তরুণী, সুজনির উপর ধপ্ ক'রে ব'সে জিজ্ঞেস করল, "হল আপনাদের লিষ্ট? আমাকেই সব করতে হবে নাকি?" তার পর চলল আলোচনা কর্ম্মী হিসাবে কে কেমন, কাকে পাওয়া যাবে না, কার কবে জেল থেকে ছাড়া পাবার সম্ভাবনা, ইত্যাদি। কণ্ঠস্বর ক্রমেই উঁচু পর্দ্দায় উঠতে লাগল; অরুণের চিন্তাসূত্র সব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পাইপ ধরিয়ে চুপ ক'রে রইল ব'সে। ওদের আলোচনা যেভাবে কানে আসছে, অন্য কিছু চিন্তা করা সম্ভব নয়; ওদের কথাই ভাবা যাক্। বাংলার বর্ত্তমান তরুণ-তরুণীদের চিন্তাধারার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। অরুণ বছরখানেক হ'ল আমেরিকা থেকে ফিরেছে, লাহোরে বড় চাকরি নিয়ে আছে—দেশে ফেরা এই প্রথম।

মেয়েটি বলল, "তা হ'লে দেখা যাচ্ছে পনর জন আপনাদের হচ্ছে না। টেনেবুনে বাড়াতে চাচ্ছেন এই ত?" একটি ছেলে বললে, "শহরে আর কর্ম্মী ছেলে রেখেছে নাকি—সকলেই ত জেলে; তা ব'লে কাজ ত পড়ে থাকতে পারে না। জনকুড়ি ত দাঁড় করালাম।" মেয়েটি লিষ্টখানা তুলে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে প'ড়ে যেন ঝাঁঝিয়ে উঠল; "কিচ্ছু হয় নি। কুড়ি জন ছেলে। আমি মহিলা-সমিতির প্রতিনিধি থাকতে ত্রিশ জনের মধ্যে কুড়ি জনই ছেলে—তাও টেনেবুনে!" কুচি কুচি ক'রে কাগজখানা ছিঁড়ে হাওয়াতে উড়িয়ে দিয়ে নূতন লিষ্ট করতে বসল।

তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, সতেজ ভঙ্গী, সঙ্কোচহীনতা, অরুণ ও তার সহযাত্রীর অস্তিত্বকে যেন সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে চলেছে। লিষ্ট ক'রে ওদের হাতে দিয়ে বললে, "এই নিন, কেউ আপত্তি করলে বলবেন আমি করেছি; আমি রইলাম সেক্রেটারী, মহিমবাবু প্রেসিডেন্ট। লিষ্টখানা বেণীবাবুর হাতে দেবেন।"

অরুণ বুঝতে পারলে, পূর্ব্ববঙ্গের তার সুপরিচিত একটি শহরে কোন তরুণ-সমিতি হোক, ছাত্র-সংঘই হোক বা কোন কংগ্রেস-কমীটিই হোক পুনর্গঠিত হচ্ছে। এরা বিভিন্ন শাখা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হয়ে কলকাতায় কেন্দ্রীয় সমিতির সভা থেকে পরামর্শ নিয়ে ফিরছে। আশা উদ্দীপনা, জলন্ত উৎসাহে মন ওদের ভরা; একটা বড় রকমের কিছু ক'রে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বদলে দেবার আগ্রহে ওদের আলোচনা ক্রমশঃ কার্য্যকরী উপায় ছেড়ে কূট

রাজনৈতিক পদ্ধতির জটিল আলোচনার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

একটি ছেলে বলছে, "দেখুন, আপনি দিন-দশ হ'ল জেল থেকে বেরিয়েছেন, শরীরও ভাল নেই—বিশ্রাম নিন্; সেক্রেটারীর কাজে পরিশ্রম ত কম হবে না।"

মেয়েটি উত্তর দিলে—"হ্যাঁ, আপনারা সকলে মিলে জিনিসটি পণ্ড ক'রে ফেলুন, আর আমি ব'সে ব'সে দেখি! এতগুলি সমিতি করলাম, চালাচ্ছি ত সবগুলোই, আটকাচ্ছে কোথাও? আপনারা সবাই নূতন এখন—সমিতি গড়তে পারবেন না—চালু ক'রে হাতে তুলে দিলে চালিয়ে নিতে হয়ত পারবেন। বিশ্রাম নেবার সময় কোথায়। বিশ্রাম যে চায় এ পথ তার নয়। তা এক কাজ করলে হয়, যান দেখি আপনারা, আমি এখানেই একটু গড়িয়ে নিচ্ছি। এ ক-দিন কলকাতায় লীলাদির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সব রকমের সমিতিগুলোর সব ভিতরের ব্যাপার জেনে নিয়েছি; দেখবেন এবার কি করি। দেশটাকে গরম ক'রে তুলব। আপনাদের কিছু ভাবতে হবে না যে ক-দিন আছি।" ছেলেরা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি বিছানায় শুয়ে পড়ল।

অরুণ মুখ ফিরিয়ে ডাকলে—"স্ববি।" চমকে হুড়মুড় করে উঠে এল মেয়েটি। "ওমা অরুণদা! তবে যে ওরা বলল সাহেব, আমি তাই ফিরে তাকাই নি। বাড়ী যাচ্ছ? লাহোর থেকে আসছ বুঝি? আমাকে দেখেই চিনতে পারলে?"

"গলার স্বর শুনেই; তোমাদের রাজনৈতিক আলোচনার ব্যাঘাত হবে ব'লে তখন ডাকি নি। আছ কেমন? জেল থেকে বেরুলে শুনলাম, দাদাদের নকল করছ মনে হচ্ছে। এই প্রথম?"

স্বব্রতা হেসে উত্তর দিলে, "না, বার-কয়েক হ'ল; তবে এটা একটু লম্বা তিন মাসের; সামনেরটা নিশ্চয়ই আরও বড় হবে, ক্রমশঃ দর বাড়ছে ত আমার।"

অরুণ একটা চেয়ার দেখিয়ে বললে, "ব'সো।" স্বব্রতা বসলে না; "অরুণের চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বললে, "অরুণদা তোমার ডাক শুনে আমি যে কেমন চমকে উঠেছিলাম, এখনও বুকের ভিতরটা কেমন ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। কে জানত তোমাকে আবার দেখতে পাব; ওঃ কত দিন দেখি নি। পোষাকে আর চেহারায় এমন সাহেব হয়েছ তুমি, অনেকেই চিনতে পারবে না।"

অরুণ বললে, "তোমার জিনিসগুলি এখানে আনিয়ে ব'সো ত শান্ত লক্ষ্মী মেয়েটির মত; দেশের কথা শুনি।" সতরঞ্চটা টেনে নিয়ে স্বব্রতা অরুণের চেয়ারের নিকটে বসে বললে, "এটা আমারই, বল কি জানতে চাও।"

"কংগ্রেস-আন্দোলনে যখন নেমেছ—জেলেও ক-বার গেছ, তা হ'লে তোমার পড়ার কি হচ্ছে?" স্বব্রতা বললে, "ফোর্থ ইয়ারে উঠেই কি ক'রে আপনা-আপনি পড়াটা যে বন্ধ হয়ে গেল, টেরই পেলাম না। একটা স্কলারশিপ ছিল—এ দিয়ে সমিতির কাজের অনেকটা সাহায্য হ'ত; সেটার মায়ায় সকলে বললে 'পড়' কিন্তু আর সময় পেলাম না। জেলে যাওয়া-আসার ফাঁকে ডিগ্রীর চিন্তা করা সম্ভব হ'ল না।"

"নিখিল ও রঞ্জন কেমন আছে স্ববি? মাসিমা কেমন?" স্বব্রতা বললে, "মা কাশীতে আছেন। ছোট্‌দা কংগ্রেস-কমীটির সেক্রেটারী ছিল, ইণ্টার্নড্ হয়েছে।" তার পর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে বললে, "বড়দা নেই—"

—রঞ্জন নেই? কি হয়েছিল?

—আমাদের সঙ্গে ওর রাজনৈতিক মত মিলত না, কখন থেকে যে বিপ্লবীদের দলে ছিল কে জানত? আরমারী রেডের পর নাকি ধরা পড়েছিল—কেউ বলে গুলিতে মারা গেছে, কেউ বলে আন্দামানে। ওদের জাল নামের ভিতর থেকে আসল মানুষ চেনা যায় না। তবে বেঁচে থাকলে প্রমাণ পেতামই এত দিনে, অনেক দিন ত হ'ল।"

রঞ্জন অরুণের আবাল্য বন্ধু। গভীর ভালবাসায়, অন্তরঙ্গতায় পরস্পর নির্ভরশীলতায় প্রথম তারুণ্যের স্বপ্নময় দিনগুলি রসে ভরপূর হয়ে অরুণের স্মৃতিতে অমর হয়ে আছে। ঐ মায়াময় দিনগুলি উত্তীর্ণ হয়ে অরুণ দেশ-বিদেশে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু আর কোন বন্ধুত্ব সেই উপচীয়মান অন্তরাবেগে রস-নিষিক্ত হয়ে উঠল না। হয়ত প্রথম যৌবনের পর সত্যিকার বন্ধুত্ব হয় না। অরুণের মনের উপর একটা বিষাদ-ঘন-ছায়া নেমে এল।

স্বব্রতা জানত অরুণ এ খবরে ব্যথা পাবে, তাই দূর-দৃশ্যমান দিকচক্রবালের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

"স্ববি, তুমি আছ কোথায়? তোমাদের সব কে দেখে শোনে?" স্বব্রতা জানাল, সম্পত্তির তার দাদাদের অংশ সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে, বাদ বাকী দিয়ে মন্দ চলে না; পুরনো আমলের বুড়ো কর্ম্মচারী নারাণ-কাকা

চালিয়ে দেয়। সে জেল থেকে বেরিয়ে মামার বাড়ীতে ছিল এত দিন, ঐ ছেলে দুটি সেই শহরের ওখানে নূতন ক'রে প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তোলা সুরু করেছে। সুব্রতা আজ বাড়ী যাচ্ছে।

অরুণের মনে হ'ল সুব্রতার মুখের সঙ্গে রঞ্জনের প্রথম যৌবনের চেহারার আশ্চর্য্য রকম মিল। তার দেহ বলিষ্ঠ হ'লেও, মুখটি ছিল কোমল। তেমনই চোখ, তেমনই কপাল, হাসিটিও তেমনই। সুব্রতা যেন হঠাৎ তাকে বহু দূর অতীতের স্বপ্নময় দিনগুলিতে উত্তীর্ণ ক'রে দিলে। জীবনের বহু ঝঞ্ঝাবাত অতিক্রম ক'রে শুধু নিজের চেষ্টায় সে আজ সংসারে কৃতকর্ম্মা পুরুষ ব'লে গণ্য হয়েছে; বহু কাল পিছন ফিরে তাকাবার সময় পায় নি। আজ এই অপরাহ্নের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল পদ্মার বুকের ওপর দিয়ে চলতে চলতে অপস্রিয়মান দূর গ্রামের অস্পষ্ট আভাসে ছাত্রজীবনের দিনগুলির স্মৃতি তার অবচেতন মনের গহনলোক থেকে বের হয়ে এল। এই পদ্মা পেরিয়ে এমনি কতবার যাওয়া-আসা, কত দিনের কত সুখস্মৃতি। প্রথম যৌবনের স্মৃতির সঙ্গে সুব্রতাও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বয়সে অনেক ছোট সুব্রতা ছেলেবেলা থেকে আদরে-আবদারে রঞ্জন ও অরুণের মধ্যে কোনদিন কোন পার্থক্যই রাখে নি। আজ এই উনিশ বছরের সুব্রতার দিকে চেয়ে অরুণের মনে হ'ল কত গভীর স্নেহই সে করত একে; অথচ এ ক-বছর সম্পূর্ণ ভুলেই ছিল—দেখা না হ'লে কোন দিনই হয়ত মনে পড়ত না। সংসারে ওর একাকীত্ব, ওর দীর্ঘ কারাবাসের জন্য রক্তাল্পতায় বিবর্ণ মুখ, বাতাসে চোখ-মুখের উপর উড়ে-পড়া রুক্ষ কোঁকড়ানো চুলের রাশি অরুণের মনকে গভীর-ভাবে নাড়া দিলে।

সুব্রতা বললে, "চার বছর পর ফিরছ, না অরুণ-দা! ওঃ, তখন আমি কি ছেলেমানুষই ছিলাম।" অরুণ হাসলে —মনে পড়ল তার যাবার দিনে সুব্রতার কান্না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আকুল কান্না।

—কেঁদেছিলে ও কথা মনে পড়েছে বুঝি?

সুব্রতা হেসে হাঁটুতে মাথা গুঁজল।

অরুণ নিঃশব্দে বসে রইল। অতীত স্মৃতির পরিবেশের মধ্যে এসে দু-জনের মন পরস্পরকে যেন স্পর্শ করলে।

অরুণ কথা বলে অল্প, আবেগপ্রবণ নয় কিন্তু স্পর্শ-চেতন। সহজ চেতনশীলতায় তার স্নায়ুমণ্ডল সর্ব্বদাই সজাগ সক্রিয়। কিন্তু ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ খুবই কম।

সেদিন সন্ধ্যায় সুব্রতার অনর্গল কথা শোনার ফাঁকে তার সুকুমার মুখের কোমলতা, ঠোঁট দুটির পেলবতা ও চাহনির স্নিগ্ধতা ওর মনকে কতখানি নাড়া দিলে বাহিরে তা প্রকাশ পেলে না।

রাজনৈতিক আলোচনায় সুব্রতার উদ্দীপনা লক্ষ্য ক'রে অরুণ বিস্মিত হ'ল। হঠাৎ চোখ-মুখ এমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠা, ভবিষ্যতের উপর এমন নিশ্চিন্ত নির্ভরতা, এমন আশাবাদ, আবেগময় কণ্ঠস্বর—সব মিলে অরুণের মনে হ'ল সুব্রতা যেন স্বদেশপ্রেমিক তারুণ্যের ভাবপ্রতীক; যুগে যুগে এরাই মুক্তির স্বপ্ন দেখে, ওদের উদ্দীপনা কর্ম্মী সৃষ্টি করে, অন্যেরা ওদের স্বপ্নের রূপ দেয়।

কিন্তু কোন আবেগের আচ্ছন্নতা অরুণ অপছন্দ করে। তার আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বমৈত্রীর কোন যুক্তিই সুব্রতা যেন বুঝে উঠতে পারল না। অরুণ বললে, "তোমরা ভেবে দেখ নি সুবি, এই সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতা কি ভাবে বিশ্ব-মৈত্রীকে পিছিয়ে রেখেছে; দেশে-দেশে, জাতিতে জাতিতে যে কাটাকাটি মারামারি চলছে, কত দেশ কত সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে—তার মূলে এই সঙ্কীর্ণ স্বদেশপ্রেম। এই স্বাদেশিকতার ভাবাবেগ থেকে আধুনিক যুগের মানুষের মুক্তি চাই—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশে খণ্ডবিখণ্ড পৃথিবীতে জাতিতে জাতিতে বিচ্ছিন্ন মানুষের মধ্যে একতা আনতে। আমার দেশ, আমার জাতি—কথাগুলোকে পুরনো বলে ভাববার দিন আসছে সুবি।"

সুব্রতা বুঝতে চায় না, শুধু মাথা নাড়ে। বলে, আমার দেশ আগে; পৃথিবীকে আমি কতটুকুই বা জানি।"

রাজনৈতিক মতামতে সুব্রতার দৃঢ় ধারণাগুলি লক্ষ্য ক'রে অরুণ বললে, "দেখ সুবি, তোমরা সাধারণতঃ যে কর্ম্মপন্থা মেনে চলে মনে কর—তাতে দেশের স্বাধীনতা আসবে, মূলতঃ তার সে শক্তি নেই। তোমাদের চিন্তাধারার মূলে প্রেরণা যোগাচ্ছে prestige suggestion; কোন্ মহামান্য ব্যক্তি কি বললেন তাই নিয়ে তোমরা দেখছ স্বপ্ন।"

অরুণের বিদ্যাবত্তায় সুব্রতার গভীর শ্রদ্ধা; তাই কোন তর্কের দিকে না গিয়ে শুধু উত্তর দিলে, "আমরা স্বপ্নই দেখব অরুণদা; আমরা হয়ত পারব না, তবু দেশের বুকে আমাদের স্বপ্নটাও পড়ে থাকবে, কেউ না কেউ হয়ত তার রূপ দেবে তারই প্রতীক্ষায়। We are the dreamer of dreams. কত লোকের স্বপ্ন সফল হয়েছে অরুণ-দা।"

অরুণের মনে হ'ল বিশ্বমৈত্রীর কল্পনাও যে একটা স্বপ্ন

সুব্রতা না বললেও, ঐ কথার দ্বারা তাকে স্পষ্ট ক'রে তুললে।

অরুণের মনে পড়ল সুব্রতা তার কর্ম্মিবন্ধুদের সঙ্গে ওখানে বসে যে আলাপ-আলোচনা করেছে সে সময়টার কথা। দুটি তরুণ যুবক ও একটি তরুণী পদ্মার বুকে অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের মাঝে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ ক'রে চলেছে; তাতে নেই হাসি গল্প, নেই সিনেমা থিয়েটারের তারকাদের কথা, নেই ব্যক্তিগত সুখদুঃখের আলোচনা, নেই পরনিন্দা পরচর্চ্চা, প্রেমালোচনা। আছে শুধু এক অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের স্বপ্নবিহ্বলতা। হ'তে পারে এদের চিন্তাধারা ভাবাবেগে আচ্ছন্ন, স্বাদেশিকতায় সঙ্কীর্ণ; কিন্তু কতকগুলি তরুণ যে নূতনতর ধাতুতে গড়ে উঠছে এটা ঐ একাভিমুখী চিন্তায় অরুণের লক্ষ্যগোচর হ'ল।

চার বছরের অনুপস্থিতিতে বাংলা দেশের কংগ্রেস ও বিপ্লবান্দোলনের যতখানি খবর সে পেয়েছে, দেশে পা দিয়েই যেন তার চেয়ে বেশী পেলে।

কলকাতায় দু-চার জন বন্ধুবান্ধবকে খোঁজ করে পেলে না, ওরা জেলে। প্রমোদের সঙ্গে দেখা হ'ল; প্রমোদ ওদের আমলের সেরা ছেলে। যে-প্রমোদ অনায়াসে আই-সি-এস হ'তে পারত—সে সকালে এক কলেজের ছেলেকে পড়ায়—এতেই ওর সংসার চলে। ওর স্ত্রী জেলে; দুটি ছেলেমেয়েকে পাশের ঘরের ভাড়াটেরা যত্ন করে। প্রমোদের সঙ্গে গল্প করার সময়ও হ'ল না, নানা সভাসমিতি নিয়ে তার ব্যস্ততার অন্ত নাই। বাংলার হাওয়ায় একটা স্বপ্নের আচ্ছন্ন ভাব; আন্তর্জাতিকতাবাদী অরুণ এ স্বপ্নকে যেন বুঝতে পারে না। যখন রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে সারাটা দেশ বিক্ষুব্ধ, অরুণ তখন আমেরিকায়; তাই আজ ফিরে এসে দেশের পরিবর্ত্তনটা যেন আয়ত্ত করতে পারছে না।

কিন্তু মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও নানা আলোচনার ভিতর দিয়ে দুইটি চিত্তে এই সন্ধ্যাটি রঙীন হয়ে উঠল। অরুণের মনে হ'ল, এই রকম একটি ক্ষীণা দীর্ঘাঙ্গী ভাবময়ী তরুণীর সাহচর্য্যে তার জীবনযাত্রা আরও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। সুব্রতার চোখে মুখে আজও সেই কৈশোর, সেই সরলতা; অধিকন্তু যা অরুণের চোখে নূতন, এই প্রজ্ঞাময় সৌন্দর্য্য, 'ইন্‌টেলেকচুয়াল বিউটি'।

সুব্রতা বুঝতে পারলে, সেই সুগভীর স্নেহ আজও তার জন্য জমা রয়েছে। সে সংসারে একা নয়; নিশ্চিন্ত নির্ভরতার আশ্রয়ে দাঁড়াবার মত জায়গা রয়েছে, যেখানে সব বিপদে নির্ভয় হস্ত প্রসারিত ক'রে আড়াল করে দাঁড়াবার তার বাল্য কৈশোরের অরুণ-দা রয়েছে, যার সঙ্গে তার বড়দা'র সব স্মৃতি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

অরুণের পাশে চুপ ক'রে তার সান্নিধ্য অনুভব করতে করতে আবেগপ্রবণ সুব্রতা বহুদিনের কঠোরতার পর এক অননুভূত স্নিগ্ধ আনন্দের সন্ধান পেলে। মুখে একবার শুধু বললে, "বড় ভাল লাগছে অরুণ-দা এই সন্ধ্যাটা; অনেক দিন যেন সন্ধ্যাই দেখি নি।"

দু-জনের বাড়ী চট্টগ্রাম শহরের একই পাড়ায়। পরদিন সকালবেলা তারা বাড়ী পৌছল।

আনন্দ-উৎসব থেকে স্বেচ্ছানির্ব্বাসিত সুব্রতার এত দিন কেটেছে রাজনৈতিক আন্দোলনের তন্ময়তার মধ্যে। সুকঠোর ছিল তার পরিবেশ; বন্ধুরা দেখেছে শুধু তার তপস্বিনী রূপ, ছেলেরা বলেছে সার্থক ওর নাম, মহার্ঘ ওর সাহচর্য্য, ধন্য হবে সে যে পাবে ওর অন্তরঙ্গতা। একটা স্বপ্নের মেঘমেদুর ছায়া ওর চোখের দৃষ্টিকে সংসারের আর সব দিক থেকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। কোন কামনা বেদনা আবিলতা ওর মনকে স্পর্শ করে নি। পুরুষ-বন্ধুরা ওর তন্ময়তাকে শ্রদ্ধা করেছে, ওর নিষ্কলুষ কুমারী-মনের একমুখীন ভাবপ্রবণতাকে ওরা সম্মান করেছে; নিজেদের মাঝে বলাবলি করেছে—এমন একাগ্রতা ও বিশুদ্ধ ভাবাবেগই তাদের আন্দোলনের প্রাণ; চুলচেরা বিচার, লাভ-ক্ষতির সংশয়, পদে পদে নানা সমালোচনায় আন্দোলনের সংস্কার প্রচেষ্টা তাদের নয়। সুব্রতা ওর প্রাণপ্রাচুর্য্য ও ভাবাবেগে ওদের আন্দোলনে করেছে প্রাণসঞ্চার, অনেক দ্বিধা-সংশয়কে ভেঙে চুরমার ক'রে অনেক মেয়েকে টেনে এনেছে ওর চার পাশে। এমন আদর্শবাদী একাগ্র অক্লান্ত দেশসেবিকার জীবন যে কঠোর হবে তা স্বাভাবিক। তার উপর সুব্রতার গৃহ ছিল না, পরিবার-পরিজন ছিল না; বিরাট্ প্লাবনের ঘূর্ণাবর্ত্তে সব চুরমার হয়ে গেছে।

এই কঠোর কর্ম্মমুখর রুক্ষ জীবনের আকাশতলে বিশুদ্ধ স্নেহ-ভালবাসার স্নিগ্ধ প্রশান্তি নিয়ে দাঁড়াল অরুণ। সুব্রতার জীবনে ইহা এক পরম আশীর্ব্বাদ। তার প্রসারিত দক্ষিণ হস্ত কখন যে সুব্রতা গ্রহণ করেছে নিজেই তা জানতে পারে নি। হয়ত তার অবচেতন মনে অরুণের জন্য পাতা ছিল আসন; বাল্য কৈশোরের স্বপ্নময় স্মৃতির মোহন-কাঠির স্পর্শে অন্তরের মণিকোঠার খুলে গিয়েছে দ্বার।

এই ক-দিন তারা দু-জনে কর্ণফুলীর তীরে, পতাঙ্গার সমুদ্র-সৈকতে, রেল-অঞ্চলের তরুছায়াঘন নির্জ্জন পথে, পরস্পরের সান্নিধ্যে স্বপ্ন রচনা করেছে। উদার আকাশ, মায়াময় পৃথিবী রূপরসগন্ধবর্ণে সুব্রতাকে তার অপরিচিত এক স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে; তার জীবনে এসেছে যে রসঘন নূতন পরিবেশ, তার সৌন্দর্য্য-সমারোহে সে আত্মবিস্মৃত। তার প্রতিদিনকার জীবন যেন ঐ দিগন্ত-বিস্তারী আকাশের উপুড়-করা নীলকান্তমণির পেয়ালার অফুরন্ত সুধাস্রোতে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে আছে। তার বাইরে রইল সুব্রতার অতীত জীবন, আর সমস্ত পৃথিবীর আর সবই।

পাতালপুরীর বন্দিনী রাজকন্যা জীয়নকাঠির স্পর্শে জেগে উঠে বিস্ময়-বিস্ফারিত কমলনয়ন মেলে আকাশ ও ধরণীকে নিরীক্ষণ করছে।

অরুণের ছুটি শেষ হয়ে গেলে আবার ছুটি চেয়ে পাঠালে। সুব্রতাকে না নিয়ে সে ফিরতে চায় না। যে কথাটি ওর মনের মাঝে অসংখ্য বার গুঞ্জরণ তুলে ফিরছে, তাকে সে একটি বারও প্রকাশ করতে পারলে না। বলতে পারলে না—"সুব্রতা, চল একত্রে আমরা ঘর বাঁধি। সংশয়ের দোলা ওর মনকে ছাড়তে চায় না। বন্য হরিণী হঠাৎ পোষ মেনেছে বটে, কিন্তু ওর কানে অরণ্যের ডাক এসে পৌঁছতে কতক্ষণ।

অরুণ তার গভীর ভালবাসার কথা প্রকাশ করতে পারে না; সুব্রতার মুখের দিকে চেয়ে তার মনে হয়, এই অপাপবিদ্ধার মনে লাগবে অশুচিতার ছোঁয়াচ তার প্রেমনিবেদনে।

ঐ কয় দিনে সুব্রতার চোখের দৃষ্টি আরও কাল, আরও ভাবময় হয়ে উঠেছে; ওর রুক্ষশ্রী ক্রমে লাবণ্যরেখায় তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে। অরুণের চোখের সামনে এ যেন কমল-কলির ক্রমপ্রস্ফুটন। অরুণের মন ভ্রমরের মত সেই অর্দ্ধস্ফুট কমল-কলিকাটিকে ঘিরে গুঞ্জরণ করে বেড়ায়; অনুভব করে ও যেন ফুটছে তারই ছোঁয়ায়—তারই অন্তরা-বেগের উত্তাপে। নিজেকে ধন্য মনে করে।

প্রতিটি অপরাহ্নে তারা একত্র বেড়ায়। কোন দিন বেছে নেয় শহরপ্রান্তের নির্জ্জন গ্রাম্য পথ; চিরপুরাতন আকাশ ও পৃথিবী দু-জনের চোখে নূতন হয়ে ওঠে। অরুণ বলে তার প্রবাস-জীবনের গল্প, সুব্রতার মন তার সঙ্গে সঙ্গে সুদূর সিন্ধুপারের অজানা দেশে ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের পায়ে চলা পথে আম, জাম, নারিকেল, সুপারি গাছের ছায়ায় ছায়ায়, পড়োবাড়ী বোজা পুকুরের ধারে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে সদ্যপ্রবাস-প্রত্যাগত অরুণের মন বাংলার পল্লীকে যেন নূতন করে পায়। তারই মাঝে সুব্রতার উপস্থিতি এই নব-পরিচিতিকে কি মহান্ মাধুর্য্যে যে মণ্ডিত করে তোলে অরুণ নিজেই বিস্মিত হয়।

তার মনে হয় সার্থক হয়েছে তার দেশে আসা; কর্ম্ম-মুখর কঠোর জীবনসংগ্রামে উত্তপ্ত রুক্ষ দিনগুলির পর এ যেন মুক্তিস্নান। কোন দায়িত্ব নাই, কোন সংগ্রামের স্পর্শ নাই, দিনগুলি আসছে আর ভেসে যাচ্ছে নিস্তরঙ্গ নদীর বুকে রঙীন পালতোলা নৌকার মতন। তার মাঝে প্রতিটি দিন সুধায় ভরে দিয়েছে সুব্রতার সাহচর্য্য। প্রতিটি প্রহর যেন ওর অগণিত কথা ও হাসির সুর-মাধুর্য্যে ভরা।

স্বল্পবাক্ অরুণ সুব্রতাকে কি ব'লে ধন্যবাদ জানাবে ভাষা খুঁজে পায় না; কিছুই বলা হয় না। চলতে চলতে কোন সময় ওর একখানা হাত নিজের মুঠির মধ্যে তুলে ধরে কোমল সুগৌর দীর্ঘায়ত অঙ্গুলি ও তার রক্তাভ নখ-কণার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকায়; সুব্রতার হাতের মৃদু কম্পন ওর রক্তে চাঞ্চল্য আনে; হাত ছেড়ে দেবার পরও অনেকক্ষণ তার উত্তপ্ত স্পর্শ যেন সে অনুভব করে।

কোন দিন বেড়িয়ে ফিরবার পথে সুব্রতা অরুণের নন্দন-কাননের দোতলা বাড়ীর নীচের ঘরটিতে এসে বসে। কোন দিন অরুণের মার সঙ্গে দেখা করতে যায়, কোন দিন যায় না। এমনই বিনা কারণে শুধু ব'সে থাকা শিথিল শ্রান্ত ভঙ্গীতে, মাঝে মাঝে দু-একটি কথা বলা অরুণের মনকে বিশেষ ভাবে স্পর্শ করে। সুব্রতা যখন চলে যায় তার বহুক্ষণ পরও অরুণের মনে হয়,—ওর চোখের চাউনি, কথার সুর ও দেহের সৌরভ ছড়িয়ে আছে সারা ঘরময়; একটা মৃদু উষ্ণতাও যেন রেখে গেছে ঘরের পরিবেশে।

বাড়ীর সম্মুখের ছোট বাগানটিতে কোন কোন দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অরুণ স্বপ্নাবিষ্টের মত ঘুরে বেড়ায়। কি ক'রে সুব্রতাকে সে পেতে পারে, তাকে সুখী করতে পারে তাই অনেকক্ষণ ভাবে। যে রাজনৈতিক আবহাওয়ায় সুব্রতা মানুষ হয়েছে তার থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দূরে সরিয়ে নিতে না পারলে সুব্রতাকে নিজের ক'রে পাওয়া কঠিন; যে-কোন মুহূর্ত্তে সে হারিয়ে যেতে পারে অরুণের জগৎ থেকে।

কি ক'রে এই সরিয়ে নেবার কথাটা বলা যায় অরুণ ভেবে পায় না; সংশয় আজও গেল না, সময় এসেছে কি না

বুঝতে পারে না, অসময়ে নিজের চঞ্চলতায়—সব-কিছু ঘুলিয়ে দেয়, এই তার ভয়। সুব্রতার সরল স্নিগ্ধ চাউনির অন্তরালে যে সম্ভ্রমপূর্ণ বিশ্বাস স্পষ্ট অনুভব করেছে তাকেই তার ভয়। ঐ সম্ভ্রম-শ্রদ্ধার পরিমণ্ডলে অবস্থান ক'রে সে নিজেকে স্পষ্ট ব্যক্ত করতে পারে না। তৃণশীর্ষে দোলায়মান কুয়াশার সূক্ষ্মজালে রবিরশ্মি যে বর্ণচ্ছত্র রচনা করেছে তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করার মত ভ্রম যেন তার না হয়।

এক দিন কৈবল্যধামের পাহাড়ের উপর অরুণ ও সুব্রতা বসেছে একটি পত্রবহুল ইউক্যালিপ্টাস গাছের তলায়। সম্মুখে অর্দ্ধবলয়াকৃতি সমুদ্র-মেখলায় সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। শহরের জনকোলাহল থেকে বহু দূরে এই শান্ত নির্জ্জন মন্দির-প্রাঙ্গণের স্নিগ্ধ আবেষ্টনীতে সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটায় ও পরস্পরের নির্জ্জন সান্নিধ্যে দু-জনের মনই আবেশমুগ্ধ হয়ে রয়েছে।

অরুণ সুব্রতার একখানি হাত কোলের উপর তুলে নিলে, বললে, "সুবি, মাকে নিয়ে কাল আমি যাচ্ছি, তুমি আমার ওখানে থাকবে চলো। তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না।" গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসে পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশের যে অংশটুকু সুব্রতা অনেকক্ষণ ধরে দেখছিল, সেদিকে অর্দ্ধনিমীলিত দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বললে, "যাবো।"

এর পর অরুণ আর বলার কিছু খুঁজে পেলে না, সুব্রতার হাতখানা একবার তার মুখের উপর বুলালো। তার মনের কথা প্রকাশ পেল কি না—সুব্রতাই বা কি বুঝল সে ঠিক ক'রে উঠতে পারল না। তবু সুব্রতার স্থির-সমাহিত ভাবমুগ্ধতার পরিবেশকে তার ব্যক্তিগত সুখ-লিপ্সার অভিব্যক্তিতে নষ্ট ক'রে দিতে অরুণের বাধল। সুব্রতার অপলক চাউনিতে, গালে কপালে উড়ে-পড়া চূর্ণ অলকে সূর্য্যাস্তের রক্তাভা এমন একটা সুদূরতা এনে দিয়েছে যা এই সমুদ্র আকাশ ও বনপ্রকৃতির সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গেছে যে অরুণ এই মেয়েটিকে তার দৈনন্দিন জীবনের কোলাহলের বাস্তবতার মাঝে পাবার কল্পনাকে জোর ক'রে যেন নিজের মনে স্থান দিতে পারল না।

তারা যখন ফিরে এল, সুব্রতা গেল অরুণের মার কাছে রান্নাঘরে। বললে, "আমি তোমাদের সঙ্গে লাহোর যাচ্ছি মাসিমা।" অরুণের মা খুব আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, "চল, ওদেশের জলবায়ু খুব ভাল রে, দিনকতক ওখানে থাকলে শরীর তোর খুব ভাল হবে।"

সুব্রতা বালিকার মত হেসে বললে, "কি যে বলো মাসিমা, শরীর আমার খারাপ কিসে। তা ছাড়া আমি যেচে বললাম যাব—তুমি বলছ দিনকয়েক থাকতে, আমি কিন্তু অ-নে-ক দিন থাকব।"

অরুণের মা হেসে বললেন, "শোন পাগলীর কথা, থাকবি যত দিন খুশী তোর। কত বার তোকে আমার কাছে থাকতে বলেছি তুই শুনিস নি।"

সুব্রতা বললে, "থাকবই ত। অনেক বার বলেছ ত কি হয়েছে। আজ কেন বলছ না—সুবি, তুই আমার কাছে বরাবর থাক। আমি কিন্তু রান্না জানি না বাপু, ও সব হাঙ্গামা আমি কোনদিন পারব না। চিরকাল তোমাকে জ্বালাতন করব।"

অরুণের মা জোরে হেসে বললেন, "এইটুকুই ত আমি ক'দিন থেকে ঠাকুরের কাছে চাইছি রে; এত দিনে তোর সময় হ'ল মা?" তিনি ওর চিবুকে হাত দিতেই সুব্রতা লঘুপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অরুণের মা হেসে ডাকলেন, "ওরে সুবি শোন্ শোন্।" সুব্রতা ততক্ষণে বারান্দা ও উঠান পেরিয়ে পালিয়েছে।

অরুণ সব শুনল; পলায়নরতা সুব্রতার চোখ-মুখের একটা আনন্দোচ্ছল চপলতা ও চলনভঙ্গীর লঘুতা তাকে জানিয়ে দিল—তার না-বলা অনেক কথাই সুব্রতার মনে পৌঁছেছে; মঞ্জুর হয়েছে তার অন্তরের আবেদন।

ম্লান জ্যোৎস্নায় তার ঘরের সম্মুখের ছোট বাগানে যখন সে এসে দাঁড়াল, তার মনে হ'ল—কি সুন্দর এ পৃথিবী, কি সুন্দর শুধু বেঁচে থাকা; সুব্রতাকে সে পেয়েছে যে সুব্রতাকে সে ভালবাসে যে সুব্রতাকে সে চায়। ইচ্ছা হ'ল সকলকে ডেকে বলে, "শোনো তোমরা, আমার সুব্রতাকে আমি আজ পেলাম। ধন্য হয়েছে আমার প্রেম।"

সেই রাত্রে শোবার আগে সুব্রতা তার জানালায় এসে দাঁড়াল। তার মনে হ'ল সার্থক হ'ল তার জীবন এত দিনে; কি মহামূল্য জিনিস যেন সে পেয়েছে। একই আকাশের তলায় এমন অস্পষ্ট জ্যোৎস্না-ম্লান একই পৃথিবীতে সে আর অরুণ—এ যেন অভিনব সমাবেশ। পরম অভাবনীয় যেন আপনা হ'তে বিনা সাধনায় এসে ধরা দিল। তার এত দিনের কর্ম্মব্যস্ত জীবন যেন একান্ত তুচ্ছ হয়ে মিলিয়ে গেল, এক নূতন অভিনব মাধুর্য্যপূর্ণ পৃথিবীতে সে প্রথম পা দিল আজ, সে পৃথিবীতে আর সমস্ত আচ্ছন্ন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে তার অরুণ। যে দুটি সবুজ কাঁঠালী চাঁপাফুল অরুণ তার

খোঁপায় গুঁজে দিয়েছিল সে ফুটিকে সে বার-বার তার গালে মুখে বুলাতে লাগল—কত অমৃতময় অনুক্ত বাণী ওদের পাপড়ির অভ্যন্তরে ওরা বয়ে এনেছে যেন; কোন অমৃতলোকের আহ্বান ওদের সৌরভে।

প্রেমের দেবতার অমূল্য মণির ভাণ্ডারে নিষ্পাপ কুমারীর প্রথম ভালবাসার প্রগাঢ় প্রেমানুভূতির আর একটি বিনিদ্র রজনী সঞ্চিত হয়ে রইল।

লাহোরে অরুণের বাড়ী, গাড়ী ও অন্যান্য ঐশ্বর্য্যে সুব্রতা খানিকটা বিস্মিত হ'ল। উষর দেশে যেখানে সবুজ শ্রীর খুবই অভাব তারই মাঝে অরুণ যে লন্ করেছে তা যেন সবুজ পুরু গালিচায় মোড়া। মাটি-খুঁড়ে-বাঁধানো চৌবাচ্চায় ফুটেছে পদ্ম; তারই পাশে নাম-না-জানা অজস্র রঙীন ফুলে ভরা লতার কুঞ্জ, বাগানে অজস্র ফুল। ছাদে মাটি দিয়ে যে বাগান করা হয়েছে সুব্রতার চোখে তা অভিনব।

অরুণের বাগানের ফুল ও পাতার এত বিভিন্ন রকম সমাবেশ সুব্রতাকে মুগ্ধ করল। অভিজাত পাড়ায়, উচ্চ-শিক্ষিত সমাজে এই সুন্দর বাড়ীতে আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে তার জীবন কাটবে—এ যেন তার কাছে একান্ত অপ্রত্যাশিত।

এক দিন সে অরুণকে বললে, "অনেক কষ্ট করে স্বনির্ভরতার মধ্য দিয়ে অনেক দুঃখ পেরিয়ে তোমাকে সংসারে কৃতকার্য্য হ'তে হয়েছে। বড়দার মুখে আমরা অনেক শুনেছি। তোমার দুর্দ্দিনে আমি কোন দিন তোমার কিছু করতে পারি নি, সেই জীবনের সঙ্গে আমাদের কোন সংযোগ ছিল না। আজ তোমার ঐশ্বর্য্যের মাঝে হঠাৎ এসে তাতে ভাগ বসাতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে।"

অরুণ হাসলে, বললে, "এখন শুধু তোমার উপস্থিতি দিয়ে আমার সব কিছুই তুমি সার্থক করে তোলো।"

কিন্তু দিনকয়েকের মধ্যে সুব্রতা আবিষ্কার করলে শুধু অরুণ এবং তার সুরুচিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যই যে আছে তা নয়; এখানে বহির্জগতও একটা আছে, যা একান্ত রূঢ়ভাবে গায়ে এসে বাজে সেটা হ'ল এক কথায় সোসাইটি।

অরুণের বন্ধুমহলে বিলাত-ফেরত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বা বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যবসায়ীর সংখ্যাই বেশী, মহিলারাও আধুনিকা।

ওদের শিষ্টাচার ও সৌজন্য নিখুঁত। আদব-কায়দা, আলাপ-আলোচনা সবই সুরুচিপূর্ণ। তবু সুব্রতার মনে হয়—সে এক নূতন জগতে এসে পড়েছে। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট, লীগ অব নেশনস্ বা গোল্ড ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সমস্যার সমালোচনায় ওদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও গভীর জ্ঞান স্পষ্ট প্রকাশ পায়। ইংরেজী ও কণ্টিনেণ্টাল সাহিত্যে ওদের সত্যিকারের বিদ্যাবত্তার পরিচয়ও সে পেয়েছে। প্রতিদিনই তার মনে হয় এদের সাহচর্য্যে তার চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ ঘটছে। অরুণের কথামত এখানকার কলেজে পড়বে কি না সে ভাবে।

তবু কোন কোন দিন গভীর রাত্রে ওদের আলাপ-আলোচনা থেকে টুকরো টুকরো অংশগুলি নিয়ে সুব্রতা যখন চিন্তা করে, তখন মনে হয় সে যেন ভারতবর্ষের বাইরে চলে এসেছে। বেশভূষা, আদব-কায়দা, এমন কি খাওয়া থাকা সবই ইংরেজী ধরণে। ভাষা ইংরেজী। হিন্দী উর্দ্দু বা বাংলা যেখানে চলতে পারে সেখানেও ইংরেজীর প্রাধান্য। অবশ্য বহু দিনের চর্চ্চায় সবই সহজ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে; শিক্ষা ও সুরুচির জন্য কোথাও কোন অশোভন কিছু নেই, কোন উগ্রতা নেই। বৈদেশিকতাকে এরা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে এমন সহজ ভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছে যে সুব্রতা অবাক্ হয়। এরা যে তার স্বদেশবাসী, সুব্রতা অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করে নিতে পারে না। এত আলাপ-আলোচনার মধ্যে ভারতবর্ষের কোন সমস্যা কদাচ স্থান পায় এবং তা খুবই সংক্ষিপ্ত। রাজনৈতিক আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ দেশে ওরা সামান্য দু-একটি কথায় আলোচনা শেষ ক'রে দেয়। মন তাদের বহির্মুখী; দৃষ্টি য়ুরোপ আমেরিকায় নিবদ্ধ। আন্তর্জাতিকতায় মন এমন আচ্ছন্ন যে স্বদেশ বলে কিছু ওরা বোধ হয় অনুভব করতে পারে না, সুব্রতা অন্ততঃ তাই মনে করে। সুব্রতার স্বাদেশিকতার ইতিহাসে ওরা শুধু স্নেহমিশ্রিত অনুকম্পা প্রকাশ করেছে। ছেলেমানুষী ছাড়া কিছুই এর মধ্যে তারা খুঁজে পায় নি। তবু ভদ্রতা করে অনেক স্তুতিবাদ করেছে।

দেশের জাতি ধর্ম্ম সমাজের বন্ধন এদের নাই, নিজেদের গণ্ডীর 'সোসাইটিই এদের সমাজ'। দেশের মাটিতে বাস করেও দেশের কোন সুখ দুঃখ কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা এদের মনকে স্পর্শ করতে পারে না। এদের জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যাবত্তা ও অন্যান্য নানা গুণ সত্ত্বেও সুব্রতা কিছুতেই এদেরকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তার মনে হয়, পশ্চিমের উজ্জ্বলতা এদের চোখে এত ধাঁধা লাগিয়েছে যে তাদের দৃষ্টিতে তাদের স্বদেশ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অরুণের আন্তর্জাতিক অভিমতগুলো সুব্রতা সমালোচনা করে, কিছুতেই স্বীকার ক'রে উঠতে পারে না।

চারি দিকের অজস্র ঐশ্বর্য্য, পার্টি ডিনার নাচগান প্রভৃতি নানা মনোমুগ্ধকর আয়োজন ও অরুণের গভীর আন্তরিক ভালবাসার আবেষ্টনী অতিক্রম ক'রে গভীর রাত্রে সুব্রতার 'দীনা ভারতমাতা' ও তার কোটি কোটি সন্তানের বেদনার ক্ষীণতম আভাস সুব্রতার মধ্যে মোহাচ্ছন্ন স্বেচ্ছা-সেবিকার কাছে এসে যেন পৌঁছায়। কোথায় যেন বাজে অস্পষ্ট ব্যথা; কি যেন কোথায় হারিয়েছে সুব্রতা বুঝতে পারে না। সারাদিনের নানা রকমের আনন্দ-কোলাহলে মগ্ন থেকে রাত্রির বিজন গভীরতায় একটা ক্ষীণ বেদনার আভাসে মন ভার হয়ে আসে। অতি প্রিয়জনের অনুপস্থিতির ব্যথার মত যাতে সারাদিনে কত বার মনে হয় কি যেন নেই, অথচ কি সেটা তা স্পষ্ট অনুভূত হয় না। সংলের নানা আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কোন-না-কোন কথার ইঙ্গিতে—তার অবচেতন মনে তার হারানো স্বাদেশিকতার জন্য মমতা জমা হয়ে ওঠে নিজের অজ্ঞাতে। রাত্রির নির্জ্জনতায় তন্দ্রাচ্ছন্ন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সুব্রতার মনে হয় কোথায় যেন কি ত্রুটি ঘটেছে, কি একটা অসম্পূর্ণতা নিজের মাঝে সে খুঁজে বেড়ায়।

অরুণ স্নেহ-মমতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে সুব্রতাকে মুগ্ধ কৃতার্থ ক'রে রাখে। সুব্রতার ঘরখানার আধুনিক সাজসজ্জা অনিন্দ্য রুচির পরিচয় দেয়। সুব্রতার জন্য একটি ঝি ও 'বয়' রাখা হয়েছে, কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই যার ফাঁক দিয়ে বিষণ্ণতা মনকে স্পর্শ করতে পারে। তার প্রাণের মধ্যে যে উজ্জ্বলতা, যে সঙ্গীত, যে সৌন্দর্য্য ও কোমল তারুণ্য অরুণ এনে দিয়েছে তার জন্য সুব্রতা কৃতার্থ।

তবু কেন রাত্রির পুষ্পগন্ধঘন নিবিড় অন্ধকারে তার জাগরণ ও সুপ্তির প্রত্যন্ত প্রদেশে একটা অনির্দ্দিষ্ট বেদনা ঘুরে বেড়ায়? সুব্রতা তাকে অস্পষ্ট অনুভব করে কিন্তু আয়ত্ত করতে পারে না।

'সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট' ও 'ষ্টেটস্‌ম্যান' অরুণের বন্ধুচক্রে প্রধান সংবাদপত্র। সুব্রতা অনেক চেষ্টা ক'রেও তাতে মনঃসংযোগ করতে পারে না। ট্রিবিয়ুনের দু-একটা হেডলাইনে কোন রাজনৈতিক সংবাদ হঠাৎ যেন সুব্রতাকে নাড়া দিয়ে যায়। তাকে মনে করিয়ে দেয় ভারতের ভিতরেই তারা আছে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও কোন কোন স্বাদেশিকতার খবরে সুব্রতার মন অল্পক্ষণের জন্য যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

প্রাত্যহিক সান্ধ্য বৈঠকে রাজনৈতিক আলোচনা যখনই উঠে—অরুণ সুব্রতার মাঝে ইদানীং একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে। সুব্রতা কোন আলোচনায় যোগ দেয় না, তবু অরুণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এটা ধরা পড়ে। সুব্রতার চোখের তারা তেমনি নীল ও তেমনি দীর্ঘ ঘনপক্ষ্মঢাকা, তবু তার দৃষ্টির আবিষ্টতা যেন আর তেমন নিরবচ্ছিন্ন নয়; হঠাৎ কোন কোন কথায় চাউনি যেন উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ সন্ধানী হয়ে ওঠে, একটা অস্পষ্ট অস্থিরতা প্রকাশ পায়। কংগ্রেস ও বিপ্লবান্দোলনের অনিবার্য্য ব্যর্থতার সম্বন্ধে সান্ধ্য বৈঠক যখন সহজেই একমত হয়, তখন সুব্রতার ক্ষীণদীর্ঘ দেহ যেন রেখায় রেখায় কঠিন হয়ে ওঠে, মুখের প্রত্যেক রেখাটি যেন হঠাৎ তাদের কোমলতা হারায়, দৃষ্টিতে ও দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধরে যেন একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ফুটে ওঠে। কিন্তু সে সাময়িক, আবার সহজ হয়ে আসে সবই। তবু অরুণ ভয় পায়, জোর ক'রে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে।

স্নেহাশ্রয়মুগ্ধা বন্দিনী বনহরিণীর কর্ণে অরণ্যের আহ্বান এসে পৌঁছাল কি? অরুণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। বৈঠক অন্যের বাড়ীতে বসাতে চেষ্টা করে—কখনও ভাবে সুব্রতাকে এই সংসর্গ থেকে বহু দূরে কোথাও লুকিয়ে রাখে; দেশসেবিকা সুব্রতাকে সে সঞ্জীবিত হ'তে দিতে পারে না। তার সুব্রতাকে সে কিছুতেই হারাতে চায় না। এই আদর্শের সংঘাত থেকে কি ক'রে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে ভেবে অরুণ ব্যাকুল হয়।

অরুণের মা পঞ্জিকায় শুভদিনের নির্ঘণ্টে দিন খুঁজেন। সুব্রতা তার প্রশ্নের উত্তরে সলজ্জ হাসিতে বলে, "বেশ ত, তোমার যা খুশী।" অরুণ কিন্তু এতেও ভরসা পায় না। রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কত দিনই বা রাখা চলবে? সুব্রতার মন স্বভাবতঃ সজাগ ও স্পর্শচেতন; এই সাময়িক ভাবমুগ্ধতার আচ্ছন্নতা যে-কোন মুহূর্ত্তে কোন সামান্য আঘাতেই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। তার পর স্বাভাবিক চিন্তা-ভাবনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ওদের মনে যে-কোন দিন গভীর অন্তরাল সৃষ্টি করতে পারে; এই আশঙ্কা অরুণকে পীড়িত ক'রে তুললে। সুব্রতাকে সে হারাতে পারে না। সুব্রতার সুকুমার মনের স্পর্শে যে গভীর প্রেম জন্মলাভ করেছে, অরুণের মনে সে এনেছে এক বিচিত্র বিপর্য্যয়; সেই প্রেমের আলোয় এতদিনকার পুরনো পৃথিবী আজ হয়েছে স্বপ্নরঙীন, দীপ্ত হয়ে উঠেছে তার মানসলোক সেই আলোকের ধারায়। তার কর্ম্মমুখর কঠোর জীবনে এই প্রেম যেন রাত্রিশেষে অরুণবরণা উষার সৌন্দর্য্যময় সুকুমার আবির্ভাব।

অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাদেশিকতার দৃষ্টিভঙ্গী সুব্রতা ও তার মাঝে এক পুরু পর্দার মত দুইটি মনকে কি চিরকাল-বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখবে না?

অরুণ যত ভাবে তত চঞ্চল হয়; অজস্র স্নেহ-মমতায় সুব্রতাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখতে প্রয়াস পায়।

দোতলার বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে ভোরের অস্পষ্ট আলোয় জনহীন শান্ত রাজপথের দিকে চেয়ে সদ্যোত্থিতা সুব্রতা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

বহুদূর থেকে 'প্রভাত ফেরী'র সঙ্গীতের অস্পষ্ট ধ্বনি এসে পৌঁছল, সুব্রতা উৎকর্ণ হয়ে উঠল। ভাষা অজানা, বাণী অস্পষ্ট, তবু এই জাগরণী গানে স্বাদেশিকতার বহু-পরিচিত সুর।

কিছুক্ষণ পর একটি ক্ষুদ্র মিছিল এসে পৌঁছল, জন-কয়েক পুরুষ ও মেয়ে গান গেয়ে চলেছে, তাদের পেছনে এক দল স্বেচ্ছাসেবিকা; ত্রিবর্ণ কংগ্রেস-পতাকা উড়ছে।

অরুণ তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সুব্রতার পাশে দাঁড়িয়েছে। সুব্রতা জিজ্ঞাসা করলে "ওরা যাচ্ছে কোথায়?" "ষ্টেশনে।" "কেন?"

"ওরা যাবে অমৃতসর জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। ক'দিন ধরে রোজ যাচ্ছে; সন্ধ্যায় ফিরবে।"

সুব্রতা যেন স্বপ্ন দেখছে, লক্ষ্যহীন দৃষ্টি, নিজের মধ্যে যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অন্যমনস্ক সুব্রতার মুখে-চোখে সারাদিন এক চাঞ্চল্য ও বেদনার আভাস লক্ষ্য ক'রে অরুণ ক্ষুব্ধ হ'ল।

সন্ধ্যায় জাতীয় সঙ্গীত শুনে আবার ওরা বারান্দায় দাঁড়াল। ভোরের সেই মিছিল ফিরছে। খোলা গাড়ীতে জনকয়েক স্বেচ্ছাসেবিকা, কারোর মাথায় কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে আহতদের সংখ্যা বেশী; একজনের কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, এক চোখের চারদিক ফুলে চোখ বন্ধ হয়ে গেছে, একখানা হাতে স্লিট বাঁধা ও গলার সঙ্গে হাত ঝুলানো। ধীরে ধীরে মিছিল চলে গেল।

অরুণ সুব্রতার একখানা হাত মুঠোর মধ্যে তুলে বললে, "সুব্রতা এটা ভুল পথ, দিনের পর দিন এই যে শারীরিক নির্যাতন ওরা সইছে তা সম্পূর্ণ নিরর্থক। সামান্য ক'জন মাত্র ফিরে এল। কেউ গেছে জেলে, কেউ বা হাসপাতালে; কেউ মরেছে শুনলে আশ্চর্য্য হব না। এই আত্মনির্যাতনের ভিতর দিয়ে ওদের দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু দেশের মুক্তি এই পথে আসতে পারে না। বৃহত্তর ক্ষেত্রে কেন্দ্রিক সমস্যাগুলিকে যদি গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বুঝাপড়া ক'রে নেওয়া যায় তাহলে এই ক্ষুদ্র সমস্যাগুলি আপনিই লোপ পায়। এত রক্তপাতের প্রয়োজন হয় না। তোমার সহানুভূতি এই আন্দোলনের দিকে, তাই তোমাকে বলছি—এটা ঠিক পথ নয়—এই স্বাদেশিকতার ভিত্তি সঙ্কীর্ণ, এরই শাখা কম্যুনিজম।

সুব্রতা শুধু বললে, "ভবিষ্যৎ বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য এতে দেশের "ম্যরাল" (morale) উন্নত স্তরে গড়ে উঠছে; বৃহত্তরের জন্য এই প্রস্তুতি।"

অরুণ সুব্রতার হাতে চাপ দিয়ে বললে, "সুবি, মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্র ছেলেদের সঙ্গে নয়; রাজনীতির চেয়ে সমাজনীতিই মেয়েদের যোগ্যতর ক্ষেত্র। একটা সংসার তোমরা প্রত্যেকে গড়ে তুলতে পাও; দেশের, জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের গড়ে তোলা তোমাদের হাতে; তোমরা যদি বাইরে দাড়াও ও কাজগুলো করবে কে? একটা জাতির কালচার তোমরাই ভবিষ্যগামীদের হাতে তুলে দেবে।"

সুব্রতা উত্তর দিল না—অরুণের কাঁধে মাথা হেলান দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

সুব্রতার বর্ত্তমান জীবনের সঙ্গে তার আদর্শ জীবনের যে সংঘাত বেধেছে, তা রাত্রে আবার তীব্র হয়ে দেখা দিলে।

অনেক রাত্রে যখন জনকোলাহল সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে, বাইরের দিগন্তপ্লাবিত জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে সুব্রতা রবীন্দ্রনাথের একখানা কাব্যগ্রন্থ অন্যমনস্ক-ভাবে খুললে। বহুদিনের মধ্যে বইখানাতে হাত দেয় নি, খুলতেই চোখে পড়ল একখানা চিঠি। যেদিন তারা চট্টগ্রামের আশ্রমে বসেছিল সেই সন্ধ্যায় ওদের পাড়ার একটি ছেলে অরুণের কাছে চিঠিখানা দেয়—সুব্রতার চিঠি। সুব্রতা সেদিন একবার শুধু চোখ বুলিয়ে চিঠিখানা হাতের বইয়ের ভিতর রেখে দেয়। আবেশ-মুগ্ধতার জন্য চিঠির ভাষা তার মন স্পর্শ করে নি। লিখেছে এক স্বেচ্ছা-সেবিকা বান্ধবী: "তোমার কাছে আমরা অনেক কিছু আশা করেছিলাম, কিন্তু চোখের সামনে তোমার শোচনীয় মানসিক মৃত্যু দেখবার দুর্ভাগ্য আমাদের হ'ল।"

মানসিক মৃত্যু! সত্যই ত! আদর্শবিচ্যুত, কর্ম্মহীন, আলস্য-মুগ্ধ জীবন। সত্যই ত তার দলের কাছে সে আজ মৃত, দেশের কাছে সে আজ হারানো সন্তান! অরুণের দেশ-জাতি-সমাজহীন বন্ধুচক্রের আবেষ্টনীই কি তার প্রকৃত স্থান? এই আদর্শচ্যুতিই কি তার পতন

নয়? "মা বোন, তোমরাও এসো" দেশ-নায়কের এই আহ্বান—অন্য দিকে অরুণের যুক্তি; কোন্‌টি সত্য? কোন্‌টি গ্রহণীয়?

যে-ব্যথা এত কাল অজানা ও অস্পষ্ট ছিল, রাত্রির অন্ধকারে তার তন্দ্রাচ্ছন্ন অসতর্ক অবসরে মনের গভীরতায় সঞ্চরণ ক'রে বেড়াত, সে আজ সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। তারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুব্রতা অন্তর্গূঢ় মানসিক দ্বন্দ্বে নিজকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুললে।

পরদিন ভোরে বারান্দায় সুব্রতা ও অরুণ দাঁড়িয়েছে; জাগরণ-ক্লান্ত সুব্রতার বিশুষ্ক মুখে বিবর্ণতা সুস্পষ্ট। দাঁড়িয়েছে স্বেচ্ছাসেবক মিছিলের আগমনের প্রতীক্ষায়। সম্মুখে অরুণোদয়। অন্ধকার ভেদ ক'রে আলোর দেবতার রথ এসে পৌঁছেছে প্রায়। বিকাশোন্মুখ, রাগরক্ত বর্ণচ্ছটার আভাস দিগন্তে এক মহান্ সম্ভাবনার সূচনা করেছে।

অনেকক্ষণ পরে মিছিল এসে পৌঁছল; আজ লোক খুবই কম। এই ক'দিনের ধরপাকড়ে স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা কমে গেছে। অরুণ বললে, "রোজই সংখ্যা কমছে, শারীরিক উৎপীড়নের ভয়ে দ্বিধাগ্রস্ত যারা ছিল তারা বোধ হয় সরে পড়েছে।" ওদের বাড়ীর নীচে এসে সকলে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ক'রে উঠল।

সুব্রতা চঞ্চল হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে বললে, "আমি যাই", তার পর পাতলা খদ্দরের চাদরখানার লুণ্ঠিত অংশ টেনে নিয়ে দ্রুতপদে নীচে চলল। অরুণ হাত বাড়িয়ে পথ আগলালে, "কোথায় যাচ্ছ সুব্রতা!" সুব্রতা আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, "যেতে দাও, আমায় যেতে দাও।" অরুণ হাত গুটিয়ে নিলে, সুব্রতা ছুটে নীচে মিছিলের সঙ্গে মিশে গেল।

একটু পরে অরুণ তার গাড়ী হাঁকিয়ে মিছিলকে এসে ধরল এক পথের মোড়ে। গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে ডাকলে—"সুব্রতা, ফিরে এসো।" সুব্রতা মিছিলের সর্ব্বাগ্রে দু-হাতে দুটি সম্পূর্ণ অপরিচিতা স্বেচ্ছাসেবিকার হাত ধরে জোরে এগিয়ে চলেছে; তার দৃষ্টি স্বপ্নময়, সামনের সব-কিছু ভেদ ক'রে, সে দৃষ্টি কোন্ সুদূর পানে নিবদ্ধ। হাওয়াতে অগোছালো চুল কপালের উপর উড়ছে, জাগরণ-ক্লিষ্ট বিশুষ্ক মুখে এক অপূর্ব্ব ভাবোন্মাদনা; অরুণের আহ্বান সে শুনতে পেলে কি না বুঝা গেল না।

অরুণ মিছিলের সঙ্গে এগিয়ে চলল; কিন্তু অনেক ডাকেও সুব্রতা ফিরল না। একবার অরুণের দিকে চাইল, কিন্তু অরুণ বুঝল সে চোখে দৃষ্টি নেই, অন্ততঃ অরুণকে দেখবার মত নয়। এ যেন নিশি-পাওয়া। এই দীর্ঘচ্ছন্দা ক্ষীণাঙ্গী তরুণীর স্বপ্নাচ্ছন্ন রূপ অরুণকে বিস্মিত করলে।

অরুণের মনে হ'ল মিথ্যা একে অনুসরণ করা, মিথ্যা একে স্নেহের বন্ধনে বাঁধবার প্রয়াস। আসক্তিবিহীনা এই চির-পলাতকা তার জীবন থেকে আজ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হ'ল। গভীর বেদনায় মুহ্যমান অরুণের চোখে অরুণা-লোকিত আকাশ ও পৃথিবী বিবর্ণ হয়ে গেল।

সুব্রতার শয়নকক্ষে অরুণ আজ প্রথম প্রবেশ করলে। বিছানায় বালিশে সুব্রতার সদ্য-শয্যাত্যাগের চিহ্ন সুস্পষ্ট। ঘরের বাতাসে এক ক্ষীণ সৌরভ, এক মৃদু উষ্ণতা।

দেয়ালে মোনালিসার ছবির পাশে মহাত্মাজীর ডাণ্ডি-অভিযানের দণ্ডধর মূর্ত্তি। অতি সস্তা ছবি, কাল বিকালে এক পানের দোকান থেকে সুব্রতা আনিয়েছে। ছবির নীচে সুব্রতার হাতের লেখা—

"পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী—"

ছবির গায়ে হেলান দিয়ে রেখেছে বড় একগুচ্ছ রজনী-গন্ধা, কাল সন্ধ্যায় অরুণ সুব্রতাকে যা দিয়েছিল। অরুণের মনে হ'ল তার সব স্নেহ-মমতা গভীর ভালবাসা, তারই দেওয়া এই শুভ্র রজনীগন্ধার স্তবকের সঙ্গে সঙ্গে সুব্রতা তার ভাবগুরুর পদমূলে নিবেদন ক'রে নিজকে দায়মুক্ত করেছে।

অরুণের বুকের ভিতর যেন মোচড় দিয়ে উঠল। মহাত্মাজীর হাসি যেন মোনালিসার হাসির চেয়েও আজ অরুণের চোখে অধিকতর রহস্যময় মনে হ'ল। তার চোখের কৌতুকোচ্ছল চাহনির মাঝে যেন অরুণ শুনতে পেলে, "কেমন? আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিলে, পারলে কি?"

অরুণ বেদনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ব'লে উঠল, "হে যাদুকর সন্ন্যাসী, এই হাসি দিয়ে তুমি লক্ষ লক্ষ নরনারীকে মন্ত্র-মুগ্ধ ক'রে রেখেছ। তোমার স্বপ্ন সফল করবার জন্য কত সহস্র ভাবাবিষ্ট তরুণ প্রাণ তোমার ভাবাদর্শের বেদীমূলে নিজেদের আত্মাহুতি দিচ্ছে, তুমি কত নিষ্ঠুর তারা কি জানে? তোমার স্বপ্ন সফল করবার জন্য আমার যৌবন-স্বপ্ন আজ নিষ্ফল হ'ল, বিবর্ণ হ'ল আমার পৃথিবী, অকালে স্তব্ধ হ'ল আমার জীবনের চন্দ্রালোক-গীতিকা। শত-সহস্রের এমন হৃদয়-নিঙড়ানো বেদনার অভিশাপ তোমাকে কি চিরকাল ঘিরে থাকবে না?"

বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল অরুণের দৃষ্টি।

কাল সন্ধ্যায় সুব্রতা খোঁপায় যে ফুলের গুচ্ছ পরেছিল, তা রূপার ট্রে থেকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে সে মুহ্যমানের মত সোফায় ব'সে পড়ল। সেই অর্দ্ধশুষ্ক বিগত-সৌরভ পরিত্যক্ত পুষ্পস্তবককে চুম্বন করতে গিয়ে অরুণের চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

একক

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

ঘুরেছি ফিরেছি দেখেছি সকল দেশ,
মানুষের বাস কোথা ভাই, তার পাই নাই উদ্দেশ।

মেরু-সমুদ্র-পারে
তুষার-পাথরে গড়া ঘরে ঘরে খুঁজিয়া ফিরেছি তারে।
মানুষের চালে চলে কালো পাখী, সাদা ধব্‌ধবে বুক,
মাছের আশায় ফিরিছে শিকারী শ্বেতলোম ভল্লুক,
মধ্যরাতের সূর্য্যের আলো তির্য্যক হয়ে মিশে
শাড়ীতে জরির আঁচল দোলানো অরোরা-বরিয়ালিসে।
মরীচিকা ভরা মরু,
কণ্টকলতা বাঁচে শুধু প্রাণে, ক'টি খর্জ্জুর তরু
দূরে ওয়েসিসে তৃষ্ণার জল বুক দিয়ে আছে ঘিরে,
মুক্তকৃপাণ দস্যুর মত ঘূর্ণীহাওয়ারা ফিরে।
প্রেইরী ও কেনীয়নে,
খুঁজেছি তাহারে মহীরুহে ভরা গহন নিবিড় বনে।
কত পিরামিড, মেগালিথ আর চৈত্যগুহার সারি,
মঠে মন্দিরে সমাধিশিলায় পরশ খুঁজেছি তারি।

নদীতট ভরা ধানের ক্ষেতের অবারিত সমারোহে,
নতশির কোথা বাঁশবন তার আপন ছায়ার মোহে
কাজলাদীঘির একপাশ ঘেঁসি' ফুটেছে সাপলা দুটি,
আঘাটার কাছে আধখানা ডোবা খুঁটি,
তারই শিরে বসি' জলতলে চোখ রেখে
মাছরাঙা আছে যেন সেই কোন্ আদ্যিকালের থেকে!
নগরে নগরে দেখি ভিড় করে মানুষেরই গড়া কল,
মানুষের মত চলে কথা বলে একেবারে অবিকল,
প্রাণ নেই তবু প্রাণের কাঁপনে কাঁপে তাহাদের বুক,
মানুষ তাদেরে কর্ম্ম সঁপিয়া সঁপিয়াছে সুখ-দুখ।
কোটি কোটি সেই কলের চাকায় বোনা হয়ে দিবানিশি
শুভ ও অশুভ ভাগ্যের সূতা একসাথে যায় মিশি'।

খুঁজেছি দূরে ও কাছে,
মানুষের দেখা মেলেনি ত ভাই, কে জানে সে
কোথা আছে।
আপনারে লয়ে পূর্ণ মানুষ, নহে সে কাহারো দায়,
দিকে দিকে শুধু জাতি-উপজাতি-সঙ্ঘ-সম্প্রদায়।
রাষ্ট্রনীতিক, স্বার্থনীতিক, ধর্ম্মনীতিক দলে
এ সারা পৃথিবী জুড়ে আছে ভাই, চোখ সেথা নাহি চলে,
একটি মানুষ, একখানি বুক, কোথায় তাহার মাঝে
একটি হৃদয় একান্তে তার আপনারই সুরে বাজে।

মানুষেরে চাই, ভালবাসি, আর মানুষের গান গাই,
আজিকার দিনে নাই সে ত কোথা, হায় সে যে নাই, নাই!
তার হাসি-আঁখিজল,
সব বাঁধা দিয়ে বাঁধন গড়ে সে, তাই দিয়ে বাঁধে দল।
চোরেদের দলে যেইমত চোরে চোরে
বাঁধা থাকে এক ন্যায়ের শাসনে, কুটুম্বিতার ডোরে,
তেমনই বাঁধন দিয়ে এরা দল গড়ে,
তার পরে সেই দলে দলে বাধে বিরোধ পরস্পরে।
শেষ নাহি হ'তে ফিরে সুরু হয় ধ্বংসলীলার পালা,
সে যে কি হিংসা! তত হিংসার জ্বালা
একখানি বুকে কখনো ধরে না, যদি হিংসায় বুক
ভরা থাকে কারও আজীবন, হয় সব-সেরা হিংসুক।

কবে সুরু হবে ক্রূরহাতে ভেঙে ফেলা
এই যতখানে মানুষে মানুষে মেলা
সমান স্বার্থ, সম-বিশ্বাস, সম-গোত্রের টানে,
মানুষেরে যেথা মানুষের কাছে আনে
প্রেম ছাড়া আর কিছু,
প্রেম ছাড়া আর কাহারো শাসনে মাথা যেথা তার নীচু।

প্রেমের শরণ মাগিব, ধর্ম্ম প্রেম ছাড়া কিছু নয়।
বুদ্ধ সে কি রে একজন? তাঁর নূতন অভ্যুদয়
যুগ থেকে যুগে। আজি ভুলে যাই সঙ্ঘ গড়ার কথা,
মানুষ, আমার একক মানুষ! তুমি বড় সর্ব্বথা।

নূতন যুগের কে তুমি বুদ্ধ, আছি তব পথ চাহি',
প্রতি মানুষেরে ডাক দিয়ে ক'বে, 'তোর চেয়ে বড় নাহি।
তোরই হাতে-গড়া পুতুল-প্রতিমা, তোরই হাতে গড়া বেদী,
তারেই দেবতা ক'রে কৌতুক এ কি রে মর্ম্মভেদী!
ওরে রাজা, তুই লুটাস কাহার পায়ে?
তোরই হাতে গড়া জাতি-উপজাতি সমাজে সম্প্রদায়ে
তোর চেয়ে বড় কাহারে হেরিস? ব্যক্তির চেয়ে বেশী
আয়তন যার, প্রেমহীন তার হাতের মাংসপেশী
ব্যক্তির চেয়ে বেশী জোর যদি আপনার মাঝে লভে,
সব চেয়ে বড় শত্রু সে তোর তবে।
ন্যায়ের শাসনে মানুষেরে বেঁধে অন্যায় তোলে শির,
নামুক সেথায় নির্ম্মম তোর অভিশাপ ওরে বীর!
ক্ষুদ্র প্রেমেরে আশ্রয় করি' অপ্রেম যেথা বড়,
তার 'পরে তোর বজ্র হানুক আঘাত কঠোরতর।'

প্রেম ছাড়া আর কোনো শাসনের বাঁধন যে নাহি মানে,
একক মানুষ, মুক্ত মানুষ, ফিরি তাঁরই সন্ধানে।

আলোচনা

"রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা"

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী'তে ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ "রবীন্দ্র-সাহিত্যের আদিপর্ব্ব" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

> "[রবীন্দ্রনাথের] আরেকটি বেনামী কবিতা সম্প্রতি অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন ('বাংলা সাহিত্যের কথা', ৩য় সংস্করণ, ১৩৪৯) ১২৮০র মাঘ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন' থেকে উদ্ধার করেছেন। প্রকাশের তারিখ অনুসারে এই "ভারতভূমি" কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত রচনা বলে হয়ত স্বীকার করতে হবে।"

"ভারত ভূমি" কবিতাটিতে লেখকের নাম নাই; 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদকের মন্তব্যে প্রকাশ, ইহা "এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকে"র রচিত। এই নামহীন কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের রচনা কি না সে-সম্বন্ধে ডাঃ নাগ একেবারে নিঃসংশয় নহেন; তিনি লিখিতেছেন :—

> "কবিতাটি যে বছর বঙ্গদর্শনে মাঘ মাসে (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৮৭৪) ছাপা হয় সেই ১২৮০ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র প্রথম সর্গও বঙ্কিমচন্দ্র ছাপেন। এ ক্ষেত্রে অনুমান করা যেতে পারে যে দ্বিজেন্দ্রনাথই বালক কবি রবীন্দ্রনাথের "ভারতভূমি" প্রকাশের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে দিয়েছিলেন। কিন্তু বড়দাদা রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন নিশ্চিত ভাবে বার বছর জেনে বঙ্কিমের মন্তব্যে "চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকে"র রচনা কি ক'রে ছাপালেন সেটা বোঝা যায় না।"

কিন্তু নিঃসংশয় হইতে না পারিলেও, ডাঃ নাগ সমগ্র "ভারত ভূমি" কবিতাটি 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন এবং প্রবন্ধের স্থানে স্থানে এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যাহা পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয়, তিনি কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা বলিয়া মনে করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার দু-একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "ভারতভূমি" কাঁচা রচনা হলেও কাব্যসরস্বতীর পাদপীঠে শিশু রবীন্দ্রনাথের কচি হাতের প্রথম আল্পনা। এ হিসাবে রবীন্দ্র-ভক্তদের কাছে কবিতাটির আদর হবে বলে এইটে ছেপে কিছু আলোচনা করা গেল।...
>
> রবীন্দ্রনাথকে ছেলেবেলায় বয়সের চেয়ে যে কিছু বড় দেখাত তার প্রমাণ তাঁহার এগার বছর বয়সে পিতার সঙ্গে প্রথম বোলপুর (১২৭৯ ফাল্গুন) হয়ে অমৃতসর পর্য্যন্ত ট্রেনযাত্রার গল্পের মধ্যে আছে। সুতরাং বার বছরে রচিত "ভারত-ভূমি" কবিতাটি এক "চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালকে"র বলে যে বঙ্কিম গ্রহণ করেন তারও খানিকটা কারণ মেলে।"

"ভারত ভূমি" কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের রচনা হইলে আপাততঃ এটিকেই কবির সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, সে-সম্বন্ধে কোনরূপ প্রমাণ ডাঃ নাগ বা ডাঃ সুকুমার সেন দিতে পারেন নাই। বরং কবিতাটি যে অন্য কাহারও—রবীন্দ্রনাথের নহে, এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে; কারণগুলি এই :—

(১) "ভারত ভূমি" কবিতাটির উপরে 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছেন :—"এই কবিতাটি এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকের বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি।" কবিতাটি ১২৮০ বঙ্গাব্দের মাঘ (১৮৭৪, জানুয়ারি) মাসে প্রকাশিত হয়; এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স বারো বৎসর সাত মাস (৭ মে ১৮৬১ তারিখে কবির জন্ম) সাড়ে বারো বৎসরের বালককে বঙ্কিমচন্দ্র "চতুর্দ্দশ বর্ষীয়" বলিয়া উল্লেখ করিবেন—ইহা কষ্টকল্পনা।

(২) রবীন্দ্রনাথ 'জীবন স্মৃতি'তে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরো বেশি দুঃসহ হইত।" এ হেন 'বঙ্গদর্শনে' রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা প্রকাশিত হইয়া থাকিলে কবি যে সে-কথা বিস্মৃত হইতেন না, এবং 'জীবন-স্মৃতি'তে বা অন্যত্র তাহার উল্লেখ করিতেন, তাহা এক প্রকার নিঃসন্দেহ।

কবিতাটি যদি বালক রবীন্দ্রনাথের না হয়, তাহা হইলে কাহার রচনা? আনন্দের কথা, ইহার লেখকের নাম আমরা খুঁজিয়া পাইয়াছি।

"ভারত ভূমি" কবিতাটি বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র) প্রথম রচনা। জ্যোতিশ্চন্দ্রই যে ইহার লেখক তাহা তাঁহার স্বহস্তলিখিত ডায়ারি পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছি। ডায়ারির ১৬ পৃষ্ঠায় আছে :—

> "মৎকর্ত্তৃক লিখিত কবিতাবলী।
>
> ১। ভারতভূমি—বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮০।"

'বঙ্গদর্শন', 'ভ্রমর', 'এডুকেশন গেজেট' প্রভৃতিতে তিনি যে-সকল রচনা স্বনামে, অন্য নামে, বা নাম না দিয়া প্রকাশ করেন, জ্যোতিশ্চন্দ্র তাহার একটি স্বতন্ত্র তালিকাও রাখিয়া গিয়াছেন। এই তালিকাও আমি দেখিয়াছি; ইহাতে প্রকাশ :—

> "১। ভারতভূমি (কবিতা) বঙ্গদর্শন ১২৮০ anonymous."

১৮৭৪ সনের জানুয়ারি (১২৮০, মাঘ) মাসের 'বঙ্গদর্শনে' যখন "ভারত ভূমি" কবিতাটি প্রকাশিত হয় তখন জ্যোতিশ্চন্দ্রের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। তাঁহার ডায়ারিতে তাঁহার জন্মতারিখ—"১ জানুয়ারি ১৮৬০" পাইতেছি। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' "এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকে"র রচনা বলিয়া যে মন্তব্য করেন তাহাতে কোন ভুল নাই।

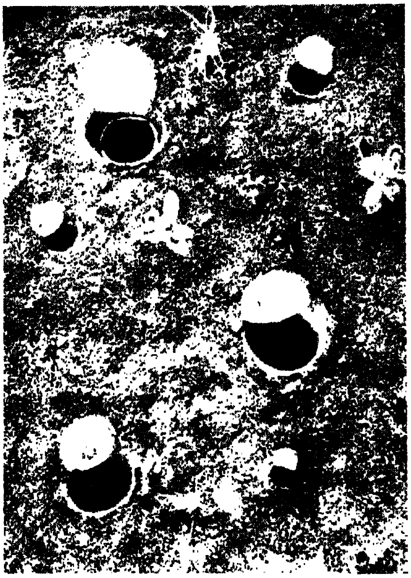
বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিশ্চন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এই কারণেই তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রথম রচনা "ভারত ভূমি" কবিতাটি স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া ও অংশতঃ ছাঁটিয়া প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তিনি কবিতাটির উপরে মন্তব্য করিয়াছিলেন :—"...কোন কোন স্থানে, অল্পমাত্র সংশোধন করিয়াছি। এবং কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি।" অপর কোন বালকের রচনা হইলে বঙ্কিমচন্দ্র এতটা করিতেন কি না সন্দেহ।

জ্যোতিশ্চন্দ্রের অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত শচীশজীব চট্টোপাধ্যায়ের নিকট তাঁহার পিতার পুরাতন ডায়ারিগুলি আছে; যে-কেহ ইচ্ছা করিলে উহা দেখিতে পারেন। শচীশজীব বাবু পিতার ডায়ারিগুলি আমাকে দেখাইয়াছেন এবং সেগুলি হইতে আবশ্যক অংশ উদ্ধৃত করিবার সম্মতি দিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

গর্ত্তবাসী মাকড়সা

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নিজেদের অস্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য জীব-জগতের সর্ব্বত্র প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত একটা অবিরাম দ্বন্দ্ব লাগিয়াই আছে। দ্বন্দ্বটা প্রধানতঃ প্রতিকূল অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা ছাড়া



'ট্র্যাপ-ডোর' মাকড়সার গর্ত্তের ঢাক্‌না খুলিয়া রাখা হইয়াছে।

আর কিছুই নহে। প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়াই জীব-জগৎ অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরে উন্নীত হইয়াছে। এই কারণেই জীব-জগতে অসংখ্য বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে এই কারণেই বহু জাতি এবং ততোধিক উপজাতীয় প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। উন্নত পর্য্যায়ের প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম পর্য্যায়ভুক্ত প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। কোন কোন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে জাতিবৈচিত্র্য এত অধিক যে, মনে হয় যেন ইহারা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করিবার সম্ভাব্য কোন প্রকার পথেই অগ্রসর হইতে কসুর করে নাই। অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরের প্রাণীদের কথা বাদ দিয়া নিম্নস্তরের কীট-পতঙ্গের মধ্যে একমাত্র মাকড়সার বিষয় আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে—ইহারা এত অধিক সংখ্যক বিভিন্ন জাতি এবং উপজাতিতে বিভক্ত যে, তাহার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা দুষ্কর। আনাচে-কানাচে, বনে-জঙ্গলে মাকড়সার জাল প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে। বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সা বিভিন্ন পদ্ধতিতে জাল বুনিয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে—একমাত্র আমাদের দেশেই কত রকমারি জাল-বোনা মাকড়সা রহিয়াছে। জাল বোনে না অথচ বিচিত্র ধরণের বাসা নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করে, বিভিন্ন জাতীয় এরূপ মাকড়সার সংখ্যা অগণিত। জলাভূমিতে অথবা জলের উপরিভাগে বিচরণকারী মাকড়সার সংখ্যাও কম নহে। কেহ কেহ আবার জলের নীচেই তাহাদের বিশ্রামস্থল নির্ম্মাণ করিয়া



'ট্র্যাপ-ডোর' মাকড়সা

থাকে। আমাদের দেশেও কয়েক প্রকার ডুবুরী ও মেছো-মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক জাতীয়

মাকড়সা দেয়ালের ফাটলে বা বৃক্ষকোটরে বাস করিতেই অভ্যস্ত। মাকড়সারা যে কেবল জলে, স্থলে ও বৃক্ষ-লতাদিতেই বিচরণ করিয়া থাকে তাহা নহে,—বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সারা আকাশপথে বিচরণ করিবার জন্যও



মাকড়সা তাহার অর্দ্ধ মুক্ত গর্ত্ত হইতে শিকার ধরিয়া তাহাকে ভিতরে টানিয়া লইতেছে

অতি অদ্ভুত কৌশল আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কয়েক জাতীয় মাকড়সা আবার সুরঙ্গ এবং মৃত্তিকাভ্যন্তরে গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করে। দৈহিক গঠন এবং অঙ্গসংস্থানের গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান থাকায় মাকড়সারা সাধারণ কীটপতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত নহে; তাছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও প্রত্যেক মাকড়সাই কম হউক বেশী হউক—কিছু-না-কিছু সুতা বুনিতে পারে। গর্ত্তবাসী মাকড়সারাও এই সকল বৈশিষ্ট্য বর্জ্জিত নহে। তথাপি ইহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী অনেকটা সাধারণ কীটপতঙ্গের মত। পিপীলিকা ও মৌমাছির ন্যায় অল্প সংখ্যক কয়েক জাতীয় সামাজিক মাকড়সা ব্যতীত বাকী সকলেই অত্যন্ত অসামাজিক প্রাণী। জালেই হউক গর্ত্তেই হউক, এক স্থানে বহু মাকড়সা দেখা গেলেও তাহারা নিজ নিজ আশ্রয়স্থলে, একক ভাবেই বাস করিয়া থাকে। একই জমিতে পাশাপাশি বিভিন্ন গর্ত্তে বহুসংখ্যক মাকড়সা বাস করিলেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব দূরে থাকুক দেখা-সাক্ষাৎই হয় না। পরস্পরের মধ্যে দৈবাৎ সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেলে উভয়েই উভয়কে পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়ে, নচেৎ সংঘর্ষ অনিবার্য্য। স্ত্রী-মাকড়সারাই সাধারণতঃ জাল বা গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। পুরুষরা আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহারা স্ত্রী মাকড়সার পরিত্যক্ত আশ্রয়স্থলে অথবা যেখানে-সেখানে কোনরকমে মাথা গুঁজিয়া অবসর-সময়টা কাটাইয়া দেয়। গর্ত্তবাসী মাকড়সার পুরুষদের সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য, অবশ্য এই শ্রেণীর কোন কোন পুরুষ-মাকড়সাকে কদাচিৎ গর্ত্ত-নির্ম্মাণ করিতেও দেখা যায়।

আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতীয় অন্ততঃ চার পাঁচ রকমের সুড়ঙ্গ এবং গর্ত্ত-নির্ম্মাণকারী মাকড়সা লক্ষ্য করিয়াছি। ইহারা সকলেই সর্ব্বতোভাবে না হইলেও অন্ততঃ কতক বিষয়ে বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকাদিগকে অনুকরণ করিয়া থাকে। ইহারা সকলেই নূতন আবিষ্কৃত বলিয়া বৈজ্ঞানিক নামকরণ করিয়াছি। ডেঁয়ো-পিঁপড়ের অনুকরণকারী কালো-রঙের এক জাতীয় মাকড়সা গাছের ফাটলে অথবা গাছের গুঁড়ি-সংলগ্ন ভূমিতে সামান্য গর্ত্ত খুঁড়িয়া বসবাস করে। ইহারা প্রধানতঃ ডেঁয়ো-পিঁপড়ে খাইয়াই জীবন ধারণ করে। গর্ত্তের মুখে পাতলা জাল বুনিয়া এলোমেলোভাবে ছড়াইয়া রাখে। মাকড়সা গর্ত্তের ভিতরে অবস্থান করিলেও শরীরের পশ্চাদ্ভাগ হইতে নির্গত একখণ্ড সূক্ষ্ম সুতা গর্ত্তের বাহিরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সূত্র-গুলির সহিত সংলগ্ন থাকে। ডেঁয়ো-পিঁপড়েগুলিকে অনেক সময় তাহাদের বাসার আশেপাশে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ছুটাছুটি করিতে দেখা যায়। ছুটাছুটি করিবার সময় অসতর্ক ভাবে একবার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মাকড়সার সুতার উপর পা দিলেই বিপদ। পায়ের সঙ্গে সুতা আঠার মত লাগিয়া যায়। ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে গিয়া আরও জড়াইয়া পড়ে। পা আটকাইবার সঙ্গে সঙ্গেই জালের মৃদু কম্পনে গর্ত্তের মধ্য হইতে মাকড়সা শিকারের আগমন-বার্ত্তা টের পাইয়া দরজার কাছে আসে এবং ওৎ পাতিয়া তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকে। ফাঁদ হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টায় শিকার সম্পূর্ণরূপে জড়াইয়া না পড়া পর্য্যন্ত মাকড়সা ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করে এবং সুযোগ বুঝিলেই জালসমেত শিকারটাকে টানিয়া গর্ত্তের মধ্যে লইয়া যায়। শিকার ধরিবার জন্যই হউক বা অন্য কোন প্রয়োজনেই হউক, কোন কারণেই ইহাদিগকে গর্ত্তের বাহিরে আসিতে দেখা যায় না।

কলিকাতার আশেপাশে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা, হাল্কা খয়েরী রঙের এক জাতীয় মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা পুরাতন দেয়াল অথবা ভগ্ন ইষ্টকস্তূপের ধারে ছোট ছোট গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া



'ট্র্যাপ-ডোর' মাকড়সা তাহার অনিষিক্ত ডিম খাইয়া ফেলিতেছে

বাস করে। পাতলা জাল বুনিয়া গর্ত্তের মুখে চাঁদোয়ার মত ঝুলাইয়া রাখে। শিকার ধরিবার আশায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে গর্ত্তের ধারে চাঁদোয়ার আড়ালে ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে। ছোট ছোট কীটপতঙ্গ দেখিতে পাইলেই ছুটিয়া গিয়া আক্রমণ করে এবং বাসায় লইয়া আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার রসরক্ত চুষিয়া খায়।

ঘাসপাতা সমাকীর্ণ ছায়াযুক্ত স্থানে দেয়ালের গায়ে পুরাতন বৃক্ষের গুঁড়িতে সিকি ইঞ্চি পরিমিত গাঢ় খয়েরী রঙের এক প্রকার মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। হঠাৎ দেখিলে মাকড়সাগুলিকে অনেকটা মাঝারিগোছের ডেঁয়ো-পিঁপড়ের মত বলিয়াই মনে হয়। ইহারা সূতা, মাটি এবং অন্যান্য পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার সাহায্যে ধনুক অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে 'U-টিউবে'র আকারে সুরঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করে। কলিকাতার ভিতরে এবং বাহিরে বিভিন্ন স্থানে এই জাতীয় মাকড়সার সুরঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়। স্তিমিত আলোকে অথবা ছায়ার আড়ালে শিকার ধরিতে বাহির হইলেও সুরঙ্গ ছাড়িয়া ইহারা সাধারণতঃ উজ্জ্বল আলোকে বাহির হইতে চাহে না। জোর করিয়া বাসা হইতে বাহির করিয়া দিলে অতি দ্রুতগতিতে ছুটিয়া কোন কিছুর আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বেশীক্ষণ ছুটিতে পারে না। ক্লান্ত হইলেই মৃতের ন্যায় ভান করে। ডেঁয়ো পিঁপড়ের সহিত আকৃতিগত নিখুঁৎ সাদৃশ্য না থাকিলেও দ্রুত গতিভঙ্গি হইতে ইহাদিগকে পিপীলিকা বলিয়া ভুল করাই স্বাভাবিক। সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিবার প্রারম্ভে এই মাকড়সা ধনুকের আকারে বাঁকানো একটা সূতার কাঠামো নির্ম্মাণ করিবার পর আশেপাশের বিভিন্ন স্থান হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাটির টুকরা, শেওলা এবং অন্যান্য বিবিধ পদার্থ বহন করিয়া লইয়া আসে এবং সেগুলিকে সূতার কাঠামোর উপর বসাইয়া দেয়। সূতার আঠায় লাগিয়া সেগুলি দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়া থাকে। উপরের আবরণ নির্ম্মাণ শেষ হইলে ভিতরে পুনরায় পুরু করিয়া সূতার আস্তরণ দিয়া দেয়। 'U-টিউবে'র মত দুইটি



'ট্র্যাপ ডোর' মাকড়সা তাহার শিকার লইয়া গর্ত্তে প্রবেশ করিতেছে; ইহার পরই দরজা বন্ধ করিয়া দিবে

বাহুসমন্বিত সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না হইলেও ইহাতে যে আত্মরক্ষা ও দুইটি কুঠরির সুবিধা পাওয়া যায়—তাতে কোনই সন্দেহ নাই। সুড়ঙ্গটা লম্বালম্বি নির্ম্মিত হইলে এরূপ সুবিধা হইত না। সর্ব্বাপেক্ষা



গর্ত্ত-মাকড়সা তাহার দরজা টানিয়া বসাইবার চেষ্টা করিতেছে

বড় সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য দেড় ইঞ্চি হইতে পৌনে দুই ইঞ্চির বেশী হইবে না। সুড়ঙ্গের দুই মুখই খোলা থাকে। শত্রু এক মুখ দিয়া আক্রমণ করিলে অপর মুখ দিয়া তাহার অগোচরেই পলায়ন করা যায়। তা ছাড়া শত্রুর দৃষ্টি এড়াইবার জন্য বাসাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই এমন ভাবে শেওলা ও অন্যান্য পদার্থের টুকরা দ্বারা আবৃত করিয়া করিয়া রাখে যে, গর্ত্তের মুখের দুইটি ছিদ্র ছাড়া আর কোন অংশই সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। এই জাতীয় পুরুষ মাকড়সাদিগকে মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনের সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ মাকড়সারা স্ত্রী-মাকড়সার পরিত্যক্ত জীর্ণ বাসগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। স্ত্রী-মাকড়সা অপেক্ষা পুরুষ-মাকড়সা কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্বকায়। জাল-বোনা মাকড়সাদের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেরা অসম্ভব রকমে ক্ষুদ্র হইয়া থাকে; কিন্তু জলচারী, নেকড়ে, মৎস্যশিকারী এবং বাসা নির্ম্মাণকারী অধিকাংশ মাকড়সার স্ত্রী ও পুরুষের শরীরের দৈর্ঘ্য প্রায় সমান। প্রকৃত পিঁপড়ে অনুকরণ-কারী মাকড়সার পুরুষেরা স্ত্রী-মাকড়সা অপেক্ষা অনেক বড় হইয়া থাকে। আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এ পর্য্যন্ত সাইত্রিশ রকমের বিভিন্ন জাতীয় পিঁপড়ে-মাকড়সা সংগ্রহ করিয়াছি। ইহারা নিখুঁৎ ভাবে বিভিন্ন পিপীলিকার আকৃতি, প্রকৃতি এমন কি দেহবর্ণ পর্য্যন্ত অনুকরণ করিয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকেরই পরিণত বয়স্ক পুরুষের দেহাকৃতি স্ত্রী-মাকড়সা অপেক্ষা বড়। অবশ্য পরিণত অবস্থায় রূপান্তরিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্ত্রী মাকড়সার সহিত আকৃতি ও দৈর্ঘ্যে পুরুষ-মাকড়সার বাহ্যিক কোন পার্থক্যই দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের দেশে ডেঁয়ো এবং বিষ-পিঁপড়ের অনুকরণকারী প্রায় ছয়-সাত রকমের মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই কম-বেশী ভূগর্ভের অধিবাসী। কিন্তু ইহাদের বাসা নির্ম্মাণ প্রণালী কিঞ্চিৎ ভিন্ন ধরণের বলিয়া এ প্রসঙ্গে আলোচনা করিব না। যাহা হউক, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'U-টিউবে'র মাকড়সা উজ্জ্বল আলোকে বাহিরে আসিতে চাহে না। কিন্তু নিতান্ত দায়ে পড়িলে অথবা প্রয়োজনের তাগিদে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায়। এক বার এরূপ একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ হইয়াছিল।

কয়েক দিন পূর্ব্বে শান্তিনিকেতনের 'মালঞ্চে'র পরি-বেষ্টনীর মধ্যে একটি টিলার মত উঁচু জায়গায় একটা বটগাছের গোড়ার দিকে এরূপ কয়েকটা মাকড়সার সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইয়াছিলাম। গোটা তিনেক সুড়ঙ্গ ছিল খুব কাছাকাছি। একটা ছিল—অনেকটা দূরে। ভিতরে মাকড়সা আছে কিনা দেখিবার জন্য সুড়ঙ্গটার উপর একটু চাপ দিতেই কালো রঙের একটা ক্ষুদ্রকায় মাকড়সা বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িয়া বিদ্যুৎগতিতে মৃত্তিকাভ্যন্তরে অদৃশ্য হইল। বুঝা গেল, প্রত্যেকটি বাসাতেই মাকড়সা থাকিবার সম্ভাবনা। অপর বাসাগুলির মধ্যে একটি অর্দ্ধ-ছিন্ন বাসাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ছিল। ছিন্ন বাসাটার পাশেই প্রায় এক ইঞ্চি ব্যবধানে ছিল আর একটি নূতন বাসা। বটপাতার মধ্য হইতে শ্যামাপোকার মত ধূসর বর্ণের একটা পোকা ধরিয়া বটের আঠায় তাহাকে লম্বা একটা ঘাসের ডগায় আটকাইয়া লইলাম। ঘাসের লম্বা ডগার সাহায্যে পোকাটিকে এক বার এ বাসার মুখে আবার ও বাসার মুখে স্পর্শ করাইতেই পোকাটা পা দিয়া বাসা আকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল। দুই-এক বার এরূপ করিতেই উভয় সুড়ঙ্গের মাকড়সা দুইটিই বোধ হয় শিকারের উপস্থিতি অনুভব করিয়া যুগপৎ বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিল। ইতিমধ্যে ঘাসের ডগা সংলগ্ন পোকাটাকে উভয় বাসার মধ্যস্থলে রাখিয়া ধীরে ধীরে নাড়াইতে লাগিলাম। উভয়েই বাসা হইতে বাহির হইয়া অতি সন্তর্পণে শিকারের দিকে অগ্রসর হইল। দুইটিই স্ত্রী-মাকড়সা; সম্মুখের পায়ের প্রান্ত ভাগ হইতে পিছনের পায়ের প্রান্ত ভাগ পর্য্যন্ত আধ ইঞ্চির বেশী হইবে না। ছিন্ন

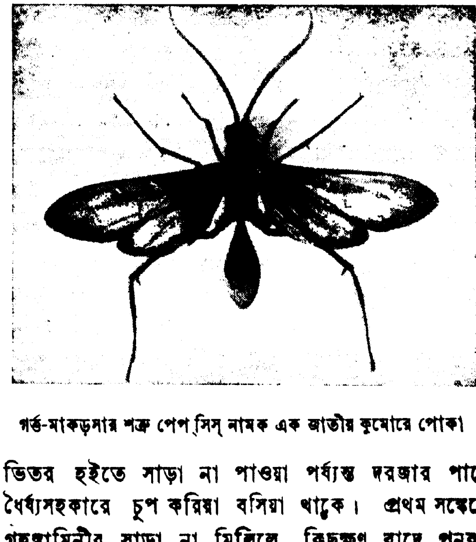
বাসার মাকড়সাটা শিকারের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই পোকাটাকে সরাইয়া লইলাম। মুখোমুখি অবস্থায় উভয়েই থমকিয়া দাঁড়াইল। পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান তখন আধ ইঞ্চির বেশী নহে। প্রায় মিনিট-



গর্ত্তের মধ্যে দুইটি মাকড়সার লড়াইয়ের ফলে একটির প্রাণান্ত ঘটিয়াছে

খানেক স্থিরভাবে অবস্থান করিবার পর ছিন্ন-বাসার মাকড়সাটা সম্মুখের দুই পা উঁচু করিয়া অপরটার দিকে অগ্রসর হইল। অপর মাকড়সাটাও ইতিমধ্যে সম্মুখের দুই পা উঁচু করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তার পর চলিল—ঠিক্ যেন রঁায়বেশে কায়দায় পায়তারা কষা। পরস্পর মুখোমুখি থাকিয়াই উভয়ে এক বার এ পাশে আবার ও পাশে সরিতে লাগিল। মনে হইল যেন উভয়ে উভয়কে পাশের দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু এ পাশে ও পাশে সরিয়া গিয়া কেহই কাহাকে সেই সুযোগ দিতেছে না। মিনিট পাঁচেক পর্য্যন্ত এভাগে পায়তারা কষিবার পর ছিন্নবাসার মাকড়সাটা অকস্মাৎ বিদ্যুৎবেগে অপর মাকড়সাটার উপর লাফাইয়া পড়িল। তার পর সুরু হইল কামড়াকামড়ি। কিন্তু দুই-চার সেকেণ্ড মাত্র। তার পরই উভয়ে উভয়কে ছাড়িয়া দূরে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ বাদেই আবার হাতহাতি লড়াই সুরু হইয়া গেল। মিনিটখানেকের মধ্যেই ছিন্ন-বাসার মাকড়সা অপর মাকড়সাটাকে কাবু করিয়া ফেলিল এবং পরাজিত অর্দ্ধমৃত মাকড়সাটাকে টানিয়া লইয়া তাহারই গর্ত্তে ঢুকিয়া পড়িল। পুনরায় সে নিজের বাসায় গিয়া বসবাস করিয়াছিল কি না জানি না, তবে জীবজগতের অপরাপর বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মত মাকড়সা-রাজ্যেও যে গায়ের জোরে অপরের অধিকারে দখলীস্বত্ব স্থাপন করা হয় তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ রহিয়াছে।

আমাদের দেশীয় সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণকারী মাকড়সাদের আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাদের পুরুষ-মাকড়সারা নিজেদের বসবাসের জন্য কদাচিৎ সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা স্ত্রী-মাকড়সার পরিত্যক্ত জরাজীর্ণ সুড়ঙ্গেই আশ্রয় গ্রহণ করে। যৌন-মিলনের সময় হইলেই পুরুষেরা স্ত্রী-মাকড়সার দরজায় গিয়া তাহাদের সহিত মোলাকাৎ করিতে চেষ্টা করে। বাসার দুই দিকের দুইটি মুখ সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিলেও প্রথমে সে গিয়া কিছুতেই অন্দরে প্রবেশ করিবে না। মাকড়সার এরূপ শিষ্টাচারের কথা শুনিয়া অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। কাহারও সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলে আমরা যেমন তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দরজার কড়া নাড়ি, পুরুষ-মাকড়সাও সেইরূপ স্ত্রী মাকড়সার সুড়ঙ্গের দরজার কাছে উপস্থিত হইয়া সম্মুখের দুই পায়ের সাহায্যে অতি অদ্ভুত ভঙ্গীতে গর্ত্তের মুখটাকে দুই-তিন বার কাঁপাইয়া দেয়।



গর্ত্ত-মাকড়সার শত্রু পেপ্‌সিস্ নামক এক জাতীয় কুমোরে পোকা

ভিতর হইতে সাড়া না পাওয়া পর্য্যন্ত দরজার পাশে ধৈর্য্যসহকারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। প্রথম সঙ্কেতে গৃহবাসিনীর সাড়া না মিলিলে কিছুক্ষণ বাদে পুনরায়

সুড়ঙ্গের মুখটাকে অতিসন্তর্পণে কাঁপাইয়া দেয়। অনেক স্থলেই দেখা যায়—প্রথম বারের সঙ্কেতেই গৃহস্বামিনী দরজার সম্মুখে হাজির হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তুই-তিন বার সঙ্কেতের পরও আগন্তুক সম্বন্ধে



মাকড়সা গর্ত্তের মধ্যে আলাদা থলি বুনিয়া ডিম পাড়িয়াছে।

গৃহস্বামিনী কোনই উৎসাহ প্রদর্শন করে না। আগন্তুক তখন ঘুরিয়া গিয়া সুড়ঙ্গের অপর দরজায় উপস্থিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সঙ্কেত চালাইয়া গৃহস্বামিনীকে তাহার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিবার চেষ্টা করে। তাহাতেও বিফলমনোরথ হইলে বাধ্য হইয়াই অপর কোন গৃহস্বামিনীর দরজায় ধর্ণা দিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহারা সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে সূতার আস্তরণ বুনিয়া দেয়। সুড়ঙ্গের ভিতরে অবস্থান করিলেও বাহির হইতে উৎপন্ন, এই সূতার আস্তরণের, সামান্য কম্পন হইতেই ইহারা কোন কিছুর আগমনবার্ত্তা টের পায়। সাক্ষাৎপ্রার্থী আগন্তুকের মৃদু কম্পন, শিকার অথবা আততায়ীর গতিভঙ্গীর পার্থক্য-জনিত বিবিধ কম্পনের তারতম্য বোধ ইহাদের অসাধারণ। যাহা হউক, আগন্তুকের সাড়া পাইলেই গৃহস্বামিনী সুড়ঙ্গের মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, শরীরের অর্দ্ধাংশ সুড়ঙ্গের মধ্যে রাখিয়াই সম্মুখের দুই পা উঁচু করিয়া আগন্তুককে অভিবাদন জ্ঞাপন করে। আগন্তুকও ঠিক সেইভাবে সম্মুখের দুই পা উঁচু করিয়া অতি মৃদু ভাবে স্ত্রী-মাকড়সার পাদ-স্পর্শ করিয়া প্রত্যভিবাদন জ্ঞাপন করে। এই অপূর্ব্ব অভিবাদনের ভঙ্গী হইতে পুরুষ-মাকড়সার তো কথাই নাই—দর্শকদের পর্য্যন্ত বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, স্ত্রী-মাকড়সাটা তখন কি 'মুডে' রহিয়াছে। খারাপ 'মুডে' থাকিলে অভিবাদনের ভঙ্গীটাই যেন সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণাত্মক হইয়া দাঁড়ায় এবং তৎক্ষণাৎ আগন্তুককে তাড়া করিয়া যায়। পুরুষ-মাকড়সাও তখন প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলায়ন করে; কিন্তু বিপরীত অবস্থায় অর্থাৎ ভাল 'মুডে' থাকিলে অভিবাদন-পর্ব্ব শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রী-মাকড়সা নিমেষের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং অপর দরজার কাছে মুখ বাহির করিয়া থাকে। পুরুষটিও তখন বাহিরের দিক দিয়া ছুটিয়া গিয়া সেই দরজায় উপস্থিত হয় এবং উভয়ে উভয়ের পাদ-স্পর্শ করিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করে। কিন্তু মাত্র এক-আধ সেকেণ্ড এরূপ আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া স্ত্রী-মাকড়সা সুড়ঙ্গ-পথে ছুটিয়া গিয়া পুনরায় অপর দরজায় উপস্থিত হয়। পুরুষটিও তৎক্ষণাৎ সেই দরজায় ছুটিয়া যায় এবং পদকম্পনে প্রীতি-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে। অনেকক্ষণ এরূপ লুকোচুরি খেলা চলিবার পর পুরুষ-মাকড়সা এক একবার একটু একটু করিয়া স্ত্রী-মাকড়সার পিছনে পিছনে তাহার সুরঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। অবশেষে এক সময়ে সুযোগ বুঝিয়া গৃহস্বামিনীর পিছনে পিছনে ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। প্রায় আধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গের মধ্যে অবস্থান করিবার পর অকস্মাৎ তাহাকে যেন ছিটকাইয়া বাহিরে আসিতে দেখা যায়। ব্যাপারটা আর কিছুই নহে—যৌন-মিলনের পর গৃহস্বামিনী তাহাকে উদরসাৎ করিবার উপক্রম করিবার ফলেই প্রাণভয়ে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

মাটির নীচে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করে—আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এরূপ কয়েক জাতীয় মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে গর্ত্তের মুখে কপাট নির্ম্মাণ-কারী এক জাতীয় মাকড়সাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা সাধারণতঃ 'ট্র্যাপ-ডোর'-মাকড়সা নামে পরিচিত। আমাদের দেশীয় গর্ত্ত বা সুড়ঙ্গ-নির্ম্মাণকারী মাকড়সার সুড়ঙ্গের মুখে কোন দরজার বন্দোবস্ত নাই। একমাত্র 'ট্র্যাপ-ডোর'-মাকড়সাই সুড়ঙ্গের মুখে ঢাকনি নির্ম্মাণ করে। বলা বাহুল্য, ইহাদের গর্ত্তের একটিমাত্র মুখ থাকে। 'ট্র্যাপ-ডোর'-মাকড়সা মাটির নীচে প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি হইতে দেড় ইঞ্চি চওড়া গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাসা তৈয়ারি করে। শ্যাওলা ও ঘাসপাতায় আবৃত নরম

মাটির মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে 'ট্র্যাপ-ডোর' মাকড়সার গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। একই স্থানে বিভিন্ন গর্ত্তে বহুসংখ্যক 'ট্র্যাপ-ডোর'-মাকড়সার আবাসস্থল নির্ম্মিত হইলেও ইহাদের মধ্যে প্রতিবেশীর প্রতি হৃদ্যতা বা



দেখিয়া মনে হয় দুইটি মাকড়সা গর্ত্তের মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু উপরেরটি প্রকৃত মাকড়সা এবং নীচেরটি তাহারই পরিত্যক্ত খোলস মাত্র

সহানুভূতির কোনই চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। একই মাতার গর্ভসম্ভূত মাকড়সাদের মধ্যে কোন কারণে দুই জনের সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেলে নেহাৎ অকারণেই লড়াই বাধিয়া যায় এবং এক পক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটে না। বাসা নির্ম্মাণের প্রারম্ভে 'ট্র্যাপ-ডোর'-মাকড়সার মুখের সম্মুখভাগে অবস্থিত হাতের মত দুইটি উপাঙ্গের সাহায্যে ডেলা-ডেলা মাটি তুলিয়া লইয়া কিছু দূরে ফেলিয়া আসে। গর্ত্ত তিন-চার ইঞ্চি গভীর হইলেই মাটি তুলিবার জন্য অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে। গর্ত্তের নীচে ডেলা ডেলা মাটি আলগা করিয়া এলোমেলোভাবে বোনা কতকগুলি সূতার সহিত সেগুলিকে আটকাইয়া দেয়। সূতার সহিত অনেকগুলি ডেলা সংলগ্ন হইলে উপর হইতে সূতার গোছা টানিয়া বাহির করে। গর্ত্ত নির্ম্মাণ শেষ হইবার পর যাহাতে দেয়ালের আল্গা মাটি ঝরিয়া গর্ত্ত বুজিয়া না যায় সেজন্য শক্ত চোয়ালের সাহায্যে দেয়ালের মাটি আগাগোড়া চাপিয়া বসাইয়া দেয়। এই কারণে গর্ত্তের অভ্যন্তরভাগ এবড়ো-খেবড়ো হইলেও মাটি ধ্বসিয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে না। গর্ত্তের দেওয়াল সুদৃঢ় করিবার পর চতুর্দ্দিকে বারংবার সূতা বুনিয়া ভেলভেটের মত কোমল আস্তরণ দিয়া দেয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাটির ডেলা, শ্যাওলা প্রভৃতি একত্রিত করিয়া গর্ত্তের উপরিভাগে একপাশে একখানি গোলাকার চাক্তি নির্ম্মাণ করে। চাকৃতির যে-দিকটা গর্ত্তের ভিতরে থাকিবে সে-দিকটায় এবং তাহার চার ধার ঘেরিয়া খুব পুরু করিয়া সূতা বুনিয়া দেয়। গর্ত্তের আস্তরণ ও ঢাকনার সূতার আস্তরণের সহিত এক দিকে সূতা বুনিয়া কব্জার মত জুড়িয়া দেওয়ার ফলে ঢাকনাটি স্থানচ্যুত না হইয়া অনায়াসে উঠা-নামা করিতে পারে। চতুর্দ্দিকে সূতার আস্তরণ দেওয়া শেষ হইলে ঢাক্‌নাটিকে ভিতর হইতে টানিয়া গর্ত্তের মুখে চাপিয়া বসায়। চতুর্দ্দিকে সূতার আস্তরণ অনেকটা আলগা ভাবে থাকার ফলে ঢাক্‌নার পরিধি গর্ত্তের মুখ হইতে কিঞ্চিৎ বড় হইয়া থাকে। কিন্তু বারংবার সেটাকে গর্ত্তের মুখে চাপিয়া বসাইবার দরুন ক্রমশঃ বেশ আঁটিয়া যায়। তার



মাকড়সা তাহার গর্ত্তের দরজা ঠেলিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে

পর চোয়ালের সাহায্যে ঢাকনার নীচের দিকে দুইটি ফুটা করিয়া দেয়। এই ছিদ্র দুইটির সাহায্যেই মাকড়সা ভিতর হইতে ঢাকনাটাকে ধরিয়া খুলিতে বা বন্ধ করিতে পারে। বাসার নির্ম্মাণ শেষ করিতে ষোল হইতে বিশ ঘণ্টা সময়

লাগিয়া থাকে। ঢাকনার উপরিভাগে শ্যাওলা ও লতা-পাতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ জুড়িয়া দেয়। ইহার ফলে ঢাকনা বন্ধ থাকিলে সে স্থানটা আশেপাশের ঘাসপাতার সহিত বেমালুম মিশিয়া থাকে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেও



মাকড়সা তাহার গর্ত্তের দরজা নির্ম্মাণ করিতেছে

কোথায় মাকড়সার গর্ত্ত আছে তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। বাহির হইতে কেহ গর্ত্তের ঢাকনা খুলিতে চেষ্টা করিলে মাকড়সা ভিতর হইতে তাহাকে টানিয়া ধরিয়া রাখে। এই টানের জোরও বড় কম নহে। জোর করিয়া ঢাকনা খুলিয়া লইলে মাকড়সাটা তাহা কামড়াইয়া ধরিয়াই থাকে। কিন্তু গর্ত্তের অন্ধকার হইতে আলোয় আসিবামাত্রই বিপদ বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ঝুপ করিয়া গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া যায়। প্রধানতঃ ইহারা রাত্রি কালেই শিকার অন্বেষণে বহির্গত হয়। গর্ত্ত ছাড়িয়া দূরে বাহির হইলেই গর্ত্তের ডালা খুলিয়া রাখিয়া আসে। নচেৎ ডালা বন্ধ হইলে বাহির হইতে তাহা আর খুলিবার উপায় থাকে না। সাধারণতঃ ইহারা গর্ত্তের মুখে শরীরের অর্দ্ধাংশ বাহির করিয়া শিকারের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। গর্ত্তের নিকট দিয়া কোন কীট-পতঙ্গ যাতায়াত করিলেই তাহাকে আক্রমণ করিয়া গর্ত্তের ভিতরে টানিয়া নেয়। দরজাটিও সঙ্গে সঙ্গে আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া যায়, তখন নিশ্চিন্ত মনে আহারে প্রবৃত্ত হয়। দিনের বেলায়ও অবশ্য সময়ে সময়ে ইহাদিগকে গর্ত্তের ডালা অর্দ্ধোন্মুক্ত করিয়া শিকারের জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। অধিকন্তু শিকারের লোভ দেখাইয়া দিনের বেলায় ইহাদিগকে গর্ত্তের বাহিরে আনা অসম্ভব নহে। কিন্তু প্রথমতঃ দুই একবার এইরূপে প্রলোভিত হইলেও প্রতারণা বুঝিতে বেশী সময় লাগে না; তখন শত চেষ্টাতেও আর গর্ত্ত হইতে বাহির করা যায় না। 'ট্র্যাপ-ডোর'-মাকড়সারাও অত্যন্ত কলহপ্রিয়। সহজে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে না। কোনক্রমে দুইটিতে সামনা-সামনি হইয়া গেলেই লড়াই অনিবার্য্য। সময় সময় অল্প ব্যবধানে পাশাপাশি গর্ত্ত খুঁড়িতে খুঁড়িতে একের গর্ত্তের সহিত অপরের গর্ত্ত নীচের দিকে গিয়া মিলিত হইয়া যায়। তখন গর্ত্ত খোঁড়া বন্ধ রাখিয়া উভয়ে উভয়কে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। একটি প্রাণত্যাগ না করা পর্য্যন্ত লড়াই থামে না। ইহাদের মধ্যে পুরুষ মাকড়সার সংখ্যা খুবই কম। তাহারাও কদাচিৎ ছোট ছোট গর্ত্ত নির্ম্মাণ করে। স্ত্রী-মাকড়সা গর্ত্তের মধ্যেই আলাদা থলি বুনিয়া তাহাতে ডিম পাড়ে। কুমারী অবস্থায় ডিম পাড়িলে তাহা হ তে বাচ্চা উৎপন্ন হইবে না বুঝিয়াই বোধ হয় সেই ডিমগুলিকে নিজেই খাইয়া ফেলে। নিষিক্ত-ডিম পাড়িবার পর বাচ্চা বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদা তাহা আগলাইয়া বসিয়া থাকে। বাচ্চাগুলি দুই মাস পরে খোলস বদলাইতে সুরু করে এবং ছয়-সাত বার খোলস বদলাইবার পর যৌবনে পদার্পণ করে।

দিনের বেলায় ইহাদের গর্ত্তের বাহিরে না আসিবার একটা প্রধান কারণ এই যে, পেপসিস্ মিল্ডার নামক এক জাতীয় কুমোরে পোকা ইহাদের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়, ট্র্যাপ-ডোর-মাকড়সাকে দিনের বেলায় গর্ত্তের বাহিরে দেখিতে পাইলেই এই কুমোরে পোকা তাহাকে আক্রমণ করে এবং উভয়েই জড়াজড়ি করিতে করিতে গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। কুমোরে পোকার সহিত মাকড়সা আঁটিয়া উঠিতে পারে না। বারংবার হুল ফুটাইয়া তাহাকে অসাড় করিয়া ফেলে এবং তাহার শরীরে একটি ডিম পাড়িয়া চলিয়া আসে। এই ডিম হইতে যথাসময়ে কীড়া—ফুটিয়া মাকড়সার দেহ উদরসাৎ করিতে থাকে এবং যথাসময়ে পূর্ণাঙ্গ কুমোরে পোকারূপে মাকড়সার গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসে। মাকড়সা বাসা ছাড়িয়া বাহিরে না আসিলে কিন্তু কুমোরে পোকা তাহাকে আক্রমণ করে না; কারণ অর্দ্ধোন্মুক্ত দরজার ফাঁকে আক্রমণ করিলে গর্ত্তের ডালা বন্ধ হইয়া কুমোরে পোকার আর বাহিরে আসিবার উপায় থাকে না।

ভারতের ভগবান

শ্রীঅবনী নাথ রায়

আপনাদের সকলেরই স্মরণ আছে ইতিমধ্যে এক দিন সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছিল যে এক জন বিখ্যাত দেশ-নায়ক মারা গেছেন। সেই সন্ধ্যায় ঘটনাটির আলোচনা-প্রসঙ্গে আমার এক বন্ধু উত্তেজিত স্বরে বললেন, "এই ত মশায়, আপনাদের ভগবান। ভগবান ভগবান করেন, এই ত তাঁর ক্ষমতা—এমন এক জন নেতাকে তিনি রক্ষা করতে পারলেন না। আসল কথা হচ্ছে পৃথিবীটা চল্‌ছে এক অন্ধ শক্তির (blind force) তাড়নায়—সেই শক্তির বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা আপনাদের ঐ তথাকথিত ভগবানেরও নেই। সকল রকম যানের চালনা করার কতকগুলি নিয়মকানুন আছে—সেই নিয়মকানুনের ব্যত্যয় হ'লে যান ভাঙবে এবং তার যাত্রীরা বিপদাপন্ন হবে, এই হ'ল প্রকৃতির নিয়ম—কোন প্রসিদ্ধ নেতাকে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য এই নিয়মের বিরুদ্ধতা করা আপনাদের ভগবানের সাধ্যাতীত।"

এত বড় যুক্তির বিরুদ্ধে তর্ক করা আমার ভগবানের সাধ্যাতীত ছিল কি না জানি নে কিন্তু আমার সাধ্যাতীত ছিল। সুতরাং চুপ করেই গেলাম। আমি না জেনেও মেনে নিয়েছিলাম যে যখন কোন ঘটনারই আদি-অন্ত আমার জানা নেই, তখন কোন মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন। বরঞ্চ এর মধ্যেও ভগবানের মঙ্গল-হস্তের ইসারা আছে এই বিশ্বাস রেখে ঘটনাটি বুঝে দেখতে চেষ্টা করা ভাল।

পরে খবর বেরল নেতার মৃত্যুর সংবাদটা সত্য নয়। তখন যদি আমি পুনরায় আমার বন্ধুর সামনে গিয়ে পূর্বের তর্কের অনুবৃত্তি ক'রে বলতাম, "কেমন দেখলেন, আমার ভগবান আছেন কি না? এই ত নেতাকে তিনি বাঁচিয়ে দিলেন!" তবে তিনি ফের কি যুক্তির অবতারণা করতেন জানি নে। কিন্তু আমি যে তা' করি নি তার কারণ দুটো:—প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে, বন্ধুকে লজ্জিত করার ইচ্ছা আমার ছিল না। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, আমি বিশ্বাস করি যে ভগবানের থাকা-না-থাকা আমাদের এই ঠুন্‌কো তর্ক-স্রোতের উপর নির্ভর করে না। ঠুন্‌কো বললাম এই জন্যে যে, আমাদের তর্কের মূল্য যে কতটা তা ত চোখের সামনেই দেখতে পেলাম। সোমবারে ঠিক হ'ল যে ভগবান নেই, যেহেতু এক জন নেতা মারা গেছেন। আবার বুধবারে ঠিক হ'ল যে না ভগবান আছেন, যেহেতু নেতা বেঁচে গেছেন। অর্থাৎ ভগবানের অস্তিত্ব যদি আমাদের এই প্রবৃত্তি এবং দ্বন্দ্বমূলক মনের যুক্তিনিরপেক্ষ না হ'ত তবে আমিও বলতাম যে এমন ভগবানের না থাকাই ভাল যাঁকে ইচ্ছা করলেই এক দিনের যুক্তিতে বিসর্জন দেওয়া যায়, আবার ইচ্ছা করলেই আর এক দিন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায়।

উপরের ঘটনাটি যদিচ আমি উদাহরণ-স্বরূপে দিয়েছি কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, ভগবান সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশের মনোভাব ঐ ধরণের। অর্থাৎ আমাদের মনোভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ভগবানকে যে আমার না হ'লেও চলে তার কারণ হচ্ছে আমার জানার পরিধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ব'লে। আমি মা-বাপের স্নেহে মানুষ হয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, এম-এ পাস করেছি, উত্তর-জীবনে অপেক্ষাকৃত দুর্লভ চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সচ্ছলতাপূর্ণ জীবন যাপন করছি—আমি মুখ ফিরিয়ে জোর গলায় বলতে পারি যে ভগবান আবার কোথায়? তাঁকে ত কই দেখতে পাচ্ছি নে। কিন্তু যদি আমি জানতাম যে জীবন ত মাত্র ঐটুকুই নয়—আমার জীবনের ঐ কয়েকটি বৎসর সমগ্র জীবন-নদীর অত্যন্ত ক্ষীণতম একাংশমাত্র, তবে ভগবান সম্বন্ধে অত সহজে সিদ্ধান্ত করতে আমার বাধতো। পূর্ব-জীবন, ভবিষ্য-জীবনের কথা ছেড়েই দিলাম—তার অবতারণা করলে যে তর্ক উঠবে সে আর শেষ হবার নয়—কিন্তু এই বর্তমান জীবনেই কি আমরা দেখতে পাই নে যে আমার জীবনের যেটুকু রূপ মাত্র দেখছি সেইটুকুই জীবনের সত্যকার রূপ নয়? আমি স্বচ্ছন্দে আছি সত্য, কিন্তু যে দুর্ভাগা জন্মের থেকেই বাপ-মা হারিয়েছে, যে পড়ার চেষ্টার পরিবর্তে পেয়েছে লোকের অবহেলা, লোকের তাচ্ছিল্য—যে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত গলদঘর্ম হয়েও জীবিকাসংগ্রহ করতে পারে না—সে যদি মানুষের দ্বারে বঞ্চিত হয়ে ভগবানকেই আঁকড়ে

ধরে তবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? অনেক সতী-সাধ্বী দেখেছি যাঁরা স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে শান্তিতে ঘরকন্না করছেন কিন্তু ঐ ত জীবনের একমাত্র চেহারা নয়। এমনও ত দেখেছি যে সর্বাঙ্গসুন্দরী মেয়ে বিবাহের পরে বৎসর না ঘুরতেই স্বামীহারা হ'ল—সামনে তার দীর্ঘজীবন—আত্মীয়স্বজন বড় জোর করলে তার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা—সমাজ দিলে কতকগুলি বাইরেকার বিধিনিষেধ কিন্তু তার বুভুক্ষু অন্তরের উন্মুখ ভালবাসা পার্থিব স্বামীকে নিবেদন করতে না পেরে জগৎ স্বামীকে নিবেদন না করলে ত তার তৃপ্তি নেই। জীবনের এই দিকটায় আমাদের নজর পড়ে না, তার কারণ আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনের কয়েকটি বৎসরের হাসি-কান্নার ইতিহাস দিয়েই গণ্ডীবদ্ধ—আমার জীবন এবং অপরের জীবন যে সেই একই মহৎ জীবনের স্পন্দন তা আমি অনুভব করতে পারি নে। ভাষান্তরে বলা যায় যে, আমার জীবন এবং অপরের জীবনের মধ্যেকার যে যোগসূত্র সেটা আমার কাছে হারিয়ে গেছে—তাই ইচ্ছা করলেই আমি অনুভূতির দিক দিয়ে নিজের জীবন থেকে অপরের জীবনে যেতে পারি নে।

এখানে একটা কথা উঠতে পারে। সেটা এই যে, বঞ্চিত, উৎপীড়িত এবং উপদ্রুত মানুষের যে ভগবানকে না হ'লেই চলে না এই যদি সত্য হ'ত তবে সর্বদেশে এবং সর্বকালে তার বিধান দেখি নে কেন। বিশেষ ক'রে পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীরা ত এ নিয়ে মাথাই ঘামায় না—অথচ তারা ত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। বরঞ্চ আমাদের চেয়ে তারা বেশি আরামেই আছে এবং জগতের দরবারে তাদের আসন আমাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে। আমার ধারণা এইখানেই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতার এবং সংস্কৃতির মূলগত পার্থক্য। প্রাচ্য দেশ ইতিহাসের যুগ থেকে এবং তারও আগে থেকে ভগবানকে নিয়ে অনেক গবেষণা করেছে—ভগবান যে আছেন সেটা তারা উপলব্ধি করেছে এবং সকলের কাছে সে সত্য প্রচার করেছে। সুতরাং ভগবান তাদের কাছে অনির্দেশ্য ধোঁয়ার মত কোন তর্কের বিষয় নয়—ভগবান তাদের জীবনের মূলকেন্দ্রে অনুভূতিগম্য হয়ে অবস্থান করছেন। এই কারণে প্রাচ্য দেশের শ্রুতি ও স্মৃতি, ঐতিহ্য এবং সংস্কার, সাহিত্য এবং সঙ্গীত সবই ঐ এক আদর্শের পরিপোষক এবং প্রচারক। এই আদর্শ যে-জাতি জীবনে গ্রহণ করে সে-জাতি অপরকে নিজের থেকে স্বতন্ত্র এবং পৃথক ব'লে ধারণা করতে পারে না এবং তাই না পারার ফলে তারা কারোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা (competition) করতেও পারে না। অপর পক্ষে এই প্রতিযোগিতার মন্ত্রই হ'ল পাশ্চাত্য সভ্যতার সঞ্জীবনী শক্তি—এই মন্ত্রের উন্মাদনায় এক জাতি অপর জাতিকে পিছনে ফেলে ছুটে এগিয়ে যেতে চায় বিজ্ঞানে, দর্শনশাস্ত্রে, চারু এবং কারু শিল্পে—এমন কি রাজনীতিতেও অর্থাৎ দেশের ভৌগোলিক সীমার পরিবৃদ্ধিতে। এর একটা চোখ-ধাঁধানো রূপ আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ যে জগৎ-বিধানের একটা চিরন্তন সত্য নয়, সেটা আমরা বর্তমান পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের দৌলতে নগ্ন চোখের সামনে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাচ্ছি। এই যুদ্ধে লড়াই বেধেছে বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের অর্থাৎ মারণাস্ত্রের সঙ্গে মারণাস্ত্রের, রাজনীতির সঙ্গে রাজনীতির, অর্থাৎ নিজের দেশের ভৌগোলিক সীমাকে যেন-তেন-প্রকারেণ দীর্ঘ লম্বা ক'রে টেনে অপরের দেশের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার। এই যুদ্ধের ব্যাখ্যা যদি ভাষান্তরে এই ব'লে করি যে এ লোভের সঙ্গে লোভের প্রতিযোগিতা, এ মানুষকে কে কত বেশি ঘৃণা করতে পারে, কে কত বেশি ধ্বংস করতে পারে তারি প্রতিযোগিতা—তবে সেটা কি নিছক ভুল হবে? এই যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, এই যে মানুষের বুদ্ধির এবং অধ্যবসায়ের চমকপ্রদ বিবর্তন (evolution), মানব-সভ্যতার পক্ষ থেকে এর শেষ ফল যে cataclysm, catastrophe বা debacle—আমাদের ভাষায় যাকে বলতে পারি 'প্রলয়'—তবে সেটা কি ভুল ভবিষ্যদ্বাণী হবে? প্রাচ্য দেশ এই পরিণতির বিষয় ধ্যানদৃষ্টিতে অবগত হ'য়েই জীবনকে • প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন শান্তিতে, প্রতিযোগিতার উপর নয়। সেই কারণে প্রাচ্য সভ্যতার ভিত্তির মধ্যে পরিকল্পনা রয়েছে তপোবনের, শান্তরসাস্পদ বনভূমির। বনভূমির মধ্যে বিচরণশীল ঋষি-মুনির কথা বললেই আমাদের মনে হয় আদিম গুহাবাসী কতকগুলি অসভ্য প্রাণীর কথা বুঝি বলা হচ্ছে। এই ধারণা যে সত্য নয়, তার প্রমাণ আপনারা যদি নয়াদিল্লীতে শেঠ বিড়লা-প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির দেখেন তবে নিজেরাই আমার কথার সাক্ষ্য দিতে পারবেন। মন্দিরের বাইরে দিল্লীর প্রাচীন রিজের (ridge) পঞ্জর কর্তন ক'রে সেখানে তৈরি ক'রে রাখা হয়েছে দুটি গুহা। এই গুহার সঙ্গে বর্তমান ঘরবাড়ীর তফাৎ কেবল জাঁকজমকের—principle-এর নয়। অর্থাৎ বসবাসের জন্য যেটুকু দরকার তার বেশী সরঞ্জাম আর সে যুগের লোকেরা চান নি। তাঁরা জেনেছিলেন যে এই

প্রয়োজনের, এই চাওয়ার তাগিদের সীমা নেই—একবার তার বল্গা ঢিলে ক'রে দিলে সে উদ্দাম গতিতে ছুটে চলবে—শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যাবে তার ঠিকানা নেই। সেই কারণে প্রথম থেকেই তাঁরা বল্গা টেনে ধরার শিক্ষা জীবনে গ্রহণ ক'রেছিলেন। তাই দেখতে পাওয়া যায় পল্লব-ঘন ছায়া-শীতল প্রাচীন বনভূমিতে একটা প্রশান্তির, একটা তপস্যার, জগৎপিতাকে উপলব্ধিগম্য ক'রে তোলার উপযোগী একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেখানে ছিল না ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রুতধাবন, এক জনের বিদ্যাকে পরাস্ত ক'রে আর এক জনের জয়ধ্বজা প্রতিষ্ঠিত করবার কৌশল—যেহেতু তাঁরা জানতেন সমস্ত বিদ্যাই পরিসমাপ্ত হয়েছে সেই সর্বব্যাপী ভূমাকে জানা এবং অনুভব করার মধ্যে।

পাশ্চাত্য দেশে ভগবানকে জানবার উপযোগী মনোভাব যে গঠিত হ'য়ে ওঠে নি তার আর একটা কারণ আমার মনে হয় সে দেশের বিজ্ঞানের উপর অতি-নির্ভরণ জীবনের সর্ববিধ সমস্যা-সমাধানের জন্য একমাত্র বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস এবং নির্ভর করতে শিখলে মানুষ মনে করে সে-ই সব জানে, সব বোঝে, সব করতে পারে—জীবনে তদতিরিক্ত আর কারুকে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমার সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে এই যে মানুষ কত সামান্য জেনেও মনে করে সে সব জানে। মানুষ আকাশে উড়তে পেরেছে, জলের উপর দিয়ে চলাচলের জন্য অর্ণব-পোত তৈরি করেছে, সহস্র মাইল দূরের আওয়াজ সে ঘরে বসে অবলীলায় শুনতে পায়, সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত বন্ধুর মুখ তার ইচ্ছাক্রমে তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে পারে, ল্যাবরেটরিতে উপকরণের সঙ্গে উপকরণ মিশিয়ে এক কৃত্রিম মনুষ্য-জাতি সৃষ্টির অধ্যবসায়ে সে বিভোর—বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রার গৌরবে সে মনে করে অজানার রাজ্য বুঝি নিঃশেষ হ'য়ে এল, জানার রাজ্যে তার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখলে কি এর উল্টা প্রমাণ পাই নে? আমার জীবনে সন্তান আস্‌বে কি আস্‌বে না আমি জানি নে, যদি আসে তবে সে পুত্র কি কন্যা তা জানি নে, কবে সে জন্মাবে জানি নে, কবে তার ধরণীর খেলা সাঙ্গ হবে জানি নে—প্রাত্যহিক জীবনে আমার শত চেষ্টাকে তুচ্ছ ক'রে কে তাকে বাড়ায় বা কমায়, কে তাকে সুস্থ রাখে বা অসুস্থ করে তার কোন হদিসই আমার জানা নেই। একটা ফুলের গাছ পুঁতলে বলতে পারি নে কবে তাতে ফুল ফুটবে—এক দিন দেখি আমার শত বারি-সিঞ্চনের অধ্যবসায়কে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে সে শুকিয়ে গেছে—আবার এক দিন দেখি আমার বাড়ীর পিছনের দিকে একটা অযত্নরক্ষিত ফুলগাছ অজস্র ফুলে বিভূষিত হ'য়ে আমার বাড়ীর হাওয়া একেবারে মাতাল ক'রে তুলেছে। আবহাওয়াবিদেরা (Meteorologist) এখনও প্রকৃতির খেয়ালের নিরাকরণ ক'রে নিশ্চিত বলতে পারেন না কবে বৃষ্টি আসবে, কবে আসবে ঝড়, কবে হবে ভূমিকম্প। সব চেয়ে মজা লাগে যখন এক জন মানুষ আর এক জনকে এই ব'লে সান্ত্বনা দেয় যে তোমার ভয় কি? আমি তোমার পিছনে আছি। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে অপরের জন্য কিছু করার আশা-ভরসা ছেড়ে দিলাম, মানুষ নিজের সম্বন্ধেই বা কতটুকু করতে পারে? তার নিজের জীবনের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে কি এই সত্যে উপনীত হওয়া যায় না, যে তার জীবনের কেন্দ্রে ব'সে আর এক জন চাকা ঘুরিয়েছেন, সারথিত্ব করেছেন—তা না করলে আমরা আজ যে যেখানে আছি সে সেখানে কোন দিন পৌছাতাম না? জীবনের যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে এসেছি তার দিকে ফিরে তাকালে দেখতে পাই যে জীবনের উষাকালে যাদের বন্ধুত্বে বরণ করেছিলাম তাদের কেউ আজ আশে-পাশে উপস্থিত নেই—কেউ আমাদের ফেলে পূর্বাহ্ণেই মহাপ্রস্থান করেছেন, কাউকে বা আমরা ফেলে এত দূরে সরে এসেছি যে মধ্যে অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান রচিত হয়ে গেছে—অথচ তখন আন্তরিকতার সঙ্গেই কামনা করেছিলাম যে আমাদের যেন কোন দিন ছাড়াছাড়ি না হয়। কৈশোরে যে সঙ্গিনীর সাথীত্ব কামনা ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে তোমাকে কাণ্ডারী না করলে চলবে না আমাদের জীবনের তরণী, তুমি জীবনে আসন গ্রহণ না করলে আমাদের জীবন হবে বিস্বাদ—যৌবনের মধ্যাহ্ন-খররৌদ্রে উপস্থিত হ'য়ে দেখলাম সঙ্গিনী বহু দূরে নিরলস-চিত্তে ঘর-কন্না করছেন, আমরা আছাড় খেয়ে জীবনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে আর এক দিকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছি। অথচ যেদিন আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সেদিন তার মধ্যে অসত্যের বাষ্পও ছিল না। তবু যে এ রকম হ'ল তার কারণ আমাদের জীবনে বরাবর শ্রেয়ের সঙ্গে বিরোধ লেগেছে প্রেয়ের—আমরা চেয়েছি এক কিন্তু আমাদের পক্ষে কি শুভ তা আমরা জানি নে, সে জানেন কেবল আমাদের অন্তর্যামী। তাই আমাদের অনেক চাওয়ার—অনেক ভুল ক'রে চাওয়ার হাত থেকে

অব্যাহতি দিয়ে আমাদের পক্ষে যা সত্যিকার কল্যাণ তাই দান ক'রে আমাদের জীবনের তরণীকে পারে উত্তীর্ণ করে দেওয়ার ভার গ্রহণ করেছেন সেই পারাপারের নেয়া। এই মনোভাবের দিকে ইঙ্গিত করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে।" কিন্তু এই নেওয়ার দিকে লক্ষ্য ক'রে আমরা যেন আবার তাঁর দেওয়ার দিকে দৃষ্টি না হারাই। যেমন জীবনের পথ থেকে বন্ধু সরে গেছে অমনি তার স্থান গ্রহণ করেছেন আর এক জন বন্ধু—যেমন জীবনের কক্ষ থেকে সঙ্গিনী খসে গেছে তার স্থান গ্রহণ করেছেন অপর এক জন সঙ্গিনী। এই ভাবেই জীবন-নাট্যের রসলীলা জমে উঠেছে এবং তার মধ্যে থেকে এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে বন্ধুরূপে যাকে পেয়েছি সে-ও তিনি, প্রিয়ারূপে যাকে পেয়েছি সেও তিনি, মানসী রূপে যাকে চেয়েছি কিন্তু পাই নি সেও তিনি। 'রসো বৈ সঃ'।

যে-মানুষ কোন দিন ভগবানকে চায় নি সেও যে এক দিন তাঁকে অবলম্বন করবার জন্যে হঠাৎ ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে তার কারণ জীবনের মুখোস সরে গিয়ে তার কাছে সত্য প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে। সে আবিষ্কার করে যে যে-বন্ধুকে সে প্রাণাধিক ব'লে জেনেছে তার ব্যবহার ছিল স্বার্থপ্রণোদিত। জীবনের দীর্ঘ পথে যে সঙ্গিনীর হাত ধরে সে অনেক সুখ এবং দুঃখ অতিক্রম করে এসেছে তার মনোভাব ছিল কার্পণ্যদুষ্ট। যে পিতা এবং মাতাকে সে স্নেহের নির্ঝরিণী ব'লে জেনেছিল কোন আকস্মিক অপঘাতে হঠাৎ দেহযন্ত্র বিকল হওয়ায় সে দেখলে তাঁদের স্নেহের মন্দাকিনী মন্দীভূত কিংবা শুষ্কপ্রায়। তখন সে চকিত হ'য়ে ভাবে যে এত দিন তবে করেছিলুম কি? কোন্ বালুচরের উপর বাসা বাঁধতে চেয়েছিলাম? তখন সে খুঁজতে আরম্ভ করে যে এই সব চঞ্চল এবং পরিবর্তনশীল বস্তুর পিছনে কোন অচঞ্চল এবং নিত্য সত্তা আছে কি না। তখনই হয় তার ধর্মের সত্যিকার প্রয়োজন—অথতে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। আর এই জিজ্ঞাসা সকলের জীবনে আসতে বাধ্য—কারোর দু'দিন আগে, কারোর দু'দিন পরে, কারোর এই জন্মে, কারোর জন্মান্তরে। কেন-না মানুষ যে নিজের চেয়ে বেশি কাউকে ভালবাসতে পারে না এ তার স্বভাবের কার্পণ্যদোষ—এর উপরে যাওয়ার সাধ্য তার নেই। আর এই তথ্য তার প্রিয় এবং প্রিয়ার গোচর হ'লেই তাদের ভালবাসার মোহ উবে যায়, প্রেমের সৌধ ধূলিসাৎ হ'য়ে মাটিতে মেশে।

স্বপ্ন ও বিস্মৃতি

শ্রীকরুণাময় বসু

যখন চলিয়া আসি সকরুণ বিদায়ের কালে
একটি বিধুর মুখ, ছলছল নয়নের ভাষা
উন্মন করিল মোরে; কথা ছিল হৃদয়-আড়ালে,
সে কথা হ'ল না বলা, দূরে গেল দুর্লভ দুরাশা।
আজও তাই প্রাণপ্রান্তে সকরুণ জীবনের ধ্বনি
ব্যাকুল তরঙ্গ তোলে; কত কথা মনে মনে বলি,
বলি যেন, লক্ষ্মী মেয়ে না-বলা সে কথা কি শোন নি?
সে প্রেমের উন্মুখতা, অব্যক্ত সে বাণীর অঞ্জলি
মদির মুহূর্ত্তগুলি বিচ্ছেদের খরস্রোতে ভাসি
করুণ কুসুম সম রেখে যায় দু-চারিটা দল,
তাহার সুগন্ধ স্মৃতি দূর হ'তে ব্যাকুল নিশ্বাসি
চঞ্চল বেদনা আনে, বহে আনে ম্লান অশ্রুজল।
এ স্মৃতি ভাসিয়া যাবে দূরবর্ত্তী দিনান্তের তীরে,
আর কি রহিবে মনে অতীতের বিস্মৃত বেদনা;
তবুও মুহূর্ত্ত তরে বাঁধিলাম অনন্তের নীড়ে
একটি বিমুগ্ধ স্বপ্ন, ওগো বন্ধু কভু ভুলিও না।

•

তবুও ভুলিতে হবে, পৃথিবীর বিস্মৃত ধূলিতে
কত স্বপ্ন আছে মিশা, আঁকা আছে হারান সঙ্গীতে।

সোভিয়েট রাশিয়ার যুদ্ধ-প্রাচীর-চিত্র

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়, এম-এ (লণ্ডন), এফ-আর-এ-আই (লণ্ডন)

বিমানবাহিনী যেমন আধুনিক যুদ্ধের অপরিহার্য্য অঙ্গ, প্রচার-বিভাগও তেমনি আধুনিক যুদ্ধ-কৌশলের এক মহা অস্ত্র। আবার প্রচার-বিভাগে প্রাচীর-চিত্রের স্থান বেতার-জগতের পরেই। প্রাচীর-শিল্প জাতীয় জাগরণে কিংবা কোন যুদ্ধে কতখানি কার্য্যকরী এবং শক্তিশালী হ'তে পারে তার প্রথম নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল রাশিয়ার "অক্টোবর বিদ্রোহে"র সময়। গড়খাই, সুসজ্জিত ট্যাঙ্কের মধ্যে যেমন এক দিকে চলেছিল যুদ্ধ-সঙ্গীত তেমনি অন্য দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল হাজার হাজার প্রাচীর-চিত্র যা শ্রমিকদের মনে, কৃষকদের প্রাণে এবং সৈন্যদের বুকে এনে দিয়েছিল এক নূতন প্রাণ ও নবজাগরণের সাড়া। জগদ্বিখ্যাত রাশিয়ার কবি মায়াকভ্স্কি এই যুদ্ধশিল্পীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যঙ্গচিত্র সৃষ্টি করলেন যার জন্যে আজও রাশিয়াবাসী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত ক'রে থাকে।

গোড়ার দিকে এই যুদ্ধ-প্রাচীর-চিত্রগুলি সাফল্যমণ্ডিত করতে রাশিয়ার শিল্পীদের অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিল্পীর কাজ পুরাতনের গতানুগতিক রীতি ঝেঁটিয়ে ফেলে নূতনের পথ আবিষ্কার করা। তাই চারিদিকে চলল নানা রকম পরীক্ষা এবং এ সময় প্রাচীর-চিত্রের ভার রাশিয়ার "যুদ্ধ-কাউন্সিলের ওপর গিয়ে পড়ল। তাদের উৎসাহ এবং প্রেরণায় রাশিয়ার যুদ্ধ-চিত্র ধীরে ধীরে বহুবিস্তৃত শাখা-প্রশাখায় বলীয়ান হয়ে উঠেছে এবং এই পটভূমিকায় আজ ফুটে উঠেছে নূতন সমাজের অরুণরেখা। মায়াকভ্স্কি যুদ্ধ-চিত্র এঁকেই ক্ষান্ত হলেন না, তাঁর নবীন হাত দিয়ে বেরিয়ে এল চিত্রগুলির বিষয়বস্তুর সহজ ও অনাবৃত পরিচয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, রাশিয়ার প্রসিদ্ধ প্রাচীর-চিত্রশিল্পী মুরের একখানি আঁকা ছবিতে এরূপ লেখা আছে, "তুমি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে যোগদান করেছ?" কিংবা শিল্পী কোরেট্জ্স্কি যাঁর চিত্রের বিষয়-বস্তু হচ্ছে বিশ্ব-আন্দোলন—তাঁর বিখ্যাত "ইন্টার-



শত্রুনিপাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাশিয়া



জার্ম্মানী ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণাত্মক-চুক্তির পরিণতি

ন্যাশনাল" প্রাচীর-চিত্রখানির পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই ভাবে 'tis the final conflict, let each stand in his place." অর্থাৎ "এই হচ্ছে শেষ যুদ্ধ, যে যার মত প্রস্তুত হও।" অথবা ডেইন্‌কার চিত্রে এরূপ লেখা আছে, "We must ourselves become specialists." "আমরা প্রত্যেকেই বিশেষজ্ঞ হব।"

শান্তির সময়েও, বিশেষভাবে ১৯৩১ সন থেকে আরম্ভ ক'রে যখন নানা দিক দিয়ে রাশিয়ায় গণতান্ত্রিক পরীক্ষা সুরু হ'ল তখনকার প্রাচীর-চিত্রগুলি রাশিয়ার গঠনমূলক ইতিহাসে এক অনবদ্য দান। যে শক্তিকে বড় ক'রে রাশিয়া আজ বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সেই শ্রমশিল্প-সম্বন্ধীয় কলকব্জা, কারখানা ও শ্রমিকদের জীবন প্রাচীর-চিত্রে ভরে উঠল। এই সময়ের প্রাচীর-চিত্রগুলির বিশেষত্ব হচ্ছে একটি মূর্ত্তি অঙ্কন, যাকে ঘিরে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছে যে শিল্পী তাতে কি ভাব ফোটাতে চান তা অনায়াসেই চোখে ধরা পড়ে। সব সময় প্রত্যেকটি মূর্ত্তি চিত্রের পটভূমিকার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং নূতন সমাজের নূতন মানুষ নিয়েই রাশিয়ার শিল্পীদের সুরু হ'ল কারবার।

সোভিয়েট প্রাচীর-চিত্র-পদ্ধতির উন্নততর হওয়ার মূলে আছে শিল্পীদের ঘনিষ্ঠভাবে গণ-আন্দোলনের সহিত যোগাযোগ। প্রাচীর-চিত্রের ইতি-হাসের গোড়া থেকেই সোভিয়েট শিল্পীরা তাঁদের শিল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং মূর্ত্তিগুলির সমাবেশ এমনভাবে ক'রে আসছেন যাতে জনসাধারণের মন সহজেই উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ফলে প্রাচীর ও ব্যঙ্গচিত্রগুলির প্রভাব হাজার হাজার লেখা জিনিষের চেয়েও বেশী বিস্তারলাভ করেছে এবং জনসাধারণ বাস্তব জীবনকে আরও গভীর ও ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছে। বিভিন্ন রঙের সমাবেশও এই প্রাচীর-চিত্রগুলির একটা বৈশিষ্ট্য। সোভিয়েট শিল্পীদের মতে রঙের সমাবেশ অঙ্কনের একটা অঙ্গবিশেষের জন্যেই শুধু প্রয়োগ করা হয় না, প্রতিপাদ্যবিষয়ের চরিত্র-বিশ্লেষণই তার মুখ্য উদ্দেশ্য।

আবার প্রাচীর-চিত্রগুলির সঙ্গে সোভিয়েট ব্যঙ্গচিত্রের একটা যোগাযোগ স্পষ্ট রয়েছে। ব্যঙ্গচিত্রগুলিতে যেমন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে শত্রুপক্ষের দুর্ব্বলতা, তেমনি দেখান হয়েছে মানুষের সাধারণ জীবন, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থা। এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল অজস্র ব্যঙ্গচিত্রের দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা যাদের বিচারের ভার গিয়ে পড়ল আবার এই শিল্প সম্বন্ধে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ রসিকদের ওপর।

এমন কি রাশিয়ার বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা "প্রাভ্‌দা" ও "ইজ্‌ভেস্‌তিয়া" প্রত্যহ এই সব প্রাচীর- ও ব্যঙ্গ- চিত্র



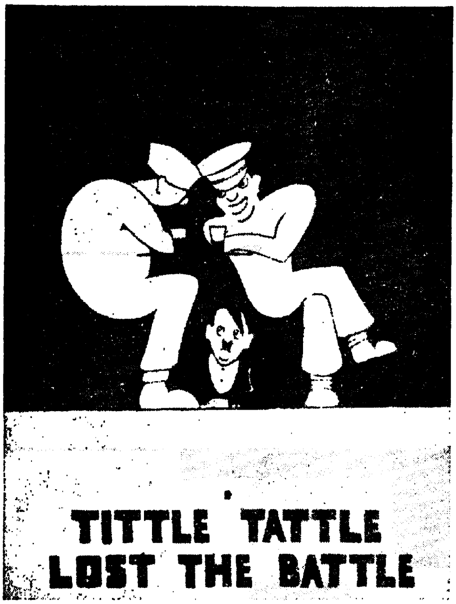
অগ্র-পশ্চাতে হিটলারকে উদ্ব্যস্ত করিবার উদ্যোগ



বলশেভিকবাদ উচ্ছেদে ভীমের শক্তি চাই—নাৎসী ভীম গোয়েবল্‌সের আস্ফালন

ছেপে জনশিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে আসছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের পুরোভাগে প্রাচীর- ও ব্যঙ্গ-চিত্র দিয়ে মাসিক ও দৈনিক পত্রিকা হাজার হাজার ছেপে পাঠান হচ্ছে, কেন না সেখানে লালফৌজদের অবসর খুবই কম, তাই তারা রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় এই সব চিত্র থেকে সহজেই উপলব্ধি করে।

এই সব প্রাচীর-চিত্রে দেখান হয়েছে বিষয়বস্তুর সহজতা, খুঁটিনাটিকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে এমন একটা সাহসিক প্রলেপ দেওয়া হয়েছে যা চোখকে পীড়িত ক'রে তোলে না। তাই সোভিয়েট ইউনিয়নে যুদ্ধ-প্রাচীর-চিত্র ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে নানারূপ প্রাচীর-চিত্রের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। এমন কি অনেক সময় কলকারখানার কঠিন সমস্যাগুলি প্রাচীর-চিত্রের সাহায্যে জনসাধারণের কাছে সহজবোধগম্য ক'রে তোলা হয়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও প্রাচীর-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা প্রচুর। নানারূপ ঘটনার সমাবেশে চিত্রগুলি অঙ্কিত। আমাদের দেশে পটুয়াদের আঁকা পটগুলি দিয়ে যেমন আবহমানকাল থেকে একটা জনশিক্ষার রীতি প্রচলিত ছিল তেমনি সোভিয়েট ইউনিয়নে সঙ্গীত, অভিনয়, শিক্ষা, কৃষি, কলাকৌশল



ফষ্টিনাষ্টিতে কার্য্যহানি

প্রভৃতি কাজে প্রাচীর-চিত্রগুলির দান অতুলনীয়। লোকশিক্ষা হিসাবে প্রাচীর-চিত্রগুলির চাহিদা বেড়ে যাওয়ার মূলে অবশ্য রয়েছে রাশিয়ার অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান এবং শ্রমশিল্পের ব্যাপক প্রসারতা লাভ। ১৯২৫ সন থেকে সোভিয়েট প্রাচীর-শিল্পধারায় যে একটা সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করা হচ্ছে তা স্পষ্টই বোঝা যায়, কিন্তু তাই বলে গতানুগতিকের স্থান সেখানে মোটেই নেই। অবস্থাবিশেষে অঙ্কন-রীতি প্রথাও সেখানে বদলে যাচ্ছে।

উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে সোভিয়েট প্রাচীর-চিত্রে প্রথম প্রথম আলোকচিত্রগুলি নানাভাবে কেটে বসান হ'ত, কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা উঠে গিয়ে বর্ণের প্রলেপ দেওয়া সুরু হয়েছে। বর্ত্তমানে রাশিয়ার প্রাচীর-চিত্র কেবলমাত্র প্রচার-উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয় না, শিল্প হিসাবেও এর স্থান খুব উঁচুতে। তাই দেখা যায়, একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রাচীর-চিত্রগুলি জাতীয় সম্পদ হিসাবে বিখ্যাত মিউ-জিয়মগুলিতে স্থান পেয়েছে। সাধারণতঃ আমাদের দেশে কোন প্রাচীর-চিত্র বললে সস্তাদরের "কমার্শিয়াল" শিল্প বোঝায়, কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে



জাপানী কবলে ভবিষ্য চীনের লাঞ্ছনা

প্রাচীর-চিত্রগুলি যাতে হালকা না হয়ে যায় তার জন্যে নানারকম ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জনশিক্ষার দিক দিয়ে এর কার্য্যকারিতাও প্রচুর। একটা জাতির সুনির্দ্দিষ্ট অগ্রগতির পথে প্রাচীর-চিত্র যে কতখানি এবং কত ভাবে সাহায্য ও প্রেরণা দিতে পারে, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাচীর-চিত্রগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

গত স্পেনের যুদ্ধে ঠিক রাশিয়ার প্রাচীর-চিত্রগুলির প্রথা অনুকরণ ক'রে সমগ্র জাতির মনে একটা নব-জাগরণের ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। বিখ্যাত শিল্পী পিকাসো স্পেনের প্রাচীর-চিত্র অঙ্কনে যোগদান করেছিলেন। পৃথিবীর শিল্প-ইতিহাসে স্পেনের প্রাচীর-চিত্রগুলির দান অপরিসীম। স্পেনের মতই চীনেও রাশিয়ার যুদ্ধ-প্রাচীর-চিত্রের অনুকরণে এক বিরাট্ শিল্প গড়ে উঠেছে যা জনসাধারণকে আজ পর্য্যন্তও উৎসাহ, শিক্ষা এবং একতাবদ্ধ হ'তে প্রতিনিয়ত প্রেরণা দিয়ে আসছে। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডেও এই যুদ্ধ-প্রাচীর-চিত্রের চাহিদা ক্রমশই বেড়ে চলেছে এবং গত বছর সেখানকার জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে রাশিয়ার এবং স্পেনের যুদ্ধ-প্রাচীর-চিত্রগুলির প্রদর্শনী বহুবার খোলা হয়। বিংশ শতাব্দীর বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে নরনারীর মুক্তি ও অগ্রগতির পথে প্রাচীর ও ব্যঙ্গ-চিত্রগুলির যে অভূতপূর্ব্ব দান তা উপলব্ধি করার সময়ও আজ আমাদের এসেছে।

আঁধি

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মরুভূমি মেঘ হয়ে এলো :
আদিগন্ত অন্ধকার, বাতাসের রুদ্ধস্বর, আকাশ ঘোরালো।
কোটি কোটি ধূলিরেণু মুঠি মুঠি তুলে নিয়ে ছড়ালে এখানে
তোমাকে চিনেছি আজ তাম্র অন্ধকারে, সুতীব্র এ দিনে।
ধ্বনি আর সংগীতের বসন্ত-উৎসব শেষে হে বিজয়ী বীর
রক্তের পতাকা তুলে উন্মুক্ত আবেগে তুমি এলে আজ :
আকাশ আবির।

শূন্য ক্ষেতে একবার উর্দ্ধে চোখ তুলে
দেখি :
সৌখিন কৈশোররাগে সিক্ত নও,
এ কি!
দুর্দম কঠিন দিনে এলে তুমি আজ
ভাঙনের তীব্র সুরে উন্মত্ত আবেগময় অন্ধ নটরাজ।

দিগন্ত মেখলা ছিঁড়ে হঠাৎ আহ্বানি কার ধূলি-ধূমকেতু
হয়েছো পাহাড়,
কনক-কিঙ্কিণী-ভাঙা ভূলুণ্ঠিত শতাব্দীর
কম্পমান হাড়।
যাযাবর হে বৈরাগী, তোমার সাধনা শুধু
বৈরাগ্যের নয়,
তুমি তো আনো নি মৃত্যু অন্ধকার অশরীরী
প্রেতছায়াময়।

তোমার পিছনে শত অশ্বের ধ্বনি
তোমার পিছনে বিপুল জীবন আছে,
ঐ শোনা যায় অশনির ঝন্‌ঝনি
স্তব্ধ বুকের অনেক অনেক কাছে।
তোমার পতাকা উদ্ধত নির্ম্মম
জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ করেছে জানি,
ওগো নিষ্ঠুর ওগো বীর অনুপম
আকাশে-বাতাসে তোমার বজ্রবাণী।
তোমার শিয়রে নতুন পৃথিবী জাগে
সবুজ ফসলে সূর্য্যের গুঁড়ো পড়ে,
কৃষক-বধূর ভ্রমর-কৃষ্ণ চোখে
আগামী দিনের মদির স্বপ্ন ঝরে।

মরুভূমি তোমার পতাকা
জ্বলন্ত স্বাক্ষর শূন্যে, রক্ত ছবি আঁকা।
একাকার এ পৃথিবী, সূর্য্যের পরাজয়, শেষে পলায়ন,
মহাশূন্য ঢেকে দিলে বর্বর বিক্ষোভে শুধু, নিষ্ঠুর চুম্বন।
বহু বর্ষ পরে আজ এই রক্ত ঝড় করেছি বরণ :
সামনে স্ফটিক দিন—হে মহাজীবন, হে মহামরণ!

গত শতাব্দীর কলিকাতা

শ্রীহরিহর শেঠ

এখনকার উচ্চচূড় প্রাসাদসম ভবনাদি, পার্ক, সুন্দর রাজপথাদি সম্বলিত কলিকাতা মহানগরীর সহিত তখনকার শহরের কোন তুলনাই হয় না। এখনকার সুখসুবিধা ও সৌন্দর্য্যের প্রায় কিছুই তখন ছিল না। বৈদ্যুতিক আলো-পাখা, পথিপার্শ্বে ফুটপাথ, পথাভ্যন্তরের ড্রেন, এমন কি কলের জল এ সব কিছুই ছিল না। তখন জলাশয় ও কূপ হইতেই সাধারণতঃ পানীয় জল সংগৃহীত হইত। বর্ষাকালে জলনিকাশের ভাল ব্যবস্থা ছিল না। যদিও বর্ষাগমে এখনও কোন কোন পথ বৃষ্টিজলে প্লাবিত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তখন স্থানে স্থানে একেবারে জলাশয়ের আকার ধারণ করিত।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে শহরের যে প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা কল্পনার অতীত। গত শতাব্দীর শেষভাগে বড়বাজার, চৌরঙ্গী, চিৎপুর, বহুবাজার প্রভৃতি অধিকাংশ স্থানই ঘন বসতিপূর্ণ থাকিলেও বালিগঞ্জ, শিয়ালদা, শ্যামবাজার প্রভৃতি স্থানে পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বেও বহু আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থান, কোথাও কোথাও বৃক্ষাচ্ছাদিত অন্ধকারময় ডোবা পুষ্করিণী, অপরিষ্কার ড্রেন প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হইত।

পাল্কি ও ঠিকা গাড়ীই তখন যানবাহনের প্রধান অবলম্বন ছিল। মোটর, ট্রাম এমন কি ফিটন্ গাড়ীও গত শতাব্দীর প্রথম দিকে ছিল না। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্পোরেশন কর্ত্তৃক প্রথম ট্রাম পরিচালনার ব্যবস্থা হয় এবং শিয়ালদা হইতে বৈঠকখানা, বহুবাজার, ডালহাউসি স্কোয়ার, ষ্ট্রাণ্ড রোড হইয়া আর্ম্মেনিয়ান ঘাট পর্য্যন্ত ট্রামলাইন পাতা হয় এবং ট্রামচলাচল আরম্ভ হয়। কিন্তু এই নূতন প্রচেষ্টায় ক্ষতির পরিমাণ অত্যধিক হওয়ায় নয় মাস পরে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে কয়েক বৎসর পরে তদানীন্তন অস্থায়ী মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানের ভ্রাতা মিঃ স্টার এবং মিঃ পারিশের চেষ্টায় কর্পোরেশনের নিকট হইতে আবশ্যক অধিকার সংগ্রহ করিয়া ব্যাপক ভাবে কলিকাতায় ট্রামচলাচলের জন্য একটি সিণ্ডিকেট গঠিত হয় এবং ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা ট্রামওয়েস কোম্পানিকে ট্রাম-লাইন প্রভৃতি মাইল-প্রতি ৪০০০ পাউণ্ড দরে বিক্রয় করা হয়। পর বৎসরের শেষভাগ হইতে রীতিমত কাজ আরম্ভ হয়। সে ট্রাম ঘোড়ায় টানিত। পরে খিদিরপুর লাইনে এঞ্জিন-পরিচালিত ট্রাম চলাচল করিত।

তখন পি এণ্ড ও কোম্পানির ভিন্ন আপ্‌কার কোম্পানি ও জার্ডিন স্কীনার কোম্পানিরও যাত্রিবাহী ষ্টীমার ছিল এবং মেকিনন্ মেকেঞ্জির দুই-একখানি ছোট স্টীমার ছিল। পণ্যদ্রব্যসকল আনিবার ও লইয়া যাইবার জন্য বড় বড় জাহাজ ছিল, জেটি না থাকায় বোটে করিয়া মালপত্র উঠান ও নামান হইত।

তখন পনর দিন অন্তর মাসে দুই বার বিলাতী মেল যাইত। একবার কলিকাতা গার্ডেন রীচ হইতে পি এণ্ড ও কোম্পানির স্টীমারে এবং পর-বার বোম্বাই হইতে ছাড়িত। কলিকাতা হইতে রেলে ও যে-সকল স্থানে রেল ছিল না ডাক রাণাররা লইয়া পুনরায় রেলে করিয়া বোম্বাই পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিত। সেইরূপ বিলাত হইতেও মাসে একবার কলিকাতায় ও অন্য বার বোম্বাইয়ে মেল আসিত। গার্ডেন রীচে যখন মেল পৌঁছিত সে সময় কলিকাতার প্রায় সকল ইউরোপীয় নবাগতদের দেখিবার ও অভ্যর্থনার জন্য তথায় উপস্থিত হইত। সে সময় এখানে মহিলার সংখ্যা অল্প থাকায় কোন অনূঢ়া যুবতী আসিলে সেই স্থানেই প্রায় তাহার বৈবাহিক সম্বন্ধের সূত্রপাত হইয়া যাইত।

কেরোসিন তৈলের ব্যবহারের পূর্ব্বে রাত্রিকালে আলোর জন্য নারিকেল ও রেড়ির তৈলই একমাত্র অবলম্বন ছিল। কেরোসিনের আবির্ভাবের সহিত অধিবাসীদের যেমন ইহার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে অনেক সুবিধা হইল, তেমনই ইহা ক্রমে একটি বিলাসের উপকরণও হইয়া উঠিল। ইহার অল্প দিন পূর্ব্বেই কলিকাতায় গ্যাসের আলোর প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা মাত্র সরকারী ভবনসমূহে ও রাস্তায় সীমাবদ্ধ ছিল। যদিও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে কলিকাতায় ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক আলোকের প্রচলন আরম্ভ হয়, তথাপি ১৮৮১তে হাওড়া জুট মিল

কোম্পানির কলে উহা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৮৯৫ হইতে সকল পাটকলে বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা হয়। কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে অনেক দিন হইতেই বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিত। রাস্তার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হ্যারিসন রোডে এই আলোর ব্যবহার হয়।

বৈদ্যুতিক আলোর সহিত ক্রমে বৈদ্যুতিক পাখারও প্রচলন হয়। তৎপূর্ব্বে টানাপাখার ব্যবহার ছিল। ধনী ব্যক্তিদের বৈঠকখানায় তখনকার বহুপ্রকার সুদৃশ্য ও বিচিত্র পাখা দেখা যাইত।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কলিকাতায় কোন বরফের কল ছিল না। এই সময় জর্জ্জ হেণ্ডার্সন কোম্পানির দ্বারা বেঙ্গল আইস কোম্পানি নামে প্রথম বরফের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে মেসার্স বাম্বারলরী কোম্পানির উদ্যোগে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুষ্টাল আইস কোম্পানি নামে অন্য একটি কোম্পানি গঠিত হয়। এই শেষোক্ত কোম্পানির আবির্ভাবের সহিত উভয় কোম্পানির মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ায় দুইটি প্রতিষ্ঠানই ধ্বংসমুখে পতিত হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে উভয়ে একত্রীভূত হইয়া ক্যালকাটা আইস্ এসোসিয়েশন লিমিটেড নামে একটি স্বতন্ত্র কারবার স্থাপন করে।

কলিকাতায় বরফের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে আমেরিকা হইতে টিউডর আইস্ কোম্পানির দ্বারা কাষ্ঠের জাহাজে ওয়েনহ্যাম্ লেক হইতে বরফ আনীত হইয়া বিক্রয় হইত। ছোট আদালতের পশ্চিমে উহা যে গুদামে রক্ষিত হইত তাহাকে "আইস হাউস" বলিত। তখন শহরের বিভিন্ন স্থানে বরফের ডিপো ছিল না, প্রত্যেককে তাঁহাদের নিত্য প্রয়োজনের জন্য কম্বলে মুড়িয়া আনিতে কম্বল-সমেত লোক পাঠাইতে হইত। সচরাচর প্রতি সের দুই আনা দরে বিক্রয় হইত। যখন বিপরীত বাতাস বা অন্য কোন কারণে জাহাজ পৌঁছিতে বিলম্ব ঘটিত তখন একত্রে এক সেরের অধিক পাওয়া যাইত না এবং অধিক পরিমাণে দরকার হইলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট প্রয়োজন হইত। সময় সময় অত্যধিক বিলম্ব ঘটিলে সাগরে জাহাজ পৌঁছিবামাত্র তথা হইতে টেলিগ্রাম্ করিয়া কলিকাতায় জানান হইত। তদ্দ্বারা ইউরোপীয় অধিবাসীবৃন্দ বিশেষ উল্লসিত হইত। সে সময় আমেরিকা হইতে আপেলও আমদানি হইত। ভারতের কোন স্থানে উহা জন্মিত না বা উহার চাষ কেহ করিত না।

সাহেবদের টেনিস্ ও ফুটবল খেলা তখন ছিল না, কিন্তু গল্ফ ও পোলো খেলা সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রথম প্রথম কি ইংরেজী কি বাংলা থিয়েটারে স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয়ের কোন ব্যবস্থা ছিল না, কিশোর ও যুবকদিগকে লইয়াই নারীর অংশ অভিনীত হইত। প্রথম পেশাদারি থিয়েটার যাহা এদেশে আইসে তাহা মিস্টার ও মিসেস্ লিউইসের অধিনায়কত্বে অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিয়াছিল এবং গড়ের মাঠে অক্টার্লনী মনুমেণ্টের পার্শ্বে অস্থায়ী কাষ্ঠনির্ম্মিত নাট্যমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়া তথায় অভিনয় হইয়াছিল। পরে মিঃ লিউইসই রয়েল থিয়েটার নামক নাট্যমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ভিন্ন ভিন্ন নাট্যসম্প্রদায় আনাইয়া অভিনয় আরম্ভ করেন।

দেশীয় থিয়েটারের ইতিহাসও খুব প্রাচীন নহে। দেশীয় অধিবাসীদের জন্য প্রমোদাগার বলিতে সাধারণতঃ থিয়েটারগুলিই ছিল, আর শীতকালে গড়ের মাঠে বিদেশাগত সার্কাসের ধুম লাগিত। তখনকার বাংলা থিয়েটারের প্রোগ্রামে 'রঙ্গালয়ে ধূমপান নিষেধ' লিখিতে কখনও ভুল হইতে দেখা যাইত না। কিছু কাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত অভিনয়কালে প্রত্যেক অঙ্কের প্রারম্ভে একটি সুদীর্ঘ ঐকতান বাদনের ব্যবস্থা ছিল। আজকাল সাধারণ থিয়েটারে যেমন সচরাচর কোন একটি বিষয় লইয়া কয়েক ঘণ্টা মাত্র অভিনয় হইয়া থাকে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। প্রায় সমস্ত রাত্রিব্যাপী অভিনয় হইত এবং অভিনয়ের একটি মূল বিষয়ের সহিত হাস্যকৌতুককর একটি ছোট হাল্কা স্বল্পসময়োপযোগী নাটকও অভিনীত হইত। তাহাকে ফার্স বলিত। মূল আহার্য্যের সহিত চাটনির মত যেন ফার্স বা প্রহসন একটা থাকা অপরিহার্য্য ছিল। নাটকগুলি প্রায় সবই পৌরাণিক ছিল, কদাচিৎ কোন ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হইতে দেখা যাইত। আর প্রহসনগুলি অনেক সময়ই সাময়িক সামাজিক বিষয়াদি লইয়া লিখিত হইত। এখনকার মত তখন এখানে-সেখানে দেওয়ালে, প্রাচীরগাত্রে এত প্লাকার্ড হ্যাণ্ডবিলের আধিক্য দেখা যাইত না। স্থানে স্থানে থিয়েটারের বড় বড় প্ল্যাকার্ডই দেখা যাইত।

হাওড়ার পুল ১৮৭৪ সালে স্যর্ ব্রাড্ফোর্ড লেসলি দ্বারা নির্ম্মিত হয়। তৎপূর্ব্বে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর পারাণি নৌকা যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল। পুল নির্ম্মাণের পর কিছু কাল ধরিয়া লোক-প্রতি সামান্য টোল আদায় করা হইত। পুলনির্ম্মাণের পূর্ব্বে মালপত্র ও লোকজন যাতায়াতের অসুবিধা যথেষ্টই ছিল। হাওড়ার অবস্থা তখন খুবই খারাপ ছিল। তখন ইহা কর্দ্দমাক্ত নর্দ্দমা ও ডোবাপূর্ণ মাত্র একটি অপরিচ্ছন্ন নগর ছিল।

হাওড়ার স্টেশনটি তখনকার দিনের পক্ষে একটি বড় স্টেশন হইলেও এখনকার তুলনায় উহা অতি সামান্যই ছিল। বর্ত্তমানে যেখানে মালগুদাম আছে তখন ঐ স্থানে সুউচ্চ করগেটের চালার মধ্যে মাত্র দুইটি টালিপাতা লম্বা প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম ছিল। উত্তর দিকের প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে স্টেশন মাস্টারের অফিস, পার্শেল অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস প্রভৃতি পাশাপাশি অবস্থিত ছিল এবং প্রত্যেক ঘরের সম্মুখে বড় বড় সাদা অক্ষরে অফিসের নামাঙ্কিত টানাপাখার ন্যায় কাল রঙের বোর্ড ঝুলিতে দেখা যাইত। নিম্ন শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য কোন বিশ্রামস্থান ছিল না, কেবল উপস্থিত যেখানে উত্তর দিকের গাড়ীবারান্দা আছে ঐ স্থানে একটি করগেটের অর্দ্ধগোলাকৃতি ছাদবিশিষ্ট প্রশস্ত শেড্ ছিল। যত দূর মনে হইতেছে উহার মেজে কাঁচা ছিল। ঐ স্থানেই কোন কোন যাত্রীকে ভূমিতে বা দুই একখানি বেঞ্চে বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত। এই ঘরের উত্তরাংশে টিকিট বিক্রয় হইত। রাত্রে আলোর জন্য উপরে বহুসংখ্যক নিম্নমুখী বার্নার-বিশিষ্ট চক্রাকার গ্যাসের আলো ছিল। এক্ষণে আর সেরূপ ধরণের আলো কোথাও দেখা যায় না। তখনও অন্যত্র কোথাও সেইরূপ আলো ছিল না। পরে এ শেড্ ভাঙিয়া ঐ স্থানে একটি অতি সামান্য রকমের প্ল্যাটফর্ম্ম প্রস্তুত হয়। উহার মাত্র সাত-আট হাত উর্দ্ধে পুরাতন রেলের থামের উপর অবস্থিত একটু করগেটের আচ্ছাদন ছিল, যাহা বর্ষাকালে বৃষ্টির জলের ছাট হইতে যাত্রীদের রক্ষা করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সে সময় স্টেশনের বাহিরের পথগুলি অপরিষ্কার ছিল, সেখানে যানের মধ্যে কতিপয় ছ্যাকড়া গাড়ী ও অনেকগুলি পাল্‌কি থাকিত।

শিয়ালদহ স্টেশনটি তখন হাওড়া স্টেশন অপেক্ষা তুলনায় ভাল ছিল। উহার মধ্যে একটা গাম্ভীর্য্য ছিল। সেরূপ বড় বড় খিলানবিশিষ্ট ছাদ তখন অন্যত্র কোথাও দেখা যাইত না। কিন্তু স্টেশন-সান্নিধ্যে এত ঘরবাড়ী ছিল না। এখনও ছাগ-মেষাদির জন্য যেমন দুই থাক-বিশিষ্ট গাড়ী মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, তখন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য সেই প্রকার গাড়ীও দেখা যাইত।

মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা তখন হীন ছিল। অনেক রাস্তা-ঘাটের অবস্থা এখনকার তুলনায় খুব খারাপ ছিল। অপ্রশস্ত গলি এখনকার মত খাদরি করা ছিল না, অনেক স্থলে বাঁধান পর্য্যন্ত ছিল না। মোটা মোটা চিম্‌নির মধ্যে কেরোসিনের আলো অনেক গলিতে দেখা যাইত। বড় বড় পথিপার্শ্বে বিশেষ যে সব রাস্তায় ট্রাম চলাচল ছিল, সেস্থানে মধ্যে মধ্যে রাস্তা ও ফুটপাথের মধ্যের সংযোগ-স্থানে ঘোড়ার জলপানার্থ লৌহনির্ম্মিত বড় বড় জলপূর্ণ জলাধার ছিল। ট্রামের ঘোড়াগুলিকে ট্রামে-যোড়া অবস্থাতেই জলপান করিতে দেখা যাইত। গরমের দিনে সর্দ্দীগর্ম্মি হইয়া পথে পড়িয়া অনেক ঘোড়া মারা যাইত। তখনও অনেক বাড়ীতে কূয়া ও কূয়া-পায়খানা ছিল। ড্রেন-পায়খানার প্রচলন তখনও হয় নাই, সমস্তই খাটা পায়খানা ছিল। পথিপার্শ্বের আবর্জ্জনা ফেলিবার জন্য ক্ষীণকায় একটি অশ্ব-পরিচালিত এক প্রকার খোলা কাঠের গাড়ী ছিল; মশা-মাছির উপদ্রব যথেষ্টই ছিল।*

* মঁটেগু ম্যাসে লিখিত Recollections of Calcutta for over half a Century নামক ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তক হইতে অনেক কথা গৃহীত হইয়াছে।

মহাবৈষ্ণব বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

অন্যায় সহিয়া চলি নিত্য নতশিরে
সুখনীড় পাছে ভাঙে। তাই তো জাতিরে
পঙ্গু করি রাখিয়াছে দাসত্ব-শৃঙ্খল
মৃত্যুর শাসন আজও রয়েছে অচল।
ব্যাপ্ত করি দিলে তুমি মেঘমন্দ্রস্বরে
বীর্য্যের কঠিন মন্ত্র দিগ্ দিগন্তরে।
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের উদ্ধার
প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম—করিলে প্রচার।

গীতার কৃষ্ণরে, হায়, ভুলে গেনু কবে!
যাত্রার কৃষ্ণরে ল'য়ে মাতিনু উৎসবে।
আসিল ক্লৈব্যের নিশা। ঘুচাতে আঁধার
পাঞ্চজন্যধারী কৃষ্ণে বসালে আবার
জাতির হৃদয়াসনে। হীনবীর্য্য ক্লীব
ভিক্ষাপাত্র দূরে ফেলি ধরিল গাণ্ডীব।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ইংলণ্ডের নিকট ভারতের পাওনা

যুদ্ধের তিন বৎসরে ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের আর্থিক সম্বন্ধ পরিবর্তিত হইয়াছে, ভারতবর্ষ এখন পাওনাদার এবং তাহার পাওনা বহু কোটি ষ্টার্লিং বিলাতে পড়িয়া রহিয়াছে। এই তিন বৎসরে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে যে-সব মাল লইয়াছেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন আপিসে তাহার মূল্য বাবদ ষ্টার্লিং জমা দিয়াছেন আর ভারত-সরকার এদেশে নোট ছাপিয়া মূল্য পরিশোধ করিয়াছেন। এই ভাবে কোটি কোটি টাকার ষ্টার্লিং জমিতে থাকে। প্রথমটা এই জমানো ষ্টার্লিং দিয়া বিলাতের নিকট ভারতবর্ষের যে-সব দেনা ছিল তাহার অধিকাংশ মিটাইয়া ফেলা হয়। কিন্তু ইহার পরেও আরও ষ্টার্লিং জমিতেছে। অতঃপর ক্রমবর্দ্ধমান এই বিপুল পরিমাণ ষ্টার্লিং লইয়া কি করা হইবে সে সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হইয়াছে।

ভারতবাসী চাহে এই ষ্টার্লিং দিয়া ভারতবর্ষে অবস্থিত বিলাতী কোম্পানীগুলির, বিশেষতঃ পাবলিক ইউটিলিটি কোম্পানীদের সমস্ত শেয়ার ক্রয় করিয়া লওয়া হউক। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট, ভারত সরকার এবং ব্রিটিশ বণিক্‌কুল কেহই এই প্রস্তাবে রাজী নহেন। ইহার কারণ দুর্বোধ্য নহে। আমেরিকা ব্রিটেনকে মাল সরবরাহ করিয়া সেই পাওনা টাকায় আমেরিকাস্থ বিলাতী বহু কোম্পানী ও জমিদারীর শেয়ার ক্রয় করিয়া লইয়াছে। সেখানে বিলাতী আপত্তি খাটে নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের কথা স্বতন্ত্র। এখানে উক্ত প্রস্তাব উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সরকারের অর্থসচিব বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে ঐ জমানো ষ্টার্লিং দিয়া একটা মোটা রকমের পেন্সান ফণ্ড করা হউক, অর্থাৎ যে-সব শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান এদেশে আসিয়া চাকুরী করিয়া পেন্সান পাইয়াছেন তাঁহাদের পেন্সান যে বরাবর চলিবে তাহার একটা ব্যবস্থা থাক। এই ব্যবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, কারণ ভারত-শাসন আইনে একটি বড় রকমের রক্ষা-কবচ বসাইয়া অবসর-প্রাপ্ত সিভিলিয়ান প্রভৃতির পেন্সানের পাকা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকিবেই, ব্রিটেন এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া থাকিলে এইরূপ একটি ফণ্ড সৃষ্টির কোন প্রয়োজন থাকে না। ভারতবর্ষ ব্রিটেনের হস্তচ্যুত হইবার সম্ভাবনা যখন নাই-ই তখন পেন্সান ফণ্ড সৃষ্টি করিয়া টাকাটা বিলাতে জমা রাখিতে অথবা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সিকিউরিটির পরিবর্তে আগে হইতেই ভারতবর্ষের পাওনা টাকা কাটিয়া লইতে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এত উৎসুক কেন?

ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ইচ্ছা এই টাকায় বিলাতে একটি পুনর্গঠন ফণ্ড তৈরি হউক এবং টাকাটা বিলাতেই মজুত থাকুক। যুদ্ধের পর ব্রিটেন এবং ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনের সময় এই টাকাটা বিশেষ কাজে লাগিবে। এই প্রস্তাবের মর্ম্মার্থ অনুধাবন করাও কঠিন নহে। যুদ্ধের পর ব্রিটেন পুনরায় তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য সুরু করিবে। আমেরিকায় কোন মাল ভবিষ্যতে চালান দেওয়া কঠিন হইবে, অষ্ট্রেলিয়া কানাডা প্রভৃতি ডোমিনিয়নও যে ভাবে শিল্পোন্নতি করিয়া লইয়াছে তাহাতে ঐ সব বাজারেও বিশেষ সুবিধা হইবে না। ইহা ছাড়া ডোমিনিয়নগুলি নিজেরা আলাদা ভাবে আমেরিকার সহিত ঋণ ও ইজারা আইন অনুসারে যে-সব চুক্তি করিতেছে তাহার ফলে যুদ্ধের পর বহু দিন আমেরিকার সহিতই উহাদিগকে বাণিজ্য করিতে হইবে। চীনেও ভবিষ্যতে কতট সুবিধা হইবে বলা কঠিন। অবশিষ্ট থাকে দুইটি মাত্র বিক্রয়-কেন্দ্র, কামধেনু ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকা। সুতরাং ভারতবর্ষের একটা মোটা টাকা হাতে আটকাইয়া রাখিলে ভারতবর্ষ বিলাত হইতেই যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, কাপড় প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় মাল আমদানী করিতে বাধ্য হইবে। জমা টাকার মায়ায় অপর দেশে ঐ সব দ্রব্য সস্তায় পাইলেও ক্রয় করিবার উপায় তাহার থাকিবে না।

টাকাটাও কম নয়, এখনই উহার পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকা এবং সপ্তাহে প্রায় ১০ কোটি টাকা করিয়া পাওনা বাড়িতেছে। ৪০০ কোটি টাকা দেনা ইতিমধ্যে শোধ দেওয়াও হইয়াছে।

—

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

বাংলার ভূতপূর্ব মন্ত্রিমণ্ডল ঘোষণা করিয়াছিলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দেওয়া হইবে এবং প্রজার সহিত সরকারের সাক্ষাৎ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে। বাংলা

দেশের বর্তমান অবস্থায় জমিদারী প্রথার অবসানই প্রার্থনীয়। এখানে জমিদার প্রধানত: হিন্দু এবং প্রজা মুসলমান। খাজনার জন্য জমিদার গবর্মেণ্টের নিকট দায়ী, নির্দিষ্ট দিনে সূর্য্যাস্তের মধ্যে খাজনা দাখিল করিতে না পারিলে জমিদারী নিলাম হইয়া যায়, কিন্তু প্রজার অনাদায়ী খাজনা আদায় করিতে জমিদারকে বহু প্রকারে বেগ পাইতে হয়। তদুপরি হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন আছে। মুসলমান প্রজার নিকট হিন্দু জমিদার বাকী খাজনা দাবী করিলে তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় জমিদার হিন্দু বলিয়াই তাহার অসুবিধার প্রতি সে দৃক্‌পাত করিতে চাহে না। এই ভাবে মুসলমান প্রজার নিষ্ফল আক্রোশই হিন্দু জমিদারের ভিতর দিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজের উপর গিয়া পড়ে। জমিদারের পরিবর্তে গবর্মেণ্ট প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায়ের ভার লইলে গবর্মেণ্টকেই প্রজার সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইবে। হিন্দু স্বার্থ মুসলমান স্বার্থ এই ভাবে উঠিয়া গিয়া রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও প্রজা-স্বার্থ তাহার স্থান গ্রহণ করিবে; সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টির একটা প্রধান উপায় তিরোহিত হইবে।

উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাইলে জমিদারেরা তাঁহাদের জমিদারী ছাড়িতে যে দ্বিধা করিবেন না, বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের আলোচনাতেই তাহা বুঝা গিয়াছে।

—

বিচারের প্রহসন

নাগপুরের জনৈক স্পেশাল জজের বিচারে একটি পুলিস চৌকি পোড়াইবার অভিযোগে সাত ব্যক্তি দুই বৎসর তিন মাস করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সেসন জজ ম্যাজিষ্ট্রেট অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্পেশাল জজের রায় বাতিল করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, "অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দুইটি কনষ্টেবলের সাক্ষ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। দুই জনের সাক্ষ্যে সাত জনের দুই বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই দুই জন সাক্ষী নির্ভরযোগ্য হওয়া চাই। এক্ষেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেট কেমন করিয়া ভ্রান্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিলেন এবং প্রমাণ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা না করিয়া কেমন করিয়া দুই ব্যক্তিকে জেলে পাঠাইয়া দিলেন, আমি তাহা বুঝিতে অক্ষম। কোন ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত না-হওয়া পর্যন্ত তাহাকে নির্দোষ বলিয়া মনে করিতে হইবে। বর্তমান মামলায় সম্পূর্ণরূপে অন্যায় বিচার হইয়াছে এবং আমার মনে হয় এই ম্যাজিষ্ট্রেট যে শুধু বিচারকের দায়িত্ব পালনেই অক্ষম তাহা নহে, ম্যাজিষ্ট্রেটের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্যতাও ইহার নাই।"

পুলিসের সাক্ষ্যে অতিরিক্ত আস্থা স্থাপনে এদেশের এক শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রবল আগ্রহের বহু পরিচয় ইতিপূর্বেও মিলিয়াছে। বিচার ও শাসন বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিবার দাবীও বহুবার উঠিয়াছে, কিন্তু গবর্মেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। ভারতরক্ষা-আইনে ম্যাজিষ্ট্রেটদেরই বহু স্থানে স্পেশাল জজে পরিণত করিয়া তাঁহাদের হাতে অপরিমিত ক্ষমতা অর্পণ এখনও বন্ধ হয় নাই।

—

গবর্ণরের কার্য্যের সমালোচনা বে-আইনী নহে

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলার মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিয়া গবর্ণরকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, "জন্মভূমি" নামক বোম্বাইয়ের একটি গুজরাটী সংবাদপত্র উহার গুজরাটী অনুবাদ প্রকাশ করে। বোম্বাই-সরকার এই অভিযোগে "জন্মভূমি"র জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়া নূতন জামানত তলব করেন। "জন্মভূমি" সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিলে বোম্বাই হাইকোর্ট জামানত তলবের আদেশ নাকচ করিয়াছেন, এবং প্রাদেশিক গবর্ণরদের কার্য্যকলাপের সমালোচনার অধিকার সম্বন্ধে দেশে যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তাহা নিরসন করিয়া দিয়াছেন।

প্রধান বিচারপতি রায়ে বলিয়াছেন যে, আলোচ্য পত্রটিতে 'প্রধানত: গবর্ণরের সহিত মন্ত্রীদের সম্পর্কের কথাই সমালোচনা করা হইয়াছে। ডাঃ মুখার্জ্জির মূল অভিযোগ এই যে, গবর্ণর ভারত-শাসন আইন এবং রাজকীয় উপদেশপত্রের মর্মার্থ পালন করেন নাই, মন্ত্রীদের সহিত সকল সময় তিনি আলোচনা করেন নাই, তাঁহাদের পরামর্শ শোনেন নাই, এবং মন্ত্রিসভা-সমর্থক দল অপেক্ষা বিরোধী দলের প্রতিই তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলা দেশে প্রচারিত কোন সংবাদপত্রে এই পদত্যাগপত্র প্রকাশিত হইলেও উহাতে অপরাধ হইত কি না প্রধান বিচারপতি সে সম্বন্ধেও সংশয় প্রকাশ করিয়া বলেন যে, কোন মন্ত্রীর পদত্যাগের কারণ প্রকাশিত হইলে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে কিরূপে ঘৃণা বা অবজ্ঞার পরিচয় দেওয়া হয় তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

পদত্যাগ করিলে উহার কারণ জানাইবার—মন্ত্রীদের সহিত গবর্ণরের ব্যবহারের সমালোচনা

যথোপযুক্ত ভাষায় করিবার অধিকার প্রত্যেক মন্ত্রীর আছে।

যে-দেশে কনষ্টেবলের কার্য্যের সমালোচনা করিলেও সিডিশনের অভিযোগে পড়িতে হয়, সেখানে গবর্ণরের কার্য্যের প্রতিবাদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে ইহাই স্বাভাবিক। দেশের "গণতান্ত্রিক" ব্যবস্থা-পরিষদে গবর্ণরের বেতন ও ভাতা প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা নিষিদ্ধ করিয়া গবর্ণরকে সমালোচনার উর্দ্ধে রাখিবার চেষ্টাও হইয়াছে। গবর্ণরের কার্য্যের সমালোচনা করিলেই যে তাহা বে-আইনী হয় না—বোম্বাই হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত সিডিশন-আইনের ব্যাখ্যার উপর নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছে।

—

মেদিনীপুর ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বেচ্ছাচারিতা

কলিকাতা হাইকোর্টেও সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় প্রদত্ত হইয়াছে। মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন. এম. খাঁর ব্যবহারের বিরুদ্ধে গত ছয় মাস যাবৎ সংবাদপত্রে ও ব্যবস্থা-পরিষদে বহু সমালোচনা হইয়াছে, কিন্তু বাংলার গবর্ণর-শাসিত গবন্মেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত মাত্র করেন নাই। মন্ত্রিসভা ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। প্রশ্রয় পাইয়া উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটটির হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায় এবং অন্যায় ভাবে এক ব্যক্তির নামে তিনি মামলা দায়ের করিবার আদেশ দেন। বেঙ্গল নাগপুর রেলের জনৈক কর্ম্মচারীর যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ সত্ত্বেও তিনি তাঁহার মোটরকার ভারতরক্ষা-আইনের বলে কাড়িয়া লন এবং বি. এন. আরের এজেণ্ট তাঁহার এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। এজেণ্টের বিরুদ্ধে কিছু করিতে না পারিয়া তিনি উক্ত কর্ম্মচারীর নামে মামলা দায়ের করেন। ভদ্রলোক মামলা নাকচের আদেশ প্রার্থনা করিয়া হাইকোর্টে আবেদন করেন। বিচারপতি এজলী রায়ে বলেন যে ইহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার কোন আইন-সঙ্গত কারণ ছিল না। বিচারপতি সেন তীব্র ভাষায় মন্তব্য করিয়া রায় দেন এবং বলেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট আক্রোশ চরিতার্থ করিবার জন্যই এই মামলা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্য স্বেচ্ছাচারিতার পরিচায়ক হইয়াছে।

"গবন্মেণ্টের প্রেষ্টিজ" রক্ষার জন্য এই শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে বে-পরোয়া ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দিতেও বাংলার গবর্ণর কুণ্ঠিত হন নাই। ব্যবস্থা-পরিষদে প্রকাশ্য আলোচনার ফলে প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক স্বীকার করিয়াছিলেন যে, মেদিনীপুরের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ উঠিয়াছে তাহার প্রকাশ্য তদন্ত আবশ্যক। একটি ট্রিবিউনাল অবিলম্বে বসাইবার প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়াছিলেন, কিন্তু মাসাধিক কালের মধ্যেও তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। পরিষদে ইউরোপীয় দল এই প্রকার তদন্তের বিরোধিতা করিয়াছেন। সরকারী প্রেষ্টিজ রক্ষার নামে অযোগ্য এবং স্বেচ্ছাচারী কর্মচারীকে প্রশ্রয় দিলে উহার ফল যে সম্পূর্ণ বিপরীত হয়, বিচারপতি এজলী ও সেনের রায়ে তাহাই সুস্পষ্ট হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত মেদিনীপুরে অপর ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিতেই হইয়াছে, কিন্তু এই প্রকার মামলা হইবার পূর্বে জনমত মানিয়া লইয়া খাঁ সাহেবকে মেদিনীপুর হইতে সরাইয়া দিলেই উহা সঙ্গত ও শোভন হইত।

—

বাঁকুড়া জেলা বোর্ড

বাঁকুড়া দর্পণ (১৬ই মার্চ) লিখিতেছেন,

"গত ১৩ই মার্চ স্পেশাল মিটিঙে বাজেট পাস হইয়া কমিশনারের নিকট যাইতেছে। এই বাজেটেও নাকি লক্ষাধিক টাকা ঘাটতি দেখানো হইয়াছে। ২০শে মার্চের সভায় জেলা বোর্ডের হেলথ অফিসারের কুইনাইন ইত্যাদির ব্যবস্থার জন্য কলিকাতা যাতায়াত খরচ বাবদ প্রায় ৪৭৲ টাকার ট্রাভলিং বিল সমর্থনের জন্য পেস করা হইবে। জেলা বোর্ডের ডিস্‌পেনসরীগুলির মধ্যে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ইন্দাস থানার ডিসপেনসরীতে নিত্যপ্রয়োজনীয় টিংচার আইডিন, ম্যাগসালফ, ক্যাষ্টর অয়েল, কুইনাইন, সিনকোনা প্রভৃতি কিছুই নাই। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, তত্রত্য হাসপাতাল কমীটি নাকি বোর্ড হইতে কুইনাইনাদি কোন ঔষধ না পাইয়া স্থানীয় সাহায্যকারিগণের চাঁদার টাকা হইতে ঔষধ কিনিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাহাও পান নাই। উপরন্তু আরও অবগত হইলাম হেলথ অফিসার কুইনাইন পাইবেন কি না সংবাদ না লইয়াই কলিকাতা পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেণ্টে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। কোন কার্য্য হয় নাই, অথচ ট্রাভলিং বিল দেউলিয়া বোর্ডকে দিতেই হইবে।"

বাঁকুড়া জেলা বোর্ডের অব্যবস্থা ও দুর্নীতি দূর করিবার জন্য বহু দিন যাবৎ আন্দোলন চলিতেছে, কিন্তু কোন ফলই হয় নাই। স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া এক জন যোগ্য চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবার অবসর আজও পান নাই। বোর্ড নিজে যেখানে ঔষধ সরবরাহ করিতে পারেন নাই, সেখানে স্থানীয় হাসপাতাল কমীটি ঔষধ ক্রয় করিতে চাহিয়া অনুমতি পান নাই ইহাও আশ্চর্য্য। হাসপাতাল কমীটিকে ঔষধ ক্রয় করিবার অনুমতি দিলে কি বোর্ডের সরকারী প্রেষ্টিজ ক্ষুণ্ণ হইবে?

মিথ্যা প্রেষ্টিজ ও ভ্রান্ত মর্যাদাবোধ এ দেশের দরিদ্র জনসাধারণের অশেষ ক্ষতিসাধন করিতেছে।

—

সিভিল সাপ্লাই ডিরেক্টোরেটে পরিবর্তন

সিভিল সাপ্লাই ডিরেক্টোরেটের সমস্ত কর্মচারী শেষ পর্য্যন্ত পরিবর্তিত হইয়াছে। চাউল চালান দিবার বাধা-নিষেধের কড়াকড়িও কতকটা হ্রাস করা হইয়াছে। জেলা হইতে জেলান্তরে চাউল চালানের নিষেধাজ্ঞা বাতিল করিয়া চালান সম্পর্কে বাংলা দেশকে তিনটি এলাকায় বিভক্ত করিবার ফলে চাউলের দরও কিছু কমিয়াছে।

সিভিল সাপ্লাই বিভাগের কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও দূরদর্শিতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বহু সমালোচনা হইয়াছে। গত ছয় মাস যাবৎ সংবাদপত্রে এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এই অভিমতই প্রকাশ পাইয়াছে যে, মূল্য-নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক কিন্তু সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে উহার পরিণাম ক্ষতিকর হইবে। সিভিল সাপ্লাই বিভাগ ইহাতে কর্ণপাত মাত্র করেন নাই। মূল্য-নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা তাঁহারা সরবরাহ-নিয়ন্ত্রণের উপর ঝোঁক দিয়াছেন বেশী; ইহার ফলে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং জনসাধারণকে অনাবশ্যক ক্ষতি ও লাঞ্ছনা স্বীকার করিতে হইয়াছে। এক মাস পূর্বেও আমরা লিখিয়াছিলাম যে, চাউলের মূল্য কমাইবার উপায় (১) সমস্ত রপ্তানী একেবারে বন্ধ করা, (২) চালান সম্পর্কে সমস্ত বাধা প্রত্যাহার করা এবং (৩) কিছু চাউল গবর্মেণ্টের হাতে মজুত রাখিয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের বিনিময়-হার-নিয়ন্ত্রণ দণ্ডের ন্যায় উহা ব্যবহার করা। চালান দেওয়ার বাধা-নিষেধের কড়াকড়ি হ্রাস হইবার সঙ্গে সঙ্গে চাউলের দর কমিয়াছে ইহা উল্লেখযোগ্য। ভবিষ্যতে বাংলা দেশ হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানী যদি একেবারে বন্ধ করা হয় এবং জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে চাউল চালান দেওয়ার সমস্ত বাধা প্রত্যাহার করিয়া নৌকা প্রভৃতি ফিরাইয়া দিলে বৎসরের শেষে হয়ত বিশ-পঁচিশ টাকা মন দরে চাউল পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

সিভিল সাপ্লাই ডিরেক্টর শ্বেতাঙ্গের বদলে কৃষ্ণাঙ্গ হইলে দেশবাসীর কোন লাভ নাই। আমরা বহুবার বলিয়াছি, এদেশে সিভিলিয়ান কর্মচারীদের সহিত জনসাধারণের কোন প্রকার যোগ না থাকাতে ইহারা কোন ক্ষেত্রেই দেশবাসীর বিপদে সাহায্য করিতে পারেন না। ঝটিকা বা বন্যা প্রভৃতি দ্বারা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্য দান সংগঠনে একটি জনসেবা-প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক যে সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে, কোন সিভিলিয়ান তাহা পারেন না। ফাইল সহি এবং রুটিন মাফিক কাজ করিতে যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহাদের নিকট হইতে ইহার অতিরিক্ত কিছু আশা করাও কঠিন। ডিরেক্টোরেটের নূতন কর্মচারীদের কাহারও কাহারও পাকা সেক্রেটরী বলিয়া খ্যাতি আছে বটে, কিন্তু চাউলের মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ন্যায় বিরাট্ দায়িত্ব গ্রহণ করিবার মত যোগ্যতার পরিচয় ইঁহারা দিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

—

কাগজ উৎপাদন

ভারতবর্ষে কাগজ উৎপাদন, আমদানী ও বণ্টন সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় পরিষদে বাণিজ্য-বিভাগের সেক্রেটরী যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা হইতে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য জানা গিয়াছে। রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিঃ হোসেন ইমাম একটি প্রস্তাব আনিয়াছিলেন যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের এবং নাগরিকদের জন্য কাগজের পরিমাণ বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হউক এবং কাগজ ব্যবহার কমাইবার উপায় আবিষ্কারের জন্য সরকারী ও বেসরকারী সদস্য লইয়া একটি কমীটি গঠিত হউক। ইহার কয়েক দিন পূর্বে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে সর্ ফ্রেডারিক জেম্স বলিয়াছিলেন যে ভারত-সরকার বিলাতী দৃষ্টান্তের অনুকরণে এদেশে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের অনুপাত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু বিলাতী আদর্শে এ দেশে বেসরকারী সদস্য লইয়া কাগজ ব্যবহার কমাইবার উপায় আবিষ্কারের জন্য কোন কমীটি গঠন করিতে সম্মত হন নাই।

বাণিজ্য-বিভাগের সেক্রেটরী মিঃ ইমামের প্রস্তাবের জবাবে যথারীতি আশ্বাস দিয়াছেন যে, দেশে কাগজ উৎপাদন বাড়াইবার জন্য গবর্মেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণে প্রকাশ ১৯৪২-৪৩-এ যত কাগজ ভারতে তৈরি হইয়াছে, ১৯৪৩-৪৪-এ তদপেক্ষা শতকরা ১৫ ভাগ অর্থাৎ ১৪ হাজার টন বাড়িবে। সরকারী সংখ্যাতত্ত্বের মহিমা বুঝিয়া উঠা কঠিন। ভারত-সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার দপ্তর হইতে প্রকাশিত মাসিক বিবরণীতে প্রকাশ ১৯৪১-৪২-এ দেশে প্রায় ৯৩ হাজার টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু পর-বৎসরের

প্রথম ৬ মাসের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় উৎপাদনের পরিমাণ অকস্মাৎ শতকরা ৩০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। ১৯৪২-এর মার্চ মাসে উৎপন্ন হইয়াছে ৭ হাজার টন, এপ্রিল মাসেই উহা কমিয়া ৫½ হাজার টন হইয়াছে এবং তদবধি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোন মাসেই গড়ে ৫ হাজার সাড়ে পাঁচ হাজার টনের বেশী উৎপন্ন হয় নাই, অথচ গত বৎসর গড়ে মাসিক প্রায় ৮ হাজার টন উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার কারণ কি? সেক্রেটরী সাহেব ১৯৪২-৪৩ অপেক্ষা বর্তমান বর্ষে কত বেশী উৎপাদন হইবে তাহার হিসাব দিয়াছেন কিন্তু ১৯৪১-৪২ সম্বন্ধে নীরব কেন?

হাতে তৈরি কাগজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভারত-সরকার প্রকৃত পক্ষে কোন চেষ্টাই করেন নাই। যুক্তপ্রদেশে প্রায় হাজার টন কাগজ কুটীরে তৈরি হয়। হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই এবং বাংলা দেশেও কম হয় না। এই কুটীর-শিল্পটিকে প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট কিছু সাহায্য করিলেও উৎপাদন অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইত। যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস-গবর্মেণ্টের চেষ্টার জের টানিয়া চলিয়াছেন বলিয়াই সেখানকার বর্তমান গবর্মেণ্ট অন্ততঃ হাজার টন উৎপাদনও দেখাইতে পারিয়াছেন।

—

গবর্মেণ্টের কত কাগজ লাগে?

বাণিজ্য-বিভাগের সেক্রেটরী বলিয়াছেন ভারতবর্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণের ব্যবহারে বার্ষিক ১ লক্ষ ৯৯ হাজার টন এবং সরকারী প্রয়োজনে ২০ হাজার টন কাগজ লাগে। সমগ্র উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ গবর্মেণ্ট দখল করিয়া লইয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রায় ১৯৪২-৪৩-এর কম উৎপাদনের হিসাবেও গবর্মেণ্ট ৫০ হাজার টনের বেশী কাগজ নিজেদের ব্যবহারের জন্য রিজার্ভ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণামে কাগজের বাজার অস্বাভাবিক ভাবে চড়িয়াছিল এবং পরে গবর্মেণ্ট তাঁহাদের দাবী শতকরা ২০ ভাগ কমাইবার পরও আর দাম কমে নাই। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বলা হইয়াছিল যে সরকারী ডিপোগুলির চাহিদা কমাইয়া ১১৫০০ টন কাগজ বাঁচানো হইয়াছে এবং গত অক্টোবর হইতে মার্চ মাসের মধ্যে ১৩ হাজার টন কাগজ ব্যবহার কমানো হইয়াছে। শ্রম-বিভাগের সেক্রেটরী প্রায়র সাহেব এই সব হিসাব দিয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এত কাগজ বাঁচাইবার পরও লোকে তাঁহাদিগকে দোষ দেয় কেন? সরকারের কত কাগজ বস্তুতঃই প্রয়োজন তাহা বুঝিবার মত হিসাব তাঁহারা দেন না বলিয়াই জনসাধারণের মনের অবিশ্বাস দূর হইতে পারে না। এক সেক্রেটরী বলেন ২০ হাজার টন কাগজ মোট দরকারে লাগিত, আর একজন দুই দফায় ২৪৫০০ টন বাঁচাইবার হিসাব দিলেন। যুদ্ধের জন্য কত কাগজ বেশী লাগিতেছে, তাহার কতটা অংশ বাঁচানো সম্ভব হইয়াছে তাহার কিছুই উপরোক্ত হিসাব হইতে বুঝা সম্ভব হইল না।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে বাণিজ্য-বিভাগের সম্পাদক আরও একটি হিসাব দেন নাই, ভারত-সরকার কত কাগজ বাহিরে রপ্তানী করিতেছেন তাহা বলিতে অস্বীকার করিয়া তিনি শুধু এইটুকু জানাইয়াছেন যে "রপ্তানীর পরিমাণ অনেক কমানো হইয়াছে।"

—

হাতে তৈরি কাগজ

ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে কুটীরে কুটীরে কাগজ তৈরি হয় এবং এই কাগজের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বাড়াইবার উপযুক্ত উপকরণ দেশেই রহিয়াছে। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের আমলে এই শিল্পটির উন্নতির প্রতি বিশেষভাবে ঝোঁক দেওয়া হয়। নানা ভাবে ইঁহারা হাতে তৈরি কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন। ইঁহাদের পদত্যাগের পর এই চেষ্টা বন্ধ হইয়া যায়। সম্প্রতি গ্রাম উদ্যোগ পত্রিকায় বোম্বাই প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ভি এল মেটা এক প্রবন্ধ লিখিয়া দেখাইয়াছেন যে, বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট এবং দেশীয় রাজ্যসমূহ এই শিল্পটির উন্নতির জন্য এখনও চেষ্টা করিলে কাগজের দুর্ভিক্ষ অনেক কমিতে পারে। কাগজ তৈরিতে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বহু দরিদ্র ব্যক্তির সন্ধান গ্রামাঞ্চলে পাওয়া যায়, ইঁহাদিগকে অর্থসাহায্য করিলেই অনেকগুলি উৎপাদন-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতে পারে। কাগজ তৈরি শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা গবর্মেণ্ট অনায়াসেই করিতে পারেন। বাংলার শিল্প-বিভাগ ছাতার বাঁট ও বোতাম তৈরি শিক্ষা দিবার জন্য যে মাতামাতি ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, কাগজ তৈরির জন্য তাহার একাংশ ব্যয় করিলেও এই দুর্দিনে অনেক সুফল পাওয়া যাইত। দেশের এই অতিপ্রয়োজনীয় শিল্পটির দিকে মনোযোগ দিবার সময় তাঁহাদের এখনও হইবে কিনা সন্দেহ। বাংলা দেশে বহু গ্রামে কাগজ তৈরির কেন্দ্র আছে, একটু সাহায্য করিলেই এগুলি ভালভাবে চলিতে পারে, নূতন কেন্দ্রও স্থাপন করিবার সুযোগ ঘটে।

মাদ্রাজে ও ত্রিবাঙ্কুরে কুটীরে কাগজ তৈরির

উপযুক্ত একটি ভাল উপাদান রহিয়াছে—পেরু গাছের ছাল। পশ্চিম-ঘাট অঞ্চলে এই পেরু গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার ছাল ছাড়াইয়া লইলে গাছের কোন ক্ষতি হয় না। বাংলা দেশে এই গাছ পাওয়া যায় কি না তাহারও সন্ধান হওয়া উচিত। ইহার বোটানিকাল নাম কারেয়া আরবোরা (Careya Arborea)।

—

ব্যর্থ অনুকরণ

বর্ত্তমান যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটেন নিজের খাদ্য-সমস্যা সমাধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। গোড়া হইতেই ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ বিভাগকে দেশের সাধারণ শাসন-বিভাগগুলির মধ্যে একটি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে-দেশে প্রয়োজনের শতকরা ১১ ভাগ খাদ্য মাত্র উৎপন্ন হইত, সেখানে নিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থার জন্য আজ পর্য্যন্ত খাদ্যাভাব ঘটে নাই। ব্রিটেনের খাদ্য উৎপাদন ও বণ্টন কিরূপে চলিতেছে তাহার একটি সুন্দর বিবরণ আন্তর্জাতিক শ্রমিক অফিসের রিপোর্টে পাওয়া গিয়াছে।

খাদ্য-সচিবের দপ্তর প্রথমে খুব সামান্যভাবে কাজ আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে সমগ্র দেশের ফসল উৎপাদন, গবাদি গৃহপালিত পশুপালন, খাদ্যদ্রব্য আমদানী প্রভৃতি ব্যবস্থা গবর্মেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করেন। খাদ্যদ্রব্য বণ্টন-ব্যবস্থাও ঐ সঙ্গেই তাঁহাদের আয়ত্তে আসে। প্রথম হইতেই তাঁহারা দেশের সকল শ্রেণীর লোকের খাদ্যদ্রব্য চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন এবং এমনভাবে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যাহাতে সকল বিক্রয়কেন্দ্রে উপযুক্ত সরবরাহ বজায় থাকে। দেশের কোন শ্রেণীর লোক যাহাতে ন্যায়সঙ্গত দাবী হইতে বঞ্চিত না হয় তৎপ্রতিও তাঁহারা প্রথমাবধি লক্ষ্য রাখিয়াছেন। সরবরাহের ভার গবর্মেণ্টের নিজের হাতে রহিয়াছে, বণ্টনের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের উপর।

খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের একটি মূলনীতি এই যে খাদ্যাভাব ঘটিবার এবং মূল্য বৃদ্ধি আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবার পূর্বেই সরবরাহ-নিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। এই অবস্থা ঘটিবার পরে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিতে গেলে উহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ইহা সর্বদা মনে রাখিয়াছেন। গবর্মেণ্ট স্বয়ং এবং লাইসেন্স-প্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের মারফৎ ফসল ক্রয় করিয়া সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন।

এই বিবরণ হইতে দেখা যাইবে এদেশে কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের অনুসৃত নীতির ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র করিয়াছেন। দুই বৎসরের অধিক কাল তাঁহারা খাদ্যদ্রব্য ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ভার সরকারী দপ্তরখানার দুই জন কর্মচারীর হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পরে কতকটা উন্নতির চেষ্টা হইলেও শাসন-বিভাগের একটি মূল অঙ্গরূপে ইহাকে তাঁহারা মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের দেখাদেখি তাঁহারা নিজেরা ফসল ক্রয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করা হয় নাই। সমস্ত ব্যাপারটি একেবারে খাপছাড়া ভাবে করা হইয়াছে।

কিছু কিছু দুর্নীতি থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সাফল্যলাভের মূল কারণ এই যে, তাঁহাদের কর্মচারিবৃন্দ সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রীদের অধীন এবং মন্ত্রীরা বিভাগীয় কার্য্যের জন্য পার্লামেণ্টে জবাবদিহি করিতে বাধ্য। এদেশে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া হইয়াছে সিভিলিয়ানদের উপর, ইঁহাদের উপর মন্ত্রীদের কোন কর্তৃত্ব খাটে না। ব্যবস্থা-পরিষদে জবাবদিহি ইঁহাদিগকে করিতে হয় কিন্তু তাহার প্রতিকারের কোন উপায় ইঁহাদের হাতে নাই। তার উপর দুর্নীতি আছে। উৎকোচ-গ্রহণ-পরায়ণতা এত বাড়িয়াছে যে খাদ্য-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত নবনিযুক্ত মন্ত্রী কার্য্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা-পরিষদে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, এই বিভাগের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ঘুষ লওয়ার অভিযোগ বড় বেশী আসিতেছে। বিলাতের ব্যর্থ অনুকরণে এ দেশে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহাকে অনুপস্থিত জমিদারের ঘুষখোর গোমস্তা কর্তৃক জমিদারী-পরিচালনার সঙ্গে তুলনা করা চলিতে পারে।

—

কাপড়ের দাম বাড়ে কেন ?

কাপড়ের মিল মালিকদের অতিলাভের লোভ বস্ত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ, এরূপ একটি অভিযোগ দেশে ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। দু-একটি কাপড়ের কলের আয়ব্যয়ের হিসাব একটু খতাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় এই অভিযোগ অমূলক নহে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

কানপুরের একটি কাপড়ের কলের ডিরেক্টর-বোর্ডের চেয়ারম্যান জনৈক শ্বেতাঙ্গ নাইট। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে উহার লাভের পরিমাণ দেখা যাইবে :—

	১৯৪২ হাজার টাকা	১৯৩৯ হাজার টাকা	১৯৩৮ হাজার টাকা
মোট লাভ (Gross Profit)	১,৫৬,৭৪	২৩,৩৫	২১,২৯
দেয় ট্যাক্স	১,১০,০০	৩,৫০	২,৭৯
ডেপ্রিসিয়েশন	৬,০০	৬,০০	৬,০০
নীট লাভ	৩৪,০৫	১২,৬৩	১১,০৩
দেয় লভ্যাংশ	২১,০০	৮,৭৫	৭,০০
	১২০%	৫০%	৪০%

অর্থাৎ গত তিন বৎসরে নীট্ লাভের পরিমাণ প্রায় তিন গুণ বাড়াইবার জন্য এই মিলটিকে মোট লাভের পরিমাণ বাড়াইতে হইয়াছে প্রায় সাত গুণ! এই অতি-লাভের ভাগ গবর্মেণ্ট পাইয়াছেন এক কোটি দশ লক্ষ টাকা, আর মিল পাইয়াছে ১৯৩৯-এর লাভের উপর প্রায় ২১ লক্ষ টাকা বেশী। ডেপ্রিসিয়েশনের অঙ্ক দেখিলেই বুঝা যায় উৎপাদন বিশেষ বাড়ে নাই। ডবল শিফ্‌টে কাজ চলিতে পারে কিন্তু যন্ত্রপাতি বাড়ে নাই। ক্রেতাদের রক্ত শুষিয়া যে এই সাত গুণ টাকা আদায় হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। অতিলাভের দুই-তৃতীয়াংশ গবর্মেণ্টকে দিতে হয়, কাজেই ইহারা ক্রেতার নিকট হইতে অতিরিক্ত তিন টাকা আদায় করিয়া গবর্মেণ্টকে দুই টাকা দিয়া এক টাকা নিজেরা অতিলাভ করে। অতিলাভের সমস্ত টাকা গবর্মেণ্ট গ্রহণ করিলে এই লোভ হয়ত থাকিত না।

ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিকে জাতীয় শিল্প মনে করিয়া দেশবাসী এত দিন নানা ভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বর্তমান সঙ্কটের দিনে অতিলাভের এক-তৃতীয়াংশ ভাগ পাইবার লোভে ইহারা দরিদ্র দেশবাসীর নিকট হইতে যেভাবে অতিরিক্ত মূল্য আদায় করিয়াছে তাহার পর ভবিষ্যতে আর কখনও ইহারা জাতীয় সম্পদরূপে পরিচয় দেয় কোন্ লজ্জায় তাহাই দ্রষ্টব্য।

—

তাঁতের কাপড়ের ভবিষ্যৎ

তাঁতের কাপড় সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট মাঝে মাঝে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহার পরিচয় কমই পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে ছিটে ফোঁটা অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থাও হয় কিন্তু আন্তরিকতা এবং পরিকল্পনার অভাবে তাহাতে কোন কাজ হয় না। বহু আন্দোলনের পর ভারত-সরকার বৎসর-তিনেক পূর্বে তাঁতের কাপড় সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য এক কমীটি নিযুক্ত করেন। ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারী মাসে কমীটি তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই, গবর্মেণ্ট সে সম্বন্ধে কি করিতেছেন তাহাও জানা যায় নাই। তবে রিপোর্টের কোন কোন সুপারিশ অংশতঃ বোম্বাইয়ের "কমার্স" নামক পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

কমীটির প্রধান সুপারিশ এই যে, মিলের কাপড়ের উপর একটা সেস বসাইয়া ঐ টাকায় গঠিত ফণ্ড হইতে বয়ন-শিল্পকে সাহায্য করা হউক। কমীটির ধারণা কয়েকটি সাহায্য পাইলে তাঁতের কাপড় মিলের কাপড়ের সহিত সমানভাবে বিক্রয় হইতে পারিবে। স্থানে স্থানে সুতা-কাটার কল স্থাপন এবং সুতা সরবরাহের জন্য গুদাম স্থাপন করিলে তাঁতিদের সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করা হইবে।

বর্তমানে যে-সব মিল কাপড় বোনে তাহারাই প্রধানতঃ সুতাও কাটে। তাঁতিদের ইহারা মিলের প্রতিযোগী বলিয়া মনে করে এবং এই কারণে সুতার দাম এমনভাবে আদায় করে যাহাতে তাঁতের কাপড় মিলের কাপড় অপেক্ষা বেশী সস্তা না হইতে পারে। কেবলমাত্র তাঁতিদের জন্য আলাদাভাবে সুতা-কাটা কল স্থাপিত হইলে বয়ন-শিল্পের একটি প্রধান অন্তরায় দূর হইবে। যুদ্ধের পর গবর্মেণ্ট উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং দিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীগুলি ক্রয় করিয়া লইয়া গ্রামে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহের বন্দোবস্ত করিয়া দিলে কুটীরে কুটীরে বৈদ্যুতিক তাঁতের প্রচলন হইতে পারিবে এবং দেশের বয়ন-শিল্প মুষ্টিমেয় কতিপয় কোটিপতির করায়ত্ত না থাকিয়া তখন প্রকৃত জাতীয় সম্পদে পরিণত হইবে। হাতে-কাটা সুতা মিলের কাপড়ের সঙ্গে বর্তমান প্রগতির যুগে যে কোন মতেই তাল রাখিয়া চলিতে পারে না তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশে সুতা-কাটার কলগুলিকে গবর্মেণ্ট নিজেদের অধীনে রাখিলে এবং ঐগুলি একটি নিখিল-ভারতীয় বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত হইলে অতিরিক্ত উৎপাদনের ভয়ও থাকিবে না।

অনেকের ধারণা, মিলগুলি ডবি ও জ্যাকার্ড তাঁত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবার পরই হাতের তাঁতের বর্তমান দুরবস্থা ঘটিয়াছে। কমীটির মতে এই ধারণা ভুল; মিলগুলিতে ডবি ও জ্যাকার্ড তাঁত ব্যবহার নিষিদ্ধ না করিলেও চলে। শাড়ীর ডিজাইন আরও উন্নত করিবার বন্দোবস্ত হাতের তাঁতেই এখনও হইতে পারে।

কমীটির মতে সমগ্র বয়নশিল্পকে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমস্ত হাতের তাঁত একটি সুপরিকল্পিত কেন্দ্রীয় সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাধীনে আনিতে না পারিলে উহার স্থায়ী উন্নতি কখনও হইবে না। বয়ন-শিল্পের উন্নতির উপর শুধু বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ নহে, দেশের দরিদ্র কৃষককুলের আর্থিক উন্নতিরও সম্ভাবনা নির্ভর করিতেছে।

—

বাংলায় অনাবাদী জমি

বাংলা দেশে গুরুতর খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য দেশের সর্বত্র খাদ্যশস্যের চাষ বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। গবর্মেণ্ট এ সম্বন্ধে এখনও কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করিতে পারিতেছেন না। গত সেন্সাসে বাংলার লোকসংখ্যা ছিল ৫,০১,১৪,০০২; এবার উহা বাড়িয়া হইয়াছে ৬,০৩,১৪,০০০। দশ বৎসরে বাংলায় এক কোটি লোক বাড়িয়াছে, কিন্তু ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত তাহাদের খাদ্যাভাব হয় নাই। বাংলায় বার্ষিক ৯২ লক্ষ টন চাউল প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে বার্ষিক গড়ে ৭৬ লক্ষ টন দেশে উৎপন্ন হয় এবং ১৮।১৯ লক্ষ টন বিদেশ হইতে আসে। আমদানী চাউলের অধিকাংশই আসিত ব্রহ্মদেশ হইতে। ব্রহ্মদেশ জাপানের কবলিত হইবার পর এই আমদানী বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু দেশে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ বৃদ্ধির কোন চেষ্টা হইতেছে না।

বর্তমানে কতকগুলি জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। চাউল আমদানী বন্ধ, কিন্তু রপ্তানী চলিতেছে। সাধারণ জনসংখ্যা এক কোটি ত বাড়িয়াছেই, তদুপরি সামরিক প্রয়োজনে বহু লক্ষ সৈন্য এখানে আসিয়াছে। আটার অভাবে রুটিভোজীদেরও ভাত খাইতে হইতেছে। চাউলের অভাব এই সব বহু কারণের সংমিশ্রণে একেই তীব্র হইয়া উঠিতেছিল, এবার ফসল কম উৎপন্ন হওয়ায় উহা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে।

বাংলায় আবাদযোগ্য যে-সব অনাবাদী জমি রহিয়াছে সে সবগুলিতে চাষ হইলে কি পরিমাণ ফসল বৃদ্ধি হইতে পারে তাহার হিসাব করা কর্তব্য। নিম্নোদ্ধৃত তালিকা হইতে কর্ষণযোগ্য অনাবাদী জমির পরিমাণ বুঝা যাইবে।

১৯৩৯-৪০-এ বাংলায় আবাদী অনাবাদী জমির পরিমাণ:

মোট জমি	জঙ্গল	চাষের অনুপযোগী	অনাবাদী জমি	চলতি পতিত জমি	কর্ষিত জমি
একর	একর	একর	একর	একর	একর
৫,০৩,৭৩,২৯৬	৪৬,১৫,১৫৯	৯৪,৬৮,৭৫২	৬৬,৩০,১৬২	৪৭,৪২,৮২৩	২,৪৯,১৬,৪০০

চলতি পতিত জমি ছাড়া যে ৬৬ লক্ষ একর জমি অনাবাদী রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশেই চাষ করা সম্ভব। বহু কারণে জমি অনাবাদী পড়িয়া থাকে, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে। (১) মামলা-মকদ্দমার জন্য জমির মালিকানা বা দখলীস্বত্ব অমীমাংসিত থাকা, (২) ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন জমিতে চাষ দেওয়ার অসুবিধা, (৩) জলসেচের ও বন্যার জল নিকাশের বন্দোবস্তের অভাব, (৪) জঙ্গলের নিকটবর্তী জমিতে বন্য জন্তু কর্তৃক ধান নষ্ট হইবার আশঙ্কা, (৫) জমিদারের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লইবার আইনানুযায়ী ব্যবস্থাসমূহ সম্পাদনে বিলম্ব প্রভৃতি কারণ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া অনেকের নিকট অতিরিক্ত জমিও থাকে, যে জমিতে তাহাদের লোকাভাব বা অর্থাভাব প্রযুক্ত চাষ দেওয়ার সামর্থ্য নাই। এই সব কারণ দূর করিতে পারিলে ৬৬ লক্ষ একরের মধ্যে বহু জমিতে চাষ বৃদ্ধি করা সম্ভব। প্রথম ও পঞ্চম কারণ বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ জরুরী আইন পাস করিয়া দূর করিতে পারেন। তৃতীয়টি দূর করিতে হইলে সমবায় বিভাগের পুনর্গঠন দরকার। অস্ত্র-আইন প্রয়োগের কড়াকড়ি হ্রাস করিয়া চতুর্থ কারণ দূর করা অনায়াসেই সম্ভব। বন্য শূকরের উপদ্রবে জঙ্গলের নিকটবর্তী বহু জমিতে কৃষকেরা চাষ করিতে ভরসা পায় না, বন্দুক পাইলে তাহারা এই সব জমির চাষে উৎসাহিত হইবে।—শ্রীপরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

—

অনাবাদী জমিতে চাষবৃদ্ধির উপায়

সারের অভাবে কৃষককে প্রতি বৎসর কিছু কিছু জমি উর্বরাশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য ফেলিয়া রাখিতে হয়। সারের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে এই সব পতিত জমি আবাদ করিয়া আরও ৪৭ লক্ষ একর চাষ বৃদ্ধি করা যায়। এমোনিয়াম সালফেট জমির সর্বোৎকৃষ্ট সার, কিন্তু ইহার ব্যবসায়টি বিদেশী বণিকদের করায়ত্ত। ভারতবর্ষে টাটার কারখানায় এবং রেলের কলিয়ারিগুলিতে প্রচুর পরিমাণে এমোনিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়। গবর্ণমেণ্ট টাটা ও রেলের নিকট হইতে সমস্ত সার ক্রয় করিয়া লইয়া উহা সরাসরি কৃষকগণকে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

খইলের সারও কৃষকদের হাতে পৌঁছাইয়া দেওয়া দরকার। গ্রামের কচুরীপানাগুলিকে সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া উহার সারও দেওয়া যায়। কিন্তু এগুলি করা কৃষকদের নিজেদের পক্ষে সম্ভব নহে, গবন্মেণ্ট অগ্রণী না হইলে ইহার কোনটিই হইবে না। বিহারে প্রচুর পরিমাণে পটাশ নাইট্রেট জন্মে, উহাও আনিয়া গবন্মেণ্ট কৃষকদের দিতে পারেন। এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে কৃষকদের পক্ষে সস্তায় সার পাইবার উপায় হইবে।

সব্জী ও ফলের চাষ অনেক বাড়িতে পারে। মাছের চাষও বাড়াইবার উপায় আছে। রেল-লাইনের পাশে বহু স্থানে যে সব জলা আছে, মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণের অভাবে সেগুলিতে মাছের চাষ হয় না। প্রতি বৎসর এগুলিকে ইজারা দিবার ও যথারীতি তদারক করিবার বন্দোবস্ত হইলে প্রচুর মাছ উৎপন্ন হইতে পারে। গ্রামে অনেক পুকুর মামলা-মকদ্দমার জন্য অকেজো পড়িয়া থাকে। বহু সরিকের পুকুরগুলি কোন কোন সরিকের দোষে সংস্কারের অভাবে পানা পড়িয়া মজিয়া যায় এবং এইগুলিতে মাছের চাষ হয় না। কোন কোন সরিকের ইচ্ছা থাকিলেও আইনগত বাধায় সংস্কার করা সম্ভব হয় না। এই সব পুকুরের মালিকানা স্বত্ব সম্বন্ধে আইন পরিবর্তন করিয়া যাহারা উহা সংস্কার করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে সে সুযোগ দিলে মাছের চাষ বৃদ্ধি এবং বহু ক্ষেতে জল সরবরাহের উপায় হইতে পারে।

বাংলায় জঙ্গলের পরিমাণ কম নয়। ইহাদের মধ্যে এমন গাছ অনেক আছে যাহা কোন কাজে লাগে না—যে-সব গাছে ফল হয় না। পূর্ববঙ্গে প্রচুর আমগাছ আছে, কিন্তু আমে এত বেশী পোকা হয় যে উহার অতি অল্প অংশই খাওয়া চলে। এই সব গাছ কাটিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া অল্প পরিমাণে ভাল আমের অথবা অন্য ফলের গাছ লাগাইলে উহাতে ফল বেশী পাওয়া যাইবে, চাষ বাড়াইবার জন্য বহু জমিও খালি হইবে। বর্তমানে সাময়িকভাবে কাঠ এবং জ্বালানী কাঠের অভাবও মিটাইতে পারে।

খণ্ড খণ্ড জমিকে একত্র করিয়া বড় করিয়া তুলিলে চাষের সুবিধা হইবে, আইল প্রভৃতির দ্বারা যে-সব জমি অকেজো পড়িয়া থাকে সেগুলিতেও চাষের উপায় হইবে।

আর একটি অত্যাবশ্যক কার্য উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহ। ইহারও ব্যবস্থা গবন্মেণ্টকেই করিতে হইবে। উন্নত বীজের নামে যাহাতে অকেজো বীজ সরবরাহ না হয় তৎপ্রতি গবন্মেণ্টের কঠোর দৃষ্টি রাখা দরকার, আমলাতান্ত্রিক গবন্মেণ্টের কর্মচারীদের মধ্যে এইরূপ অসাধুতা আদৌ অসম্ভব নহে।

এই সঙ্গে ব্যাপকভাবে কৃষককে ঋণদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমবায়-সমিতিগুলি প্রায় অচল হইয়াছে, কৃষি-ঋণ যেভাবে দেওয়া হইতেছে প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্য। সমবায়-বিভাগ পুনর্গঠনে অনেক বিলম্ব ইতিমধ্যেই হইয়াছে, আর কালহরণ না করিয়া সমবায়-ঋণদান সমিতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা একান্ত প্রয়োজন।—শ্রীপরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

—

বাংলায় যৌথ কৃষির সম্ভাবনা

যৌথ কৃষিতে উৎসাহ দেওয়া দরকার। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরা কৃষিকার্য্যে লাভ হয় না বলিয়া উহাতে অগ্রসর হইতে চাহে না। কৃষিকার্য্য লাভজনক করা যায় না এমন নহে, কিন্তু তাহার জন্য মূলধন বিনিয়োগ, অল্প খাজনায় এবং রেলওয়ে স্টেশনের কাছাকাছি একসঙ্গে অনেকখানি জমি দরকার। প্রথম প্রথম যদি গবন্মেণ্ট মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের এই সব সুবিধা করিয়া দেন এবং যুদ্ধের পর মন্দার বাজার আসিলে তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দেন, তাহা হইলে দেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইতে পারিবে। গুটিকয়েক সরকারী কৃষিক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত অপেক্ষা এই শ্রেণীর স্বাধীন যৌথ-কৃষিক্ষেত্র দেখিয়া সাধারণ কৃষকেরাও শিক্ষালাভ করিতে পারিবে এবং ভবিষ্যতে বাংলায় যৌথ-কৃষি প্রচলনের পথ সুগম হইবে। নদীপ্রধান দেশের নরম মাটিতে খাঁটি ইউরোপীয় প্রণালীতে যৌথকৃষি প্রচলনে কিছু অসুবিধা থাকিতে পারে, কিন্তু বাংলা দেশের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করাও মোটেই কঠিন নহে। ব্যাপক ভাবে হাতেকলমে কাজে লাগিলে সমস্ত অসুবিধা পরিস্ফুট হইবে এবং তখনই ঐগুলি দূর করিবার জন্য প্রকৃত গবেষণা সম্ভব। এ দেশের কৃষির বর্তমান অবস্থায় সরকারী কৃষি-গবেষণাগার সামান্য সাহায্যই করিতে পারে এবং এই কারণে উহার ফলও বিশেষ কিছু হয় নাই।

যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইবে ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিদেরা গোড়া হইতেই এই ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছেন। যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইবার কোন সম্ভাবনা এখনও দেখা যায় নাই। সামরিক প্রয়োজনে বাংলা হইতে চাউল ক্রয় করিতে ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট বা ভারত-সরকার যে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না এবং বাংলা-সরকারের পক্ষে তাহাতে বাধা দিবারও উপায় যে

থাকিবে না, বঙ্গীয় আইন-সভার প্রশ্নোত্তরে তাহা ভাল করিয়াই বুঝা গিয়াছে। বাঙালীকে দুর্ভিক্ষ হইতে বাঁচাইতে হইলে সকল দিক ও সকল সমস্যা বিবেচনা করিয়া যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য এক দিকে যেমন সুচিন্তিত পরিকল্পনা নির্ধারণ করা প্রয়োজন, তেমনই ঐ পরিকল্পনা অবিলম্বে এই বৎসরেই সুষ্ঠুভাবে কার্য্যে পরিণত করাও দরকার। যুদ্ধের গতির সহিত তাল রাখিয়া ইহা করিতে হইবে। আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতার স্থান এ যুগে আর নাই। যুদ্ধের আরম্ভ হইতেই ব্রিটেন স্বয়ং খাদ্যশস্যের চাষ বৃদ্ধির জন্য যে চেষ্টা করিয়াছে, বাংলায় তাহার একাংশও করা হয় নাই। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক কৃষির দিকে ত একবার দৃষ্টিও দেওয়া হয় নাই। আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘ-সূত্রিতা বর্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্য বহু পরিমাণে দায়ী। সার ও বীজধান সরবরাহ প্রভৃতিতে কোনরূপ অসাধুতা যাহাতে না হয়, কৃষি-ঋণ-দানের ভিতর কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব যাহাতে প্রশ্রয় না পায় তৎপ্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া অত্যন্ত সতর্কতার সহিত দেশের সর্বত্র সমানভাবে কৃষকদের সাহায্যদানের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে ব্যর্থতার সম্ভাবনা কম। পরিকল্পনা নির্ধারণ যত সহজ, সুষ্ঠু ও ব্যাপক ভাবে উহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা তদপেক্ষা অনেক কঠিন,—বিশেষতঃ যে শাসনব্যবস্থায় জন-সাধারণের সহিত সরকারী কর্মচারীদের প্রাণের যোগ নাই সে আমলাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে উহা আরও কঠিন। খাদ্যসমস্যা একা বাংলার সমস্যা নয়, উহা নিখিল-ভারতীয় সমস্যা। বাংলার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা প্রধানতঃ এ দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হইবে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সহিতও এই পরিকল্পনার যোগ না রাখিলে পূর্ণ সাফল্য লাভের সম্ভাবনা থাকিবে না।—শ্রীপরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

—

দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী

আসাম গৌরীপুর এস্টেটের ভূতপূর্ব দেওয়ান দ্বিজেশ-চন্দ্র চক্রবর্তী পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কৃতী পুরুষ ছিলেন। গৌরীপুরের দেওয়ানরূপে তিনি শিক্ষা, কৃষি এবং যৌথপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সম্পর্কিত নানা প্রতিষ্ঠানে যে-সব ব্যাপক জনহিতকর সংস্কার প্রবর্তন করেন তাহাতে শুধু এস্টেটের উন্নতিই সাধিত হয় নাই, গৌরীপুরের প্রজাদের হৃদয়েও তিনি চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন। "বঙ্গনারী" ছদ্মনামে তাঁহার পত্নী অনিন্দিতা দেবী বঙ্গ-সাহিত্যে সুলেখিকা বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। অবসর গ্রহণের পর দ্বিজেশচন্দ্র পুরীধামে বাস করিতেছিলেন এবং তথাকার জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি দুই পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে সুসাহিত্যিক ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী অন্যতম।

—

বেগম জুলেখা খাতুন

কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পত্নী বেগম জুলেখা খাতুনের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মৌলানা সাহেবকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তদনুসারে বোম্বাই গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। অনুরূপ অবস্থায় রাজবন্দীদের সাময়িক ভাবে মুক্তিদান নূতন নহে, খ্যাত-অখ্যাত বহু বন্দীর বেলাতেই পূর্বে ইহা করা হইয়াছে। শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত বেগমসাহেবা মৌলানা সাহেবের আগমনের ব্যর্থ প্রতীক্ষা করিয়াছেন। মৌলানা সাহেবকে কয়েক দিনের জন্য ছুটি দিয়া পত্নীর মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ দিলে পৃথিবী রসাতলে যাইত না ইহা নিশ্চিত।

—

বঙ্গদেশে আসন্ন দুর্ভিক্ষ

১৩৪৮ সালের ফাল্গুন মাসে প্রবাসীতে আমরা লিখিয়াছিলাম :—

"পাটচাষ গত বৎসর অপেক্ষা যাহাতে অধিক না হয় সে বিষয়ে তাঁহাদিগের (অর্থাৎ বাংলা-সরকারের) অবিলম্বে চেষ্টা করা কর্তব্য একথা আমরা গত মাসের প্রবাসীতে বলিয়াছি। এই বিষয়ে তাঁহারা যদি অবহিত না হন তাহা হইলে আগামী ফসলে কেবল যে পাটের দর কম হইবে তাহা নহে, পরন্তু ধান্যের চাষ কম হওয়ায় ও ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আমদানীর অসুবিধা থাকায় বঙ্গদেশে অন্নাভাব ঘটিতে পারে।"

ইহার কিছু পূর্বে হক-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিমণ্ডল পাটচাষ পূর্ব বৎসরের দ্বিগুণ করিয়া দেন। তাহার অব্যবহিত পরেই উক্ত মন্ত্রিমণ্ডলের পতন ঘটে ও হক-শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিমণ্ডল সংগঠিত হয়। শেষোক্ত মন্ত্রিমণ্ডলকেই প্রধানতঃ উদ্দেশ করিয়া আমরা অনুরোধ জানাইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ে কিছুই করেন নাই। অর্থনীতির নিয়মগুলি কোনও মন্ত্রিমণ্ডলের খাতির রাখে না। আজ মোটে আড়াই মাস ধান কাটা হইয়াছে। ইহারই মধ্যে মোটা চাউল কলিকাতায় বাইশ টাকা আট আনা

মণ, বর্দ্ধমান জেলার পল্লী অঞ্চলে কুড়ি টাকা ও বরিশাল জেলায় উনিশ টাকা। বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রায় এই অবস্থা। আরও দুই মাস পরে দেশের কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা চিন্তা করিতে ভয় হয়। সরকার যদি বাহির হইতে চাউল, গম, জোয়ার প্রভৃতি আমদানী না করেন ও দেশবাসী যদি সারা বাংলায় আউশ ও বোরো ধান চাষের ব্যাপক প্রসার, পাটচাষের হ্রাস ও কৃষির উপযুক্ত এক হাত জমিও ফেলিয়া না রাখিয়া তাহাতে তরিতরকারির চাষ না করেন, তাহা হইলে কয়েক মাসের মধ্যেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পুনরভিনয় ঘটিবে।

— শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

পাটের দর ও ইংরেজ কলওয়ালাদের লাভ

এখন এক শত গজ চটের দাম পঁচিশ টাকা আর ইহা প্রস্তুত করিতে যে পঁয়ত্রিশ সের পাট লাগে তাহার দাম বার টাকা মণ হিসাবে সাড়ে দশ টাকা। মাঝখানে এই যে সাড়ে চৌদ্দ টাকা রহিয়াছে ইহা খাইতেছে কলওয়ালারা যাহাদের শতকরা প্রায় পঁচানব্বই ভাগ হইতেছে ইংরেজ। সর্ নাজিমুদ্দিন-পরিচালিত মন্ত্রিমণ্ডল পাটচাষ দ্বিগুণ করিয়া কৃষকের ক্ষতি ও কলওয়ালাদের লাভের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। যখন কৃষক পাট বিক্রয় করিয়াছিল তখন দর আরও কম ছিল। পাটচাষ অধিক করায়, ধানচাষ কম হইয়াছে ও কৃষককে আজ আঠার কুড়ি টাকা মণ চাউল কিনিতে হইতেছে। বাংলার পাটচাষীর শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমান, আবার সমগ্র ভারতে যত মুসলমান আছে তাহার শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ বঙ্গদেশে বাস করে। সুতরাং পাকিস্তানপ্রয়াসী মুসলমান মন্ত্রীরা মুসলমান-সমাজের বিরাট্ অংশের কতটা ক্ষতি করিতেছেন তাহা অশিক্ষিত মুসলমান কৃষক বুঝিতেছে না বলিয়া তাঁহাদের পদসম্ভ্রম এখনও বজায় আছে। বর্তমান সময়ে মোটামুটি নব্বই লক্ষ গাঁট পাটের কাজ বৎসরে হইতেছে। পূর্বোক্ত সাড়ে চৌদ্দ টাকার সাত টাকা অন্ততঃ কৃষক পাইবার অধিকারী ধরিলে তাহার বাৎসরিক ক্ষতির পরিমাণ ত্রিশ কোটি টাকা। গত মহাযুদ্ধের সময়ে কৃষককে বঞ্চিত করিয়া কলওয়ালারা যেরূপ লাভ করিয়াছিল এবারও যদি তাহা করে তাহা হইলে দেশের প্রতিনিধি মন্ত্রিমণ্ডলের সার্থকতা কোথায়? রেলপথ হইতে ইংরেজের মূলধন উঠিয়া যাইতেছে। সুতরাং সমস্ত ভারতের মধ্যে বাংলার পাটকলেই ইংরেজের সর্বাধিক মূলধন নিবদ্ধ বলা যায়।—শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

—

বস্ত্রের দুর্মূল্যতা ও কলওয়ালাদের লাভ

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকায় আমরা তুলার দাম সে সময়ে কম ও কাপড়ের দাম বেশী দেখাইয়া লিখিয়াছিলাম সরকার যদি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করেন তাহা হইলে লোকের মনে ধারণা হইবে যে তাঁহারা সাধারণ সময়ের অতিরিক্ত লাভের শতকরা ৬৬⅔ অংশ পাইয়া দেশবাসীর দুঃখ নির্বিকারচিত্তে দেখিয়া যাইতেছেন (…remains a silent spectator of the suffering of the masses)। গত ১৭ই মার্চ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে রাজস্বসচিব সর্ জেরেমি রেইস্‌ম্যান বোম্বাইয়ের তুলাব্যবসায়ীরা অন্যায়ভাবে তুলার দর চড়াইতেছে বলিয়া তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন ও সরকার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে দমন করিবেন এই কথা বলেন। তদুত্তরে সর্ পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস তুলার ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে ১৮ই মার্চ বোম্বাইয়ে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেন যে, কাপড় ও সূতার দর অত্যধিক চড়িলেও সরকার লাভের অংশ পাইয়া নির্বিকারচিত্তে কাপড়ের কলওয়ালাদের মোটা লাভ দেখিয়া গিয়াছেন (…chose to be silent spectators of an enormous margin to the textile industry which of course brought in to the Government substantial amount by way of Excess Profits Tax)। একের অন্যায়ে অপরের অন্যায় সমর্থনযোগ্য হয় না। তুলার দাম এক কান্দি (৭৮৪ পাউণ্ড) বর্তমানে ৬১০ টাকা হইবার কোনও কারণ নাই, কারণ ১৯৪২ জানুয়ারীতে উহা ১৭৬ টাকা ছিল। উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ১৯৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে ৫,৯৮০,০০০ গাঁট, ১৯৪২-৪৩এ ৪,৪২৯,০০০ গাঁট কিন্তু রপ্তানী ৪০০,০০০ গাঁটের বেশী আশা করা যায় না, ভারতের কলগুলিতে লাগিবে ৪,২০০,০০০ গাঁট, দেশের আভ্যন্তরীণ কাজে লাগিবে ৩৫০,০০০ গাঁট। পূর্ব ফসলের উদ্বৃত্ত তুলা ও নূতন ফসলের পরিমাণ যোগ করিলে হয় ৮,৪০০,০০০ গাঁট। সুতরাং তুলার দর এত চড়িবার কারণ বড় ধনীদের তুলা ধরিয়া রাখা ও ফাটকা খেলা ছাড়া অপর কিছু হইতে পারে না। বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীহরিদাস মাধবদাস তুলা ধরিয়া রাখার কথা স্বীকারও করিয়াছেন। এখন এই সকল ধনী ব্যবসায়ীদের নির্লজ্জ লোভের ফলে সারা ভারতের লোক বস্ত্রহীন হইতে বসিয়াছে। এখনও ভারতবর্ষে যত লোক হাতের তাঁত চালায় সমস্ত কলকারখানায় তত লোক কাজ করে না। যুদ্ধের জন্য বিদেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ সূতা আসিতে পারিতেছে না (যাহা কলওয়ালারা

বরাবর চাহিয়াছেন) ও কলওয়ালারা সুতার দামও কাপড়ের সমান চড়া রাখিয়াছেন। তাহার ফলে লক্ষ লক্ষ তন্তুবায় আজ নিরন্ন। সর্ পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস যে তুলার চাষীর স্বার্থের কথা তুলিয়াছেন তাহা অবান্তর, কারণ তুলার দর ব্যবসায়ীদের হাতে যাইয়া চড়ে, কৃষক যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকে। সরকার যদি ষ্টাণ্ডার্ড কাপড়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া সমস্ত কাপড় যাহাতে বাধ্যতামূলকভাবে ন্যায্য লাভে বিক্রীত হয় তাহার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে ভাল হয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কোনও সভ্য দারিদ্র্য-জর্জরিত কোটি কোটি ভারতবাসীর ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত বস্ত্রশিল্পের ধনী ভারতীয় মালিকদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই যে, তাঁহারা আর রক্ষণশুল্কের সহায়তার দাবী করিতে পারেন না এবং এইরূপ দাবীর কোন অর্থও হয় না। দেশের লোক যদি এইরূপ ব্যবহার করে তাহা হইলে কেবল বিদেশীয়ের সমালোচনা করিয়া লাভ কি ?—শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

—

বঙ্গদেশে বাঙালীর প্রথম চিনির কল

মৈমনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ শহরের নিকট দৈনিক ৪০০ টন আখ মাড়াই করা চলে এরূপ একটি চিনির কল হাওড়ার শিল্পনেতা শ্রীআলামোহন দাস চালাইতেছেন। বঙ্গদেশে ইহাই বাঙালীর প্রথম চিনির কল। বাঙালী বৎসরে সাধারণ সময়ে ১৩০,০০০ টন চিনি খরচ করে কিন্তু ইহার একটি ছটাকও সে নিজে তৈয়ারী করিতে পারিত না। চিনি বাবদ বৎসরে যে প্রভূত পরিমাণ অর্থ আমাদের হাত হইতে প্রধানতঃ বিহার ও যুক্তপ্রদেশে চলিয়া যাইতেছে তাহা বন্ধ করিতে হইলে এরূপ আরও কল প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাঙালী ধনীদের নিকট টাকা কম নাই। তাঁহারা এই সকল শিল্প স্থাপন করিলে নিজেরাও লাভবান্ হইবেন, বহু বাঙালীকে কাজও দিতে পারিবেন ।—শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

—

চীনা শিক্ষাব্রতী দল

চীন হইতে ডাঃ উ-র নেতৃত্বে একটি শিক্ষাব্রতী দল ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। ইহারা শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের জন্য গমন করিলে তথাকার আম্রকুঞ্জে খাঁটি ভারতীয় প্রথায় ইহাদিগকে সম্বর্ধনা করা হয়। শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। ডাঃ উ অভিনন্দনের উত্তরে একটি সুন্দর বক্তৃতায় চীনের সহিত ভারতের যোগসূত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেন এবং বিশ্বকবির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কুড়ি বৎসর পূর্বে কবিগুরু চীন-ভ্রমণের সময় যাঁহাদের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজকাল ভারতবর্ষে আগমন করিয়া কবিগুরুর অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতেছেন। মার্শাল ও মাদাম চিয়াং কাই-শেক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কবিগুরু তখন ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শান্তিনিকেতনে গিয়া তাঁহারা কাবর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আসিয়াছেন। মেদিনীপুর দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাইয়াও তাঁহারা স্থির থাকিতে পারেন নাই। আর্তত্রাণে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহারা পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। চীনের সহিত ভারতের যোগসূত্র ক্রমেই দৃঢ়তর হইতেছে এবং এশিয়ার এই দুই মহাদেশের পরম শ্রদ্ধার পাত্র রবীন্দ্রনাথের অভাব উভয়েই আজ তীব্রভাবে অনুভব করিতেছে।

—

মৌলবী ফজলুল হকের পদত্যাগ

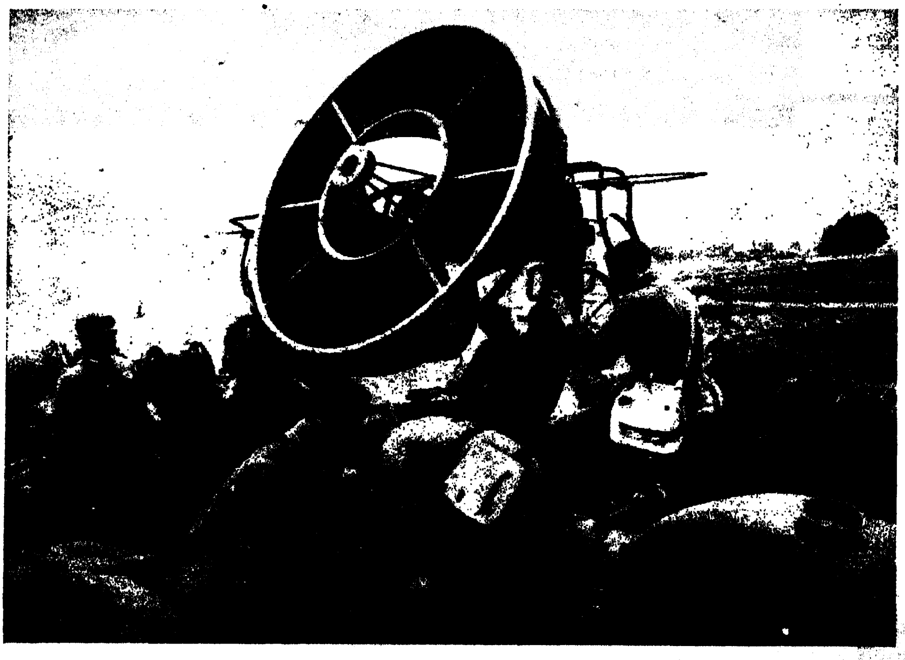
প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের অন্তঃসারশূন্যতা অবশেষে বাংলা দেশেও নাটকীয় ভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার পদত্যাগের কারণ বর্ণনা করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহার মর্মার্থ এই যে, বাংলার গবর্ণর প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের কোন মর্যাদাই রাখেন নাই ; যে-সব ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের পরামর্শে চলিবার জন্য গবর্ণরকে ভারত-শাসন আইন এবং রাজকীয় উপদেশপত্রে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সে-সব স্থলেও তিনি মন্ত্রিমণ্ডলের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অধীনস্থ সিভিলিয়ান কর্মচারীদের কথায় চলিয়াছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ, গবর্ণর মৌলবী ফজলুল হককে ডাকিয়া এই বিবৃতির প্রতিবাদ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। অব্যবস্থিতচিত্ত বলিয়া পরিচিত হক সাহেব জীবনে অন্ততঃ এই একটিবার দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়া গবর্ণরের অযৌক্তিক কথা মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। "জন্মভূমি"র মামলায় বোম্বাই হাইকোর্টের রায়ে বাংলার গবর্ণরের ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু মুখরক্ষার এই উপায় অবলম্বন করিবার জন্য যাঁহারা তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন গবর্ণরকে তাঁহারা ভুল পথেই পরিচালিত করিয়াছেন।

হক সাহেবের পদত্যাগ অথবা পদচ্যুতির আরও

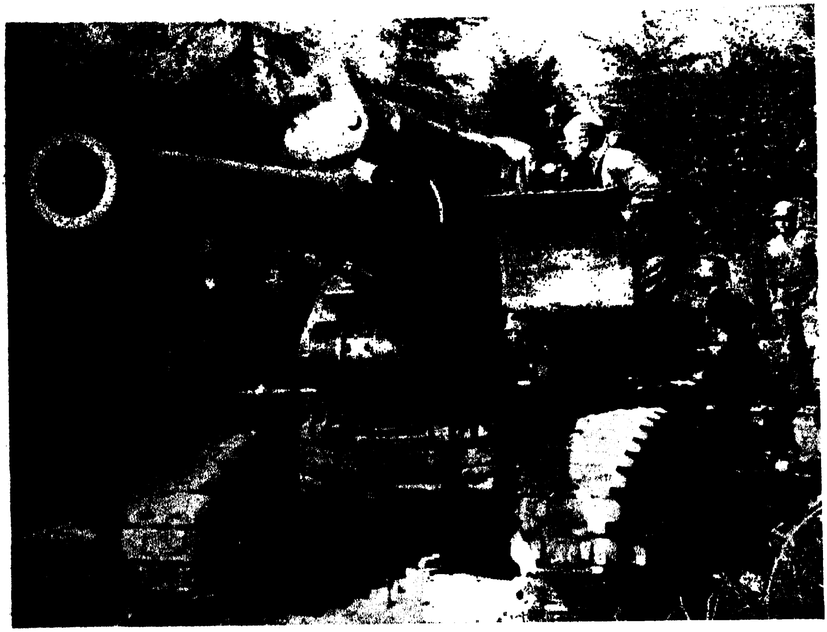
স্বাধীনতা-সংগ্রামে চীন-সেনা



চীন-সেনাদের যুদ্ধযাত্রা। স্বদেশ হইতে জাপানীদের তাড়াইয়া দিবার জন্য ইহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ



চুংকিঙে বিমান-বিধ্বংসী বাহিনী শত্রু-বিমানের আওয়াজ ধরিবার জন্য দূর-শ্রবণ-যন্ত্রের চক্র ঘুরাইতে রত

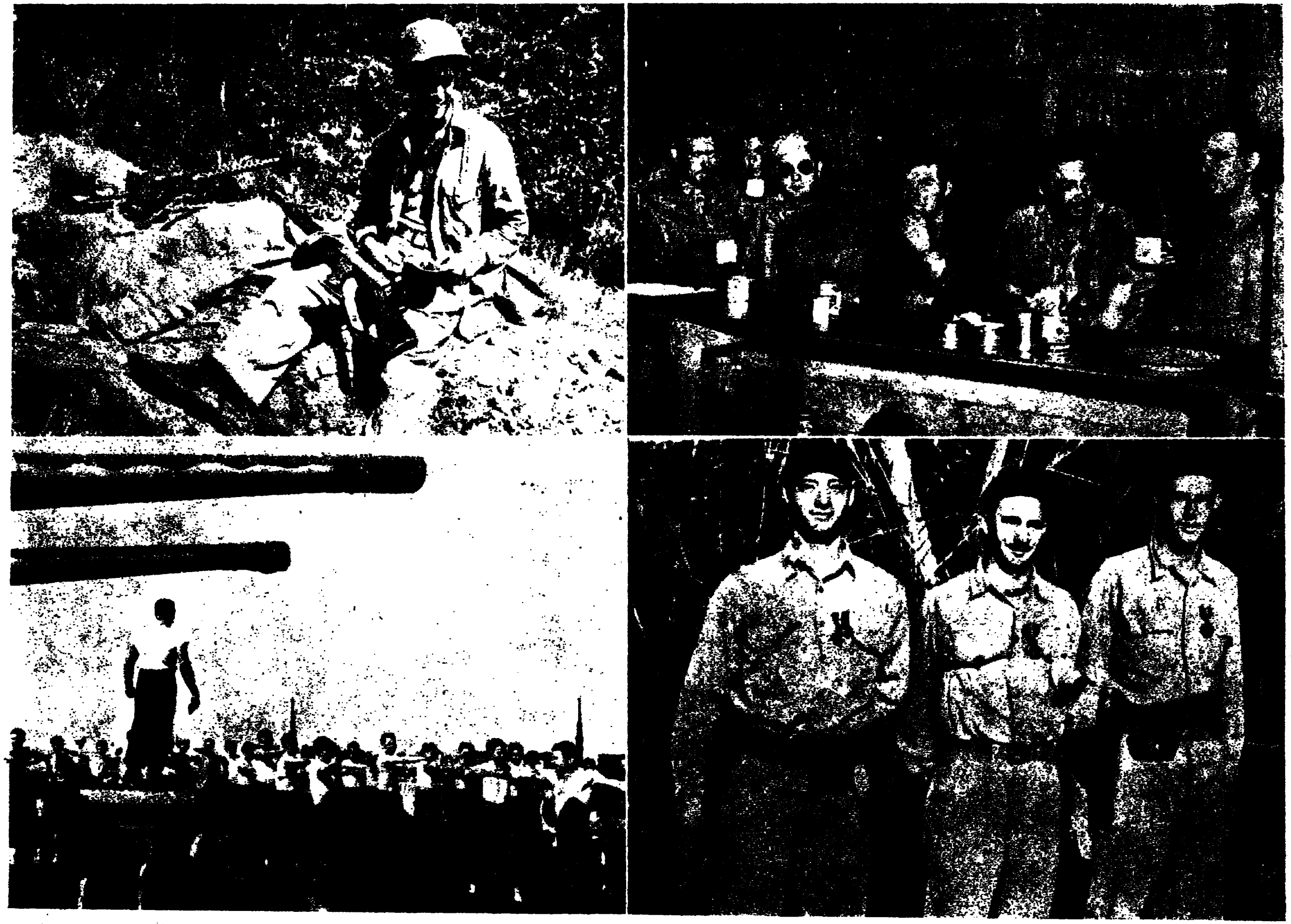


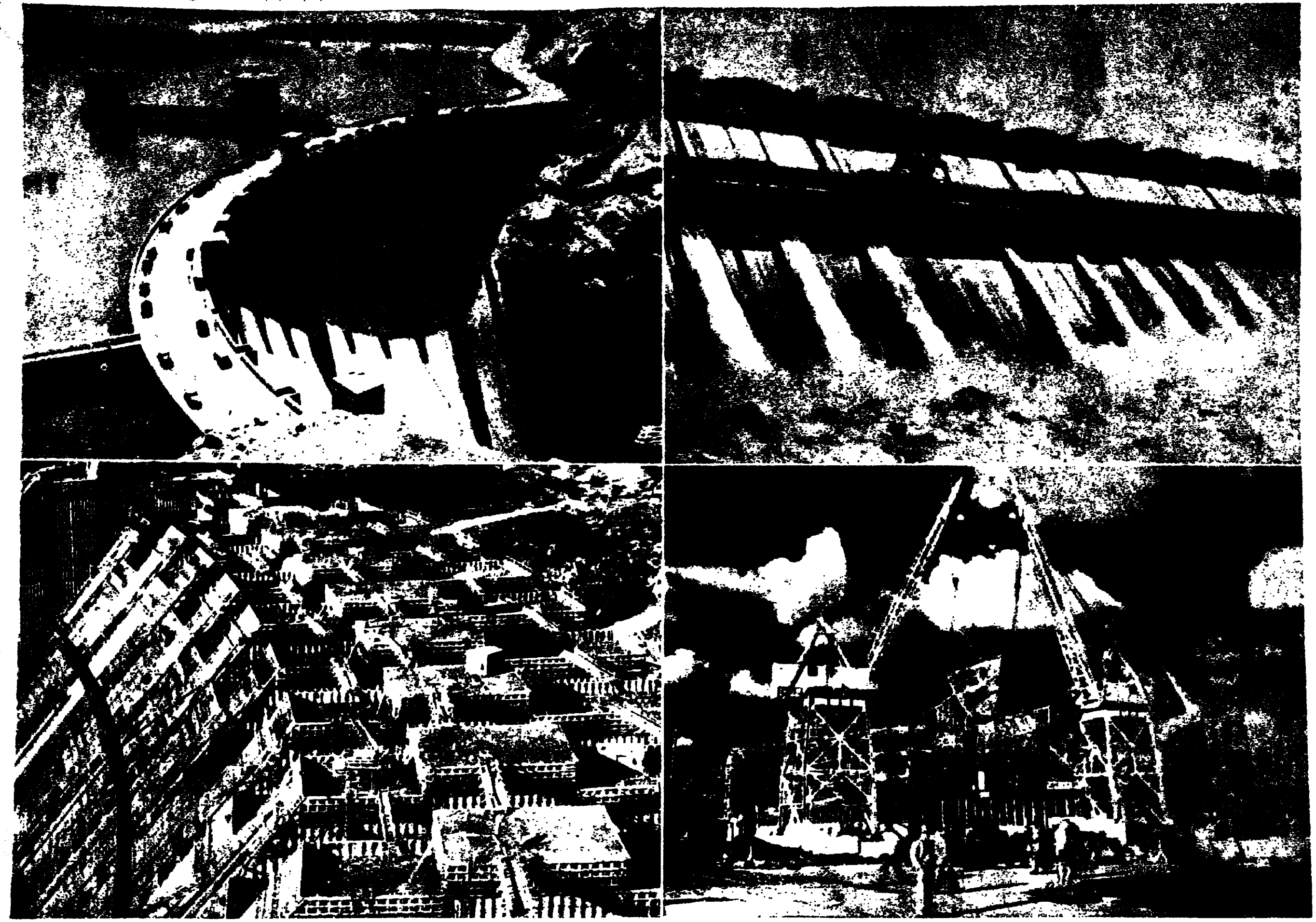
বৃহৎ কামান হইতে গোলাবর্ষণে রত সোভিয়েট গোলন্দাজ-সেনা



সোভিয়েট পদাতিকবাহিনী ট্যাঙ্কের সাহায্যে শত্রুব্যূহ আক্রমণ করিতেছে

যুদ্ধরত যুক্তরাষ্ট্রের কার্য্যকলাপ





উপরে বাম দিক হইতে : (১) পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম বোল্ডার বাঁধের একটি দৃশ্য, (২) কোলাম্বার নদীর উপরে বিরাট কুলী বাঁধ।
নিম্নে বাম দিক হইতে : (১) বিশাল শাষ্টা বাঁধের নির্ম্মাণকার্য্যের দৃশ্য, (২) বিরাটকায় রণসম্ভারবাহী জাহাজ পাঁচ দিনেই নির্ম্মিত হইতেছে।

একটি কারণ প্রকাশ পাইয়াছে। কংগ্রেসী "বিদ্রোহী"দের ভোটে তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডল অনাস্থা প্রস্তাব কাটাইয়া উঠিতেছে, গবর্ণর নাকি ইহাও সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। ভারত-শাসন আইন প্রণয়নের সময় পার্লামেণ্টে সর্ সামুয়েল হোর জোর গলায় বলিয়াছিলেন যে, বাংলা দেশের পরিষদে এমন ভাবে আসন ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সেখানে কোন প্রগতিশীল মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হওয়া পাহাড়ে ধ্বস নামিবারই ন্যায় অসম্ভব। কিন্তু বর্তমানে সেই অসম্ভবই সম্ভব হইয়াছে। ইউরোপীয় দলের হাত হইতে ভারকেন্দ্র সরিয়া গিয়াছে কংগ্রেসের হাতে। বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডল কার্যতঃ সকল দিক দিয়া অক্ষম হইলেও দৃশ্যতঃ প্রগতিশীল—কৃষক-প্রজা দল এবং "বিপ্লবী" বসুদল মন্ত্রিত্ব করিতেছে, আর উহাকে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলীম লীগ ও ইউরোপীয় দলের আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে "বিদ্রোহী" কংগ্রেস! ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট হইতে সুরু করিয়া বাংলার গবর্ণর পর্যন্ত সকলেরই ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবার কথা। গবর্ন্মেণ্ট হাউসে শেষ পর্য্যন্ত চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়া হক সাহেবের পদত্যাগ-পত্র কেন টাইপ করিয়া তৈরি রাখা হয় তাহার কারণ অনুধাবন করা বাঙ্গালীর পক্ষে কঠিন নয়।

—

চালে ভুল

রাজনৈতিক জালটা বেশ ভাল ভাবেই ফেলা হইয়াছিল বটে, কিন্তু চালটা শেষ পর্য্যন্ত ভুল হইয়া গিয়াছে। হক সাহেবের পদত্যাগের সংবাদ বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসী দলের প্রধান হুইপ তাঁহার উপর আস্থা প্রস্তাব আনিবার নোটিস দিয়াছেন। পদত্যাগের পূর্বে পর-পর তিন বার অনাস্থা প্রস্তাব কাটাইয়া উঠিয়া হক সাহেব প্রমাণ করিয়াছিলেন যে পরিষদে তাঁহার পূর্ণ সংখ্যাধিক্য বিদ্যমান আছে। তাঁহার সমর্থকদের মধ্যে অনেকে কারাগারে আটক থাকা সত্ত্বেও মুসলীম লীগ ও ইউরোপীয় দল সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে পারে নাই। প্রগতিশীল কোয়ালিশন দলের সম্পাদক সৈয়দ বদরুদ্দোজা বার-বার বলিয়াছেন যে, এখনও পরিষদে তাঁহাদেরই পূর্ণ সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে। মুসলীম লীগ পার্লামেণ্টারী দলের সম্পাদক দাবী করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের দলে ৮৫ জন মুসলমান সদস্য আছেন। সৈয়দ বদরুদ্দোজা সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। মুসলীম লীগের দাবী সত্য হইলে ইউরোপীয় পঁচিশ জনের সহায়তায় এবং অন্যান্য দল হইতে আর দশ-পনর জনকে সংগ্রহ করিলেই তাঁহারা মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু গবর্ণর ও ইউরোপীয় দলের সহায়তা সত্ত্বেও তাঁহারা পনর দিনের মধ্যেও মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে পারেন নাই। হক সাহেবকে অত্যন্ত অশোভন ভাবে বিদায় দিবার পরও গবর্ণরকে বার-বার তাঁহাকেই ডাকিয়া পরামর্শ করিতে হইতেছে। বাজেট পাস করিবার জন্য গবর্ণর ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। ভারত-সচিব আমেরী সাহেবও বাঁধা-বুলির অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া আপাততঃ এই অপ্রীতিকর আলোচনা এড়াইয়া গিয়াছেন। হক সাহেবকে বাদ দিয়া এবং কংগ্রেসের উপর নির্ভরশীল নহে এমত একটি মন্ত্রিমণ্ডল স্যর নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে গঠন করিতে পারিলেই বোধ হয় ইহাঁদের মনোগত অভিপ্রায় পূর্ণ হয়। পরিষদে হক সাহেবের উপর আস্থা প্রস্তাব পাস হইলে তাঁহাদের পক্ষে এই ব্যাপারটিকে স্বেচ্ছাকৃত পদত্যাগ বলিয়া জাহির করিবারও উপায় থাকিবে না।

—

গবর্ণরের উপদেশ-পত্রের নির্দেশ

প্রত্যেক গবর্ণর এ দেশে আসিবার সময় তাঁহাকে একটি রাজকীয় উপদেশ-পত্র (Instrument of Instructions) দেওয়া হয়। ইহাতে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্বন্ধে গবর্ণরকে বলা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে যাঁহার সংখ্যাধিক্য আছে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া গবর্ণর মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন। হক সাহেবের পদত্যাগ-পত্র দাবী করিয়া বাংলার গবর্ণর উপদেশ-পত্রের এই ধারার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। পরিষদে যাঁহার সংখ্যাধিক্য প্রমাণিত হইয়াছে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে গবর্ণর বাধ্য করিয়াছেন এবং সংখ্যালঘু বিরোধী দলের নেতাকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। স্যর্ নাজিমুদ্দীন সংখ্যাধিক্য অর্জন করিতে না পারিলে এবং পরিষদ হক সাহেবের উপরেই আস্থা জ্ঞাপন করিলে গবর্ণরের পক্ষে উপদেশ-পত্র অনুসারে হক সাহেবকেই আহ্বান করিয়া পুনরায় মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার জন্য অনুরোধ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না।

ন্যাশনাল গবর্ন্মেণ্টের যে ধুয়া গবর্ণর তুলিয়াছেন তাহার অন্তঃসারশূন্যতাও ধরা পড়িয়া গিয়াছে। বর্তমানে পরিষদে মুসলীম লীগ ও ইউরোপীয় দল ভিন্ন অপর সকল দলই মন্ত্রিমণ্ডলের সমর্থক। হক সাহেব সকল দল লইয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের ইচ্ছাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। গবর্ণর কিন্তু সরকারী ইস্তাহারের 'যত বেশী সম্ভব দল' লইয়া ন্যাশনাল মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

—

মন্ত্রীদের দায়িত্ব—যৌথ, না একক ?

মৌলবী ফজলুল হকের পদত্যাগের পর প্রাদেশিক মন্ত্রীদের দায়িত্ব যৌথ, না একক এ সম্বন্ধে পুনরায় প্রশ্ন উঠিয়াছে। হক সাহেব এবং স্পীকার সৈয়দ নৌশের আলির মতে মন্ত্রীদের দায়িত্ব একক নহে, যৌথ। অন্যান্য মন্ত্রীদেরও কেহ কেহ গবর্ণরকে ইহা বলিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগে মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙিয়া গিয়াছে, মন্ত্রীর কর্তব্যপালন করিবার দায়িত্ব তাঁহাদের আর নাই। গবর্ণর কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রীদের প্রত্যেকের নিকট হইতে পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারত-শাসন আইনে মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্ব সম্বন্ধে কোন কথা নাই। এই আইন পাস করিবার সময়েই এ সম্বন্ধে দাবী উঠিয়াছিল, কিন্তু ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। গবর্ণরের উপদেশ-পত্রে শুধু এইটুকু বলা হইয়াছে যে, মন্ত্রীদের মধ্যে যৌথ দায়িত্বের ভাব জাগ্রত রাখিবার প্রয়োজনীয়তার কথা গবর্ণর যেন সব সময় মনে রাখেন।(He shall bear constantly in mind the need for fostering a sense of joint responsibility among his Ministers.)

সৈয়দ নৌশের আলিকে বাংলার মন্ত্রিমণ্ডল হইতে অপসারিত করিবার সময় একা প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগে মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙে নাই, অপর প্রত্যেক মন্ত্রীকেই পৃথক্‌ভাবে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিতে হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও গবর্ণর পৃথক্‌ভাবে মন্ত্রীদের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের একক দায়িত্বই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

মন্ত্রিমণ্ডলের যৌথ দায়িত্ব মানিয়া লইলে উহাকে প্রকৃত শক্তি অর্জন করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। পৃথিবীর যে-সব দেশে পার্লামেণ্টারী শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহার সর্বত্র মন্ত্রীদের দায়িত্ব যৌথ। ইহাতে প্রধান মন্ত্রীর প্রতিষ্ঠা এবং মন্ত্রিমণ্ডলের শক্তি উভয়ই বৃদ্ধি পায় এবং মন্ত্রিদলও দানা বাঁধিবার সুযোগ লাভ করে। ইংলণ্ডের ইতিহাস ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের যে ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের হাতে ক্ষমতাবিহীন দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে, যেখানে সিভিল সার্ভিসের উপর মন্ত্রীদের কোন হাত নাই, সেখানে মন্ত্রিমণ্ডলের দায়িত্ব একক রাখিয়া ভেদনীতি পরিচালনের পথ অতি সূক্ষ্মভাবে খুলিয়া রাখা হইবে ইহাই স্বাভাবিক। বাংলার মন্ত্রীরা পৃথক্‌ভাবে পদত্যাগ-পত্র পেশ না করিয়া ভারত-শাসন আইন-রচয়িতাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার অবকাশ এবারও একবার পাইয়াছিলেন।

—

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে হোয়াইট পেপার

মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর দেশব্যাপী যে তীব্র অসন্তোষের ঢেউ বহিয়া গিয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব কংগ্রেসের উপর চাপাইয়া এদেশে একটি বৃহৎ পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া গবন্মেণ্ট নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, বিলাতেও একটি সুবৃহৎ হোয়াইট পেপার প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট ও ভারত-সরকারের বক্তব্য এই যে, কংগ্রেস যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেশে এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছিল যাহাকে প্রকাশ্য বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের নিকট লিখিত এক পত্রে গবন্মেণ্টকেই এই বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী করিয়াছিলেন। দায়িত্ব বস্তুতঃ কাহার এবং কতখানি, কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ কারামুক্ত হইবার পূর্বে তাহা সঠিকভাবে জানিবার উপায় নাই। ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের এক তরফা বক্তব্য বিশ্বের জনসাধারণ প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বভাবতঃই কুণ্ঠিত হইবে।

হোয়াইট পেপার প্রকাশিত হইবার এক সপ্তাহ পরে পার্লামেণ্টে মিঃ আমেরী বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে যাহারা এই সকল অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাইয়াছে তাহাদের হৃদয়ের পরিবর্তনের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না পাইলে মহাত্মা গান্ধীকে কোনরূপ সুবিধা দেওয়া তিনি বিপজ্জনক বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে এরূপ কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাই। কংগ্রেসের বর্তমান কার্য্যকলাপ একটু সহানুভূতির সহিত লক্ষ্য করিলেই ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিদেরা বুঝিতে পারিতেন যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেস এবার আপনার উপর আস্থা রাখিতে শিখিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ভারতবাসীকে সমস্ত লাঞ্ছনার ঊর্ধ্বে মস্তক অবিচলিত রাখিতে শিখাইয়াছেন, তাই কোন বিভীষিকাই তাঁহার অন্তরাত্মাকে আর সঙ্কুচিত করিতে পারে না। কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য ভারতবাসীকে আর ভীত নত করে না; বলের নিকট নত হওয়াকে সে আত্মাবমাননা, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অবমাননা বলিয়া মনে করে। কংগ্রেসকে চূর্ণ করিয়াছি বলিয়া লর্ড উইলিংডন যে দম্ভ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া নেতাদের কারারুদ্ধ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ৪০ কোটি ভারতবাসীর হৃদয়ে কংগ্রেস যে আসন পাতিয়া রাখিয়াছে তাহাকে শিথিল করিতে পারিয়াছেন কি না লর্ড লিনলিথগো ইহা ভাবিয়া দেখিতে পারেন। কংগ্রেসের ঐতিহাসিক প্রয়োজন শেষ

হইয়া যায় নাই—তাই বহু দুঃখেও সে বিনাশপ্রাপ্ত হয় নাই। —

ডেপুটেশনের ব্যর্থতা

নেতৃ-সম্মেলন হইতে বড়লাটের নিকট যে ডেপুটেশন পাঠাইবার কথা ছিল তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ডেপুটেশন প্রেরণের তারিখ ছিল ১লা এপ্রিল; ৩০শে মার্চ নেতাদের জানানো হয় যে বড়লাটকে সম্মেলন হইতে যে বিবৃতি পাঠানো হইয়াছে তাঁহার সমক্ষে ডেপুটেশনের নেতা তাহা পাঠ করিবেন এবং প্রত্যুত্তরে তাঁহার লিখিত বক্তব্য তিনি পাঠ করিবেন। ডেপুটেশনের সহিত সাক্ষাৎ এইখানেই শেষ হইবে। ডেপুটেশন-প্রেরণের প্রধান উদ্দেশ্য খোলাখুলি আলোচনা; বড়লাট তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎকারের কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া নেতারা সিদ্ধান্ত করেন। বোম্বাইয়ের মিঃ মুন্সী এ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, "আত্ম-মর্য্যাদাবোধসম্পন্ন কোন ব্যক্তি ডেপুটেশনের এই প্রহসনে যোগদান করিতে পারেন না।" এই ঘটনায় শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর ন্যায় ধীরমস্তিষ্ক ব্যক্তিও বিশ্বাস করিয়াছেন যে, জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীর সহিত আপোষ-মীমাংসা করিবার কোন অভিপ্রায় ব্রিটেনের নাই। —

মিঃ ইডেনের বক্তৃতা

আমেরিকা ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন বিলাতে ফিরিয়া পার্লামেণ্টে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে আমেরিকার সহিত ব্রিটেনের সামরিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধের কথা বেশী করিয়া আছে। উত্তর-আফ্রিকার প্রশ্ন আছে, ভিসি ফ্রান্সে একটি জানালা খোলা রাখিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। স্পেন, পর্তুগাল, তুরস্ক প্রভৃতি ইউরোপের সমুদয় নিরপেক্ষ দেশ সম্বন্ধে আলোচনা আছে, শত্রুপক্ষের আত্মসমর্পণের পর আমেরিকা, ব্রিটেন, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি কেমন করিয়া ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে পৃথিবীকে বাঁচাইবার বন্দোবস্ত করিবে সেই দূর ভবিষ্যতের কাহিনীও আছে—নাই শুধু দুইটি সমস্যার কথা, ভারতবর্ষের নামমাত্র উল্লেখ নাই, আর নাই রাশিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কোন কথা। মিঃ ইডেনের আমেরিকা-যাত্রার পূর্ব্বে দুইটি ঘটনায় পৃথিবী আলোড়িত হইয়াছিল—একটি, মস্কোতে আমেরিকান দূত এডমিরাল স্টাণ্ডলীর বক্তৃতা এবং রুশ-জার্ম্মান মৈত্রীর পুনঃ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমেরিকার সহ-সভাপতি মিঃ ওয়ালেসের ইঙ্গিত; দ্বিতীয়টি, ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধীর উপবাস। এই দুটি বিশ্বসমস্যার উপর ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব আলোকপাত করিবেন এ আশা যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহারা নিরাশ হইয়াছেন।

মিঃ ইডেন কানাডাতেও গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন এবং ভারতবর্ষের প্রতি ব্রিটেনের ব্যবহারের তারতম্য সুস্পষ্ট। সাম্রাজ্যের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থ করিয়া তুলিবার জন্য ইম্পিরিয়ালিষ্ট ব্রিটেন যে নবজাতীয়তার বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইংরেজ-অধ্যুষিত উপনিবেশগুলি সেই মধুময় বাণীতে ভোলে নাই, নিজ নিজ স্বার্থের কড়ায়-গণ্ডায় প্রমাণ তাহারা আদায় করিয়া লইতেছে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকার কানে মধু ঢালিবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু তেলও ব্রিটেনকে খরচ করিতে হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন, "ইংরেজ ক্রমাগতই ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলির কানে মন্ত্র আওড়াইতেছে, 'যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব' কিন্তু তাহারা শুধু মন্ত্রে ভুলিবার নয়—পণের টাকা গণিয়া দেখিতেছে। হতভাগ্য আমাদের বেলায় মন্ত্রেরও কোন প্রয়োজন নাই, পণের কড়ি ত দূরে থাক।" ডোমিনিয়ন ও ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবহারের এই তারতম্যের একমাত্র কারণ ডোমিনিয়নেরা শক্তিমান্, ভারতবর্ষ এখনও শক্তি অর্জন করিতে পারে নাই। —

ব্রিটেনের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা কাহারা ?

নিউ ইয়র্ক টাইমসে এক প্রবন্ধ লিখিয়া অধ্যাপক লাস্কি দেখাইয়াছেন যে, ব্রিটেনের জনসাধারণ ভোট দিবার অধিকার লাভ করিলেও এখনও সেখানে পুরাতন ধনী শাসকশ্রেণীই পার্লামেণ্টে ও মন্ত্রিসভায় আধিপত্য লাভ করিয়া দেশ ও উপনিবেশ শাসন করে। হাউস অব কমন্সের মেজরিটি রক্ষণশীল দলের হাতে; ইঁহাদের আর্থিক স্বার্থ অধ্যাপক লাস্কি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। রক্ষণশীল দলের শতকরা ৪৪ জন বিভিন্ন কোম্পানীর ডিরেক্টর। ব্যাঙ্ক, বীমা, রেলওয়ে, জাহাজ, লৌহ প্রভৃতি কোম্পানীর মোট ১৮০০ ডিরেক্টরের পদ ইহাদের করায়ত্ত, কাজেই ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির সহিত ইঁহাদের স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ভারতবর্ষ ও উপনিবেশসমূহের বড় বড় প্রত্যেক শিল্পের প্রতিনিধি পার্লামেণ্টে আছে। ৪৩ জন সদস্য জীবিত লর্ডদের আত্মীয়, ৯৫ জন পার্লামেণ্টের বড় বড় সদস্যদের আত্মীয় এবং ৪২ জন বিভিন্ন লর্ডের জামাতা। রক্ষণশীল দলের ৩০০ জনের মধ্যে শতকরা ৮০ জন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী, ১২৫ জন ইটন অথবা হ্যারোর ছাত্র, এবং ৮৮ জন অক্সফোর্ড অথবা কেম্ব্রিজের ছাত্র। ওয়ার ক্যাবিনেটে দুই জন অভিজাত বংশের লোক এবং দুই জন বিপুল ব্যবসায়ের অধিকারী আছেন। রক্ষণশীল মন্ত্রীদের মধ্যে দুই জন ডিউক, এক জন সংবাদপত্রের মালিক, এবং

অবশিষ্ট সকলেরই কোন-না-কোন লর্ডের সহিত আত্মীয়তা অথবা কোন বড় ব্যবসায়ের সহিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আছে।

এই শাসক-শ্রেণীর নিকট হইতে আবেদন-নিবেদন ও ডেপুটেশনের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ সম্ভবপর বলিয়া মনে করাও কঠিন। বর্তমান চার্চিল গবর্মেণ্টের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রত্যেকটি বড় বড় পদে এই শ্রেণীর লোকেরাই অধিষ্ঠিত আছেন।

—

ভারতের ভাবী গণতন্ত্র

ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিদেরা এত কাল ব্রিটেনের পার্লামেণ্টারী গবর্মেণ্টকে জগতের আদর্শ গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি বলিয়া প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলি প্রত্যেকেই ব্রিটেনের আদর্শে আপনাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়িয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষও ধীরে ধীরে এই গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি লাভ করিবার অধিকার পাইবে, ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ প্রাপ্ত হইয়া সে অন্যান্য ডোমিনিয়নের সহিত সমান আসনে বসিবার সম্মান অর্জন করিবে—ভারতবাসী এত দিন ইহাই শুনিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কিছু দিন যাবৎ ইহার বিপরীত প্রচারকার্য্য যে সুরু হইয়াছে অনেকেই হয়ত তাহা লক্ষ্য করেন নাই। ৩০শে মার্চ পার্লামেণ্টের বিতর্কে মিঃ আমেরী ঘোষণা করিয়াছেন, "ব্রিটেনে যে গণতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে উহাই গণতন্ত্রের একমাত্র আদর্শ এই ধারণা ব্রিটিশ এবং ভারতবাসীর মন হইতে দূর না হইলে ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইবে না। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি আমাদের আদর্শে গঠিত হইবে—গুরুত্ব না বুঝিয়া এই কথাটি আমরাও বলিয়াছি, ভারতবাসীকেও বিশ্বাস করিতে দিয়াছি।"

লর্ড সভার বিতর্কে লর্ড হেইলি বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে পার্লামেণ্টারী শাসনপদ্ধতির পরিবর্তে কিরূপ রাষ্ট্রবিধি প্রবর্তন করা যায় তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য অন্যান্য কতকগুলি দেশ হইতে বিশেষজ্ঞ সংগ্রহ করিয়া একটি কমীটি গঠন করা হউক।

মিঃ আমেরী এবং লর্ড হেইলির উক্তি হইতে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে রক্ষণশীল দলের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারত-শাসন আইনের বিধান অনুসারে ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর ৯৩ ধারায় গবর্ণরের শাসন চলিবার পর আইন সংশোধিত হইবে। যুদ্ধের পর ভারত-শাসন আইন সংশোধনের সময় গণতান্ত্রিক অধিকার আরও বেশী না দিয়া সামান্য যেটুকু দেওয়া হইয়াছে তাহাও সম্ভবতঃ কাড়িয়া লওয়া হইবে। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অভ্যন্তরে থাকিয়া ভারতবর্ষ অন্যান্য ডোমিনিয়নের ন্যায় ধীরে ধীরে বিলাতী আদর্শে আপনার গণতন্ত্র গড়িয়া তুলিবে, বহু বৎসর যাবৎ ভারতবাসীকে এই আশ্বাস দিবার পর অকস্মাৎ ইহার বিপরীত উক্তিতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে যে, বর্তমান রক্ষণশীল দলের হাতে ব্রিটেনের শাসনভার থাকিলে ভারতবর্ষে হয়ত আবার কিছু দিনের জন্য ক্লাইব ও হেষ্টিংসের আমল ফিরিয়া আসিতে পারে। লর্ড লিনলিথগোকে বর্তমানে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়া যে স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রবর্তন করিয়া রাখা হইয়াছে, যুদ্ধের পরও উহারই জের চলিবে এবং ভারতরক্ষা-আইন নাম বদলাইয়া ভারত-শাসন আইনে পরিণত হইবে এই আশঙ্কা অতঃপর আর অমূলক বলিয়া মনে করা চলে না। বিভিন্ন দেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আসিয়া ভারতবর্ষের রাষ্ট্রবিধি নির্ধারণ করিয়া দিবে এ প্রস্তাব ভারতবাসী অসম্মানজনক বলিয়া বোধ করিবে।

—

ভারতীয় সমস্যায় লর্ড সামুয়েল

লর্ড সভার বিতর্কে উদারনৈতিক দলের লর্ড সামুয়েল তাঁহার বক্তৃতায় তিনি ভারতবর্ষে ডোমিনিয়ন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তন সঙ্গত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, "ভারতবর্ষের বড়লাটকে ডোমিনিয়ন বড়লাটের সমপর্য্যায়ভুক্ত করিতে হইবে।" ব্রিটিশ ডোমিনিয়নসমূহে ডোমিনিয়ন গবর্মেণ্টের পরামর্শে বড়লাট নিযুক্ত হন এবং বড়লাটের পদচ্যুতিও তাঁহাদেরই দাবি অনুসারে হইয়া থাকে। মন্ত্রিমণ্ডল সেখানে পূর্ণশাসন ক্ষমতার অধিকারী এবং নিজ নিজ পার্লামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য। কংগ্রেস সেদিনও যুদ্ধের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী না করিয়া আপাততঃ ভারতবর্ষে এই ধরণের শাসন-পদ্ধতিই চাহিয়াছে; ডোমিনিয়ন স্টেটাস অপেক্ষা অনেক অল্পেতেই সন্তুষ্ট হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। বড়লাটের শাসন-পরিষদকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য করিলেও আপাততঃ কংগ্রেসের সহিত আপোষ-রফার পথ প্রশস্ত হইতে পারিত। ভারতবাসীকে এত দিন ধরিয়া ভাবী শাসনতন্ত্রের যে লক্ষ্য অভিমুখে পরিচালিত করা হইতেছিল তাহা হইতে হঠাৎ মোড় ঘুরাইয়া ডিক্টেটরীর দিকে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিলে নূতন বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইতে পারে, রক্ষণশীলদল ইহা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। পলাশীর যুদ্ধের পর মুসলমানকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য হিন্দুর সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, এ যুগে কংগ্রেসকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য মুসলমানের অযৌক্তিক দাবিকে প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে—কিন্তু ভাবী যুগে হিন্দু-মুসলমান কংগ্রেস-মডারেট প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় ও সকল দলকে অসন্তুষ্ট করিয়া জন কয়েক আম্বেদকর ও জাফরুল্লার সাহায্যে চল্লিশ কোটি লোকের উপর ডিক্টেটরী শাসন পরিচালনা কত দূর সম্ভব, একটু সুস্থ মস্তিষ্কে তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

—

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে মনে হয় সকল ক্ষেত্রেই এখন উভয় পক্ষ তাহাদের শক্তির শেষ সীমার অতি নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছে। অক্ষশক্তিত্রয়ের মধ্যে ইটালী বোধ হয় তাহার শক্তিসামর্থ্যের শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে, অর্থাৎ তাহার সৈন্যবল, অস্ত্রবল আর বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা নাই, যে পরিমাণ বলপ্রয়োগ সে এখন জলে স্থলে ও আকাশে করিতেছে তাহার অধিক কিছু করা তাহার ক্ষমতার অতীত। জার্ম্মানীর পক্ষেও সাধারণ হিসাবে সেই অবস্থা অতি নিকটে এবং এখন অধিকৃত ফ্রান্স ইত্যাদি নানা অঞ্চল হইতে দক্ষ শ্রমিক লইয়া যাওয়ার এবং সমস্ত জাতিকে সম্পূর্ণ ভাবে যুদ্ধসজ্জায় সাজাইবার (টোটাল মবিলাইজেশন্) যে চেষ্টা চলিতেছে তাহাতে অভিনব এবং অসাধারণ উপায়ে যুদ্ধের ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা চলিতেছে। এই চেষ্টা কতটা সফল হয় তাহা অদূর ভবিষ্যতেই দেখা যাইবে এবং মনে হয় যে ব্রিটিশ এবং মার্কিন বিশেষজ্ঞ দল বিশ্বাস করেন না যে উহাতে জার্ম্মানীর বিশেষ শক্তিবৃদ্ধি হইবে। বরঞ্চ যে-ভাবে তাঁহারা রাবণবধের পূর্ব্বেই লঙ্কাভাগের কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে তাঁহাদের বিশ্বাস যে, পাশ্চাত্য দেশে অক্ষশক্তির দিগ্বিজয়-ক্ষমতায় ভাটা পড়িতে আর দেরি নাই। অক্ষশক্তির তৃতীয় অধিকারী জাপানের বিষয়ে মিত্রপক্ষের জ্ঞানের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে কিছুই পাওয়া যায় নাই, এখন বোধ হয় কিছু হইয়াছে ; সুতরাং ইয়োরোপের যুদ্ধের শেষ সময়ের নির্দ্দেশ আমরা প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিলের বক্তৃতায় পাইয়াছি কিন্তু জাপানের বিষয়ে সে রকম কিছুই পাওয়া যায় নাই।

জাপানের লোকবল এখনও অপর্য্যাপ্ত আছে সে বিষয়ে মার্কিন দূত গ্রু এবং অন্য অনেকেই নিঃসন্দেহ। অস্ত্রবলে জাপান এত দিন হীন ছিল—ধারের হিসাবেও, ভারের হিসাবেও—কিন্তু ইতিমধ্যে কি ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে সে বিষয়ে কোনও সঠিক সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। যে ভাবে মিত্রপক্ষের উচ্চ অধিকারীদ্বয় আগে ইয়োরোপের পালা শেষ করিয়া এসিয়ার রঙ্গভূমিতে অবতরণের ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে মনে হয় যে, তাঁহাদের বিচারে জাপানের অস্ত্রনির্ম্মাণ-ক্ষমতা দুই-তিন বৎসরের মধ্যে এমন কিছু বাড়িতে পারে না যাহাতে সম্মিলিত মিত্রপক্ষের—অন্ততঃ পক্ষে ব্রিটেন ও মার্কিনের—বিপদ বৃদ্ধি হইতে পারে। এইরূপ বিশ্বাস সমীচীন কিনা তাহা নিরূপণের ক্ষমতা আমাদের নাই, তবে জাপানের যুদ্ধশক্তি বিকাশের ইতিহাস অন্য কথা বলে। জাপানের উদ্যম ও অধ্যবসায় অসীম এবং সে দেশে কারুদক্ষ শ্রমিকেরও অভাব নাই। অভাব ছিল প্রধানতঃ কাঁচামালের এবং অত্যাধুনিক নির্ম্মাণ-যন্ত্রের (মেশিন-টুল)। কাঁচামাল পাইলে এবং অভিজ্ঞ ও কৌশলী যন্ত্রবিশারদ থাকিলে নির্ম্মাণ-যন্ত্রের অভাবপূরণ অসম্ভব নহে, তাহা কেবলমাত্র সময়সাপেক্ষ। জাপান এখন কাঁচামালের অধিকার হিসাবে জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতিদের মধ্যে গণ্য। মাল সরবরাহের জাহাজের অভাবের কথা মাঝে মাঝে যাহা শোনা যাইত তাহাও সম্প্রতি বিশেষ কেহই বলে নাই। সুতরাং এখন প্রশ্ন যন্ত্র-বিশারদদের এবং সময়ের। প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতায় বুঝা যায় যে মিত্রপক্ষ এখনও অন্ততঃ পক্ষে আরও দুই বৎসর সময় জাপানকে দিতে প্রস্তুত, সুতরাং জাপানের পক্ষে নূতন চেষ্টার সময়েরও অভাব না ঘটিতে পারে, শেষ প্রশ্ন তবেই জাপানের ও জাপানের মিত্রবর্গের যন্ত্র-কৌশলের উপর নির্ভর করিবে। ইহা অসম্ভব নয় যে সময় পাইলে জাপান তাহার ক্ষমতা দ্বিগুণ করিবার নূতন উপায় সৃষ্টি করিতে পারিবে, এবং যদি সেরূপ অবস্থা ইউরোপের যুদ্ধ মিটিবার পূর্ব্বেই ঘটে, তবেই মিত্রপক্ষের সমূহ বিপদ। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিলে বর্ত্তমানে জাপানও তাহার শক্তির সীমায় পৌছাইয়া আছে। যে প্রায় এক বৎসর সময় সে তাহার বিদ্যুৎ-অভিযানের পরিণতির পর পাইয়াছে তাহাতে জলে স্থলে বা আকাশে তাহার নূতন শক্তি বিকাশের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

মিত্রপক্ষের মধ্যে স্বাধীন চীন অপরিসীম লোকবলের অধিকারী হইয়াও অস্ত্রের অভাবে ক্ষীণ। মিত্রপক্ষের যে বিশাল অস্ত্র-নির্ম্মাণের পর্য্যায় চলিয়াছে তাহার অতি সামান্য অংশে ফলভোগও চীনের পক্ষে এখন সম্ভব নয় এবং জাপানের শক্তি ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে সে অবস্থার উন্নতির পথও দেখা যাইতেছে না। চীনের পক্ষে "মরিয়া" হইয়া টিঁকিয়া থাকাই এখন অতি অসাধারণ শৌর্য্যের বিষয়, চীন হৃতবল হইলে জাপানের এক অতি প্রবল স্থল ও আকাশ সেনার সমষ্টি অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিত। সেই শক্তিকে স্থাণু করিয়া রাখায় মিত্রপক্ষের যে অশেষ উপকার হইয়াছে তাহার প্রতিদান করা ব্রিটেন ও আমেরিকার পক্ষে দুরূহ হইবে।

রুশ এখন অস্ত্রবলের জন্য কিছু অংশে পরমুখাপেক্ষী। লোকবলের হিসাবেও যে বিষম ক্ষতি তাহার হইয়াছে তাহা সহজ বুদ্ধিতে নিরূপণের অতীত। সুতরাং সোভিয়েটের হিসাবের খাতায় এখন ক্ষতিপূরণের অঙ্কের প্রয়োজন। পূর্ব্ব-ইয়োরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে সোভিয়েট গণ-সেনা অক্ষশক্তির পূর্ণ বলপ্রয়োগের যে অতি প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিয়াছে তাহা বর্ণনারও অতীত। সে সকল দুর্দ্দান্ত সমর-অভিযানের তুলনায় ফ্রান্সে বা উত্তর-আফ্রিকায় যাহা ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে তাহা অতি সামান্য খণ্ডযুদ্ধ মাত্র। তাহার ফলে যে অবস্থা এখন আসিয়াছে তাহা অসীম শৌর্য্য ও বীর্য্যের আকর সোভিয়েট গণসেনার পক্ষেও দুঃসহ। এখন রুশের প্রয়োজন ক্ষতিপূরণের জন্য সাহায্য ও সময়, কেন-না মূলধনের ক্ষয় বেশী দিন চলিতে পারে না। ইহা সত্য যে, জার্ম্মানী এবং তাহার সাহায্যকারীদিগেরও অসীম ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থায় এখনও বিশেষ চোট লাগে নাই।

ব্রিটেনের ও আমেরিকার অস্ত্র নির্ম্মাণের উদ্যমের পূর্ণ বিকাশ অল্পদিনের মধ্যেই হইবে। ব্রিটেনের সৈন্য-বলের যে পরিমাণ বৃদ্ধি ইতিমধ্যেই হইয়াছে তাহার পর বাৎসরিক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে নূতন কন্সক্রিপ্ট ভর্ত্তি ছাড়া আর বিশেষ কিছু হইতে পারা বোধ হয় সম্ভব নয়। আমেরিকায় মার্কিন সৈন্যদল এখনও গঠিত হইতেছে, লোকবলের অঙ্কে সেখানে এখনও অশেষ বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাহাদের শিক্ষাদান, অস্ত্রদান এবং যুদ্ধক্ষম করা অতি জটিল ব্যাপার এবং তাহা বিশেষ সময়সাপেক্ষ। তত দিনে মিত্রপক্ষের অন্যদের বলক্ষয়ের কিরূপ ব্যাপার দাঁড়াইবে তাহাও এক বিশেষ প্রশ্ন এবং সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ প্রশ্ন শক্তিপ্রয়োগের ব্যাপারে। ব্রিটেন ও আমেরিকায় যে পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে তাহার কতটা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছাইতে পারে এবং যে পরিমাণ সৈন্যবল ব্রিটেনে ও আমেরিকায় মজুত আছে তাহার কতটা বিদেশে পাঠাইয়া, যথাযথভাবে অস্ত্রশস্ত্র, রসদ ইত্যাদি সরবরাহ করিয়া সম্যক ভাবে অভিযান চালনা করা সম্ভব তাহার সব-কিছু নির্ভর করে নৌবল ও বাণিজ্যপোতের সংখ্যার উপর। মহাসাগরের যুদ্ধে ডুবুরি জাহাজের আক্রমণ কি ভাবে চলিতেছে তাহা এখন প্রকাশিত হয় না, কিন্তু ইহা এখন নিশ্চিত যে ঐ আক্রমণ বিশেষভাবে প্রতিরোধ না করিতে পারিলে ইয়োরোপ বা এসিয়া মহাদেশে মিত্র-পক্ষের শক্তিপ্রয়োগ কোনও গরিষ্ঠ অনুপাতে সম্ভব হইবে না

এই বৎসরের গ্রীষ্ম ও শরৎকালের মধ্যে মিত্রপক্ষের সম্মিলিত শক্তির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম বিকাশ সম্ভব, যদি সকল ক্ষেত্রে সমীচীনভাবে অস্ত্র ও লোকবলের সরবরাহ হয় এবং সুনির্দ্দিষ্টরূপে সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়। যদি তাহা না হয় তবে যুদ্ধের শেষ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত থাকিতে বাধ্য।

বিগত বৎসরের যুদ্ধের মধ্যে মার্কিন সেনার রণাঙ্গনে অবতরণ এবং স্টালিনগ্রাডে সোভিয়েট গণসেনার অলৌকিক বীরত্ব ও আত্মবলিদান এই দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। প্রথমটির দরুণ দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে ও ভারত-মহাসাগরে জাপানের বিজয়-অভিযান ক্ষান্ত হয় এবং কিছু পরে উত্তর-আফ্রিকায় দৃশ্যপটের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়। দ্বিতীয়টির ফলে জার্ম্মান রণনায়কগণের পূর্ব্বমুখী দ্রুত দিগ্বিজয়ের কল্পনা বাতাসে মিলাইয়া যায়।

রুশ-সেনার শীতকালীন অভিযান শেষ হইয়া গিয়াছে। একমুখী ও নির্দ্দিষ্ট স্বল্পলক্ষ্য অভিযানে যাহা কিছু ঘটিতে পারে সে সকলই ইহাতে দেখা গিয়াছে। এইরূপ অভিযানে উভয় পক্ষের প্রচণ্ড ক্ষতি, ঘাত ও প্রতিঘাত সমানভাবে আকস্মিক ও প্রবল এবং অভিযানকারী সকল লক্ষ্যস্থল দৃঢ় ভাবে স্বকরায়ত্ত না করিতে পারিলে যুদ্ধে দ্রবভাব আসা নিশ্চিত। সম্প্রতি রুশ-রণভূমির ১২০০ মাইল বিস্তৃত প্রান্তে তুষার-দ্রবের পঙ্কস্রোত বহিয়া চলিতেছে, সুতরাং যুদ্ধে মন্দা পড়িয়াছে। শীত অভিযানের ফলাফলের বিচার করা বৃথা, তবে ইহার ফলে জার্ম্মান-বাহিনী দারুণ লাঞ্ছিত, ক্ষতিগ্রস্ত এবং তিনটি উৎকৃষ্ট যুদ্ধকেন্দ্র হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। অন্য দিকে সোভিয়েটের বিপদের আশঙ্কার বিশেষ কিছু উপশম হয় নাই। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, এখন সব কিছু নির্ভর করিতেছে লাভ-লোকসানের খাতায় ক্ষতিপূরণের অঙ্কের উপর এবং সে হিসাবে সোভিয়েটের পরিস্থিতি বিশেষ সন্তোষজনক বলা চলিবে না, যত দিন রুশের মিত্র পক্ষের যুদ্ধশক্তি ইয়োরোপ মহাদেশের ক্ষেত্রে সম্যক্ ভাবে প্রযুক্ত না হয়।

ট্যুনিসিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে মিত্রশক্তির পাল্লা এখন বিশেষ-ভাবে ভারী। এই স্বল্পপ্রসর রণাঙ্গনে মার্কিন ও ব্রিটেনের প্রায় সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগের উপায় করা হইয়াছে। ইটালো-জার্ম্মান রক্ষীদল এখন তিন দিক হইতে আক্রান্ত এবং মিত্রপক্ষের আক্রমণ এখন অতি দৃঢ়ভাবে চালিত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত যে সকল সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে

মিত্রপক্ষের অগ্রগতি রোধের কোনও কারণ দেখা যায় নাই, যদিও বিপক্ষের রণকুশলী নেতার এবং যুদ্ধক্ষম সৈন্যের প্রতিরোধ-চেষ্টা এখনও সমানভাবেই প্রবল রহিয়াছে।

এসিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে নূতন কিছুই দেখা যায় নাই। চীন দেশে যুদ্ধের অনল ক্ষণিকভাবে জ্বলিয়া ক্রমে নিবিয়া আসে, দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে চালমাৎ—কেবল মাত্র মাঝে মাঝে আকাশবাহিনীর তৎপরতার কথা শোনা যায়। চীনের অবরোধ পূর্ব্বেকার মতই কঠোর লৌহ-শৃঙ্খলের মত স্বাধীন চীনের কণ্ঠলগ্ন হইয়া আছে। জাপান কয়েক বারের ব্যর্থ সৈন্যচালনার পর সম্প্রতি য়ুনান প্রদেশে, ইয়াংসি নদের পার্শ্বস্থ অঞ্চলে ও শান্টুং প্রদেশের যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবার উপক্রম করিয়াছে। ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের অবস্থা পূর্ব্বেকার মতই জটিল হইয়া আছে, শুধু যা মাঝে মাঝে বোমা ক্ষেপণের এবং আকাশ-যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

আরাকান অঞ্চলের যুদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি বিবরণ গত মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদের অভাবে গুজবের ও উদ্ভট সিদ্ধান্তের অন্ত ছিল না, বিবরণগুলিতে তাহার কিছু অংশ লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা ঠিক্ যে, সরকারী সংবাদ দানের এবং সরকারী মতামত জ্ঞাপনের যে ব্যবস্থাগুলি রহিয়াছে তাহাদের কার্য্যপ্রথার অনেক উন্নতি আবশ্যক। যেভাবে আরাকানে সৈন্য-চালনার সময় নানা প্রকার ঘোষণা ও মতামত প্রকাশিত হয় এবং গত দুই মাসে তাহা যে ভাবে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে তাহার কোনটাতেই সংবাদঘোষণায় কৃতিত্বের কোন চিহ্নমাত্র নাই।

প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিলের বক্তৃতায় যুদ্ধ সম্বন্ধে নূতন কিছুই নাই। আগে ইয়োরোপে মিত্রশক্তি নিষ্কণ্টক হউক তাহার পর এসিয়ার পালা। ইয়োরোপে আরও দুই বৎসর ত লাগিবেই, এমন কি তিন বৎসরও লাগিতে পারে, সেখানকার গণ্ডগোল মিটিলে এসিয়ায় সব-কিছু করা যাইবে এইরূপ তাঁহার মত। ইতিমধ্যে জাপান অবশ্য লক্ষ্মী ছেলের মত মাষ্টারের কাছে মার খাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে কি না সে বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই। চীনদেশে এইরূপ বিষম সঙ্কটাপন্ন অবস্থা আরও দুই-তিন বৎসর চলিলে কি হইবে সে ভাবনা কাহারও নাই—ভারতবর্ষের কথা তো ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। এইরূপ মনোবৃত্তির দরুণই সসাগরা বসুন্ধরার চৌদ্দ আনার অধিকারীবর্গের সহিত তিনটি দেউলিয়া দেশ এত দিন লড়িতে পারিয়াছে।

বৈশাখের রবীন্দ্রনাথ

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

বৈশাখ মাস পুণ্যমাস। বাংলা দেশ ফলফুলের প্রাচুর্য্যে ভ'রে ওঠে এই মাসে। যত পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠান ক'রে বাংলার মেয়েরা পুণ্যের হাওয়া বওয়ায় বাংলার চারিদিকে। জননীর পুণ্যে, নারীদের পুণ্যে প্রাচুর্য্যের কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলার কোলে আবির্ভূত হয়েছিলেন এই বৈশাখে।

আমাদের এই দারুণ দুঃসময়ে বৈশাখের রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করি ফলফুলের প্রাচুর্য্যের মধ্যে। বাংলার ফুল-সম্ভার কবির চিত্তকে সাজিয়ে তুলত ভরা গাঙের জোয়ার-জলের মত। কবির মুখের দু-একটি কথা, দু একটি কাহিনী—যা স্মৃতির আকাশে ভেসে রয়েছে টুকরো মেঘের মত সেগুলিকে স্মরণ ক'রে লিখে সাজিয়ে "প্রবাসী"র পাঠকদের উপহার দিচ্ছি।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের গোড়ার দিকে কবির সম্পাদনায় একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ক'রে বিদ্যালয়ের আয় বৃদ্ধির দিকে মনোযোগী হওয়ার জন্য অনেক হিতকারী বন্ধুবান্ধব কবিকে পরামর্শ দেন। কবি তখন অর্থাভাবে বিশেষ বিপন্ন—কাজেই পরামর্শটা খুবই শ্রুতিমধুর ছিল, কিন্তু কবি তাতে লুব্ধ হন নাই। বললেন, "অনেকেই এখন উৎসাহ দিচ্ছেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেউই টিঁকে থাকবেন না—আমারই ঘাড়ে শেষটা সব ঝুঁকি চেপে পড়বে। আমার মনের এরূপ গঠন নয় যে একখানি মাসিক পত্রিকা পরিচালনায় আমার সমস্ত মন নিয়োগ করতে পারি। এ কাজ আমার নয়। রামানন্দবাবু বাংলায় একটি নূতন জিনিস খাড়া ক'রে তুলেছেন—তাঁর প্রবাসী। ছবি, লেখা, গল্প ইত্যাদিতে প্রবাসীর আদর্শ একটু নূতন রকম। এ রকম মাসিক পত্র বাংলায় ইতিপূর্ব্বে ছিল না। যা লিখতে পারি—প্রবাসীতেই দেব। লাভ-লোকসানের দায় ঝুঁকি রামানন্দবাবুর। লোকসানের দায়ে নিজেকে জড়াতে চাই না।" কবি তখন দেনাকে বড্ড ভয় করতেন।

জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কবি যা কিছু লিখেছেন, তার অধিকাংশই প্রবাসীকে দিয়ে গেছেন। কবি নেই—কবির প্রিয় প্রবাসী আজ উপবাসী—কবির লেখামৃত পরিবেশনে সে আজ অক্ষম। কবিকে স্মরণ ক'রে তাঁর আদরের প্রবাসীতে আজ তাঁরই কথা দু-একটি বলছি।

ব্যবসা-বিপর্য্যয়ে বিব্রত কবি যখন ত্যাগের পাত্র হাতে নিয়ে নিজেকে উজাড় ক'রে দেবার জন্য পিতার প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম গড়ার কাজ সুরু করেন—তখন তাঁর বৈরাগ্য-ধোওয়া মঙ্গলদীপ্ত উজ্জ্বল মূর্ত্তি যারা মনোযোগ দিয়ে দেখেছে, তারা সে সময়কার পরিচয় তাঁর জানে। একটি ঘটনার উল্লেখ করি।

শীতকাল—পৌষের শীতে সকলেই কাতর—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্রগুলিকে ভোর পাঁচটায় স্নান করতে হ'ত ইঁদারার টাট্‌কা তোলা গরম গরম জলে। কিন্তু স্নানের পরে গরম ইউনিফর্ম্ম পরা সকল ছাত্রেরই ছিল অত্যাবশ্যক। অভিভাবকদের খবর দেওয়া হ'ল একটি ক'রে ইউনিফর্ম্ম পাঠিয়ে দিতে, অথবা টাকা পাঠালে তৈরি ক'রে দেওয়া হবে বলা হ'ল। সকলেরই বাড়ী থেকে ইউনিফর্ম্ম এল, কারও কারও টাকা এল। একজন ছাত্রের বাবা লিখলেন—"আমার টাকা নেই, ইউ-নিফর্ম্ম দিতে পারব না।" কবির গায়ে তখন একটিমাত্র শীতবস্ত্র, না জোব্বা, না ওভারকোট—কবির নিজের আবিষ্কৃত একটা মাঝামাঝি প্যাটার্ণের। বেশ স্পষ্ট মনে আছে, পোষাকটি ছিল ছাই রঙের আর তার কোমরের কাছে ছিল মস্ত বড় একটা তালি। কবি বললেন—"এইটাই কেটে ওর ইউনিফর্ম্ম ক'রে দেওয়া যাক্, নইলে ছেলেটা শীতে মারা যাবে যে। আমি একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে চালিয়ে নেব।"

কবি তখন নানা প্রকারে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করছিলেন। পিতা জীবিত, তাঁকে তিনি ব্যবসা-বিপর্য্যয়ের কথা ঘুণাক্ষরে জানতে দেন নি—পাছে তিনি উদ্বিগ্ন হন। সমস্ত দুঃখ কবি নিজে বহন করেছেন, নিজের ঋণের বোঝা এবং অন্যের ঋণের বোঝা একলা মাথায় নিয়ে। তবু ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ছাত্রদের কোনরূপ অসুবিধা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সদাসর্ব্বদা দৃষ্টি রাখতেন, তাদের অভাব-অভিযোগের দিকে। নিজের উপর দিয়ে কত রকমের ঝড় বয়ে যাচ্ছে, বাইরে থেকে তা কেউ এতটুকু জানতে পারত না। ওঁর ঋণের কথা উঠে পড়ল ব'লে এটাও সেই সঙ্গে ব'লে নিচ্ছি, যে কা'রও এক পয়সা ঋণ তিনি রেখে যান নি।

বালকদের প্রতি কবির সহজ প্রীতির ভাব ছিল কি সুন্দর ও স্বাভাবিক, দু-একটি দৃষ্টান্তে সেটি পরিষ্কার হবে।

আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ তপনমোহন যখন সাত বছরের ছেলে—তখন কবি এক দিন আমার বাড়ী রায়-বাগানে যান। কবির মনে মনে ঝোঁক ছিল ছোট ছোট

ছেলে সন্ধান ক'রে নিজের স্কুলের জন্য সংগ্রহ করা। তপন কবির ভাইঝির ছেলে— আপনার লোক। তপনকে দেখেই তাঁর পছন্দ হ'ল। মনে মনে গেঁথে রাখলেন, একে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ভর্ত্তি করতে হবে—যদিও মুখে কিছু বললেন না। তপনকে কাছে ডেকে কত কি জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় পড়ে, কি পড়ে, ইত্যাদি। কবি চ'লে গেলেন, সাত বছরের ছেলে তপন বললে, "ইনিই বুঝি সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভারতী, বালক, সব কাগজে যাঁর নাম লেখা থাকে শ্রীরবীন্দ্রনাথ, শ্রীরবীন্দ্রনাথ?" আমরা হেসে উঠলাম। বললাম, "তোর বুঝি খুব ভাল লেগেছে? কি দেখে এত ভালো লাগল, বল্ ত?" অনেকক্ষণ ভেবে তপন বললে, "কি রকম গলার আওয়াজ!" পরে কবির কাছে এই গল্প করায় কবি বললেন, "দেখলে কেমন সমজদার?"

এর দু-বছর পরে তপন ভর্ত্তি হ'ল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে। সেই সময়কার এক দিনের কথা মনে পড়ছে। আমার শ্বশুর-মশায় তখন রাঁচিতে তাঁর অন্য দুই-ভাইয়ের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসতে গিয়েছেন। নীচু-বাংলাতে রাতে একা থাকা সম্ভব নয় ব'লে সেই ক'টা দিন শান্তিনিকেতনের বাড়ীতে আমি এ. রয়েছি। দিনুর বাবা থাকতেন একতলায়, তপনকে নিয়ে দুতলার একটা ঘরে আমি, আর অন্য দিকের একটা ঘরে কাকামশায়। তপন তখনও এতটুকু, আর ভীষণ ভীতু। রাতের অন্ধকারে একলা শান্তিনিকেতনের দুতলার সিঁড়ি উঠতেও সে ভয় পায়, আমাকে ডাকতে ডাকতে ওঠে, তাও "মেজো পিসীমা" পুরো গলা দিয়ে বেরোয় না, "মেজো" "মেজো—" পর্য্যন্ত বেরোয় শুধু।

এক দিন সে ঘুমিয়ে যাবার পরে আমি একটু নীচে নেমেছি। দিনুর বাবার অসুখ, তাঁকে দেখে উপরে ফিরে গিয়ে দেখি, তপনকে নিজের পাশে শুইয়ে কবি তাকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছেন। হঠাৎ কি কারণে তার ঘুম ভেঙে যায়, তখন আমাকে বিছানায় না দেখতে পেয়ে সম্ভবতঃ সে বাইরে বেরিয়ে ঘুরছিল, দেখতে পেয়ে কবি তাকে অভয় দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন।

আর একবারের কথা। তখন কবির সঙ্গে আগরতলা রাজবাড়ীর খুব ঘনিষ্ঠতা, প্রায়ই যাওয়া-আসা চলে। কর্ণেল মহিম ঠাকুরের স্ত্রী-বিয়োগ হবার পর তাঁর ছেলে সোমেন দেববর্ম্মণকে তিনি কবির হাতে সমর্পণ করেন। হঠাৎ এক দিন তাকে সঙ্গে ক'রে কবি কলকাতায় আমার কাছে এসে উপস্থিত। বললেন, "বড় বৌমা, তিন দিনের জন্যে এর ভার তোমাকে নিতে হচ্ছে। আমার ত ঘর নেই, বাড়ী নেই, কিছু নেই, তোমার কাছে ওকে রেখে যাচ্ছি, যেখানে ওর যত্ন হবে।" কথা হ'ল, তিন দিন পরে তাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাবেন। সেই দিনই রাত ন'টায় সোমেনের খাওয়া দেখতে আবার আমার কাছে এসে উপস্থিত। আমি বললাম, "আপনার কি ভয় হয়েছে, আমি ওকে না খাইয়ে রাখছি?" হাসলেন, কিন্তু ব'সে রইলেন ওর খাওয়া না শেষ হওয়া পর্য্যন্ত। যে তিন দিন সোমেন আমার কাছে রইল, প্রত্যেক দিন তার রাত্রের খাওয়া দেখবার জন্যে এসে ব'সে থাকতেন। ও ঘুমে ঢুলে ঢুলে প'ড়ে যাচ্ছে, আমি তার মু'খে লুচি তরকারি ঠুসছি, আর প্রাণপণে সে কাশছে. খুব কিছু দেখবার মত ব্যাপার যে তা নয়। সেই সোমেন ট্রেন দুর্ঘটনায় পুড়ে মারা গেল, কত ভাল তাকে বাসতেন আর কত বড় আঘাতই যে তখন পেয়েছেন।

আরও একটি ছেলের কথা বলছি। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ এক দিন তার বিধবা মা তাকে সঙ্গে ক'রে হাজির। স্ত্রী-বিয়োগের পর কবি প্রায় বৎসর দুই কোনো অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন না, দারোয়ানকে ব'লে দিলেন 'ইন্‌কো বড়-মাজীকো পাস লে যাও।" আমি বললাম, "কি ব্যাপার রে?" দারোয়ান বললে, "কেয়া জানে মাজী!" ছেলেটির মা বিষয়টা পরিষ্কার ক'রে দিলেন, তিনি বিধবা মানুষ, ছেলে মানুষ করবার তাঁর সাধ্য নেই, কবিকে তাঁর ছেলেটির সব ভার নিতে হবে। ছেলেটি রয়ে গেল এবং মানুষ হয়েই শান্তিনিকেতন থেকে বেরোল।

দর্শন-প্রার্থিনী অপরিচিতাদের অন্দরে পাঠিয়ে দেওয়াই যদিও তাঁর নিয়ম ছিল, তবু সব সময় যে নিয়মরক্ষা হয়ে উঠত তা নয়। দুবারের দুটি ঘটনার কথা বলছি। একবার এক বোষ্টমী সব পাহারা এড়িয়ে একেবারে তাঁর দরবারে গিয়ে হাজির, তিনি তখন একলা রয়েছেন, বললে, "বাবা, তুমি ত পরম বৈষ্ণব, তুমি আমাকে ফিরাবে কেমন ক'রে, আমাকে কিছু ভিক্ষা দিতেই হবে।" কে উপরে গেল, কে তাকে ঢুকতে দিলে এই-সব নিয়ে পার্শ্বচরেদের মধ্যে খুব হৈ চৈ বেধে গেছে যখন ততক্ষণ সে নগদ দশটি টাকা কবির কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রে স'রে পড়েছে। আর একবার আর একটি মেয়ে, সেও ঠিক ঐ দশটি টাকাই তাঁর কাছ থেকে আদায় করেছিল, এবং কতকটা একই ধরণের পন্থা অবলম্বন ক'রে। সে বলেছিল সে বঙ্কিম চাটুজ্যের ভাইঝি। সে প্রস্থান করবার পর আমরা তাই নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করাতে কবি বললেন, "ও বঙ্কিমবাবুর নাম ক'রে নিজের পরিচয় যখন দিয়েছে, তখন সে সাঁচ্চাই হোক আর মেকিই হোক তাকে কি আমি ফেরাতে পারি?"

পুস্তক পরিচয়

বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা—অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন এম. এ, পি-এইচ ডি। প্রকাশক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তৃতীয় সংস্করণ (১৯৪২)

গ্রন্থকার 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,' 'A History of Brajabuli Literature' ইত্যাদি বহু সারগর্ভ গ্রন্থ রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বাংলা-সাহিত্যের 'কথা' বহুকাল তাঁকে জনপ্রিয় করে রাখবে। অতি সরল ও সুললিত ভাষায় প্রায় এক হাজার বছরের ইতিহাস তিনি মাত্র দুই শত পাতায় লিপিবদ্ধ করেছেন; অথচ অন্য অনেক বইয়ের মতন গ্রন্থাদির তালিকা মাত্রে পর্য্যবসিত হয় নি। প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকার—সন তারিখ ছাড়া—গ্রাম, জিলা ও ঐতিহাসিক আবেষ্টন নিয়ে পাঠকের কাছে উপস্থিত; সেই সঙ্গে দু-চার ছত্র মূল পদ উদ্ধৃত ক'রে সুকুমার বাবু সাধারণের কৌতূহল জাগাতেও চেষ্টা করেছেন। মনসামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি লৌকিক কাব্য সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা তিনি শুনিয়েছেন। শুধু আক্ষেপ থাকে একটা দিকে: ধর্ম্মপ্রভাববর্জ্জিত লৌকিক কাহিনী ও পল্লীগাথা (যথা পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা)গুলির উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা সঙ্কীর্ণ; ভবিষ্যৎ সংস্করণে উদারভাবে এই অধ্যায়ের যথোপযুক্ত বিশ্লেষণ থাকবে আশা করি। আরও দু'টি বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্র রয়েছে; মেয়েলী ব্রত-কথা (রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন) এবং বাংলার বাউল পদ-সংগ্রহ। আশা করি এই রকম মৌখিক অথবা অলিখিত গল্প-সাহিত্য নিয়ে তিনি ভবিষ্যতে আলোচনা করবেন। বাংলা-সাহিত্যের আধুনিক যুগের ইতিহাস মাত্র ৫০ পৃষ্ঠায় সারতে বাধ্য হয়ে গ্রন্থকার সব কথা ভাল করে বলবার অবকাশ পান নি। তবে যথাসম্ভব রচনাগুলি ও রচয়িতাদের কাল নির্ণয়ে সাহায্য করতে তিনি চেষ্টা করেছেন। তিন বৎসরে তিনটি সংস্করণ হওয়ায় বোঝা গেল যে বইখানি হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। আমরা 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা'র বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীকালিদাস নাগ

আলেখ্য—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, ২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. সংখ্যা ১৫৫। মূল্য দুই টাকা।

গল্পগ্রন্থ, দশটি গল্পে সম্পূর্ণ। রামপদবাবু গল্পের জন্য খুব সুদূরের অভিযান করেন না; নিত্য-প্রবহমান জীবনের মধ্যেই যেখানে একটু বিস্ময়, কৌতুক, আনন্দ বা বিষাদের সন্ধান পান, একটু গাঢ় রং ফলাইয়া পাঠকের চোখের সামনে ধরেন। তাই, চেনা জিনিসকে ভাল করিয়া দেখিবার, চিনিবার এবং উপলব্ধি করিবার যে এক সহজ আনন্দ আছে, রামপদবাবুর লেখায় সেই আনন্দ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

সৃষ্টি হিসাবে সমস্ত গল্পগুলিই অনবদ্য হইলেও, 'তৃষ্ণা'; "গলি, গরু ও গৌরী" এবং 'বটগাছ' গল্প তিনটি বিশেষ করিয়া ভাল লাগিল। তৃষ্ণা গল্পটিতে লেখক, আপাত দৃষ্টিতে যাহা হীন এমন একটি চিত্তবৃত্তিকেও কমনীয় এবং বোধ হয় কতকটা সুন্দরও করিয়া দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। "গলি, গরু ও গৌরী"—বস্তি-চিত্র। কিন্তু বস্তির চারিদিকের গ্লানির মধ্যে একটিমাত্র যে শুচিতার নিদর্শন আছে তাহা কর্দমে কমলের মতই শোভন এবং বিস্ময়কর। 'বটগাছ' গল্পটিতে লেখক এক বৃদ্ধার নিজের পুরাতন ভিটার প্রতি অদ্ভুত আকুতির চিত্র আঁকিয়াছেন,—একটি অতি সামান্য হৃদয়বৃত্তি লইয়া এমন সুন্দর গল্প প্রায় চোখে পড়ে না। রসিক সমাজে বইখানির সমাদর হওয়া উচিত।

রঙ্গমঞ্চ—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোং। মূল্য বার আনা।

পিরানডেলো, মলেয়ার ও ষ্ট্রীনড্‌বার্গ—এই তিন জনের নাটিকার ছায়া অবলম্বনে লেখক তিনখানি নাটিকা লিখিয়া বইখানিতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। নাটিকা তিনটি সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই। মূল লেখকদের নামই তাদের পরিচয়; লেখক পাইপ থেকে বাহির করিয়া দেশী কলিকাতে চালিয়া সাজিয়াছেন বলা যায়। তাঁহার কৃতিত্ব এই যে তিনি এ বিষয়ে বেশ মুন্সিয়ানা দেখাইয়াছেন। রসপিপাসু মাত্রেই বইখানিতে আনন্দ পাইবেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য-বিতান—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়। ২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

মোহিতলাল শুধু কবি নহেন, তিনি বিশিষ্ট সমালোচক। আধুনিক জীবনে, তথা সাহিত্যে যে আদর্শহীনতা সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে, তিনি তাহাকে সর্বত্র কশাঘাত করিয়াছেন। অনেক বিষয়ে তাঁহার মতামত প্রবল এবং তীক্ষ্ণ, কিন্তু কোথাও যুক্তিহীন নহে। গতানুগতিক নিন্দাস্তুতি বর্ষণ করিয়া তিনি দায়িত্ব পালন করেন নাই; অধ্যয়ন, নিষ্ঠা এবং রসোপলব্ধি লইয়া সশ্রদ্ধভাবে সাহিত্যবিচারে অগ্রসর হইয়াছেন। যাঁহারা সাহিত্যের সিদ্ধ সাধক, তাঁহাদের সাধনাকে তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, আর যাহারা মন্দির-প্রাঙ্গণে উপদ্রবকারী তাহাদের তিরস্কার করিয়াছেন। এই গ্রন্থে একুশটি নিবন্ধ আছে। তন্মধ্যে আটটি—বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে; একটি করুণানিধানের কবিতা, একটি রবীন্দ্র মৈত্রের রচনা সম্পর্কে; অপর এগারোটি—সাহিত্যের আদর্শ এবং বাংলা-সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি বিষয়ে। প্রত্যেকটিতেই অন্তর্দৃষ্টি এবং রসজ্ঞতার পরিচয় আছে। 'হাস্যরস ও হিউমার' প্রবন্ধে লেখক বিভিন্ন শ্রেণীর হাস্যরসের সূক্ষ্ম ও নিপুণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 'বিদ্যাসাগর'-সংক্রান্ত রচনাটি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য; আমরা এই মনীষী মহাপুরুষের সাহিত্য-কীর্তি সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট সচেতন নহি। 'রডোডেনড্রন গুচ্ছ'—'শেষের কবিতা'র আলোচনা। লেখক ইহার রচনা-সৌন্দর্য এবং অমিত রায়-চরিত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রাচীনের অনুরাগী হইলেও লেখক নবীনের প্রতি অহেতুক বিরাগ প্রকাশ করেন না; বস্তুতঃ নবীন প্রতিভার সন্ধান পাইলে সাগ্রহে সংবর্ধনা করিয়া থাকেন। কেবল শক্তিহীনের দম্ভ, শ্রদ্ধাহীনের ঔদ্ধত্য এবং অরসিকের প্রলাপ তিনি সহিতে পারেন না। জ্ঞান ও অনুভূতির এরূপ সুসঙ্গতি বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে সুলভ নহে, এমন ঐকান্তিক সাহিত্য-প্রীতিও বিরল।

দুই দম্পতি—শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। ডি·এম্ লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক। গ্রাম্য জমিদার হরচন্দ্রের পুত্রকন্যাগণকে লইয়া গল্পটি গড়িয়া উঠিয়াছে। মধ্যম পুত্র ভাইবোনদের ঠকাইয়া বিষয় হাত করিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত পাপের শাস্তি ভোগ করিল। কনিষ্ঠ পুত্র উদার, প্রজাহিতৈষী, বিপদে পড়িয়াও উদ্ধার পাইল। কন্যা প্রণয়ের মোহে পলায়ন করিল, পরে বুঝিল, তাহার প্রণয়ীর নিকট প্রেম অপেক্ষা টাকাই বড়। কয়েকটি মৃত্যুতে নাটকের অবসান। গ্রন্থখানি সম্প্রতি প্রকাশিত হইলেও গ্রন্থকার সেকালের। মনে হয়, তাঁহার এই রচনার উপর গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল'র ছায়া পড়িয়াছে।

অশ্রু ও আকাশ—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। রসচক্র সাহিত্য-সংসদ, কলিকাতা। দাম বারো আনা।

সুন্দর কয়েকটি চতুর্দশপদী কবিতা। রচনা গাঢ়বন্ধ, সংযত, শব্দ-বিন্যাস প্রশংসনীয়।

সীমান্তের চিঠি—শ্রীপ্রজেশকুমার রায়। সুনামগঞ্জ। দাম ছয় আনা।

ইঁহার অপর কবিতার বইয়ের প্রশংসা আমরা ইতিপূর্বে করিয়াছি। এইখানিও প্রশংসনীয়। ভাষায় এবং ছন্দে কাব্যের কমনীয়তা আছে।

আগামী সেদিন নয় দূরে—শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। মূল্য আট আনা।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেষকে উপেক্ষা করিয়া কাব্য রচনা করা আজ কঠিন। আবার এই পরিবেষ এবং তাহার আনুষঙ্গিক সমস্যা-গুলিকে একান্ত করিয়া তোলাও কাব্যের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। সুধীর বাবু বাস্তব জীবনকে ভাবদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাঁহার কাব্য বেসুরা হয় নাই।

ভূয়োদর্শন—'বনফুল'। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ২।০

জীবন-পথে চলিতে চলিতে কত কি দেখি, কত কি ভাবি। কিন্তু অস্ফুট চিন্তাগুলি মনের মধ্যে জাগিতে না জাগিতে মিলাইয়া যায়। যাহা দেখি, তাহার মর্মে প্রবেশের পথ জানি না, মুহূর্তের ভাবনা কুড়াইয়া মালা গাঁথিতে শিখি নাই, ক্ষণিক উদ্ভাসে জীবনের স্বরূপ চিনিতে পারি না। 'ভূয়োদর্শন' পড়িয়া সেই কথাই ভাবিলাম। এমন করিয়া যদি নিত্যপরিচিতকে সত্যের আলোকে দেখিতে ও দেখাইতে পারিতাম! প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা সমস্যা ও চিন্তা একত্র করিয়া কয়েকটি সরস গল্পের আকারে লেখক তাহাদের সাজাইয়াছেন। লেখক সহৃদয়। আমরা তাঁহার উদার হাসিতে যোগ দিই, হাসিতে হাসিতেও ভাবি, আবার জীবনের অপরিহার্য দুঃখ-দ্বন্দ্বের ইঙ্গিতে সে হাসি বেদনা-স্পর্শে কোমল হইয়া আসে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সূত্রধারকুল পরিচয়—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার। পোঃ বাংলা, পাঁচাণী, ময়মনসিংহ।

আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক অমূল্য রত্নের সন্ধান

পাওয়া গিয়াছে সত্য, তথাপি এখনও আমাদের সামাজিক ইতিহাস অনেকাংশে গভীর রহস্যজালে আবৃত। সুখের বিষয়, বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজেদের পূর্বগৌরবের মনোরম চিত্র অঙ্কনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া স্ব স্ব সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত সংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ফলে, এ বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, এগুলির অধিকাংশই ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক কোনও মর্যাদাই লাভ করিতে পারে নাই। কারণ, বিস্ময়কর হইলেও একথা সত্য যে, অতি অল্পসংখ্যক প্রকৃত ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিকই এ কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। এ উপেক্ষার মূলে অবশ্য উপযুক্ত উপকরণের বিরলতা। অসম্পূর্ণ উপকরণেরও যথাসম্ভব সদ্‌ব্যবহার করা যায় না এমন নয়। তবে এ জাতীয় অনেক গ্রন্থের মত আলোচ্য গ্রন্থেও তাহা দেখা যাইতেছে না একথা সত্যের খাতিরে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

খেলা-ধূলা—বিজয়চন্দ্র মজুমদার। প্রবাসী কার্যালয়, ১২০।২ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। ১০৩ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

মনস্বী বিজয়চন্দ্র মজুমদার সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান চর্চ্চার মধ্যেও বাংলার শিশুদের কথা যে ভুলিয়া যান নাই, আলোচ্য পুস্তকখানি তাহারই নিদর্শন। নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয়ের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও কেমন করিয়া তিনি শিশুদের জন্য এই অপূর্ব্ব পুস্তকটি রচনা করিয়াছিলেন, অভিভাবকবৃন্দের মনে তাহা বিস্ময়ের সঞ্চার করিবে। শিশু-সাহিত্যে এমন অনাবিল হাস্যরসপূর্ণ পুস্তক খুব কমই আছে। বহুসংখ্যক রেখাচিত্র বইখানিকে আরও লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছে। উচ্ছ্বসিত হাসির ভিতর দিয়া তিনি শিশুদের বার গণনা, মাসের নাম, কোলজাতি প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয়ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া শিখাইয়া দিয়াছেন। স্বর্গীয় সুকুমার রায় চৌধুরীর পর শিশু-সাহিত্যে এমন বিমল ও পবিত্র হাস্যরসের খোরাক বিরল। বইখানি বাংলার ঘরে ঘরে শুধু শিশুদের নয়, যুবা ও বৃদ্ধদেরও চিত্ত জুড়াইতে সক্ষম হইবে।

ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক: সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ১১১। মূল্য পাঁচ সিকা।

ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের একখানি নির্ভরযোগ্য সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের যে অভাব এত দিন অনুভূত হইয়া আসিতেছিল, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাহা দূর করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। রামমোহন হইতে সুরু করিয়া ভারতসভা পর্য্যন্ত যে-সব রাজনৈতিক ঘটনা ও চিন্তাধারা ভারতবাসীর চিত্ত আলোড়িত করিয়াছে, তাহারই পূর্ণবিকাশ ঘটিয়াছে কংগ্রেসে। বর্ত্তমানে যে গণ-আন্দোলন ও গণ-চেতনা আমরা চক্ষুর উপরে দেখি, তাহারই অঙ্কুর খুঁজিয়া পাই প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে নদীয়ায় ও মালদহে নীলকরের বিরুদ্ধে কৃষাণ আন্দোলনে এবং বিশ্বাস-ভ্রাতৃদ্বয় ও রসিক মণ্ডলের নেতৃত্বে। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেশী যুগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা এবং চিন্তাধারার গতি ও পারম্পর্য্য লেখক নিপুণ ভাবে অল্প কথায় বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বাংলা দেশ এই চিন্তাধারার উৎস হইলেও সকল সময়েই রাজনৈতিক আন্দোলন প্রদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া অখণ্ড ভারতের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের এই দিক্‌টিও লেখক ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বপ্রথম ন্যাশনাল ফণ্ডের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, এণ্ড্রুজ ও মুখার্জ্জির নজীরের উপর নির্ভর করিয়া প্রচলিত এই ভুল ধারণার সংশোধন করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন যে তৎপূর্ব্বে 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' এবং ভারতসভা ন্যাশনাল ফণ্ড প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। "মুদ্রিত হইয়া এই পরিকল্পনা সর্ব্বপ্রথম সাধারণে 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' মারফতেই প্রচারিত হইয়াছিল।" রাজনৈতিক নেতা ও কর্ম্মীবৃন্দ বইখানি হাতের কাছে রাখিলে উপকৃত হইবেন।

প্রতাপাদিত্য চরিত্র—রামরাম বসু। ডক্টর মনোমোহন ঘোষ সম্পাদিত। প্রকাশক: দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ১০৬। মূল্য দেড় টাকা।

রামরাম বসুর রচিত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাংলা গদ্য সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত (১৮০১) মৌলিক গ্রন্থ। আরবী ফারসী শব্দের বাহুল্য এবং যথোপযুক্ত বিরামচিহ্নের অভাবের জন্য বইখানি আজকালকার পাঠকদের নিকট দুর্ব্বোধ্য। বর্ত্তমান সংস্করণে যথোচিত বিরামচিহ্ন, নানা টিপ্পনী ও শব্দার্থ সূচী সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ইহার অর্থবোধ সহজসাধ্য হইয়াছে। ভূমিকাতে ডক্টর ঘোষ গ্রন্থকার এবং গ্রন্থের রচনা-রীতি আদি সম্পর্কে অনেক মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহারা অধিকতর জ্ঞান সঞ্চয় করিতে চান, এই বইখানি তাঁহাদের খুবই কাজে লাগিবে।

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

সোভিয়েট নারী—শ্রীঅনিলকুমার সিংহ। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ৭২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪২, মূল্য আট আনা।

পাঁচ অধ্যায়ে লিখিত এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বর্ত্তমান রাশিয়ার নারী সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হইয়াছে। প্রাক্‌বিপ্লব রাশিয়ার সহিত বর্ত্তমান সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে প্রভেদ সে দেশের বর্ত্তমান নারীর সহিত জার-শাসিত রাশিয়ার নারীর প্রভেদ তদপেক্ষা বেশী ছাড়া কম নহে। সে দেশে নারী আর পুরুষের ভোগের বস্তু, সম্পত্তি, অধীন বা পর-মুখাপেক্ষী ত নহেই বরং রাষ্ট্র ও শ্রেণীহীন সমাজের চোখে সে সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের সমান। জীবনের প্রতি কর্ম্মক্ষেত্র আজ নারীর নিকট উন্মুক্ত। কোথাও হীন বা অক্ষম বলিয়া নারী অবজ্ঞাত নহে। এই অবাধ সুবিধার জন্যই নারী সেখানে জীবনের প্রতি কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জ্জন করিয়া জাতীয় উন্নতির সহায়ক হইয়াছে। নারী আজ গৃহে, কারখানায়, নৌবিভাগে, বিমান-পরিচালনায় পুরুষের অত্যাজ্য সহকর্ম্মী। আজ সোভিয়েটের জীবন-মরণ সংগ্রামে নারী পরম সহায়করূপে কার্য্য করিতেছে। সত্যই সোভিয়েট এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিতেছে যাহার ভবিষ্যৎ এখনও আমাদিগকে কল্পনার চোখে দেখিতে হয়।

এই মহা বিপ্লবী সভ্যতার জন্ম মাত্র পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে। মানব সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে এত অল্প সময়ে এত বড় পরিবর্ত্তন আর কখনও হইয়াছে বলিয়া কেহ জানে না। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে এই বিপ্লবী সভ্যতা কি সত্যসত্যই বর্ত্তমানের পুঁজীবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, গৃহ-সর্ব্বস্ব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক সভ্যতাকে পূর্ণভাবে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, না ক্রমবিকাশের পথে সোভিয়েট সভ্যতার এই নবস্ফুরণ আবার কোন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিবে? ভবিষ্যৎই এই প্রশ্নের সমাধান করিবে। বর্ত্তমান সময়ের সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজীবাদীর মিলিত শক্তির সহিত ফ্যাসী দানবশক্তিসমূহের জীবন-মরণ সংগ্রামও এক অভাবনীয় ঘটনা সন্দেহ নাই এবং এই যুদ্ধের ফলাফলও মানব-সভ্যতার ভবিষ্যতের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবে তাহাও নিশ্চিত। যুদ্ধোত্তর জগতের পুনর্গঠনে সোভিয়েট নারী তাহার নবলব্ধ শক্তি দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারী অপেক্ষা অধিকতর সাহায্য করিবে ইহা বলা যাইতে পারে।

লেখক নারীগণের উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকা প্রণয়ন করিলেও পুরুষেরাও ইহা হইতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। সোভিয়েটের নারী-প্রগতির পর্ব্বগুলি এদেশের নরনারী অনুমোদন করিবেন একথা স্বীকার না করিয়াও বলা চলে যে রাশিয়ার আদর্শকে সম্পূর্ণ না মানিয়াও উহার নিকট হইতে এরূপ অনেক কিছু গ্রহণ করা চলে যাহাতে ভারতীয় নারী-সমাজের, তথা ভারতীয় সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইবে। সমাজ-হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার মত অনেক মনের খোরাক পাইবেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

কালো হাওয়া—বুদ্ধদেব বসু। ডি, এম লাইব্রেরী। মূল্য তিন টাকা।

ঝরঝরে বাংলায় লেখা, চিত্রমণ্ডিত, চরিত্রসংঘাতের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বে

বর্ণাঢ্য এই উপন্যাস। বুদ্ধদেববাবু চমৎকার গল্প জমিয়ে তুলেছেন এবং বাঙালী জীবনের বহু প্রসঙ্গকে উজ্জ্বল ক'রে ধরেছেন কালের আবহাওয়ায়। কালো হাওয়া সংসারে বহে যায়; হয়ত এখন সমাজে তারই প্রকোপ বেশি; কিন্তু বুলির জীবনে তার জীর্ণতা ছোঁয় নি; নিরঞ্জনেরও না। অরিন্দমের জীবন ভাঙল ঝোড়ো হাওয়াটার অপঘাতে, ঝড়ের প্রধান কেন্দ্র তার নিজের বিলাসী চরিত্রে নয়, তারও বাহিরে—বলা যেতে পারে তার স্ত্রী মন্তী-র অস্থির মানসও ঘূর্ণিবাত্যার নিমিত্তকারণ। আসল কারণ তাদের দাম্পত্যজীবনের অন্তর্নিহিত স্বভাববিরোধিতা। অনেকের ঘরে এ রকম বহু বৈষম্য চাপাই থেকে যায়, জাগ্রত স্তরে পৌঁছয় না—কিন্তু মহামায়ার টানে পড়ে এদের আভ্যাসিক অসাম্যতা টিঁকল না। মহামায়াকে মধ্যে রেখে ঝড় বইল, অথচ তিনি নিজে সহজ তপস্বিনী, নিষ্কলুষ—এক জায়গায় কেন মিথ্যাভাষণে প্রবৃত্ত হলেন বুঝলাম না—এবং তাঁর আশ্রমে শক্তি ফলাবার নেশায় হ্লাদিনীবৃত্তির চর্চ্চা করেন নি। কেন তাঁরই চতুর্দ্দিকে দুর্ব্বল চিত্তের অহঙ্কার ঐকান্তিক বিহ্বল হয়ে উঠল বোঝা শক্ত নয়; মহামায়ার সহজাত একটি সম্মোহন আছে, কিন্তু প্রেরণা দেবার বড় সৃষ্টিশক্তি নেই। ভাঙা নোঙরহীন চরিত্র তাঁর ঘাটে ভিড় ক'রে আসে—তার মধ্যে সব জন্মের দলও ছোট নয়—তাদের আপন জীবনে তারা আশ্রয় বানাতে জানে না, কর্ম্মক্ষেত্র থেকে পালিয়ে নারী-নাৎসীয় শাসনে ধরা দেয়। মন্তী-র সাংঘাতিক বিক্ষুব্ধ জীবনে দৃঢ়তা যত এল, স্বার্থান্ধতার বহ্নিস্ফুলিঙ্গ তার চেয়ে বেশি। মহামায়ার দায়িত্ব এ জন্যে কম নয়; কেননা তিনি বুঝতে পেরেও প্রতিকারের চেষ্টা করেন নি। মন্তী-র স্বামী অরিন্দম সব মিলিয়ে লোকটি চলনসই কিন্তু স্ত্রীর স্বাধীন সত্তাকে না-বোঝার পক্ষে তার প্রচণ্ড স্বামিত্ববোধটাই যথেষ্ট। সুতরাং পঙ্কমাঝে যা নিতান্ত হবার তা উৎকট ভাবে হ'ল—একেই বলে গ্রীক-ট্রাজেডীয় অনিবার্য্যতা। অরিন্দমের চরিত্রটা খুব স্পষ্ট আঁকা হয়েছে, বেশি স্পষ্টতার ভাষাও চোখে পড়ল। কালো হাওয়ার উগ্রতম প্রতীক কিন্তু ওদের পুত্র অরুণ; নামটায় ঘোর প্রতিবাদ আছে। অসহায় উজ্জ্বলার প্রতি তার ব্যবহারে ঘৃণ্যগ্রহণের রুক্ষতা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না. তাদের শিশু ত তারই পাপের বিষে মরল। অরিন্দমের সংসারে যথার্থ বাঁচল কেবল বুলি, তাও বর্ম্মায় পালিয়ে—একে পালানো বলা চলে না। তার বড় বোন মিনির ত আগাগোড়াই ব্যর্থতা; বঙ্গীয় নারীমেধযজ্ঞের ভাল উদাহরণ মিনি, আর তার বৌদি উজ্জ্বলার জীবন।

বুদ্ধদেববাবু গল্পের ভিতর দিয়ে, কখনো কথাচ্ছলে, মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সুন্দর দৃষ্টিতে যে-মনুষ্যত্ব প্রকাশ করেছেন তাতে তাঁর শিল্প মহিমান্বিত হয়েছে। অথচ যথার্থ পুরুষের দিকটা ক্ষুণ্ণ করা হয় নি। করবেনই বা কেন।

চলাফেরা চলন্তি-দৃশ্যের বর্ণনায় নিবিড়, মনোময় কবির পরিচয় পেয়েছি। দু-চার জায়গায়, যেমন ঘুমের মগ্ন চলন্ত ভাবের চিত্রণে (৩৩৯ পৃষ্ঠা) বুদ্ধদেববাবু অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। বাংলা গদ্যের প্রশস্ত সাবলীল বৈচিত্র্য এই বইয়ে প্রবাহিত। ক্বচিৎ একটি বাক্য কানে ঠেকেছে; চোখে ঠেকেছে ছাপার, বানানের ভুল। কিন্তু কানে ঝঙ্কৃত হয়েছে প্রসাদগুণান্বিত সমস্ত গল্পটির আশ্চর্য সহজ প্রকাশভঙ্গী, এবং মনশ্চক্ষে এখনো দেখছি কালো ঝড়ে দোলা-খাওয়া একটি বাঙালী সংসারকে। পড়ে দেখুন।

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী

প্রাচীন চীন ও নবীন জাপান—শ্রীগিরিজাচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শান্তি লাইব্রেরী, ঢাকুরিয়া, চব্বিশ পরগণা। পৃ. ১০৮। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

•

চীন ও জাপানের ইতিহাস সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। লেখক যথাক্রমে আদি যুগ, মধ্য যুগ ও বর্ত্তমান যুগ এই তিনটি অধ্যায়ে এ দুইটি দেশের কথা বলিয়াছেন। চীন-জাপান যুদ্ধ আজ ছয় বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে চীন মিত্রশক্তি ও জাপান অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত। এ সময় উভয় দেশের পুরাবৃত্ত জানিবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। এই পুস্তক পাঠে সেই আগ্রহ কথঞ্চিৎ মিটিবার সম্ভাবনা। পুস্তকখানি বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে লিখিত। তথাপি ইহাতে এমন অনেক বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যাহাতে বর্ত্তমানের উপর খানিকটা আলোকপাত করে।

আফগানিস্থান—শ্রীরামনাথ বিশ্বাস। পর্য্যটক প্রকাশনা ভবন, ১৫৬, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। পৃ. ১৬৮। মূল্য দুই টাকা।

ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাস মহাশয় আফগানিস্থানের বিভিন্ন অঞ্চল পর্য্যটন করিয়া যে-সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার লেখায় পাণ্ডিত্যের বালাই নাই। অপ্রত্যক্ষ বিষয় সম্বন্ধে তিনি কল্পনার আশ্রয় করিয়া কিছু লেখেন না। তাঁহার লেখা যে সাধারণের নিকট এত সহজ ও চিত্তাকর্ষক হয় তাহার কারণ উহাই। ইহা বহুজন সমাদৃত হইবে নিশ্চয়।

•

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

রত্ননেশা—শ্রীননীগোপাল মজুমদার। এম. সি সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

ছেলেদের উপন্যাস। •সচিত্র। ত্রিবর্ণ প্রচ্ছদপট এবং একখানি দ্বিবর্ণ চিত্র ছাড়াও অনেকগুলি ছবি আছে। ছবিগুলি শ্রীঅনন্ত ভট্টাচার্য্য অঙ্কিত। "রত্ননেশা" এডভেঞ্চারের কাহিনী। কোম্পানীর আমলের কথা। আধো-আলো আধো-ছায়ার কালে সংস্থাপিত করিলে এরূপ গল্প জমে ভাল বলিয়া লেখক যুগসন্ধিক্ষণকেই বাছিয়া লইয়াছেন। স্থান—সুন্দরবন এবং বাংলার অন্যান্য অঞ্চল। বাঙালীর সাহস এবং বাংলার গৌরব বর্ণনায় লেখক ননীগোপাল মজুমদারের লেখনী সহজেই উল্লসিত হইয়া উঠে। গুপ্তধনের সন্ধানে দুঃসাহসিকেরা ঘুরিয়া মরিতেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা এবং বালক নাতি ও তাহার বন্ধু বহু বিপদের সম্মুখীন হইয়া দস্যুদলের চক্রান্ত ব্যর্থ করিতেছে। দুর্গম স্থানে পথ হারাইয়া পথ খুঁজিয়া বাহির করার পদ্ধতি ও পরিকল্পনা স্কাউট-বালকদের কাজে লাগিতে পারে। অদ্ভুতের সমাবেশ একটু বেশী হইলেও রোমাঞ্চকরঘটনাসন্ধানী বালকের কৌতূহলী মন কাহিনীর বৈচিত্র্য উপভোগ করিবে। গল্প প্রবহমান, ঘটনাগুলি ঘোরালো এবং লিখিবার ভঙ্গীটি ভাল।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ— শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃ. ১২৪, মূল্য এক টাকা।

রবীন্দ্রনাথ সহস্রচিত্ত পুরুষ। তাঁহার হৃদয়-বীণাযন্ত্র ছিল বহু তার-বিশিষ্ট। তাহাতে 'বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী' যেমন বাদিত হইত তেমনি আবার বাংলার পল্লী-প্রান্তের সহজ গ্রাম্য সুরেরও অভাব ছিল না। 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ'-এ

রবীন্দ্র-হৃদয়ের শেষোক্ত দিকেরই পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইহাতে জমিদার রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ-জীবনের তেরোটি কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দরিদ্র পল্লীবাসীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম সহানুভূতি, তাঁহার প্রজাবাৎসল্য ও কৌতুকপ্রিয়তার কথায় গল্পগুলি বিশেষ উপাদেয়। অধিকারী মহাশয় সত্য কাহিনীকে গল্পরসে সিক্ত করিয়া পাঠকসমাজের নিকট পরিবেশন করিয়াছেন। পরিবেশন উৎকৃষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই দিককার স্বল্পজ্ঞাত জীবনের যে কয়েকটিমাত্র কাহিনী তিনি বলিয়াছেন তাহাতেই পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ হইবে না। তাহারা অধিকারী মহাশয়ের নিকট রবীন্দ্রনাথের আরও গল্প শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিবে।

বিংশ শতাব্দী—শিশির সেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৫৬ পৃষ্ঠা। মূল্য দেড় টাকা।

বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি শিক্ষিত তরুণ-তরুণীকে লইয়া এই উপন্যাস। কাজেই "বড় বড় গালভরা কথা, ক্লাসলেস সোসাইটি, কিষাণ মজদুর, ইকনমিক সোশালিজম্‌" প্রভৃতির অভাব নাই। বিংশ শতাব্দীর বিশ্লেষণী মনের সাক্ষাৎ লেখক পাইয়াছেন। গল্প দৃঢ়বদ্ধ না হইলেও মোটের উপর সুলিখিতই হইয়াছে। ভাষা প্রয়োগের শৈথিল্য মাঝে মাঝে মনকে পীড়িত করে। সম্ভবতঃ ইহাই লেখকের প্রথম রচনা, সেই হিসাবে প্রশংসনীয়।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

দেশ-বিদেশের কথা

বাংলা

পণ্ডিত লালামাহন বিদ্যানিধি জন্ম-শতবার্ষিকী

পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব সম্প্রতি শান্তিপুরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে তাঁহার দান অসামান্য। তাঁহার গবেষণামূলক পুস্তকাবলীর মধ্যে 'কাব্য নির্ণয়'



লালমোহন বিদ্যানিধি

এবং 'সম্বন্ধ নির্ণয়' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষার একটি নিজস্ব রীতি আছে, এবং ইহা সব স্থলে সংস্কৃতের :উপর নির্ভরশীল নহে। বিদ্যানিধি মহাশয় 'কাব্য নির্ণয়' পুস্তকে বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জয়দেব, মধুসূদন এবং অন্যান্য বিখ্যাত কবিদের রচনা হইতে বাংলা ছন্দ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় এ ধরণের পুস্তক সম্ভবতঃ এই প্রথম। লালমোহনের 'সম্বন্ধ নির্ণয়' পুস্তকখানি বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি গবেষণামূলক প্রামাণিক গ্রন্থ। তিনি ১৯১৩, ২৮শে সেপ্টেম্বর ইহধাম ত্যাগ করেন।

পরলোকে ডাক্তার বরদাকান্ত রায়

বরিশাল নরোত্তমপুর-নিবাসী ডাক্তার বরদাকান্ত রায় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহুকাল বিহার-উড়িষ্যায় সম্মানের সহিত সিভিল সার্জনের পদে কার্য্য করিয়া কলিকাতায় অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন। যত দিন তিনি সক্ষম ছিলেন, তত দিন প্রতি বৎসর বরিশাল জেলায় গিয়া পূজার ছুটির সময় শত শত চক্ষু রোগীর বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারাদি চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার সহৃদয় চিকিৎসা-গুণে:বহু শত অর্থসামর্থ্যহীন ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। বিশ্ব-ভারতীর শ্রীনিকেতনে গিয়া তিনি গ্রামবাসীর এইরূপ চিকিৎসা করিয়াছেন। যখন বার্দ্ধক্যবশতঃ অন্য কোথাও যাইতে পারিতেন না তখনও বহু লোক তাঁহার কলিকাতাস্থ বাস-ভবনে গিয়া তাঁহার নিঃস্বার্থ সহায়তায় রোগমুক্ত হইয়াছে।

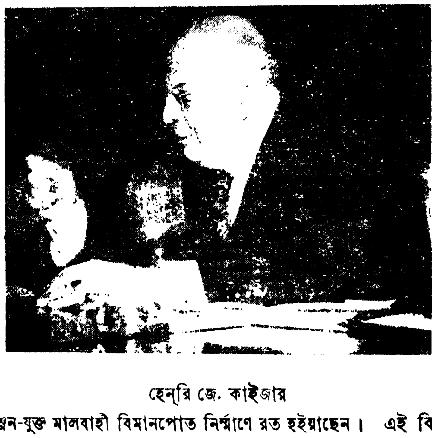


বরদাকান্ত রায়

বিদেশ

বিখ্যাত ব্যোমযান-নির্ম্মাতা হেন্‌রি জে. কাইজার

হেনরি জে, কাইজার বিশালায়তন ব্যোমযান নির্ম্মাণের পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি সাত-



হেন্‌রি জে. কাইজার

এঞ্জিন-যুক্ত মালবাহী বিমানপোত নির্ম্মাণে রত হইয়াছেন। এই বিমান-গুলির টনেজ হইবে আড়াই শত এবং এই ধরণের বিমানবহর আমেরিকায় প্রস্তুত রণসম্ভার দেশান্তরে লইয়া যাইবার উপযোগী হইবে। তাঁহার এইরূপ বিমানের পরিকল্পনা প্রকাশিত হইলে আমেরিকায় ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার উপর আড়াই শত টনেজের তিনখানি বিমান নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করিয়াছেন। কাইজার মহোদয় ইতিপূর্ব্বে অতি দ্রুত রাস্তা, সেতু ও জাহাজ নির্ম্মাণেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বিরাট বোল্ডার বাঁধ, এবং শাষ্টা বাঁধ ও ইহার জন্য কুলী বাঁধ সিমেণ্টের কারখানা নির্ম্মাণ তাঁর অদ্ভুত কীর্ত্তি। নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বেই তিনি এ সব নির্ম্মাণ করাইতে সমর্থ হন। সম্প্রতি পাঁচ দিনের মধ্যে বড় জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াও তিনি সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার মত এত অল্প সময়ে এত বড় জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে আর কেহই সমর্থ হন নাই।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০

২য় সংখ্যা

গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাঁহার অসীম মঙ্গললোক হতে,
　　তোমাদের এই হৃদয় বনচ্ছায়ে
অনন্তেরি পরশ-রসের স্রোতে,
　　দিয়েছে আজ বসন্ত জাগায়ে।
তাই সুধাময় মিলন কুসুমখানি,
　　উঠ্‌ল ফুটে কখন নাহি জানি
এই কুসুমের পূজারী অর্ঘ্যখানি,
　　প্রণাম করল দুই জনে তাঁর পায়ে।

সকল বাধা যাক্ তোমার ঘুচে,
নামুক তাঁহার আশীর্ব্বাদের ধারা,
মলিন ধূলার চিহ্ন সে দিক মুছে,
শান্তি পবন বহুক বন্ধ হারা।
নিত্য নবীন প্রেমের মাধুরীতে,
কল্যাণফল ফলুক দোঁহার চিতে,
সুখ তোমাদের নিত্য রহুক দিতে,
নিখিল জনের আনন্দ বাড়ায়ে।*

৩০শে বৈশাখ ১৩২৯ সন

* শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তীর সৌজন্যে

রবীন্দ্রনাথের পত্র

[বিজয়চন্দ্র মজুমদারকে লিখিত]

শান্তিনিকেতন

ওঁ

প্রীতিনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

আমাদের "শান্তিনিকেতন" নামক ছোট একটি পত্রে "বাংলা কথ্যভাষা" প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বাংলা শব্দ উচ্চারণ লইয়া দুই-একটা কথা বলিয়াছিলাম এবং সেই সঙ্গে ব্যাকরণঘটিত মন্তব্যও কিছু ছিল। আপনি তাহা লইয়া 'প্রবাসী'তে যে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহার প্রতিলিপিখানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। বাংলা ভাষার সোদরা ভাষাগুলির সহিত পরিচয় না থাকাতে এ সকল বিষয়ে অনেক কথাই আন্দাজে বলিয়া থাকি। কিন্তু আন্দাজে বলারও একটা গুণ এই যে তাহাতে আলোচনার ও সংশোধনের অবকাশ দেওয়া হয়। চাণক্যের উপদেশ (যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে) যদি শিরোধার্য্য করিয়া লইতাম তবে তাহা শোভন হইত কিন্তু কল্যাণকর হইত না—আমার তরফে এইমাত্র কৈফিয়ৎ। দুই অক্ষরের বিশেষণ বাংলা ভাষার স্বরান্ত হইয়া থাকে এই নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের কোনো পাঠকের নিকট হইতে প্রতিবাদ পাইয়াছি এবং এবারকার 'শান্তিনিকেতন' পত্রে এই নিয়মের কৃচিৎ অন্যথা সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। এই সম্ভাবনা আমার পূর্ব্বেও জানা ছিল কিন্তু উক্ত নিয়মের উল্লেখ নিতান্ত প্রসঙ্গক্রমে ঘটাতে ভাষা-প্রয়োগে সতর্ক হইতে ভুলিয়াছিলাম। যাহা হউক আপনার মন্তব্য সম্বন্ধে আমার যাহা প্রশ্ন আছে তাহা পৌষের শান্তিনিকেতনে প্রকাশ করিব এবং আপনাকে পাঠাইয়া দিব। বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয়—কারণ ইহাতে আমার বিশেষ ঔৎসুক্য আছে কিন্তু আমার সম্বল বেশি নাই, তাই আন্দাজ লইয়া আমার কারবার। আমার মত ইস্কুলপলাতক ছেলের এই দুর্গতি।

অনেক দিন আপনাকে দেখি নাই। এক বার শান্তিনিকেতন আশ্রমে আসিয়া দুই-চার দিন কাটাইয়া যাইতে পারেন কি? তাহা হইলে আপনার সঙ্গে নানা কথা আলোচনার অবকাশ পাওয়া যায়। কলিকাতায় ভিড় এত বেশি যে, মন খুলিয়া কথা কহিবার ফাঁক পাওয়া যায় না। ইতি ৭ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চৈতালী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ফাল্গুন গিয়া চৈত্র পড়িয়াছে। কয়েক দিন মাত্র হইয়াছে কিন্তু তবুও রোদের দিকে যাওয়া যায় না। অদূরে জুট মিলটার গায়ে রোদ যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে; কলের ক্লান্ত নিঃশ্বাসের মত অভ্র-রং লাগান চিমনিটা দিয়া একটা তাম্রাভ ধুঁয়ার অস্পষ্ট রেখা মন্থর গতিতে কুণ্ডলি পাকাইতে পাকাইতে আকাশে মিশাইয়া যাইতেছে। প্রশস্ত মাঠটার সবুজ রঙে একটা অস্বস্তিকর চিকচিকে শ্বেতাভা—মনে হয় তৃষ্ণার্ত কি-একটা এই কাঁচা হরিৎ তাহার লালাক্ত জিব দিয়া যেন চাটিয়া বেড়াইতেছে। দূরে গঙ্গার দিকেও চাওয়া যায় না—রুক্ষ আকাশের নীচে জলের রেখাটা দুলিতেছে যেন একখানি কম্পমান মরীচিকা।

মাঠের ও-প্রান্তে একটা পত্রহীন পলাশ গাছের মাথায় এক থোকা টকটকে ফুল এখনও কি করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া আছে। বেশ একটা প্রীতির ভাব জাগায় না, মনে হয়—দগ্ধাবশিষ্টের শেষ অগ্নিরেখা।

অশ্বিনী বলিল, "এবার চৈত্রের রূপ দেখছ? বৈশাখ যে তা হ'লে কি বেশে আসবেন বলতে পারি না।"

তারাপদ বলিল, "জানলাটা বরং বন্ধ ক'রে দিই, সত্যি চোখে বড় লাগছে আলোটা। সমস্ত বছরটাই প্রায় শুকো গেল, হবেই ত এ রকম।"

উঠিতেই শৈলেন বলিল, "থাক না, তোমরা না হয় এ দিকে মুখ ক'রে ঘুরে ব'স!"

তারাপদ, অশ্বিনী, অক্ষয় তিন জনেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া একটু হাসিল।

তারাপদ বসিতে বসিতে বলিল, "তোমাদের অন্ত পেলাম না শৈলেন, বর্ষা সরস, তাতে রস পাও বুঝি; কিন্তু এই জ্বলন্ত আকাশ আর ধরিত্রী,—চাইলে চোখ ঠিকরে পড়ে, এতে তোমরা কি রসের, কি কবিত্বের যে সন্ধান পাও মাথায় ঢোকে না। নাঃ, তোমাদের নিয়ে যে কি মুশকিলেই···"

শৈলেন স্থিরদৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল, মুখটা একটু ফিরাইয়া লইয়া একটু হাসিল। সত্যই একটু আবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। তারাপদর পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়াই বলিল, "মুশকিল বরং তোমাদের নিয়েই—প্রত্যেকটি ব্যাপার তোমরা মানুষ বা জীবজন্তুর সুখ-সুবিধের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করবে। জল হয় নি—অর্থাৎ তোমাদের ধান-মুগ-মুসুরির অসুবিধে হয়েছে, কি তোমাদের গরু-ঘোড়ার একটু ঘাসের অভাব হয়েছে, ব্যস্ তোমরা চোখে অন্ধকার দেখছ বলে পৃথিবীর সব সৌন্দর্য-লোপ পেলে! ধর, যদি একটা বৃহত্তর প্রয়োজনে বা কোন এক বিরাটতর সত্তার—পুরুষেরই বল—অদ্ভুত সৌন্দর্য-লিপ্সা মেটাবার জন্যেই এই রুক্ষতার সৃষ্টি হয়ে থাকে ত তাঁর সেই বিরাট্ আনন্দের সঙ্গেই আমাদের মনের সুর বাঁধবার চেষ্টা করাটাই কি বেশি?···"

এমন সময় অক্ষয় হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া জানালার বাহিরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ দেখ, উস!···"

সকলে নির্দিষ্ট পথে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিশ্চল হইয়া গেল। একটা মুষলাকৃতি বিরাট্ দেহ তাণ্ডবের মত্ত আনন্দে জ্বলন্ত মাঠের উত্তর হইতে দক্ষিণে চক্রগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার ধূলিপাটল অঙ্গ হইতে জীর্ণপত্রের ছিন্ন বসন ক্রমাগত পড়িতেছে খসিয়া, আর ক্রমাগতই সে শিকড়ের মত শীর্ণ, বক্র অঙ্গুলি দিয়া সেটাকে জড়াইয়া লইতেছে। পাতায় পাতায় সংঘাতের ফলে যে একটা উগ্র মর্মর উঠিতেছে সেটা এত দূর থেকেও স্পষ্ট শোনা যায়।

তারাপদ বলিল, "এ রকম ঘূর্ণি অনেক দিন দেখি নি,—কখনও দেখেছি কি না মনে পড়ে না।"

অক্ষয়ের একটু যেন ঘোর লাগিয়াছিল, বলিল, "ঘূর্ণিই ত?···দেখ দেখ, কপালে আগুন জ্বলছে!"

একটানা নয়, তবে একটু থাকিয়া থাকিয়া সত্যই রুদ্রের তৃতীয় নয়নের মত ঘূর্ণিটার ললাটে একটা অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিতেছে। যত আবর্জনা দেহ-লগ্ন করিতে করিতে গতিটা হইয়া উঠিতেছে আরও প্রমত্ত।

তারাপদও একটু কি রকম হইয়া গিয়াছিল, কতকটা যেন নিজের মনেই বলিল, "শুনেছি সব ঘূর্ণিই—ঘূর্ণি মাত্র নয়।"

আবার নিজেই সেটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, "অবশ্য মেয়েলী কথা।"

অক্ষয়ের ঘোরটা তখনও কাটে নাই, একটু বিরক্তির কণ্ঠেই বলিল—"মেয়েলী!" ঐ আলোটা তাহ'লে কি? ঐ দেখ, আবার···ঐ···ঐ···"

শৈলেন বলিল, "আগুনই। কোন্ উনুনের তাও সন্ধান পেয়েছি আমি।"

সকলে তাহার মুখের দিকে চাহিল। শৈলেন পলাশ গাছটার পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল, "ফুলের সেই গোছাটা কোথায়?"

সকলেই দেখিল ডালের বেশ খানিকটা পর্যন্ত লইয়া ফুলের সমস্ত স্তবকটা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! অক্ষয় প্রশ্ন করিল, "বলতে চাও, ঘূর্ণিতে ডালশুদ্ধ মুচড়ে নিয়ে চলে গেছে?"

শৈল মাথা দোলাইল বলিল, "বাংলার ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ঘূর্ণি এর বেশি বোধ হয় পারে না, তবে অন্যত্র সে গাছকে-গাছ উপড়ে নিয়ে নাচের সহচর করেছে এ আমার নিজের চক্ষে দেখা।"

সকলে ধরিয়া বসিল—গল্পটা তাহা হইলে বলিতে হইবে, চৈতালী গল্পই চলুক আজ।

শৈলেন মাথার তলায় মোটা তাকিয়াটা ভাল করিয়া বসাইয়া লইল, যাহাতে দৃষ্টিটা বেশ সোজাসুজি জানালার বাহিরে গিয়া পড়িতে পারে। বলিল—"সে গল্পটা বলতে গেলে আমাকে আগে অক্ষয়ের ক্ষমা ভিক্ষে ক'রে নিতে হয়। তার মানে, যদিও ঘূর্ণিটা বোধ হয় একটা আটপৌরে চৈতালী ঘূর্ণি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তবু সমস্ত ব্যাপারটার যোগাযোগের মধ্যে এমন কতকগুলো কাণ্ড হয়েছিল যার টীকা আমি এখনও সম্পূর্ণ ভাষ্য ক'রে উঠতে পারি নি।"

শৈলেন রহস্যের স্মৃতিতেই যেন একটু থামিয়া গেল, তাহার পর আবার আরম্ভ করিল—"সেবার হঠাৎ নেপালে পশুপতিনাথ দর্শনের খেয়াল চাপল। চমকো না, ভক্তির টান নয়। শিব উদাসীন, কিন্তু আমি ওঁর বা ওঁদের সম্বন্ধে তার চেয়ে লাখোগুণ উদাসীন এ কথা জানই। ঝোঁক চাপল দলে প'ড়ে। মেয়ে-পুরুষে বেশ একটি বড় দল হ'ল আমাদের। ওদের অবশ্য লোভ সাক্ষাৎ শিবকে দেখবে, আমার সখ দেখব হিমালয়। অন্তত এই উদ্দেশ্য নিয়ে ত বেরুলাম।

কিন্তু জান, ধর্ম জিনিসটা বড় সংক্রামক। চার দিন লাগল আমাদের হিমালয়ের গোড়ায় পৌঁছতে। এই চার দিনেই দলের সবার মুখে ক্রমাগত শিবের কীর্তিকাহিনী শুনতে শুনতে আমার মনে অল্প অল্প ক'রে রং ধরতে লাগল। তার পর দল ক্রমেই বাড়তে লাগল আর আলোচনাও ঘোরাল হয়ে উঠতে লাগল, শেষে এমন হ'ল যে যখন হিমালয়ের গোড়ায় পৌঁছলাম তখন হঠাৎ দেখি, আর সবার মতনই আমিও এক রীতিমত শৈব হয়ে পড়েছি! আমার মানসিক পরিবর্তন আর সেই সঙ্গে নিষ্ঠা দেখে সবাই সাব্যস্ত করলে—বাবাই আমায় ঘরছাড়া ক'রে টেনে নিয়ে এসেছেন।

কথাটা আমিও বেশ জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করলাম এবং বোধ হয় দেবতার এই বিশেষ অনুগ্রহের বিশ্বাসেই আমার আকাঙ্ক্ষাটা সব সীমানা ছাড়িয়ে একেবারে অসম্ভাব্যের কোটায় গিয়ে উঠল। আকাঙ্ক্ষা না ব'লে যদি আবদার বলি ত বোধ হয় আরও ঠিক হয়। হিমালয়ের নীচেকার গোটাকতক পাহাড় অতিক্রম করতে করতেই তার বিরাটত্বায় আমি যেন অভিভূত হয়ে পড়তে লাগলাম। কতকটা যেন একটা নেশার ভাব আমার মাথায় ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল,—খুব বড় একটা কিছুর নেশা। মনে হয় এই ত আমি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে যা বিরাট, সব চেয়ে যা রহস্যময়—দেবতাদের লীলাভূমি, শঙ্কর-উমার তপঃপ্রাঙ্গণ যে হিমালয় তার গহ্বরে বিচরণ করছি; এখানে এসেও কি আমায় ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ একটা মন্দিরের মধ্যে স্বল্পায়তন একটি শিলা বিগ্রহকে দেখেই দেবদর্শনের সাধ মিটিয়ে যেতে হবে? আমার প্রতি যদি দেবতার এতই করুণা যে আমার কঠিন ঔদাসীন্যের মধ্যেও তাঁর আকর্ষণকে এমন প্রবল আর অমোঘ ক'রে তুলেছেন তো তিনি আমার কাছে নিজের স্বরূপে প্রকট হ'ন। কালের অপ্রমেয় অতীতে এই দেবভূমির উপর লোকাতীত যে সমস্ত লীলা সংঘটিত হয়েছিল তার অল্প একটুও আবর্তিত ক'রে আমার নয়নের সামনে ধরুন। আমি চরিতার্থ হব। তপঃক্ষীণা ধ্যানরতা উমার প্রশান্ত জ্যোতির্ময়ী মূর্তিই হোক, ভিক্ষার্থী শঙ্করের সামনে শিবানীর অন্নপূর্ণামূর্তিই হোক বা মদন-ভস্মের সময় যোগীবরের প্রলয়মূর্তিই হোক,—কালের যবনিকা তুলে আমায় দেখান একবার। তার জন্যে যা তপস্যা তা আমি করব। আমার জাগ্রত চেতনায় যদি সম্ভব না হয় ত স্বপ্নেই হোক বা আমার চেতনাকে সম্মোহিত করেই হোক, আমায় দেখান। আমি সেটাকেও সত্যরূপেই গ্রহণ ক'রে আমার তীর্থ-অভিযানের সঞ্চয় ক'রে রাখব। তাঁর লীলা-ক্ষেত্রে এসেও যদি আমায় মাত্র স্থাবর শিলামূর্তি দেখেই ফিরতে হয় ত ভাবব আমি বঞ্চিত হলাম।

যতই এগুতে লাগলাম, হিমালয়ের বিস্ময় যতই আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল, আমার মনটা ততই যেন অপ্রসন্ন হয়ে উঠতে লাগল।...এই ত এসে পড়লাম ব'লে,—ভিড়ের পেছনে শিলামূর্তিকেও ভালভাবে না পেয়ে, আর শিলামূর্তির পেছনে দেবতাকেও হারিয়ে দু-দিন পরে ফিরে যাব। শূন্যহাতেই যাব ফিরে। এই জন্যেই কি সুদূর বাংলা ছেড়ে এত আশা এত উদ্যম নিয়ে আসা? যে-দেবতার প্রসাদ লাভ করেছি ব'লে সবাই বলছে, এক এক সময় যে-দেবতাকে অন্তরতম অন্তরে পাই বলেও যেন অনুভব করি, তাঁর কি ক'রে পূজো করবো, যদি এই দারুণ নিরাশা মনকে তিক্ত ক'রে রাখে? বরকে অভিশাপে পরিণত করবার জন্যেই কি তিনি আমায় এখানে নিয়ে এলেন?...আমার খাওয়া কমে এল, পথ অতিক্রম করার উৎসাহ কমে এল, দলের পক্ষে আমি যেন একটা বোঝা, এবং সমস্যা হয়ে উঠতে লাগলাম; যে-দল বিশেষ ক'রে আমার ওপরই একটা অলৌকিক শক্তির আকর্ষণ ধ্রুব বলে মেনে নিয়েছিল।

এরই মধ্যে কিন্তু আমার মনে এক এক সময় আবার হঠাৎ কোথা থেকে একটা জোয়ার ঠেলে উঠত; একটা প্রবলতর বিশ্বাসের জোয়ার। সমস্ত মনটা লোকোত্তর কিছু একটা দেখতে পাবে বলে যেন উদগ্র হয়ে উঠত, মনে হ'ত এই এক্ষুনি দেখতে পাবে,—সে এক অদ্ভুত ধরণের অনুভূতি যাতে না দেখতে পাওয়াটাই আশ্চর্য মনে হ'ত।...এই যে প্রত্যক্ষ সমস্ত ঘটনা—এই রুক্ষ ইন্দ্রিয়াধীন হিমাচল, এই দলের পর দল আমাদের যাত্রীদের অভিযান, তাদের প্রতি দিনের চলার ইতিহাস, চটিতে এসে নিতান্ত পার্থিব ব্যাপারগুলার অনুষ্ঠান—এই সবগুলোকেই কেমন যেন অলীক আর অদ্ভুত ব'লে মনে হ'ত। ঠিক যেন এসব

মিলিয়ে আসছে আর সামনেই অন্য এক নাট্যশালার একটা পর্দার দোল অনুভব করা যাচ্ছে। এখুনি পর্দা উঠবে আর আরম্ভ হবে নটরাজের খেলা। বেশ অনুভব করছি, এই যে পেছনের জগৎ আমার, এটা সে-খেলার সামনে প্রেক্ষাগৃহের মতনই আমার চেতনা থেকে বিলীন হয়ে যাবে।

তোমরা বলবে—আশা, নিরাশার সঙ্গে উপবাস আর পথশ্রান্তি মিলে আমার মস্তিষ্ককে বিকৃত ক'রে আনছিল; সম্ভব। এই সময় একটা ব্যাপার হ'ল যার দ্বারা আমি আমার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। তোমাদের বলতে ভুলে গেছি যে মেলা লোককে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে আমাদের যাত্রা করতেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। ফলে, যদি বলা যায় যে সব যাত্রীদলের মধ্যে আমরাই প্রায় শেষ দল ছিলাম ত বিশেষ মিথ্যা বলা হয় না। পৌঁছবার আগের দিন দুপুর বেলায় আমরা যে-চটিতে এসে উঠলাম সেখানে খবর পেলাম যে একটা আকস্মিক প্রবল ঝড় আর বৃষ্টিপাতে সামনের রাস্তায় একটা বড় রকম ধস্ হয়ে রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে। এ রকম জায়গায় একটা আতঙ্কের কথা শুনলে তার সত্য মিথ্যা নির্ধারণ করবার আর সাহস থাকে না মনে। স্থির হ'ল আমরা একটা অন্য পথ দিয়ে ঘুরে যাব, তাতে আমাদের একটা দিন বেশি লাগবে। আমি ছাড়া সবাই বড় নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল।"

তিন জনেই প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "তুমি ছাড়া!"

শৈলেন উত্তর করিল, "হ্যাঁ, আমি ছাড়া বইকি।"

তিন জনেই আবার প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "তার মানে?"

শৈলেন উত্তর করিল, "আমার মনে হ'ল আমার মনের আবেদন যেন যথাস্থানে পৌঁছে গেছে। যদি তখন এও ভেবে থাকি যে পাহাড়ের এই ধস্ কোন এক মহা-শক্তির আবির্ভাবই সূচিত করছে ত কিছু আশ্চর্য হয়ো না। আমার মনটা তীক্ষ্ণ প্রত্যাশায় আরও চঞ্চল হয়ে উঠল। ঐ ধস্—আমাদের যাত্রাপথে যা একটা এত বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল সেটা কার পদচিহ্ন মাত্র? তাকে দেখতেই হবে, তা সে যতই ভৈরব হোক না কেন।

পথ অত্যন্ত খারাপ, ক্রমাগতই যেন মনে হচ্ছে গভীরতর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করছি। যখন পরের চটিতে পৌঁছলাম আমরা তখন দিব্যি অন্ধকার হয়ে এসেছে। আমাদের সঙ্গে মাত্র আর একটি ছোট দল ছিল—যাত্রীরা উত্তর-মাদ্রাজ অঞ্চলের। সবাই তাড়াতাড়ি রাঁধবার-খাবার ব্যবস্থায় লেগে গেল।

অন্ধকারমগ্ন সেই জায়গাটা আর সেই রাত্রিটা আমার মনে একটা এমন ছাপ রেখেছে যা এ-জন্মে মেটবার নয়। চটিটা একটা পাহাড়ের গোড়ায়, তার পেছনের দেয়ালটা পাহাড়েরই একটা অংশ। সেই দেয়ালটা একটু একটু ঢালের ওপর যে কতটুকু পর্যন্ত চলে গেছে কিছুই ঠাহর হয় না। চটির কলরব থেকে একটু আড়ালে এসেই একটা অদ্ভুত থম-থমে ভাব। শব্দের রেশমাত্রও কোথাও কিছু নেই—অবস্থাটাকে যেন শুধু মৌনতা বললেই যথেষ্ট হয় না; মনে হয়—মৌনতাও যেন তার কাছে ঢের মুখর। সেই অন্ধকার, সেই রহস্যময় বন, সেই পাহাড়—যা কোথায় গিয়ে যে ঠেকেছে কেউই জানে না, আর, সমস্তকে আচ্ছন্ন ক'রে সেই অদ্ভুত শুব্ধতা—এই সব কটি একসঙ্গে আমার মনকে ভরাট ক'রে আমায় উল্লাসে, বিস্ময়ে যেন কি এক রকম করে দিলে। মনের ভাবটা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না—কেন-না মানুষ যখন একটা ভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে তখন তার স্মৃতিশক্তিটা হয়ে পড়ে বড় অস্পষ্ট, তবে আবছায়াগোছের একটু মনে আছে যে হঠাৎ যেন একটা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার নেশা আমায় পেয়ে বসল—ঠিক আত্মহত্যা করবার নয়, শুধু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার—এই তরল কষ্টিপাথরের মত অন্ধকারে, চির-অজ্ঞেয় বনাশ্রিত এই পাহাড়ে, এই অপরূপ শুব্ধতায়। বিরাট্ এক অজগর তার অপলক ঘনকৃষ্ণ চক্ষু দিয়ে আমায় সম্মোহিত ক'রে ফেলে তার অন্ধকার জঠরে আকর্ষণ করছে। সব তুচ্ছ ক'রে, সব ভুলে আমি স্থির পদক্ষেপে চলেছি, কেন-না গতির মধ্যে রয়েছে এক অপূর্ব মাদকতা।...আর একটা ঘূর্ণি উঠেছে, দেখ!"

অপেক্ষাকৃত ছোট ঘূর্ণি; মিলাইয়া গেলে, সকলে আবার পূর্ববৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া বসিল। শৈলেন বলিল, "খুব বেশী দূর যাই নি, কেন-না একটু গিয়েই পদে পদে জঙ্গলের ডালপালার বাধা পেয়ে আমার চৈতন্য হয়েছিল—এটা বেশ মনে আছে। ঠিক যেন আমার মনে হ'ল প্রাণপণে কে আমায় সামনে ঠেলে রাখবার চেষ্টা করছে—কার যেন নিঃশব্দ সতর্ক বাণী শুনিতে পাচ্ছি—'এস না, এস না, এ পথ নয়...।' অবশ্য চৈতন্য হবার সঙ্গে সঙ্গে ফেরবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে ত আর সম্ভব নয়— সমস্ত রাত শুধু ঘুরে বেরিয়েছি মাত্র। ভোরেও নয়, সকালেও নয়, যখন চটিতে ফিরলাম তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। সঙ্গীরা—দুই দলেরই সবাই যথাসাধ্য খোঁজাখুঁজি ক'রে দুপুরের অল্প একটু আগে নিরাশ হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। বোধ হয় আরও থেকে যেত কিছুক্ষণ, কিন্তু এই সময় একজন তিব্বতী লামা চটিতে হঠাৎ এসে পড়েন। তিনি

আমার দু-দিন থেকে উপোস যাচ্ছিল,—এক পাতার রস খাওয়া ছাড়া, সেই সমস্ত দিনটাও কিছু খাই নি। শুধু ব'সে ব'সে অপলক নেত্রে দেখে গেছি—জেগে, কি তন্দ্রায়, কি গাঢ় ঘুমের স্বপ্নে, কি মনের আরও গভীরতম কোন অজ্ঞাত চেতনার স্তরে, কিছুই বলতে পারব না। শুধু দেখলাম দিন আর একটু অগ্রসর হ'তে নটরাজের নাট্যশালার আর একটা পট উঠল। সেই বসন্ত—যার কাছাকাছিও কিছু একটা কেউ পৃথিবীতে কখনও দেখে নি, সেটা রূপে, শব্দে, গন্ধে আরও যেন শতগুণ মদির হয়ে উঠল। ক্রমে নেশার মত একটা অনুভূতি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অবশ ক'রে ফেলতে লাগল—মনে হ'তে লাগল এই বসন্তই সত্য আর সব কিছু মিথ্যা—মনের শত নিষ্ঠা দিয়ে জীবনে যা-কিছু অর্জন করেছি সবই যেন অক্লেশে ফাগুনের এই জলন্ত শিখায় আহুতি দেওয়া যায়। সব সাধনার সব তপস্যার—সেই যেন চরম সার্থকতা। চিন্তার মধ্যেই আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। পূবের পাহাড়ের সোনা-রূপার ওপর দিয়ে সূর্যের যে কিরণ এসে পড়ছিল সেই গুলোই বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হওয়ার জন্যেই হোক বা আমার দৃষ্টিবিভ্রম হোক, অথবা দুটোর মিলিত পরিণতিই হোক, এক সময় মনে হ'ল ঊর্ধ্ব কোথা থেকে আলোর পথ বেয়ে কারা সব নেমে এসে সেই তপস্যা-বেদীর চারি দিকটা ফেললে ঘিরে, আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হ'ল তাদের বিলাসোচ্ছল নৃত্য। যা ছিল পাখীদের কাকলি মাত্র, সুরে সুরে ঘনীভূত হ'য়ে তারই একটা অংশ যেন এক অপার্থিব সংগীতে রূপান্তরিত হয়ে উঠল। সব চেয়ে আশ্চর্য এই যে, আয়োজনের এই পূর্ণতার মধ্যেও কোথায় একটা কি অভাবের সুর ঘনিয়ে উঠতে লাগল,—একটা অব্যক্ত যাতনা-চাপা হাহাকার। বহুক্ষণ ধরে চলল, আমারও মাথার মধ্যে একটা ঘূর্ণি জেগে উঠছে। দিন বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে, আলো উজ্জ্বলতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রঙের রাশি হয়ে উঠছে আরও তীক্ষ্ণ,—যেন তরাইয়ের শেষ পুষ্প-কলিটি পর্যন্ত কিসের তাড়ায় তাড়াতাড়ি ফুটে উঠছে, সংগীত হয়ে উঠছে আরও উচ্ছল, হাওয়া মদিরতায় আরও বিহ্বল,—বেশ বুঝা যাচ্ছে সব পূজাই একটা ক্লাইম্যাক্সের দিকে মত্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে,—লয় ক্রমশই দ্রুত করতে করতে সংগীত যেমন শেষতম সমের পানে ছুটে চলে।

তার পর, দুপুরের একটু পরেই হঠাৎ যোগীর ধ্যানভঙ্গ হ'ল। সব গেল বদলে, বাতাসের গতিটা পর্যন্ত। এতক্ষণ ছিল দক্ষিণপ্রবাহী, হঠাৎ মূর্তির পেছন থেকে গিরিসঙ্কট বেয়ে আগুনের হলকার মত একটা বায়ুস্রোত ঢুকে পড়ল। একটা বিকট ঝম্-ঝম্-ঝম্ শব্দ, তার পরেই সেকেণ্ড কয়েকের জন্যে সমস্ত তরাইটা স্তব্ধ হয়ে গেল, সব যেন একটা উৎকট ভয়ে আঁৎকে উঠেছে। এর পরেই যা আরম্ভ হ'ল তাকে মদনভস্মের পুনরভিনয় ভিন্ন আর কিছুই বলা চলে না। প্রথমেই সেই মূর্তিটা মাথার জটা ফুলিয়ে, গায়ের আভরণ ফণিদলকে ত্রস্ত ক'রে, উগ্র দৃষ্টিতে জেগে উঠল। আর শুধু এক দক্ষিণ দিক ছাড়া সব দিক দিয়েই সেই রকম আগুনের হলকার মত হাওয়া ঢুকতে লাগল—পাহাড়ের অলি-গলি যেখানেই একটু পথ পেলে সেখান দিয়েই। ক্রমে চারি দিককার হাওয়ার সংঘর্ষে, তাণ্ডব নাচে ভূতনাথের সঙ্গিদলের মতই ঘূর্ণির পর ঘূর্ণি। সেও নিশ্চয় এই চৈতালী ঘূর্ণিই, কেন-না, আগেই বলেছি আমি যা দেখেছিলাম সেটা ফাগুন-শেষের বা চৈত্র-আরম্ভের ব্যাপার;—চৈতালী ঘূর্ণিই, কিন্তু তার কাছে এ ঘূর্ণি শিশুমাত্র! গাছ উপড়ে ফুলে-ভরা গাছের ডালগুলোকে লুফতে লুফতে প্রলয় হুঙ্কারে সমস্ত তরাইটা ওলট-পালট ক'রে ফিরতে লাগল। ধুলোয় ধুলোয় দিগন্ত হয়ে এল অন্ধকার, ডাল-পাতার সংঘর্ষে পাহাড়ের কোলে দাবাগ্নি জ্বলে উঠে সেই ধুলোকে গৈরিকে রাঙিয়ে আগুনের মতই উত্তপ্ত ক'রে তুললে। সূর্যও হয়ে উঠল প্রলয়ের সূর্যের মতই প্রখর। চারি দিকে পাহাড়ে ঘেরা সেই প্রকাণ্ড তরাইয়ের গহ্বরে একটা চাপা হুঙ্কার গর্জে ফিরতে লাগল—সংহার—সংহার—শুধুই সংহার—তার সঙ্গে মিশল ধ্বংসের হুতাশ, মৃত্যুর আর্তনাদ;—একটা দিন যার প্রভাত ছিল এত অপরূপ সুন্দর, অপরাহ্ণে সে অকস্মাৎ এত বিকট হয়ে উঠতে পারে কল্পনাও করা যায় না।

ক্রমে ঘূর্ণির ধুলো-বালির সঙ্গে পোড়া জঙ্গলের ছাই মিশে তরাইটাকে লুপ্ত ক'রে সূর্যকে নিষ্প্রভ ক'রে আনলে। মাতুনি আরও বেড়েই চলল। ঘূর্ণিতে গাছের জলন্ত শাখা ঘোরাতে ঘোরাতে ধ্বংসের অট্টহাসের সঙ্গে চারি দিকে অগ্নিবৃষ্টি ক'রে ঘুরতে লাগল, মাঝে মাঝে দৃশ্য আরও বীভৎস—শূন্যে জলন্ত শাখার সঙ্গে ফুটন্ত ফুলের শাখার জড়াজড়ি—চাপা আর্তনাদের সঙ্গে ফুলের স্তবক দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠে মুহূর্তে এক মুঠো ছাই হ'য়ে ধুঁয়ায়-ভরা আকাশে মিলিয়ে গেল। বিনষ্টতপঃ শঙ্করের তৃতীয় নয়নের আগুন পঞ্চশরের শেষ চিহ্নটি পর্যন্ত ভস্মীভূত না করে তৃপ্ত হবে না।

কখন সূর্যাস্ত হ'ল বোঝা গেল না, ধুলো আর ধুঁয়ায়

সঙ্গে কখন যে মেঘ এসে মিশে গেছল তাও টের পাই নি। এক সময় বৃষ্টি নামল—বোধ হয় সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই।"

শৈলেন চুপ করিল। আর তিন জনেও খানিকক্ষণ চুপ করিয়াই রহিল; তাহার পর অক্ষয় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, "আশ্চর্য!"

শৈলেন বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল, তাহার পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, "কোন্‌টে?"

অক্ষয় উত্তর করিল, "কোন্‌টে নয়?—সেই মঠধারী; —তার আবির্ভাব, তিরোভাব দুই-ই; সেই ধ্যানমগ্ন মূর্তি, যা শেষে অমন ক'রে প্রলয়ে মেতে উঠল..."

অশ্বিনী কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "এমন কি সেই খণ্ডপ্রলয়ের মধ্যেও তোমার অক্ষত থাকাটা পর্যন্ত..."

শৈলেন বলিল, "তোমরা যে অর্থে আশ্চর্য বলছ তার কিছুই নয়, তবে অসাধারণ বটে, বিশেষ ক'রে সমতলবাসী বাঙালীর দৃষ্টিতে।...রাতটা আমি সেইখানেই কাটালাম—আশ্রয় খোঁজাখুঁজি করবার ইচ্ছা বা উৎসাহ কিছুই ছিল না। সকালে পিছন দিকের একটা সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে নেমে যখন তরাইয়ের কোলে এলাম, দেখি রং-বেরঙের কাপড়-পরা স্ত্রী-পুরুষের দল তরাই ছেড়ে ফিরে যাচ্ছে। এক নূতনতর কৌতূহলে নিজেকে পাহাড়ের আড়ালে রেখে রেখে আমি এগিয়ে গেলাম। দেখলাম অধিকাংশই সব যুবক আর যুবতী, কচিৎ এক-আধটা প্রৌঢ়, বৃদ্ধ নেই—একটু তিব্বতীঘেঁষা চেহারা হ'লেও সব অপূর্ব সুন্দর। আর দেখলাম সকলেই সেই মহাশ্মশানের এক-এক মুঠো ছাই সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে।..."

তারাপদ প্রশ্ন করিল, "ছাই!"

শৈলেন বলিল, "ছাই।...বুঝতে পারছ না? আমাদের দেশের দোলপর্বের ঠিক বিপরীত একটা পর্ব, একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠান।—যে মদন নিত্যই যুব-হৃদয়ে পঞ্চশরের আগুন জ্বালছে, তার বিরুদ্ধে শঙ্করের রোষাগ্নি-পূত রক্ষা-কবচ।

তারাও সবাই অক্ষত দেখে আমি একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। দেখি এই বিরাট্ নাট্যশালার একটা অডি-টোরিয়াম বা প্রেক্ষাগৃহ আছে। প্রেক্ষাপ্রাঙ্গণ বললে আরও ঠিক হয়। তার অসাধারণত্ব এইখানে যে সেটা কলকাতা বা অন্য কোন জায়গায় একটা সাধারণ অডিটোরিয়ামেরই মতন। রুক্ষ, কঠিন-হয়ে-যাওয়া গলা পাথরের পাহাড়টা সিঁড়ির মত থাকে থাকে ওপর দিকে উঠে গেছে, মাঝে মাঝে কতকটা ব্যালকনির মতনই এক একটা অংশ সামনের দিকে ঠেলে এসেছে। তার ওপর থাকলে নীচের ধাপ-গুলো চোখের আড়ালে পড়ে যায়। বুঝলাম আমি খুব উঁচুতে এই রকম একটা ব্যালকনিতে আশ্রয় পেয়েছিলাম। আমার বা আমাদের গায়ে যে আঁচড় লাগে নি তার কারণ আগেই বলেছি—ঘূর্ণিগুলো এই এক দক্ষিণ দিকটা ছেড়ে আর সব দিক দিয়েই এসেছিল—স্বভাবতই ধ্বংস-লীলাটাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই দিকটা বাদ দিয়েই। সেটার মধ্যে আশ্চর্য কথা ত দূরে থাক্, অসাধারণত্বেরও কিছু নেই—নিতান্ত ভৌগোলিক ব্যাপার—পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

এবার তোমার দ্বিতীয় আশ্চর্যের কথা। তরাই যাত্রীশূন্য হ'লে আমি সেই মূর্তির দিকে এগুতে আরম্ভ করলাম..."

অক্ষয় বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "মূর্তি ছিল তখনও?"

শৈলেন উত্তর করিল, "প্রায় দেখা যায় পাহাড়ের গা থেকে একটা অংশ ঠেলে এসে একটা জীব, জন্তু বা মানুষের আকারে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকে। কত যুগ ধরে উত্তরায়ণের সঙ্গে তিব্বতের হাওয়া তেতে উঠতে সে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়ে এসেছে। সেই সব ঘূর্ণি বালির উকো দিয়ে এই রকম একটা ঠেলে-আসা পাথরের গায়ে খাঁজ-খোঁজ তৈয়ের করে একটা আসনবদ্ধ মানুষের মূর্তি সৃষ্টি ক'রে ফেলেছে। পাহাড় অঞ্চলে খুবই সাধারণ একটা দৃশ্য—বিশেষ যেখানে ঝড়ের প্রাবল্য আছে। সমস্ত বৎসর ধরে এই মূর্তির কোণ-কানে বিচিত্র রঙের লতাপাতা জন্মে সমস্ত মূর্তিটাকে..." অক্ষয় একটু নিরাশ হইয়াই বলিল, "এই পর্যন্ত থাক্।"

তারাপদ, এমন কি অশ্বিনীর মত অবিশ্বাসীও এই বিরতিতে আপত্তি করিল না। তিন জনেই বাইরের তপ্ত প্রকৃতির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। যেন অন্তরে যে সুরের প্রবাহ, বাইরে তাহার সঙ্গত খুঁজিতেছে।

শুধু শৈলেনের মুখেই একটা মৃদুহাস্যের জের কোথায় যেন লাগিয়া রহিল।

প্রাচীন চীন ও ভারতবর্ষ

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

চীনের সহিত ভারতের যোগ বহুকালের। এই দুই বৃহৎ দেশ, যাহাদিগকে মহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ঠিক কত কাল পূর্ব হইতে তাহাদের মধ্যে আদান-প্রদান গমনাগমন শুরু হয়, বলা বড় কঠিন।

ঐতিহাসিক বলেন, বৌদ্ধভিক্ষু কাশ্যপমাতঙ্গ ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনে যান। সেই দিন হইতে চীন, ভারতের সঙ্গে ধর্ম সংস্কৃতি ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

কাশ্যপমাতঙ্গের পর ক্রমাগত সহস্রাধিক বর্ষ ব্যাপিয়া বহু ভারতীয় এবং চীনদেশীয় চীন ও ভারতে গমনাগমন করিতে থাকেন। তাঁহাদের অনেকের কথা চীনদেশীয় সাহিত্য ও ইতিহাস হইতে জানা যায়। কিন্তু অধিকাংশেরই নাম ও পরিচয় চিরতরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

"নানাকালের মহাভিক্ষুদের জীবনী" নামক চীন-গ্রন্থে এমন দুই শত প্রতিভাবান্ চীনভিক্ষুর কথা আছে, যাঁহারা ভারতে আসিয়া শিক্ষালাভ করিয়া অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থে এমন চব্বিশ জন ভারতীয় ভিক্ষুর জীবনী পাওয়া যায়, যাঁহারা চীনে মহাকারুণিক বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণার ধর্ম প্রচার করিয়া অলৌকিক সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

বহু ভারতীয় চীনভাষা অধ্যয়ন করিয়া সেই ভাষায় নিজ ধর্মগ্রন্থাদির অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া আচার্য কুমারজীবের নাম উল্লেখযোগ্য। আচার্য কুমারজীব ৪২৫ খণ্ডে ৯৮খানি গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহার অনুবাদ শুধু অনুবাদের দিক হইতে নহে, সাহিত্যিক দিক হইতেও সমাদৃত। তাঁহার ও হুয়েনসং-এর রচনাশৈলী চীনের প্রাচীন সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

কুমারজীব যেমন চীনভাষায়, হুয়েনসং সেইরূপ সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃতে তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। বহু ভারতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতকে তিনি তর্কে পরাজিত করিয়া গিয়াছেন।

কথিত আছে, আচার্য হুয়েনসং ৬৫৭খানা গ্রন্থ ভারত হইতে চীনে লইয়া যান। তাহার মধ্যে ৭৫খানা গ্রন্থ চীনভাষায় ১৩৩৫ খণ্ডে অনুবাদ করেন। অনুবাদ ব্যতীত দুর্বোধ্য সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষ্যাদিও তিনি রচনা করেন। তাঁহার রচিত আচার্য বসুবন্ধুকৃত 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি' গ্রন্থের ভাষ্য একখানা অপূর্ব গ্রন্থ। ইহা Louis de la Vallee Poussin ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতীয় অনুবাদকগণের মধ্যে আচার্য কুমারজীবের পরই আচার্য পরমার্থের নাম উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, ইনি ২৪০ পোটিকা (bundle) পুঁথি চীনে লইয়া যান। ইনি বহু গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার বত্রিশখানা মাত্র এখন পাওয়া যায়।

চীনদেশীয় অনুবাদকগণের মধ্যে আচার্য হুয়েনসং-এর পর আচার্য ই চিঙ্ (I Tsing)-এর নাম করা যাইতে পারে। ইনি চারি শত পুঁথি (যাহার শ্লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষ) ভারত হইতে চীনে লইয়া যান। তাহার ছাপ্পান্নখানা চীন ভাষায় অনুবাদ করেন।

ভারতীয় ও চীনদেশীয় প্রচারকগণের অনেকেই ভারত হইতে চীনে অসংখ্য পুঁথি লইয়া যান। চীনের 'লো য়্যাং' নগরে প্রসিদ্ধ ভারতীয় ভিক্ষু আচার্য বোধিরুচির বাসগৃহে দশ হাজার পুঁথি সঞ্চিত ছিল বলিয়া শোনা যায়।

এই সমস্ত পুঁথি এখনও চীনে আছে কি নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা জানা যায় না। তবে তাহার মধ্যে কতকাংশ চীনভাষায় অনূদিত হইয়া গিয়াছে।

চীনভাষায় অনূদিত এই সমস্ত গ্রন্থরাজি "চীন-ত্রিপিটক" নামে পরিচিত। এই অনুবাদরাশির মধ্যে চীনদেশীয় পণ্ডিতগণের স্বরচিত ব্যাখ্যাদি গ্রন্থও কিছু পরিমাণে আছে। আবার ইহাতে অবৌদ্ধ গ্রন্থও স্থান পাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ "সুবর্ণসপ্ততিশাস্ত্র" (সাংখ্যকারিকা ভাষ্য) ও "বৈশেষিকনিকায়দশপদার্থশাস্ত্রে"র নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই চীন-ত্রিপিটকের সর্বাপেক্ষা আধুনিক সংস্করণ (Tai Sho edition) জাপান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার গ্রন্থসংখ্যা ২১৮৪।* চীন-ত্রিপিটকের আরও

---

* একস্থানে বর্ণনা পাওয়া যায় যে হান্ বংশীয় মিঙ্ টি সম্রাটের সময় হইতে ৬৬৪ বৎসরের মধ্যে, ১৭৬ জন অনুবাদক কর্তৃক ২২৭৮খানা গ্রন্থ ৭০৪৬ খণ্ডে অনূদিত হয়। এই গ্রন্থসংখ্যাই দেখিতেছি "তাই শো" ত্রিপিটকের গ্রন্থসংখ্যা হইতে অধিক। অথচ ইহার পরেও কয়েক শত বৎসর আরও অনেক গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল। সুতরাং অনূদিত বহু গ্রন্থ যে নষ্ট বা লুপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিহাসেও পাওয়া যায় কয়েক জন চীন সম্রাট বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহারা বহু মঠ ও শাস্ত্রগ্রন্থ নষ্ট করেন।

কয়েক প্রকার সংস্করণের নাম ও গ্রন্থসংখ্যা এখানে দেওয়া হইল।

১। সুঙ্ বংশীয় সংস্করণ ত্রিপিটক (৯৬০—১২৭৬ খ্রীঃ) ইহার গ্রন্থসংখ্যা ১৯২১। ইহা ৬৩১০ উপখণ্ডে, ৫৯২ খণ্ডে, ৬০ গুচ্ছে (bundle) পাওয়া যায়।

২। চিঙ্ বংশীয় সংস্করণ ত্রিপিটক। (১৬৪৪—১৯১১ খ্রীঃ) ইহা ড্র্যাগন এডিসন্ ত্রিপিটক বলিয়া সুপরিচিত। ইহার গ্রন্থসংখ্যা ১৬৬৬। ইহা ৭১৭৪ খণ্ডে ৭১৯ গুচ্ছে পাওয়া যায়।

৩ (ক)। সাঙ্ঘাই সংস্করণ ত্রিপিটক। ইহার গ্রন্থসংখ্যা ১৯১৬। ইহা ৮৪১৬ উপখণ্ডে, ৪১৪ খণ্ডে, ৪০ গুচ্ছে পাওয়া যায়।

৩ (খ)। এই সাঙ্ঘাই সংস্করণের একটি পরিশিষ্ট সংস্করণ বাহির হইয়াছে। উহার গ্রন্থসংখ্যা ৫২।*

বর্তমান চীনের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত ল্যু চেঙ্ (Lu Ch'eng) রচিত "বৌদ্ধশাস্ত্র গবেষণা পদ্ধতি" নামক পুস্তকে ১৪ প্রকার সংস্করণের ত্রিপিটকের নাম পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে সুঙ্ বংশকালীন—পাঁচটি, য়ুয়ান্‌বংশকালীন—একটি, মিংবংশকালীন—৪টি, চিংবংশকালীন—দুইটি ও রিপাব্লিককালীন দুইটি—(সাঙ্ঘাই সংস্করণ ও তাহার পরিশিষ্ট)।

কিন্তু ইহার অধিকাংশ সংস্করণেরই অংশমাত্র ব্যতীত সমস্ত পাওয়া যায় না।

চীন ত্রিপিটক সম্বন্ধে একজন ইউরোপীয় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, যে, ইহা পালিত্রিপিটকের এক শত গুণেরও অধিক এবং ইহার মধ্যে পালিত্রিপিটকের প্রায় সমস্তই কোনো-না-কোনো রূপে পাওয়া যায়।

এই উক্তি একেবারে অতিরঞ্জিত নহে।

অনেকের মত যে, বুদ্ধের উপদেশসমূহ পালিত্রিপিটক হইতে চীন ভাষায় অনূদিত হয় নাই, সংস্কৃত হইতেও হয় নাই। কিন্তু এক প্রকার প্রাকৃতে রচিত বুদ্ধের মৌলিক উপদেশসমন্বিত গ্রন্থরাজি (যাহার মূল এখন অপ্রাপ্য) হইতেই ঐ অনুবাদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

ইহা গেল সূত্রের কথা। কিন্তু আরও অন্যান্য বৌদ্ধশাস্ত্র যাহা অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, আর্যদেব, অসঙ্গ, বসুবন্ধু ইত্যাদি মহাযান আচার্যগণ এবং তাঁহাদের অনুগামী শিষ্য প্রশিষ্যাদির দ্বারা সংস্কৃতে রচিত হয়, তাহাও চীন ভাষায় অনূদিত হইয়া চীনত্রিপিটকের অন্তর্গত হইয়াছে।

এই সমস্ত অনূদিত গ্রন্থের মূল প্রায় সমস্তই আজ অপ্রাপ্য।

কেমন করিয়া এই সমস্ত গ্রন্থ ভাষান্তরে অনূদিত হইল? কাহারা করিলেন? কী ভাবে করিলেন?

ভারতীয়, কাবুলী, খোটানী, তুখার জাতীয়, চীনদেশীয়, তিব্বতীয়, শ্যাম ও সিংহল দ্বীপবাসী, পারস্যদেশীয় পণ্ডিত গৃহস্থ ও ভিক্ষুগণ কর্তৃক, এই অপূর্ব অনুবাদ-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম ও তাঁহাদের সম্পাদিত গ্রন্থসংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১। কাশ্যপমাতঙ্গ। ইনিই সেই প্রসিদ্ধ ভারতীয় ভিক্ষু, যিনি ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনে গিয়া বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণার ধর্ম প্রচার করেন। ইনি মধ্য-ভারতীয় এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"দ্বিচত্বারিংশ-পরিচ্ছেদ-শাস্ত্র"† নামক একখানা গ্রন্থ ইনি চীন ভাষায় সঙ্কলন করেন। ইহার ঐ গ্রন্থ অতীব জনপ্রিয়, আজও সর্বত্র পঠিত হয়। ইনি চীনের প্রসিদ্ধ শ্বেতাশ্ব মঠে দেহত্যাগ করেন। ঐ মঠই চীনের আদি বৌদ্ধ মঠ। আজও ইহা বর্তমান আছে।

২। ধর্মরক্ষ। ইনি গোভরণ বা ভরণ নামেও পরিচিত। ইনি একজন ভারতীয় শ্রমণ। বিনয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কাশ্যপমাতঙ্গের পর ইনি চীনে যান। কথিত আছে, কাশ্যপমাতঙ্গ ও ইনি উভয়ে মিলিয়া "দ্বিচত্বারিংশ-পরিচ্ছেদ-শাস্ত্র" সঙ্কলন করেন। ইনি ৬৮-৭০ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচখানা গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

৩। আন্ শি কও। ইনি পূর্বপারস্য বা পারথিয়া হইতে চীনে যান। ইনি একজন রাজকুমার ছিলেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর রাজ্য পিতৃব্যকে দিয়া ১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনে গিয়া বহু সূত্রগ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহার পঞ্চান্নখানা গ্রন্থ পাওয়া যায়।

৪। ধর্মকাল। ভারতীয় ভিক্ষু। ২২২ খ্রীষ্টাব্দে চীনে যান। ২৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মহাসাঙ্ঘিকগণের প্রাতিমোক্ষ অনুবাদ করেন। চীন ভাষায় এই প্রথম বিনয় গ্রন্থের অনুবাদ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহা লুপ্ত হইয়াছে।

৫। ধর্মরক্ষ। (২৬৬-৩১৭ খ্রীঃ)। ইনি ছত্রিশটি ভাষা বা উপভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। বহু গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন। এখনো নব্বইখানি পাওয়া যায়।

৬। চু-শু-লান্। ইনি একজন ভারতীয়ের বংশধর।

---

* বিশ্বভারতীর চীন-ভবনে এই তিন প্রকার সংস্করণের ত্রিপিটকই সাঙ্ঘাই সংস্করণের পরিশিষ্টসহ পাওয়া যায়।

† বিশ্বভারতীর চীন-ভবন হইতে এই গ্রন্থের সংস্কৃত ও পালি-ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহার ইংরেজী অনুবাদ আছে।

চীনে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ খণ্ডে দুইখানা গ্রন্থ ২৯০-৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুবাদ করেন। কিন্তু এখন ইহা পাওয়া যায় না।

৭। উ-লো-ছা। ইনি খোটানের ভিক্ষু। ২৯১ খ্রীষ্টাব্দে চু-শু-লানের সহিত একটি সূত্রগ্রন্থ অনুবাদ করেন

৮। গৌতম সঙ্ঘদেব। ইনি কাবুলের শ্রমণ। ৩৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনে যান। ইহার চারখানা গ্রন্থ পাওয়া যায়।

৯। বুদ্ধভদ্র। ইনি ভারতীয় শ্রমণ। শাক্য সিংহের পিতৃব্য অমৃতোদনের বংশধর। ৩৯৮-৪২১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পনরখানা গ্রন্থ অনুবাদ করেন। কিন্তু ইহার মাত্র সাতখানা পাওয়া যায়। কুমারজীবের সহিত ইহার সাক্ষাৎকার হয়। ইনি ৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

১০। ধর্মপ্রিয়। ইনি একজন ভারতীয় শ্রমণ। ৩৮২ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ খণ্ডে একখানি সূত্রগ্রন্থের অনুবাদ করেন।

১১। ধর্মনন্দিন্। তুখার জাতীয় শ্রমণ। ইনি ৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চীনে যান। ১১৪ খণ্ডে পাঁচখানা গ্রন্থ অনুবাদ করেন। দুইখানা পাওয়া যায়।

১২। কুমারজীব। ভারতীয় শ্রমণ। ইহার পূর্বপুরুষগণ পুরুষানুক্রমে রাজমন্ত্রী ছিলেন। ইনি ৩৮৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনে যান। ৪১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইনি চার শত পঁচিশ খণ্ডে আটানব্বইখানা গ্রন্থ অনুবাদ করেন। অনুবাদ ব্যতীত ইনি একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও কতকগুলি কবিতাও চীন ভাষায় রচনা করেন। ইহার তিন হাজারেরও অধিক চীনদেশীয় ভিক্ষু শিষ্য ছিলেন। ইহার দেহত্যাগের সঠিক সময় পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ইনি দেহত্যাগ করেন। এখন পঞ্চাশখানা গ্রন্থ ইহার নামে পাওয়া যায়।

১৩। ফা-শিয়েন। চীনদেশীয় ভিক্ষু। ইনি ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত অভিমুখে রওনা হন। ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে চীনে ফিরিয়া যান। ইনি বুদ্ধভদ্রের সহিত একত্রে কয়েকখানা গ্রন্থ অনুবাদ করেন। নিজে একাও কতকগুলি অনুবাদ করেন। তাহার চারখানি মাত্র পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ইনি ইহার প্রসিদ্ধ ভ্রমণকাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। ৮৬ বৎসর বয়সে ইহার দেহত্যাগ হয়।

১৪। ধর্মরক্ষ। ভারতীয় শ্রমণ। ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে চীনে যান। চীনের উত্তর-প্রদেশের 'লিয়াঙ' রাজবংশের দ্বিতীয় শাসকের অনুরোধে, তিনি ৪২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন তাঁহার বয়স ৪৯, তখন তিনি উত্তর-প্রদেশের 'ওয়ে' রাজবংশের তৃতীয় শাসকের দ্বারা নিমন্ত্রিত হন। এই নিমন্ত্রণই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হয়। 'লিয়াঙ' বংশের শাসক সন্দেহ করেন ধর্মরক্ষ 'ওয়ে' বংশের সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহার কোন অনিষ্ট সাধন করিবেন। এই মিথ্যা সন্দেহে পথিমধ্যে গুপ্তঘাতকের দ্বারা তিনি ধর্মরক্ষের প্রাণনাশ করেন। এইরূপে এই ভারতীয় ধর্মপ্রচারক বিদেশে আততায়ীর হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার অনূদিত বারখানি গ্রন্থ আজিও তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

১৫। গুণভদ্র। ব্রাহ্মণ-বংশীয় ভারতীয় শ্রমণ। মহাযান শাস্ত্রে অতীব অভিজ্ঞ ছিলেন। ৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনে যান। ৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নানা গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ইহার আটাশখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

১৬৷ ধর্মবিক্রম বা ধর্মশূর। চীন ভিক্ষু। ৪২০ খ্রীষ্টাব্দে পঁচিশ জন বন্ধুসহ ভারতে আসেন। ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনে ফিরিয়া একখানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

১৭। সঙ্ঘবর্মন্—শ্যাম দ্বীপের শ্রমণ (৫০৬-৫২০ খ্রীঃ)। ইহার নয় খানা গ্রন্থ পাওয়া যায়।

১৮। উপশূন্য। ইনি মধ্যভারতের এক রাজপুত্র (৫৩৮-৫৬৫ খ্রীঃ) ইহার চার খানা গ্রন্থ আছে। ইহার মধ্যে 'বিমলকীর্তিনির্দেশ' অতি প্রসিদ্ধ।

১৯। পরমার্থ। গুণরত বা কুলনাথ বলিয়াও পরিচিত। ইনি উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ শ্রমণ। ৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনে যান। ৫৫৭-৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি চল্লিশখানা গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এখন বত্রিশখানা পাওয়া যায় ইহার মধ্যে অশ্বঘোষ-কৃত (১) মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদ শাস্ত্র, (২) সুবর্ণসপ্ততি শাস্ত্র (সাংখ্যকারিকাভাষ্য) ও (৩) আচার্য বসুবন্ধুর জীবনী এখানে উল্লেখযোগ্য। ৫৬৯ খৃষ্টাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে ইহার দেহত্যাগ হয়।

২০। ধর্মরুচি। ভারতীয় শ্রমণ (৫০১-৫০৭ খ্রীঃ)। ইহার দুই খানা গ্রন্থ পাওয়া যায়।

২১। রত্নমতি। ভারতীয় শ্রমণ (৫০৮ খ্রীঃ)। ইহারও দুইখানা গ্রন্থ পাওয়া যায়।

২২। বোধিরুচি। উত্তর-ভারতীয় শ্রমণ। ৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনে যান। ৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ত্রিশ বা ততোধিক গ্রন্থের অনুবাদ করেন। ত্রিশখানা এখন পাওয়া যায়।

২৩। বুদ্ধশান্ত। ভারতীয় শ্রমণ (৫২৪-৫৩৯ খ্রীঃ)। ইহার নয়খানা গ্রন্থ পাওয়া যায়।

২৪। গৌতম প্রজ্ঞারুচি। বারাণসীর ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম (৫৩৮-৫৪৩ খ্রীঃ)। তের খানা গ্রন্থ ইহার নামে পাওয়া যায়।

২৫। জ্ঞানগুপ্ত। গান্ধার দেশীয় শ্রমণ (৫৬১-৬০০ খ্রীঃ)। ইহার আটত্রিশখানা গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইনি ৭৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

২৬। গৌতম ধর্মজ্ঞান বা ধর্মপ্রজ্ঞ। ইনি বারাণসীর গৌতম প্রজ্ঞারুচির জ্যেষ্ঠ পুত্র। উত্তর 'ছি' রাজবংশের ধ্বংসের পর (৫৭৭ খ্রীঃ) উত্তর 'চাও' রাজবংশীয় শাসক কর্তৃক ইনি এক জেলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইহার একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

২৭। নরেন্দ্রযশস্। ভারতীয় শ্রমণ। (৫৫৭-৫৮৯ খ্রীঃ)। ইহার পনেরখানা গ্রন্থ পাওয়া যায়।

২৮। প্রভাকর মিত্র। ভারতীয় শ্রমণ। ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনে যান, ইহার তিনখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

২৯। হুয়েন সং (বা শুয়েন চুয়াং)। চীন দেশীয় প্রসিদ্ধ শ্রমণ। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন হইতে ভারত অভিমুখে রওনা হন। ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনে ফিরিয়া, সেই বৎসর হইতেই দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত, অত্যন্ত নিপুণতার সহিত ১৩৩৫ খণ্ডে পঁচাত্তর খানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ৬৫ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইনি অনুবাদ ব্যতীত দুর্বোধ্য গ্রন্থের ভাষ্যাদিও প্রণয়ন করেন। ইহার ভ্রমণ-কাহিনী জগৎপ্রসিদ্ধ। ইহার অনূদিত পঁচাত্তর-খানি গ্রন্থ আজিও পাওয়া যায়।

৩০। দিবাকর। ভারতীয় শ্রমণ (৬৭৬- ৬৮৮ খ্রীঃ)। উনিশখানি গ্রন্থ ইহার নামে আজিও পাওয়া যায়।

৩১। হুয়ি-চি (প্রজ্ঞা)। ভারতীয় শ্রমণ। চীনে জন্ম। ইহার পিতা ব্রাহ্মণ চীনে রাজদূতের কার্য করিতেন। ৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি একখানি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। উহা আজও পাওয়া যায়।

৩২। রত্নচিন্ত। কাশ্মীরের শ্রমণ (৬৯৩—৭২১ খ্রীঃ) শতাধিক বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। সাতখানা গ্রন্থ ইহার নামে পাওয়া যায়।

৩৩। ই-চিঙ (I-Tsing)। চীন দেশীয় প্রসিদ্ধ শ্রমণ। ৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত অভিমুখে রওনা হন। ত্রিশ বা ততোধিক দেশ ভ্রমণ করিয়া ৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনে ফিরিয়া যান। ইনি চারি শত সংস্কৃত পুঁথি সঙ্গে লইয়া যান। কিছু Relicsও লইয়া যান। ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭৯ বৎসর বয়সে ইহার দেহত্যাগ হয়। ইহার অনূদিত ছাপান্নখানি গ্রন্থ আজিও পাওয়া যায়। ইহার ভ্রমণ-কাহিনী জগৎ-প্রসিদ্ধ।

৩৪। বোধিরুচি। ভারতীয় শ্রমণ। দাক্ষিণাত্যের কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আসল নাম ধর্মরুচি। চীন-সম্রাজ্ঞীর (৬৮৪ ৭০৫ খ্রীঃ) আদেশে ইহার বোধিরুচি নাম হয়। ইনি ৬৯৩-৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে ১১১ খণ্ডে ৫৩ খানা গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ইহার ৪১ খানা এখন পাওয়া যায়। কথিত আছে, ১৫৬ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

৩৫। প্রমিতি। ভারতীয় শ্রমণ (৭০৫ খ্রীঃ)। ইহার একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

৩৬। বজ্রবোধি। ভারতীয় শ্রমণ। দক্ষিণ-ভারতের মলয় রাজ্যের (মলয় দ্বীপ?) ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। ৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনে যান। ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। ১১খানি গ্রন্থ ইহার নামে পাওয়া যায়।

৩৭। শুভকর সিংহ। ভারতীয় শ্রমণ। শাক্যসিংহ বুদ্ধের পিতৃব্য অমৃতোদনের বংশধর। নালন্দা মঠে থাকিতেন। ৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনে যান, ৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ৯৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ৫খানি গ্রন্থ ইহার নামে পাওয়া যায়।

৩৮। অমোঘবজ্র। ভারতীয় শ্রমণ। উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম। ৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহার গুরু বজ্রবোধিকে অনুসরণ করিয়া ইনি চীনে যান, ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে গুরু যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন ইহাকে তিনি ভারত ও সিংহলে শাস্ত্র সংগ্রহের জন্য যাইতে আদেশ করেন। সেই আদেশ অনুযায়ী অমোঘবজ্র ভারতে ও সিংহলে যান। ৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি চীনে প্রত্যাবর্তন করেন। চীনসম্রাট্ ইহাকে "প্রজ্ঞাকোষ" উপাধি দেন। ৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজকীয় উপাধি ব্যতীত ইনি "ত্রিপিটকভদন্ত" নামক আর একটি উপাধি লাভ করেন। ৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের জন্মদিনে রাজদরবারে ইনি ইহার অনুবাদসমূহ এক স্মারকলিপিসহ উপহার দেন। ঐ স্মারকলিপিতে লেখা ছিল:—"বাল্যকাল হইতে চৌদ্দ বৎসর (৭১৯-৭৩২ খ্রীঃ) আমি আমার গুরু বজ্রবোধির সেবা করিয়া যোগশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করি। তাহার পর ভারতের নানা স্থানে গমন করিয়া ৫০০ শতাধিক বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করি। উহা এখনো চীনে আনা হয় নাই। • • •।" ৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

"থাঙ" বংশীয় রাজগণের ইনি অতিশয় ভক্তিভাজন ছিলেন। ইঁহার প্রভাবে তন্ত্রশাস্ত্র তাহার নানা অলৌকিক ঋদ্ধিসিদ্ধি সহ চীনদেশে প্রথম প্রচার লাভ করে। ইঁহার ১০৮খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

৩৯। প্রজ্ঞা। কাবুলের শ্রমণ (৭৮৫-৮১০ খ্রীঃ)

৪০। ধর্মদেব। নালন্দা-মঠের শ্রমণ (৯৭৩-১০০১ খ্রীঃ)। চীন-সম্রাট ইঁহাকে "মহাধর্মাচার্য" উপাধি দানে সম্মানিত করেন। ১০০১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন। ১১৮খানি গ্রন্থ ইঁহার নামে পাওয়া যায়।

৪১। দেব। জলন্ধরের (কাশ্মীর) শ্রমণ। ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে চীনে পৌছেন। সেই সময় হইতে ২০ বৎসর যাবৎ অনুবাদ-কার্যে লিপ্ত থাকেন। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার ১৮খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

৪২। দানপাল। ভারতীয় শ্রমণ। ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে চীনে যান। ৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে চীন-সম্রাট কর্তৃক উপাধির দ্বারা সম্মানিত হন। ইঁহার নামে ১১১খানা গ্রন্থ পাওয়া যায়।

৪৩। ধর্মরক্ষ। মগধবাসী ভারতীয় শ্রমণ। ১০০৪ খ্রীষ্টাব্দে চীনে যান এবং সেই সময় হইতে ১০৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুবাদ কার্যে লিপ্ত থাকেন। ১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনিও চীন-সম্রাট কর্তৃক উপাধির দ্বারা বিশেষভাবে সম্মানিত হন। ১০৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ৯৬ বৎসর বয়সে ইঁহার দেহত্যাগ হয়। বারখানি গ্রন্থ ইঁহার নামে পাওয়া যায়।

৪৪। মৈত্রেয় ভদ্র। মগধবাসী ভারতীয় শ্রমণ। ইনি 'লিয়াও' বংশীয় (৯০৭-১১২৫ খ্রীঃ) চীন-সম্রাটের গুরু ছিলেন। ইঁহার সঠিক সময় জানা যায় না। ৫খানা গ্রন্থ ইঁহার নামে পাওয়া যায়।

৪৫। বাষ্প। তিব্বতীয় শ্রমণ। কুবলাই খাঁ যখন চীন জয় করেন, তখন ইনি তাঁহার বিশ্বাসী পরামর্শদাতা ছিলেন। ১২৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মোঙ্গলীয় ভাষায় এক বর্ণমালাপদ্ধতি প্রস্তুত করেন। ইঁহার একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

৪৬। জ্ঞানশ্রী। ভারতীয় শ্রমণ। ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনে যান। ইঁহার নামে দুখানা গ্রন্থ পাওয়া যায়।

নানাদেশীয় এবং নানাজাতীয় এই অনুবাদকগণ, কখনো কেহ একা, কেহ বা একজন সাহায্যকারী লইয়া কখনো বা কয়েকজন মিলিত ভাবে এই অনুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। পরবর্তীকালে সম্মিলিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে এই অনুবাদ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইত। নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে ইহার আভাস পাওয়া যাইবে।

ইহা ৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের এক "বৌদ্ধশাস্ত্র-রূপান্তর ভবনে"র কার্যাবলীর বর্ণনা হইতে উদ্ধৃত হইল* :—

প্রধান অনুবাদক (ই চ্‌) মধ্যস্থলে বসিয়া মূলগ্রন্থ পাঠ করিতেন, তাঁহার বামে বসিতেন "অর্থদ্রষ্টা" বা "অর্থ-নির্ণায়ক" (চেঙ্‌ ই)। তিনি প্রধান অনুবাদকের সহিত অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। তৃতীয় ব্যক্তি "রচনা-সমীক্ষক" (চেঙ্‌ ওয়েন্‌) দক্ষিণে বসিয়া তাঁহার আবৃত্তি অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন এবং লক্ষ্য করিতেন উহা যথাযথ হইতেছে কি না। চতুর্থ ব্যক্তি "লিপিকর" (শু চ্‌) ঐ আবৃত্তি শুনিয়া চীন ভাষায় তাহার প্রতিলিপি লইতেন। উহার পর "লেখক" (পি শু) ঐ প্রতিলিপি দেখিয়া চীনভাষায় শব্দে শব্দে উহার অনুবাদ করিতেন। ষষ্ঠ ব্যক্তি "বাক্য-বিরচক" বা "শব্দ-যোজক" (চুই ওয়েন্‌) ঐ আক্ষরিক অনুবাদ দেখিয়া চীন ভাষার রীতি, গতি ও ধারা অনুযায়ী বাক্য রচনা করিতেন। সপ্তম "অনুবাদ-তুলক" (চান্‌ ই) এই দুই মূল ও অনূদিত গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিতেন। অষ্টম "পরিমার্জক" (খান্‌ টিং) সর্বপ্রকারের বাহুল্য ও অতিরিক্ত শব্দাদি কাটিয়া ছাঁটিয়া অনুবাদ প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট করিতেন। সর্বশেষে "রচনা-পরিপোষক" (জুন্‌ ওয়েন্‌) নামক নবম ব্যক্তি সমস্ত অনুবাদের পুনরাবৃত্তি ও পরিশোধন করিতেন।

সহস্র বর্ষাধিক ভারতীয় মহামনীষিগণের প্রভাব চীনের জাতীয় জীবনের সর্বত্র গভীর ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। ২২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত (বিশেষ করিয়া ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২৭৯ খ্রীঃ পর্যন্ত) কন্‌ফ্যুসিয়ানদিগের ও তাওয়িষ্টগণের আধ্যাত্মিক ভাবরাশির উপর ভারতীয় ভাবরাশির প্রভাব পড়িতে থাকে। অবশেষে উহা হইতে এক নূতন যুক্তি-বাদী দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। উহা চীনে "লি শিও" (Li-Hsio) নামে পরিচিত।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। চিন্‌ (২৬৫-৪২৩ খ্রীঃ) ও থাঙ্‌ (৬১৮-৯০৭ খ্রীঃ) বংশকালীন গদ্য ও পদ্যাদির এবং সুঙ্‌ (৯৬০-১২৭৯ খ্রীঃ) ও মিঙ্‌ (১৩৬৮-১৬৪৩ খ্রীঃ) রাজবংশকালীন দার্শনিক নিবন্ধাদির উপর ভারতীয় সাহিত্যের আশ্চর্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* *Vide*: *Fu-Tsu-Tung-Chi* (complete records of Buddhism) Section, 43; by *Sramana Chi-P'an.*

চিত্র ও স্থাপত্য বিদ্যার অনেক জিনিষ ভারত হইতে চীনে গিয়াছে, প্যাগোডা ও মূর্তিনির্মাণ, ফ্রেস্কো অঙ্কন চীন ভারত হইতে পাইয়াছে।

চীনের লেখ্য ভাষার উপরও ভারতীয় প্রভাব পড়িয়াছে। থাং রাজবংশকালীন এক বৌদ্ধ ভিক্ষু (Shou wen) চীন ভাষায় ৩৬টি বর্ণমালা প্রবর্তন করেন। ইহা একেবারে সংস্কৃত বর্ণমালা। ইহার দ্বারা চীন ভাষার ধ্বনি ও উচ্চারণাদিতে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সহস্রাধিক বর্ষ ব্যাপিয়া, নানা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করিয়া, ভারত হইতে চীনে যাইয়া যাঁহারা এইরূপ অলৌকিক কার্য সাধন করিলেন, ভারতের কোনোও গ্রন্থের কোথাও তাহার বা তাঁহাদের উল্লেখ মাত্রও নাই। ভারতের এই গৌরবের কথা কি কোনো ভারতীয় লিপিবদ্ধ করেন নাই? না সেই লিপিবদ্ধ গৌরব-কাহিনীও লুপ্ত হইয়া গেল?

এই অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ সংস্কৃত বা পালি সাহিত্যের কোথাও না থাকিলেও, সংস্কৃত সাহিত্যের বহু স্থানে চীন দেশ বা চীনজাতির উল্লেখ আছে।

এই সমস্ত গ্রন্থের কোনো কোনোখানা সম্ভবত বৌদ্ধ ধর্মের চীন অভিযানের পূর্বে; কিন্তু অধিকাংশই তাহার পরে রচিত।

প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে মহাভারতের বহু স্থানে চীন দেশ, চীন জাতি বা চীন দেশীয় দ্রব্যাদির কথা আছে। মনু-সংহিতার এক স্থানে চীনজাতির কথা আছে। রামায়ণে মাত্র এক স্থানে চীনজাতির কথা আছে।* কিন্তু উহাও আবার সব রামায়ণে পাওয়া যায় না।

মহাভারতের যেখানে যেখানে চীনের উল্লেখ আছে তাহা উদ্ধৃত হইল:—

সভাপর্বে অর্জুনের দিগ্বিজয় অভিযানে যখন ভগদত্তের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয়, তখন ভগদত্ত কিরাত ও চীন সৈন্য পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন:—স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষোঽভবৎ॥ ২।২৬।৯

উদ্যোগপর্বে দেখা যায়, ভগদত্ত দুর্যোধনকে যে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য দান করেন তাহার মধ্যে চীন সৈন্য ছিল।

ভগদত্তো মহীপালঃ সেনামক্ষৌহিণীং দদৌ
তস্য চীনৈঃ কিরাতৈশ্চ কাঞ্চনৈরিব সংবৃতম্
বভৌ বলমনাধৃষ্যং কর্ণিকারবনং যথা। ১৯.১৫-১৬

"মহারাজ ভগদত্ত এক অক্ষৌহিণী সৈন্য দান করেন। তাঁহার সেই সেনা চীন ও কিরাতের দ্বারা পরিবৃত হইয়া যেন স্বর্ণের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিল। উহা যেন কর্ণিকার পুষ্পের বনের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।"

এই শ্লোকে চীনগণের পীতবর্ণের অতি সুন্দর বর্ণনা রহিয়াছে। উদ্যোগপর্বের অন্যত্র চীনদেশীয় ঘোটকের কথা আছে:—

বাজিনাং চ সহস্রাণি চীনদেশোদ্ভবানি চ।৮৬।১০

ঐ পর্বের আরও এক স্থানে চীনের উল্লেখ আছে:—

অর্কজশ্চ বলীহানাং চীনানাং ধৌতমূলকঃ।* ৭৪।১৪

বনপর্বে দেখিতেছি চীনগণ হূণাদির সহিত যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন ও পরিবেষকের কার্য করিতেছেন।

হারহূণাংশ্চ চীনাংশ্চ তুষারান্ সৈন্ধবাং স্তথা
...অপ্রাক্ষমহমায়াতান্ যজ্ঞে তে পরিবেষকান্।৫১।২৫-২৬

—কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—"হার, হূন, চীন, তুষার ও সিন্ধুবাসিজনগণকে আমি তোমার যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া পরিবেষকের কার্য করিতে দেখিয়াছিলাম।"

ভীষ্মপর্বেও চীনগণের উল্লেখ আছে:—

তথৈব রমণাশ্চীনাস্তথা চ দশমালিকাঃ
ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্যশূদ্রকুলানি চ।৯।৬৬

কর্ণপর্বে রহিয়াছে:—

পাঞ্চালাংশ্চ বিদেহাংশ্চ কুলিন্দকাশিকোসলান্
সুহ্মানঙ্গাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ নিষাদান্ পুণ্ড্রচীনকান্।৮।১৯

চীন জাতির ও চীন দেশের সবিশেষ উল্লেখ যে-সব গ্রন্থে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে মহাভারত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু মহাভারতের সঠিক সময় জানা না যাওয়ায় ঠিক কতকাল পূর্ব হইতে ভারতের সহিত চীনের পরিচয় শুরু হয়, তাহাও জানিবার উপায় নাই।

মহাভারতের সঠিক সময় জানা না যাইলেও পণ্ডিতদের

* চীনানপরচীনাংশ্চ তুষারান্ বর্বরানপি।
কাঞ্চনৈঃ কমলৈশ্চৈব কাম্বোজানপি সংবৃতান্। রা, ৫।৪৪।১৪
Ramayana edited by Gaspare Gorresio, Paris, 1884.

* —"বলীহগণের অর্কজ, চীনগণের ধৌতমূলক—ইঁহারা ভূপতি বংশের কলঙ্ক স্বরূপ। ইঁহারা যুগান্তে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় জাতি ও বন্ধুবান্ধবগণকে এককালে উচ্ছিন্ন করিয়াছেন।"

চীনগণের ভূপতিকুলকলঙ্ক এই "ধৌতমূলক" কি কবির কল্পনামাত্র, না ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক কিছু আছে?

১১৫৪-১১২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এক অতি অত্যাচারী, কুপ্রসিদ্ধ চীন সম্রাটের নাম পাওয়া যায়। এই সম্রাট এত অত্যাচারী ছিলেন যে তাঁহার প্রজারা তাঁহাকে "চো" অর্থাৎ "ন্যায়ধ্বংসকারী" "মানবসমাজ-নাশক" উপাধি দিয়াছিল। এই সম্রাট যে-বংশে জন্মগ্রহণ করেন সেই বংশের নামের অর্থ "ধৌত" (washed)। "ধৌত মূল যাঁহার তিনি ধৌত-মূলক" এইভাবে এই সম্রাটকে "ধৌতমূলক" বলা যায়। প্রাচীন ভারতে ব্যক্তিগত নামের পরিবর্তে কুল বা বংশ ধরিয়া নামকরণ খুবই প্রচলিত ছিল। যথা—'কৌশিক', 'ভরদ্বাজ', 'কাশ্যপ', 'পাণ্ডব', 'কৌরব', 'রাঘব' ইত্যাদি।

মত এই যে, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক হইতে খ্রীষ্টপর চতুর্থ শতকের মধ্যে বর্তমান আকারের মহাভারত রচিত হইয়াছে।

সুতরাং বলা যাইতে পারে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক হইতে প্রথম খ্রীষ্টাব্দের (বৌদ্ধভিক্ষু কাশ্যপমাতঙ্গের সময়) মধ্যে চীনের সহিত ভারতের পরিচয় শুরু হয়। চীন সাহিত্যেও পাওয়া যায় যে চন্দ্রগুপ্তের সময় (৩১৫ বি. সি) ভারতের সহিত চীনের পরিচয় ছিল।

মহাভারতে দেখা যাইতেছে যে চীনগণ যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়ের স্থান লাভ করিয়া ভারতীয় ক্ষত্রিয়গণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। যজ্ঞে তাঁহারা নিমন্ত্রিত হইতেছেন। পরিবেষণও করিতেছেন।

কিন্তু মনুর সময় (অর্থাৎ বর্তমান মনু-সংহিতা রচনা-কালে) অথবা মনুর মতে, তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্ব গিয়া বৃষলত্ব (শূদ্রত্ব) প্রাপ্তি ঘটিয়াছে :

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ। ১০।৪৩-৪৪

—"ক্রিয়ালোপহেতু এবং ব্রাহ্মণের দর্শন না পাইয়া ইঁহারা বৃষল হইয়া গেলেন।"

ললিতবিস্তরে 'চীন-লিপি'র কথা আছে :—

অথ বোধিসত্ত্বঃ—বিশ্বামিত্রমাচার্যমেবমাহ। কতমাং ভো উপাধ্যায় লিপিং মে শিক্ষয়িষ্যসি। ব্রাহ্মীং খরোষ্টীম্ অঙ্গলিপিং বঙ্গলিপিং মগধ-লিপিং—চীনলিপিং হূণলিপিং—উপাধ্যায় চতুঃষষ্টিলিপীনাং কতমাং মাং ত্বং শিক্ষয়িষ্যসি। দশম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৪৪।

—বোধিসত্ত্ব আচার্য বিশ্বামিত্রকে প্রশ্ন করিলেন—"হে উপাধ্যায়, আপনি আমাকে কোন্ লিপি শিখাইবেন ? ব্রাহ্মীলিপি, খরোষ্টীলিপি, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, মগধলিপি—চীনলিপি, হূণলিপি, ইত্যাদি ৬৪ লিপির কোন্ লিপি আপনি আমাকে শিখাইবেন ?"

কথাসরিৎসাগরে 'চীনপিষ্ট' অর্থাৎ চীন-সিন্দূরের কথা আছে :—

চীনপিষ্টময়ো লোকশ্চারণৈকময়ী চ ভূঃ।
আনন্দময়্যাং সর্বস্তামপি তস্তামভূৎ পুরি ॥২৩।৮৫।

অত্থসালিনীতে (ধম্মসঙ্গনির অত্থকথা বা ভাষ্যতে) আছে :—

যাসাং বাসেন দিসাভাগা চীনপিট্ঠ চুন্নরঞ্জিতা—বিয় চ বিরোচিংসু। ৪১। (পালিটেক্‌ষ্ট সোসাইটি হইতে প্রকাশিত)।

অভিধানচিন্তামণিতে আছে—সিন্দূরং নাগজং নাগরক্তং-শৃঙ্গারভূষণং চীনপিষ্টং···॥৪।১২৭।

সুত্তনিপাতে ও বিষ্ণুপুরাণে চীনক শব্দ পাওয়া যায়। উহা এক প্রকার শস্য।

সামাকচিঙ্গুলকচীনকানি পত্তপ্ফলং মূলপ্ফলং গবিপ্ফলং।
ধম্মেন লদ্ধং সতমস্নমানা ন কামকামা অলিকং ভণন্তি ॥২।২।১।

সুত্তনিপাতের অত্থকথায় চীনক শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—অটবি পব্বতপাদেসু অরোপিত-জাতা চীনমুগ্গা। "বনে ও পর্বতের সানুদেশে আরোপিত উৎপন্ন চীন মুগ।"

ব্রীহয়শ্চ যবাশ্চৈব গোধূমা অণবস্তিলাঃ
প্রিয়ঙ্গবো হ্যদারাশ্চ কোরদূষাঃ সচীণকাঃ। বিষ্ণু, ১।৬।২১।

ভাবপ্রকাশে এক প্রকার শস্য অর্থে চীনাক শব্দ পাওয়া যায় :—

চীনাকঃ (চীনা)। চীনাকঃ কঙ্গুভেদোঽস্তি স জ্ঞেয়ঃ কঙ্গুবদ্ গুণৈঃ।
পূর্বখণ্ড, ১ম ভাগ, ধান্যবর্গ।

হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতে ও হেমাদ্রির চতুরঙ্গ-চিন্তামণিতে ঐরূপ এক প্রকার শস্য অর্থে চীণক শব্দ পাওয়া যায়।

চীণকস্তু কাককঙ্গুঃ। (কাকপ্রিয়া কঙ্গুঃ কাককঙ্গুঃ)
অভিধানচিন্তামণি, ৪।২৪৪

ইহা কোন্ শস্য ? চীনাবাদাম হবে কি ?

হরিবংশে, কালিদাসের শকুন্তলা, কুমারসম্ভবে চীনাংশুকের কথা আছে :—

সুবর্ণমালাকুলভূষিতাঙ্গাশ্চীনাংশুকাভূষিতভোগভাজঃ।
হরিবংশ, ১২৭৪৫ শ্লোক। (ভবিষ্যপর্ব, নারসিংহে, ৪৪ অধ্যায়)
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য। শকুন্তলা, ১ অঙ্ক
চীনাংশুকৈঃ কল্পিতকেতুমালম্। কুমার, ৭।৩

দশকুমারচরিতে চীনাম্বরের কথা আছে :—

কস্যচিৎ চূতপোতকস্য ছায়াশীতলে সৈকততলে গন্ধকুসুমহরিদ্রাক্ষত-চীনাম্বরাদিনা নানাবিধেন পরিমলদ্রব্যনিকরেণ মনোভবমর্চয়ন্তী রেমে।
পঞ্চম—উচ্ছ্বাস।

ভাবপ্রকাশে চীনকর্পূরের উল্লেখ আছে :—

চীনাকসংজ্ঞঃ কর্পূরঃ কফক্ষয়করঃ স্মৃতঃ।
কুষ্ঠকণ্ডূবমিহরস্তথা তিক্তরসশ্চ সঃ। পূর্বখণ্ড, প্রথম ভাগ, কর্পূরাদিবর্গ।

রাজনির্ঘণ্টে চীনকর্পূর, চীনাকর্কটী (চীনা কাঁকুড় ?) চীনজ (চীন লোহা), চীনবঙ্গ (সীসা) ইত্যাদির উল্লেখ আছে।

অমরকোষ (সিংহাদিবর্গ, ৯) অভিধানচিন্তামণি (৪।৩৬০) এই দুই কোষে 'চীন' এক প্রকার মৃগের নাম। উহার সহিত কি চীনের কোন সম্পর্ক আছে ?

সুশ্রুতে ক্ষতস্থানের নানা 'ব্যাণ্ডেজে'র মধ্যে চীনপট্টের উল্লেখ আছে :—

অত ঊর্ধ্বং ব্রণবন্ধনদ্রব্যাণ্যুপদেক্ষ্যামঃ। তদ্ যথা—
কার্পাসাবিকদুকূল-কৌশেয়-পত্রোর্ণ চীনপট্ট···ইত্যাদি। সূত্রস্থান, অ—১৮।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতার বহু স্থানে চীনের উল্লেখ আছে :—

গান্ধার-কাশ্মীর-পুলিন্দ-চীনান্
হতান্ বদেন্ মণ্ডলবর্ষমস্মিন্ ॥৫।৭৭

"আষাঢ় মাসে গ্রহণ হইলে কূপ, বপ্র, নদীপ্রবাহ, ফলমূলজীবী ব্যক্তি ও গান্ধার, কাশ্মীর, পুলিন্দ, চীন আদি দেশ বিনষ্ট হয় এবং দেবরাজ মণ্ডলবর্ষী হন।"

কাশ্মীরান্ সপুলিন্দচীনযবনান্ হন্যাৎ কুরুক্ষেত্রকান্ ।।৫।৭৮

"শ্রাবণ মাসে গ্রহণ হইলে, কাশ্মীর, পুলিন্দ, চীন, যবন, কুরুক্ষেত্র, গান্ধার ও মধ্যদেশ বিনষ্ট হয়।"

কাম্বোজ-চীন-যবনান্ সহ শল্যহৃদ্ভি-
বাহ্লীকসিন্ধুতটবাসিজনাংশ্চ হন্যাৎ ।।৫।৮০

"আশ্বিন মাসে গ্রহণ হইলে, কাম্বোজ, চীন, যবন, শল্যাপহারক, বাহ্লীক ও সিন্ধুনদের তটস্থ দেশবাসিজনগণ এবং আনর্ত ও পৌণ্ড্র-দেশবাসী চিকিৎসকগণ আর কিরাতগণ বিনষ্ট হয়।

সার্পে জলরুহসর্পাঃ পিত্র্যেৎ বাহ্লীকচীনগান্ধারাঃ। ১০।৭

—"অশ্লেষা নক্ষত্রে শনি থাকিলে পদ্ম ও সর্পের, এবং মঘা নক্ষত্রে শনি থাকিলে বাহ্লীক, চীন, গান্ধার, শূলিক, রত, বৈশ্য ধনাগার ও বণিকগণের বিঘ্ন হয়।"

ঐন্দ্রাগ্ন্যাখ্যে ত্রৈগর্ত-চীন-কৌলুত-কুঙ্কুমং লাক্ষা
সস্যান্যথ মাঞ্জিষ্ঠং কৌসুম্ভং চ ক্ষয়ং যাতি। ১০।১১।

—"বিশাখা নক্ষত্রে শনির বিচরণকালে, ত্রিগর্ত, চীন, এবং কুলুতদেশীয়, কুঙ্কুম, লাক্ষা, শস্য, মঞ্জিষ্ঠা ও কুসুম্ভের ক্ষয় হয়।"

উল্কাভিতাড়িতশিখঃ শিখী শিবঃ শিবতরোঽভিবৃষ্টো যঃ।,
অশুভঃ স এব চোলাবগাণসিতহূণ-চীনানাম্। ১১।৬১।

—"কেতুর শিখা উল্কার দ্বারা তাড়িত হইলে শুভ হয়। আর সর্বতোভাবে বৃষ্টিযুক্ত হইলে অতীব মঙ্গল হয়। কিন্তু উহাতেই আবার, চোল, অবগাণ, সিতহূণ ও চীন দেশের অমঙ্গল হয়।"

ব্রহ্মপুরদার্বডামরবনরাজ্যকিরাতচীনকৌণিন্দাঃ।১৪।৩০।
ব্রহ্মপুর, দার্বডামর, বনরাজ্য, কিরাত, চীন, কৌণিন্দ—প্রভৃতি দেশ ২৭।১।২ নক্ষত্রে অবস্থিত।

প্রাঙ নর্মদার্ধশোণোড্রবঙ্গসুহ্মাঃ কলিঙ্গবাহ্লীকাঃ
শকযবনমগধশবরপ্রাগ্‌জ্যোতিষচীনকাম্বোজাঃ। ১৬।১

নর্মদার পূর্বার্ধ, শোণ, উড্র, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ, বাহ্লীক, শক, যবন, মগধ, শবর, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, চীন, কাম্বোজ এই সমস্ত দেশ—এ তীক্ষ্ণ আরণ্য দ্রব্যগণের অধিপতি, সূর্য।

গিরিদুর্গপহ্লবশ্বেতহূণচোলাবগাণমরুচীনাঃ
প্রত্যন্ত ধনিমহেচ্ছব্যবসায়পরাক্রমোপেতাঃ। ১৬।৩৮।

"গিরিদুর্গ, পহ্লব, শ্বেতহূণ, চোল, অবগাণ, মরু, চীন, প্রত্যন্তদেশ, ধনী, মহেচ্ছব্যবসায়ী; পরাক্রমযুক্ত…কেতুর অধীন বলিয়া বিখ্যাত।"

শক্তিসংগমতন্ত্রে চীন দেশের এইরূপ বর্ণনা আছে:—

কাশ্মীরন্ত সমারভ্য কামরূপাত্ত পশ্চিমঃ
ভোটান্তদেশো দেবেশি। মানসেশাচ্চ দক্ষিণে
মানসেশাদ্দক্ষ পূর্বে চীনদেশঃ প্রকীর্তিতঃ।

"চীনাচারপ্রয়োগবিধি" ও "মহাচীনাচারতন্ত্র" নামে দুইখান তন্ত্রগ্রন্থও পাওয়া যায়।

সংস্কৃতসাহিত্যে চীনদেশ বা চীনজাতি সম্বন্ধে যে-সব স্থানে কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার অনেকাংশই উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু ঐ উদ্ধৃত পাঠ হইতে চীনজাতি বা চীনদেশ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। চীন ও ভারতের সম্পর্ক কিরূপ ছিল তাহাও উহা হইতে বুঝিবার উপায় নাই।

উভয় দেশের মধ্যে সহস্র বর্ষব্যাপী যে-সম্প্রীতি ও সৌহার্দের সম্বন্ধ বর্তমান ছিল, তাহা একমাত্র চীনের সাহিত্য ও ইতিহাস হইতেই জানা যায়।

সেই সহস্র বর্ষব্যাপী প্রীতির বন্ধন, যাহা গত সহস্র বর্ষ যাবৎ ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা এ যুগে এই উভয় দেশের দুই কৃতী সন্তানের দ্বারা পুনরায় সংস্থাপিত হইয়াছে। ইঁহাদের একজন জগদ্বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যজন অধ্যাপক তান-য়ুন-সেন।

ইঁহাদের উভয়ের উদ্যোগে নালন্দা ও বিক্রমশীলার ন্যায় বিশ্বভারতীতে চীন-ভবন নামক বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হইয়াছে।

যে অমূল্য সম্পদ এক দিন কুমারজীব, হুয়েনসঙ প্রভৃতি জ্ঞানতাপসগণ ভারত হইতে চীন দেশে বহিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আজ তাহা পুনরায় চীনের নিজস্ব জ্ঞানরত্নরাজিসহ ভারতে আনীত হইয়াছে। ইহা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

এই উভয় দেশের যে-সম্পদ চীন-ভবনে রক্ষিত হইয়াছে, আজ তাহা পৃথিবীর অন্যত্র, এমন কি চীনেও অপ্রাপ্য।

এখন এই উভয় দেশের জ্ঞানাকাঙ্ক্ষিগণ চীন-ভবনে সম্মিলিত হইতেছেন। কেবল এই উভয় দেশের নহে, তিব্বত, শ্যাম, সিংহল প্রভৃতি এসিয়ার অন্যান্য প্রদেশের বিদ্যার্থিগণেরও এখানে সমাগম হইতেছে।

বর্তমান চীনের কর্ণধার, নেতা, তথা শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্, ধর্মগুরু আদি বহু প্রতিনিধিস্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই বিদ্যাপীঠে আগমন করিয়া ভারত ও চীনের এই মিলন প্রচেষ্টায় অন্তরের আগ্রহ ব্যক্ত করিয়াছেন।

তাঁহারা তাঁহাদের সৌজন্যে, আলাপে, আচরণে, ব্যবহারে, এমন কি প্রতি অঙ্গবিক্ষেপে ভারতবাসীর অন্তরে চীনের অপূর্ব সংস্কৃতির ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন।

মায়াজাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

১

পুরাতন বাড়ির চারি পাশে—পড়ো ভিটার বনে এই বাড়িখানিও হয় ত মানাইত ভাল। কিন্তু নূতন বড়-লোকের পক্ষে পাড়াগাঁর মধ্যে অপ্রচারিত অবস্থায় থাকা যেমন পীড়াদায়ক—এই বাড়িখানির সুসংস্কৃত ও বর্দ্ধিতায়ন দেহ-সৌন্দর্য্য তেমনই চারি পাশের অযত্নবর্দ্ধিত জঙ্গলমধ্যে আর আত্মগোপন করিতে পারিতেছে না। সীমানার খাটো প্রাচীর অনেকখানি মাথা উঁচু করিয়াছে; প্রাচীরের ওপিঠে গুল্মঘেরা বন আর দেখা যায় না। সিং-দরজার মাথা খানিকটা ছাঁটিয়া ফেলিলেও—সুসংস্কৃত হইয়াছে; ভিতরে ঠাকুরদালান তৈয়ারী না হইলেও—সদর দরজার মর্য্যাদা তাহার দেহানুপাতে বোঝা যাইতেছে। আর সঙ্কীর্ণ হইয়াছে বাড়ির উঠান। ভাগ বাঁটোয়ারার দ্বারা নহে, মানুষের অসাচ্ছল্যের দিনে যাহার বৃদ্ধি—সাচ্ছল্যের প্রসাদে তাহাকে সঙ্কুচিত হইতে হইয়াছে। সেই বহু পুরাতন পাতলা ইষ্টক-গ্রথিত অর্দ্ধভগ্ন ঘর দু'খানির কোলে ফালি রোয়াকটুকুর অস্তিত্ব আর নাই; উত্তর সীমানা আরও বিস্তৃত হইয়া—উপর নীচে দৈর্ঘ্য-প্রস্থযুক্ত বহু দরজা-জানালা-সমন্বিত আধুনিক স্বাস্থ্যানুমোদিত ছয়খানি ঘর উঠিয়াছে। উইপোকার ভয় কাটাইবার জন্য কাঠের কড়ি সেই সব ঘরে দেওয়া হয় নাই। ছাদের উপর বুক সমান উঁচু আলিসা হইয়াছে। সে আলিসার জাফ্‌রি-কাটা সৌন্দর্য্য—ওই বনসীমা ভেদ করিয়া পথের লোকের দৃষ্টিকেও ক্ষণেকের জন্য আকর্ষণ করে। পাঁচ হাত চওড়া বারান্দার উঠান হইয়াছে সঙ্কীর্ণ। আম-কাঁঠালের গাছ-গুলিকে নির্ম্মূল করা হয় নাই, তবে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন তাহাদের সর্ব্ব অঙ্গে সুপ্রকট। বাড়ির ছেলেরা শীত কালের দিনে ঘুড়ি উড়াইবার সময় প্রায়ই অনুযোগ করে! দ্বিতলের ছাদে উঠিলেই বা নিস্তার কোথায়! অট্টালিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়া গাছগুলিও দুরন্তপনায় উর্দ্ধে শাখা-প্রশাখা মেলিতেছে। গাছের ডালে ঘুড়ি আটকাইয়া বালকদের ক্রীড়া-আনন্দে প্রায়ই বিভ্রাট বাধায়। কেনা বাড়িটার সঙ্গে এ বাড়ির এমন অদ্ভুত যোগসাধন হইয়াছে যে আগেকার পৃথকত্ব কল্পনাতেও আনা দুষ্কর। নূতন ইঁদারা, রান্নাঘর ও গোয়ালঘর দুই বাড়ির মাঝখানকার ব্যবধান ঘুচাইয়া অখণ্ড এক বাড়ির অস্তিত্বই ঘোষণা করিতেছে। গৃহস্থের বাড়ি এখন বড়লোকের প্রাসাদের কৈশোর সীমায় সবেমাত্র পদার্পণ করিল বুঝি।

তিনটি ঘরের মাঝখানে সিঁড়িটা না করিয়া একেবারে প্রান্তদেশে তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সিঁড়ির এমন মজবুত গঠন-নৈপুণ্য যে, আরও দু'টি তলা উঠিলেও সিঁড়িরও উর্দ্ধগামী হইবার বাধা নাই। ঘোরানো সিঁড়ি—খিলানের উপর চার-পাঁচটি ধাপ লইয়া পূর্ব্ব হইতে উত্তরে ফিরিয়াছে, উত্তর হইতে পশ্চিম ও সেখান হইতে দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া পুনরায় পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াছে। সিঁড়ির মাথায় ছোট একখানি ঘর—নির্জ্জন। নির্জ্জন বলিয়াই জপতপ বা পূজার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। সেই সিঁড়ি উপরে উঠিলে অনেকখানি আকাশের সঙ্গে অনেক-খানি গ্রামাংশ চোখে পড়ে। সেই ছাদে আলো ও বাতাসের দাক্ষিণ্য অবারিত। মনও সেই খোলা পরিবেশে অনেকখানি প্রসারিত হইয়া যায়।

বাড়িখানার রং গৈরিক অর্থাৎ এলামাটির প্রলেপে সে গৈরিক বসনে দেহ ঢাকিয়াছে। ঘরগুলির অভ্যন্তরে কলিচূণের গোলা দেওয়া। সাদা রঙে বকপাখীর পালকের মত সেগুলি ধবধবে। এবং সেখানে যাঁহারা বাস করেন—তাঁহাদের মনে না গৈরিক—না শুভ্র রঙের ছোপ লাগিয়াছে। সবুজ আর লাল রঙের মিশ্রণে তাঁহারা সংসারকে সুচারু করিয়া সাজাইতেছেন। তবু চিলে-কোঠার ঘরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলে ও ফুল-চন্দন-ধূপ-ধুনার গন্ধ বাহির হইলে—বাহিরের গৈরিক রঙের সঙ্গে তাহার মিতালী গাঢ়তর হয়। অতিথি-অভ্যাগত বা দুঃস্থদের সেবায় তৎপর হইলে সাদা রঙের ছায়াও তার মাঝে খেলিয়া যায় বইকি। সাতটি রঙ লইয়া সংসার রচনা চলিতেছে; এ বাড়িতেও তার ব্যতিক্রম নাই।

তবু সংসারে রঙের পরিবর্ত্তন নিত্য দেখা যায়। সময়ের পরিবর্ত্তনে যে রঙ বদলায় এমন নহে, তবে সময়ের চিহ্ন দেহের চেয়ে মনেই লাগিয়া থাকে অধিকক্ষণ, এবং তার প্রসাদে দেহেরও পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষীভূত হয়।

সেদিনের বালিকা বধূর সশঙ্কিত দৃষ্টি ও দ্বিধাজড়িত চলন আজ অতীতের রূপকথা। সেদিনের বধূ আজ আধ-নিমীলিত চক্ষু তুলিয়া অগাধ বিস্ময়ের সঙ্গে প্রিয়-পরিজনের পানে চাহিয়া শ্রদ্ধা বা প্রেমের অনুভূতিতে বিগলিত হইয়া পড়ে না। সেই দিনের সঙ্কোচ সুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে বুঝি! যোগমায়ার কণ্ঠে মিনতির পরিবর্ত্তে কর্ত্তৃত্বের সুরই বাজে আজকাল। বধূ-জীবনের যবনিকাখানি খসিয়া গিয়া গৃহিণী-জীবনের পটোত্তোলন সুরু হইয়াছে। সেই উত্তোলিত পটের মাঝখানে বাড়ির চেহারা বদলাইয়াছে, বধূর মন ও দেহ বদলাইয়াছে, বদলাইয়াছে শাসন-কর্ত্তৃত্বের পটভূমিকা।

প্রাতঃকাল। অগ্রহায়ণের শেষ। নবান্ন শেষ হইয়াছে, বড়ি দেওয়া চলিতেছে। নবান্নের দিনে প্রথম দেওয়া বড়িগুলি এখনও ভাল করিয়া শুকায় নাই। চটের উপর হইতে বড় বড় কুমড়া-বড়িগুলি তুলিয়া উল্টাইয়া রোদে দেওয়া চলিতেছে প্রত্যহ; সেই সঙ্গে নানা প্রকারের ভাজা বড়ি, অম্বলের বড়ি, ছোট, মাঝারি, বড় বড়ি দেওয়া চলিতেছে। শাশুড়ী বুড়া হইয়া পড়িয়াছেন। তবু একবার ছাদে আসিয়া বসেন। রোদ-পোহানো ও বড়ি-আগলানো দু'টি কাজই হয়। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে, দশ হাত দূরের বস্তু ধোঁয়া ধোঁয়া দেখেন, এবং ধোঁয়া দেখেন বলিয়াই শুচিতা সম্বন্ধে সারা চিত্ত তাঁহার বেশি করিয়া সচেতন হইয়াছে। নীচেয় থাকিলে অনর্গল বকুনির সঙ্গে —আচার-বিচারের বিধিনিষেধ ব্যাখ্যাত হইতে থাকে। বড়ি আগলাইবার ছুতায় যোগমায়া তাঁহাকে ছাদে তুলিয়া দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। তবু ছাদে উঠিয়াই কি নিস্তার আছে! বলেন, ছাদটা ভাল ক'রে ধুয়ে দিয়েছ ত বউ মা? যে বাঁদরের উৎপাত! ছেলেরা আসছে আসছেই। একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে—

যোগমায়া বলে, হাঁ মা, আপনি বরঞ্চ ঠ্যাঙ্গা হাতে ক'রে ঐ দিকটায় বসুন। রোদও পাবেন।

শুকনা সজিনার ডাল মাঝে মাঝে ছাদের উপর ঠুকিয়া তিনি বলেন, যত রাজ্যের পায়রা বাসা বেঁধেছে দালানে। তা বাঁধুক, মানুষের ভাল সময়ে ওরা বাসা বাঁধে। শালিক ছাতারের উৎপাতই কি কম! মানুষকে থুয়ে খেতে দেয় না। হাঁ বউমা, সজনে গাছে এবার কুঁড়ি ধরেছে তো? গেলবারে মাঘ মাসের ঝড়ে আর জলে সব ফুল ঝরে—একটিও ডাঁটা বাঁধতে দেয় নি।

এমনি অনেক কথা—উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া তিনি বলেন। সংসারের কর্ত্তৃত্ব করে যোগমায়া, নির্দ্দেশ দেন শাশুড়ী। এখনও বড় সিন্দুকের চাবিটা তাঁহার কোমরের ঘুন্সীর সঙ্গে বাঁধা। এখনও ছোট কাঠের বাক্সের চাবি খুলিয়া তিনি সংসার-খরচের টাকা-পয়সা বাহির করিয়া দেন। পূজার সঙ্কল্প তাঁহার নামেই হয়। এখনও বাগানে শুক্‌না কাঠ ভাঙিবার শব্দ কানে পৌঁছাইলে—যথাসম্ভব গলা চড়াইয়া হাঁকেন, কে র‍্যা, কাঠ ভাঙে কে?

নাতি-নাতিনীরা বুড়িকে কিছু জ্বালাতন করে। তবে সংখ্যায় তাহারা বেশি নহে বলিয়া যোগমায়াকে সর্ব্বক্ষণ অনুযোগ-অভিযোগের ভারে প্রপীড়িতা হইতে হয় না। বিমল বড় হইয়াছে, এইবার তাহার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা দেওয়া হইবে। মেজ হৃষীকেশ বাপের প্রিয় বলিয়া পিতার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মক্ষেত্রে থাকে। রামচন্দ্র পদমর্য্যাদায় কিছু বাড়িয়াছে, কাজেই যোগমায়া বাসায় না থাকিলেও—ঠাকুর চাকরে মিলিয়া সেখানকার শৃঙ্খলা বিধান করিয়া থাকে। বাড়ি হইতে যতখানি স্নেহ ও সতর্কতা দেওয়া চলে—তাহা যোগমায়া আর শাশুড়ী মিলিয়া পত্রযোগে পাঠাইয়া দেন। লোক মারফৎ বড়ি, ঘি, আনাজপাতিও মধ্যে মধ্যে প্রেরিত হয়। বাড়ি আসিলে রামচন্দ্র ঠাকুরের রন্ধন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করে। লুচি, পোলাও, মাংস, দুধ সব কয়টি পুষ্টিকর খাদ্য যে প্রায়ই তাহাদের জোটে সে-কথাও বার বার বলিয়া থাকে, তবু ছেলের গায়ে হাত দিয়া মায়েরা বলেন, (কেহ প্রকাশ্যে —কেহ বা মনে মনে) পোড়া কপাল, এই বুঝি তোদের ভাল খাওয়া? দিন দিন কি ছিরিই যে হচ্ছে!

প্রতিবাদ করা বৃথা জানিয়া উহারা মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে।

নাতিনীটি ছোট বলিয়া বেশি অসাবধান। প্রায়ই পাড়া-বেড়ানো কাপড়ে ঠাকুরমাকে ছুঁইয়া ফেলে। না ছুঁইলেও গায়ে কাপড়ের বাতাস লাগাইয়া বিভ্রাট বাধায়। আর কুচা কুচা যে দু'টি ছেলেমেয়ে এ বাড়িতে আছে—তাহারাও দুষ্টামিতে গৌরীর চেয়ে কোন অংশে কম নহে। তাহারা যোগমায়ার রক্তসম্পর্কীয় কেহ নহে, অথচ এ সংসারে তাহাদের মূল্য অস্বীকার করা চলে না।

গহনা বাঁধা দিয়া একদা যে বাড়িখানি যোগমায়ার শাশুড়ী কিনিয়াছিলেন, এবং যাহা অধুনা এই বাড়ির অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে—ইহারা সেই বাড়ির সম্পর্কীয়। যোগমায়ার জ্যেঠ্ শশুর বহুদিন হইল পরলোকগমন

করিয়াছেন। কয়েক বছর পরে পালিত বোনপোটিও এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছে। নাবালকের বিষয় বিধবা রক্ষা করিতে পারে নাই। প্রায় সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া উহাদের হাত ধরিয়া আজ বছর দুই হইল—সে এ-বাড়ি আশ্রয় করিয়াছে। যোগমায়া ত ইহাদের পাইয়া বর্ত্তাইয়া গিয়াছে। শাশুড়ীও অসন্তুষ্ট নহেন। তবু তিনি যে খুব প্রসন্নও নহেন—সে কথা পাকেপ্রকারে প্রায়ই বলিয়া থাকেন। পরের সংসারে পরের নাকি মমতা হয় না। যে বউ নিজের বিষয় রক্ষা করিতে পারিল না, তাহার লক্ষ্মীশ্রী সম্বন্ধে শাশুড়ী যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেন।

সত্য কথা বলিতে কি বউটি কিছু অগোছালো। কেমন এলোমেলো ভাব। না জানে ছেলেমেয়ের যত্ন করিতে, না পারে সংসারের কাজ গুছাইয়া করিতে। বাসন মাজিতে বসিয়া বাসনই সে মাজিতে থাকে, যেন সারাদিনভোর এই কাজ ছাড়া আর কিছুই সে করিবে না। উঠান ঝাঁট দিবার পর এখানে-ওখানে পাতা কুটা ইত্যাদি দেখা যায়, এবং গোবরজল ছড়ানোতেও বিশৃঙ্খলার একশেষ। যোগমায়ার তিরস্কার সহিয়া সে হাসিমুখে বলে, দিদি, আজ কিন্তু আমি নিরামিষ রাঁধব।

যোগমায়া বলে, হাঁ, তা হ'লেই মার খাওয়া হবে 'খন। আলোচালের ভাত তুমি পিণ্ডি ক'রে রাঁধবে।

সুহাস বলে, তাই বলে শিখব না? তুমি আঁশ-নিরামিষ দুটো হেঁসেল নিয়ে যা নাকাল হও?

কি করি ভাই—আমার অদৃষ্ট।

সুহাস বলে, কি জান দিদি, ঝাঁটপাট দেওয়া কি বাসন-কোসন মাজা ও সব মুনিষ-জন করতো—শাশুড়ী আমায় কিছুটি করতে দিতেন না। খালি ধান সেদ্ধ করা আর ধান শুকোনো।

এই প্রসঙ্গে জমি-জমার কথা আসিয়া পড়ে। যোগমায়া বলে, তা হাঁ রে—তুই এমনও বোকা! কালনায় রেজেস্টেরী আপিসে গিয়ে সই দিয়ে এলি? বললি—জমি আমি স্বেচ্ছায় বিক্রী করছি।

কি করব দিদি। উনি মারা গেলেন, চাষা গাঁ—এমন একঘর লোক পেলাম না যে পরামর্শ করি। ভাই এল। বললে, দিদি, সই না দিলে নাবালকের বিষয় আমি দেখতে পারব না। আরও কত কি বোঝালে—ছাই মনেও থাকে না।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল, তা দেবোত্তর যে বিষয় আছে—

সুহাস বলিল, সে ত ছেলে সাবালক না হ'লে পাব না। এখন তারা অছি—তারাই দেবসেবা করবে আর বিষয় ভোগ করবে।

তা কাজকর্ম্মগুলো একটু মন দিয়ে শেখ ভাই। তোমারও ত ছেলেমেয়ে বড় হবে—সংসারধর্ম্ম করতে হবে।

সুহাস হাসিয়া বলিল, আর তুমিও যেমন দিদি, ওরা যদি বাঁচে তবেই ত।

ষাট—ষাট! ও কি অলক্ষুণে কথা! মা হয়ে এমন কথা তুই ভাবতেও পারিস!

না ভেবে উপায় কি দিদি। আমার যে কপাল খারাপ। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া সুহাস ইঁদারা তলায় চলিয়া গেল।

যোগমায়া আপন মনে বলিল, আহা, নিজের সংসার ভেসে গেছে বলে—আবাগীর সংসারে আর যত্ন-আত্তি নেই। ভগবান ওর ভাল করুন।

নূতন বড়ি দেওয়া হইতেছিল। শাশুড়ী ঠেঙ্গা হাতে ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ও গুলো কি বড়ি বউমা?

তিলে বড়ি। আপনি ভাজা বড়ি খেতে ভালবাসেন—তাই—

পোড়া কপাল! আর কি দাঁতের জুত আছে যে ভাজা বড়ি চিবুবো! হাত দিয়ে গুঁড়িয়ে—পাকলে পাকলে—তা হাঁ বউমা, শহরে নাকি আজকাল দাঁত বাঁধানো হয়েছে? ঠিক্ সত্যিকারের দাঁতের মত ছোলা মটর চিবিয়ে খায় লোকে?

শুনতে ত পাই। আপনি কি বাঁধাবেন?

পোড়া কপাল! কোন্ মড়ার খুলি থেকে খুলে এনে বসিয়ে দেবে—ওয়াক্ থু—

যোগমায়া বলিল, মানুষের দাঁত কেন হবে, শুনেছি পাথরের দাঁত।

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়া তিনি বলিলেন, তুমিও যেমন—পাথরের দাঁত নাকি আবার হয়! ওই বলে—না হ'লে মানুষ কিনবে কেন। দাঁত প'রে বুড়ো বয়সে জাতজন্ম খোয়াই আর কি! একটু থামিয়া বলিলেন, বেশি দিন থাকলেই ভুগতে হয়। রথছড়ৎ সবই যায়। বেহাই-বেয়ান ভাগ্যিমানী ছিলেন—ড্যাংডেঙিয়ে কবে চলে গেছেন। আমি মহা পাপিনী—আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে ব'সে আছি। যম বোধ হয় ভুলে গেছেন—বউমা।

ও কথা বলবেন না, মা, আপনি আছেন—পাহাড়ের আড়ালে আছি।

থেকে ত সব কর্ম্মই কচ্ছি মা। কুটোটি ভেঙে উবগার নেই। একটু স্বর নামাইয়া বলিলেন, ও পারের বউ কিছু করে—না খালি থ্যাতাং থ্যাতাং ক'রে বেড়ায়? ছেলে-গুলোকে একটু সহবৎ শেখায় না। মাগো, খালি সত্যিক জাত ছুঁয়ে ঘর-দুয়োর নৈনেত্য করছে।

শোকাতাপা মানুষ—শুনলে দুঃখ পাবে মা।

শোকাতাপা কে নয় মা। এক-কুড়ির কিছু বেশি বয়সে বিধবা হলাম—মাথার ওপর কেউ ছিল না। মানুষ করি নি নাবালক ছেলে? না বিয়ে দিই নি মেয়ের?

আপনাদের সঙ্গে কার তুলনা বলুন।

না মা, আমাদের সোনার কালের তুলনা আলাদা। এই ত তুমিও সতীকন্যে ঘর-দুয়োর কেমন গুছিয়ে করছ। যাকে যা ভক্তিছেদ্দা করবার—যা রাখবার ঢাকবার—লোক লোকুতো—আচার-ব্যাভার—সবই ত মানিয়ে করছ। ওদের ধারাই ওই। রেঢ়ো লোক—খালি ধান সেদ্ধ ছাড়া আর কিছু পারে না।

বড়ি দেওয়া শেষ করিয়া যোগমায়া নামিয়া আসিল। এইবার উনান জ্বালিয়া রান্না চাপাইতে হইবে।

বাহির হইতে কে হাঁকিল, টেলিগ্রাম আছে গো মা-ঠাকরুণ—টেলিগ্রাম। যোগমায়া দেবী।

রান্নাঘরের রোয়াকে দাঁড়াইয়াই যোগমায়ার আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। শীত পড়িয়া অবধি প্রত্যহ দুপুর বেলা কয়েকটি দাঁড়কাক উঠানে-রক্ষিত বাসনের উপর বসিয়া ভুক্তাবশিষ্ট, ডাঁটার ছিবড়া ভাত ইত্যাদি খাইবার কালে যে কর্কশ কা-কা ধ্বনি করে তাহাতেও প্রাণে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি হয় না। মাঝরাত্রিতে ঘুম ভাঙিয়া গেলে—কায়েতদের পড়ো ভিটায় কালপেঁচার ডাক শোনা যায়—সে ধ্বনিও কম অমঙ্গলজনক নহে। এ নাকি গাঁয়ে মড়ক আসিবার পূর্ব্ব লক্ষণ। ঢেলা ছুড়িয়াও পাখীটাকে তাড়ানো যাইতেছে না।

শাশুড়ী বলেন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় অমনি কালপেঁচা ডাকত; এক দিন নয়, দু-দিন নয়—দু'টি মাস ধ'রে। পর পর অজন্মা হ'ল—লোক মরে কুড় উঠে গেল। গভীর রাত্রিতে কালপেঁচার সেই অমঙ্গলসূচক তীব্র ধ্বনিও যোগমায়াকে এতটা বিচঞ্চল করিয়া তুলে না—অশুভ বার্ত্তাবাহী পিওনের কণ্ঠস্বর যেমন বুকের মাঝে বিঁধিয়া গেল।

সহি দিয়া লাল খামখানি যোগমায়া তুলিয়া লইল। ইংরেজী সে জানে না, অথচ ওই টানা টানা দুর্ব্বোধ্য অক্ষরগুলির পানে চাহিয়া প্রাণ তাহার আকুল হইয়া উঠিল।

সুহাস বলিল, কি লিখেছেন বউঠাকুর?

চিঠি নয়—টেলিগেরাম। কম্পিতকণ্ঠে যোগমায়া বলিল।

টেলিগ্রামের গুরুত্ব সুহাস বুঝে না। কহিল, তা পড় না।

অকস্মাৎ যোগমায়ার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। টেলিগ্রামের গুরুত্ব যে বোঝে না—তাহার উপর রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। ঈষৎ ঝাঁজালো কণ্ঠে সে কহিল, ইংরেজি লেখা আমি পড়তে পারি! দেখ্—তুই যদি পারিস।

যোগমায়ার এই ঝাঁজালো উক্তিতে সুহাস বিস্মিত হইল। মুখের হাসি তাহার মিলাইল, আমৃতা-আমৃতা করিয়া কহিল, তা বিমলকে দিয়ে—

ক্রুদ্ধস্বরেই যোগমায়া বলিল, একজামিন দিয়ে ছেলে ধিঙ্গী সেজে বেড়াচ্ছেন! আর কি চুলের টিকি দেখবার জো আছে। কে রইলো—কে মলো—, আবার শিহরিয়া সে জিব কাটিয়া দেবতার নাম উচ্চারণ করিল। দু'টি চোখের কোলে জলরেখা চক্ চক্ করিয়া উঠিল।

সুহাস ডাকিল, ওরে রঘু—রঘু তোর দাদাকে একবার ডেকে নিয়ে আয় তো। শীগ্‌গির।

রঘু, লক্ষ্মী ও গৌরী তিন জনেই কলরব করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে বিমলের দু'টি হাত ও কাপড়ের প্রান্তভাগ ধরিয়া টানিতে টানিতে তেমনই কোলাহল করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল:

—আমি আগে ধরেছি মা।

—ইস্, আমি আগে নয়?

—তা বই কি, আমিই ত বললাম—দাদা ছুতোর বাড়ি বসে আছে। বলি নি?

যোগমায়ার গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া ছেলেদের কোলাহল স্তব্ধ হইয়া গেল। হাত বাড়াইয়া টেলিগ্রাম-খানা বিমলের দিকে আগাইয়া দিয়া যোগমায়া বলিল, পড় দেখি—খোকা।

বিমল নিঃশব্দে পড়িতে লাগিল। পড়িয়া অর্থ বুঝিল বলিয়াই সে চুপ করিয়া রহিল। মুখখানি তাহার শুকাইয়া গেল।

অধীর কণ্ঠে যোগমায়া বলিল, কি লিখেছে—খোকা বল্ না?

শুষ্ককণ্ঠে বিমল বলিল, হৃষীকেশের অসুখ—খুব শক্ত অসুখ।

অসুখ! দ্বিতীয় কথা উচ্চারণ করিবার সামর্থ্য যোগমায়ার রহিল না। দেওয়ালটা না ধরিয়া ফেলিলে সে হয়ত টলিয়া রোয়াক হইতে উঠানের উপরেই পড়িয়া যাইত।

বিমল মায়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া কহিল, তুমি কাঁপছ—মা।

বসিয়া পড়িয়াই যোগমায়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। প্রিয়-বিয়োগ বেদনার তীব্রতা এই মুহূর্ত্তে সে অনুভব করিতেছে যেন। প্রাণের ভিতর এমন হু হু করে কেন? কি যেন হারাইয়াছে, মাথা খুঁড়িয়া রক্তগঙ্গা হইলেও সে নিধি আর খুঁজিয়া মিলিবে না।

পড়িয়া রহিল রন্ধনের আয়োজন। যাত্রার আয়োজন যোগমায়াকে করিতে হইল। বিমল সঙ্গী হইবে। বাঁকুড়া আর কতটুকু পথ! একবার রাণাঘাট আর একবার হাওড়ায় গাড়ি বদল করিতে হইবে। অতটুকু ছেলে বিমল পারিবে ত তাহাকে লইয়া যাইতে? কেন পারিবে না? না লইয়া গেলে যে যোগমায়ার সর্ব্বস্ব যায়। ঘরের মটকায় আগুন ধরিলে প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টাই মানুষের সর্ব্বপ্রথম জাগে, ধন-সম্পদের কথা ভাবিয়া আকুল হইবার সময় ত সে নহে!

অশ্রুর সঙ্গে আহারের প্রতিকূল সম্বন্ধ। শাশুড়ী ও জায়ের অনুরোধে—বুক ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে চাহিলেও—হাতের মুঠায় অন্নের পিণ্ড মুখের মধ্যে ভরিতে হইল। শুভযাত্রার যত কিছু আয়োজন—হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া শাশুড়ীই সম্পন্ন করিলেন। তিনি অভয় দিলেন, কাঁদিলেন, এবং 'তার' করিয়া সংবাদ জানাইবার পুনঃ পুনঃ অনুরোধের মধ্যে 'দুর্গা শ্রীহরি' ধ্বনিও উচ্চারণ করিলেন। ঘড় ঘড় করিয়া ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ দূরে মিলাইয়া গেল। মধ্যরাত্রির কালপেঁচা বা দুপুর বেলাকার দাঁড়কাকের ধ্বনির মতই সেই শব্দ অশুভ ইঙ্গিতই করিয়া গেল বুঝি।

'তার' আসিল না, সপ্তাহ পরে রামচন্দ্র সস্ত্রীক ফিরিয়া আসিল। ঘড় ঘড় শব্দে ঘোড়ার গাড়ি আবার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। রামচন্দ্রের হাত ধরিয়া নামিল বিমল, পিছনে অবগুণ্ঠনবতী যোগমায়া। এক রাশ জিনিস পত্র গাড়ির মাথা হইতে নামিল, নামিল না শুধু হৃষীকেশ।

বাড়ির উঠানে আছড়াইয়া পড়িয়া যোগমায়া বুকভাঙা কণ্ঠে ডাকিল, মা—গো।

শাশুড়ী বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, আমার সোনার ঋষিকে কোথায় রেখে এলে গো—বউমা।

২

কয়েক দিন পরে।

রামচন্দ্র বলিল, না খেয়ে আর কত দিন কাটাবে মায়া!

যোগমায়া বলিল, অনেক খেয়েছি আমি—আর আমায় খাবার কথা বলো না গো।

তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে রামচন্দ্র বলিল, আমাদের কর্ম্মফল মায়া। নইলে—

যোগমায়া বলিল, কেন আমাদের কর্ম্মফলে ও চলে গেল।

কার কর্ম্মফলে কে চলে যায়—আমরা কি বুঝবো মায়া। ভগবান শঙ্করের একটা গল্প মনে পড়লো। শঙ্করের ইচ্ছা হ'ল নদীতে নাইবেন, মা কিছুতেই যেতে দেবেন না। নদীতে কুমীর আছে, ছেলের ফাঁড়ার কথা মা জানেন। কিছুতেই তিনি শঙ্করকে ছাড়বেন না। শঙ্কর তখন মাকে বোঝালেন, মা মৃত্যুর কথা ভেবে কেন তুমি কাঁদছ? আমাদের প্রতিদিনকার মৃত্যু যা চোখের সামনে ঘটছে দিনরাত—তা ত কই দেখেও দেখছ না! ছেলেবেলায় তোমার কোলে শুয়ে যখন খেলা করেছি—তখনকার সেই কোমল শিশুদেহের সঙ্গে—আজকের এই বয়ঃপ্রাপ্ত কঠিন দেহের তুলনা কর দেখি। সেই কোমল দেহের মৃত্যু কোন্ কালে হয়েছে। আজ ইচ্ছে করলেও আমার এই দেহ নিয়ে তুমি তেমনি কোলে শুইয়ে আদর করতে পার না। সুতরাং কত বার আমাদের এই নশ্বর দেহের মৃত্যুই যে চোখের উপর ঘটছে।

যোগমায়া তাহাতে সান্ত্বনা লাভ করিল কি না, কে জানে—নিস্পন্দের মত রামচন্দ্রের বুকে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

তত্ত্বকথা শুনাইয়া চির-বিচ্ছেদকে জয় করা দুরূহ। সংসারের কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতির আলোতেই না চিরবিদায়ী উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ঘটনার প্রদীপগুলি মনের মধ্যে আপনি জ্বলিয়া উঠে—আপনি আগুন জ্বালাইয়া পুড়াইয়া মারে। তবু রামচন্দ্র যে কয় দিন বাড়িতে ছিল—পরস্পরের সান্নিধ্য লাভ করিয়া এবং পরস্পরকে সান্ত্বনা দিয়া, দিনরাত্রি কোন প্রকারে কাটিয়া যাইত। সে চলিয়া গেলে যোগমায়ার জ্বালা বাড়িল বই কমিল না।

প্রতিবেশিনীরা কত সান্ত্বনা দিত—সে যেন না দিলে নয়—এমনই-গোছের একটা কিছু। ছোট মেয়েটিকে কোলে বসাইয়া দিয়া বলিত, ওকে কোলে ক'রে ব'স মা। ভগবান করুন—আবার কোল আলো ক'রে চাঁদের মত একটি ফুটফুটে ছেলে—

রূপে ভুবন আলো করিয়া চাঁদের মত দশটি ছেলে আসিলেও—মায়ের মনে সেই একটি কুরূপ ছেলের জন্য যে বেদনা লাগিয়া থাকে—তাহা দূর হয় কিসে? অথচ এই সান্ত্বনাই উঁহারা দেন! এমন নাকি সকলেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে! অশ্রু চোখে না থাকে যখন যোগমায়া সান্ত্বনা-কারিণীদের মুখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে। একদা ইঁহারাও শোক পাইয়াছেন, পুনরায় সন্তান কোলে পাইয়া সেই শোক ভুলিয়াছেন। মাঝে মাঝে কখনও বা হঠাৎ একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মনে হয়, সে বাঁচিয়া থাকিলে ঠিক এত বড়টি হয়ত হইত। সে রোজগার করিয়া টাকা আনিত, বিবাহ করিয়া সংসারকে ফাঁপাইয়া তুলিত হয় ত। হয়ত রোজগার সে করিতে পারিত না, বিবাহ করিত কিনা—কে জানে, কিন্তু ব্যতিক্রম-গুলি লইয়া মায়েরা চিন্তা করিতে ভালবাসেন না। যোগমায়া তাঁহাদের বলি-রেখাঙ্কিত মুখের পানে চাহিয়া ভাবে, কালে হয়ত সব ভুলিতে পারা যায়। কিন্তু সেই সব ভুলিয়া-যাওয়ার শান্তিপ্রদ কাল কত দিনে যোগমায়ার কাছে ধরা দিবে!

কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় শাশুড়ী হরিনামের মালা পেন্দকে টাঙাইয়া রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া সারা দিনের কর্ম্মব্যস্ত মনের মধ্যে ধিকিধিকিপ্রায় আগুনকে খোঁচাইয়া তুলেন। নিজের চোখের জলে বুক ভাসিলেও তাঁহার মুখে আঁচল চাপিয়া ধরিয়া যোগমায়া সান্ত্বনা দেয়। শাশুড়ীর ক্রন্দনকে বিলম্বিত হইতে দেয় না, যেখানে থাকে ছুটিয়া গিয়া সেই উচ্চ চীৎকারধ্বনি রোধ করে সে। না রোধ করিলে ঐ তীব্র বিচিত্র সুর—তীক্ষ্ণধার ছুরির মত যোগমায়ার অন্তরকে বিদীর্ণ করিতে থাকে। দম তার বন্ধ হইয়া আসে। এক একবার সে ভাবে—অমনই ভাবে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিলে বুঝি বুকের গুরুভার নামিয়া যায়। কিন্তু বউমানুষের অমন ভাবে চীৎকার করাটা যে অশোভন—সে সংস্কারও প্রবলভাবে তাহার চীৎকারের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়। সংস্কার এমনই প্রবল—সেই সুদূর বাঁকুড়ার বাসাতেও—শাশুড়ীর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও যোগমায়া গলা ফাটাইয়া কাঁদিতে পারে নাই। হৃষীকেশ ত যোগমায়ার অপেক্ষা করিয়া ছিল না। সে পৌঁছিবার বহু আগেই রামচন্দ্র পুত্রের শেষকৃত্য সারিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছিল।

শাশুড়ীই প্রস্তাব করিলেন, দিন কতক বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে এস, বউমা। ও বাড়ির বউ আছে—যেমন ক'রে হোক সংসার চালাবে'খন।

যাইবার ইচ্ছা যোগমায়ার ছিল না। এই সংসারের গুরু দায়িত্ব ও গভীর মমত্ববোধের চাপে কোথাও পা বাড়াইবার ইচ্ছা যোগমায়ার হয় না। নহিলে স্বামীর কাছে দুই-এক মাস কাটাইয়া—এই বাড়িতে সে ফিরিয়া আসিত কেন? বাসার সেই বন্দীশালায় অনেকখানি স্বাধীনতাই ত যোগমায়ার ছিল। খণ্ডিত আকাশ, খানিকটা প্রান্তর ও নিত্য-দেখা লোকজনের মাঝেও নিজের অখণ্ড কর্ত্তৃত্বকে সে পুরাপুরিই ভোগ করিত। তবু বাড়ির এই আম-কাঁঠাল-ছায়া-ঘেরা উঠান, শাশুড়ীর নির্দ্দেশ মাথায় পাতিয়া গৃহকর্ম্মের শৃঙ্খলাবিধান, প্রতিদিনের বেড়াইতে আসা প্রতিবেশীদের সম্মুখে আড়ষ্ট হইয়া প্রশংসা গলাধঃকরণ, সখীর সঙ্গে রহস্যালাপ—যোগমায়াকে নিয়তই টানিয়া আনিত। বিমলের জন্য—হৃষীকেশের জন্য নূতন করিয়া গৃহ নির্ম্মাণের কল্পনা সেই করে, নিজের মনের রঙে রাঙাইয়া সংসারকে আঁকিতে আরম্ভ করিয়াছিল যোগমায়াই ত। বাসার মুক্তির ক্ষেত্রে সেই চিত্র আঁকা চলিত আরও সুষ্ঠ ভাবে, কিন্তু বদলীর বাদল লাগিয়া যোগমায়ার চিত্র কাঁচা স্যাঁতসেঁতে ও সাদা দাগে অস্পষ্ট হইয়া উঠিত। যে আম-কাঁঠাল গাছ সে নিজের হাতে বাসার অঙ্গনে পুঁতিয়া গেল—তাহার ক্রমবর্দ্ধমান রূপটি দেখিবে অপরে। আবার অবিরত জল সিঞ্চনে যে-গাছের মুকুল ধরিতে সে দেখিল—ফল পাকিবার অনেক আগেই সে গাছের মায়া তাহাকে কাটাইতে হইবে। মানুষের সঙ্গে হৃদ্যতা জমিবার মুখেই—তাঁবু ভাঙিবার হুকুম আসে। কুষ্টিয়ার কালিতারা আজ কোথায়—কে জানে? কেষ্টার মা এখনও কি বাঁচিয়া আছে? আর পূর্ণিমা? এমন কত স্মৃতিই ত পিছনের তরঙ্গ প্রহারে আগের তরঙ্গ ভাঙিয়া দিবার মত মনের মাঝে কল্লোলধ্বনি তোলে। যেখানে প্রতিমুহূর্ত্তে নীড়-ভাঙার মহোৎসব লাগিয়া আছে—নীড় গড়িবার মমতা সেখানে পুঞ্জীভূত হইবার অবসর পাইবে কেন? তবু, স্থির ভাবে বাসা পাতিবার দিন যোগমায়ার আসিয়াছিল। রামচন্দ্র ইন্‌সপেক্টর হইয়া বড় আপিসে বদলি হওয়ার সঙ্গে—নিত্য বাসা বদলানোর হাঙ্গামা অনেকটা কমিয়াছিল। কিন্তু যোগমায়ার মনের ভীরুক্ষেত্রে মমতার বীজ তখন আর

উপ্ত হইবার অবসর ছিল না। এক দিকে বয়োজীর্ণ শাশুড়ী একাকিনী সংসার লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন—অন্য দিকে ছেলেদের পড়াশুনা। নিত্য স্কুল বদলানোর ফলে উহাদের বিদ্যাশিক্ষার বাধা রামচন্দ্র পছন্দ করিত না। পদোন্নতির সময়ে বড়ছেলে বিমল দেশের স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতেছিল—তাহাকে স্কুল ত্যাগ করানো রামচন্দ্র যুক্তিযুক্ত বোধ করে নাই। বুড়া শাশুড়ীর ঘাড়ে ছেলের সময়-বাঁধা স্কুলের ভাত দেওয়ার কাজ ফেলিয়া যোগমায়া প্রবাসিনী সাজিতে পারে নাই। সংসারের যে দিকে ছায়া—যে জমিতে সার পড়িয়াছে—মমতার ফসল সেই খানেই আপনি বোনা হইয়া গেল। ছায়াভরা আম-কাঁঠালের গাছের তলায়, ও-বাড়ির নটে-পালং-কুমড়া-লাউয়ের ক্ষেতে, পুরাতন বাড়ি নূতন করিয়া গড়িবার মুখে—তার শ্রীশোভাকে মনোরম করিতে যোগমায়ার সম্বন্ধ কখন সংযুক্ত হইয়া গেল। নূতন রূপে নূতন আকর্ষণ আনিল এই জন্মভিটা। শ্বশুরকুলের ভিটা—স্বর্গের চেয়ে গরীয়সী যে মাটি—মরণ যেখানে বহুপূর্ব্ব হইতেই পুণ্য-সূর্য্যের প্রথমোদয় দেখিবার উল্লাসে চির প্রতীক্ষমান। বহুদিনকার শোনা কথা—নূতন বাড়ির রূপে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া যোগমায়ার রক্তধারার সঙ্গে যোগমায়ারও অজ্ঞাতে কখন মিশিয়া গেল।

এই বাড়িই আজ শোকের সমুদ্রটিকে স্ফীত করিয়া তুলিতেছে। হৃষীকেশ অদেখা হইয়া ছলছল পাংশু মুখে সে বাড়ির শূন্যমণ্ডল ভরিয়া আছে। চোখ চাহিলে ছোটখাটো বস্তুপুঞ্জে হৃষীকেশ জীবন্ত হইয়া উঠে, চোখ বুজিলেও হৃষীকেশ মুছিয়া যায় না। উপরের দক্ষিণ-দুয়ারী বড় ঘর দু'খানা—একখানা বিমলের—একখানা হৃষীকেশের। পাশের পূজাগৃহটি অবশ্য যোগমায়ার জন্য কিংবা বিমল-হৃষীকেশের অনাগত অংশীদারের জন্যও হইতে পারে। বাহিরের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ, যেখানে মুছিয়া গেল, মনের অস্পষ্ট ইঙ্গিতকে লইয়া আবার কল্পনার জাল বুনিবে যোগমায়া কোন্ সাহসে? ও ঘরের দুয়ারে সন্ধ্যাদীপ লইয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য যোগমায়ার নাই, ওদিকে চাহিবার অধিকার—

বাবা-মাকে বেশি করিয়াই মনে পড়িল। বাপের সেই পিঙ্গল চোখের কটা তারা—মায়ের নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর। না থাকুক সেই সব—সেই বাড়ি আছে। সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেও মনে হইবে—বাবা-মায়ের কোলে শোকার্ত্ত সন্তান ফিরিয়া আসিয়াছে। দুরন্ত কাল—নির্ব্বোধ কাল—সর্ব্বসন্তাপহারী কাল—বহুদিন হইল ওদিকের স্মৃতির চিতা নির্ব্বাণ করিয়া দিয়াছে। সুখের মুহূর্ত্তে তাঁহাদের স্মরণ করিয়া মন চঞ্চল হয়, শোকের মুহূর্ত্তে তাঁহাদের বিয়োগব্যথার মধ্যে এই সদ্যপ্রাপ্ত বেদনাকে মিশাইয়া দিলে—যোগমায়ার মন কি মা-বাপের কোলে ফিরিয়া যাওয়া দুঃখী মেয়েটির মত সর্ব্বসন্তাপ ভুলিয়া যাইবার মন্ত্রটিকে আয়ত্ত করিতে পারিবে না?

কালের ব্যবধান দূরত্বের ব্যবধান হ্রাস করিয়াছে। পাল্কী উঠিয়া গিয়াছে। গোযান আছে—তাও অচল হইয়া আসিতেছে। ঐ মেঠো পথে ঘোড়ার গাড়িই চলে আজকাল। দু-ঘণ্টার পথ আধ ঘণ্টায় পাওয়া যায়।

পরিবর্ত্তন সর্ব্বত্রই সুস্পষ্ট। ভাইয়ের সংসারে নূতন ব্যবস্থা। বড় আটচালার বদলে দুখানি কোঠাঘর সেখানেও উঠিয়াছে। সে বাড়ির উঠানও সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। বকফুলের গাছ, জাঁতি ফুলের গাছ, পেয়ারা গাছ নানা জাতীয় ফুলের সেই শোভা, ঘৃতকুমারীর ঝাড়—কিছুই নাই। কুয়াতলায় কাঁঠাল গাছ—কুয়াসমেত নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। শুধু উঠানে শুইয়া শাখাসমৃদ্ধ লেবুগাছটা ফলে ফুলে সাজিয়া সেদিনের কথা আজও মনে রাখিয়াছে। বাপের কর্ত্তৃত্ব শেষ হইয়াছে—ভাইয়ের শাসন-যুগ এই সংসার বহন করিতেছে। কলমি ডোবার বিলোপ ঘটিয়াছে—বড় একটা আমবাগান সেখানে মাথা তুলিয়াছে। বাৎসরিক আয়ের অঙ্ক বাড়িয়াছে। যে-তেঁতুল গাছে হুতোম পাখী ডাকিলে অন্ধকার রাত্রিতে যোগমায়া মায়ের কোল ঘেঁষিয়া ওই পাখীটার ডাকের গল্প শুনিতে চাহিত—সেই ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটা কাটিয়া বছর খানেক ধরিয়া নাকি জ্বালানি কাঠ পাওয়া গিয়াছিল। পুরাতন মানুষের পুরাতন সঙ্গীরা এমনই করিয়া আত্মগোপন করে, নূতন মানুষেরা নূতন সাথী জুটাইয়া লয়।

ভায়ের সংসারে পোষ্য বেশি নাই। বউয়ের বয়স কম, মাত্র দুটি ছেলে লইয়া সে হাঁপাইয়া পড়িয়াছে। পিত্রালয় সম্পর্কীয়া এক পিসিমা আসিয়া বছরের দশটি মাস বউয়ের সাহায্য করেন। তিনি বিধবা। নিঃশেষিত-প্রায় শ্বশুরকুলের দাবি নাই, পিতৃকুলের আশ্রয়ে আসিয়া—কর্ত্তৃত্ব না হউক—যেমন পাঁচজনে থাকে তেমনই হয়ত ছিলেন। এ বাড়ির গৃহিণী না থাকায় নূতন বউকে সংসার গুছাইয়া ও চিনাইয়া দিবার জন্য লগনের দিন হইতেই আসিয়াছেন। তার পর বউ সংসার চিনিলেও—আঁতুড় তোলার হাঙ্গামা—পাল-পার্ব্বণের হাঙ্গামা—অসুখ-বিসুখের হাঙ্গামা ইত্যাদিতে দশটি মাস তাঁহাকে এখানে থাকিতে হয়। শীতের দু'টি মাস—তাঁহাকে ধরিয়া রাখা

দায়। বলেন, বুড়ো হাড়ে শীত সহ্যি হয় না। সকালে উঠে উঠোন ঝাঁট, গোবরজল ছড়া দেওয়া—যখন বয়েস ছিল—সেই কোন ভোরে কাক-কোকিল ডাকতে-না-ডাকতে উঠে সব সেরেছি। এখন কি পারি ?

কিন্তু সেইটিই আসল কথা নহে। ঐ সময়ে তিনি পিত্রালয়েও অবস্থান করেন না। শ্বশুরালয়ে চলিয়া যান। শ্বশুরালয়ে লোক না থাকুক—কিছু সম্পত্তি আছে। একটা ছোট পুকুর (ডোবা সংস্করণ), গোটাকতক আম নারিকেল গাছসমন্বিত বাগান, আর ভিটের পড়ো জমিতে গোটাচল্লিশেক খেজুর গাছ। শীতকালে শিউলিরা গুড় তৈয়ারী করিবার জন্ত গাছগুলি জমা লয়। প্রতি গাছ চার আনা। জেলেদের যৎসামান্ত দামে পুকুরটা জমা দিয়া দেন, আর মাঘ মাসে আমের মুকুল ধরিলে মুচিদের গোব্‌রা আসিয়া মা-ঠাকুরাণীর 'ছিচরণে' গোটাপাঁচেক টাকা প্রণামী দিয়া বাগানটুকুর ব্যবস্থা করিয়া লয়।

মা-ঠাকুরাণী অর্থাৎ বিন্দু-পিসি জানেন—হাজার দর-দস্তুর করিলেও গোব্‌রা মুচি ভক্তি গদ্‌গদ্‌ বাক্য ছাড়া একটি আধলাও বেশি খরচ করিবে না। তবু অভ্যাস বশতঃ বলেন, হাঁ রে গোবরা, গেলবার শুনলাম নারকোলই বেচেছিস সাত টাকার—।

গোবরা হাত জোড় করিয়া বলে, আর মা-ঠাকরোন, এই বাগানের শীতে হিমে চোর আগ্‌লে সেই যে জ্বর হ'য়েছিলো—বদ্যি খরচ তিনটে মাসে গেল দু'কুড়ি ছ টাকা। তোমার বউরে এখনও যমে মানুষে টানাটানি করছে। ওর যদি কিছু হয়—রইলো ঘর-দুয়োর মা-ঠাকরোন—যেদিকে দু'চক্ষু যায়,—চোখের জলে গোবরের কথা বন্ধ হইয়া যায়।

বিন্দু-পিসি মনে মনে কাঁপিয়া উঠিয়া বলেন, আহা, সেরে উঠবে বই কি। এমন জাজ্বল্যমান সংসার—ভগমান কি এমনিই করবেন! আমি আশীর্ব্বাদ করছি—

মাটিতে মাথা ঠুকিয়া—কাঁদিয়া হাসিয়া—অনেক ভক্তি-গদগদ কথা বলিয়া গোবর মুচি বাহির হইয়া যায়।

বিন্দু-পিসিও জানেন—যথা লাভ। সেবার মধুসূদনের কথায় (মধুসূদন তাঁহার জ্ঞাতি দেবর। তাহাদের বাড়িতেই সামান্ত খরচ দিয়া বিন্দু-পিসি এই দু'টি মাস যাপন করিয়া টাকা ক'টি আদায় করিবার সুযোগ পান) ছিরু ভুঁইমালীকে জমা দিয়া একটি পয়সাও আদায় করা যায় নাই। টাকা বেশি বলিয়া ছিরু একখানি খত লিখিয়া বাগান জমা লয়, এবং মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দেয়। তার পর যা হয়। পর বৎসরেও বিন্দু-পিসি সে টাকা আদায় করিতে পারেন নাই। ছিরু সাফ্‌ জবাব দিয়াছিল, কোথায় পাব—মা-ঠাকরোন। এমন জায়গায় জমি—চোর ঠেকাতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। তার পর চোতের ঝড়ে আম প'ড়ে ধুলধাবাড়। বেড়া বাঁধার খরচটা উঠলো না।

শাপমন্যির ভয় দেখাইলে ছিরু হাসিয়া বলিয়াছিল, ভগমান তো তোমার একা নয়—সব দেকছেন উনি। উনিই এর বিচের করবেন।

সুতরাং গোবর মুচি ছাড়া গত্যন্তর কি। সে যে ঠকাইয়া লয় তাহা বিন্দু-পিসি যেমন বোঝেন—সেও বোঝে তেমনি। কিন্তু নগদ টাকাটা দিয়া গোবর ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখে। আর মুখের সেই ভক্তিগদগদ বাক্যগুলি! দরাদরি করিবার কালে সেগুলির প্লাবনে বিন্দু-পিসিও কোথায় ভাসিয়া যান। ভাবেন, ওই আমার ভাল। বিধবার হ'য়ে কেই বা দেখে শোনে—কেই বা দরদস্তর করে। তবু গোবরের ধর্ম্মভয় আছে।

পরের সংসারে বিন্দু-পিসি স্থান পাইয়াছিলেন, এক সময়ে কর্ত্তৃত্বও করিয়াছিলেন কিছু, কিন্তু তারিণী মানুষ হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে—সূর্য্য উঠিলে কুয়াশা অন্তর্হিত হইবার মত বিন্দু-পিসিও অন্তর্হিত হইতেছিলেন। বলেন, যার সংসার সেই চিনল যখন—আমার কেন মাথাব্যথা! আমার ধর্ম্ম আমি করলাম—ওদের ধর্ম্ম এখন ওরা করুক।

বউয়ের নাম তারিণী। দীনতারিণী, কি জগত্তারিণী কিংবা বিপত্তারিণী—সে কথা কেহ জানে না। বিন্দু-পিসিও বলেন, অতয় আমার কাজ কি বাপু, তারিণী কেমন মিষ্টি নাম।

কেহ যদি বলিত, পুরুষের নামও তো তারিণী হয়, পিসি। বিন্দু-পিসি চক্ষু বিস্তৃত করিয়া জবাব দিতেন, হয়! মা-দুগ্‌গার এক নাম তারিণী। পোড়া কপাল! ব্যাটা ছেলের আবার ওই নাম রাখে! কালে কালে কতই শুনবো!

বিন্দু-পিসিই যোগমায়াকে অভ্যর্থনা করিলেন, এস মা, এস। আহা—শোকাতাপা মানুষ—পুত্তুর শোকের তুল্য কি আর আছে। বুকে দিবে রাত্তির কুল কাঠের আঙ্‌রা জেলে রাখে। আহা, চুপ কর মা, চুপ কর। মা না থাকুক—আমরা তো আছি, দু'টি দিন জুড়িয়ে যাও।

রসগোল্লার হাঁড়িটা তারিণীই হাত পাতিয়া লইয়াছিল। উলঙ্গ ছেলে দু'টি লোলুপ দৃষ্টিতে হাঁড়ির পানে চাহিয়া মায়ের আঁচল ধরিয়া টানিতেছিল।

তারিণী ঝাঁজিয়া উঠিল, মর, মর, আপদরা—দিন রাত্তির খালি খাই—খাই। এত গিলেও ত আখিত্তি মেটে না!

বিন্দু-পিসির বুকের মধ্যেই যোগমায়া শিহরিয়া উঠিল। সন্তানের মৃত্যু কামনা মা করে কি করিয়া!

তারিণী একটুখানি দাঁড়াইয়া হাঁড়ি ও পশ্চাদ্ধাবমান পুত্রসমেত ও ঘরে চলিয়া গেল। যোগমায়া অশ্রু মুছিয়া মৃদু স্বরে বলিল, বউ কি ছেলেদের অমন ক'রে গাল দেয়, পিসিমা?

—আর মা, ফিস্ ফিস্ করিয়া বিন্দু-পিসি বলিলেন, দিন-রাত্তির দাঁতের কসে ফেলে চিবুচ্ছে। বললে আরও বাড়ায়। নিজেরই না-হয় হয় নি, বুঝিও নে কি বুক-ছেঁচা ধন ওরা। কত আরাধনার জিনিস। কে বলবে বল। নিজের ভাই-ঝি বলে বলছি নে, এমন—

কথা শেষ হইল না, তারিণী ফিরিয়া আসিয়া কহিল, হাত-মুখ ধোও, ঠাকুর-ঝি। তোমার ভাই আবার গেছেন গয়েশপুর; আজ বিকেলে আসবেন কি না—কে জানে?

—গয়েশপুর কেন?

—কে জানে, শ্রীমন্তর মা বুঝি মন্তর নেবে। মাঘ মাস হ'লে ত তোমার ভাইয়ের চুলের টিকিটি দেখবার জো নেই।

বিন্দু-পিসি বলিলেন, এই দেখ না, তারিণীর শরীল খারাপ ব'লে ভাল রকম আদায়-পত্তর না ক'রেই মাঘের শেষেই চলে এলাম। বলি—রয়েছি গিন্নীর মত বাড়িতে—ওদের সুখ-সুবিধে ত দেখতে হবে।

তারিণী কিন্তু বিন্দু-পিসির কথায় বিগলিত না হইয়া কহিল, কাঁথাগুলো আজ রদ্দুরে দিয়েছিলে, না ভিজে জব্ জব্ করছে। ঠাকুর-ঝি ত তোমার মত নয় যে—ভিজে কাঁথা গায়ে জড়িয়েই ঘুম মারবে!

যোগমায়া বলিল, কাঁথা ভিজল কেন?

—কেন আবার? হাতের ঠোর কত! এক গেলাস জল গড়িয়ে খেতে গিয়ে এই কাণ্ড! সংসারের কত সুসারই যে কচ্ছেন!

বিন্দু-পিসি বলিলেন, তা বয়েস হয়েছে—রথ-ছড়তের যুৎ নেই, আগেকার মত গুছিয়ে করতে পারি কি সব?

তারিণী ঝাঁঝালো কণ্ঠেই বলিল, বয়েসের সঙ্গে মানুষের সবই কমে—কমে না শুধু মুখখানি। যেমন বচন—তেমনই গেলন। কথাশেষে তারিণী ফর্‌কাইয়া ওদিকে চলিয়া গেল।

বিন্দু-পিসি চোখের জল মুছিতে মুছিতে চুপি চুপি বলিলেন, কি করি মা, জীব দিয়েছেন যিনি—তিনি আহারের ব্যবস্থা করেছেন। আজ যদি আমার কিছু হয়—

তারিণীকে দেখিবামাত্রই তিনি ত্বরিতে চোখে আঁচল ঘষিয়া উত্তাপহীন কণ্ঠে কহিলেন, যোগমায়া আমার কাছেই শোবে'খন, নেপটা না হয় তোমার ঘর থেকে পাঠিয়ে দিও।

তারিণী জবাব দিল, সে হুঁস আমার আছে। ঠাকুর-ঝি তক্তাপোষের ওপর শুয়ো রাত্তিরে—ওঁর আবার ঢুকুর-ঢাকুর আছে ত, জল পড়া আশ্চয্যি নয়।

যোগমায়া বিন্দু-পিসির পানে চাহিতেই তিনি চারি দিকে চাহিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, রাত্তিরে জল খাই কি না—তাই বললে। তা বুড়ো মানুষ অন্ধকারে ফেরো খুঁজে পাই তো কলসী খুঁজে পাই নে।

—আলো জ্বালেন না কেন?

—আলো? বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া তিনি বলিলেন, তিরিশ দিনে তিরিশটি কাঠি—সবগুলো কি জ্বলেও ছাই। দেশলাই জ্বালার শব্দ হ'লেই যা করে। তারিণী বলে বটে ক্যাঁট-কেঁটিয়ে—কিন্তু হিসিবী মেয়ে।

ঘর হইতে বাহিরে আসিল তারিণী, বলিল, বলি সাধে! যোজগার করতে ত ঐ একটি মানুষ। ওর মুখের দিকে যদি না চাইলাম ত—

বিন্দু-পিসি বলিলেন, দেমাক ক'রে বলছি নে—নিজের ভাই-ঝি বলেও নয়—ওর মত বুদ্ধি—

বিন্দু-পিসির এই খোসামোদ যোগমায়ার ভাল লাগিল না। বয়সের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া নীচে নামিলে মিষ্ট ব্যবহার মিলিতে পারে—সম্মান দুষ্প্রাপ্য হইয়াই উঠে। পিসি নিজের ম্যর্যাদা নিজে কেন রাখিতে পারেন না? বাৎসরিক সামান্য কিছু আয়ও ত তাঁহার আছে, শ্বশুর-ভিটায় একখানি চালা করিয়া থাকিলেও ত এমন লাঞ্ছনা ভোগ তাঁহাকে করিতে হয় না। কিন্তু লাঞ্ছনা গায়ে মাখিবার মনোবৃত্তি বিন্দু-পিসির নাই। তিনি হাসিমুখেই তাঁহার অতীত দিনের গল্প করিতে লাগিলেন।

যোগমায়ার কানে সে গল্পের সবই প্রবেশ করিল হয়ত, কিন্তু মনে রাখিবার মত এক টুকরাও

লাগিয়া রহিল না। ভাইয়ের সংসারে অভাব আছে, বাপের সংসারেও ছিল, সদ্য-আগত কোন লোক সেই অভাব বুঝিতে পারিত না।

আহারের লিপ্সা এমনই যোগমায়ার ছিল না, নতুবা সে লক্ষ্য করিলে অবাক হইত—গৃহস্থের ঘরে এই ছন্নছাড়া ভাব কেন?

বিন্দু-পিসি ওবেলা কয়েক প্রকার শাক রাঁধিয়া একখানি পাথরে অল্প অল্প সাজাইয়া শিকের উপর তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। যোগমায়া খাইবার কালে নামাইয়া দিয়া বলিলেন, মেয়ে আসবে শুনে এটা-ওটা রাঁধলাম।

তারিণী বলিল, আমার পাতে নয়, তোমার অমন্ত রান্না—ও ঠাকুর-ঝি খেতে পারবে না। হয় নুনে বিষ—নয় আলুনি।

—এই শুষনি-শাকের ঝোলটুকু খাও ত মেয়ে। নুন কম হয় একটু দিয়ে নাও। কলমি শাক উচ্ছে দিয়ে চর্চ্চড়ি, সজনে ডাঁটার নিম-ঝোল।

যোগমায়া পিসিমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিল, কেন বউ, বেশ ত রেঁধেছেন পিসিমা।

তারিণী মুখ মচকাইয়া বলিল, তুমিই খাও—ঠাকুর ঝি! ও অমন্ত্যে আমাদের অরুচি ধ'রে গেছে। একখানা তরকারিতে তো পিসির হয় না।

বিন্দু-পিসি বলিলেন, আমি যেন নিজের জন্তেই রাঁধি! তোমরা পাঁচজন আছ—

তারিণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, অত রকম শাক আর অত রকম অম্বল আলাদা আলাদা না রেঁধে একসঙ্গে যদি রাঁধ তো সময়ের অনেক সুসার হয়।

শুইবার সময় বিন্দু-পিসি বলিলেন, তারিণীর ওই কাটাকাটা বুলি, কিন্তু মনটি ভারি সাদা। যখন বললে, ব্যস্, তার পর গঙ্গাজল।

যোগমায়া বলিল, আপনি শ্বশুর-বাড়িতে থাকেন না কেন পিসিমা?

কোথায় থাকব মেয়ে! ছোটবেলা থেকেই যে তিন কূল খেয়ে ব'সে আছি। ভাইয়ের সংসারে গেলাম—সেখানে মাথায় ক'রে রাখলে। আজা ভাই। বললে, দিদি, তারিণীর সংসারে আমার কেউ নেই, তার সংসারটা গুছিয়ে দিয়ে এস। তাই এলাম?

খানিক পরে যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল, বউ চড়া কথা বললে আপনার কষ্ট হয় না!

কষ্ট! ওকে যে হাতে ক'রে মানুষ করেছি আমি। অন্ধকারে বিন্দু-পিসি হাসিলেন। ছেলেবেলা থেকে ও অমনি অভিমানী।

আমার কিন্তু লাগে। যোগমায়া সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিল।

আহা, তা লাগবে বইকি মেয়ে। আমায় যে তুমি ভালবাস। তা দু'দিন থাকলেই দেখবে ওসব কিছু নয়।

যোগমায়া বলিল, আমার বাপের আমলে দেখেছি—মা কাউকে চড়া কথা বলতেন না। এত খাটতেন দিন-রাত, সর্ব্বদাই হাসি-মুখ। সংসারে যেখানে কথান্তর হয় না—সেইখানে মা লক্ষ্মী বিরাজ করেন—পিসিমা।

সে কথা একশো বার মেয়ে। কিচি-কিচি ঝিকি-ঝিকিতে কি মা লক্ষ্মী তিষ্ঠুতে পারেন! কক্ষনো না। তুমি এসেছ—শোকাতাপা মানুষ—তোমার তো ভালই লাগবে না।

সত্যি ভাল লাগে না আমার। যোগমায়া চুপ করিল। অন্ধকারে বোঝা গেল না সে কাঁদিতেছে কি না। বিন্দু-পিসিও খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, মেয়ে, ঘুমুলে?

—না। অস্পষ্ট স্বর।

—আলোটা জ্বালব?

—না।

—একটু জল খাবে?

—না।

বিন্দু-পিসি আরও খানিকক্ষণ থামিয়া বলিলেন, তবে আমি একটু জল খাই মা।

জল ঢালার শব্দ যোগমায়া শুনিল। খানিকক্ষণ ধরিয়া চক্ চক্ একটা শব্দও উঠিল যেন। যোগমায়া কহিল, ঘরে আছুড় দুধটুধ নেই তো পিসিমা? বেরালে যেন চক্ চক্ ক'রে কি খাচ্ছে।

চাপা কণ্ঠে বিন্দু পিসি উত্তর দিলেন, না। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল কাসির শব্দে ঘর ভরিয়া উঠিল।

যোগমায়া ব্যাকুল হইয়া কহিল, কি হ'ল—পিসিমা?

ঢক্ ঢক্ করিয়া জল পান করিয়া বিন্দু-পিসি বলিলেন, জল গলায় বেধেছিল মা। ও কিছু নয়। কালী, দুর্গা, তারা, শয়নে পদ্মনাভঞ্চ—

অবিলম্বে বিন্দু পিসির নাসিকা গর্জ্জন শোনা গেল। অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে উপাধান সিক্ত করিয়া যোগমায়া জাগিয়া রহিল। মনে আজ অতীতের আনাগোনা সুরু হইয়াছে। বহুদিনের হারানো-জনের স্মৃতিতে রাত্রি অন্ধকারের সঙ্গে অশ্রুময়ী হইয়া উঠিল। বুকের কাছটা এমন খালি খালি বোধ হইতেছে! মাগো! (ক্রমশঃ)

উদ্ভিদজগতে অভিনব বৈচিত্র্য উৎপাদনে মানুষের কৃতিত্ব

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সর্ব্বপ্রথম জীবোৎপত্তি সম্পর্কিত বিতর্কমূলক বিবিধ মতবাদের কথা আলোচনা না করিয়াও মোটামুটিভাবে একথা বলা যায় যে, জীব সৃষ্টির অনুকূল অবস্থায় উপনীত হইবার পর পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম 'প্রোটোপ্লাজম্' বা জৈব-পঙ্কই আদি-জীবরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। উদ্ভিদ এবং



মানুষের চেষ্টায় উৎপাদিত কেরোলিন গোলাপ। একটি গাছেই পঞ্চাশটি ফুল এবং ততোধিক কুঁড়ি ধরিয়াছে

প্রাণিজগতে আজ যে অগণিত বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা কাহারও খেয়াল-খুশী মতে উৎপাদিত হয় নাই; জীবন ধারণের অপরিহার্য্য প্রবৃত্তির বশে, প্রাণ-শক্তির অদম্য প্রেরণায় প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে জয়ী হইবার নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ যুগ ব্যাপিয়া ক্রম-বিকাশের ফলেই এই অভাবনীয় বিরাট বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। কেমন করিয়া জৈব-পদার্থের ক্রমবিকাশ ঘটিতেছে তাহার কতকাংশের পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ মিলিলেও প্রাকৃতিক উপায়ে কি ভাবে তাহা কার্য্যকরী হইতেছে তাহার অবিসম্বাদী প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ডারুইন বলিয়াছিলেন—প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে যোগ্যতমের উদ্বর্তন; পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক আকৃতি-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন এবং বংশানু-ক্রমিক উত্তরাধিকারিত্বের ফলেই উদ্ভিদ এবং জীব-জগতে ক্রমবিকাশ ঘটিয়া থাকে। জীবন-সংগ্রামে যাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইতে পারে তাহারাই বাঁচিবার উপযুক্ত বলিয়া নির্ব্বাচিত হয়। এই সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্তই বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ বা প্রাণী তাহার পূর্ব্ব আকৃতি, প্রকৃতি পরিবর্ত্তনে বাধ্য হইয়া থাকে। এই বিষয়ে ডারুইনের পূর্ব্বে লামার্ক বলিয়াছিলেন যে, উদ্ভিদ বা প্রাণী দেহের প্রয়োজনীয়তা এবং অপ্রয়োজনীয়তা অনুসারেই তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করিতে হয় তাহারই ক্রমশঃ উৎকর্ষ সাধিত হইতে থাকে, যাহার ব্যবহার নাই তাহা ক্রমশঃই লুপ্ত হইয়া আসে। তাঁহার মতে এই ভাবেই জিরাফের লম্বা গলা উৎপাদিত হইয়াছিল।

বালুকাময় শুষ্ক মরুভূমি অঞ্চলেই পত্রশূন্য, স্থূলকায় 'ক্যাক্টাস্' বা মনসা গাছ প্রথম আবির্ভূত হয়।



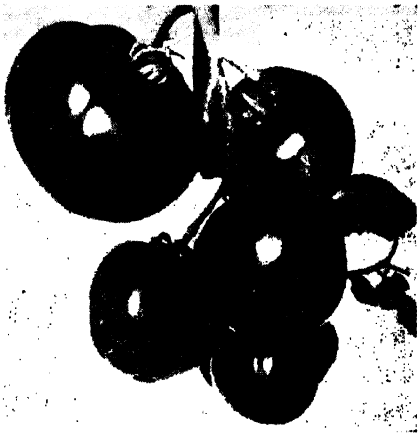
নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত শ্বেতবর্ণের এক প্রকার অপূর্ব্ব ডেফোডিল

কোন বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া অনুকূল আবহাওয়ায় পত্রপুষ্প-শোভিত অসংখ্য উদ্ভিদ বিরাজ করিত। আকস্মিক কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বশতঃ ভূস্তরের পরিবর্ত্তনের ফলে সেস্থান ক্রমশঃ মরুভূমিতে পরিণত হইতে লাগিল। প্রতিকূল



দেয়ালের গায়ে লতানো এক জাতীয় ফুলগাছে অসংখ্য ফল ধরিয়াছে

আবহাওয়ায় অনেকেই লুপ্ত হইয়া গেলেও সহনশীল অল্প সংখ্যক উদ্ভিদ কোন রকমে বাঁচিয়া গিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কালক্রমে তাহারা স্থানীয় অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য সাধারণ উদ্ভিদের আকৃতি, প্রকৃতি বিসর্জ্জন দিয়া নূতন ভাবে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িল। বালুকাময় স্থানে শিকড়ের সাহায্যে গাছ যে সামান্য পরিমাণ রস সংগ্রহ করে, উত্তপ্ত আবহাওয়ায় শীঘ্রই তাহা পত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে উবিয়া গিয়া গাছকে শুষ্ক করিয়া ফেলে। এই জন্যই তাহাদের কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখাগুলি, সকলেই হইল পত্র-শূন্য এবং যথেষ্ট পরিমাণ জলীয় পদার্থ সঞ্চিত রাখিবার জন্য তাহাদিগকে কোমল মাংসে গঠিত স্থূলাঙ্গ ধারণ করিতে হইয়াছিল। মাংসল কাণ্ডের প্রতি উদ্ভিদভোজী প্রাণীদের অতিরিক্ত লোভ থাকায়, উন্মুক্ত প্রান্তরে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সর্ব্বদেহ বিষাক্ত কণ্টকে আচ্ছাদিত করিয়া লইল। কিন্তু ওয়াইজম্যান প্রমুখ অনেকেই—কেহবা বিশ-পঁচিশ পুরুষ পর্য্যন্ত ইঁদুরের লেজ কাটিয়া, কেহবা খরগোসের ডিম্বকোষ বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং কেহ কেহ আবার উদ্ভিদদেহে বিচিত্র পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া বিবিধ পরীক্ষার ফলে প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন যে, পিতামাতার অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য সমূহ সন্তানে পরিচালিত হয় না। তৎপরে ডারুইন বাস্তব জগতের অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রয়োগে দেখাইলেন যে, উদ্ভিদ এবং জীব-জগতে একটা পরিবর্ত্তন অর্থাৎ অবস্থাভেদে এবং অন্যান্য বিবিধ কারণে একই জাতীয় জীব বা উদ্ভিদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন রকমের পার্থক্য আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। একই জাতীয় উদ্ভিদের পরস্পরের মধ্যে আকৃতি, প্রকৃতি, দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বর্ণ, গন্ধ অনুসারে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা রকমের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। একই জাতীয় প্রত্যেকটি গাছে ফুলের বা ফলের সংখ্যা সমান হয় না। প্রত্যেকটি বীজাধারের বীজসংখ্যা সমান নহে। একই বৃক্ষের প্রত্যেকটি পাতার আকৃতি বা আয়তন সমান হয় না। অবশ্য মোটামুটিভাবে একটা আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকিলেও বংশধর পিতামাতার নিখুঁৎ প্রতিচ্ছবি নহে। জলবায়ু, খাদ্য, আলোক, উত্তাপ এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে উদ্ভিদ ও জীব দেহে অনবরতই এরূপ পরিবর্ত্তন



বৃহদাকৃতির সুদৃশ্য টোমাটো

ঘটিতে দেখা যায়। অনুকূল অবস্থায় বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তন বা পার্থক্য বংশানুক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে এবং তাহারই ফলে কালক্রমে নূতন নূতন উদ্ভিদ এবং প্রাণীর আত্মবিকাশ ঘটিতে দেখা যায়। কোন কারণে এই ক্রম-পরিণতির মধ্যবর্ত্তী ধারার বিলোপ সাধন

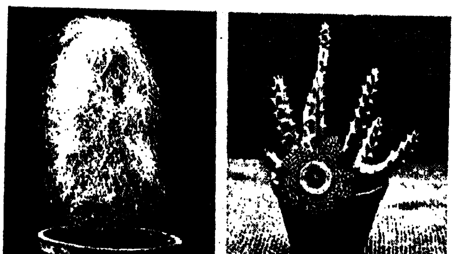
ঘটিলে অবশিষ্ট যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অভিনব বলিয়াই মনে হয়। ডারুইনের মতবাদের যৌক্তিকতা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইলেও পরিবর্ত্তনজনিত বৈশিষ্ট্য কেমন করিয়া বংশানুক্রমে সন্তান-সন্ততিতে পরিচালিত



নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন অপূর্ব্ব গুজবেরী

হয়—এই রহস্যের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে হিউগো ডি ভ্রিজ বহুবিধ পরীক্ষার ফলে এক অদ্ভুত রহস্য আবিষ্কার করিলেন। তিনি দেখিলেন—জৈব-পদার্থে সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তন দেখা যায় বটে; কিন্তু সকল রকমের পরিবর্ত্তনকেই এক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কতকগুলি পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ স্থায়ী আবার কতকগুলি হয়—সম্পূর্ণ অস্থায়ী। কতকগুলি সাধারণ উদ্ভিদের দৃষ্টান্ত হইতেই এই দুই রকমের পরিবর্ত্তনের পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে।

আমাদের দেশের জলপদ্ম, কচুরীপানা, কলমি-লতা, জল-লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছগুলি সকলের নিকটই পরিচিত। এইগুলি প্রধানতঃ জলজ উদ্ভিদ হইলেও জলের অভাব ঘটিলে শুষ্ক জমিতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। শীত ও গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে ইহাদের পাতা ও ডাঁটার আকৃতি এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে, তখন ইহাদিগকে এক 'গণ'ভুক্ত বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ বলিয়াই মনে হয়। লজ্জাবতীর ডাঁটা এবং কলমি-লতার ডাঁটা এবং পাতা উভয়েই অসম্ভব রকমের সরু হইয়া যায়। কচুরি পানা খর্ব্বকায় হইয়া পড়ে এবং প্রত্যেকটি পাতার ডাঁটার মধ্যস্থলে ডিম্বাকৃতি স্ফীতি দেখা দেয়। কিন্তু বর্ষা সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা আকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। কচুরি পাতার আয়তন বৃদ্ধির সহিত তাহাদের ডাঁটার স্ফীতিগুলি অদৃশ্য হইতে থাকে। ডাঁটাগুলি অসম্ভবরূপে লম্বা হইয়া উঠে। কলমি-লতার পাতাগুলি অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যায় এবং ডাঁটাগুলিও লম্বা হইয়া ফাঁপিয়া উঠে। জল-লজ্জাবতীর ডাঁটার চতুর্দ্দিকে মোটামোটা তুলার পটির মত সাদা শোলা জন্মাইতে থাকে। একই গাছের বীজ হইতে উৎপন্ন কতকগুলি গাছকে ছায়ায় এবং কতকগুলিকে উন্মুক্ত স্থানে রোপন করিলে তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতিতে অদ্ভুত পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবোৎপন্ন এই পরিবর্ত্তন কখনও বংশধরে সংক্রামিত হইতে দেখা যায় না। এইরূপ পরিবর্ত্তনকেই অস্থায়ী পরিবর্ত্তন বলা হয়। কিন্তু সময়ে সময়ে দেখা যায় একই জাতীয় বহু গাছের মধ্যে কোন্ একটা গাছে বা কোন একটা ডালে একটা বিশিষ্ট পার্থক্য-সমন্বিত ফল ধরিয়াছে। এই ফলের বীজ হইতে গাছ উৎপাদন করিয়া বংশানুক্রমে যদি ঐরূপ বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত ফলই উৎপন্ন হইতে দেখা যায় তবে প্রথম গাছটির ঐ পরিবর্ত্তনকে স্থায়ী পরিবর্ত্তন বলা হয়। ডি ভ্রিজ্ ইহাকে বলিয়াছেন—'মিউট্যাণ্ট'। এই 'মিউট্যাণ্ট'



সুদৃশ্য ফুল উৎপাদনকারী ক্যাকটাস্

হইতেই উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতে অগণিত বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যৌন-মিলনোৎপন্ন বীজের সাহায্য না লইয়া

'কলম' করিবার প্রথায় শাখা-প্রশাখা হইতে উৎপাদিত গাছের সাহায্যে কোন বৈশিষ্ট্য অবিকৃতভাবে বেশী দিন



নির্ব্বাচন-কৌশলে উৎপাদিত 'হোয়াইট-কারাণ্ট' নামক এক জাতীয় ফলের গুচ্ছ।

রক্ষা করা সম্ভব নহে। ক্রমশঃ তাহাতে অবনতি ঘটিতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যৌন-মিলনোৎপন্ন বংশধরের তেজ ও শক্তির উৎকর্ষতা বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই সমজাতীয়ের মিলন অপেক্ষা অ-সম মিলনের ফল উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অ-সম মিলনোৎপন্ন বর্ণসঙ্করের বংশধারা সম্পর্কিত মেণ্ডেল কর্তৃক আবিষ্কৃত তথ্যগুলি ক্রম-বিকাশের অন্ততঃ একটি ধারার রহস্য অবগত হইবার পন্থা সুগম করিয়া দিয়াছে ত বটেই, অধিকন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও তাহার অসামান্য প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। অনেকের ধারণা, নিকট সম্পর্কিতদের মধ্যে পরস্পর মিলনোৎপন্ন সন্তান-সন্ততির অবনতি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু বিবিধ পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে—অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ মিলনের ফলে উৎকর্ষই সাধিত হয়, অধিকন্তু বংশধারার বিশুদ্ধতাও রক্ষিত হইয়া থাকে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্রে ইহার বিপরীত ফলও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মোটের উপর উদ্ভিদ ও জীব-জগতের বৈচিত্র্য-উৎপত্তির রহস্য অনুসন্ধান করিতে গিয়া বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত সাধনায় যে-সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া বহুবিধ পরীক্ষার ফলে ক্রম-বিকাশই ইহার প্রকৃত কারণ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। এই সকল তত্ত্ব অভ্রান্ত হইলে তদনুযায়ী কার্য্যপ্রণালী অনুসরণে ইচ্ছানুরূপ জীব বা উদ্ভিদ উৎপাদন করা অসম্ভব নহে। অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশবাদের যৌক্তিকতায় আস্থা স্থাপন করিলেও এক সময়ে অনেকেই এরূপ ধারণা পোষণ করিত যে, জীব-জগতের ক্রম-বিকাশ প্রাকৃতিক ঘটনা এবং একমাত্র প্রাকৃতিক উপায়েই তাহা ঘটা সম্ভব। কিন্তু মানুষের অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি অদম্য; প্রাকৃতিক রহস্য উদ্ভেদ করিয়া তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে তাহার উৎসাহের অন্ত নাই। কাজেই উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর অনুসরণে বিবিধ উপায়ে পরীক্ষাকার্য্য চলিতে লাগিল। অবশেষে বহু সাফল্য ও বিফলতার ভিতর দিয়া কালক্রমে যেভাবে সে উদ্ভিদ ও জীব-জগতে অভিনব বৈচিত্র্য উৎপাদনে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার। এস্থলে তাহার সুদীর্ঘ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনাও সম্ভব নহে। তবে জীব-জগতের কথা বাদ দিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ দু-এক জন অদ্ভুতকর্ম্মা মনীষীর উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপের বিষয় উল্লেখ করিব মাত্র।

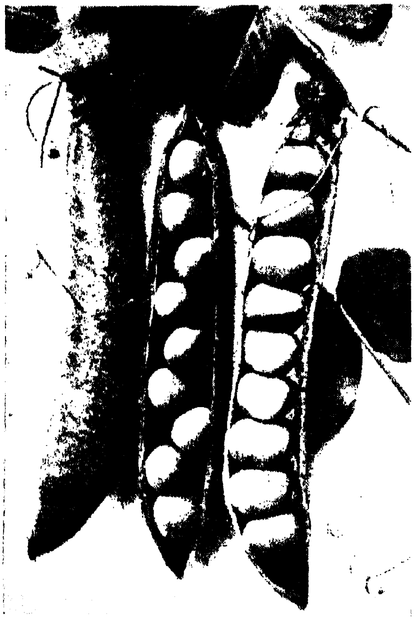
এককালে ব্রিটিশ ও আইরিশ কলসমূহ যে ময়দা উৎপাদন করিত তাহা ছিল অতি নিকৃষ্ট ধরণের। কারণ



বার্ব্বাঙ্ক কর্তৃক উৎপাদিত কণ্টকবিহীন ফণী-মনসা এবং অন্যান্য বিভিন্নজাতীয় ক্যাক্‌টাস্‌।

সে সময়ে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গম উৎপন্ন হইত না। ব্রিটিশ এবং আইরিশ কলওয়ালা সমিতির সভ্যবৃন্দ, স্যার রোল্যাণ্ড বিফেনকে উৎকৃষ্ট ধরণের এমন এক প্রকার গম উৎপাদন করিবার জন্য অনুরোধ করেন যাহার দানায় শীষ থাকিবে

না, ফসলগুলি ছত্রাক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে না; দানাগুলি হইবে শক্ত অথচ প্রচুর পরিমাণ প্রটেন সমন্বিত।



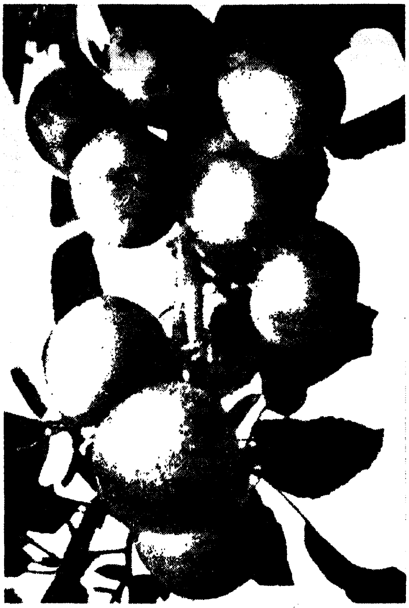
বর্ণসঙ্কর উৎপাদন এবং নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়ায় মটরশুঁটির অদ্ভুত উৎকর্ষতা সাধিত হইয়াছে।

তা ছাড়া উৎকৃষ্ট রুটি তৈয়ারির উপযুক্ত বিবিধ গুণাবলীসহ বর্দ্ধিত হারে ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। এতগুলি বৈশিষ্ট্যসমন্বিত কোন প্রকার গমেরই অস্তিত্ব ছিল না। বিফেন বিশেষ গুণসম্পন্ন এক প্রকার গমের সহিত অন্য প্রকার বৈশিষ্ট্যসমন্বিত গমের মিলন ঘটাইয়া বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করিলেন। এইরূপে বিভিন্ন গুণাবলী সমন্বিত বহুবিধ বর্ণসঙ্কর উৎপাদিত হইবার পর মেণ্ডেল-নিয়মানুসারে বর্ণসঙ্করগুলির পরস্পরের মধ্যে মিলন ঘটাইয়া বহুসংখ্যক পরীক্ষার ফলে বিফেন 'Little joss' এবং 'Yeoman' নামে দুই প্রকারের অভীপ্সিত গম উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিবিধ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এই অভিনব গমই আজ পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত হইয়াছে।

যবদ্বীপে "P. O. J. 2878" নামে এক প্রকার আখ হইতে প্রচুর চিনি উৎপাদিত হইয়া থাকে। যত রকমের আখ দেখা যায় তাহার মধ্যে এই আখে চিনির পরিমাণ প্রায় বিশ গুণ বেশী। পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যত প্রকার আখ জন্মে তাহারা সকলেই কোন-না-কোন প্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এই "P. O. J. 2878" আখের কোন রোগ হইতে দেখা যায় না; অধিকন্তু তাহার ফলন হয় প্রচুর। এই উন্নত ধরণের আখ কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই উৎপন্ন হয় নাই, মানুষের বুদ্ধিকৌশলেই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছে। চাষ হইতে উৎপন্ন প্রচুর ফলন বিশিষ্ট এক প্রকার আখের সহিত প্রথমতঃ যবদ্বীপের অতি নিকৃষ্ট ধরণের বন্য আখের মিলন ঘটাইয়া বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করা হয়। এই বন্য আখগুলি সম্পূর্ণরূপে চিনি বিবর্জ্জিত হইলেও রোগ-আক্রমণ প্রতিরোধ-ক্ষমতায় ছিল অদ্বিতীয়। তৎপরে সেগুলির সহিত বিবিধ গুণসম্পন্ন অন্যান্য আখের যোগাযোগ ঘটাইয়া তাহাদের বংশধরদিগের ভিতর হইতে নির্ব্বাচন-প্রথায় তিন-চার বৎসরের চেষ্টায় "P.O.J. 2878" উৎপাদন করা সম্ভব হইয়াছিল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রথমতঃ যে আবাদী-আখের মিলনে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার ক্রমোসোম্ সংখ্যা ছিল চল্লিশ; কিন্তু এই নবোৎপাদিত আখের ক্রমোসোম্ সংখ্যা হইয়াছে—এক শত বিশ। গমের মধ্যেও ক্রমোসোম্ সংখ্যার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বন্য অবস্থার আদিম গমের ক্রোমোসোম্ সংখ্যা ছিল চৌদ্দ; কিন্তু নূতন জাতীয় গমের ক্রোমোসোম্ সংখ্যা হইয়াছে বিয়াল্লিশ। এইরূপে বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন রকমের গমের সংযোগে বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করিয়া নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়ায় ডেভিড ফাইফ, বিখ্যাত 'রেড-ফাইফ' এবং ইউনাইটেড স্টেট্‌স্-এর সরকারী কৃষিবিভাগ 'কান্ রেড' নামক উৎকৃষ্ট গম উৎপাদন করিয়াছেন।

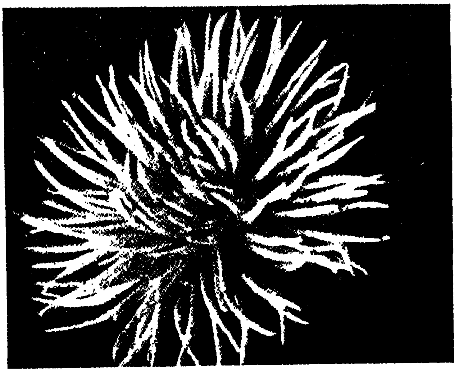
কিন্তু পৃথিবীতে কোন কালে যাহার অস্তিত্ব ছিল না এরূপ অভিনব উদ্ভিদ উৎপাদনে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর এবং যুগান্তকারী কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন আমেরিকার লুথার বার্ব্বাঙ্ক। নব নব উদ্ভিদ সৃষ্টিতে তাঁহার অপূর্ব্ব কৃতিত্বের জন্য তিনি সাধারণতঃ উদ্ভিদ-যাদুকর নামেই বিখ্যাত। বার্ব্বাঙ্ক উদ্ভিদ বিশেষের প্রকৃতি অনুযায়ী নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়ায়, দূর বা নিকট সম্পর্কিতদের মধ্যে পরাগনিষেকে, বর্ণসঙ্কর উৎপাদনে অথবা ক্ষেত্রবিশেষে উদ্ভিদের অ-যৌন বংশ বিস্তারের রীতি অনুসরণ করিয়া নূতন নূতন জাতীয় এত অধিক সংখ্যক রকমারি বৃক্ষলতা উৎপাদন করিয়াছিলেন যে, অনেকে তাঁহাকে ভগবানের সৃষ্টিতে হস্তক্ষেপকারী সয়তান বলিয়া অভিহিত করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই। তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি, যাদুকরের ভেল্কির মত ক্ষণস্থায়ী নহে। বংশাবলীতে পরিচালিত

হয় না অথচ অপূর্ব্ব গুণাবলী সমন্বিত যে-সকল উদ্ভিদ তিনি পরীক্ষা ব্যপদেশে উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহাদের



মানুষের চেষ্টায় উৎপাদিত উৎকৃষ্ট ধরণের প্রচুর ফলোৎপাদনকারী এক জাতীয় আপেল।

সংখ্যা অগণিত। নববিকশিত গুণাবলী যে স্থলে বংশ-পরম্পরায় অবিকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করে কেবল মাত্র তাহাদিগকেই তিনি বাঁচিতে দিয়াছেন। তাহারাই আজ নানাভাবে মানুষের সুখসম্পদ বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে। অস্থায়ী গুণসম্পন্ন অসংখ্য সৃষ্টি স্বহস্তে ধ্বংস করিয়া ফেলিলেও স্থায়ী গুণসম্পন্ন যাহাদিগকে বাঁচিতে দিয়াছেন তাহাদের সংখ্যার বিশালত্বে বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে মাসাচ্যুসেটস্-এর ল্যাঙ্কাস্টার নামক স্থানে লুথার বার্ব্বাঙ্ক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেন একটা অপরিসীম উদ্ভিদ-প্রীতি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিন বছর বয়সের সময়েই টবে রোপিত ছোট্ট একটা 'ক্যাক্‌টাস্' বা মনসা গাছ ছিল তাঁহার নিত্যসহচর। যেখানেই যাইতে হইত গাছটিকে কখনও সঙ্গছাড়া করিত না। অসামান্য উদ্ভিদ-প্রীতি থাকিলেও অভিভাবকের ইচ্ছায় অল্প বয়সেই তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হইল—এক এঞ্জিনীয়ারিং কারখানায়। স্বীয় প্রতিভাবলে এ স্থলে তিনি দুই-একটা নূতন ধরণের কলকজাও উদ্ভাবন করেন। ইতিমধ্যে অবসর সময়ে তাহার পিতৃব্যের কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভিদ লইয়া নানা প্রকার পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল ধৈর্য্যসহকারে কাজ করিতে করিতে অতি চমৎকার কতকগুলি ফসল উৎপাদনে সমর্থ হইলেন। প্রায় বিশ বৎসর বয়সের সময় ছোট্ট একটি বাগান ক্রয় করিয়া উৎকৃষ্ট ধরণের ফলমূল উৎপাদনে মনোনিবেশ করেন। অপূর্ব্ব কার্য্যদক্ষতার ফলে দিনের পর দিন বাগানের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি বিভিন্ন জাতীয় আলুর মিলন ঘটাইয়া তাহা হইতে নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়ায় নূতন ধরণের উৎকৃষ্ট এক প্রকার আলু উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই নূতন আলু 'বার্ব্বাঙ্ক পটেটো' নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। এই উন্নত ধরণের আলুর জন্য তাঁহার বাগানের নামডাক ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমশঃ বাগান হইতে লাভের অঙ্ক বার্ষিক চার হাজার পাউণ্ডে দাঁড়াইল। এই অর্থের অধিকাংশই তিনি উদ্ভিদ সম্পর্কিত বিবিধ পরীক্ষায় ব্যয় করিতে লাগিলেন। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে তিনি এই লাভজনক প্রতিষ্ঠান বিক্রয় করিয়া দিয়া সাণ্টারোজায় নূতন কৃষিক্ষেত্র এবং গবেষণাগার স্থাপন করিয়া অপরিসীম উদ্যমে কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। নূতন ধরণের উদ্ভিদ উৎপাদন সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। ইহার জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষার প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘকালের চেষ্টাতেও বাঞ্ছিত ফললাভ হয় না। বিবিধ পরীক্ষায় অকাতরে অর্থব্যয় করিতে করিতে এই সময়ে তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আর্থিক



কৃত্রিম পরাগনিষেক এবং নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন 'ক্যাকটাস্ ডালিয়া'

অস্বচ্ছলতা অপেক্ষাও মানসিক অশান্তিই সেই সময়ে বিশেষ পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। হাজার হাজার নূতন নূতন গাছ উৎপাদন করিয়া তাহাদের প্রায় অধিকাংশকেই যখন স্বহস্তে পোড়াইয়া ফেলিতে লাগিলেন তখন প্রতি-

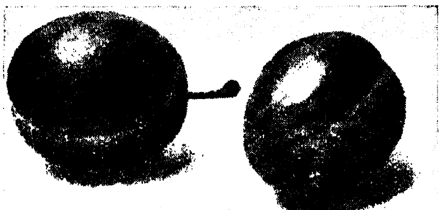
বেশীর ভাগ অনেকেই তাঁহার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিল। এরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও



বার্ব্বাঙ্ক উৎপাদিত এক জাতীয় সুস্বাদু পেঁয়াজ

কিছুমাত্র ভগ্নোৎসাহ না হইয়া পরীক্ষা চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর হাজার হাজার গাছ জন্মাইয়া পরীক্ষার ফলে আশানুরূপ প্রমাণিত না হইলে সেগুলিকে বিলকুল নির্ম্মমভাবে নষ্ট করিয়া ফেলিতেন। লাভ-লোকসান বা খ্যাতি-অখ্যাতির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া এই অক্লান্ত কর্ম্মী, তপস্বীর ন্যায় তাঁহার জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ ব্যয়িত করিয়া অপূর্ব্ব সিদ্ধিলাভ করিলেও লোকের তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপ ছাড়া আর বিশেষ কিছু লাভ করেন নাই। কিন্তু ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে অকস্মাৎ যেন অভাবনীয় দ্রুততার সহিত তাঁহার খ্যাতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ঐ বৎসর সানফ্রান্সিস্‌কোতে আমেরিকার কৃষি-কলেজ সম্মিলন আহূত হইয়াছিল। সম্মিলনের প্রতিনিধিবর্গ বার্ব্বাঙ্কের বাগান ও কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন করেন। তাঁহারা বার্ব্বাঙ্ক কর্ত্তৃক উৎপাদিত সম্পূর্ণ অভিনব উৎকৃষ্ট আলু, পেঁয়াজ, শত শত রকমারি আঙ্গুর, বাদাম, কুল এবং বিভিন্ন জাতীয় অন্যান্য বিবিধ প্রকারের ফুল ফল দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যান। কারণ এই জাতীয় ফলমূল ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনও দেখে নাই। এগুলি সবই ছিল বার্ব্বাঙ্কের অভিনব সৃষ্টি। অতীত যুগের বিশ্বামিত্র নাকি তপস্যার বলে নারিকেল ফল সৃষ্টি করিয়া খোদার উপর খোদকারি করিয়াছিলেন; কিন্তু এই কলির বিশ্বামিত্র যে সহস্র বা লক্ষ গুণে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন! যাহা হউক, কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহাদের পরিদর্শনের রিপোর্ট ফটোগ্রাফসহ প্রায় শতাধিক বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হইয়া গেল এবং প্রায় মাসখানেকের মধ্যেই এই উদ্ভিদ-যাদুকর বিশ্ব-বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। পৃথিবীর সুদূর প্রান্ত হইতেও প্রত্যহ শত শত দর্শক তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ভিড় জমাইতে লাগিল। এই সময়ে প্রতি দিন প্রায় পাঁচশত হইতে ছয় শত দর্শক আসিত। ছুটি বা পর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত বাদ যাইত না। পত্র ও টেলিগ্রামের সংখ্যা দৈনিক তিন শতেরও উর্দ্ধে উঠিয়াছিল। সময়াভাবে অনেক পত্র এমন কি টেলিগ্রাম পর্য্যন্ত অপঠিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। এত অধিক সংখ্যক দর্শক-সমাগমে সময়াভাবে তাঁহাকে অনেক সময় পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভোজন সমাপন করিতে হইত। ইহার ফলেই ক্রমশঃ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে।

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন মানুষের মুখ দেখিয়া মনের ভাব বুঝিতে পারে, বার্ব্বাঙ্কও ছিলেন উদ্ভিদ সম্বন্ধে তেমনই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। গাছগুলিকে দেখিবামাত্রই তিনি তাহাদের গুণাগুণ এবং বাঁচিয়া থাকিবার মত তাহাদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা বুঝিতে পারিতেন। সেই জন্যই তিনি প্রতি দিন সহস্র সহস্র গাছ পরীক্ষা করিয়া যথাযথ ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইতেন। অন্যথায় তাঁহার অভিনব সৃষ্টির সংখ্যা এরূপ বিপুল হইতে পারিত না। বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন ফুল ফলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি একত্রিত করিয়া তিনি অসংখ্য বিভিন্ন রকমের গোলাপ, লিলি, ডালিয়া, ডেজি প্রভৃতি ফুল এবং আঙ্গুর, বাদাম, পিচ, কুল, নাসপাতি, টোমাটো, শশা, তরমুজ প্রভৃতি অসংখ্য রকমারি ফল উৎপাদন করিয়াছিলেন। প্রচলিত ফুল ও ফল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় হইলেও নামগুলি প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরাতনই রহিয়া গিয়াছে। তবে



বার্ব্বাঙ্ক কর্ত্তৃক উৎপাদিত বৃহদাকৃতির এক জাতীয় কুল

কতকগুলির নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যেমন—আমেরিকার বন্য প্লাম, জাপানের কৃষিজাত প্লাম এবং এপ্রিকট ফলের সংযোগে উৎপন্ন নূতন এক প্রকার ফলের নামকরণ হইয়াছে—"প্লামকট"। বার্ব্বাঙ্ক কর্ত্তৃক উৎপাদিত বৃহদাকার

মনোরম ডেজি ফুল—সাষ্টা ডেজি নামে পরিচিত। প্লাম বা কুলের বিবিধ রকমের স্বাদ, গন্ধ, আকৃতি এবং

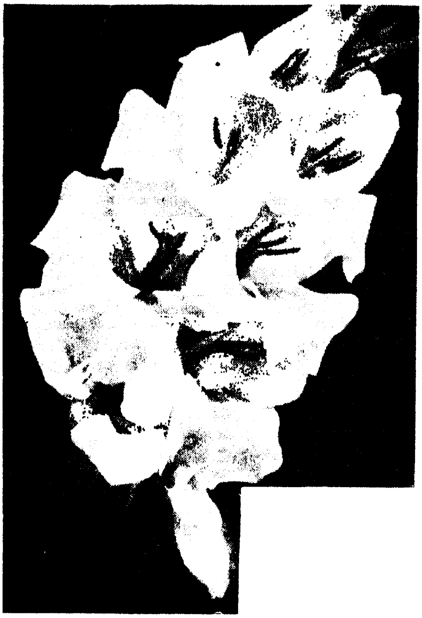


নির্ব্বাচন-কৌশলে উৎপাদিত এক প্রকার সুদৃশ্য এবং সুস্বাদু আপেল

বর্ণ উৎপাদনে তাঁহার একটা বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত এবং শক্ত আঁঠি-সমন্বিত, আঁঠিশূন্য অথবা কোমল আঁঠিযুক্ত ছোট, বড়, মাঝারি কত রকমের কুল যে উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কাঁটা-শূন্য খাদ্যোপযোগী 'ক্যাক্টাস্' বা মনসা গাছ উৎপাদন তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। তিনি পিচ ও নেক্টারিণের মিলনে এমন এক প্রকার ফল উৎপাদন করেন যাহা আকৃতি ও বর্ণে মনোমুগ্ধকর ত বটেই, অধিকন্তু পিচ অথবা নেকটারিন অপেক্ষা অধিকতর সুস্বাদু। পপি অথবা আফিং ফুল লইয়াও তিনি অতি অদ্ভুত কাজ করিয়াছিলেন। সাধারণ বন্য পপির সহিত পূর্ব্ব দেশীয় বিবিধ পপির মিলনে এমন এক জাতীয় পপি উৎপাদন করেন যাহার ফুল, আকৃতি ও বর্ণ-গৌরবে অতুলনীয়। ইহার এক-একটি ফুলের মাপ পাশাপাশি দশ ইঞ্চিরও বেশী। তিনি প্রায় হাজার দুই রকমারি পপি উৎপাদন করিয়াছিলেন। একজন দর্শক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—আপনি ত প্রচলিত ফুল-ফলের আকৃতি, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন; কিন্তু কোন দুর্গন্ধযুক্ত ফুলকে সুগন্ধযুক্ত ফুলে পরিণত করিতে পারেন কি? উত্তরে তিনি একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন—চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি। চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেনও। একজাতীয় বন্য ডালিয়ার দুর্গন্ধ অসহ্য। কয়েক বৎসরের চেষ্টায় এই দুর্গন্ধযুক্ত ফুলকে তিনি সুগন্ধি ফুলে পরিবর্ত্তিত করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, আকৃতি এবং বর্ণেও ইহাকে অতুলনীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি দুর্গন্ধ ও ঝাঁঝশূন্য কয়েক জাতীয় সুস্বাদু পিঁয়াজও উৎপাদন করিয়াছিলেন। মোটের উপর তাঁহার সান্টা রোজার বাগানে তিন লক্ষ বিভিন্ন রকমারি কুল, ষাট হাজার বিভিন্ন পিচ্ ও নেকটারিন, তিন হাজার আপেল, এক হাজার বিভিন্ন জাতীয় আঙুর, পাঁচ হাজারের অধিক বিভিন্ন জাতীয় বাদাম, বার শত কুইন্স, দুই হাজার চেরি, পাঁচ হাজার আখরোট, পাঁচ হাজার চেস্টনাট, ছয় হাজার বিবিধ জাতীয় বেরী উৎপন্ন হইত। তাছাড়া বিবিধ প্রকারের ফুল ফল, তরিতরকারী ও শাকসব্জীর সংখ্যা ছিল অগণিত। জাপানীরা যেমন শোভা বর্দ্ধনের জন্য বিশেষ প্রণালীতে বড় বড় গাছকে ক্ষুদ্রকায় গাছে রূপান্তরিত করে—উদ্ভিদের সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতার সুযোগ লইয়া স্থান সংকুলান অথবা শোভাবর্দ্ধনের নিমিত্ত শক্ত কাণ্ডসমন্বিত গাছকে লতানে গাছে পরিবর্ত্তিত করা তাঁহার পক্ষে অতি সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কৃত তথ্য সমূহকে ভিত্তি করিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উদ্ভিদের উৎকর্ষ সম্পাদন এবং নূতন নূতন ফলমূল শাকসব্জী উৎপাদনে উৎসাহ ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার অগণিত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু কৃষিপ্রধান হইলেও আমাদের দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণাব্যপদেশে দুই-একটি উদ্ভিদের কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকিলেও ব্যাপকভাবে কৃষিকার্য্যে অথবা উদ্ভিদ-উৎপাদনে তেমন কোন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। তবে এই বিষয়ে শান্তিনিকেতনে যে সকল কাজ হইতেছে তাহা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বভারতীর কর্ম্মসচিব রথীন্দ্রনাথ উদ্ভিদ-জীবন সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা এবং তৎসম্পর্কিত অসাধরণ কর্ম্মদক্ষতা লইয়া বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষলতার উৎকর্ষ সাধন এবং বৈচিত্র্য সম্পাদনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। প্রধানতঃ পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ আরম্ভ হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রের অনেক স্থলে সাফল্য লাভ হইয়াছে। টোমাটো গম প্রভৃতি কয়েক প্রকার ফসল যাহা শান্তিনিকেতনের চতুপার্শ্বস্থ অনুর্ব্বর ভূমিতে কোনকালেও জন্মাইতে দেখা যাইত না, সে সবগুলিকেও তিনি সফলতার সহিত জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছেন। সুদৃঢ় কাণ্ড এবং শাখা প্রশাখা সমন্বিত আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি গাছগুলিকে তিনি দেওয়ালের গায়ে লাগাইয়া লতা গাছে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন; তাহার ফলে দেয়ালের শোভা বর্দ্ধন, বেড়ার প্রয়োজন এবং তৎসহ ফলোৎপাদন এই কয়েক প্রকার কাজই সম্পাদিত হইতেছে। স্থানীয়

জমির ক্ষয় এবং তজ্জনিত অসমতা নিবারণকল্পে তিনি অন্যান্য ব্যবস্থার সহিত যেরূপ কৌশল সহকারে দেশী-বিদেশী বিবিধ উদ্ভিদের সহায়তা লইয়াছেন তাহা সত্য সত্যই অনুধাবনযোগ্য। মাটির আঁট বাঁধিবার জন্য এক প্রকার সুগন্ধি ঘাস আমদানি করিয়াছেন, এগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্টভাবে দ্রুতগতিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে যে, মনে হয় একদিকে যেমন ইহারা জমির ক্ষয় নিবারণ এবং উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হইবে অপর দিকে তেমনই অদূর ভবিষ্যতে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। পরিত্যক্ত পুরাতন আম্রকুঞ্জের নিষ্ফলা গাছের গুঁড়ির সহিত নূতন ডালপালার জোড় মিলাইয়া পুনরায় সেগুলিকে ফলবতী করিবার জন্য তিনি পরীক্ষা-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তা ছাড়া এরূপ অনুর্ব্বর ভূমিখণ্ডে কর্পূর, হিং, এলাচ প্রভৃতি নানা রকমের গাছ জন্মাইয়াছেন। তাহাদের সতেজ পত্রপল্লব, আয়তন এবং বৃদ্ধির হার দেখিলে মনে হয়, অচিরেই ইহারা দেশের সর্ব্বত্র বংশবিস্তারে সাফল্য লাভ করিবে। আলোক এবং উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া তিনি ঐস্থানে আনারস উৎপাদনেও কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার গোলাপবাগ এবং সব্জী বাগানের ফুলফল, লতাপাতার অবস্থা দেখিলে ঐ স্থানের মৃত্তিকার অনুর্ব্বরতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা স্বাভাবিক। বিশ্বভারতীর বহুমুখী বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকিয়া এবং অবসর মত যন্ত্রবিজ্ঞান এবং ললিত কলার অনুশীলনে



অ-সম মিলনোৎপন্ন বংশধরদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচনের ফলে উৎপন্ন লিলি-জাতীয় এক প্রকার ফুল।

সময়ক্ষেপ করিয়াও তিনি যে উদ্ভিদ সম্পর্কিত বিবিধ পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছেন ইহার ফল সুদূর প্রসারী হইবে বলিয়াই মনে হয়।

ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন

১৩৪২ সাল। ব্ল্যাক আউটের গাঢ় অন্ধকার রাত্রে শোনা যায় একটা গভীর আর্ত্তনাদ। মনে হয় আকাশের বুকে কে যেন তীক্ষ্ণ ছুরিকা দিয়া আঘাত করিতেছে।

শব্দটা ঠিক কোথা হইতে আসে, কে কাতরাইয়া ওঠে, কেন ওঠে কিছুই তার জানা নাই, অথচ এ কাতরানি মহেন্দ্রের ভাল লাগে, কে যেন স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখাইয়া দেয় তাঁর ব্যথাহত বুকের উপর। অনেক দিন পরে তিনি আজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন, আঃ—

ছয় মাসের মধ্যে এতটা আরাম মহেন্দ্র কোন দিনই বোধ করেন নাই; ঔষধ ও ইনজেকশন, সুশ্রূষা ও স্বজনের আশ্বাসবাণী কিছুতেই ব্যথার এতটুকু লাঘব হয় নাই। সামান্য শব্দেই তিনি বিরক্তি বোধ করেন, নাতি-নাতনীদের কলরবে পর্য্যন্ত স্নায়ুর উদ্বেগ হয়, আর আজ কিনা তাঁর ভাল লাগিল কর্ণপটহবিদারী ঐ নিনাদ যাহা শুনিলে সুস্থ মানুষেরও অস্বস্তি বোধ করার কথা।

কোল-বালিশটা বুকে টানিয়া তিনি চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন, প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন অন্তত আর একটা শব্দের, ঐরূপ আর একটা কাতরানির।

অসুখ তাঁর আজ এক বছরের, প্রথমে বাড়ীর বাহির হইতে পারিতেন, ডাক্তারের পরামর্শে বাহিরে যাওয়া বন্ধ

হইল। তার পর কয়েক দিন ঘুরিলেন উঠানে। চিকিৎসক কহিলেন, উহুঁ, সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন।

বাহির হইতে ঘর এবং কিছুকাল পরে ঘরের মধ্যেই শয্যাশ্রয়ী হইতে হইল। ঔষধ চলিল নানা রকম, পাউডার, মিক্শ্চার ও ইনজেকশন, চূর্ণ, বটিকা ও পাচন, হাজার ও লক্ষ শক্তির হোমিওপ্যাথিক ভেষজ, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। ব্যাধি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল।

কিন্তু চিকিৎসা যে-কোন একটা করাইতেই হইবে। ধর্ম্মেরই মতন চিকিৎসার সংস্কার মানুষজাতিকে পাইয়া বসিয়াছে, ধর্ম্মযাজক ও ডাক্তার—এরা তোমার উপকার করিবেই।

এদিকে দেহের ভার দিনের পর দিন দুর্ব্বিষহ হইয়া ওঠে, এই বিকল যন্ত্রকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া কোন রকমে চালু রাখিবার অর্থ হয় না, ইচ্ছাও করে না আর।

অফুরন্ত অবকাশের মধ্যে মহেন্দ্রের খালি মনে হয়, এ জীবনের সার্থকতা কি? ভাবিয়া ভাবিয়া হদিশ কিছু মিলে না। সুদীর্ঘ এই ষাট বৎসর দেশের ও সমাজের ত দূরের কথা, নিজেরও কোন উপকার তিনি করিতে পারেন নাই। বড় চাকুরী করিয়াছেন, মোটা পেন্সনও পান—কিন্তু এ সবে তৃপ্তি কোথায়? যে গতানুগতিক নিয়মে প্রভাতের পর সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পর আবার প্রভাত আসে সেই একই নিয়মে আহার, নিদ্রা প্রভৃতি জৈবিক চাহিদা মিটাইতেই ত দিনগুলি কাটিয়া গেল। শেষের দিকে প্রত্যহ ঘড়ি ধরিয়া আসিতে লাগিল, যন্ত্রণা ও অনিদ্রা, বার্লির জল ও শিরাপথে পঞ্চাশ সি. সি. গ্লুকোজ।

কে ভাবিয়াছিল চলতি পথে এমনি করিয়া তরী এক দিন চড়ায় আটকাইয়া যাইবে। কে জানিত যে জীবনের চলার ধর্ম্মই এই।

যে সূর্য্যের আলো ও জ্যোৎস্নায় মন আগে ফুলের মতন বিকশিত হইত, যে বাতাস কপোল স্পর্শ করিলে আরামের সুরে বলিতেন, আঃ! সেই আলো বাতাসও আজ ঔষধের মতন তিক্ত কটু হইয়া উঠিল। মহেন্দ্র ভগবানকে ডাকিলেন, প্রভু আর ত পারি নে।

ঠিক এই সময় একদিন কানে গেল অপরিচিত কণ্ঠের ঐ আর্ত্তনাদ। এক বার নয়, দু-বার নয়, বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে শব্দটা ভাসিয়া আসিতে লাগিল। মহেন্দ্রের উপর তার প্রতিক্রিয়া হইল মন্ত্রশক্তির মতন। ধীরে ধীরে তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। বসিয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিলেন। ঝিরঝিরে দক্ষিণ-বাতাসে শরীর জুড়াইয়া গেল।

ব্যাপারটা কাহাকেও বলিলেন না। পরের দিন রাত দুটা বাজিয়া গেল, মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময় বিধাতার আশীর্ব্বাণীর মতন আসিল গত রাত্রের সেই শব্দ। আজ আরও ভাল লাগিল, এবার আশা হইল সারিয়া উঠিবার।

সেই হইতে ঐ শব্দের সঙ্গে তাঁর মনের কেমন একটা যোগাযোগ স্থাপিত হইল, ঐ মানুষটি যেন তাঁর পরমতম আত্মীয়, শ্রেষ্ঠতম সুহৃৎ।

এত দিন মহেন্দ্র ছিলেন রোগ-দুর্ব্বল, নিতান্তই অসহায়। রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্গতাও বাড়িয়া যাইত। স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা সবই বর্ত্তমান, কিন্তু তিনি যেন নিতান্তই একা, তাঁর জগৎ তাদের জগৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

কিন্তু আজ সাথী মিলিয়াছে, মিলিয়াছে একজন সমব্যথী। সবাই যখন ঘুমন্ত, চরাচর নিদ্রামগ্ন তখন তাঁর সঙ্গে আরও একটি মানুষ জাগিয়া থাকে। অপর সকলে যখন জীবনকে উপভোগ করে তখন শুধু তাঁর একারই আর্ত্তি সুরু হয় না; আরও একজন রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করে, কাতরায়, আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। মহেন্দ্রের দুঃখকে সে সমানভাগে বণ্টন করিয়া লয়।

* * *

অনেক বড় বড় ডাক্তার মহেন্দ্রকে দেখিতেন। তিনি যে সারিয়া উঠিতে পারেন এ আশা তাঁরা কখনও করেন নাই।

অল্পকালের মধ্যেই তাঁর শরীরের অভাবিতপূর্ব্ব এই পরিবর্ত্তনে সকলেই বিস্মিত হইলেন।

ডক্টর চৌধুরী বলিলেন, এ একটা ওয়াণ্ডারফুল কেস, মেডিক্যাল জার্নালে রিপোর্টেড হবার মতন।

কর্ণেল হোয়াইটহেড মন্তব্য করিলেন, ইয়েস ইট ইজ। তবে আড়াই-শ ইনজেকশন আমরা দিয়েছি। তারও ত একটা ফল আছে।

মহেন্দ্রের স্ত্রী দয়াময়ী মানত করিয়াছিলেন, স্বামী সারিয়া উঠিলে শিবালয়ে এক মণ সন্দেশের ভোগ দিবেন। রোগ একটু কমিতেই আধমণ ভোগ পড়িয়া গেল। দয়াময়ী দেবতাকে বলিলেন, ওঁকে সারিয়ে তোল ঠাকুর, আরও এক মণ দেব।

* * *

কয়েক দিন পরের কথা। মহেন্দ্র এক দিন রাত্রে চাকরকে ডাকিলেন, উত্তম! এই উত্তম!

উত্তম বাবুর ঘরেই শোয়। ঘুম ভাঙিলে সে বলিল, কি বাবু?

—শুনছিস ঐ শব্দ ?

—কিসের কথা আপনি বলছ ?

—তোমার মাথার। এমন বদ্ধ কালাই হয়েছ যে অত বড় চীৎকারটাও তোমার কানে যায় না। যাক্, কালীতলায় একটা লোক গোঙাচ্ছে, সম্ভবত ভিখারীই হবে। যাও, তার খবর নিয়ে এস। তাকে বলবে কাল সকালে আমার কাছে আসতে।

উত্তম ভাবিল, বাবু এ বলে কি? শব্দ ত কিছুই শোনা যায় না। আর গেলেই বা বাবুর তাতে কি? কত অভাগীর পুতই ত রাস্তায় চেঁচায়। দৌড়াইয়া গিয়া তাদের খবর লইতে হইবে—এই কন্‌কনে শীতের রাত্তিরে।

লোকটাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাবুকেও অভিশাপ দিয়া উত্তম বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া বলিল, এই তল্লাটে ত কেউ চেঁচান নি বাবু। মহেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, যথেষ্ট হয়েছে। যান, আপনি এখন ঘুমোন।

পরের দিন আবার উত্তমকে পাঠান হইল। মহেন্দ্র বলিয়া দিলেন, কালীতলার পুবের রাস্তায় যা—বাবুদের বাড়ীর সামনেটা দেখবি। লোকটি ওখানেও থাকতে পারে। পেলেই নিয়ে আসবি। বলবি, বাবু তোমায় কিছু বকশিশ দেবে, ডাক্তার দেখাবে।

উত্তম আজও বিফলমনোরথ হইয়া আসিল। মহেন্দ্র গম্ভীর হইয়া গেলেন। তবে কি তাঁরই ভুল? শব্দটা কোথা হইতে আসে হয়ত ঠিক অনুমান করিতে পারেন নাই।

শব্দের সন্ধানে—বিশেষত রাত্রিকালে ওরূপ ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

এবার বড় ছেলে ক্ষৌণীশের ডাক পড়িল। মহেন্দ্র সব কথা তাকে খুলিয়া বলিলেন।

ক্ষৌণীশ বলিল, আজই ব্যবস্থা করছি, বাবা।

মহেন্দ্র বলিলেন, লোকটি আমায় ভারী রিলিফ্ দিয়েছে। দেখ, ওর যদি কোন উপকার করতে পার, সেটা হবে তোমাদের পিতৃ-ঋণ শোধ করার সামিল!

ক্ষৌণীশ একটু ক্ষুণ্ণ হইল, এত সেবা-যত্ন করিয়া, অর্থ ব্যয় করিয়া পিতাকে তারা একটু সুস্থ করিয়া তুলিয়াছে আর কৃতজ্ঞতা পাইল কি না পথের একজন ভিখারী!

মহেন্দ্র বলিলেন, গন্ধেশ্বরী-তলাও একবার দেখো, আর দেখো আঠারো হাত কালীবাড়ীর সামনেটা।

ক্ষৌণীশরাও খুঁজিল কিন্তু কোন কিনারা করিতে পারিল না।

মহেন্দ্র বলিলেন, বেশ, আজ রাত্তিরে এই ঘরে এসে তোমরা শুনো। তাহলেই অনুমান করতে পারবে, কোত্থেকে সে চেঁচায়।

রাত্রে দয়াময়ী, ক্ষৌণীশ, তার ভাই বুড়ো এবং তাদের কাকা ধ্রুব সকলেই কর্ত্তার ঘরে উপস্থিত হইলেন। রাত দু'টার পর মহেন্দ্র বলিলেন, শুনছ—ঐ, ঐ চীৎকার! ষ্টার্টার ঘুরিয়ে দিলে পুরনো মোটর যেমন ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে গলার আওয়াজটা ঠিক সেই রকম।

সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র কহিলেন, ওঃ তোমরা শুনতে পারছ না বুঝি?

একটু থামিয়া তার পর বলিলেন, আশ্চর্য্য, কোন ওষুধেই ধরল না অথচ ফল হ'ল ঐ শব্দে। একে সাইকিক বলতে পারো, ঠিক সাইকিকও নয়, কেমন যেন মন্ত্রশক্তি অথবা ইথিরিয়াল ভাইব্রেশনের ফল।

* * *

লোকটির কোন খোঁজই পাওয়া যায় নাই। ঐরূপ কোন শব্দও কেহ শুনিতে পায় নাই। তাই বাড়ীর সবাই সিদ্ধান্ত করিয়াছে ব্যাপারটা রোগ-দুর্ব্বল মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র।

এদিকে মহেন্দ্র দিনের পর দিন বিরক্ত হইয়া উঠেন, সর্ব্বদাই খিট-খিট করেন। কি অপদার্থ এ লোকগুলা সব!

রোগ আবার বাড়িয়া যায়। মহেন্দ্র হতাশভাবে বলেন, আমি আর বাঁচব না। দরকার নেই বাঁচার।

সাহস করিয়া কেহ আর সামনে আসে না, আসিলেও প্রশ্ন করে না। কারও কারও সন্দেহ হয় যে ঐ শব্দ তিনি নিজেও আর শুনিতে পান না এবং পান না বলিয়াই অসুখ পুনরায় বাড়িয়া চলিয়াছে।

এক দিন কমল কহিল, দাদু, তোমার মাথা খারাপ।

সাত বৎসর বয়স্ক পৌত্রের সার্টিফিকেট পাইয়া মহেন্দ্র খুশী মনে কহিলেন, হ্যাঁ ভাই।

কমল কহিল, তাই অসুখ বাড়ছে তোমার।

—কে বলেছে এ কথা?

পিতামহের এবার অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বরে ভীত হইয়া কমল কহিল, না না, কেউ বলে নি।

শেষে কমলালেবু ও আপেল ঘুষ পাইয়া এবং চারিটা পয়সা নগদ আদায় করিয়া কমল বলিল, দাদী বলে।

দাদী বলে, আমার মাথা খারাপ!

—হ্যাঁ, মা কাকী ওদের সামনে বলেছে।

—কি বলেছে ?

রাত্তিরে কেউ চেঁচায় না, কেউ শুনতে পায় নি। তোমার মাথা খারাপ কি না তাই তুমি শোন।

মহেন্দ্রের চোখ দুটা লাল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, ডাকো, ডাকো তোমার দাদীকে।

ঠাকুরমাকে ডাকিতে কমলের সাহসে কুলাইল না। মহেন্দ্র ডাকিলেন, তুষ্টু !

ভৃত্য তুষ্টুচরণের পরিবর্ত্তে উপস্থিত হইলেন গৃহকর্ত্রী স্বয়ং। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে ?

—বেশ নাটুকেপনা করতে পার ত। নিজেই টিটকারী দাও, আবার সাধু সাজ।—উত্তেজনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর আরও উচ্চগ্রামে চড়িতে থাকে ও বুক চাপিয়া ধরিয়া মহেন্দ্র হাঁপাইতে আরম্ভ করেন্।

দয়াময়ী বলিলেন, মিথ্যে মাথা খারাপ ক'রো না, একটু স্থির হও !

—মিথ্যে নয়, একেবারেই মিথ্যে নয়। বৌদের কাছে বলবে আমার মাথা খারাপ, নাতি-নাতনির্দের সঙ্গে হাসাহাসি করবে।

সামান্য কিছু হ'লেই তুমি এমন ঘোঁট পাকাতে পার, বাপু।

—ঘোঁট, আমি ঘোঁট পাকাই—কথা আর শেষ হইল না, মহেন্দ্র বিছানায় পড়িয়া ছটফট্ করিতে লাগিলেন।

মেজ ছেলে বুড়ো ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল।

সেদিনকার মতন ফাঁড়া কাটিয়া গেলেও ক্রমে ক্রমে সকলেই আশা ছাড়িলেন। এখন ভরসা মাত্র সেই মানুষটার। তাকে দেখিলে ব্যাধির যদি কিছু উপশম হয়। দয়াময়ী বলিলেন, যে করে হোক্ তোমরা ওর খোঁজ কর, বুড়ো। যত টাকা লাগে আমি দেব।

বেশ মোটা টাকাই ব্যয় হইয়া গেল। রোঁদের পাহারাওয়ালা, কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার, পাড়ার রাত্রিচরেরা সকলেই কিছু কিছু পাইল। কেহ খোঁজ করিল ভবিষ্যতের বকশিশের আশায়, কেহ স্তোক দিয়া বকশিশ আদায় করিয়া লইল।

রাস্তা হইতে রোগীও ধরিয়া আনা হইল কয়েক জন। তাদের গলা শুনিয়াই মহেন্দ্র বলিলেন, না না, বিদেয় করে দাও ওদের সব।

এক-এক জন আসিয়া ব্যর্থতার খবর দেয় আর মহেন্দ্র বলেন, ওঃ, তুমিও পারলে না। বেশ বেশ, সবই আমার কর্ম্মফল। এক দিন যিনি একজন জাঁদরেল পুলিস সুপার ছিলেন আজ তাঁর চোখে ফুটিয়া ওঠে কসাইর হাতের গরুর চাহনির মতন অসহায় করুণ ভাব।

* * *

নিয়মভঙ্গের রাত্রি। জ্ঞাতি-কুটুম্বদের খাওয়াইয়া বাড়ীর লোকেরা সব শুইয়া পড়িয়াছে। জাগিয়া শুধু দয়াময়ী একা। ছায়াচিত্রের ছবির মতন তাঁর চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের অনেক স্মৃতি, যেন এই সেদিনের কথা। কিন্তু তা ত নয়—তার পর কাটিয়া গেছে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ।

সুখে-দুঃখে, মিলনে-বিরহে, কলহ-শান্তিতে চল্লিশটা বছর কাটাইলেন যাঁর সঙ্গে, নিজেকে যাঁর সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি আজ কোথায়, ঐ তারকাগুলির কোন্‌টায় ?

নিজের অভাবের বেদনা যে কত গভীর তাহা উপলব্ধি করার সময়ও এই কয়দিন ছিল না। এ আসে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে, আর একজন আসিয়া করে তাঁর স্বামীর গুণকীর্ত্তন, কি রাজার মতন মানুষটাই ছিলেন মহেন্দ্রবাবু।

যত সব ছেঁদো কথা, কিন্তু এগুলি এড়াইবার উপায় নাই। সমাজে থাকিতে গেলে ইহারও মূল্য দিতে হইবে। তার উপর দেবররা পুত্রকন্যারা চায় কর্ত্তার শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে পরামর্শ, চায় উপদেশ।

কেহ বা আসে উপদেশ দিতে, রায় বাহাদুরের শ্রাদ্ধে এটা করা চাই, ওটা না হইলে অঙ্গহানি হইবে।

শ্রাদ্ধের পর গভীর নিশ্চিন্ততা ও নিস্তব্ধতার মাঝখানে আজ তাঁর বুকের মধ্যে হু-হু করিতে থাকে, মনে হয় সবই ফাঁকা, অর্থহীন! চোখের পাতা ভিজিয়া যায়। দয়াময়ী ধ্যান করিতে থাকেন স্বামীর দীর্ঘ কান্তিমান মূর্ত্তি—মনে পড়ে বিবাহ রাত্রের প্রথম সম্বোধন, স্ত্রীকে ডাকিতে গিয়া তরুণ মহেন্দ্রের কণ্ঠ তখন আবেগে জড়াইয়া আসিয়াছে।

মনে পড়ে নিজেদের কলহের কথা, চটিয়া গেলে মহেন্দ্রের জ্ঞান থাকিত না, যা-তা বলিতেন। পরমুহূর্ত্তেই আবার অনুতপ্ত হইতেন, ক্ষমা চাহিতেন, রাগ ক'রো না লক্ষ্মীটি। আমি বড় বদ্‌রাগী, মাফ কর আমায়। স্ত্রীর চোখের জল মুছাইয়া দিতেন ওষ্ঠের সাদর স্পর্শ দিয়া।

ধীরে ধীরে দয়াময়ীর চোখ বুজিয়া আসিল।

খানিকটা পরে কি একটা শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘুম ভাঙার পরও কানে বাজিতেছিল সেই শব্দ, একটা চাপা কান্নার সুর—দূরে কে যেন কাঁদিতেছে।

সেই হইতে প্রতি রাত্রেই তিনি জানালার কাছে

বসিয়া থাকেন, প্রতীক্ষা করেন ঐ শব্দের। উহা শুনিবার জন্য চিত্ত উদ্বেল হইয়া থাকে।

কিন্তু বাড়ীর কাহাকেও কিছু বলেন না। মানুষ যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত গুরুমন্ত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করে এই সম্বন্ধেও তিনি সেইরূপই নীরব রহিলেন। এ যেন তাঁর স্বামীর শেষ স্মৃতি, এর মর্য্যাদা অপরে কি বুঝিবে।

বাড়ীর অনেকেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শেষে এক দিন ছোট বধূ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ওরকম বসে আছেন কেন মা?

দয়াময়ী বলিলেন, শুনতে পাচ্ছ না? এস, বস এসে কাছে।

বধূ কাছে আসিয়া বসিল।

খানিকক্ষণ পরে দয়াময়ী বলিলেন, শুনতে পাচ্ছ না বুঝি? তা তোমরা পাবে না। তার পর ফিস্ ফিস্ করিয়া আরম্ভ করিলেন, রোজ এই সময় রাস্তায় কে একজন কাঁদে। তোমার শ্বশুর এই শব্দই শুনতে পেতেন। অমন জ্ঞানীগুণী লোক ছিলেন, ওঁদের ত আর ভুল হয় না।

বধূ নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দয়াময়ী তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন, ব'লো না যেন কাউকে, বললে আর শুনতে পাওয়া যাবে না।

উপন্যাসে গ্রাম ও গ্রাম-জীবনের আদর্শ

শ্রীকমলা দেবী

১

প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর পূর্বে বাংলা দেশে ইংরেজের রাজত্ব স্থাপন একটা অদ্ভুত ব্যাপার। বহু দূর দেশ হইতে এক দল বণিক ব্যবসায় উপলক্ষে এ দেশে আসিয়া কেমন করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের মালিক হইয়া বসিল, কেমন করিয়া "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল', পোহালে শর্বরী রাজদণ্ড রূপে" তাহার ইতিবৃত্ত রূপকথার মত মনে হয়। সেদিন হইতে ইংরেজের সমৃদ্ধি ও শক্তি তাহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের মধ্যে প্রধান আসনে স্থাপিত করিয়াছে। আর সেই বিদেশী বণিক-রাজের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থায় এ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যে বিপর্যয় ঘটাইয়াছে তাহার ফলে এ দেশের পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থা ও পারিবারিক বন্ধন শুধু শিথিলই হয় নাই, প্রায় ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। বিগত দেড় শত বৎসরে পাশ্চাত্য মহাদেশে যন্ত্র-বিজ্ঞানের যে কল্পনাতীত উন্নতি হইয়াছে তাহাতে পৃথিবীর স্বরাট্ দেশগুলির নরনারীদের জীবন-যাত্রায় অভূতপূর্ব আরাম ও আরোগ্যের ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়াছে, কিন্তু ইংরেজের শাসনাধীনে থাকিয়াও এ দেশের কোটি কোটি নরনারী প্রায় আদিম অবস্থার জীবন যাপন করিতেছে—আরাম-আরোগ্য তাহাদের স্বপ্নেরও অগোচর বস্তু। বিজ্ঞান-লালিত আধুনিক সভ্যতার উন্নত যুগেও ম্যালেরিয়া-জীর্ণ পল্লীবাসীর ঘরে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, স্বাস্থ্য নাই, শিক্ষা নাই,—দুর্বহ জীবনে আনন্দ নাই বৈচিত্র্য নাই।

এ দেশের প্রায় পনর আনা লোক গ্রামে বাস করে। বলিতে গেলে কৃষি-কর্মই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ও ভরসা। তাহাও সম্পূর্ণ রূপে দৈব কৃপার উপর নির্ভর করে। অনাবৃষ্টি ও প্লাবন হইতে বাঁচিবার মনুষ্যায়ত্ত কোন উপায় তাহাদের সাহায্যে নিয়োজিত হয় নাই। বয়নশিল্প, রেশম-শিল্প, রঞ্জনশিল্প, ধাতুশিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতি যে সকল শিল্প বাংলার গ্রামে গ্রামে বহু শতাব্দী ধরিয়া উত্তরোত্তর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া দেশ-বিদেশের লোকের বিস্ময়ের বস্তু হইয়াছিল এবং যাহা বহু লক্ষ শিল্পী শ্রমিক ও বণিকের অন্ন-সংস্থানের ও সমগ্র ভাবে দেশের ধনাগমের উপায় স্বরূপ ছিল তাহা দিনে দিনে বিনষ্ট হইয়া লুপ্ত কিংবা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে পল্লীবাসী নরনারীর জীবন-প্রবাহ অতি মন্থর গতিতে একই খাতে বহিয়া চলিয়াছে—স্বাধীন দেশের ন্যায় সহস্রবিধ চরিতার্থতায় নানা কর্মধারায় ধাবিত হইবার পথ খুঁজিয়া পায় নাই। দেশের জনসাধারণ জীবিকা অর্জনে, তথ্যানুসন্ধানে, জ্ঞান আহরণে, নানা প্রয়োজনে—নিছক জীবন চাঞ্চল্যে প্রচুর প্রাণশক্তির তাড়নায় দলে দলে জগতের আনন্দ-যজ্ঞে ছুটিয়া বাহির হইতে পারে নাই। চির বুভুক্ষু অর্ধনগ্ন নির্জীব নিরানন্দ গ্রামবাসী জনসাধারণ যুগযুগান্ত ধরিয়া সংকীর্ণ গ্রাম পথে ন্যুব্জ দেহে ক্লান্ত পদে "শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি" নতশিরে বহন করিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু পরাধীনতার সকল দুঃখ-দৈন্য-গ্লানির মধ্যেও আমাদের এইটুকু আশা ও সৌভাগ্যের কথা যে, এখনও এ দেশের মানুষের মন নিষ্পিষ্ট হইয়া মরিয়া যায় নাই—এমন অবস্থার মধ্যেও বহু মনীষাসম্পন্ন ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। বরং বিজাতীয় সভ্যতার সংঘাত বাঙালীর চিত্তে যে জাগরণের সাড়া জাগাইয়াছে তাহাতে প্রাচীন ও মধ্য যুগের পয়ার-ত্রিপদী প্লাবিত ছড়া-পাঁচালী মঙ্গল-কাব্যের স্বল্প পরিসর গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার রাজপথে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের দিব্য প্রতিভা বাংলা কাব্য ও কথা-সাহিত্যকে অল্প দিনের মধ্যে প্রাদেশিকতার অনেক উর্ধ্বে বিশ্ব-সাহিত্যের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

সাহিত্য সামাজিক মানুষের মনের সৃষ্টি বলিয়া সকল সাহিত্যেরই একটা বৃহৎ অংশ সমাজের ভাল মন্দ নানা সমস্যার বিচার ও আলোচনায় পরিপূর্ণ। বাংলাদেশের বেশীর ভাগ লোকই গ্রামে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে বলিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে বহু দিন যাবৎ যে জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে চিন্তাশীল বাঙালী সাহিত্যিকরা গল্পে উপন্যাসে নাটকে প্রবন্ধে তাহার গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। এক দিন যে গ্রামে 'মর্মরায়মান বেণু-কুঞ্জে, আম-কাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিত, অতিথিশালা স্থাপিত হইত, পুষ্করিণী খনন চলিত, গুরু মহাশয় শুভঙ্করী কষাইতেন, টোলে শাস্ত্র অধ্যাপনা চলিত, চণ্ডী-মণ্ডপে রামায়ণ পাঠ হইত এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত হইত, সেই গ্রাম এখন নিরন্ন, স্বাস্থ্যহীন, শ্রীহীন! ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বেও বাংলার গ্রামে যে শোভা ছিল, গ্রামবাসীদের জীবন যে-আদর্শে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হইত তাহারই কথা 'ধ্রুবতারা' নামক সেকালের একখানি প্রসিদ্ধ উপন্যাসে লিখিত হইয়াছে। ইহার লেখক ৺যতীন্দ্রমোহন সিংহ এক জন বিদ্বান্ ও যশস্বী লেখক ছিলেন। তিনি দেশের পুরাতন আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতির পক্ষপাতী নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তাঁহার বর্ণিত পল্লী-গ্রামের একটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের একখানি চিত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"দুইটি কারণে এই দত্ত-পরিবার এতদ্দেশে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের অতিথিসৎকার বিষয়ে উদারতা দেশ প্রসিদ্ধ। রমানাথের পিতা ৺রাধামাধব দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুকালে পুত্রগণের প্রতি আদেশ ছিল—'বাবারা, দেখিও যেন অতিথি কখন আমার বাড়ী হইতে ফিরিয়া না যায়।' তাঁহার এই আদেশ পুত্রগণ এ যাবৎ কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। জ্যেষ্ঠ দ্বারকানাথ ফরিদপুরে মোক্তারি করিয়া অনেক টাকা উপার্জন করিতেন। তাহার সমস্তই তিনি নানাপ্রকার পুণ্যকার্যে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে সংসারে অনটন আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদের ভূসম্পত্তিতে বার্ষিক ১২০০ টাকা আয়, এতদ্ভিন্ন খামার জমিতে বিস্তর ধান পাওয়া যায়। এই আয় দ্বারা সংসারের সম্পূর্ণ খরচ নির্ব্বাহ হয় না। পরিবারে লোকসংখ্যা কুড়িটি, ইহা ছাড়া অতিথি-অভ্যাগত ও কুটুম্ব প্রায় লাগিয়াই আছে। এই গ্রামটি ফরিদপুর যাওয়ার পথে পড়ে বলিয়া অনেক মামলা-মোকদ্দমাকারী লোক সন্ধ্যার পর তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়া রাত্রিবাস করে। এখানে আসিলে কেহ বিমুখ হইয়া প্রত্যাগত হইবে না জানিয়া অনেকে তাঁহাদের আতিথ্যধর্ম্মের অপব্যবহার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হয় না। এই অতিথিসৎকার ভিন্ন দুর্গোৎসব, দীপান্বিতা, দোল প্রভৃতি 'বার মাসে তের পার্ব্বণ', ব্রত-নিয়ম, ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল ব্যয়ের জন্য দত্ত মহাশয়ের বিস্তর টাকা ঋণ হইয়াছে। মহেন্দ্র কেরাণীগিরি করিয়া যে মাহিনা পান, তাহাতে তাঁহার বাসা খরচ চলা কঠিন। তাঁহার দ্বারা সংসারের বিশেষ কোন আনুকূল্য হয় না, তবে তাঁহার বাসায় থাকিয়া কয়েকটি ছেলে লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছে, ইহাই লাভ।

"অতিথিসৎকার ভিন্ন দত্ত-পরিবারের সুখ্যাতির আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। তাহা এই পরিবারস্থ সকলের নিরবচ্ছিন্ন একতা ও হৃদয়ের প্রীতিস্নিগ্ধ ভদ্রতা। এ জন্য এই পরিবারটিকে আদর্শ হিন্দু পরিবার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দত্ত মহাশয়েরা চারি সহোদর চারি দেহে এক আত্মা ছিলেন। তাঁহাদের সহধর্ম্মিণিগণও যেন চারিটি সহোদরা ভগিনী। এ পরিবারে কেহ কখন স্বার্থপরতা হিংসা-দ্বেষ কলহ দেখে নাই। পুত্র-কন্যা-বধূগণের চরিত্রও সেই একই ছাঁচে ঢালা। দ্বারকানাথের জীবদ্দশাতেও রমানাথই সংসারের কর্তৃত্ব করিতেন, কারণ দ্বারকানাথ অধিকাংশ সময়ই কর্ম্মস্থলে থাকিতেন। কিন্তু রমানাথ কর্ত্তা হইলেও দ্বারকানাথের সহধর্ম্মিণী জয়দুর্গাই প্রকৃত পক্ষে সংসারের কর্ত্রী ও গৃহিণী। রমানাথ অনেক বিষয়েই তাঁহার পরামর্শ লইয়া কাজ করেন। অন্তঃপুরেও অবশ্য সকলেই তাঁহার মতে চলেন, তিনিও স্নেহের ডোরে সকলকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার নিজের কোন পুত্র নাই,—রমানাথ ও হরিনাথের পুত্রগণই তাঁহার পুত্রস্থানীয়। সেই পুত্রগণও তাঁহাকে নিজ নিজ গর্ভধারিণী জননীর মত দেখেন। তিনি সকলেরই 'বড়-মা'। এমন কি, বাড়ীর ভৃত্যগণেরও তিনি 'বড়-মা'।"

পূর্ব বঙ্গের একটি গ্রামে এই দত্ত পরিবারের নিবাস। গ্রন্থকার সেই গ্রামের ও দত্তদের বাড়ীর যে মনোরম বিবরণ দিয়াছেন তাহার কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ক্ষুদ্র ফরিদপুর সহরটিকে একটি বৃহৎ পল্লী বলিলেই ঠিক হয়। তাহার অবিরল-সন্নিবিষ্ট স্নিগ্ধচ্ছায়াবহুল বটবৃক্ষশ্রেণী এবং শ্যামল-শষ্পমণ্ডিত প্রান্তরের শোভা অতুলনীয়। ফরিদপুরের ঠিক দক্ষিণে ঢোল-সমুদ্র নামক একটি প্রকাণ্ড বিল ছিল। এই দশ-পনর বৎসরের মধ্যে পদ্মার বালি পড়িয়া তাহা ভরিয়া গিয়াছে। এক সময়ে যে তরঙ্গসঙ্কুল বিশাল হ্রদ পাড়ি দিতে মাঝিগণ নৌকার 'আগা গলুই'তে 'দুধপানি' দিয়া পারের নামে আধ পয়সার সিন্নী মানৎ করিত, আজ সেখানে গ্রাম বসিয়াছে। ইহা বিচিত্র লীলাময়ী পদ্মার একটি অদ্ভুত লীলা।

"এই ঢোল-সমুদ্রের দক্ষিণ পাড়ে ফরিদপুর হইতে প্রায় তিন মাইল

দূরে কাজলপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটি খুব প্রাচীন। প্রাচীন বলিয়া আম, বাঁশ, তাল, তেঁতুল, বট প্রভৃতি তরুময় নিবিড় বন-সমাকীর্ণ। এ গ্রামে ভদ্রলোকের বাস নিতান্ত অল্প। কেবল কাজলপুর বলিয়া নয়, বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই এই একই দশা। অনেক পুরাতন গ্রামে বন জঙ্গলের যে পরিমাণে বৃদ্ধি, প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশ সকলের সেই অনুপাতে ক্ষয়। এ গ্রামের অধিকাংশ লোকই মুসলমান ও নমঃশূদ্র কৃষিজীবী। কায়স্থ বংশসম্ভূত রমানাথ দত্তই একমাত্র সম্পন্ন গৃহস্থ। তিনি এ গ্রামের তালুকদার।

* * *

"দত্তদিগের বাড়ীটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা—তিন খণ্ডে বিভক্ত। 'বাড়ী' বলিতে পাকা কোঠা নহে—অনেকগুলি মাটীর ভিৎ, দরমার বেড়া ও খড়ের চালযুক্ত ঘরের সমষ্টি। দক্ষিণের খণ্ডে চারিখানি ঘর—তাহার উত্তরের খানি চণ্ডীমণ্ডপ, দক্ষিণের খানি বৈঠকখানা, অন্য দুইখানি খুব লম্বা ঘর অতিথিশালারূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের নাম 'নাকারি ঘর'। এই গৃহ চতুষ্টয়ের মধ্যস্থলে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ; পূর্ব্বে এখানে একখানা বড় নাটমন্দির ছিল—কয়েক বৎসর হইল, তাহা পড়িয়া গিয়াছে, আর তোলা হয় নাই। বাড়ীর মধ্যখণ্ডের মধ্য স্থলেও বিস্তৃত উঠান, তাহার চারি দিকে চারিখানি বড় বড় ঘর। সেগুলি শয়ন-গৃহ রূপে ব্যবহার করা হয়। উঠানের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে আর দুইখানা ছোট ঘর আছে। তাহাও আবশ্যক মত শয়ন-গৃহ রূপে ব্যবহৃত হয়।

"উত্তরের খণ্ডে দুইখানা রন্ধনশালা, ঢেঁকিশালা এবং আরও দুই-তিন খানা ছোট ছোট ঘর আছে। বাড়ীর উত্তর ও পশ্চিমে আম, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারি, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষ পরিপূর্ণ বাগান। অন্দর খণ্ডের পূর্ব্ব দিকে একটি ছোট পুষ্করিণী আছে তাহার জল দুর্গন্ধময় এবং পানায় পরিপূর্ণ। বহির্ব্বাটীর দক্ষিণে একটি বড় পুষ্করিণী আছে, তাহার জল এক সময়ে খুব ভাল ছিল, এখন সংস্কারাভাবে কিছু খারাপ হইয়াছে; তবু এই জলই গ্রামবাসিগণের একমাত্র সম্বল। এই পুকুরের উত্তর-পাড়ে ও বৈঠকখানার দক্ষিণে একটি ফুলবাগান। তাহাতে জবা, টগর, কাঁটালি-চাঁপা, মল্লিকা, রজনীগন্ধা, অপরাজিতা, রক্তকরবী প্রভৃতি ফুল ফুটিয়া আছে।

"সমগ্র বাড়ীটি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঘরের দাওয়াগুলি সুমার্জ্জিত, শাদা ধবধবে। বাড়ীটি দেখিলেই বোধ হয়, যেন এখানে লক্ষ্মীর দৃষ্টি আছে। আর তাহা না থাকিবেই বা কেন? যেখানে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সর্ব্বজনপ্রীতি ও চিত্তপ্রসাদ, সেখানেই কমলার কৃপা দেদীপ্যমান। যিনি কমলাকে কেবল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া জানেন, তিনি ভ্রান্ত। লক্ষ্মীর আর একটি নাম 'চঞ্চলা'। এ নামটি কেবল তিনি বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল বলিয়া নহে। যেখানে চঞ্চলতা অর্থাৎ উদ্যম ও কর্ম্মশীলতা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও শান্তি আছে, সেখানেই তিনি বিরাজমানা বুঝিতে হইবে। আর যেখানে জড়তা ও অলসতা এবং তাহার অনুচর স্বার্থপরতা ও অশান্তি কমলা তাহার ত্রিসীমায়ও পদার্পণ করেন না। এক দিন কর্ম্মশীল ও শান্তিসুখময় ভারত তাঁহার পীঠস্থান ছিল। কিন্তু হায়! আজ তাহা নিরবচ্ছিন্ন জড়তার ক্রোড়ে সুষুপ্তিময়।"

গ্রন্থের এক স্থানে লেখক এই পরিবারের উন্নতমনা গৃহকর্ত্রীর সহিষ্ণুতা, উদারতা, সদ্বিবেচনা ও পরিবারের ছোট-বড় সকলের প্রতি সহৃদয় সমদৃষ্টির এবং পরিবারের অন্যান্য অন্তঃপুরচারিণীদের স্বভাবের নম্রতা, আনুগত্য, সেবাপরায়ণতা, ও আতিথেয়তার বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা জানি ইহা কবি-কল্পনা নহে। বাংলা দেশে এরূপ অনেক একান্নবর্ত্তী পরিবার পরম সদ্ভাবে একত্র বাস করিয়াছে—যদিও আজিকার দিনে ইহা অত্যন্ত বিরল হইয়া আসিয়াছে। সেই চিত্রের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"অন্তঃপুরের গোময়লিপ্ত বৃহৎ প্রাঙ্গণে কয়েকখানা বড় বড় চাটাইয়ের উপর ধান শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে। বাড়ীর মেয়েছেলেরা সকলে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বড় রন্ধনশালায় মহেন্দ্রের স্ত্রী কাদম্বিনী রন্ধন করিতেছেন। সেই ঘরের বারান্দায় রমানাথের স্ত্রী মেজগিন্নী তরকারি কুটিতেছেন। নিরামিষ রন্ধনশালায় দেবেন্দ্রের বিধবা স্ত্রী শরৎশশী রাঁধিতেছেন। এই বাড়ীর রন্ধনকার্য্যটা বধূগণই করিয়া থাকেন। বৃদ্ধা শাশুড়ীদিগের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া তাঁহারা বসিয়া নবেল পড়েন না। ছোটগিন্নী অর্থাৎ হরিনাথের স্ত্রী উত্তরের ঘরের বারান্দায় বসিয়া বিবাহের পিঁড়ি চিত্র করিতেছেন। বড়গিন্নীর একটি সধবা কন্যা নীরদাসুন্দরী সেখানে বসিয়া একখানা কাঁথা সেলাই করিতেছেন। বধূগণ পিত্রালয়ে আসিলে তাঁহাদের একরূপ ছুটি, ইনিও সেই কালে সুখ ভোগ করিতেছেন। মেজগিন্নীর একটি বিধবা কন্যা যামিনী উঠানের এক কোণে বসিয়া বাসন মাজিতেছেন। এতদ্ভিন্ন আরও দু'তিনটি স্ত্রীলোক নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

"বড়গিন্নী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, 'বড় বৌ, রহিম আসিয়াছে। উহাকে ভাত দাও। কাল রাত্রে ও এখানে খায় নাই; উহার যে মাছখানা রাখিয়া দিয়াছ, তাহা দিতে ভুলিও না।'

"রহিম উঠানে একখানা কলার পাতা লইয়া বসিল, বড়বৌ তাহাকে ভাত ও ব্যঞ্জন দিয়া গেলেন। রহিম কলাপাতার উল্টা পিঠে ভাত খাইতে লাগিল।

"বড়গিন্নী আবার বলিলেন, 'মেজবৌ, বিদ্যানিধি-ঠাকুরের সিধা তৈয়ারি কর। ওলো যামিনী, আগে পূজার বাসনগুলা মাজিয়া পূজার ঘরে রাখিয়া আয়। উমার মা, একটা বেশী করিয়া শিব গড়িও।'

"উঠানে পাঁচ ছয়টি শিশু বড়গিন্নীর খাস তত্ত্বাবধানে বসিয়া আলুভাতে 'ফেনাভাত' খাইতেছিল। তিনি উঠিয়া যাওয়াতে তাহারা অন্যমনস্ক হইয়া এদিক-ওদিক করিতেছিল। একটি ছেলে উঠিয়া গিয়া একটা বিড়ালের লেজ ধরিয়া টানিতেছিল। বড়গিন্নী তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, 'কি রে! তোরা খাচ্ছিস না? ভাত দেখি নড়ে না।' ধমক খাইয়া তাহারা আবার ভাত খাইতে আরম্ভ করিল। একটি মেয়ে গালের মধ্যে ভাত পুরিয়া মুখ ভার করিয়া বলিল, 'বড় মা, তারপর সে কুমীর কি করিল, বল না?'

"বড়গিন্নী ভাত খাওয়াইতে খাওয়াইতে একটা ঢেঁকি কিরূপে কুমীরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই গল্প জুড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি গল্প বন্ধ করিয়া উঠিয়া যাওয়াতে, ছেলেরাও অন্য দিকে মন দিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের ভাত না খাওয়ার খুব সন্তোষজনক ওজর ছিল। তিনি কিন্তু সেই ওজর একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া কড়া হুকুম দিলেন—'না, এখন বেলা হইয়াছে, এখন আর কুমীর-টুমীরের কথা হবে না। খা, তোরা শীগগির শীগগির খেয়ে ওঠ।'

"একটি ছেলে বলিল—'টুমীর আবার কি?' ইহাতে সকলে হাসিয়া উঠিল। বড়গিন্নীও হাসিয়া বলিলেন—'টুমীর তোর শ্বশুর!' বড়বৌ

কাদম্বিনীর একটি নবমবর্ষীয়া কন্যা সরলা বাঁশী প্রস্তুত করিবার জন্য একটি আমের আঁটি বেড়ার উপর ঘষিতেছিল, আর গানের সুরে—

'কালো কালো ভোমরা কালো শাস খায়।
রাত হ'লে ভোমরা খোঁয়াড়ে যায়।'

বলিতেছিল। তাহার বাঁশী বাজিতে আরম্ভ করিল এবং সে আহ্লাদে অন্যান্য শিশুদিগের নিকট আসিয়া বাজাইতে লাগিল।

"এই সময় একটি মুসলমানকে বাড়ীর ভিতরে আসিতে দেখিয়া সরলা বলিল—'বড়-মা, ঐ দেখ, তোমার ভাই আসিতেছে।'

"এই কথা শুনিয়া অন্যান্য রমণীগণের মধ্যে একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। বড়গিন্নীও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'ভাই না ত কি লো? মাগি, তোর সব কথাতেই ঠাট্টা। নামের নাম ধর্ম্মসম্পর্কটা বুঝি একেবারে তুচ্ছ?'

"বড়গিন্নীর ভ্রাতার নাম গোপাল, সেই জন্য গোপাল সেখ তাঁহাকে 'দিদিঠাকুরুন' বলিয়া ডাকে।

* * *

"তিনটি শিশুসন্তান সহ একটি বিধবাকে আসিতে দেখিয়া বড়গিন্নী বলিলেন,—'ওলো মোনার মা, তোরে যে এখন আর দেখি না?'

"মোনার মা নিকটে আসিয়া বলিল—'মাঠাকুরুন, যে বাষ্যা হইছে, এখন আর ঘরের বাহির হওয়া যায় না—চারিদিকে জল। তোমাগো বাড়ী আসতি কাপড় বাচে না। আজ একটু জল কমছে, তাই এই কয়ডা কাচ্চাবাচ্চা নিয়া আইছি। বড়ঠাকুরুন, আমার দুক্ষির কথা আর কি কবো? আজ দুই দিন ঘরে দানাডা নাই। ক্যাবল নাইল সিদ্ধ কর্যা ইহাগো খাওয়াইছি। আপনি যে টাহাডা দিছিলেন, তা'তে কয়দিন একবেলা কর্যা ভাত খাইছিলাম। কিন্তু তা' কবে ফুরায়্যা গেছে। এহন ত আর বাচি না। আপনি দয়া না করলি এরা দানা-বিনি মর্যা যাবে।'

"ইহা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষে জল আসিল। বড়গিন্নী তাহার তিনটি ছেলেকে ভাল করিয়া দেখিতেছিলেন। তাহাদের শরীর শীর্ণ—বুকের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তিনি কাতর হইয়া বলিলেন—'তা এদের নিয়ে আসিয়াছিস্ ভাল হইয়াছে। ও বড়বৌমা! ঘরে পান্তাভাত যদি থাকে ত ইহাদের চারিজনের জন্য বাড়িয়া দাও। তা মা, আমি আর এই রকম কয় দিন তোদের বাঁচাইতে পারিব? আমার বেশী টাকাকড়ি নাই। আচ্ছা তোর ত এখন কাঁচা বয়স, চেহারাও ভাল, তুই নিকা বসিস্ না কেন? নিকা বসিলে তোর খাওয়া-পরার কষ্ট থাকিবে না।'

"মোনার মা চক্ষু মুছিয়া বলিল—'বড়ঠাকুরুন, সকলে ত আমারে নিকা বসতি কয়। কিন্তু আমি তাতে নারাজ! খোদাতাল্লার কছম কর্যা কই, আমার আর সে সাধ নাই। আমার এ জীবনের যে সুখ, তা সেই এক জনের সাতে গেছে। এখনি আমার এই কয়ডি নাবালক মানুষ করতি পারলি, আমি তারগো কামাই খায়্যা বাচতি পারব। এখন আবার কোন্ গোলামের কাছে যাব সে আমার সোনার চাঁদগো খেদায়্যা দিবে। আর দুইখান বছর কোনোমোতে আপনাগো ভিটাডা কামড়ায়্যা থাকতি পারলি আমার বড় ছাল্যা মোনা কিছু কিছু রোজগার কর্তি পারবে। আমিও বারো দুয়ারে বারাকুটা বাচ্চা এক রকম চালাতি পারবো। কিন্তু এই বাষ্যার তিনডা মাস—যে দইগণ্ডী বাষ্যা—কোনমোতে চালাতি পারলিই আমি বাচি। আপনার দয়া না হলি আমরা এইকয়ডা মানুষ দাপাইয়া মরবো! ও আল্লা!'

"বড়গিন্নী বলিলেন—'আচ্ছা, তুই এক কাজ কর্। আমাদের ভোলার মা কয় দিন বাড়ী গেছে তার ছেলেটার বড় ব্যারাম—বাঁচে কি মরে! সে আসা পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া কাজকর্ম্ম কর্, তোরা কয়টি তিনবেলা খেতে পাবি। পরে আমি তোকে দুইটা টাকা দিব। তুই ত ধান ভানতে পারিস, সেই টাকা দিয়া হাটে ধান কিনিয়া চাল তৈয়ারি করিয়া বেচিস্। সেই চাল বেচিলে তোর অবিশ্যি কিছু লাভ থাকবে। এই রকম করিয়া কোনক্রমে কিছু দিন চালাইতে পারবি। যদি ভালভাবে কাজ চালাস্, কাউকে না ঠকাস্, আর চাল না খেয়ে ফেলিস, তবে আমি আর পাঁচ টাকা দিব। গোপালকে বলিস, সে ধান কিনিয়া দেবে।'

"মোনার মা এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। বড়বৌ একখানা পাথরের থালায় করিয়া পান্তাভাত বাড়িয়া আনিয়া দিলেন, তাহারা চারি জনে খাইতে বসিল।

'বড়বৌ তাহাদিগকে খাইতে দিয়া আসিয়া বলিলেন—'বড়মা, ছয় জন অতিত্ এসেছেন, পণ্ডিতঠাকুর আছেন, দুধে ত কুলাইবে না। দুধ আরও চাই।'

"বড়গিন্নী দুধের কথা বলিবার জন্য সরলাকে দত্তমহাশয়ের নিকট পাঠাইলেন। দত্তমহাশয় অন্দরে আসিয়া বলিলেন—এবেলা আর দুধ ঘটিবে না। ওবেলা হাট আছে, হাটে দুধ কেনা যাবে। যে দুধ পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতিথিদিগকে দিতে বলুন। আমাদের এবেলা দুধের দরকার নাই।'"

'ধ্রুবতারা' পুস্তকটিতে সেকালের বাংলার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সমসাময়িক ইতিহাসের সহিত প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল লেখকের আদর্শ ও মতবাদ মিলিয়া-মিশিয়া যে চিত্রগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা আমাদের নিকট রমণীয় বলিয়া মনে হয়।

ইহার পর বহু বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। বাংলায় প্রায় সর্বত্রই ম্যালেরিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রামগুলি রোগের আকর হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য, স্বাভাবিক কারণে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু তাহাদের পর্যাপ্ত অন্নসংস্থানের উপায় নাই। গ্রামের বুদ্ধিজীবী লোকেরা গ্রাম ছাড়িয়া জীবিকার সন্ধানে শহরে আসিয়াছে ও সেখানেই বাসা বাঁধিয়াছে। ইহাতে গ্রামগুলির দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহারা নিরুপায় ও একান্ত অসহায় তাহারা এবং কৃষিজীবীরা বাধ্য হইয়া গ্রামেই বাস করিতেছে। তাহারা অনেকেই অর্ধাশনে দিনপাত করে, ম্যালেরিয়া-কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় অচিকিৎসায় ও কুচিকিৎসায় ভুগিয়া কর্মে অপটু, অলস ও শ্রমবিমুখ হইয়া পড়ে এবং অনেকে মরিয়া বাঁচিয়া যায়। বুদ্ধিমান, চরিত্রবান, শিক্ষিত লোকেরা জীবিকার জন্য গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় সুশিক্ষা ও সৎ-সংসর্গের অভাবে সেই সকল রোগক্লিষ্ট নিরন্ন গ্রামবাসীদের মধ্যে ঈর্ষা-দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা ও কলহপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের স্বভাবকে বিকৃত ও চরিত্রকে হীন করিয়া দেয়। ইহাই বাংলার—বিশেষ করিয়া উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য ও পশ্চিম

বঙ্গের অবস্থা। ইতিমধ্যে গত চল্লিশ বৎসরে দেশের বুকের উপর দিয়া বারম্বার প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলনের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। বাঙালী জাতি অতিশয় ভাবপ্রবণ বলিয়া একটা দুর্নাম আছে। এই সব আন্দোলনের পর জাতির মনের তলায় কিছু পরিমাণে মহৎ প্রেরণা ও উচ্চ আদর্শের পলি পড়িয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজে'র আদর্শ ও 'শ্রীনিকেতনে' তাঁহার গ্রামোন্নয়নের প্রাণপণ প্রয়াস এবং 'সবরমতী' ও 'সেবাগ্রামে' মহাত্মাজীর জীবনাদর্শ অনেক মহৎহৃদয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। শহরে থাকিয়া পর্যাপ্ত উপার্জনের সামর্থ্য সত্ত্বেও তাঁহারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মান-সম্ভ্রম, ক্ষমতা-প্রতিপত্তির লোভ ত্যাগ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছেন এবং অশেষ দুঃখকষ্ট অপমানকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া গ্রামের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন। সংখ্যায় তাঁহারা অধিক নহেন, কিন্তু তাঁহাদের ত্যাগপূত কল্যাণব্রত জীবন বাঙালীর মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং বাংলা সাহিত্যে তাহার ছাপ পড়িয়াছে।

উপরে একজন সেকালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুরুষ-লেখকের রচনা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া সেকালের গ্রাম-জীবনের আদর্শ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এইবার আধুনিক যুগের একজন প্রথিতযশা শ্রেষ্ঠ মহিলা সাহিত্যিকের একখানি পুস্তক[১] হইতে কিছু কিছু গ্রামের ছবি এবং বর্তমান যুগের সংস্কার-প্রয়াসী মনের গ্রাম-সেবার আদর্শ উদ্ধৃত করিতেছি।

একটি কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বোক্ত পুস্তকটিতে নদী-মেখলা পূর্ববঙ্গের "আম-বাঁশ-তাল-তেঁতুল-বট প্রভৃতি তরুময় নিবিড় বনসমাকীর্ণ" গ্রামের ছবি দেখিয়াছি। আর দ্বিতীয় পুস্তকটিতে পশ্চিম বঙ্গের কঙ্করময় উপলবন্ধুর তরঙ্গায়িত প্রান্তর-শোভার এবং শাল-মহুয়া-পলাশবন বেষ্টিত গ্রামের পরিচয় পাইব।

"করুণা ঝির সঙ্গে আতা পাড়িয়া তাহার ছোট টুকরিটি ভর্ত্তি করিয়া সুধা যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সূর্যদেব সবে মাত্র অস্তশিখরের অন্তরালে লুকাইলেও, তাহাদের মাঠের মধ্যের বাড়ী তাহারই মধ্যে একেবারে অন্ধকার হইয়া যায়। বাড়ীর পশ্চিম দিকে একটা পুকুর, তাহার পর প্রায় দুই শত বিঘা সুবিস্তৃত ধানের ক্ষেত। সুতরাং সূর্যদেব যখন ধরণীর নিকট বিদায় লন, তখন গাছপালা বাড়ী ঘরের আড়ালে একটু একটু করিয়া নামেন না, একেবারেই দিগন্তরেখার অন্তরালে চলিয়া যান। সামান্য কিছুক্ষণ পশ্চিম আকাশের মেঘে কিম্বা ধূলিজালে বর্ণচ্ছটার খেলা দেখা যায়। তাহার পর অন্তহীন কালো অন্ধকারের স্তূপ মাত্র অবশিষ্ট থাকে।"

* * * *

১। শ্রীমতী শান্তা দেবী প্রণীত 'অলখ-ঝোরা'।

"সেদিন হাটবার। পথে তখনই লোক-চলাচল বাড়িয়া উঠিতেছে। সাঁওতালদের মেয়েরা মাথায় তিন-চারিটা ঝুড়ি উপরি উপরি চাপাইয়া লালপেড়ে মোটা শাড়ীর চওড়া লাল আঁচল কোমরের পিছনে গুঁজিয়া, ঋজুদেহ গতিচ্ছন্দের সহিত অল্প দোলাইয়া, সারি সারি পথে বাহির হইয়াছিল। তাহাদের নিটোল কালো হাতে চওড়া শুভ্র শাঁখা, ঘন তৈল চিক্কণ চুলে জবা কি করবী ফুল। মেয়েদের ঝুড়িতে বেশীর ভাগই চাল কি চিঁড়া, নয়ত লাউ-কুমড়া। হাটের পথিকদের ভিতর মেয়ের ভিড়ই বেশী। পুরুষ অল্পস্বল্প যা আছে, তাহারা কেহ স্ত্রীর মাথায় গুরুভার বোঝাটি চাপাইয়া কোলের শিশুটিকে নিজে বুকে করিয়া চলিয়াছে, কেহ বা বাঁকের ভারে ঘাড় হেলাইয়া ক্ষেতের বেগুন ঢেঁড়স লঙ্কা ইত্যাদি লইয়া দ্রুত তালে ছুটিয়াছে। তাহাদের কোমর জড়াইয়া পাঁচ-ছয় হাত একটা খাটো ধুতি ছাড়া সর্ব্বাঙ্গে কোনও পোষাকের বালাই নাই, ঘর্মাক্ত পেশী-বহুল হাত-পাগুলি দ্রুত চলার তালে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। দুই-এক জনের মাথার বাবরী চুলের উপর নূতন লাল গামছা বাঁধা।

"মাইল দশেক আসিয়া পথটি হঠাৎ অনেকখানি নামিয়া গিয়াছে। সেখানে পথের দুই ধারে মস্ত মস্ত তেঁতুল গাছ। সমস্ত পথ ঝাঁপালো পাতার ছত্রে ছায়া করিয়া আছে। গাছতলায় মাঝে মাঝে গর্ত্ত কাটিয়া তিনখানা করিয়া পাথর কি ইট বসানো; ইটের গায়ের ও গর্ত্তের ভিতরের ঘন কালো রং ও পোড়া কাঠের টুকরা সদ্য রন্ধনের সাক্ষ্য দিতেছে। দুই পাশের বড় গ্রামগুলি হইতেই এই জায়গাটা একটু বেশী দূরে এবং এখানে নদীর জল ইচ্ছামত পাওয়া যায় বলিয়া হাটুরে ও দূর গ্রামের পথিকেরা এইখানেই রান্না-খাওয়া সারিয়া যায়।

লখা মাঝি বলিল, 'মা এইখানে চানটা ক'রে আমি দুটো ডাল ভাত ফুটিয়ে নেব। ঘণ্টাখানিক লাগবে। তার পর ছ'ক্রোশ আর দাঁড়াব না।'

* * *

"লখা গরু দুইটাকে খুলিয়া গাড়ীটা তেঁতুলতলার সামনে হেলাইয়া দাঁড় করাইল। ঝুড়ি ও বাঁক নামাইয়া আরও দুই চার জন মানুষ তখনই সেখানে উবু হইয়া বসিয়া বিশ্রাম সুরু করিয়াছিল, কেহ বা উঁচু হাঁটু দুইটা দুই হাতে জড়াইয়া উপর দিকে মুখ করিয়া মাটিতেই বসিয়া পড়িয়াছিল। এক দল বৈরাগী, ছোট বড় নানা বয়সের, তাহাদের নাকে কপালে তিলক, গলায় ত্রিকণ্ঠি, হাতে আনন্দলহরী ও পিঠে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া চলিয়াছিল। রাস্তাটা যেখানে একেবারে নামিয়া প্রায় নদীগর্ভে পৌঁছিয়াছে, সেইখানে গেরুয়া ঝুলি-ঝোলা নামাইয়া সকলে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ছোট ছেলেগুলির উৎসাহ বেশী, তাহারা একেবারে নদীর মাঝখানে চলিয়া গেল। বড়রা পাড়ের কাছেই অল্প জলে দাঁড়াইয়া কেহ পৈতা মাজিতে ও কেহ টপ্ টপ্ করিয়া ডুব দিতে লাগিল। ক্রমে সাঁওতাল-সুন্দরীরাও তাহাদের চালের ঝুড়ি ও ফল-তরকারির ঝুড়ি তীরে রাখিয়া জলে নামিতে সুরু করিল। সকলেরই ইচ্ছা, তাড়াতাড়ি স্নানটা সারিয়া শরীরটা একটু ঠাণ্ডা করিয়া দ্রুত পা চালাইয়া আগে আগে হাটে গিয়া পৌঁছায়। গরম কাল না হইলেও এত পথ হাঁটিয়া তাহাদের শরীর গরম হইয়া উঠিয়াছে।

"নদীর ধার হইতে বনের ভিতর দিকে কয়েক হাত দূরে দূরে চোর-কাঁটায় আচ্ছন্ন সরু সরু সাপের মত বাঁকা বাঁকা পায়ে-চলা পথ। পথগুলি বনের ভিতর দিয়া লুকাইয়া ছোট বড় নানা গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। বনের ধারে এদিকে-ওদিকে রজত-বেদীর মত শুভ্র উজ্জ্বল মসৃণ বড় বড় পাথর নদীর বালির উপর পড়িয়া আছে; নদীগর্ভের ভিতরেও ছোট বড় এমন কত পাথরের মেলা। নদীতে যখন জল বেশী থাকে, তখন বর্ষার দিনে জলের উপর ইহাদের মাথার উজ্জ্বল চূড়াগুলি মাত্র দেখা যায়, জল মরিয়া গেলে মনে হয় যেন সারি সারি বিরাট

শ্বেত হস্তী নদী পার হইবার সময় কোনও মহাতপা ঋষির নিদারুণ অভিশাপে প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে।

"সেদিন নদীতে বেশী জল ছিল না, হাটের পথের মহিষ ও গরুর গাড়ীগুলিও অনায়াসে নদী পার হইয়া যাইতেছিল। জলের ভিতর পাছে গরু, মহিষগুলা ভয় পায় কিম্বা ভুল করিয়া অথৈ জলে চলিয়া যায়, তাই কিশোর চালকেরা সরু সরু গাছের ডাল হাতে করিয়া জলের ভিতর নামিয়া পড়িয়া অল্পবুদ্ধি বিরাটকায় পশুগুলিকে সামলাইয়া লইয়া যাইতেছিল। জলের ভিতর বৈরাগী বালকদের লাফালাফি দেখিয়া তাহাদের কিশোর মনও লুব্ধ হইয়া এবং উজ্জ্বল চক্ষু চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এক এক গাড়ী জিনিষের ভার তাহাদের উপর, ফেলিয়া যাইবার উপায় নাই।

"গ্রামের মেয়েদের জল আনা তখনও শেষ হয় নাই। ঘন গাছের ভিতর হইতে সরু সরু পথে স্বচ্ছন্দগতি সাঁওতাল কন্যারা মাথায় কলসী ও কোলে উলঙ্গ সুপুষ্ট কালো ছেলে লইয়া নদীর ঘাটে আসিতেছে। মাঝে মাঝে একটু মাজা রঙের শীর্ণকায়া বাঙালীর মেয়েও দেখা দিতেছিল। একই গ্রামে বাস, একই পথে হাঁটা চলা, কিন্তু সাঁওতাল-মেয়েদের খোলা মাথা, নিটোল আঁট গড়ন, দৃপ্ত চলার ভঙ্গী, আর বাঙালী মেয়ের মাথায় ঘোমটা, ঢিলা শরীর, ঝুঁকিয়া সলজ্জভঙ্গীতে চলা দেখিলে আকাশ-পাতাল প্রভেদ লাগে।

"শিবু এত লোকের দেখাদেখি লখা-মাঝির সঙ্গে জলে নামিয়া পড়িল। স্বচ্ছ জলের তলায় নানা রঙের নুড়ি স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, খুশী হইয়া সে দুই হাতে তুলিতে লাগিল। সুধা একটি রজতশুভ্র পাথরের বেদীর উপর বসিয়া সাঁওতাল-মেয়েদের জলক্রীড়া দেখিতে লাগিল। কলসীর পিছন দিক দিয়া অপরিষ্কার জল দূরে ঠেলিয়া দিয়া তাহারা নদীর রূপালি জলে কষ্টিপাথরের মত কালো নিটোল সুচিক্কণ দেহ ভাসাইয়া তরল শুভ্র জল ও কঠিন কালো মূর্ত্তির বিপরীত শোভায় বনভূমি স্বল্পক্ষণের জন্য আলো করিয়া এক এক কলসী জল লইয়া ঘরে ফিরিয়া চলিল।

"সুধাকে দেখিয়া সাঁওতাল-মেয়েদের কৌতূহল অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠিল, বার বার পিছন ফিরিয়া দেখিতে লাগিল।

"বাঙালী বধূরাও ঘোমটা সরাইয়া সকৌতুক দৃষ্টিতে একটু মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেল। প্রৌঢ়া দুই-এক জন জিজ্ঞাসা করিল, 'কুথা যাচ্ছ গো?'

সুধা বলিল, 'মামাবাড়ী'।

'কুন গাঁ, কত দূর?'

সুধা বলিল, 'রতনজোড়; সে অনেক দূর।'

"হাটুরে মেয়েরা স্নান সারিয়া উঠিতেই সুধার মা মহামায়াকে দেখিয়া তরিতরকারির ঝুড়ি লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল, 'বেগুন লিবি গো, সিম লিবি গো?'

"পথের মাঝে মাঝে ক্রেতা দেখিলেই তাহারা ছোটখাটো হাট বসাইয়া দিতেছে। সময়ের কোনও মূল্য নাই, যতক্ষণ খুশী, যত বার খুশী জিনিষ বাছাই কর, ওজন কর, কেহ কিছু আপত্তি করিতেছে না।

মহামায়া বলিলেন, 'আমার ত এখানে ঘর নয় বাছা, তরকারি নিয়ে কি করব? ফলটল থাকে ত বরং দাও।'

একজন বলিল, 'কলা আছে লিবি?'

আর একজন বলিল, 'আতা আছে।'

"বৈরাগীর দলও হাটের সওদা দেখিয়া ছুটিয়া আসিল। তাহারা চিঁড়া কিনিতেই বেশী ব্যস্ত, দুই-এক জন মোটা মোটা শশাও কিনিল। মহামায়া ছেলেমেয়েদের জন্য কলা ও আতা কিনিলেন। একটা সিকি ফেলিয়া দিয়া দুইটা পয়সা চাহিতেই সকলে প্রায় সমস্বরে বলিয়া উঠিল, 'উ নাই লিব।'

"শিবু ততক্ষণ উঠিয়া আসিয়াছে; সে সিকিটার উপর সাঁওতালদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দেখিয়া বলিল, 'মা, সাঁওতালগুলো বড় বোকা, ওরা পয়সা ছাড়া আর সব কিছুকেই ভয় পায়। রূপোর সিকিরই ত বেশী দাম, তা নেবে না।'

"অনেক কষ্টে তাহাদের দাম চুকাইয়া বিদায় করা গেল। কিন্তু লখা-মাঝি কুড়ানো পাথরের উনুন জ্বালিয়া রান্না সুরু করিতেই আবার ভীড় সুরু হইল। তখন চন্‌চনে রোদ উঠিয়াছে, লোকগুলার মাথায় ছাতা কি একটুকরা গামছাও হয়ত নাই, মাথার চুলই রোদ হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। এতেও অনেকের বিড়ি খাওয়ার সখ পুরা আছে। সবাই বলে, 'মাঝি, একটু আগুন।'

* * *

"আবার যাত্রা সুরু হইল। নদী পার হইয়া মাঝে মাঝে উঁচু ডাঙ্গা জমির উপর ঝোপের মধ্যে কালো কালো হাতীর মত পাথর, মাঝে মাঝে ঘন সবুজ ধানের ক্ষেত। কোনও ক্ষেতে একটুখানি সোনার রঙ ধরিয়াছে, কোনওটা একেবারে কাঁচা। দূরে দূরে বাঁধের জলে অসংখ্য শালুক ফুল ফুটিয়া লালে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

* * *

"বেলা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এদিককার হাটের পথ নির্জ্জন হইয়া আসিতেছে। অন্য হাটবার সুধারা পথের ধারে দাঁড়াইয়া দেখে, দিন শেষে ভাঙা হাটের পর পথিকেরা মহা কোলাহল করিয়া ফিরিতেছে। তাড়ির মিষ্ট তীব্র গন্ধে সমস্ত পথটা ভরিয়া যায়। মেয়েরা হাত ভরিয়া শাঁখা পরিয়া ও পুরুষেরা নূতন জামা পরিয়া পয়সা গনিতে গনিতে চলে। সারা দিনের পরিশ্রমের পর পথে যেখানেই ডোবা দেখে নামিয়া পড়িয়া নির্ব্বিচারে দল বাঁধিয়া আঁজলা ভরিয়া জল খায়। গরুর গাড়ীগুলা যথাসাধ্য জোরে হাঁকাইয়া বাড়ী ফিরিতে সবাই ব্যস্ত। আজ এদিকে হাট নাই, পথ জনশূন্য। শরতের নীল আকাশে টুকরা মেঘের মত এক-একটা বক মাঝে মাঝে উড়িয়া চলিয়াছে। উলঙ্গপ্রায় রাখাল-ছেলেরা দড়িতে ঢিল ঝুলাইয়া সজোরে তাহাদের লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতেছে, যদি একটা বক মারা যায়। কোথাও বড় বড় মহুয়া, কি বট, কি আম গাছে শ্বেতপদ্মের মত ধপ্‌ধপে এক ঝাঁক শাদা বক ডালে ডালে বসিয়া আছে। দূর হইতে মুদিত শুভ্র পদ্ম ছাড়া কিছু মনে হয় না।"

বর্গীর উপদ্রবের ভয়ে পশ্চিম বঙ্গের গ্রামে সেকালে বাড়ী-ঘর স্বাস্থ্য ও আরাম অপেক্ষা আত্মরক্ষার অধিক উপযোগী করিয়া নির্মিত হইত। তাহার ইঙ্গিত এই পুস্তকে পাওয়া যায়।

"মামার বাড়ী সেকেলে ধরণের বাড়ী, রাস্তার উপরেই সারি সারি চারখানি ঘর, কিন্তু একখানি ছাড়া আর কোনওটির রাস্তার উপর দরজা নাই। বাড়ীর ভিতর দিকে চারখানি ঘরের দরজার কোলে লম্বা দালান, দালানের পর খোলা চাতাল, দালানেরই সমান উঁচু। চাতাল হইতে দুই ধাপ সিঁড়ি নামিয়া রান্নাঘরের খড়ো আটচালা। রান্নাঘরে আটচালার নিকস-কালো কাঠের খুঁটিগুলির গায়ে বিচিত্র কারুকার্য্য, চৌকাঠের মাথায় কাঠে খোদাই এক জোড়া মকরের মুখ, দরজাগুলিতে কাঠের চৌখুপি ঘরের ভিতর বড় বড় পিতলের ফুল বসানো।"

সুধার দিদিমা মারাত্মক পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যে প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই মারা

গেলেন। এক বৃদ্ধ কবিরাজ মাত্র গ্রামের সম্বল। সুধার মাতা মহামায়া তাই আর্তকণ্ঠে বলিতেছেন, "কিছু একটা কর। আর কিছু দিন, অন্ততঃ কিছুক্ষণ যাতে ধরে রাখা যায় তার উপায় করা যায় না? এই বড়ি ছাড়া আর কিছুই কি করবার নেই?" বাংলার অধিকাংশ গ্রামের লোক রোগাক্রান্ত হইয়া উপযুক্ত চিকিৎসক ও ঔষধ-পথ্যের অভাবে যে কিরূপ অসহায়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় মহামায়ার মুখের ঐ কয়েকটি কথায় লেখিকা তাহার একটি সুস্পষ্ট ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

সুপণ্ডিত চন্দ্রকান্তের ন্যায় কবিপ্রকৃতির মানুষের পক্ষে গ্রামই যে বাসের ও কর্মের যোগ্য স্থান নীচের অনুচ্ছেদটিতে লেখিকা তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

"সুধার বাবা চন্দ্রকান্ত মিশ্র চার মাইল দূরে শহরের স্কুলে সামান্য বেতনে হেডমাষ্টারী করিতেন। সেই স্বল্প আয়ে তাঁহার সংসার ত চলিতই না, অধিকন্তু স্কুলের এই প্রাত্যহিক পাখীপড়ার মধ্যে তাঁহার বহুমুখী মনের খোরাকও জুটিত না। তিনি মানুষটি ছিলেন একটু কবি-প্রকৃতির। * * শহরের ছোট বাসা-বাড়ীতে তাঁহার ভজন-সাধন, তাঁহার কাব্যচর্চ্চা ঠিক্ খুলিত না। তাই তিনি গ্রামে এই দিগন্ত জোড়া মাঠের মাঝখানে একটি নিজস্ব নীড় বাঁধিয়া তুলিয়াছিলেন। শহরের বাসা তুলিয়া দিয়া এখানেই যখন তিনি থাকা স্থির করিলেন তখন প্রত্যহ সকালে চার মাইল হাঁটিয়াই তিনি স্কুলে যাইতেন। বিকালেও তিনি অনায়াসে হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিতেন। তাঁহার প্রসন্ন হাস্য ও শ্রান্তিহীন মুখ দেখিলে মনে হইত যেন তিনি কেবল দুই-দশ পা সখের ভ্রমণ করিয়া আসিলেন। এই গ্রাম্য জীবনযাত্রার সহিত এক ছন্দে চলিবার ইচ্ছায় স্কুল মাষ্টারীর উপর ধানজমি চাষ করাও তিনি একটা আর্থিক আয়ের উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গোয়ালে গরু, মরাইয়ে ধান, উছলিয়া না পড়িলেও কোনওটারই একান্ত অভাব ছিল না।"

আজন্ম শহরে মানুষ উচ্চশিক্ষিত সৌখিন যুবক তপন লোকসেবার মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের গ্রামের পরিত্যক্ত পুরাতন পৈত্রিক বাড়ীতে যে কর্মের আয়োজন করিয়াছেন নিম্নে তাহারই বিবরণ দেখিতে পাইব।

"তপন এম-এ পাস করিবার পর এই গ্রামের কাজ লইয়াই থাকিবে ঠিক করিয়াছিল। গ্রামে একটা স্কুল খুলিয়া ও গোটা দুই-চার তাঁত বসাইয়া প্রথম সে কাজ আরম্ভ করে। উভয় কাজের জন্যই তাহাদের বাড়ীতে স্থান যথেষ্ট ছিল। তার পর ধীরে ধীরে লাইব্রেরী, পথ মেরামত, ঔষধ বিতরণ, বন্ধক রাখিয়া অতি সামান্য সুদে কর্জ্জ দেওয়া, কুস্তির আখড়া, ইত্যাদি নানা জিনিসের সূত্রপাত হইতেছে। মানুষের উপার্জ্জনশক্তি ও সততার উন্নতির দিকেই তাহার সকলের চেয়ে নজর বেশী।

"পড়ন্ত রৌদ্রে মাঠের পথ ভাঙিয়া তাহারা যখন গ্রামে পৌছিল তখন সারাদিনের রৌদ্রে মাটি তাতিয়া ঝাঁঝ উঠিতেছে। তপনের স্কুলের ছেলেরা অতিথিদের জন্য তাহার বাড়ীর বারান্দা ঘণ্টাখানিক আগেই ধুইয়া রাখিয়াছিল। এখন তাহাতে শীতল পাটি পাতিয়া দিয়াছে। প্রত্যেকের পা ধুইবার জন্য একটি করিয়া মাজা গাড়ুতে জল ও তাহার উপর লাল গামছা দিয়া রাখিয়াছে। মেয়েদের জন্য বিছানার চাদরের পরদা টাঙাইয়া বাঁশের টাটের ঘেরা হাত মুখ ধুইবার স্থান করিয়াছে।

"সকলের হাত পা ধোয়া হইলে তপন বলিল, 'এবার তোমাদের আতিথ্যের আসল আয়োজন দেখি।'

"বড় বড় পাথরের থালা হাতে ছেলেরা দেখা দিল। থালায় মুগের ডাল ভিজা, ছানার টুকরা, চিনি, পানফল, শাঁখ আলুর টুকরা, পাকা কলা, আম, অল্প-অল্প করিয়া সব সাজানো। একটি করিয়া পাথর-বাটিতে বেলের পানা, ও পাথরের গেলাসে ডাবের জল।

"একজন আধুনিক ভাবাপন্ন ছেলে একটা কাঁসার থালার উপর গুটি চার করিয়া পেয়ালা পিরিচ সাজাইয়া আনিয়া বলিল, 'আমাদের চা ষ্টোভ সবই আছে, ক' পেয়ালা চা করব বলুন, ক'রে দিচ্ছি।' মেয়েদের লক্ষ্য করিয়াই বিশেষ ভাবে বলা হইতেছিল, কাজেই জবাব তাহাদেরই দিতে হইবে। সুধা বলিল, 'আমার বেশী চা খাওয়া অভ্যাস নেই, আমার জন্যে চা করবেন না।'

"ছেলেটি না দমিয়া বলিল, 'আমি কোকোও করে আনতে পারি, পাঁচ মিনিট মাত্র সময় লাগবে, বেশী দেরী হবে না।'

"হৈমন্তী বলিল, 'কোকোর প্রয়োজন নেই, বেলের পানা, ডাবের জল খেয়ে আর কি কিছু খাওয়া যায়?'

"ছেলেটি অগত্যা পেয়ালা পিরিচ লইয়া চলিয়া গেল।

"নিখিল বলিল, 'ওহে তপন, ছেলেদের শহর ও গ্রামের এমন সমন্বয় করতে শিখিও না। এতে ত মানুষের আয় বাড়বে না, ব্যয়ই বাড়বে।'

"তপন বলিল, 'সমস্ত বিদ্যাই গুরুর কাছ থেকে শেখা বলতে মানুষের আত্মসম্মানে একটু লাগে, তাদের স্বলব্ধ বিদ্যা এবং জ্ঞানও যে কিছু আছে, তাও ত তারা দেখাতে চাইবে।'

"এই বাড়ীতেই স্কুলের ঘর, জলযোগের পর ছেলেরা দেখাইতে লইয়া চলিল। বেশ বড় বড় ঘর, কোন ঘরে মাদুর পাতিয়া ক্লাস হয়, কোন কোন ঘরে বেঞ্চি এবং ডেস্কও আছে।

"নিখিল জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাদের স্কুলে এমন জাতিভেদ কেন? কেউ বসে রাজাসনে আর কেউ বসে একেবারে মাটির কোলে?'

"তপন বলিল, 'ছেলেদের জিজ্ঞাসা কর কেন জাতিভেদ।'

"একটি ছেলে রসিকতাটাকে গম্ভীর ভাবে গ্রহণ করিয়া উত্তর দিল, 'যে সব ছেলেদের বয়স কম তারা নিজেদের জন্যে বেঞ্চি তৈরি করতে পারে না, তাই তাদের মাদুর কিনে দেওয়া হয়। আমরা কাঠের কাজ শেখবার জন্যে নিজেদের জিনিষই আগে তৈরি করতে শিখি।'

"মহেন্দ্র বেঞ্চিতে হাত বুলাইয়া বলিল, 'কাপড়-চোপড় ছেঁড়বার সম্ভাবনা অবশ্য আছে, কিন্তু তা হ'লেও এরা জিনিষ মন্দ করে নি। নিজেদের কাপড় ছিঁড়লে পরের বার সাবধান হয়ে খোঁচা পেরেকগুলোর উপর নজর দেবে।'

"ছেলেদের ডেস্কের সঙ্গে দেরাজও ছিল। মহেন্দ্র একটা দেরাজ টানিয়া দেখিল চাবিবন্ধ। তপন বলিল, 'চাবি ছেলেদের কাছে আছে। ওহে, আজকে কার চাবির পালা নিয়ে এস দেখি।'

"হৈমন্তী বিস্মিত হইয়া বলিল, 'চাবির পালা মানে?'

"তপন বলিল, 'ছেলেদের জিনিষপত্রের ভার প্রত্যেকের উপর আলাদা ক'রে নয়। এক-এক দিন এক-এক জন সকলের জিনিষপত্রের ভার নেয়। সেদিন সকলের চাবি তার কাছে থাকে। যদি কারুর কোন জিনিষ হারায় তার জন্য সে দায়ী হয়।'

"নিখিল বলিল, 'তুমি কি 'টেম্‌ট নট'-এর ('লোভে ফেলো না'র) উল্টা থিওরি প্রচার করছ ?'

"তপন বলিল, 'একটু এক্সপেরিমেণ্ট ক'রে দেখছি, মানুষ এই রকম ক'রে লোভ জয় করতে পারে কি না। পরকে ঠকানো আর পরের জিনিষ চুরি করা মানুষের যে সেকেণ্ড নেচার হয়ে দাঁড়াচ্ছে এর কবল থেকে উদ্ধার না পেলে আর মুক্তি নেই।'

"শিবু বলিল, 'মুক্তি আছে তপন-দা, যদি সেই রকম মার মারা যায়, যাতে জীবনে আর কোন দিন গায়ের ব্যথা না সারে।'

"সকলে হাসিয়া উঠিল। সতু বলিল, 'তাহ'লে যাদের গায়ের জোর বেশী, তারা সব চেয়ে বেশী চুরি করবে।'

"তপন বলিল, 'মানুষের শক্তি আর সুযোগ থাকলেও সে যে নির্লোভ হ'তে পারে এবং সমাজগত ও ব্যক্তিগত ভাবে তাতেই যে মানুষ লাভবান হয়, এটা লোকে কবে শিখবে জানি না।'

"মহেন্দ্র বলিল, 'যে-দেশের শ্রীকৃষ্ণ ব'লে গিয়েছেন 'মা ফলেষু কদাচন' সে দেশের কাছে তোমার এ ফিলসফি ত অতি সামান্য জিনিষ।'

"তপন বলিল, 'সামান্য হ'তে পারে, কিন্তু বিরাটটা বোঝবার বুদ্ধি পর্য্যন্ত যাদের লোপ পেয়ে গেছে, তারা সামান্যটা শিখলেও যে মুমূর্ষুর জল গণ্ডুষ হয়। ছোট হতে হতে আমরা ত মরতে বসেছি। বিদেশের লোকের কাছে মুখ দেখাতেও আমাদের লজ্জা করে যখন মনে করি আমার দেশের কত স্ত্রীলোক স্ত্রীলোককে একলা পেলে তার মান মর্য্যাদা রাখে না, অসহায় দেখলে তার সর্ব্বস্ব কাড়তে পারে আর সামান্য দু-চার পয়সার জন্যেও চোর কি ঠগ নাম নিতে লজ্জা পায় না।'

"স্কুল ঘর ছাড়িয়া সকলে বাগানে চলিল। বাগানে প্রত্যেক ছেলেকে ছোট ছোট জমি দেওয়া হইয়াছে তরকারীর ক্ষেত করিবার জন্য।

"তপন বলিল, 'ছেলেরা নিজেদের বাড়ীতে এই তরকারী নিয়ে যেতে পারে বিক্রীও করতে পারে। বিক্রীর লাভের পয়সা অর্দ্ধেক স্কুল পায়।'

"হৈমন্তী বলিল, 'বাড়ীর নাম ক'রে সব তরকারী বেচেও ত পয়সা ওরা নিজে নিতে পারে।'

"তপন বলিল, 'পারে বটে, কিন্তু এটা আমাদের স্কুলের ছেলের পক্ষে একটা ঘোরতর অন্যায়। কেউ ধরা পড়লে তাকে স্কুল থেকে বার ক'রে দেওয়া হয়। এমন কি কারুর বাড়ীর লোকে বাগানের জিনিষ চুরি করেছে জানা গেলে সে বাড়ীর ছেলেদের আর নেওয়া হয় না।'

"সুধা বলিল, 'আপনি ভয়ানক কড়া মাষ্টার। এ সব বিষয়ে এই রকম কড়াই কিন্তু হওয়া উচিত। 'আহা গরীব বেচারী' ব'লে আমরা যে ছেড়ে দি, সেটাই ওদের আরও মাটি করে।'

"সুধার কথায় উৎসাহিত হইয়া তপন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'এই একটা গ্রামের ছেলেগুলোকে যদি মানুষ ক'রে করতে পারি, বুঝব পৃথিবীর কোন একটা কাজে লাগলাম।'"

নিউগিনির আদিম অধিবাসী

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরে নিউগিনি দ্বীপটি অষ্ট্রেলিয়াকে জাপ-আক্রমণের অন্তরালে রাখিয়াছে। ইহার আদি নাম পাপুয়া, সেই জন্য তাহার অধিবাসিগণের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিম জাতিটি পাপুয়ান বলিয়া পরিচিত।

পাপুয়া বা নিউগিনি দ্বীপটি ছিল ওলন্দাজ ও ব্রিটিশদের অধীনে। পশ্চিমাংশে প্রায় অর্দ্ধেকটা ছিল ডাচ বা ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের, আর পূর্বাংশের অর্দ্ধেক ভাগ পাপুয়া টেরিটরি পরিচয়ে ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থের অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে ছিল। বিলাতী বিশ্বকোষের হিসাবে এই পাপুয়া টেরিটরির ইউরোপীয় অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১১০৭ আর আদিম অধিবাসীদের সংখ্যা ও মালয়, যবদ্বীপ, চীন, জাপান, প্রভৃতি দেশের লোক লইয়া সর্বসুদ্ধ প্রায় তিন লক্ষ—কয়েক বৎসর পূর্বেকার গণনায়।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশরা এইটি অর্থাৎ নিউগিনির পশ্চিমার্দ্ধ অধিকার করিয়া প্রোটেক্টরেট হিসাবে রাখে। পরে ১৯০৬ সালে অষ্ট্রেলিয়ার বড়লাটের অধীনে একটি টেরিটরির মতন করিয়া রাখা হইয়াছিল। ব্রিটিশ নিউগিনি বা পাপুয়ার শাসনকার্য্য চলিত এক জন গবর্ণরের দ্বারা।

নিউগিনির দক্ষিণ-পূর্বাংশের উত্তরাঞ্চলের কিছু ভাগ বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জ, নিউ বৃটেন, নিউ আয়ারল্যাণ্ড এবং অ্যাডমিরালটি দ্বীপপুঞ্জের সহিত ১৯১৯ সালে অষ্ট্রেলিয়ান কমনওয়েলথের ম্যাণ্ডেটেড টেরিটরির অন্তর্গত হয়। উত্তরার্ধভাগ পাপুয়া ছিল জার্মানীর। গত মহাযুদ্ধের পর এই ব্যবস্থা হয়। ১৮৮৬ সালে জার্মান নিউগিনি কোম্পানী এই দিকটায় ব্যবসা করিতে আসে, তাহারা নাম দেয় কাইজার দ্বীপ। অনেকগুলি বন্দর নির্মাণ করিয়া এবং বহুবিধ উন্নতি করিয়া এই কোম্পানী শেষে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে কাজ তুলিয়া চলিয়া যায়। এই ম্যাণ্ডেটেড টেরিটরির প্রধান শহর হইল রাবাউল। এই অংশের লোকসংখ্যা ৪,২৬,৩২৯।

পাপুয়ার চারিটি বন্দর—পোর্ট মরেস্‌বি, সামারাই,

ফুলুমাদন ও ডারু। পোর্ট মরেস্‌বির নিকট তামার বড় কারখানা ছিল—জাপানীরা ইহা অধিকার করিয়া তাম্রের এক ভাণ্ডার পাইয়াছে।

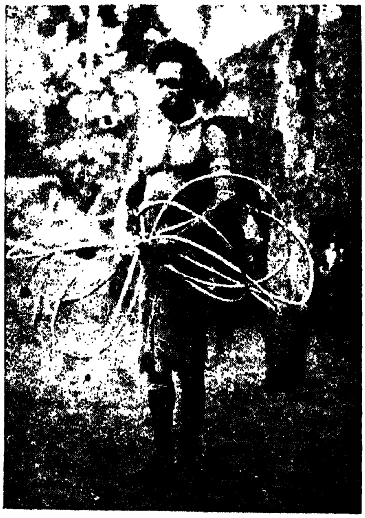


কোন পাপুয়া গ্রামের মোড়লের স্ত্রী উৎসবের বেশভূষায় সজ্জিত

নিউগিনিতে অসভ্য আদিম জাতির সংখ্যা খুব বেশী বলিয়া মার্কিন, জার্মান ও ইংরেজ নৃতত্ত্ববিদ্‌দের দৃষ্টি পড়িয়াছিল—প্রায়ই তাঁহারা আসিয়া এখানে কাজ করিয়া থাকেন, তাহা ছাড়া এই সমস্ত নিরক্ষর বর্বরদের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টেরও জানিবার প্রয়োজন হওয়াতে দুই জন সরকারী নৃতাত্ত্বিক নিযুক্ত ছিল, পাপুয়ার ইংরেজ আমলে।

নৃবিদ্যার গবেষণার পূর্বে পাপুয়া বা নিউগিনির আদিমদের পাপুয়ান বলিয়াই সাধারণ ভাবে সকলে জানিত, কিন্তু দেখা গেল পাপুয়ান ছাড়া নেগ্রিটো ও মেলানেসিয়ান* কৃষ্ণকায় জাতির (race) অন্তর্ভুক্ত বিভিন্নভাষী বহু জাতি (tribe) এখানে বাস করিতেছে। সাধারণ ভাবে আদিম অধিবাসিগণ কৃষ্ণকায় এবং ঘনকুঞ্চিত কেশদামবিশিষ্ট নিগ্রো জাতির অন্তর্ভুক্ত। মাথার চুল আফ্রিকার নিগ্রোদের মতই, পশমের মত, এবং ছোট ছোট কোঁকড়ান কেশপাশ মাথায় ঝাঁকড়া করিয়া রাখা, কখন কখন জটা পাকান। ইহাদের চেহারাও খাটো, তবে নেগ্রিটো শ্রেণীর লোকগুলি আজও কিঞ্চিদধিক বামন এবং শ্রীহীন অবয়বের অধিকারী।

পাপুয়ান জাতির সংখ্যা নিউগিনিতে সর্বাপেক্ষা বেশী। দেখিতে ইহারা কৃষ্ণকায় ত বটেই, মাথা চওড়া (dolicocephalic) এইটাই ইহাদের বৈশিষ্ট্য। পাপুয়ানদের দেশে অর্থাৎ নিউগিনিতে প্রথমে অন্য কোন আদিম জাতি আসে নাই—পরে পশ্চিম দিকের কতকগুলি দ্বীপ হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে বোধ করি নৌকা বাহিয়া আসিয়া নেগ্রিটো ও মেলানেসিয় জাতিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল উপনিবেশ করিয়াছিল। পাপুয়ানরাও পাপুয়ার পূর্বে এক সময়ে জার্মান রাজ্যান্তর্ভুক্ত বিসমার্ক দ্বীপপুঞ্জে এবং অ্যাডমিরালটি দ্বীপগুলিতে উপনিবেশ করিয়াছে। ডাচ্‌ নিউগিনি, ব্রিটিশ নিউগিনি (পাপুয়া) ও উপরোক্ত এই দ্বীপগুলিতে সর্বত্রই পাপুয়ানদের দেখিতে পাওয়া যায়। পাপুয়ানদের সংস্কৃতি আদি মানবের নিওলিথিক বা নূতন প্রস্তর-যুগের মত। নৃতাত্ত্বিকগণ বলেন নিওলিথিক যুগের



বেতের দড়ি হস্তে এড্‌মিরাল্‌ট দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসী

* ১৯১০ সালের পর হইতে ইউরোপের বণিক্‌গণ মালয় হইতে বহু কুলী এখানে আনিয়াছিলেন।

মানুষের চিহ্ন যদি কোথাও আজও মেলে ত এই পাপুয়াতে—এরা পাথর এবং হাড়ের অস্ত্র-যন্ত্র প্রস্তুত ও ব্যবহার করে।

অসভ্য আদিম পাপুয়ানরা ধান চাষ করিতে জানে না। তাহারা ফলমূল শাকসব্জী এই সব উর্বর ভূমিতে উৎপাদন করিয়া থাকে। নারিকেল, কলা, আলু, রাঙালু, শালগম এবং সাগু প্রভৃতির চাষও করে। সাগুই ইহারা ভাতের মত খায় সিদ্ধ করিয়া। সুপারি গাছও উহাদের দেশে প্রচুর—চুণসুপারি খুব চিবায়—তামাকুসেবনেও পাপুয়ানরা বিশেষ অভ্যস্ত, অবশ্য আমাদের মত আলবোলায় নহে। সুপারি চিবাইয়া মুখে রাখিয়া দেওয়া আসাম হইতে পাপুয়া পর্যন্ত মালয়, যবদ্বীপ, বলি, পলিনেসিয়া (Polynesia) প্রভৃতি সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের নৃবিদ্যার গুরু ৺অধ্যাপক পঞ্চানন মিত্র মণিপুর অবস্থানকালে ইহা প্রায়ই আমাদের নিকট গল্প করিতেন। তিনি পলিনেসিয়া, মাইক্রোনেসিয়া, মেলানেসিয়ার ভিতর দিয়া আমেরিকা গিয়াছিলেন।



উৎসবের পরিচ্ছদে পাপুয়ানত্রয়

বর্বর যুগের আদিম অবস্থায় পাপুয়ানরা আজও পড়িয়া আছে—তবে মিশনরী প্রভুদের দয়ার অভাব হয় নাই, কিন্তু সভ্যতার এত পশ্চাতে এরা আছে যে উহাদের সভ্য করিতে জাপানী গবর্ণমেণ্টেরও সময় লাগিবে।

খুব বেশী দিন নহে এই সমস্ত লোক বনে-জঙ্গলে উলঙ্গ হইয়াই ঘুরিয়া বেড়াইত, তার পর বোধ হয় সভ্য মানুষের আগমনে পাতা ও খুব কমই বস্ত্রখণ্ডের ব্যবহার শিখিয়াছে। পুরুষগণ কোমর হইতে ঝোলানগোছের এক রকম আবরণ পরিয়া থাকে, গাছের বল্কলও পরিধান করে। সামারাই অঞ্চলের পাপুয়ানরা বল্কল ও পত্র সমন্বয়ে এক প্রকার পোষাক কোমর হইতে হাঁটু পর্যন্ত পরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। স্ত্রীলোকগণও লজ্জা নিবারণের জন্য, তালগাছের পাতা ঝোলান কাপড় পরে তাও হাঁটু পর্যন্ত—কোমরের তলায় বেতের এক রকম দড়িগোছের জড়াইয়া তাহা হইতে তালপত্রগুলিকে ঝুলাইয়া দেয়।

নাগাদের মত মাথায় পালক, টুপী বা উত্তরীয়ের বাহার করে এরা কি মেয়ে কি পুরুষরা, আর পালপার্বণে ত কথাই নাই। সকলেরই বেতের বা শেলের (shell) তাগার গোছা গোছের আর্মলেট হাত-দুটার উপরাংশ ঢাকিয়া রাখে। কড়ি বা কুকুর শূয়ারের দাঁতের মালা কঙ্কণ কেহ কেহ ব্যবহার করে। কানে বেতের আংরা বা শেলের মাকড়িগোছের অদ্ভুত গহনা পাপুয়ানরা ব্যবহার করে, তাহা ছাড়া মেয়েদের মধ্যে কাহারও কাহারও নাকের মাঝে ফুটা করিয়া বড় বড় গোলাকার বেতের নথ দেখিতে পাওয়া যায়। কব্জীতেও মেয়ে পুরুষ উভয়েই ব্রেসলেটের মত টাইট বেতের দড়ির বা পাতার অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে।

পাপুয়ানদের সারা অঙ্গে মাথা হইতে পা পর্যন্ত উল্কির নানারূপ বিচিত্র নক্সা দেখিতে পাওয়া যায়—এই দিকে তাহাদের সভ্য জাতির শ্বেতকায় টমি সৈন্যের সঙ্গে মিল আছে দেখিতেছি। তফাৎ এই যে, টমিরা স্কার্ট-পরা মেয়ে, নাম বা ভাল ফুলের ছবি উল্কি করিয়া লয়। আর নিউগিনির অসভ্য মানব হয়ত দানবীয় মূর্তির নক্সা বা কাঁচা শিল্পীর নক্সা আঁকিয়া রাখে—ইহাদের সজ্জাভূষণে নারিকেলের মালা, পশুপক্ষীর বা নিহত শত্রুর মাথার খুলি বা হাড়, মাছের কাঁটা প্রভৃতি কত বাজে জিনিসই যে চোখে পড়ে।

ডাচেরা নিউগিনির পশ্চিমার্ধ অধিকার করিয়াছিল—সে অংশে এই বর্বর জাতির অবস্থা উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক অবনতিই হইয়াছিল। বলিতে গেলে এই অঞ্চলে এখনও পাপুয়ানরা উলঙ্গ হইয়া বনে-জঙ্গলে পশুর

মতই ঘুরিয়া বেড়ায়। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী আছে —গ্রামবাসীরা সাগুদানার আহারে তাহার সহিত ফলমূল সব্জী যোগে কোনরূপে বাঁচিয়া আছে। গহন অরণ্যে



একটি নরমুণ্ড-সংগ্রহকারী পাপুয়ান ঢাল-গোছের কারুকার্যময় দ্রব্য বহন করিতেছে

তাহারা তীর-ধনুক লইয়া শিকার করিয়া ফেরে। সভ্যতার আলো কত দিনে যে তাহাদের মধ্যে পৌঁছিবে তাহারাই জানে—আজও তাহাদের মধ্যে নরমুণ্ড-শিকার প্রথা এবং মনুষ্য-মাংস ভক্ষণের রুচি বিদ্যমান। ব্রিটিশ অঞ্চলে ইংরেজরা দাবী করে, বোধ হয় পাপুয়াতে, সে সব নাই কিন্তু মস্তক-আহরণ উৎসব উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, যেরূপ আসামের পূর্বসীমান্তে নাগা জাতিদের মধ্যে আজও সম্পূর্ণভাবে এই প্রথা উঠিয়া যায় নাই।

অসভ্যতার সর্বনিম্ন স্তরে অধিষ্ঠিত পিগমী নিগ্রো বা নেগ্রিলো, নেগ্রিটো শ্রেণীর বামন জাতির লোকও এই অঞ্চলে (ডাচ নিউগিনিতে) বেশী। মেলানেসিয় ছাড়া ইণ্ডোনেসিয় প্রোটো মালয় অন্তর্ভুক্ত জাতিও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

নিউগিনির আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বহু রকমের ভাষা চলিত আছে কিন্তু কোনটাই লিখিত নয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই নিরক্ষর পাপুয়ানদের মধ্যে মৃৎশিল্প এবং কারুশিল্পের অস্তিত্ব রহিয়াছে। ইহারা ধানের চাষ জানে না, কিন্তু মাটির পাত্র প্রস্তুত করিতে এবং ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। আর ইহাদের চিত্রকলা—তা সে যত নিম্নস্তরেরই হউক, তাহার অস্তিত্বের প্রসার খুব। হ্যাডন সাহেব তাঁহার আর্টের ক্রমবিকাশ (Evolution in Art) এবং নিউগিনির আর্ট এই বই দুটিতে পাপুয়ানদের শিল্প-কলা সম্বন্ধে বহু কথা লিখিয়াছেন। পাপুয়ানরা কাপড় পরিতে শিখে নাই, কিন্তু বিচিত্র চিত্র করিয়া তাহারা প্রাক্-মানবের স্বাভাবিক কলাশিল্পে অনুরাগ যে ছিল তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। সামাজিক আচার-বিচারের বা সমাজের বিধিবিধান সম্বন্ধে বেশী কিছু লিখিয়া লাভ নাই, কারণ সব আদিম জাতির মতই ইহাদেরও মধ্যে অর্বাচীন কানুন ও আচার-ব্যবহারের চলন। আর ইহাদের মধ্যে যে শ্রেণীবিভাগ প্রণালী বিদ্যমান তাহা সাধারণে বুঝিতে পারিবেন না। সমাজে Dual Organisation (রিভার্স সাহেবের দেওয়া নাম) বলিয়া দুটি ভাগ আছে তাহা বিবাহের সময় কাজে লাগে। অতি নিকট-সম্বন্ধের মধ্যে বা সমপর্যায়ের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হয় না। সম্পর্কে দাদুতে-নাতিতে বিবাহ চলিবে কিন্তু কাকা-মামার সঙ্গে ভাইঝি-ভাগিনেয়ের বিবাহ চলিবে না। এ ক্ল্যানের লোক ঐ ক্ল্যানে বিবাহ করিবে, নিজের ক্ল্যানে নহে। এই ভাবে দুইটি সামাজিক বিভাগ সৃষ্ট হইয়া গিয়াছে। ক্ল্যান অর্থে কয়েকটি পরিবার লইয়া একটি সামাজিক শ্রেণী বুঝিতে হইবে। জংলি জাতির বিবাহের কথা আর কি বলিব—উৎসব তাহারা নাচিয়া এবং মদ্যপান করিয়া করে।

পাপুয়ানদিগের মধ্যে আর একটি জিনিস আছে যাহার জন্য পুরুষ অবিবাহিতদের বাস করিবার আলাদা বড় বাড়ী নির্মাণ করা (ব্যাচিলার হাউস) সর্ব গ্রামে চোখে পড়ে। কুমার-সংঘের অর্থাৎ এই ডর্মিটরির কথা বিশদভাবে না বলিয়া কি জিনিসটা ইহাদের মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে তাহার কথাই বলিব।

পাপুয়ানদের 'ইনিসিয়েশন সেরিমনি' বলিয়া একটি প্রথা আছে। আমাদের সভ্যসমাজে ব্রাহ্মণ বা দ্বিজগণের উপবীত গ্রহণের সময় যেমন অনেক রকম কৃচ্ছ্র সাধন করিতে হয় তেমনি এই আদিম জাতিদের কিশোরকে পুরুষ বলিয়া গণ্য হইতে এবং কুমার-সংঘে প্রবেশ পাইতে একটি ব্যবস্থা-বিধানের মধ্য দিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয়। প্রথমে আট-নয় বৎসরের

ছেলেটিকে ছেলেদের আখড়া বা পুরুষ-ভবনে লইয়া যাওয়া হয়, সেখানে বুল-রোয়ার বা ষাঁড়ের মত বিকট শব্দ করার এক প্রকার যন্ত্র* তাহাকে দেখান হয়—যে জিনিসটির কর্কশ ধ্বনির সহিত সে শৈশব হইতে পরিচিত থাকিলেও তাহা তাহার নিকট একটি রহস্য-জনক ব্যাপার ছিল। এর পর অনেক রকম মারধর, পরিশ্রম, লাঞ্ছনা, উপদেশ শ্রবণ প্রভৃতি পালনান্তে দু-এক বৎসর বাদে সে এই পুরুষ-ভবনের সভ্য বলিয়া গণ্য হয় এবং সেই হইতেই ঐ স্থানেই বাস করে। এই আড্ডাবাড়ীতে সাধারণতঃ খাওয়ার বন্দোবস্ত থাকে না—খাওয়া-দাওয়াটা যে যার পিত্রালয়ে বা মাতুলালয়ে করিয়া আসে।

মাতুলালয় বলিলাম যেহেতু পাপুয়া-সমাজে মাতৃক এবং পৈতৃক উভয় প্রকার পরিবারই দৃষ্ট হয়।

পুরুষ-ভবনই হইল পাপুয়ানদের প্রাণ—ঐ স্থান হইতে ভালমন্দ কার্য—কাহারও উপকার করা বা কাহারও মাথা লইবার মন্ত্রণা, ষড়যন্ত্র, বন্দোবস্ত সবই এইখান হইতে। কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকদেরও এইরূপ বিভিন্ন মহিলা-ভবনের ব্যবস্থা আছে (খুব কমই) কিন্তু পাপুয়ানদের মধ্যে নাই। ছেলেদের লইয়াই তাহারা যে উৎসব করে এই ইনিসিয়েশনে তাহা দেখিবার বস্তু। শুধু একখানি গ্রাম নহে, আশেপাশের গ্রাম পর্যন্ত এই উৎসবে আনন্দ করিয়া যায়। শিশু পুরুষ হইয়া নূতনভাবে জন্ম-গ্রহণ করিল যেন—এইবার হইতে সে তাহার ধনুক লইয়া শিকার করিবে, দাদা বাবা কাকার সহিত বসিয়া একত্রে ধূমপান করিবে, তাহাদের সহিত একত্র কাজ করিবে, তার পর আর একটু বড় হইলে তাহাদের সহিত নরমুণ্ড শিকার করিতে বাহির হইবে।



পাপুয়ানদের ছিপ নৌকা

* Bull roarer নাগাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। নাগাদের অনেক শাখার মোবাং বলিয়া ব্যাচিলর-হাউস আছে।

কবি লজ্জাবতীর প্রতিভা

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

বাংলার মহিলা কবিদের অন্যতমা কুমারী লজ্জাবতী বসু গত ১৩৪৯ সালের ২১শে আগষ্ট বাহাত্তর বৎসর বয়সে জগতের মায়া কাটিয়ে আমাদের শোকসাগরে ভাসিয়ে অমরধামে চলে গেছেন। অমোঘ ভাগবত বিধান—যার রহস্য মানুষের কাছে চিরদিন দুর্জ্ঞেয় থেকে গেছে, তারই বশে অগণ্য মানুষ জগতে আসছে যাচ্ছে; সাগরতলে অগণিত মুক্তারাজির মত, বিজনে নিভৃতে ফোটা বনপুষ্পের মত তাদের কয়টির আমরা সন্ধান রাখি বা প্রকৃত মূল্য দিই? লজ্জাবতী বাংলার এক জন শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি হয়েও খুব বেশী খ্যাতি অর্জন ক'রে যেতে পারেন নাই; তার কারণ তিনি ছিলেন দরিদ্র আর নিজের যশের ঢাকে নিজে কি করে কাঠি দিতে হয় এই সরলা স্বভাবনম্রা মেয়ে তা জানতেন না।

ঋষি রাজনারায়ণ বসুর পাঁচ কন্যার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন কবি লজ্জাবতী; তাঁর বড়দিদি ছিলেন স্বর্ণলতা ঘোষ, ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের স্ত্রী, সাধকশ্রেষ্ঠ শ্রীঅরবিন্দ ও কবি মনোমোহনের গর্ভধারিণী জননী। তাঁর চতুর্থা ভগ্নী ছিলেন লীলাবতী মিত্র, প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম, আচার্য্য ও 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক দেশনেতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহধর্ম্মিণী। আজীবন কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন ক'রে লজ্জাবতী জীবন কাটিয়ে গেছেন নীরব সাহিত্য সেবায় ও একাগ্র অধ্যয়নে। তাঁর মত এমনভাবে কোন বিদ্যালয়সম্পর্ক-বিরহিত হয়ে

নিছক স্বচেষ্টায় এতখানি বিদ্যার্জ্জন করা বিশেষ মনীষা ও ধীশক্তি না থাকলে সম্ভব নয়। ঋষি রাজনারায়ণ মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের অধ্যক্ষের পদে অবসর গ্রহণ ক'রে যখন দেওঘরে এসে বাড়ী ক'রে বসবাস করেন, তখন দেওঘর এখনকার জনবহুল অট্টালিকাকীর্ণ চেঞ্জারদের ভূস্বর্গ ছিল না, ছিল আম-শাল-মহুয়া-বনে ঢাকা প্রকৃতির এক নির্জ্জন পার্ব্বত্য স্নেহাঞ্চল-বিছান কোল। সেইখানে লজ্জাবতীর কৈশোর ও যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বের অধিকাংশ সময় কাটে। একে একে পিতা রাজনারায়ণ, মাতা নিস্তারিণী এবং বড় ও ছোট ভাই যোগীন্দ্রনাথ ও মণীন্দ্রনাথ মারা গেলে ছোট ভাইপো অশোকের লালন-পালন ভার এই লজ্জাবতীর স্কন্ধেই পড়ে। তার জন্য তাঁকে চাকুরী গ্রহণ করতে হয়। এক সময় অধ্যাপনার কাজে তাঁর যথেষ্ট যশ ও অর্থ উপার্জ্জন হয়েছিল, বর্দ্ধমানের মহারাণী, পাকুড়ের রাণী ইত্যাদি বহু সম্রান্তা মহিলা ছিলেন এই মেধাবী কবির ছাত্রী। কিন্তু চঞ্চলা লক্ষ্মী কয় জন কবি বা সাহিত্যিকের ভাগ্যে স্থিরা অচঞ্চলা হয়ে থাকেন? শেষজীবনে তাই লজ্জাবতীকে পরের ও আত্মীয়-স্বজনের দানে অশেষ কষ্টে ও অভাবে জীবন কাটিয়ে যেতে হয়েছে।

লজ্জাবতী ছিলেন উচ্চাঙ্গের কবি; আজকাল যাঁরা সরস্বতীর বীণার তারে দু-একটি ঝঙ্কার তুলেই কবিখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন বা করছেন, লজ্জাবতী তাঁদের অনেকের চেয়ে কবিপ্রতিভায় শ্রেষ্ঠ। গত পঞ্চাশ বছর ধ'রে বহু মাসিকপত্রে ও সাময়িকে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়ে এসেছে। বাংলা-সাহিত্যের যে কোন অনুরাগী পাঠক এই বাগাড়ম্বরহীনা আত্মগরিমাশূন্যা মহিলা কবির স্বচ্ছশুভ্র ভাবগভীর কবিতাগুলি লক্ষ্য না করে পারেন না; কারণ বাঙালীর সহজসুলভ অনুকরণজ কবিতাবিলাসের মাঝে এমন খাঁটি কবিতা অল্পই মেলে। এ যেন নীল নির্ম্মল আকাশে শুভ্র তুলার মত লঘু মেঘখণ্ডগুলি নিথর মন্থর গতিতে ভেসে চলেছে কোন্ এক অনির্দ্দেশের দিকে। এই কবিতাগুলির অধিকাংশের অন্তর্নিহিত সুর যেমন করুণ তেমনি মধুর। হৃদয়ের ক্ষুধা সুখপতঙ্গ মানুষের চেপে রাখবার জিনিস নয়; এই হৃদয়ের স্নেহপ্রেমঅনুরাগ-ধারাই শুষ্ক মানবজীবনকে সরস আনন্দময় ক'রে রেখেছে; আমাদের সব ত্যাগ ও পুণ্যকাজের মূলে আছে এই হৃদয়ের ভাব ও প্রেরণা। লজ্জাবতীর জীবনে যে কারণেই হোক বিবাহ বা দাম্পত্যসুখ ঘটে নাই। সঙ্গীহীনতার এই করুণ ব্যথা তাঁর কবিতাকে দিয়েছে বড় মধুর মর্ম্মস্পর্শী সুর; এই মনীষাময়ী নারীর নিঃস্ব রিক্ত জীবনের অব্যক্ত ব্যথা তাদের পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে মধুধারা হয়ে ঝরে পড়ছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, সে ব্যথার মাঝে কোন জ্বালা নাই, দাবী নাই, অনুযোগ নাই, উন্মাদ ব্যাকুলতা বা বিদ্রোহ নাই; আছে শুধু ব্যথিতা বালিকার চোখের নীরব গোপন অশ্রু ও করুণ পূজা—কোন্ এক ক্ষণিকের দৃষ্ট দয়িতের প্রতি শ্রদ্ধাপূত আবেদন।

প্রতি দিন কে আসিয়া বাজাত বাঁশীটি?—
কভু শুনিতাম কভু যেতাম চলিয়া;
প্রতি দিন কে রাখিত মালাটি দুয়ারে?—
কভু লইতাম কভু দিতাম ফেলিয়া;
পথমাঝে কার ছায়া থাকিত জাগিয়া?
কভু দেখিতাম তারে কভু আনমনে
ফিরায়ে নয়ন দু'টি ভুলিতাম তারে।
এইরূপে গেল দিন জানি না কেমনে
আজ যবে দেখিলাম শূন্য ও দুয়ার,
নীরব বাঁশীর স্বর, ছায়াটিও আর
নাহি জাগে পথমাঝে চকিতে নয়নে
জাগিল করুণা অশ্রু, গুপ্ত অভিসার
প্রাণ করে সাধিয়াছে, আজ গো প্রথম
সুপ্রশস্ত দিবালোকে সে কাহিনী তার
উন্মুক্ত মহিমা ভরে দাঁড়াল যখন,
কাঁদিয়া জানিনু প্রিয় কত সে আমার;
তাই সারাদিন শূন্য দ্বারে চাহি বার বার
মালাটি রাখিয়া যদি যায় আর বার।

এই প্রেম নিষ্কাম ও শুভ্র, নির্ম্মল স্বচ্ছ বননির্ঝরিণীর মত এই শান্ত হৃদয়ের প্রেম মানুষকে উপলক্ষ্য ক'রে উৎসারিত হয় এবং পরিণামে ভগবানের পায়ে পৌছে যায়। চিরকুমারী লজ্জাবতীর প্রেম যে কি অনির্ব্বচনীয় বস্তু তা পাঠকরা দেখুন—

কাল তুমি বলে গেলে কোন্ দুটি কথা?
চিরদিন যেন ওই দু'টি কথা তরে
আমার অনন্ত আশা আছিল দাঁড়ায়ে,
সুখ ছিল অপেক্ষায় যেন পাইবারে
ওরি মাঝে আপনার ব্যক্ত ইতিহাস।
জীবন আছিল চাহি মাঝে যেন ওর
পাইবারে সুগভীর জীবন প্রশ্নের
সুপ্রকট ব্যাখ্যা সম সম্পূর্ণ উত্তর।
পরাণ আছিল পড়ে ঐ দু'টি স্বরে
পাইবারে আপনার মহিমা আভাস।
বাসনা জাগিয়া ছিল চির আকাঙ্ক্ষায়
পাইবারে ওরি মাঝে সার্থক বিকাশ।

আধ ব্যক্ত সুর সম প্রথম যৌবন
ধ্বনিয়া উঠিতেছিল দেহের বীণায়,
ও সঙ্গীতে মিশিবারে উহারি আহ্বান
কল্পনার তট চুমি আজও উথলায়।

সত্য ও সুন্দরের পরম ঠাকুর যে মানব-হৃদয়ের প্রেম-স্পন্দনেই ধরা পড়েন তা লজ্জাবতী বুঝেছিলেন—তাই তিনি লিখে গেছেন—

কেমনে পড়িল বাঁধা অসীম সুন্দর
নয়নের একটুকু চাহনি মাঝারে?
—অধরের দু'একটি ভাষার গাথায়
মরমের আধব্যক্ত মধুর আখরে?
কেমনে অমর সুখ ধরা দিল আসি
দু'দণ্ডের একখানি বাসনা-বাসরে?
অনন্ত উৎসব ধ্বনি পড়িল বন্ধনে
নিমেষের একটুকু অসম্পূর্ণ স্বরে?
চির ব্যক্ত অবরুদ্ধ অব্যক্তের মাঝে
অবারিত গীতস্বর ক্ষণিক ঝঙ্কারে,
বৃহৎ সৌন্দর্য্য-তৃষা ক্ষুদ্র কল্পনায়,
অমর মঙ্গল আশা ভঙ্গুর আধারে।
অবারিত বিশ্বে যার সুচির আসন
কেমনে সে নিল সাধি ক্ষুদ্রের বন্ধন?

এ কবির কবিতার সম্বন্ধে কত কথাই না বলবার আছে? এক দিন তাঁর কবিতাগুলি চয়ন ক'রে বই ক'রে বাংলার রসসাহিত্যিকদের হাতে দেবার ইচ্ছা আছে। লজ্জাবতী অমরধামে চলে যাবেন এই মাটির জগতের কাছে বিদায় নিয়ে, তাই তাঁর "যাত্রা শেষ" কবিতাটি সবার অলক্ষ্যে কবে যেন এক টুকরা কাগজে লিখে রেখে গেছেন, তাই রসসাহিত্য-বাসরে উপহার দিয়ে এ নিবেদন শেষ করছি।

হে অসীম! আজি তব দিগন্ত দুয়ারে
যাত্রা মোর শেষ;
এ যাত্রা উদ্দেশ পথে ব্যর্থ পর্য্যটন মোর
সম্পূর্ণ নিঃশেষ।
আজ সারা যাত্রাটির মোর সব রৌদ্রালোক
লুটাক গো চিরানন্দ চরণ অঙ্গনে,
সারা যাত্রাটির মোর সব কলরবটুকু
মিশে যাক তব শান্ত দিগন্ত তোরণে।
গাউক সন্ধ্যার শঙ্খপূর্ণ রটনায়
সারা যাত্রাটির মোর শেষ পরিচয়,
তব চির সুনিভৃত দিগন্ত শরণে
সারা যাত্রাটির মোর ক্লান্ত ছায়াখানি
পড়ুক লুটায়ে।

একবিংশতম নিখিল-বঙ্গীয় শিক্ষক-সম্মেলন, বাঁকুড়া

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

আমি সমাগত শ্রীমতী শিক্ষিকা ও শ্রীমান্ শিক্ষকগণকে সবিনয়ে অভিবাদন করিতেছি। কথা ছিল, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আপনাদের সহিত সম্ভাষণ করিবেন। তিনি ব্যবহারকুশল প্রবীণ, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ। দুঃখের বিষয়, তিনি এক্ষণে অসুস্থ, কলিকাতায় আছেন। এই হেতু আমি তাঁহার স্থানে দাঁড়াইয়া আপনাদিগকে স্বাগত কুশল-প্রশ্ন করিতেছি। আমাদের সৌভাগ্য, আপনারা দুঃখী ও দরিদ্র বাঁকুড়ার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া পথক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা জানি, আমরা আপনাদের যথাযোগ্য সমাদর করিতে পারিব না। আপনারা অন্তরের পূজা গ্রহণ করিয়া বাহিরের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

যাঁহারা পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়াছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ নূতন দেশ দেখিতে পাইবেন। পূর্ববঙ্গ অনূপ দেশ, সজল দেশ। বাঁকুড়া স্বল্পতোয় স্বল্পতৃণ প্রচুর-আতপ জাঙ্গল দেশ। শত বৎসর পূর্বে আসিলে এই স্থানকে বনবেষ্টিত গ্রাম মনে হইত। উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি নদী আছে। কিন্তু বর্ষাকালেও মাঝে মাঝে দুই-এক দিন মাত্র নৌকায় পারাপার হইতে হয়। গ্রামের নাম বকুণ্ডা ছিল। সত্তর বৎসর পূর্বে বাকুণ্ডা ছিল। তাহা হইতে বর্তমান নাম বাঁকুড়া হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম ভাগ বিন্ধ্য পর্বতমালার পূর্বপ্রান্ত। কত যুগ গিয়াছে, বৃষ্টি বাত্যা আতপ ভোগ করিয়া পাহাড় ক্ষয়িত ভগ্ন বিশ্লিষ্ট হইয়াছে। উপরে বালুকা-বহুল অল্প মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়াছে। অল্পদূর খুঁড়িলে পাথর পাওয়া যায়। যেখানে পাহাড়ের শির ও শিখর ছিল, সেখানে ভূপৃষ্ঠ উচ্চ আছে। দুই

শিরের মধ্যবর্তী নিম্নস্থানকে পাতী বলে। তাহা এখনও নিম্নই আছে। ফলে ভূপৃষ্ঠ ডাঙ্গা ও পাতী, ডাঙ্গা ও পাতী তরঙ্গের আকারে দৃষ্ট হয়। পাতী স্থানে মৃত্তিকা অধিক সঞ্চিত হইয়াছে। মাত্র সেখানেই চাষ হয়। বিস্তীর্ণ ডাঙ্গা পড়িয়া আছে। তাহা কৃষির অযোগ্য, বৎসরে পাঁচ মাস তৃণহীন।

এক কালে বাঁকুড়া জেলা বনাচ্ছন্ন ছিল। তথাপি এখানে ওখানে ছোট ছোট জনপদ হইয়াছিল। সমন্তাল জাতি বাস করিত। সমন্তাল নাম সংস্কৃত। আর্যীয়ের প্রদত্ত। সমন্ত (প্রান্ত) শব্দে অধিবাসী অর্থে আল প্রত্যয় করিয়া সমন্তাল শব্দ। সমন্তাল নাম অপভ্রংশে বাঁকুড়ায় সামতাল, অন্যত্র সাঁওতাল। সমুদায় জাঙ্গল দেশ সমন্তাল জাতির অধিকৃত ছিল। ইহাদের নানা শাখা আছে। পরে পূর্ব ও দক্ষিণ হইতে আর্যীয়েরা প্রবেশ করে। জনপদ থাকিলেই এক একজন অধিকারী ও নায়ক থাকেন। তাঁহারা রাজা। রাজাদের বংশের নামে এক এক রাজ্যের নাম হইয়াছিল। রাজ্যের নাম ভূমি বা ভূম। যেমন, মল্লবংশের রাজ্যের নাম মল্লভূম, শূরবংশের শূরভূম, সামন্তবংশের সামন্তভূম, শিখরবংশের শিখরভূম, বরাহভূম, মানভূম ধলভূম, ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে মল্লভূম বিস্তীর্ণ ছিল। মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুর। এখান হইতে ২০ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে। মল্লরাজারা প্রায় সহস্র বৎসর নিষ্কণ্টকে ও প্রবল প্রতাপে মল্লভূমি শাসন করিয়া গিয়াছেন।

বাঁকুড়া জাঙ্গল দেশ হইলেও বহুপূর্বকালে এ দেশে আর্যসংস্কৃতি প্রবেশ করিয়াছে। বহু স্থানে পাথরের জৈন ও বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া যায়। বৌদ্ধপরিব্রাজক এ দেশে আসিয়াছিলেন বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। সাধারণ লোকে ধর্মরাজের পূজা করিত। বুদ্ধের নাম ধর্মরাজ। এমন গ্রাম প্রায় নাই যেখানে ধর্মরাজ পূজিত হন না। ধর্মরাজের পুরোহিতের উপাধি পণ্ডিত। রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজার প্রবর্তক ছিলেন। তিনি এখন উপাখ্যানের মানুষ হইয়া গিয়াছেন। বাঁকুড়া হইতে ধর্মপূজা দক্ষিণে ও পূর্বে প্রচারিত হইয়াছে। ভাগীরথীর পূর্বভাগে হয় নাই, সেখানে ধর্মরাজ অজ্ঞাত।

বাঁকুড়ার প্রাচীন সংস্কৃতির দুই-একটা নিদর্শন বলিতেছি। বিষ্ণুপুরের মহাজনেরা ১৩ই বৈশাখ নববর্ষ আরম্ভ করেন, ১লা নয়। আশ্চর্যের বিষয়, রামাই পণ্ডিতের উপাখ্যানে লিখিত আছে, যেদিন সূর্য অশ্বিনী নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া ভরণীতে প্রবেশ করিয়াছিল, সেদিন বৈশাখ শুক্ল পঞ্চমী বৃহস্পতিবারে রামাই পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছিল। গণিত দ্বারা খ্রীষ্টপূর্ব ৫৭১ অব্দ পাওয়া যায়। তখন দক্ষিণ মগধে বিম্বিসার রাজত্ব করিতেছিলেন। কালিকা পুরাণেও উক্ত দিনটি উল্লিখিত আছে। সেদিন শিব-কালীর বিবাহ হইয়াছিল। কালিকা পুরাণ আসামে প্রণীত হইয়াছিল। বিবাহ অধ্যায়টি অষ্টম খ্রীষ্ট শতাব্দের মনে হয়। কিন্তু কোথায় কামরূপ, আর কোথায় মল্লভূম! আমার বোধ হয়, যেমন অশ্বিনীর আদি হইতে এক অব্দ (গুপ্তাব্দ) প্রচলিত হইয়াছিল, ভরণীর আদি হইতেও তেমন এক অব্দ গণিত হইত। সে অব্দের কি নাম ছিল আমরা জানি না। সে অব্দ প্রাচীন কালের অব্দ, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্রে প্রচলিত ছিল। পুণ্ড্র হইতে কামরূপে গিয়াছিল। মানভূম মল্লভূম প্রভৃতি ভূম কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল। সূর্য ১লা বৈশাখ অশ্বিনীতে প্রবেশ করে, ১৩ই বৈশাখ ভরণীতে করে। তদনুসারে মল্লভূমের মহাজনেরা অদ্যাপি ১৩ই বৈশাখ নববর্ষ প্রবেশ ধরিয়া 'হালখাতা' করেন। তাঁহারা পুরাতন স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন। বঙ্গের আর কোথাও এই স্মৃতি নাই। ইহার অর্থ, অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্বে বাঁকুড়ায় আর্যসংস্কৃতি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত ছিল।

প্রাচীনতার আর এক প্রমাণ দিতেছি। এখান হইতে ১৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে শিশুনিয়া নামে প্রায় এক হাজার ফুট উচ্চ এক পাহাড় আছে। ইহার গাত্রে এক বিষ্ণুচক্র ক্ষোদিত আছে। চক্রের নিম্নে চতুর্থ খ্রীষ্ট শতাব্দের অক্ষরে দুই পঙ্‌ক্তি লিপি আছে। ভাষা সংস্কৃত। তাহার অর্থ, "পুষ্করণাধিপতি মহারাজ শ্রীসিংহ বর্মার পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মার কৃতি (পুণ্য কর্ম)"। পুষ্করণা কোথায়, মহারাজ চন্দ্রবর্মা কে, ইত্যাদি প্রশ্ন সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হইয়াছে। কেহ মনে করিয়াছেন, দিল্লীর লৌহস্তম্ভের (প্রথম) চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গবিজয় করিয়া চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ভুলিয়াছেন, বাঁকুড়া বঙ্গে নয়, কলিঙ্গে। আর মহারাজার নাম চন্দ্রগুপ্ত নয়, চন্দ্রবর্মা। অপরে মারো-আড়ে পুষ্করণা নাম ও বর্মবংশ পাইয়া মনে করিয়াছেন, শিশুনিয়ার চন্দ্রবর্মা সে দেশ হইতে আসিয়া বাঁকুড়ায় বিষ্ণুচক্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহারা বাঁকুড়ায় অনুসন্ধান করিলে পুষ্করণা পাইতেন। ইহার বর্তমান নাম পোখন্না। এখানে 'পুকুর' বলে না, পোখর বলে। পুষ্করণা, পোখরণা, পোখন্না সহজে হইয়াছে। শিশুনিয়া হইতে পূর্বদিকে বাইশ মাইল দূরে দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে এই গ্রাম আছে। এখন হীনদশা। কিন্তু পূর্বে সমৃদ্ধ ছিল। তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। কুষাণ রাজাদের

কালের চিহ্ন আছে। এখানে পাথরের সিংহবাহিনী প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। তাহা গুপ্তরাজাদের কালের। পোখন্নায় অনুসন্ধান হয় নাই। এখানে বর্মবংশের রাজা ছিলেন না বলিতে পারা যায় না। দেখা যাইতেছে দেশকে দেশ বৌদ্ধ হয় নাই। দেশে বিষ্ণু-উপাসক ও শক্তি-উপাসক ছিলেন।

বাঁকুড়ার পূর্বসীমায় দামোদর নদের পূর্ব পারে রামাই পণ্ডিতের নিবাস ছিল। তাঁহার রচিত "শূন্য-পুরাণে" ত্রয়োদশ খ্রীষ্টশতাব্দের বাঙ্গালা ভাষা আছে। তদনন্তর চতুর্দশ খ্রীষ্টশতাব্দের মধ্যভাগে বড়ু চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের লীলা গান করিয়াছিলেন। তিনি ছত্রিনায়, বর্তমান ছাতনায় ছিলেন। ছাতনা সামন্তভূমের রাজধানী, এখান হইতে আট মাইল পশ্চিমে। বাসলী দেবী সামন্তরাজের কুলদেবী', সামন্তভূমের অধিষ্ঠাত্রী ছাতনায় পূজিতা হইতেছেন। তান্ত্রিক দেবী, প্রতিমা ভয়ঙ্করী। সামন্তভূমের রাজা হামীর উত্তররায় দৈবাৎ পাইয়াছিলেন। চণ্ডীদাসকে বাসলী দেবীর বড়ু কার্যে এবং তাঁহার অগ্রজ দেবীদাসকে পূজা কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের বিবাহ হয় নাই। দেবীদাসের হইয়াছিল। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি বাসলী দেবীর পূজা করিতেছেন। ইঁহাদের উপাধি দেঘরিয়া, অর্থাৎ দেব-গৃহ-ইয়া, দে-ঘর-ইয়া, যিনি দেবগৃহে কর্ম করেন। বড়ু শব্দের অর্থও তাই। চণ্ডীদাসের গীতিকাব্যে এক পুথী বিষ্ণুপুরে পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" নামে প্রকাশ করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণলীলা-গীতের সরণি করিয়াছিলেন। অন্যেরা সেই পথ অনুসরিয়া আপনাদিকে চণ্ডীদাস নামে আখ্যাত করিয়াছেন। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে বীরভূমে এক কবি দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গীত চণ্ডীদাস-পদাবলী নামে পঠিত ও গীত হইতেছে। বীরভূমবাসী শ্রীশিবরতন মিত্র মহাশয় ১৩৪২ সালের মাঘ মাসের 'প্রবাসী' নামক মাসিক পুস্তকে দ্বিজ চণ্ডীদাসের বংশ-পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম মহেশ, প্রপৌত্রের নাম সদানন্দ ছিল। সদানন্দ ভগবদ্-গীতার পয়ারানুবাদ করিয়াছিলেন। মিত্র মহাশয় সে পুথী পাইয়াছেন। তাহাতে কবি নিজ বংশ-পরিচয় লিখিয়াছেন! আর এক চণ্ডীদাস পদের ভণিতায় আপনাকে দীন চণ্ডীদাস বলিয়াছেন। তাঁহাকে দুই শত বৎসরের অধিক পুরাতন মনে হয় না। ভাষা দৃষ্টে বোধ হয় তাঁহার নিবাস বর্দ্ধমান জেলায় ছিল। চণ্ডীদাস নাম লইয়া বহু কবি গীত রচিয়াছিলেন। যেমন কৃত্তিবাস পণ্ডিত রামায়ণ লিখিয়া এক সরণি খুলিয়া দিয়াছিলেন এবং সে পথে যিনি গিয়াছিলেন তিনিই আপনাকে কৃত্তিবাস বলিয়াছেন, সেইরূপ বড়ু চণ্ডীদাসের শিষ্য প্রশিষ্যেরাও চণ্ডীদাস নাম লইয়াছিলেন। ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই, সমস্যাও কিছু নাই। পূর্বকালে গুরু-মারা বিদ্যা ছিল না, কবি গুরুর নামে বিকাইতেন। লোকেও কৃত্তিবাসী রামায়ণ খুঁজিত, অন্য কবির খুঁজিত না। গায়নেরা কৃত্তিবাসের নাম না দিয়া নিজের নাম দিতে পারিতেন না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাপা না হইলে বহু রবীন্দ্রনাথ দেখিতে পাইতাম।

মল্লভূমে অনেক কবির জন্ম হইয়াছিল। আর এত পুথী লিখিত হইয়াছিল যে তাহার সংখ্যা হয় না। গাড়ী গাড়ী পুথি স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছে। আর গাড়ী গাড়ী পুথী উই ও বৃষ্টি ও অগ্নির গ্রাসে পড়িয়াছে। বিষ্ণুপুরে চতুর্দশ খ্রীষ্টশতাব্দ হইতে সঙ্গীত চর্চা চলিতেছে। কেবল গীত ও কবিত্ব নয় মল্লভূমে শুভঙ্করী আর্যার উৎপত্তি হইয়াছিল। আর একটি বিশেষ কথা আছে। সামন্তভূমে মল্লভূমে ও ইহার দক্ষিণে মেদিনীপুরে আকর হইতে লৌহ নিষ্কাশিত হইত। স্থানে স্থানে লৌহমল স্তূপীকৃত আছে। যাহারা লৌহ-কলায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদিকে লোহার (লৌহকার) বলিত। তাহারা কামার নয় লোহার। এখন নিরন্ন। দেশজ লৌহের অস্ত্রশস্ত্র নির্মিত হইত। বিষ্ণুপুরের দলমর্দন কামান দেশী লোহায় দেশী কর্মকার গড়িয়াছিল। প্রায় দুই শত মণ লোহা তাতাইয়া পিটিয়া জুড়িয়া ১২ ফুট লম্বা কামান গড়া যেমন তেমন কর্ম নয়।

কিন্তু বাঁকুড়ার সেদিন আর নাই। মল্লভূমের শেষ স্বাধীন নৃপতি চৈতন্য সিংহ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরিত হইয়াছেন, তিনি সামান্য জমিদারে পরিণত হইয়া যথাসময়ে রাজস্ব দিতে পারিলেন না। মল্লভূম খণ্ড খণ্ড হইয়া নীলামে বিক্রয় হইয়া গেল। শুধু মল্লভূম নয়, কোন ভূমেরই শ্রী নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে সামন্তভূম মল্লভূমের দশায় পরিণত হইয়াছে।

ভাগীরথীর পশ্চিমের ভূমি রাঢ় নামে খ্যাত। রাঢ় দেশ উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ়, দুই ভাগে বিভক্ত। বীরভূমের দক্ষিণ সীমায় অজয় নদী দুই রাঢ়কে বিভক্ত করিয়াছে। দক্ষিণ রাঢ়ের ইতিহাস অদ্যাপি অজ্ঞাত। রাজা মানসিংহের পূর্বে ও পরেও ছোট ছোট অনেক রাজ্য ছিল। অনেক গ্রামের নামে গড় শব্দ যুক্ত আছে। এক এক গড় এক এক রাজধানী ছিল। কলিকাতাবাসী

পণ্ডিতেরা মনে করিতেন, বাঁকুড়া কাঁকর্‌য়া পাথর্‌য়া বন্য দেশ, বর্বরের দেশ, দরিদ্র পাচক ব্রাহ্মণের দেশ। সে দেশে কি কভু বড়ু চণ্ডীদাসের তুল্য রসসিন্ধু পণ্ডিত কবির উদ্ভব হইতে পারে? তাঁহাদের ভ্রম অপনীত করিবার নিমিত্ত বাঁকুড়া পুরাকৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলাম।

আপনারা যে কর্মে ব্রতী, আমরা তাহার সফলতা বাঞ্ছা করি। পাঠশালা বলি, বিদ্যালয় বলি, ইস্কুল বলি, কলেজ বলি, সকলেই আমাদের বালকবালিকাদের জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানুষ এক জীব। প্রাণ-রক্ষা তাহার প্রধান চিন্তা। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অসংখ্য শত্রু তাহার প্রাণ-নাশে উদ্যত। যে জ্ঞান দ্বারা সুস্থ বলিষ্ঠ দেহে সুখে শান্তিতে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারা যায়, সে জ্ঞান দেহজ্ঞান। ইহার নিমিত্ত দেহের নির্মাণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম স্বাস্থ্য-রক্ষার বিধি ব্যতীত দেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকার প্রকৃতি জানিতে হয়। ঋতুচর্যা, দিনচর্যা, রাত্রিচর্যা পালন করিতে হয়। অতএব জীবন-ধারণের নিমিত্ত দেশজ্ঞান অত্যাবশ্যক। দেশ হইতেই অন্ন পানীয় বস্ত্র গৃহ-নির্মাণের উপকরণ ঔষধ প্রভৃতি পাইয়া থাকি। আমরা একা একা থাকি না। গ্রামে ও নগরে বহু লোকের সহিত বাস করি। তাহাদের আচার মানিয়া চলি। ভাষা শিখিয়া তাহাদের সহিত ব্যবহার করি। প্রচলিত আইন মান্য করি। এ সকলের জ্ঞান দেশজ্ঞান। কিন্তু মানুষ এক অদ্ভুত জীব। স্বার্থের নিমিত্ত সে কি না করে? অসত্য প্রতারণা মাৎসর্য পৈশুন্য হিংসার পরিচয় আদালতে প্রতিদিন পাওয়া যায়। কিন্তু সে মানুষই নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া অন্যের প্রাণ রক্ষা করে। কেহ জলে ডুবিয়া পড়িয়াছে সে ঝাঁপাইয়া তাহাকে উদ্ধার করে। কোথায় কে অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পড়িতেছে, কোথায় কে রোগ-শয্যায় আর্তনাদ করিতেছে, সে স্থির থাকিতে পারে না, আতুরের সেবার্থে ধাবিত হয়। দেহ, আমি নয়। দেহ যেখানে সেইখানেই থাকে, কিন্তু আত্মা সর্বভূতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেই কারণে পরের দুঃখে দুঃখিত হই, পরের সুখ নিজে অনুভব করি। যে জ্ঞান দ্বারা আত্মার প্রসার হয়, তাহা আত্মজ্ঞান। সৎকর্মের অনুষ্ঠান ও সংযম ও বিনয় অভ্যাস দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের পথ উন্মুক্ত হয়। ইহা ব্যতীত কেহই সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন করিতে পারে না।

দেহজ্ঞান দেশজ্ঞান আত্মজ্ঞান, ত্রিজ্ঞান, ত্রিবর্গ। ত্রিবর্গ-সাধন দ্বারা জীবন সার্থক হয়। আপনারা ত্রিবর্গ-সাধনের উপায় দেখাইয়া দিতেছেন। আপনারা ধন্য। দেশের বালকবালিকাদের সম্মুখে জ্ঞানের দীপ ধরিয়া আছেন। ইহা অত্যুক্তি নয়, সান্ত্বনা নয়। তাহারা পিতামাতার নিকট প্রথম জন্ম পায়, আপনাদের নিকট দ্বিতীয় জন্মলাভ করিয়া মানুষ হয়। অবিবেচক মনে করে, মূল্য দিয়া পুত্রকন্যার বিদ্যা কিনিতেছে। আর যখন দেখে বিদ্যা জন্মিতেছে না, পুত্র অবিনীত উদ্ধত হইতেছে, তখন ইস্কুলের প্রতি শিক্ষকের প্রতি রুষ্ট হয়।

এক ইতিহাস বলি। এক নগরে এক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ রাজা বাস করিতেন। বস্তুতঃ তিনি রাজা ছিলেন না। ব্রিটিশকৃত রাজাও ছিলেন না। পূর্বে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, ব্রিটিশ শাসনে জমিদারীতে পরিণত হইয়াছিল। তিনি সেই জমিদারী কিনিয়া রাজ-উপাধি গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তিনি সদাশয় দানশীল ধর্মনিষ্ঠ শিষ্ট সম্মানার্হ ছিলেন। রাজপুত্র এক গবর্মেণ্ট ইস্কুলে পড়িত। বুদ্ধিতে স্থূল, দুষ্টামিতে পহেলা নম্বরের। অনেক কষ্টে তখনকার পঞ্চম শ্রেণীতে উঠিয়াছিল। বার্ষিক পরীক্ষা হইতেছে, রাজপুত্র পারিতেছে না। রাজার কর্ণগোচর হইল। তিনি পরীক্ষা-প্রণালী দেখিতে ইস্কুলে আসিলেন। শিক্ষক যথাযোগ্য সমাদর করিলেন। কুমার প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিতেছে না, নম্বর পাইতেছে না। রাজা দেখিলেন, ধৈর্যচ্যুত হইলেন। "মাষ্টার সাহেব, কাগজ কলম আপকা হৈ, নম্বর দেনে কা মালিক ভী আপ হৈ। লেকিন মেরা রাজকা মালিক নঁহী হৈ। আও বেটা, চলা আও।" কুমারকে লইয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু কুমারের নাম রহিল। একদিন শুনিলেন, কুমারের পড়া শুনা ভাল হইতেছে না। ইস্কুলে কারণ জানিতে আসিলেন। শিক্ষক মহাশয় চতুর ছিলেন, সুধাইতে লাগিলেন, কুমারের জন্য কত জন চাকর আছে? "চারো নৌকর হৈ।" কত বেতন পায়? "দশ দশ রূপেয়া।" গৃহ-শিক্ষক কত পান? "পচিশ রূপেয়া।" কুমার কত ঘণ্টা ঘুমায়? "আন্দাজ দশ ঘণ্টা।" ইস্কুলে কত ঘণ্টা থাকে? "ছ ঘণ্টা।" "রাজাসাহেব, আপনি কুমারকে আট ঘণ্টা আগলাইতে ৬৫৲ টাকা খরচ করিতেছেন, ঘণ্টায় আট টাকা দুই আনা। আর আমি ছয় ঘণ্টা আগলাই, এই গ্রীষ্মের রোদে পথে পথে ঘুরিতে দিই না, টানা পাখার বাতাসে রাখি, আপনি মাত্র দুইটি টাকা

দেন। দুই টাকায় আর কি হইবে?" রাজা পুত্রকে ইস্কুল হইতে লইয়া গেলেন, মাষ্টার পড়ায় না, বসাইয়া রাখে।

আপনাদের নিকট এইরূপ অভিযোগ নূতন নয়। জন্ম-কোষ্ঠীর দোষে আর বাড়ীর দোষে ছেলে অবিনীত উদ্ধত হয়, অবিবেচক পিতামাতা স্বীকার করিতে পারেন না। যে শিক্ষককে পিতা সম্মান করেন না, পুত্র তাঁহাকে মানে না, মানিতে পারে না। আর যে পুত্র শিক্ষকের অবাধ্য, তার শিক্ষাও সমাপ্ত! শিক্ষকের দোষ থাকে না, এমন নয়। কেহ কেহ স্বভাবতঃ রুক্ষ, কেহ স্বভাবতঃ দুর্বলচিত্ত। বালকদের তুল্য তীক্ষ্ণ সমালোচক ও হাস্যচিত্রকর দ্বিতীয় নাই। শিক্ষকের কাজ ভারি কঠিন। বই পড়িয়া শিখিতে পারা যায় না। ইস্কুলে প্রত্যহ তাঁহার পরীক্ষা চলিতে থাকে। কিছুকাল পরে শিক্ষক, বিশেষতঃ প্রধান শিক্ষক অস্বাভাবিক হইয়া পড়েন। মুখে হাসি নাই, সদা গম্ভীর। মনের ভিতরে আত্মমর্যাদা-রক্ষার চিন্তা সর্বদা জাগিতে থাকে।

ইস্কুলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নূতন বিধানে মাতৃ-ভাষার জয়-জয়কার হইয়াছে। ইংরেজী ভাষা ব্যতীত অপর সকল বিষয় মাতৃ-ভাষায় পঠন-পাঠন চলিতেছে। এখন আর উচ্চ ইংরেজী ইস্কুল নামটা সার্থক হইবে না; বলিতে হইবে 'উচ্চ বিদ্যালয়।' 'বঙ্গ বিদ্যালয়' বলিতে হইবে না; বঙ্গদেশে বঙ্গ বিদ্যালয় ব্যতীত আর কি হইতে পারে? যেটা অস্বাভাবিক ছিল, সেটা শোধরাইতে ২৫ বৎসর অর্থাৎ এক পুরুষকাল লাগিয়াছে। বহু বৎসর পূর্বে মননশীল দেশহিতৈষী বিদেশী ভাষায় বিদ্যা-উপার্জনের সাফল্যে সন্দিহান হইয়াছিলেন। ইং ১৯১৫ সালে এই বিসদৃশ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। অনেকে জানেন না, সংক্ষেপে বলিতেছি। সে বৎসর বর্দ্ধমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মেলন হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের তৎকালীন মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বোধ হয় এত বৃহৎ সম্মেলন আর কখনও হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্মেলন-পতি ও সাহিত্যশাখা-পতি হইয়াছিলেন। প্রবীণ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় দর্শনশাখা-পতি এবং প্রোফেসর যদুনাথ সরকার মহাশয় ইতিহাসশাখা-পতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। আমার উপর বিজ্ঞান শাখার ভার ছিল। বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত জ্ঞানী গুণী লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রায় দুই সহস্র সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন-সমাপ্তি দিবসে বিদ্যা-অর্জনের ভাষা বিচার্য ছিল। সভা গম্-গম্ করিতেছে, সম্মেলন-পতির আদেশ হইল আমাকে প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইবে। বিদ্যা বাঙ্ময়ী, মাতৃবাক্ দ্বারা বিদ্যা সহজে অচিরকালে লব্ধ হয়। সে বিদ্যা স্থায়ী হয়, ফল-প্রসূ হয়। প্রথম শিক্ষার্থীর নিকট মাতৃভাষাই উত্তম ও সুগম পন্থা। এই কথা বুঝিতে ও বুঝাইতে কিছুমাত্র কষ্ট নাই। ইহার বিপরীত রীতির সার্থকতা প্রতিপন্ন করাই অসাধ্য। প্রায় সকলেই এই যুক্তি অনুমোদন করিলেন, শিক্ষা-বিভাগের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকটে এই সিদ্ধান্ত প্রেরিত হইল। কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছিলেন, আপত্তি লঘু নহে। বাঙ্গালা ভাষার সামর্থ্য, বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অভাব, ইংরেজী ভাষার ব্যাপ্তি, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের সহিত এ দেশের সম্পর্ক ইত্যাদি নানা প্রশ্ন সহজেই উদিত হয়। তদনন্তর এই সকল প্রশ্ন লইয়া বহু তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় সে সময় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় অসুস্থ ছিলেন, তিনি সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। উপস্থিত থাকিলে তিনি নিশ্চয় এই সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিতে বলিতেন। আমাকে প্রস্তাব উত্থাপন করিতে বলার হেতু ছিল। দৈবক্রমে আমাকে কটক মেডিকেল ইস্কুলের ছাত্রদিকে বাঙ্গালা ভাষায় ভূত-বিদ্যা ও কিমিতি-বিদ্যা তিন চারি বৎসর শিখাইতে হইয়াছিল। কিমিতির বিষয় অল্প ছিল না। কিন্তু বিশ পঁচিশ প্রপাঠকে সমাপ্ত করিতে হইত। কলেজে বাঙ্গালা ভাষার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। দেখিয়াছি কিমিতি বিদ্যার তুল্য সাঙ্কেতিক বিদ্যাও বাঙ্গালা ভাষায় শিখাইতে পারা যায়। ফলও ভাল হয়। কলেজের ছাত্রদের জ্ঞান ভাসা ভাসা হয়, অনেক সময়ও লাগে। যখন ইংরেজী ভাষা মাতৃ-ভাষার তুল্য সুপরিচিত হয়, তখন শিক্ষা বিষয়ে উভয় ভাষাই সমান।

যে উদ্দেশ্যে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল, পৌস্তক জ্ঞান দ্বারা তাহা সম্যক্ সিদ্ধ হইতে পারিত। অল্পে অল্পে আমাদের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। আমরা দেখিতেছি আমরা জীবন-যুদ্ধে পশ্চাতে পড়িয়া আছি, আমি যাহা দেশ-জ্ঞান বলিয়াছি তাহার সম্যক্ অনুশীলন ব্যতীত প্রাণ-রক্ষার অন্য উপায় নাই। আরও দেখিতেছি, দেশের ভাগ্য-দোষে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য বিদ্যালয় নাই। সকলকেই সেই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হইবে। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় উদাসীন হইতে পারেন নাই, নূতন বিধানে প্রবেশিকা শিক্ষা যথাসম্ভব প্রায়োগিক করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি, আগমিক বিচারে যাহা প্রতিপন্ন হয়, কার্য কালে তাহা হয় না।

ইং ১৯৪০ সাল হইতে নূতন বিধানে প্রবেশিকা পরীক্ষা চলিতেছে। তদবধি তিন বৎসর অতীত হইয়াছে, নূতন বিধানের দোষগুণ লক্ষিত হইয়া থাকিবে। এই সম্মেলনে অনেক বিজ্ঞ বিদ্বান্ নিপুণ ভূয়োদর্শী কৃতি শিক্ষক ও শিক্ষিকা আছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন, আমি ধৃষ্টতা-প্রকাশে শঙ্কিত হইতেছি। আমি ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও প্রবেশিকা-পাশ ছাত্র-ছাত্রীর সহিত মিশিয়া থাকি, পুরাতনে ও নূতনে প্রভেদ দেখিতে পাই না। আপাততঃ মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষা জ্ঞান কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝি, সেটা ফেনার বৃদ্ধি। বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুতপঠনের নিমিত্ত বই নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু দ্রুত-পঠন আর দ্রুত রেল-গাড়ীতে ভ্রমণ একই প্রকার, রেলের দুই পাশের দ্রব্য-পরিচয় হয় না। আমার বিবেচনায় অল্প বই ভাল করিয়া পড়িলে যে জ্ঞান হয়, গ্রন্থশালায় শতাবধি গ্রন্থের পাতা উলটাইলেও তাহা হয় না। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত এমন বই চাই, যাহার ভাষা প্রয়োগ করিতে পারি। ভাষা-শিক্ষা, সে মাতৃভাষা হউক, বিদেশী ভাষা হউক, সেটা মুখস্থ বিদ্যা। শুধু ভাষা কেন, যাহার স্মৃতি দুর্বল, মেধা অল্প, কোন বিদ্যা তাহার অধিগত হয় না। পাঠ্য পুস্তক অধিক হইলে জ্ঞান ভাসা ভাসা হয়, মনেও থাকে না।

ভূগোল-বিবরণ, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের পাঠ্য-তালিকা এত অনিশ্চিত অপরিচ্ছিন্ন যে তাহা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইচ্ছা বুঝিতে পারা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্জীতে দেখিতেছি, ১৮ খানা ভূগোল-বিবরণ, ১৪+১৬ খানা ইতিহাস, ১৮ খানা বিজ্ঞান পুস্তক প্রশংসিত হইয়াছে। আমি দুইখানা ভূগোল-বিবরণ দেখিয়াছি। স্তম্ভিত হইয়াছি। চারি শত পাঁচ শত পৃষ্ঠার বই, যাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় খণ্ড খণ্ড তথ্য পুঞ্জীভূত হইয়াছে! ভাগ্যে ইস্কুলে পড়িবার বয়স অতীত হইয়াছে! দুইখানি ইতিহাসের বই পড়িয়াছি; দুই খানায় আট শত পঞ্চাশ পৃষ্ঠা! একখানি বিজ্ঞানের বই দেখিয়াছি, ছয়টি বিদ্যার বই, চারি শত পৃষ্ঠা। এত বড় বড় বই পড়িয়াও কিন্তু আমাদের বালকবালিকাদের দেশ-জ্ঞান অতি অল্প। দেশের বড় বড় গাছ চিনে না, পাখী চিনে না, পাখীর ডাক শুনিলে নাম বলিতে পারে না। কাপাস গাছ দেখে নাই, বলে তুলোর চাষ; জানে না বার্লির নাম যব, টিনের নাম রাং। একখানি স্বাস্থ্যবিদ্যার বই দেখিয়াছি। আড়াই শত পৃষ্ঠা। কিন্তু স্বাস্থ্য-বিদ্যা শিক্ষা প্রবেশিকায় আবশ্যক নহে, ছাত্রের স্বেচ্ছাধীন। গণিতের বই দেখিয়াছি, কোনটা ছোট নহে। বীজগণিতের ম্লেচ্ছ ভাষা পড়িবার পদ্ধতি খুঁজিয়া পাই নাই। আমি মর্কট-বৃত্তির বিরোধী। বড় বড় বইতে পাঠ্য বিষয় বাছিয়া বাছিয়া পড়ার দোষ আছে। কাজটি সোজাও নয়। আমার মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা-ভাষা-বিচারক-গোষ্ঠী এই সকল বই অবলোকন করেন নাই, করিলে ব্যাকরণ-দোষ, শব্দ-প্রয়োগ-দোষ, অযোগ্যতা-দোষ, অর্থবিকৃতি-দোষ অগ্রাহ্য করিতেন না, তর্ক-বিদ্যার মূল সূত্রের ব্যভিচার উপেক্ষা করিতেন না। বিবৃতি-দোষে জানা কথাও অজানা হইয়া পড়ে, রচনা-দোষে অপাঠ্য হয়। ইংরেজীর অনুবাদ বুঝিতে পারি, কিন্তু তরজমা বুঝা সোজা নয়। শুধু প্রবেশিকার পাঠ্য পুস্তক নয়, তৃতীয় হইতে অষ্টম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তকের অল্পসংখ্যক প্রশংসনীয় বলিতে পারা যায়। আপনারা প্রত্যহ দণ্ডভোগ করিতেছেন, ছাত্রদিগকে দণ্ড দিতেছেন। শিক্ষক সম্মেলনের কর্তব্য হানি হইতেছে।

বাঙ্গালা ভাষার দোহাই দিয়া বালকবালিকার কোমল মস্তকে গুরুভার স্থাপিত হইয়াছে, অভিভাবকেরা ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন। তাঁহাদের পরিদেবনা অহেতুকী বলিতে পারি না। ইস্কুলের নবম শ্রেণীর এক ছাত্র তাহার পাঠ্য-পৃষ্ঠা-সংখ্যা দিয়াছে। যথা—

(১) বাংলা গদ্য ১৬৭, পদ্য ৪৮, দ্রুতপাঠ ৩৬২, ব্যাকরণ ৪৫৭। মোট ১০৩৪ পৃঃ।

(২) ইংরেজী গদ্য ৯১, পদ্য ৪১, দ্রুতপাঠ ৩৭১, ব্যাকরণ ৫০০। মোট ১০০৩ পৃঃ।

(৩) ভূগোল বিবরণ ৮৫২, ইতিহাস ৮৫২। মোট ১৭০৪ পৃঃ।

(৪) গণিত।

(৫) সংস্কৃত গদ্য ৫২, পদ্য ২১, ব্যাকরণ ৫৮৪। মোট ৬৫৭ পৃঃ।

(৬) বিজ্ঞান ৪০৯ পৃঃ।

একুনে ৪৮০৭ পৃষ্ঠা।

ইহা সম্পূর্ণ তালিকা নয়। তিন ভাষা পুস্তকের অর্থপুস্তক, বাংলা ইংরেজীতে রচনা শিক্ষা, ভাষান্তরকরণ শিক্ষা, পত্রলিখন শিক্ষার বই পড়িতে হয়। একত্র করিলে ২৫০০ পৃষ্ঠার কম হইবে না। দুই বৎসরে ৮০০০ পৃষ্ঠা পড়িবার বুঝিবার ভাবিবার মনে রাখিবার সময় কোথায়? তদুপরি গণিতরূপ নিরাট অগ্নিজ শিলা চূর্ণ করিতে হইবে, যাহার দৃষ্টিমাত্রে বহু ছাত্রের মস্তক ঘূর্ণিত হয়, কলেজে গিয়া প্রকৃতিস্থ হয়। অন্নবিদেরা গুরু ভোজনের তিন কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, মাত্রাগুরু দ্রব্যগুরু সংস্কারগুরু।

ভাত লঘু, কিন্তু আকণ্ঠ ভোজনে শ্বাসরোধ হয়। পিষ্টক দ্রব্য গুরু, শীঘ্র জীর্ণ হয় না। আর উভয়েই বেসবারাদি যোগে পক্ক হইলে দুষ্পচ হয়। ছাত্র-ছাত্রীকে ত্রিবিধ গুরু অন্ন ভোজন করিতে হইতেছে। ফলে দেহের ও মনের দৃষ্টিহানি ও অজীর্ণরোগ জন্মিতেছে। এক এক পরীক্ষার সময় আসে, আধখানা হইয়া যায়। আপনারা জানেন না, শিক্ষিকা মহাশয়রা আদৌ জানেন না, ছাত্রেরা জানে কলিকাতায় কলেজ ষ্ট্রীট নামে এক রাজমার্গ আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারা যায়। সেখানে সকল বিদ্যার নির্যাস প্রস্তুত হইতেছে। প্রবেশিকার শুভঙ্করী বটিকা বিক্রয় হইতেছে। উদ্‌বিগ্ন বিষণ্ণ ক্লান্ত ছাত্র-ছাত্রী বটিকা সেবন করিয়া আশ্বাসিত হইতেছে, পরীক্ষারণে জয়ী হইতেছে।

সহৃদয় শিক্ষক ছাত্রের দুঃখে ব্যথিত হন, এবং যখন কার্যগতিকে উভয়ে একাত্ম হইতে না পারেন তখন তাঁহার চিত্ত স্বভাবতঃ বিরক্ত হয়। যে কর্ম করিয়া আনন্দ পাই না তাহাতে আমাদের চিত্ত নিবিষ্ট হয় না। ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই ইহার ফলভাগী হন। যদি ইহার উপরে শিক্ষকের অন্নচিন্তা চমৎকারা হয় তাহা হইলে দেশে জ্ঞান-প্রচারের দীপ আপনি স্তিমিত হইয়া যায়। দুর্দিনে আমরা সকলেই চিন্তিত ও ক্লিষ্ট হইয়াছি। কবে সুদিন আসিবে, আমাদের তর্কের অতীত। ইতিমধ্যে কি যে কর্তব্য তাহা আপনারা বিবেচনা করিবেন।

আমি এই সম্ভাষণে রাজপ্রতিষ্ঠিত ইস্কুলের ও পরোপকারশীল জন-প্রতিষ্ঠিত ইস্কুলের শিক্ষকের প্রভেদ করি নাই। সাধারণের নিকট দুই প্রকার ইস্কুলই সমান। উভয়ের আশয় এক, কর্ম এক। কিন্তু সকল ইস্কুল সমান রাজপ্রসাদ পায় না। ইহার অনেক কারণ আছে। একটা কারণ এই যে রাজমন্ত্রী এত ইস্কুলের প্রয়োজন স্বীকার করেন না। কয়েক বৎসর পূর্বে শুনিয়াছিলাম কতকগুলি ইস্কুল তুলিয়া দিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহার বিবেচনায় সে সব ইস্কুলে কুশিক্ষা হয়, সুশিক্ষা হয় না। দ্বিতীয় কারণ রাজকোষে এত অর্থ নাই যে দেশের সকল বালক বালিকাকে সুশিক্ষিত করিতে পারা যায়। অর্থ কেন নাই? যেহেতু দেশের লোক অর্থ উপার্জন করিতে পারে না। কেন পারে না? যেহেতু সে বিদ্যা শিখে নাই। এই দুষ্টচক্রে পড়িয়া আমরা ঘুরপাক খাইতেছি। যে বীর এই চক্র ভগ্ন করিতে পারেন, এখনও তাঁহার উদয় হয় নাই।

আর বাক্‌-বাহুল্য করিব না। আপনারা প্রসন্নচিত্তে সম্মেলনের কর্তব্য সমাপন করুন। আপনাদের শুভাগমন সার্থক হউক! জাঙ্গল দেশে অবস্থানের স্মৃতি প্রীতিকর হউক!

বাঁকুড়া,
২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৩।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীযুক্ত সরসীকুমার দত্ত মহাশয়ের কন্যা, ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশনের ছাত্রী শ্রীমতী সুকুমারী দত্ত এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন; এই কৃতিত্বের জন্য তিনি রাধাকান্ত-স্বর্ণপদক পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি বাংলাতেও প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বঙ্কিম-স্বর্ণপদক পাইয়াছেন। পূর্বে উক্ত বিদ্যামন্দির হইতে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি তারকা সম্মান (star) ও সরকারী বৃত্তি লাভ করেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ফেডারেল কোর্টের রায়

ভারতীয় ফেডারেল কোর্ট রায় দিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদ ভারত-সরকারের উপর যতটা ক্ষমতা দেওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন, ভারতরক্ষা-বিধির ২৬ নং ধারা সে সঙ্গতির মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে; অতএব এই ধারা বাতিল। ভারতরক্ষা-বিধির এই ২৬ নং ধারা অনুসারে বর্তমানে প্রায় আট হাজার ব্যক্তি বন্দী আছেন। মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমীটির সদস্যবর্গও এই ধারা অনুসারেই বন্দী হইয়াছেন। ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি সর্ মরিস্ গয়ার রায়ে বলিয়াছেন :

"আমরা স্বীকার করি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্তে অন্ততঃ সাময়িকভাবে হইলেও শাসক শক্তির কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইবে এবং সম্ভবতঃ তাঁহারা বিব্রতও হইবেন, এই জন্য আমরা দুঃখিত—বিশেষ করিয়া বর্তমান সময়টাও অতি কঠিন। কিন্তু এইরূপ অসাধারণ ক্ষমতা সম্রাটের ভারতীয় প্রজাগণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে এবং বস্তুতঃ করিয়াছেও। এই অবস্থায় আমরা একান্তভাবে আশা করি যে, ভবিষ্যতে এইরূপ ক্ষমতা গ্রহণ করার সময় অধিকতর সতর্কতার সহিত বিধিব্যবস্থা করা হইবে, তাহা হইলেই আইনবিহিত ব্যবস্থা ব্যতীত গ্রেপ্তার ও আটকের সম্ভাবিত দায় হইতে জনসাধারণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে। লোককে আটক করিবার ক্ষমতা যাহাদের উপর অর্পিত রহিয়াছে, একটা বিষয়ের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি; আমাদের অভিমত এই যে, যখন কাহাকেও গ্রেপ্তার বা আটক রাখিবার আদেশ দেওয়া হইবে তখন সেই আদেশে কি কারণে গ্রেপ্তার বা আটক করা হইতেছে, তাহা উল্লেখ করিতেই হইবে।"

"আমাদের মনে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উপস্থিত হইয়াছে—(১) ভারতরক্ষা বিধানে নিয়ম প্রণয়নের যে ক্ষমতা দেওয়া আছে, তাহাতে 'সন্দেহের সঙ্গত কারণ' অর্থে কি বুঝায়; উহার অর্থ কি এই যে, কর্তৃস্থানীয় যে ব্যক্তি আটকের আদেশ দিতেছেন তাঁহার নিকট কতকগুলি কারণ সঙ্গত মনে হইতেছে বলিয়াই তিনি সেই সমস্ত কারণে কোন ব্যক্তিকে সন্দেহ করিতেছেন, অথবা যে কারণগুলি স্বতঃই সঙ্গত, সেই সমস্ত কারণে সন্দেহ করিতেছেন? কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কোনও অনিষ্টকর কার্য্যে উদ্যত হইতেছে বলিয়া সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে তাহাকে বা তাহাদিগকে সেই কার্য্য হইতে বিরত রাখার জন্য আটক করিয়া রাখার বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা গবর্ন্মেণ্টকে দেওয়া যাইতে পারে।"

"যেখানেই প্রজা-সাধারণের স্বাধীনতার প্রশ্ন রহিয়াছে সেখানে বিচার আদালতকে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। সেই সাবধানতার সহিতই আমরা এই প্রশ্নটির আলোচনা করিতেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই কথাও মনে রাখিতেছি যে, দেশ বর্তমানে যুদ্ধরত। শান্তির সময়ে যে সমস্ত ক্ষমতার কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই, বিভিন্ন দেশের গবর্ন্মেণ্ট বর্তমানে সেই সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন ইহা সকলেই জানেন। এ কথাও সত্য বটে যে, রাজকার্য্য পরিচালনার গুরু দায়িত্ব যাঁহাদিগকে বহন করিতে হয়, বিশেষ করিয়া বিপদ এবং সঙ্কটকালে যাঁহাদিগকে সেই দায়িত্ব বহন করিতে হয় তাঁহারা সদভিপ্রায় প্রণোদিত হইয়া যে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত কার্য্যের কঠোর এবং নির্দয় সমালোচনা হইতে বিরত থাকা বিচার-আদালতের পক্ষে কর্তব্য, কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, আইন-সভা শাসনকার্য্য-পরিচালনার ক্ষমতা যে রাজপুরুষদের উপর অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা যাহাতে ক্ষমতার মাত্রা অতিক্রম না করেন, তাহা দেখাও বিচার-আদালতের কর্তব্য। রাজপুরুষবর্গের হস্তে যত কঠোর এবং সুদূরপ্রসারী ক্ষমতা দেওয়া হউক না কেন এবং যে বিপদ প্রতিরোধ করিবার জন্য সে ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে সে বিপদ যত বড়ই হউক না কেন, রাজপুরুষদের ক্ষমতা যাহাতে মাত্রা অতিক্রম করিয়া না যায়, তাহা দেখার কর্তব্য বিচার-আদালত পরিহার করিতে পারেন না।"

"ভারতরক্ষা-আইন এবং তদনুযায়ী বিধানাবলী যাঁহারা রচনা করিয়াছেন ইংলণ্ডের বিধানটি তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত ছিল। কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কর্তাবিশেষের উপর কোন লোককে আটক রাখার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার দেওয়া হইবে—এরূপ অভিপ্রায়ের লেশমাত্র উল্লেখও ভারতরক্ষা-আইনে নিবদ্ধ নাই। পক্ষান্তরে এই অতিগুরুতর ক্ষমতা কাহারা প্রয়োগ করিবেন তাহা নিয়মগুলির দ্বারা স্থির করা হইবে অর্থাৎ যাঁহারা নিয়ম রচনা করিবেন তাঁহারাই স্থির করিবেন কাহারা সেই নিয়ম প্রয়োগ করিবেন। ভারতবর্ষকে একটা বিপুল খণ্ডমহাদেশ বলা যায়। এখানকার গবর্ন্মেণ্টের সমস্যা অন্যান্য গভর্ণমেণ্টের সমস্যার তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক্, এখানে কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে ১১টি প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টও রহিয়াছে; তদুপরি অন্যান্য কর্তৃপক্ষও রহিয়াছেন। সুতরাং বিলাতের মত এখানে পূর্ব হইতেই এক বা একাধিক ব্যক্তির উপর ঐ ক্ষমতা ন্যস্ত রাখা যে কতকটা দুঃসাধ্য ইহাও সত্য। কিন্তু ভারতরক্ষা-বিধানের মধ্যে এমন কোন কথা দেখিতেছি না যাহাতে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যত নগণ্যই হউন না কেন ঐ ক্ষমতা অর্পণ করা যাইত না। কতকগুলি নির্দিষ্ট কারণে সঙ্গত বিবেচনা করিলে কোন লোককে আটক রাখিবার ক্ষমতা স্বরাষ্ট্র-সচিবের উপর অর্পণ করার নিয়ম করা এক কথা, আর কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ম করিয়া যাঁহাকে খুশী তাঁহাকে সেই ক্ষমতা দিবেন তাহা আর এক কথা।"

"কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট যে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ বা দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের উপর এই ক্ষমতা অর্পণ করিবেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় বলিয়া বলা হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ কেন্দ্রীয় সরকার ঐ ক্ষমতা নিজের এবং প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট-সমূহের উপর অর্পণ করিয়াছেন অর্থাৎ সপারিষদ গবর্ণর-জেনারেল এবং গবর্ণর ও তাঁহাদের পরামর্শদাতাদের উপর অর্পণ করিয়াছেন। বিলাতে দেশরক্ষা আইনের ১৮খ বিধান অনুসারে বন্দীদের সংখ্যা সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে যে সরকারী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, বন্দীদের সংখ্যা এত অধিক নহে যাহাতে স্বরাষ্ট্রসচিবের পক্ষে প্রত্যেকের বিষয় নিজের বিচার করিয়া দেখা অসম্ভব হয়। বিচারের দিক হইতে আমরা এই তথ্য মনে রাখিতে পারি যে, ভারতে বন্দীদের সংখ্যা বিলাতের তুলনায় অনেক বেশী। সুতরাং সপারিষদ গবর্ণর-

জেনারেল অথবা সপরামর্শদাতা গবর্ণরগণ সব সময়েই যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নজর দিতে পারিয়াছেন তাহা মনে করিতে পারা কঠিন। এই অবস্থায় যাহাদের উপর ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহাদের পক্ষে যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা বা আটক করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে সন্দেহের সঙ্গত কারণ আছে কিনা তাহা বিবেচনা করা সব সময় হয়ত সহজসাধ্য হয় নাই।"

"ভারতরক্ষা-বিধানের ২৬ নং ধারা এবং উপধারা ২ (২) (১০) এর মধ্যে একটা পার্থক্য রহিয়াছে। কোন ব্যক্তি কোন কার্য্যে উদ্যত হইয়াছে এই সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে তাহাকে আটক করিতে পারা যাইবে—এরূপ নিয়ম করিবার অধিকার আইনে দেওয়া হইয়াছে। কোন লোক কোন অনিষ্টকর কার্য্যে উদ্যত হইতেছে কিনা সে সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের কারণ থাকিলে বা না থাকিলেও এইরূপ নিয়ম করা চলিত। শুধু ইহাই বলিলে চলিত যে, যাহাতে কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ কার্য্যে রত না হইতে পারে তাহার জন্য গবর্ন্মেণ্ট তাহাকে আটক রাখা সঙ্গত বিবেচনা করেন। যে কোন গবর্ন্মেণ্ট স্থির করিতে পারেন যে কোন প্রকার বিপদের ঝুঁকি না লওয়াই সঙ্গত, সুতরাং কোন লোককে কোন কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত রাখার জন্য তাহাকে আটক রাখাই তাঁহারা ভাল মনে করিতে পারেন। তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ থাকুক বা না থাকুক ২৬ নং ধারায় গবর্ন্মেণ্টকে সেইরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু দশম অনুচ্ছেদে এরূপ ক্ষমতার কোন নিয়ম দেখা যাইতেছে না। আইন-সভা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ঐ ব্যাপক ক্ষমতা দিতে পারিতেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে তাহা করা হয় নাই তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। শুধু এই ক্ষমতাই দেওয়া হইয়াছে যে, যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কোন অনিষ্টকর কার্য্যে রত হইতে উদ্যত হইতেছে বলিয়া সন্দেহের সঙ্গত কারণ থাকিবে সে ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিকে আটক করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার আগে দেখিতে হইবে কতকগুলি সর্ত্ত পূরণ হইয়াছে কি না। কোন লোক কোন সময়ে কোন কার্য করিবে—এরূপ মনে করিয়া কোন লোককে আটক করিবার কোন ক্ষমতা গবর্ন্মেণ্টকে দেওয়া হয় নাই, বস্তুতঃই সেই লোক ঐরূপ কার্য্যে উদ্যত হইয়াছে এরূপ সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ অবশ্য থাকা চাই।—এ, পি,

ভারত-সরকার এই রায় শিরোধার্য করিয়া বন্দীদের মুক্তির আদেশ দিবেন কি না সে সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, পুনরায় এক অর্ডিনান্স জারি করিয়া বড়লাট লর্ড লিনলিথগো তাহার নিরসন করিয়াছেন। এই অর্ডিনান্সে প্রমাণিত হইয়াছে যে ভারত-সরকার বর্তমান সময়ে আইন-আদালতের উপযুক্ত মর্যাদা দানে ইচ্ছুক নহেন, অর্ডিনান্সের দ্বারা নিজেদের বিবেচনা ও সুবিধা অনুসারে দেশশাসন করিতে বদ্ধপরিকর। ভারতবাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করিবার যে সামান্য ক্ষমতা ও অধিকার এত দিন আদালতের হাতে ছিল, সাম্রাজ্য রক্ষার অজুহাতে সেটুকুও হরণ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। ফেডারেল কোর্টের এই রায়ে আইন-রচনায় বাক্যবিন্যাসের ত্রুটিই শুধু দেখান হইয়াছে এইরূপ একটা ধারণা প্রচারের চেষ্টা করা হইয়াছিল। শুধু ভারতবাসী নহে, বিলাতেও যে আমেরী সাহেবের এই যুক্তি বুদ্ধিমান লোকে গ্রহণ করিতে পারে নাই, 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে'র নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যই তাহার প্রমাণ:—

"সমস্ত ব্যাপারটাই অত্যন্ত বিশ্রী, শুধু একটা লক্ষণ ভাল। সে লক্ষণটা এই যে, ভারতবর্ষে এমন বিচারালয় আছে যাহা স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচার করিতে সমর্থ। আইনের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যখন শাসকবর্গের সহিত এই সমস্ত আদালতের মতবৈষম্য হয় তখন তাঁহারা শাসকবর্গকে নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হন না। এ সম্পর্কে যে কয়টি মামলা হইয়াছে তাহার সব কয়টিতেই বিচারক ছিলেন ইংরেজ।

এই ভাল লক্ষণ সত্ত্বেও শাসকবর্গ ঠিক উৎরাইতে পারিতেছেন না। ব্যাপারটা অতি নগণ্য, একথা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। একথা বলিলেও চলিবে না যে, ত্রুটিটা খুঁটিনাটি ঘটিত এবং কথার মার-প্যাঁচ মাত্র। সমস্ত আইনই কথার মার-প্যাঁচ। বলা হইতেছে যে, এই নয় হাজার লোককে আটক রাখার ক্ষমতা ভারত-সরকারের ছিল, ক্ষমতাটা হাতে লইবার সময় অনবধানতাবশে কথার ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। এখন উহা ঠিক করিয়া লইলেই হইল, সুতরাং ঐ ত্রুটিতে কিছু যায় আসে না। যায় আসে বই কি। ভারত-সরকার একটা নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান নহে। ভারত-সচিবের নিয়ন্ত্রণাধীনে ভারত-সরকারকে চলিতে হয়। ভারত-সচিব তাঁহার কাজের জন্য ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের নিকট জবাবদায়ী। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট যে সমস্ত আইন রচনা করেন ভারত-সচিবকে তদনুযায়ী চলিতে হয়। এ কথা ধরিয়া লওয়াই আছে যে আগাগোড়া সমস্ত কার্য্যেই আইনের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে। সত্য বটে, শান্তির সময় যে সমস্ত আইনের বলে লোকের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত হইয়া থাকে, যুদ্ধাদি আপৎকালে তাহা অনেকটা খর্ব হয় এবং সাময়িক-ভাবে লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্থগিত থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া যে আইন বিদ্যমান আছে সেই আইন অনুযায়ী কাজ করার যে দায়িত্ব ভারত-সরকারের রহিয়াছে সেই দায়িত্ব হ্রাস পায় না। বিশেষ করিয়া যে গবর্ন্মেণ্টের সহিত শাসিতদের একটা বড় অংশের বিরোধিতা চলিতেছে, সেই গবর্ন্মেণ্টের পক্ষে এই দায়িত্ব খুবই বেশী। কেন-না যথাযথভাবে এই দায়িত্ব পালন না করিলে শাসিতরা—অযথা হইলেও—গবর্ন্মেণ্টের কুমতলব আছে বলিয়া সন্দেহ করিবে।"

—

কলিকাতা হাইকোর্টের রায়

১৯৪২ সালের ২ নং অর্ডিনান্স অনুসারে ফৌজদারী মামলা বিচারের জন্য যে বিশেষ আদালতের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার কতকগুলি বিধানের বৈধতা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের বিচার কলিকাতা হাইকোর্টে সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। প্রধান বিচারপতি সার হ্যারল্ড ডারবিশায়ার, বিচারপতি খোন্দকার এবং বিচারপতি সেন রায়ে বলেন যে, উক্ত অর্ডিনান্সের ৫, ১০ এবং ১৬ ধারা প্রণয়নের আইন-সঙ্গত অধিকার বড়লাটের ছিল না। রায়ের সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:

প্রধান বিচারপতি রায় দেন যে, ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন অনুসারে গঠিত যে সমস্ত আইন-সভাকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে কেবল মাত্র সেই সকল আইন-সভাই ফৌজদারী কার্যবিধির এবং হাইকোর্টের কার্য্যবিধির পরিচালনা সম্পর্কিত কতকগুলি ধারা সৃষ্টি করিতে পারেন।

অর্ডিনান্সের ৫, ১০ এবং ১৬ ধারায় যে সমস্ত ব্যক্তিকে ঐরূপ রদ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন বিধানে বিহিত ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত নহেন, সুতরাং এই ধারা কয়টি অবৈধ।

পৃথক্ রায়ে বিচারপতি খোন্দকার বলেন যে, ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের ৭২ ধারার নবম তপশীলে গবর্ণর-জেনারেলকে কতকগুলি ক্ষমতা পরিহারের অধিকার দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু আলোচ্য অর্ডিনান্সে বিশেষ আদালতের ব্যবস্থা করার অনুরূপ কার্য্যের জন্য সেই অধিকার প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। এই কারণে তিনি মনে করেন যে উক্ত অর্ডিনান্সের ৫, ১০ এবং ১৬ ধারা গবর্ণর-জেনারেলের এক্তিয়ার-বহির্ভূত হইয়াছে।

বিচারপতি মিঃ সেন তাঁহার রায়ে বলেন যে, অর্ডিন্যান্সটির উপক্রমণিকা এবং ১ (৩) ধারা পরস্পরবিরোধী। ঐ দুইটি একসঙ্গে পাঠ করিলে দেখা যায় যে কি অবস্থায় কোন্ অর্ডিন্যান্স জারি করিবার ক্ষমতা কাহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহা গবর্ণর-জেনারেল ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, অধিকন্তু কোন অর্ডিন্যান্স জারী করিবার মত আপৎকালীন অবস্থা বিরাজ করিতেছে কিনা তাহা নির্ধারণ করিবার ভার পার্লামেণ্ট কর্তৃক খোদ গবর্ণর-জেনারেলের উপরই অর্পিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে তিনি নিজে তাহা নির্ধারণ না করিয়া উহা নির্ধারণ করিবার ভার প্রাদেশিক গবর্মেণ্টসমূহের উপর দিয়াছেন, সুতরাং সমগ্র অর্ডিন্যান্সটিই অবৈধ হইয়াছে।

বাংলা-সরকার হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে ফেডারেল কোর্টে আপীল করিয়াছেন।

—

শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ, নববর্ষ ও কবিগুরুর জন্মোৎসব

শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ, নববর্ষ এবং কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বর্ষশেষের সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা হয়। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন উপাসনা করেন। তিনি বলেন, "দিনের অবসানের পর আসে রাত্রি—বর্ষশেষে আবার আসবে নববর্ষের শুভ্র প্রভাত। এক ভয়ঙ্কর অবস্থা আমরা কাটিয়ে এসেছি। নববর্ষের প্রভাতে ভবিষ্যতের করাল রূপ দেখে আমরা যেন ভয়ার্ত না হই। বিধাতা অকল্যাণ এবং আঘাতের মাঝেই পরম কল্যাণকে প্রেরণ করবেন। আমরা আজ তাঁকে প্রণাম করি।"

১লা বৈশাখ ব্রাহ্মমুহূর্তে বৈতালিক গান হয়। আশ্রমের বালক-বালিকারা "মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্ত দ্বারে" এই গানটি সমবেত কণ্ঠে গাহিয়া আশ্রম পরিভ্রমণ করে। সূর্যোদয় হইবার পূর্বেই দূর দূরান্ত হইতে নরনারী এবং আশ্রমবাসীরা আসিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হন। শুভ্র পুষ্পের সুশোভনে এবং সুনিপুণ আলপনায় নববর্ষের প্রথম প্রভাতে মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে যেন মাঙ্গলিক রূপ অপূর্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের পৌরোহিত্যে নববর্ষের উপাসনা আরম্ভ হয়। আচার্যের বেদী হইতে তিনি বলেন, "নববর্ষের প্রাতঃকালে পূর্ব দিগন্তে জয়ভেরী বেজে উঠেছে। যাহা অসুন্দর, যাহা অন্যায়, আজ তা কেটে যাক। বিধাতার চরণতলে প্রণত হয়ে নূতন আঘাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে আমরা এসেছি। তোমরা মনে করো—মানুষের জয়লক্ষ্মী তোমার। দুঃখকে অন্তরের মধ্যে তোমরা বরণ ক'রে লও।" অতঃপর তিনি প্রার্থনায় বলেন, "আজ সমস্ত জগৎ নিজের লোভে নিজের স্বার্থে নিয়োজিত, কিন্তু ভারতবর্ষের রূপ আলাদা। ভারতবর্ষ কল্যাণের জন্যই নিয়োজিত। এই যে জগতের মহাশ্মশানে শক্তির সাধনা চলছে তা তো ভগবানের আরাধনা নহে—তাই ত গুরুদেব বলেছেন,

'সে দারুণ পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি
হে ভারত সর্ব দুঃখে রহ তুমি জাগি।'

আজ নববর্ষের প্রথম প্রভাতে প্রার্থনা করি, অসত্য অপসারিত হোক; বিধাতার আলোক সম্মুখে রেখে আমরা যাত্রাপথে চলবো। আমাদের জীবনে যেন দিনে দিনে তাঁর প্রকাশ পায়।"

নববর্ষের প্রার্থনা শেষ হইবার পর আশ্রমের আম্রকুঞ্জে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে কবিগুরুর জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বলেন, "এ জগতের তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে একটা পুরাতন ঐক্য কবিগুরু অনুভব করেছেন—তিনি এত বড় রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ মনে করেন নি। কবি পেয়েছিলেন তাঁর জীবনসঙ্গীকে। পুরাতনের সঙ্গে—অতীতের সঙ্গে কবির মিলন ঘটেছে। নূতন-পুরাতনের মধ্যে চলতে চলতে অভিসার করতে করতে একদিন মরণের সম্মুখে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। মরণের সঙ্গে হলো তাঁর মিলন। কবি অভিসারে গিয়েছেন—মিলন-সভায় গিয়েছেন। তাঁর বাঁশীর সুর যেন আজও কানে বাজছে। জন্মের উৎসব সেদিনই পরিপূর্ণ হবে যেদিন মরণের সমারোহকে আমরা মেনে লব। মৃত্যুর ভিতর দিয়েই আসে নবজীবনের সমারোহ।"

সন্ধ্যায় লাইব্রেরি হলের সম্মুখের চত্বরে 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনীত হয়। নৃত্যে গানে সুরঝঙ্কারে এবং অপরূপ রূপসজ্জায় অভিনয়টি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। অনুষ্ঠানের বিবরণী এবং আচার্য অবনীন্দ্রনাথের ও পণ্ডিত

ক্ষিতিমোহন সেনের ভাষণের উদ্ধৃতাংশগুলি আমরা শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়াছি।

—

নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলন

বাঁকুড়ায় নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলনের একবিংশতিতম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রায় পাঁচ শত প্রতিনিধি বাঁকুড়ায় সমবেত হইয়াছিলেন এবং স্থানীয় লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে তাঁহাদের অভ্যর্থনা ও আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় তাঁহার অভিভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক মনোনয়ন সম্বন্ধে যে সমালোচনা করেন তৎপ্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। রায় মহাশয়ের অভিভাষণটি বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে।

সভাপতি ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "আমাদের শিক্ষা-সমস্যা ঘোরালো হইতে পারে, উহার পূর্ণ সমাধানের পথ নির্দেশ করাও কঠিন হইতে পারে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাব আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটির কারণ নহে, উত্তম সুপারিশসমূহ কার্যে পরিণত করিতে গবর্মেণ্টের অনিচ্ছাই উহার প্রধান কারণ। অর্থব্যয়ের ভয়ে গবর্মেণ্ট কোন ভাল প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত করিতে চাহেন না। অতএব তাঁহার মতে শিক্ষক-সম্মেলন প্রভৃতি আহ্বান করিয়া জিহ্বা কণ্ডুয়ন চরিতার্থ করা ব্যতীত আর কোন লাভ হয় না। অথচ অভিভাষণের শেষে তিনিই আবার বলিতেছেন যে শিক্ষক-সম্মেলনের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলা উচিত, তবে তাহার প্রধান কর্তব্য হইবে শিক্ষা-সমস্যার প্রতি দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তাঁহার মতে গবর্মেণ্টের হাতে বালক-বালিকাদের শিক্ষার ভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নহে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষা-বিস্তারের প্রতিই তিনি জোর দিয়াছেন। গত এক শতাব্দী যাবৎ বাংলা দেশে যেটুকু শিক্ষা-বিস্তার হইয়াছে তাহার অধিকাংশই সম্ভব হইয়াছে ব্যক্তিগত চেষ্টায়। সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ বা অধীনস্থ দেশসমূহে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাস যাহাদের জানা আছে, সরকারী চেষ্টায় শিক্ষা-বিস্তারের আশা তাঁহারা রাখেন না!

—

শিক্ষকতার যোগ্যতা

পার্লামেণ্টের আগামী অধিবেশনে মিঃ আমেরীকে দেরাদুন মিলিটারী কলেজের শিক্ষক নিয়োগ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করিবেন বলিয়া মিঃ ওয়াকডেন নোটিস দিয়াছেন। ইণ্ডিয়া আপিস হইতে প্রচারিত একটি বিজ্ঞাপনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি জানিতে চাহিয়াছেন,—ভাল শিক্ষক হইবার যোগ্যতা কাহার আছে? পাবলিক স্কুল হইতে পাস করিয়াছে কিন্তু শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা নাই এবং সাধারণ স্কুলে পড়িয়াছে কিন্তু শিক্ষাদানের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে—এই দুইয়ের মধ্যে শিক্ষকতাকার্যে কে বেশী উপযুক্ত? শেষোক্ত ব্যক্তির যোগ্যতা অবশ্য স্বীকার্য হইলেও গবর্মেণ্ট কেন উহা মানিয়া লন নাই মিঃ ওয়াকডেন ইহাতে বিস্মিত হইয়াছেন। ইণ্ডিয়া আপিসের বিজ্ঞাপনে দেরাদুন মিলিটারী কলেজের দুই জন সহকারী শিক্ষকের পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হইয়াছে, ইঁহারা ইতিহাস ও ভূগোল পড়াইবেন এবং এক জন ফরাসী ভাষাও শিক্ষা দিবেন। যোগ্যতা সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে প্রকাশ, প্রার্থিগণ পাবলিক স্কুলের ছাত্র হওয়া চাই, শিক্ষাদান-কার্য্যে অভিজ্ঞতা থাকিলে ভাল হয়, না থাকিলেও চলিবে।

ভারতবর্ষে চাকুরীতে লোক নিয়োগের নীতি জানা থাকিলে মিঃ ওয়াকডেন এই প্রশ্ন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। এখানে বহু ক্ষেত্রে পূর্বে লোক ঠিক হয়, পরে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে লোক ঠিক করিবার পর চাকুরী সৃষ্টি হয়, তার পরে বিজ্ঞাপনের প্রশ্ন ওঠে। বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রচলিত রেওয়াজটার ব্যতিক্রম সাধারণতঃ করা হয় না।

—

সর্ রিচার্ড টটেনহামের মামলা

বিগত গণবিক্ষোভে কংগ্রেসের দায়িত্ব বর্ণনা করিয়া ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটরী সর্ রিচার্ড টটেনহাম কর্তৃক যে পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে লেখা হইয়াছে যে শ্রীযুক্ত জগৎনারায়ণ লাল পাটনায় জনতাকে উত্তেজিত করিয়া তাহাদিগকে হিংসামূলক কার্যে এবং অগ্নিকাণ্ড ঘটাইতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জগৎনারায়ণ লালের পক্ষ হইতে এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়া পাটনার স্পেশাল জজের আদালতে প্রার্থনা করা হয় যে, সর্ রিচার্ড টটেনহামকে আদালত-অবমাননার দায়ে কেন অভিযুক্ত করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য তাঁহার নামে নোটিস জারি করা হউক। শ্রীযুক্ত জগৎ-

নারায়ণ লাল অন্যান্য অভিযোগে কারারুদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু জনতা উত্তেজিত করিবার অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে টিঁকে নাই। যে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার বিচার করিয়াছিলেন তিনিও রায়ে বলিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত জগৎনারায়ণ লাল জনতাকে শান্ত ও অহিংস রাখিবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মামলায় আপীল করা হইয়াছে, এই অবস্থায় সর্ রিচার্ডের পুস্তিকায় উল্লিখিত মন্তব্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবে বলিয়া আবেদনকারী মনে করেন।

সর্ রিচার্ড টটেনহামের পক্ষ হইতে এডভোকেট-জেনারেল আদালতে উপস্থিত হইয়া দেখান যে, ভারত-শাসন আইনের ২৭০(১) ধারা অনুসারে ফেডারেল গবর্ন্মেণ্ট প্রতিষ্ঠার পূর্বে বড়লাটের বিনা সম্মতিতে কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনা চলে না। স্পেশাল জজ এডভোকেট-জেনারেলের আপত্তি মানিয়া লইয়াছেন। ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া অভিসন্ধিমূলক পুস্তিকা লিখিবার সময় সর্ রিচার্ড সম্ভবতঃ ভাবেন নাই যে শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে ভারতশাসন-আইনের রক্ষাকবচের অন্তরালে আত্মগোপন করিতে হইবে। এই শ্রেণীর কার্যের ফলে সরকারী তথ্যের উপর অবিশ্বাস এবং আইনের মর্যাদা রক্ষায় সরকারের আন্তরিকতা সম্বন্ধে দেশবাসীর সন্দেহ বৃদ্ধি পায়।

—

রুশ-পোলিশ বিচ্ছেদ

পোলাণ্ডের সহিত রাশিয়ার রাজনৈতিক বন্ধুত্বের অবসান ঘটিয়াছে। পোলিশ গবর্ন্মেণ্ট বর্তমানে রাজ্য-হারা, লণ্ডনে তাঁহাদের কর্মকেন্দ্র। যুদ্ধের পর পোলাণ্ড তাহার পূর্ব রাজ্য সম্পূর্ণ ফিরিয়া পাইবে কিনা এই প্রশ্ন পোলাণ্ড তুলিয়াছিল এবং রাশিয়া তাহাতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখায় নাই বরং এই মনোভাবই প্রকাশ করিয়াছে যে পোলাণ্ডের রুশ-অধ্যুষিত অঞ্চল সে ছাড়িবে না। এই ব্যাপার লইয়া বেশ কিছু দিন যাবৎ রাশিয়া ও পোলাণ্ডে মনকষাকষি চলিতেছিল। ব্রিটেন ও আমেরিকাকে সমস্ত ঘটনা জানানো হইলে তাঁহারা নীরব রহিলেন। ইতিমধ্যে জার্মেনী এক সংবাদ প্রচার করিয়া দেয় যে স্মোলেনস্ক অধিকারের পর সেখানকার এক জঙ্গলে তাহারা দশ হাজার পোলিশ অফিসারের সমাধি খুঁজিয়া পাইয়াছে এবং মৃতদেহের সহিত প্রাপ্ত কাগজপত্র তাহাদের নিকট আছে। রাশিয়ার পোলাণ্ড আক্রমণের সময় এই সব অফিসার বন্দী হয় এবং রাশিয়াই এই দশ হাজার লোককে হত্যা করে। এক বৎসরের মধ্যে শত্রু পোলাণ্ড মিত্র হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে এই সব অফিসারের মুক্তি প্রার্থনা করিলে রাশিয়া জানাইল যে উহাদিগকে মুক্তি দান করা হইয়াছে। রুশ গবর্ন্মেণ্টের এই উক্তির পরও কিন্তু একজনও অফিসার ফিরিয়া আসে নাই এবং পোলাণ্ডও এত দিন ইহা লইয়া আর উচ্চবাচ্য করে নাই।

সীমানা লইয়া মনান্তর সুরু হইবার পর জার্মেনী উহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিল এবং সত্যই হউক বা কাল্পনিকই হউক—দশ হাজার পোলিশ অফিসারের হত্যার কাহিনী প্রচার করিয়া দিল। পোলাণ্ড এবার আন্তর্জাতিক রেড-ক্রসের নিকট জার্মেনীর উক্তির সত্যাসত্য যাচাই করিবার জন্য অনুরোধ জানাইল; সঙ্গে সঙ্গে জার্মান গবর্ন্মেণ্টও উহা সমর্থন করিল। সোভিয়েট গবর্ন্মেণ্ট এবার কিন্তু ধৈর্যচ্যুত হইয়া সমস্ত ব্যাপারটার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জানাইল যে, জার্মেনীর ধাপ্পায় পড়িয়া পোলাণ্ড আন্তর্জাতিক রেড-ক্রসকে অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ করিয়া গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, জার্মেনীর চক্রান্তে ইহা ঘটিয়াছে, রাশিয়াকে অপদস্থ করিবার ইহা নিছক ষড়যন্ত্র মাত্র। হত্যার অভিযোগের অনুসন্ধানে অপর দুই পক্ষ রাজী হইলেও রাশিয়া ইহাতে কিছুতেই সম্মত হইল না, পোলাণ্ডের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক সে ত্যাগ করিল।

এই বিচ্ছেদের সংবাদ রাশিয়া ঘোষণা করিবার পর যথারীতি উহা জোড়া দেওয়ার চেষ্টা সুরু হইয়াছে বটে, কিন্তু সমগ্র ঘটনার ভিতর একটি নিগূঢ় কূটনৈতিক চালের পরিচয় ধরা পড়ে। সীমানা লইয়া বিরোধের সময় ব্রিটেন ও আমেরিকা নীরব রহিল, রুশ-পোলিশ বিচ্ছেদের পর উহারা দুঃখ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইল—ইহা অতি আশ্চর্য। ব্রিটিশ কূটনৈতিক ধুরন্ধরেরা একটু দূর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চলিয়া থাকেন। আগামী শান্তি-সম্মেলনে এই ব্যাপারটির কিরূপ ফলাফল হইবে তাহা তাঁহারা বিচার করেন নাই এরূপ হইতে পারে না। রুশ-সম্পর্কিত ব্যাপারে ব্রিটিশ ধনতান্ত্রিক মনোবৃত্তির কার্য্যকলাপ সকল ক্ষেত্রেই জটিল।

—

মুক্তির মূল্য

কম্যুনিষ্ট দল মুক্তিলাভের পর হইতে এক ভীষণ দোটানার মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। এই দল কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত "গান্ধীজীর উপবাসের পর দেশভক্তের কর্তব্য কি?" শীর্ষক পুস্তিকাটিতে এই দোটানা

মনোভাব আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। টটেনহামের পুস্তিকায় যাহা উহ্য ছিল ইহারা তাহা পূরণ করিয়াছে, নিজেদের বিরোধী দল মাত্রকেই পঞ্চমবাহিনী আখ্যায় ভূষিত করিয়াছে এবং প্রকারান্তরে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছে সমগ্র কংগ্রেস পঞ্চম বাহিনী। মুক্তির মূল্যদানের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের সহানুভূতি হারাইবার ভয় ইহাদের মনে জাগিয়াছে। তাই পুস্তিকাটির প্রত্যেক পৃষ্ঠা পরস্পরবিরোধী উক্তিতে পূর্ণ। "চাঁদিকে চন্দ টুকরে পর দেশকে বেচনেওয়ালে" বলিয়া ইহাদিগকে যাঁহারা সন্দেহ করিয়াছিলেন, এই পুস্তিকা পাঠে তাহা দৃঢ়তর হইবে।

দেশের ছাত্র ও যুবকদলকে ভারতীয় কম্যুনিষ্টরা যে-ভাবে উদ্ভট পরিচালনা করিতেছেন তাহাই সর্বাপেক্ষা অধিক আশঙ্কার বিষয়। ছাত্র-সম্মেলন আহ্বান করিয়া সেখানে পাকিস্তান-প্রস্তাব পাস করাইয়া লইয়া ইহারা আমেরী সাহেবকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উপরোক্ত পুস্তিকায় আছে ২রা মার্চের ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে :

"এই সভা সমস্ত লীগভক্ত দেশপ্রেমিককে নিঃসংশয়ে গান্ধী-মুক্তির আন্দোলনে যোগদানের জন্য আশ্বাস দিতেছে যে, হিন্দু মুসলমানের মিলিত শক্তির মধ্য দিয়া যে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে যে-কোন সীমাবদ্ধ ভূখণ্ডের অধিবাসী, কোন বিশেষ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা ও আচরণ সম্পন্ন সমস্ত জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে—তাঁহারা প্রয়োজন বোধে পৃথক্‌ ভাবেও বসবাস করিতে পারিবেন।"

সম্মেলনে প্রাপ্ত "বাণী"র মধ্যে ইহারা লীগ-নেতা সর্‌ নাজিমুদ্দীনের বাণীটিই একমাত্র উল্লেখযোগ্য মনে করিয়াছেন :—

"ছাত্র ফেডারেশনকে আমি আমার অভিনন্দন জানাইতেছি; মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পাকাপাকি আপোষের ভিত্তি; আপনারা ইহা মানিয়া লইয়াছেন—এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ।"

বাংলার কৃষক-প্রজাদল, বাংলার বাহিরের অর্হর, মোমিন, জমিয়ৎ-উল-উলেমা প্রভৃতি প্রগতিশীল মুসলমান দলের কার্যকলাপ ইহাদের চোখে পড়ে না; ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া কম্যুনিষ্টরাও অক্লান্ত ভাবেই প্রচার করিয়া চলিয়াছেন যে, লীগই ভারতবর্ষের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি!

—

মুসলমান রাজনীতি

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্নালে এক প্রবন্ধে অধ্যাপক মহম্মদ হামিদুল্লা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, "মুসলমান রাজনৈতিক চিন্তাধারা মানবসমাজে ও রাষ্ট্রে এক নূতন চেতনা আনিয়াছে এবং কার্যক্ষেত্রেও নব প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে। জাতিগত, ভাষাগত এবং দেশগত ঐক্যের প্রাচীন ধারণা ইসলাম সকলকে ভুলিতে শিখাইয়াছে। উহার পরিবর্তে ইসলাম চাহিয়াছে সমাজ-ব্যবস্থায় জাতিগত বা দেশগত অনৈক্য দূর করিয়া ইসলাম-বিশ্বাসীদের বিশ্বভ্রাতৃত্ব গঠন করিতে।" কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ যাহারা করিতে চাহিবে না—এই "বিশ্বভ্রাতৃমণ্ডলী"তে সেই কাফেরদের স্থান হইবে কি না, অধ্যাপক হামিদুল্লা সে সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। মানবজীবন সম্বন্ধে ইসলামের ধারণা বিচার করিতে গিয়াও তিনি একটি অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ইসলামের পূর্বে মানুষ হয় নীতিজ্ঞানবিবর্জিত পার্থিব জড়জীবন যাপন করিত, নতুবা পৃথিবীর সব-কিছুই মিথ্যা মায়া বলিয়া সংসার ত্যাগের উপদেশ দিত। ইসলাম নাকি সর্বপ্রথম এই দুই পরস্পরবিরোধী মতবাদের সমন্বয় সাধন করিয়াছে।

পাকিস্তানের মোহ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকে পর্যন্ত এই ভাবে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে, ইহা দেখিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই দুঃখিত হইবেন। অধ্যাপক হামিদুল্লা ইসলামকে বড় করিবার আগ্রহে দুইটি ভ্রান্ত ধারণাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইসলামের পতাকাতলে পৃথিবীর সকল মানুষকে আনিয়া 'বিশ্বভ্রাতৃমণ্ডলী' গঠনের ধারণা বিশ্বজয়েরই নামান্তর—স্ব-স্ব ধর্ম, জাতি ও দেশগত অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠ সর্বদেশের লোককে সমান অধিকার দিয়া বিশ্বভ্রাতৃমণ্ডলী গঠনের চেষ্টা হইতে উহা সম্পূর্ণ পৃথক্‌। ইসলাম প্রথমটি করিতে চাহিয়াছে, দ্বিতীয়টি করিয়াছে বলিয়া ইতিহাসে লেখে না। মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বস্তুতন্ত্রবাদ ও মায়াবাদের যে অপূর্ব সমন্বয় হিন্দু চতুরাশ্রমে এবং জনক ঋষির শিক্ষায় করা হইয়াছে—ইসলাম তাহার উর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। ইসলামের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতীয় ঋষিগণ নীতিজ্ঞানের ভিত্তিতে মানবের জীবনযাত্রার প্রতিটি ধাপ পর্যন্ত গঠন করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

প্রবন্ধটি রচনার কারণ সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন, "দিন কয়েক পূর্বে আমি 'অধ্যাপক সুব্বারাও পুরস্কারে'র জন্য প্রাপ্ত রচনাগুলি পরীক্ষা করিতেছিলাম। রচনার বিষয় 'হজরত মহম্মদের জীবনী কেন অধ্যয়ন করা উচিত' এবং কেবলমাত্র অমুসলমান ছাত্রেরা এই প্রতিযোগিতায়

যোগদান করিতে পারে। একটি ছাত্রের মন্তব্য দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম। ছাত্রটি লিখিয়াছে: মুসলমানেরাও কি ভারতীয় জনসাধারণের অবিচ্ছেদ্য অংশ নহে এবং দ্বাদশ শতাব্দী পূর্বে মুসলমানেরা যেদিন এদেশে আসিয়াছিল সেদিন তাহাদের সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতাম এত দিন একত্রে বসবাস করিবার পর আজও তদপেক্ষা অধিক কিছু আমরা জানি না—ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে?" কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখের বিষয় মুসলমান অধ্যাপকেরা পর্যন্ত আজ ইসলামের নীতিকে বড় করিবার আগ্রহে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন না। এই প্রবন্ধেই আন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধে অধ্যাপক হামিদুল্লা জোর গলায় বলিতেছেন, "ইসলামের পূর্বে পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক আইন বলিয়া কোন কিছু ছিল না। পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করিয়াই আমি এই কথা বলিতেছি।" তাঁহার মতে "কৌটিল্য ও মনু সমর ও সন্ধির যেসব নীতি নির্দেশ করিয়াছেন তাহা একমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য। ছোট্ট গ্রীক উপদ্বীপের বাহিরে যে-সব দ্বিপদ জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের প্রতি ব্যবহারের একটা তুচ্ছ নির্দেশ মাত্র দেওয়া হইয়াছে গ্রীক আন্তর্জাতিক আইনে। (The Greek International Law provided only a fickle discretion regarding all those two-legged creatures who happened to have been born outside the tiny Greek Peninsula.) রোমান আইনের সৃষ্টি হইয়াছিল রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের জন্য। ১৮৫৬ সালে তুরস্ককে সভ্য দেশের সহিত পাংক্তেয় করিবার পূর্বে ইউরোপের আন্তর্জাতিক আইন অ-খ্রীষ্টান জাতিসমূহের অধিকার স্বীকার করে নাই। জাপান প্রভৃতি অন্যান্য অ-খ্রীষ্টান এবং প্রাচ্য জাতি ইহারও পরে ঐ অধিকার লাভ করিয়াছে। একমাত্র মুসলমান আন্তর্জাতিক আইনই সকল রাষ্ট্রের সমান অধিকার ও দায়িত্ব স্বীকার করে।"

—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র-বন্দনা

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্বগ্রাম খুলনা জেলার রাড়ুলীতে পদার্পণ করিলে গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষে সেখানে একটি সভার অনুষ্ঠান হয় এবং ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কলিকাতা হইতে গিয়া উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ মেঘনাদ সাহা। অনুষ্ঠানের নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ "যুগান্তরে" প্রকাশিত হইয়াছে:

উপস্থিত বক্তাগণ বারম্বার এই কথাই বলিয়াছেন যে, খাঁটি মানুষ গড়িয়া তোলাই আচার্য্যদেবের কামনা ছিল। খাঁটি মানুষে যিনি আপনাকে পরিণত করিবেন আচার্য্যদেবের যথার্থ শিষ্য হইবেন তিনিই। ডাঃ সাহা আচার্য্যদেবের "জীবনী" হইতে বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দেন যে, দেশবাসীর সেবাই আচার্য্যদেবের সারা জীবনের সাধনা।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র উত্তরে বলেন, আজ জীবনের সন্ধ্যার উপকূলে আসিয়া হঠাৎ পিছন ফিরে তাকাবার ইচ্ছা হ'ল, সেই কোন্ সুদূরে ফেলে-আসা শৈশবের সোনার দিনগুলির কথা আজ আমার একান্ত নিভৃত নির্জ্জন চিন্তার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে উঁকি দিয়ে আমাকে চকিত আহ্বানে জানিয়ে দিয়ে যায় ঐ দূর নীলিমার অস্ফুট বারতা। আজ আমি জীবনে মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়াছি, পৃথিবীর বন্ধন ও মমতা, হাসি ও গান সব-কিছু আমার কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে। আমার সুদীর্ঘ জীবনে এইটুকু বুঝেছি যে, আমি এই ধরণীরে ভালবাসিয়াছি—ভালবাসিয়াছি আমার দেশ ও জাতিকে, ভালবাসিয়াছি আমার প্রিয় জন্মভূমিকে। তোমরা হয়ত জান কিসের মায়ায় প্রতি বৎসর আমাকে এই বঙ্গের নিম্নভূমির জলজঙ্গলে টানিয়া আনিয়াছে এবং ঘাটে ঘাটে তরী বাঁধিয়া বর্ষা-বসন্তের দিনমান কাটাইয়াছি, তোমাদের সুখ-দুঃখের সহিত আমি সুদীর্ঘ দিন জড়িত আছি, তোমাদের ব্যথা ও বেদনা আমার বিগত কর্ম-বহুল জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অশান্তি আনিয়াছে, তোমাদের উৎসব ও আনন্দ আমাকে আশান্বিত করিয়াছে। জানি এই বন্ধন এক দিন ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং সেদিন আর বেশী সুদূরে নয়।

—

রবীন্দ্রনাথের দুইখানি নূতন বই

কবিগুরুর ৮৩তম জন্মদিবসের প্রাক্কালে বিশ্বভারতী কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের দুইখানি নূতন বই "আত্মপরিচয়" এবং "সাহিত্যের স্বরূপ" প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমটিতে কবিগুরু কয়েকটি প্রবন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত ও কবিজীবনের কথা লিখিয়াছেন। প্রথম প্রবন্ধটির তারিখ ১৯০৪ সাল এবং সর্বশেষ প্রবন্ধটি লেখা তাঁহার অশীতি বৎসর বয়সে। ১৯১০ সালে পি. এন. নিয়োগীকে লেখা পত্রখানি কবির স্বাক্ষরের প্রতিলিপি-সমেত "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হয়; "আত্মপরিচয়ে"র পরিশিষ্টে উহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ৫ নং প্রবন্ধটি তাঁহার গ্রন্থাবলীর ভূমিকারূপে পূর্বে ছাপা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আর কোন প্রবন্ধ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। বইখানিতে কবির একটি মূল্যবান লেখা বাদ পড়িয়াছে; সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে 'আত্মপরিচয়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ তিনি পাঠ করিয়াছিলেন এবং ১৯১২ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। "আত্মপরিচয়ে"র দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের পূর্বে এরূপ আরও রচনার সন্ধান মিলিতে পারে।

—

শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়ের অবসর গ্রহণ

পঁচিশ বৎসরের অধিক কাল দেশ ও পঞ্জাবের সেবা করিয়া লাহোরের 'ট্রিবিউন'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় শারীরিক অসুস্থতার দরুণ অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। 'ট্রিবিউনে'র সম্পাদকীয় কলমে একটি স্বাক্ষরিত প্রবন্ধে তিনি পত্রিকার ট্রাষ্টী, তাঁহার সহকর্মী ও সহযোগী এবং পঞ্জাব প্রদেশবাসীদের প্রতি বিদায়-অভিবাদন জানাইয়াছেন। এই প্রবন্ধে পঞ্জাববাসীদের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি যে সেই প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের আতিথেয়তা ও বন্ধুত্ব তাঁহাকে তাহা কখনও মনে করিতে দেয় নাই। যুক্তি ও সহানুভূতিপূর্ণ সম্পাদকীয় মন্তব্যের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়ের অবসর গ্রহণে দেশে একজন শক্তিশালী সম্পাদকের অভাব ঘটিল।

—

এক শত কোটি টাকার খাদ্যশস্য ক্রয়

ভারত-সরকারের খাদ্য-বিভাগের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী মেজর-জেনারেল উড দিল্লী হইতে এক বেতার-বক্তৃতায় আগামী এক বৎসরে ভারত-সরকার কর্তৃক ১০০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য ক্রয়ের কথা ঘোষণা করেন। বর্তমান খাদ্য-সমস্যার পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি সাতটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রথমতঃ, প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট ভাবে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, শস্যাদি যাহাতে মজুতকারী বা গোপন ব্যবসায়ীদের নিকটে না যাইতে পারে এবং যাহাতে প্রকৃত ক্রেতারাই তাহা ক্রয় করিতে পারে, তজ্জন্য সমস্ত শস্য সরকারের হেপাজতে থাকাই বিধেয় হইবে। সরকার চাষীদের বর্তমানে ও যুদ্ধের পর এক বৎসর পর্যন্ত শস্যাদির জন্য উচিত মূল্য দিবার ব্যবস্থা করিবেন। তৃতীয়তঃ, আগামী বার মাসে কোন্ প্রদেশে কত শস্য সরবরাহ করা হইবে তাহার একটা সুনির্দিষ্ট হিসাব তৈরি করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, প্রত্যেক স্থানে শস্য ক্রয় ও শস্য আনা-নেওয়া সম্পর্কে একটি ব্যাপক ব্যবস্থা করিতে হইবে। পঞ্চমতঃ, তিনি বলেন যে, ব্যবস্থায় যত দূর সম্ভব দেশের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলিরই সাহায্য লওয়া হইবে। ষষ্ঠতঃ, তিনি জনসাধারণকে সহযোগিতা করিতে আহ্বান করেন। সর্বশেষে তিনি বলেন যে, সরকার মাত্র এক দেশ হইতে অন্য দেশে শস্য চালান দিবার উদ্দেশ্যেই যে শস্য ক্রয় করিতেছেন তাহা নয়। দেশের সর্বত্র শস্যের মূল্য ও শস্যের সরবরাহের মধ্যে সমতা রক্ষার দিক হইতে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াও সরকার এভাবে শস্য ক্রয় করিতেছেন।

মেজর-জেনারেল উডের বক্তৃতায় ভারত-সরকারের যে সঙ্কল্প ব্যক্ত হইয়াছে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল ইতিমধ্যেই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি দেখা দিয়াছে ; জনসাধারণের ইহাতে বিন্দুমাত্র সুবিধা হয় নাই, লাভ হইয়াছে শুধু অতিলোভী ব্যবসায়ী ও এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় যেখানে ব্যক্তিগত লাভই সর্বোচ্চ লক্ষ্য, সেখানে গবর্মেণ্ট দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য কুক্ষিগত করিতে চাহিলে তাহার ফল যে ভাল হইতে পারে না—ইহার বহু দৃষ্টান্ত এই কয় বৎসরে পাওয়া গিয়াছে। গবর্মেণ্ট নিজেও মন স্থির করিয়া আজ পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিতে পারেন নাই। বছরে বছরে, মাসে মাসে তাঁহাদের নিয়মকানুন বদলাইয়াছে এবং দরিদ্র দেশের নিরন্ন জনসাধারণ তাহার মূল্য দিতে বাধ্য হইয়াছে।

মেজর-জেনারেল উডের বক্তৃতার পর বাংলা দেশে চাউলের বাজার ক্রমেই চড়িতেছে। ক্রয় কার্যটা যে এখানেই বেশী পরিমাণে চলিতেছে এবং ভবিষ্যতেও চলিতে থাকিবে ইহা তাহারই নিদর্শন। নয়া দিল্লী হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের খাদ্যশস্যের বাজার-দর প্রচার করিবার একটা নিয়ম আছে। ৩রা মের উক্ত সংবাদে বিভিন্ন প্রদেশের চাউলের মূল্য নিম্নোক্ত রূপ বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে :

মণকরা পাইকারী দর—চাঁদপুর—৩২৶০ বেরিলী (যুক্তপ্রদেশ) ১২৷৷৵১৫, রায়পুর (মধ্য প্রদেশ) ৮৷৵০, বৈজওয়াদা (মাদ্রাজ) ৭৷৷৶১ পাই ; কটক ৬৷০ ; লারকানা (সিন্ধু) ৬৷০।

মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা সীমান্তে খালের এক পারে দর ৬৷৷০ টাকা, অপর পারে তাহার পাঁচ গুণ। শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলাতেও নদীর এপার-ওপারে এই অবস্থা। ইহা দ্বারা এই প্রমাণই পাওয়া যায় যে, ভারত-সরকার খাদ্য-সমস্যাকে নিখিল-ভারতীয় সমস্যা হিসাবে দেখিতে পারেন নাই ; বর্তমান দ্রুত যানবাহনের যুগে বিভিন্ন প্রদেশে মূল্যের এত বেশী তারতম্য গবর্মেণ্টের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে অক্ষমতারই পরিচয় বহন করে।

খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে হক সাহেবের বক্তৃতা

মৌলবী ফজলুল হক কলিকাতায় দেশপ্রিয় পার্কে এক বক্তৃতায় বাংলা দেশের খাদ্যসমস্যা কেমন করিয়া এত তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে তাহার কারণ বর্ণনা করেন। ইহার পূর্বে তিনি বরিশাল গিয়া সেখানকার অবস্থাও দেখিয়া আসিয়াছিলেন। বক্তৃতায় হক সাহেব বলেন, "নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি সম্পর্কে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহা পূর্ববর্তী সরকারের দোষেই হইয়াছে বলিয়া একটা ধারণার সঞ্চার হইয়াছে। সুতরাং বলা হইতেছে যে, বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতিবিধান করিতে আহ্বান করার পূর্বে বর্ত্তমান সরকারকে পূর্ববর্তী সরকারের ভুলগুলি সংশোধন করিবার জন্য অন্ততঃপক্ষে এক বৎসর সময় দিতে হইবে।

"এই ভুয়া ধারণা দূর করিবার সময় আসিয়াছে। প্রথমতঃ পূর্বে লক্ষণ দেখা গেলেও খাদ্যাবস্থায় সত্যকার সঙ্কট দেখা দেয় গত তিন মাস হইল। দ্বিতীয়তঃ, এই অবস্থার উদ্ভব বন্ধ করিবার জন্য আমরা দৃঢ় চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের পথে বাধা ছিল প্রচুর এবং আমাদিগকে কায়েমী স্বার্থের কঠিন বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। জনসাধারণের সমক্ষে সমস্ত বিষয় উপস্থাপিত করা আমি কর্তব্য বলিয়া মনে করি। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসের এক সন্ধ্যায় সরকারী কার্য্যে দিল্লী যাইবার প্রাক্কালে গবর্ণর আমাকে ভারত-সরকারের প্রস্তাবিত 'বঞ্চনা-নীতি'র কথা বলেন। এই নীতি প্রয়োগের ফলে যে গুরুতর অবস্থা হইবে তাহার বিষয় আমি গবর্ণরকে জানাই। দিল্লী হইতে ফিরিবার পর আমাকে জানান হয় যে, চাউল অপসারণ নীতি অনুসারে কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। জয়েণ্ট সেক্রেটরীর নিকট খোঁজ লইয়া জানিতে পারি যে, ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়া গিয়াছে। আমাকে আরও জানান হয় যে, গবর্ণরের আদেশক্রমে কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমাকে আরও বলা হয় যে, জয়েণ্ট সেক্রেটরীকে বাখরগঞ্জ, খুলনা ও মেদিনীপুর হইতে বাড়তি চাউল সরাইয়া ফেলিতে বলা হইয়াছে। গবর্ণর তাঁহাকে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলায় তিনি মির্জা আলি আকবর নামে এক ব্যক্তিকে ঠিক করেন। এই মির্জা আলি আকবর কে? এই ব্যক্তিকে ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। দলিলপত্রাদি লওয়ার পর্য্যন্ত সময় তাঁহার হয় নাই। আমি এই সম্পর্কে সরকারের সলিসিটর ও এ্যাডভোকেট-জেনারেলের সঙ্গে পরামর্শ করি। তাঁহারা জয়েণ্ট সেক্রেটরীর কাজের নিন্দা করেন। তখন সাত-আট জন এজেণ্টের মধ্যে কাজটি ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ইঁহাদের অধিকাংশই খুব পরিচিত প্রতিষ্ঠান। ইঁহাদের মধ্যে মেসার্স ইস্পাহানি, দত্ত ভট্টাচার্য্য, মির্জ্জা আকবর, হাকিম কাসিম দাদা ও আদম হাজি পীর মহম্মদের প্রতিষ্ঠান ছিল। মফস্বলে ইঁহাদের কাজ সুরু হওয়ায়, জনগণের দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়। পল্লী অঞ্চলে গিয়া ইঁহারা জনগণকে ধান ও চাউল বিক্রয় করিতে কার্য্যতঃ বাধ্য করেন। আমাকে বলা হয় যে, কোন কোন স্থানে তিন টাকা মণ দরে ধান কিনিয়া কলিকাতায় চৌদ্দ টাকা মণ দরে বিক্রয় করা হয়। চাউল লইয়াও অনুরূপ ফাটকাবাজি চলে। মফস্বলের অবস্থা সম্পর্কে যাঁহাদের কিছু জ্ঞানও আছে তাঁহারাই জানেন যে এজেণ্টের মারফৎ ক্রয়-ব্যবস্থার ফলে জনগণের বৈষয়িক জীবন কার্যতঃ বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। ইহার পর আসে নৌকা-বঞ্চনা-নীতি। আমাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বাংলা হইতে চাউল রপ্তানী করা হয়। আজ আমাদের সম্মুখে যে সংকট দেখা দিয়াছে তাহা যে অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের কাজের ফলেই হইয়াছে তাহা বুঝা মোটেই কঠিন নহে। এই দপ্তরের কাজে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা চলিবে না বলিয়া গবর্ণর জানাইয়া দেন। এই দপ্তরের কার্য্যকলাপের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা বা উহাতে হস্তক্ষেপ করা হইলে তাহা গবর্ণরের নিকট রিপোর্ট করিবার জন্য দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, যাহা ঘটিয়াছে তাহার জন্য আমরা এতটুকুও দায়ী নহি। সমস্ত ব্যাপার আলোচনা করিলে বর্তমান অবস্থাটা যে আমাদের সৃষ্ট নহে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। সম্প্রতি আমি বাখরগঞ্জে সফর করিতে গিয়াছিলাম। পটুয়াখালিতে চাউল অবিশ্বাস্য রকম উচ্চ দরে বিক্রয় হইতেছে। গোটা বাংলার দশাও সাধারণভাবে পটুয়াখালির দশার অনুরূপ। মিঃ সুরাবর্দী সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, বর্তমান অবস্থার দোহাই পাড়িয়া আমি রাজনৈতিক সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছি। আমরা বক্তৃতা করি বা না-করি মিঃ সুরাবর্দ্দী মন্ত্রী থাকুন বা না-থাকুন, জনগণের ক্লেশের শেষ ত হইতেছে না! গবর্ণর ও তাঁহার মন্ত্রিসভাকে জানানো আমি কর্তব্য বলিয়া মনে করি যে, বাংলার হাজার হাজার নরনারীকে দারুণ অন্নকষ্টে ও অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়া কালহরণ

করিতে হইতেছে। সরকারের এজেন্টরা মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বেও অতি উচ্চ মূল্যে ঝালকাটি ও নলচিঠিতে চাউল কিনিয়াছেন।

"সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য সময় চাহিবার কোন অধিকার মন্ত্রিসভার নাই। যে সমস্ত শক্তির ক্রিয়ায় এই অবস্থা হইয়াছে তাহা তাঁহারা বেশ ভাল করিয়াই জানিতেন। এই সব শক্তির সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা কর্তব্য ছিল।"

ইহার পূর্বে ইণ্টালী চিল্‌ড্রন পার্কের সভায় হক সাহেব বলিয়াছিলেন যে, প্রধান মন্ত্রী হিসাবে তিনি দেশের খাদ্যের পরিমাণ, আমদানীর সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক ভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিরোধিতায় তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি সিভিল সাপ্লাই ডিরেক্টোরেটে একটি সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ খোলা হইয়াছে।

সরকারী তথ্য অনুসারে বাংলায় যে ফসল মজুত থাকিবার কথা, আগামী শ্রাবণ মাসের পর তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে কি না ডিরেক্টোরেটের সংখ্যাতত্ত্ববিদরা হিসাব করিয়া বলিতে পারেন কি? জাপানীদের আগমন-আশঙ্কায় স্যর জন হার্বার্ট কত চাউল সরাইয়াছিলেন এবং সে চাউল কোথায় আছে তাহার কোন হিসাব পাওয়া গিয়াছে কি? টাকাটার হিসাব পাওয়া যায় নাই এবং উহার উদ্ধারের উপায়ও নাই, হক সাহেবই ইহা জানাইয়াছেন। চাউলের বেলাতেও কি তাহাই ঘটিয়াছে?

মৌলবী ফজলুল হকের পদত্যাগের কারণ

নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের পর কলিকাতায় যে কয়েকটি বিরাট জনসভা হইয়াছে, মৌলবী ফজলুল হক তাহাতে তাঁহার পদত্যাগের পূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন। বিবরণটি এই—

২৮শে মার্চ গবর্ণরের আহ্বান পাইয়া তিনি লাট-প্রাসাদে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় উপস্থিত হন। গবর্ণরের সহিত সাক্ষাতের সময় সেখানে গবর্ণরের সেক্রেটরী মিঃ উইলিয়াম্‌স ভিন্ন আর কেহই ছিলেন না। কয়েকটি মামুলী কথার পর গবর্ণর তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বলেন। হক সাহেব ইহাতে বিস্মিত হন। ব্যবস্থা-পরিষদে তাঁহার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও কেন তিনি পদত্যাগ করিবেন এই প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণর বলেন যে, সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের জন্য পদত্যাগ করিতে ইচ্ছুক বলিয়া হক সাহেব ব্যবস্থা-পরিষদে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহা পদত্যাগেরই নামান্তর।

হক সাহেব তখন বলেন, তাঁহার ঐ উক্তির মর্ম এই ছিল যে, গবর্ণর সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্ভব বলিয়া যখন বিবেচনা করিবেন তখন তিনি পদত্যাগ করিবেন। বর্তমানে এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই, কাজেই পদত্যাগের কোন প্রশ্নই এখন উঠে না। গবর্ণর উত্তর দেন যে, হক সাহেব পদত্যাগ না করিলে তিনি অন্যান্য দলের নেতাদের ডাকিতে পারেন না, কাজেই তাঁহার পদত্যাগ আবশ্যক। এই সঙ্গে গবর্ণর প্রতিশ্রুতি দেন যে, অত্যন্ত প্রয়োজন না হইলে পদত্যাগ-পত্রটি তিনি ব্যবহার করিবেন না এবং শুধু অপর দলের নেতাদের দেখাইবার জন্যই ইহা তাঁহার নিকট গচ্ছিত থাকিবে। গবর্ণর তাঁহাকে ব্যাপারটি গোপন রাখিতে অনুরোধ করেন এবং নিজেও ইহা গোপন রাখিবার প্রতিশ্রুতি দেন। অতঃপর হক সাহেব পদত্যাগে সম্মত হন।

তৎক্ষণাৎ গবর্ণর হক সাহেবের সম্মুখে তাঁহার পদত্যাগ-পত্রের খসড়া বাহির করিয়া ধরেন। পত্রখানি পূর্ব হইতেই লিখিয়া টাইপ করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহার অনুরোধে উইলিয়াম্‌স সাহেব তাঁহাকে চিঠিখানির একটি নকল দেন।

ঐ দিনই রাত্রি দশ ঘটিকায় হক সাহেব লাটপ্রাসাদ হইতে এক পত্র পাইয়া জানিলেন যে তাঁহার পদত্যাগপত্র গৃহীত হইয়াছে। চিঠিখানি টাইপ করা এবং উহার নীচে গবর্ণরের স্বহস্তে লেখা দুইটি লাইন ছিল এই মর্মে যে, হক সাহেবের ইচ্ছাক্রমে পর-দিন রাত্রি ৮ ঘটিকার পূর্ব্বে পদত্যাগের কথা প্রকাশ করা হইবে না। হক সাহেব বলেন যে পদত্যাগপত্র স্বাক্ষরের সময় উহা গ্রহণ করা বা প্রকাশ করা সম্বন্ধে কোন কথাই হয় নাই। তৎক্ষণাৎ তিনি ব্যাপারটি প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণরের নিকট পত্র প্রেরণ করেন।

হক সাহেব, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ঢাকার নবাব সম্প্রতি যে-সব বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের আরম্ভ হইতেই গবর্ণর ও ইউরোপীয় দলের সহিত ইঁহাদের বিরোধ চলিতেছিল। বাংলার অন্নবস্ত্র-সমস্যার কোন সমাধান ইঁহারা করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু মাঝে মাঝে চাউল রপ্তানী প্রভৃতি কোন কোন কার্য্যে ইঁহারা বাধা দিয়াছেন। মেদিনীপুরের ঘটনা সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ এবং তদন্তের প্রতিশ্রুতি

দিয়া হক সাহেব গবর্ণর, ইউরোপীয় দল এবং সিভিলিয়ান্ কর্মচারীদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। হাজরা পার্কের সভায় হক সাহেব নিজেও ইহা বলিয়াছেন।

এই অবস্থায় মনের মত নির্বিরোধী লোক লইয়া মন্ত্রি-মণ্ডল গঠনের প্রাণপণ চেষ্টা চলিবে ইহাই স্বাভাবিক। পদত্যাগপত্র স্বাক্ষরের ষড়যন্ত্রে পা দিয়া হক সাহেব উহা সফল করিয়া দিয়াছেন।

রাজনৈতিক শিষ্টাচার ব্যতীত নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি চলিতে পারে না। বাংলার গবর্ণর এই শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। বাংলায় নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির যে আবহাওয়া গড়িয়া উঠিতেছিল গবর্ণরের এই কার্য্যের দ্বারা তাহা বাধাপ্রাপ্ত হইবে। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ বা ব্যাহত হইলেই অনিয়ম বা মাৎস্যন্যায়ের পথ প্রশস্ত হয়—রাজনীতির ইহা একটি মূলসূত্র।

—

বাংলায় নূতন মন্ত্রিমণ্ডল

বাংলার গবর্ণর ও ইউরোপীয় দলের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় তিন সপ্তাহ প্রাণান্ত চেষ্টার পর খাজা স্যর নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তের জন মন্ত্রী ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছেন। ইউরোপীয় দলকে বাদ দিয়া ইহারা সংখ্যাধিক্য অর্জন করিতে সমর্থ হন নাই। দলের বনিয়াদ পোক্ত করিবার জন্য গবর্ণর ইহাদিগকে সময় দিয়াছেন, নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের পর তিনি ব্যবস্থা-পরিষদ আহ্বান করেন নাই। আট জন মন্ত্রী লইয়া হক সাহেব পরিষদে সংখ্যাধিক্য বজায় রাখিয়াছেন এবং পর পর তিন বার অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল করিয়াছেন, কিন্তু নবগঠিত মন্ত্রিমণ্ডল ১৩ জন মন্ত্রী লইয়াও পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত হইবার সাহস পাইতেছেন না ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঐ সঙ্গে ২৬ জন পার্লামেণ্টরী সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়া দল ঠিক রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়াও প্রকাশ্যে অভিযোগ উঠিয়াছে এবং তাহার কোন প্রতিবাদ হয় নাই। প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের অব্যবহিত পরেই গবর্ণর হক সাহেবকে পরিষদের সম্মুখীন হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে গবর্ণরের পক্ষপাতিত্ব সুস্পষ্ট।

সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের ধুয়া তুলিয়া গবর্ণর হক সাহেবকে পদত্যাগে বাধ্য করিয়াছেন, কিন্তু যে মন্ত্রিমণ্ডল তিনি গঠন করিয়াছেন তাহা পূর্বাপেক্ষাও অনেক কম প্রতিনিধিমূলক। পরিষদে পঞ্চাশ জনেরও অধিক বর্ণহিন্দু সদস্যের মধ্যে মাত্র জন-পাঁচেককে মন্ত্রিমণ্ডলের সমর্থনের জন্য পাওয়া গিয়াছে, অপর দুই-তিন জন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। মুসলমান এবং তপশীলীদের একটা বড় অংশ বিরোধী দলে রহিয়া গেলেন। ইউরোপীয় স্বার্থের প্রয়োজনের ও সিভিল সার্ভিসের সুবিধার জন্য বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা আবশ্যক হইয়াছে, ইহাকে জীয়াইয়া রাখিবার জন্যও তাই সর্ববিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। ভবিষ্যতেও হয়ত হইবে। বর্ত্তমান যুগের রাজনীতিতে প্রতিশ্রুতি অপেক্ষা প্রয়োজনের স্থান অনেক উর্দ্ধে।

মন্ত্রিমণ্ডলের অদল-বদলে বাঙালীর বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। অন্নবস্ত্র-সমস্যা পূর্বের মন্ত্রীরাও সমাধান করিতে পারেন নাই, ইহারাও যে পারিবেন তাহার সম্ভাবনাও নাই। চাবিকাঠি যেখানে গবর্ণর ও সিভিল সার্ভিসের হাতে, সর্বদলীয় মন্ত্রিমণ্ডলী সেখানে বাঙালীকে অন্নবস্ত্র জোগাইতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস করি না।

—

স্যর নাজিমুদ্দীনের কর্ম্মসূচী

প্রত্যেক মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের পূর্বে ভাবী প্রধান মন্ত্রী একটা কর্মসূচী প্রচার করিয়া থাকেন। স্যর নাজিমুদ্দীনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই, আপাতসুদৃশ্য একটা কর্মসূচী তিনিও দিয়াছেন। স্বাধীন দেশের মন্ত্রিমণ্ডল ঐ সূচী অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য হন, এ দেশে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের সঙ্গে সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী ও দেশবাসী উভয়েরই মন হইতে উহা মুছিয়া যায়। কর্মসূচী একটা দিতে হয় বলিয়া এখানে উহা দেওয়া হয়। স্যর নাজিমুদ্দীনের সূচীটি এই :

(ক) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, (খ) সভা আহ্বানের স্বাধীনতা, (গ) ধরপাকড়, আটক রাখা এবং রাজনৈতিক অপরাধসমূহের বিচারকার্য্য, (ঘ) রাজনৈতিক বন্দীগণকে মুক্তিদান অথবা তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে এবং নিয়মিত ভাবে নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুন্যালের দ্বারা রাজনৈতিক বন্দীদের বিষয় পরীক্ষা করাইবার ব্যবস্থা (ঙ) খাদ্য, পরিধেয় প্রভৃতি ব্যাপারে আটক বন্দীদের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা (চ) উদারতার সহিত সিকিউরিটি বন্দীদের জন্য পারিবারিক ভাতার ব্যবস্থা করা, (ছ) ভারত-রক্ষণ নিয়মাবলী এবং অর্ডিন্যান্সসমূহ প্রয়োগের ব্যবস্থা, (জ) পাইকারী জরিমানা।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান অথবা উহা রক্ষা করিবার ক্ষমতা মন্ত্রিমণ্ডল অপেক্ষা সিভিলিয়ান প্রেস অফিসারের হাতে যে অনেক বেশী রহিয়াছে, স্যর নাজিমুদ্দীন ইহা

জানেন না ইহা অবিশ্বাস্য। ধরপাকড় এবং আটক রাখিবার নীতির উপর তাঁহাদের কোন হাতই যে নাই, ইহা তাঁহারাও জানেন, দেশবাসীও বুঝে। রাজনৈতিক অপরাধের বিচারকার্য্য যে বড়লাটের অর্ডিনান্সে চলে, ইহার উপর যে মন্ত্রীদের হাত নাই, সামান্য কিছু দিন আগে ব্যবস্থা-পরিষদে বিশেষ প্রস্তাব আনিয়া স্যর নাজিমুদ্দীন ও মিঃ সুরাবর্দী তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভারতরক্ষা-বিধান এবং বড়লাটের অর্ডিনান্স প্রয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্রীরা যে কত অসহায়, বহু বার তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

রাজনৈতিক বন্দীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দানের প্রতিশ্রুতিও ইহাতে আছে। অথচ কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, অল্প দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্সি জেলে এমন ব্যাপার ঘটিয়াছে বাংলা-সরকার যাহা প্রকাশ হইতে দেন নাই, এবং বন্দীদের অভিযোগের এফিডেভিট পর্য্যন্ত হাইকোর্টের নথিভুক্ত হইতে দিতে চাহেন নাই। বিচারপতি সেনের দৃঢ়তা ও ন্যায়পরায়ণতার ফলে সরকারের এই চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হইয়াছে।

চিঠি সেন্সর

বাংলা দেশে, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে চিঠিপত্র পরীক্ষার খুব কড়াকড়ি আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় কর্ম্মচারীদের দ্বারা এই পরীক্ষাকার্য্য করানো হইতেছে। ব্যক্তিগত সংবাদ আদান-প্রদানের গোপনতা ইহার দ্বারা বাতিল ত হইয়াছেই, অধিকন্তু স্থানীয় লোকদের দ্বারা পরীক্ষাকার্য্য করানোতে নানাবিধ অসুবিধারও সৃষ্টি হইতেছে। মামলা-মোকদ্দমা অথবা অপর ব্যক্তিগত ব্যাপার ইহার ফলে বিরুদ্ধ পক্ষের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবার গুরুতর সম্ভাবনা রহিয়াছে। এরূপ কয়েকটি ঘটনা জানাও গিয়াছে। চিঠিপত্র পরীক্ষা গবর্মেণ্ট অপরিহার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিলে তাঁহারা অন্ততঃ দূরবর্ত্তী জেলা হইতে কর্ম্মচারী আনিয়া তাহাদের দ্বারা উহা করাইতে পারেন। নোয়াখালির লোক দিয়া নোয়াখালির চিঠি পরীক্ষা করাইলে ভিতরকার অত্যাবশ্যক গোপন কথাও প্রকাশ হইয়া পড়িবার যে সম্ভাবনা থাকিবে, মেদিনীপুর বা বর্দ্ধমান হইতে কর্ম্মচারী আনিলে উহা ততটা থাকিবে না।

শ্রীপরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"কংগ্রেস-লীগ ঐক্য"

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য বর্ত্তমানে কম্যুনিষ্ট পার্টির আগ্রহ সর্বাপেক্ষা অধিক। ইঁহারা কিন্তু পত্রিকায়, প্রচারপত্রে অথবা শোভাযাত্রার বুলিতে ভুলিয়াও কখনো 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্য' কথাটি ব্যবহার করেন না—বলেন কংগ্রেস-লীগ ঐক্য। কংগ্রেস হিন্দুদের এবং মুসলিম লীগ মুসলমানদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান —ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের এই ধুয়ারই প্রতিধ্বনি তাঁহারা 'কংগ্রেস-লীগ ঐক্য' বুলিটির ভিতর দিয়া অতি সূক্ষ্মভাবে করিয়া চলিয়াছেন। ইহার ভিতর কোন রহস্য আছে কি? কম্যুনিষ্ট নায়ক মিঃ পি. সি. যোশীর সহিত সর্ রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েলের কোন সাক্ষাৎকার হইয়াছে কি না, এবং এই সাক্ষাতের পর ম্যাক্সওয়েল সাহেবের পরামর্শে 'হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের' পরিবর্তে 'কংগ্রেস-লীগ ঐক্য' বুলি গৃহীত হইয়াছে কি না—কম্যুনিষ্ট দল তাহা জানাইলে ভাল হইত।

খাদ্যসচিবের বিবৃতি

নবগঠিত মন্ত্রিমণ্ডলের খাদ্যসচিব মিঃ সুরাবর্দী কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পর হইতেই একটির পর একটি বিবৃতি দিয়া জানাইতেছেন যে, "১৯৪১-৪২ সালের উদ্বৃত্ত শস্য হইতে এবং মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় যাহাতে খাদ্য-শস্যের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার হয় তাহার জন্য এবং ভাতের বদলে অন্যান্য খাদ্য প্রভৃতি প্রচলনের যে-সব ব্যবস্থা হইতেছে তাহার দরুন এই বৎসর কোনরূপ ঘাটতি হইলে তাহা সম্পূর্ণরূপে পূরণ হইতে পারিবে। সুতরাং জনসাধারণ এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে, পরিণামে খাদ্যশস্যের অভাব হইবে বলিয়া কোনরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই।" খাদ্যসচিবের এই উক্তির ভিতর অনেকগুলি যুক্তির ভুল রহিয়াছে। প্রথমতঃ, ১৯৪১-৪২-এর ফসলের কোন অংশ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে এমন কোন প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়তঃ, অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে অনেকে এক বেলা খাইয়া চাউলের খরচ বাঁচাইতেছে বলিয়া সুরাবর্দী সাহেব কতকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে মোট চাহিদার কতটুকু অংশ বাঁচিয়াছে সেটা বোধ হয় হিসাব করিয়া দেখিবার অবসর পান নাই। তৃতীয়তঃ, ভাতের বদলে অন্য প্রকার খাদ্য ব্যবহারের যে পরামর্শ তিনি ও গবর্মেণ্ট দিতেছেন তাহার ব্যবস্থাই বা কোথা হইতে হইবে? আটা মাঝে মাঝে পাওয়া গেলেও অকস্মাৎ এক এক সময় উহাও দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে।

খাদ্যসচিব ঐ বিবৃতিতেই বলিয়াছেন যে, "বর্ত্তমানে বাজারে যে উচ্চমূল্য রহিয়াছে তাহার স্বপক্ষে কোন যুক্তি

নাই। কারণ ব্যবসায়িগণ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইচ্ছাপূর্বক মূল্য নির্ধারিত করিতেছে। বহু ক্ষেত্রে মাল ডেলিভারী ছাড়াই কয়েক ধাপ মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।" সুরাবর্দী সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন, যাহাতে মূল্য হ্রাস পাইয়া ন্যায়সঙ্গত পর্য্যায়ের হইতে পারে ও পুনরায় স্বাভাবিক ভাবে ব্যবসা চলিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে গবর্ন্মেণ্ট প্রয়োজন হইলে সরকারী সর্বোচ্চ মূল্যের পুনঃ প্রবর্তন ও অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই ঘোষণার পরও চাউলের দর সমান ভাবেই চড়িতেছে। চাউলের ফাটকাবাজদের মধ্যে এবার অধিকাংশই মুসলমান এবং লীগওয়ালা, সঙ্গে কিছু ইউরোপীয়ানও আছে। অপ্রতিহত লাভে বাধা পাইবার জন্য নিশ্চয়ই ইহারা "নিজেদের" মন্ত্রিমণ্ডল এত চেষ্টা করিয়া গড়িয়া লয় নাই। ফাঁপতি টাকার জোরে চাউলের ফাটকাবাজী সুরাবর্দী সাহেব কেমন করিয়া বন্ধ করেন সেটা না দেখিলে বুঝা কঠিন।

—

তস্কর মনোবৃত্তি বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ

বাংলা দেশে এ বৎসর খাদ্যশস্যের অভাব ঘটিয়াছে ইহা নিশ্চিত, কিন্তু উৎপাদনের স্বল্পতা বর্তমান অগ্নিমূল্যের একমাত্র কারণ নহে। বাহির হইতে আমদানী বৃদ্ধি এবং দেশে অপচয় নিবারণ প্রভৃতির দ্বারা এই অভাবপূরণ ভিন্ন আপাততঃ আর কোন উপায় নাই। অতিভোজনও আমাদের দেশে অপচয়ের একটি পন্থা, ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই, অন্যান্য উপায়ে অপচয় নিবারণের সঙ্গে অতি-ভোজনের পরিবর্তে পরিমিত ভোজনে সকলে মনোযোগ দিলে কিছু চাউল বাঁচিতে পারিবে।

মূল্যবৃদ্ধির সর্বপ্রধান কারণ ব্যবসায়ীদের অতিলোভ। শতকরা ৩০ ভাগ ফসল ঘাটতি পড়িবে বলিয়া ধরিয়া লইলেও চাউলের মূল্য সাত গুণ বৃদ্ধি কিছুতেই হইতে পারে না। ফাঁপতি টাকার জোরে যে সব বড়লোক লক্ষপতি কোটিপতি হইয়াছে তাহাদের তস্কর-মনোবৃত্তি এবং ঐ সঙ্গে একদল সরকারী কর্মচারীর অকর্মণ্যতা ও উৎকোচ গ্রহণ-প্রবৃত্তি এই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির সর্বপ্রধান কারণ। অন্য দেশ হইলে এই চৌর্য্য ও তস্করবৃত্তি অবাধে চলিতে পারিত না; জনসাধারণ ইহার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ করিত; প্রয়োজন হইলে চুরি বন্ধ করিবার জন্য সর্ববিধ উপায় অবলম্বন করিত। তস্কর-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণের আতঙ্ক দেশের সর্বপ্রধান শত্রু। তদপেক্ষাও বড় শত্রু গবর্ন্মেণ্টের কতকগুলি ঘুষখোর এবং অকর্মণ্য কর্মচারী যাহারা বাঙালীর মুখের গ্রাস লইয়া অবাধে চুরি ও ডাকাতি চলিতে দিয়াছে, সর্বপ্রকারে দাগাবাজ ব্যবসায়িগণকে সহায়তা করিয়াছে। বিগত মন্ত্রিমণ্ডল ইহা বন্ধ করিতে পারেন নাই; বর্তমান খাদ্যসচিব মিঃ সুরাবর্দী এই প্রকাশ্য চৌর্য্যবৃত্তি বন্ধ করিতে পারেন কি না তাহা দ্রষ্টব্য। বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে ইহাদের মজুত চাউল ছড়াইয়া রহিয়াছে ইহা জানিয়াও আজ পর্য্যন্ত হক-মন্ত্রিমণ্ডল অথবা নবগঠিত নাজিমুদ্দীন-মন্ত্রিমণ্ডল কেহই উহা আনিয়া বাজারে ছাড়িতে পারেন নাই।

একের পর এক গবর্ন্মেণ্ট খাদ্য-সমস্যা লইয়া গবেষণা করিতে থাকিবেন, কিন্তু মরিতে মরিবে দেশের জনসাধারণ —এ কথাটি আজ বাঙালী যেন ভুলিয়া না যায়। খাদ্য-সমস্যা সমাধানে গবর্ন্মেণ্টের যদি বিন্দুমাত্র আন্তরিকতা থাকে, তবে তাঁহারা তস্কর ব্যবসায়ীদের লুট বন্ধ করুন, ঘুষখোর কর্মচারীদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া প্রকাশ্যভাবে দণ্ডিত করুন—দেশবাসী আজ মিলিত কণ্ঠে এই দাবী করুক। ভারত-সরকারের খাদ্যশস্য ক্রয়ের যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, ক্রয় ও তদ্বিরের বর্তমান ব্যবস্থা বজায় থাকিলে বাঙালী জনসাধারণের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে ইহা নিঃসন্দেহ।

—

হেমলতা সরকার

শ্রীমতী হেমলতা সরকার গত ১২ই মে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। শ্রীমতী হেমলতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। তিনি সুলেখিকা ছিলেন ও শিক্ষয়িত্রীর পুণ্যব্রত গ্রহণ করিয়া জীবনের বহু বৎসর যাপন করিয়াছেন। দার্জিলিং মহারাণী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনা হয় তাঁহারই চেষ্টায় এবং ইহার অধ্যক্ষার পদে তিনি ত্রিশ-বৎসরাধিক কাল কাজ করিয়াছেন।

তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

—

আমেরিকা ও ভারতবর্ষ

আমেরিকা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নীরব দর্শকমাত্র হইয়া থাকিতে পারে না এবং তাহা চাহেও না, আমেরিকার কর্তৃপক্ষ ও সংবাদপত্রসমূহের নানা উক্তি ও কার্য্য-

কলাপের মধ্য দিয়া তাহা ক্রমেই প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে আমেরিকা হস্তক্ষেপ করিবে না ইহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু যুদ্ধের পর ভারতীয় সমস্যায় আমেরিকা সম্পূর্ণ নীরব থাকিবে এমন কোন লক্ষণও দেখা যায় নাই। স্যর স্টাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের প্রতিনিধি কর্ণেল জনসনও কংগ্রেসের সহিত ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের আপোষের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আটলাণ্টিক চার্টার ঘোষণার পর মিঃ চার্চিল ভারতবর্ষকে উহা হইতে বাদ দিতে চাহিলে মিঃ রুজভেল্ট ঘোষণা করেন যে বিশ্বের সকল দেশই উহার ভিতর পড়ে। মহাত্মা গান্ধীর অনশনের সময়ে মিঃ কর্ডেল হাল আমেরিকায় ব্রিটিশ রাজদূত লর্ড হ্যালিফাক্সের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং এই ভাবে প্রকারান্তরে বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দেন যে ভারতবর্ষে কি ঘটিতেছে তৎপ্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য আছে।

ভারতবর্ষে "গণতান্ত্রিক নীতি" কি ভাবে প্রয়োগ করা হইতেছে মিঃ ফিলিপ্‌স কয়েক মাসের মধ্যেই তাহা উত্তমরূপে বুঝিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। পৃথিবীর বহু দেশের নানা জাতীয় লোক আমেরিকায় বাস করে, তথাপি সেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করিবার প্রয়োজন ঘটে নাই, যুদ্ধের মধ্যেও গণতন্ত্র সেখানে অব্যাহত রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ভারতীয় সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দকে বড়লাটের হুকুমে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়া ইহাদিগকে দেশের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করা হইতেছে। যে কংগ্রেসের প্রশংসায় বিলাতী রাষ্ট্রধুরন্ধরেরা তিন বৎসর পূর্বে পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন, সেই কংগ্রেসের অবিসম্বাদী নেতৃবৃন্দের প্রতি আজ তাঁহারা দস্যু-তস্করের প্রতি প্রযোজ্য ভাষা প্রয়োগ করিতেছেন।

দেশের উচ্চতম আদালতের সিদ্ধান্ত শাসন-পরিষদের সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির আদেশে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট কেমন করিয়া বাতিল করেন, ফেডারেল কোর্টের রায় ও তাহার পরবর্তী অর্ডিনান্স না দেখিলে আমেরিকার ন্যায় গণতান্ত্রিক দেশ উহা বিশ্বাস করিতে পারিত না। মিঃ ফিলিপ্‌স ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন।

কারাগারে ভারতীয় নেতাদের সহিত সাক্ষাৎকার নূতন নহে। মিঃ ফিলিপ্‌স্ মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি চাহিয়া নূতন কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই। আমেরী সাহেব এ দিক দিয়া কোন কথা না বলিয়া এই ভাবে উহা এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, "অপরাধমূলক কার্য্যে যিনি উৎসাহ দেন তাঁহার সহিত কাহাকেও সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে না।" এক তরফা এই রায়ের উপর আমেরিকা অথবা পৃথিবীর আর কোন দেশ আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। যে বিলাতী কূটনীতি একদা ক্ষুরধার ছিল, আজ তাহা ভোঁতা অস্ত্রের ন্যায় পদে পদে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে। মিঃ ওয়েভেল উইলকীর ভারতবর্ষে আগমন কি ভাবে কৌশলে বন্ধ করা হইয়াছিল তাহাও আজ ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

—

চিত্র-পরিচয়

রাণা বণবীর চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অভিষেকের রাত্রিতেই সঙ্গ-বংশের একমাত্র প্রদীপ সিংহাসনের ভাবী দাবীদার কুমার উদয়কে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করেন। উদয়ের ধাত্রী পান্না ইহা জানিতে পারিয়া শিশুকে ফলের ঝুড়ির ভিতরে করিয়া সরাইয়া দেয় এবং অন্তর্হিত কুমারকে খুঁজিয়া বাহির করিবার কথা যাহাতে বনবীরের মনে না জাগে সেজন্য উদয়ের সমবয়স্ক নিজ পুত্রকে কুমারের বিছানায় শোয়াইয়া রাখে। উদয় কোথায় জানিতে চাহিলে পান্না অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নিজ পুত্রকে দেখাইয়া দেয় এবং বনবীর তাহাকে হত্যা করে। বনবীরের ভয়ে রাজপুতানার রাজন্যবৃন্দ উদয়কে আশ্রয়দানে অসম্মত হইলে পান্না অবশেষে কমলমীরের জৈন-ধর্মাবলম্বী বৈশ্যরাজ আমাশাহের নিকট উপস্থিত হয় এবং তিনি কুমারকে আশ্রয় দান করেন। পান্না সেখানে থাকিলে কুমারের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে, এই আশঙ্কায় ধাত্রী পান্না কমলমীর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। এই মহিমময়ী নারীর অপূর্ব আত্মত্যাগ ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীরূপে অমর হইয়া রহিয়াছে।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ট্যুনিসিয়ার যুদ্ধের শেষের পর্ব্ব উপস্থিত। এই যুদ্ধের দ্রুত অবসান অক্ষশক্তিপুঞ্জের বিশেষ ক্ষতিকারক হইবে মনে হয়, নহিলে জার্ম্মান সেনা গত ছয় মাস যাবৎ এরূপ প্রাণপণ করিয়া শেষ পরিণতি ঠেকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিত না। ছয় মাস পূর্ব্বে যখন আমেরিকান সেনা-বাহিনী, ব্রিটিশ প্রথম বাহিনী এবং ফরাসী ও অন্য সৈন্যদল ট্যুনিসিয়া আক্রমণ আরম্ভ করে তখনই রোমেল এবং ফন আর্নিমের বাহিনীদ্বয়ের পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা অতি দুরাশার মধ্যে ধরা যাইতে পারিত। তখনই মিত্র পক্ষের সৈন্যবল, অস্ত্রবল, এরোপ্লেনের বহর ইত্যাদির অবস্থা অক্ষশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিল। তাহার পর রোমেলের সহস্রাধিক মাইল পশ্চাৎপদ হওয়ার সময় জার্ম্মান সেনা অতি আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত আত্মরক্ষা করা সত্ত্বেও রোমেলের লোকবল ও অস্ত্রবল দুইয়েরই যথেষ্ট ক্ষতি হয়—বিশেষতঃ বর্ম্মযুক্ত যুদ্ধরথের—সুতরাং মিত্রপক্ষের পরিস্থিতি তাহাতে উন্নতই হয়। তাহার পর ক্ষতিপূরণ এবং বলবৃদ্ধির হিসাবে অক্ষশক্তির অবস্থা ক্রমেই হীন হইতে হীনতর হয়, অন্য দিকে মিত্র পক্ষ ক্রমে ক্রমে বিরাট অনুপাতে ব্রিটেন ও আমেরিকার সমস্ত কার্য্যকরী শক্তির প্রধান অংশ ঐক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ফ্রান্সের একটি শক্তিশালী সেনাদল আক্রমণে যোগ দেয়। ক্রমেই রোমেল ও ফন আর্নিমের সেনাদলের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া আসে।



অষ্টম বাহিনী কর্ত্তৃক রোমেলের পশ্চাদ্ধাবন

জার্ম্মান সেনানায়কগণ নির্ব্বোধ নহে এবং যুদ্ধবিদ্যার ব্যবহারিক অংশে তাহাদের জ্ঞান যথেষ্ট, সুতরাং ট্যুনিসের যুদ্ধের কি পরিণাম হইবে তাহা বুঝিতে তাহাদের বেশী সময় লাগে নাই। তাহা সত্ত্বেও এরূপ বলবৈষম্যের মুখেও তবে "সময় থাকিতে সরিয়া পড়া" রূপ সহজ ব্যবস্থা ছাড়িয়া এরূপ মরণ পণ করিয়া যুদ্ধদানের অর্থ কি? এই যে ছয় মাস যাবৎ অশেষ ক্ষতি এবং নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ সত্ত্বেও এখনও যুদ্ধ চলিতেছে ইহারই বা অর্থ কি? এইরূপ যুদ্ধে জার্ম্মান দল জয়ের আশা কিছুতেই করিতে পারে না, তবে কিসের আশায় এই যুদ্ধ এত দিন এই রূপ প্রচণ্ড ভাবে চলিয়াছে? ইহার একমাত্র উত্তর এই যুদ্ধে জার্ম্মানি রুশের বিরুদ্ধে নূতন অভিযান গঠনের অবকাশ খুঁজিতেছে। ট্যুনিসিয়ার যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিলেই মিত্রপক্ষ অন্য ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্ত যোজনার সুবিধা পাইবে। এবং সেই দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্ত রচিত হইলেই রুশের উপর সংযোজিত অক্ষশক্তির দারুণ চাপের কিছু লাঘব হইবে। সুতরাং অক্ষশক্তির চেষ্টা এখন সেই দ্বিতীয় প্রান্ত রচিত হইবার পূর্ব্বেই রুশকে সাংঘাতিক



ব্রিটিশ অষ্টম বাহিনীর নূতন বর্ম্মযুক্ত যুদ্ধ-রথ, "ক্রুসেডার" ও "শের্ম্মান" জাতীয়। মার্স মাট্রুর অধিকারের চিত্র। এই নূতন যুদ্ধ-রথ-বাহিনী কর্ত্তৃক রোমেলের পরাজয় ঘটে।

পরও যদি সোভিয়েটের ক্ষমতা অটুট থাকে তবে অক্ষশক্তির পরাজয় অনিবার্য। কেননা ইয়োরোপস্থ অক্ষশক্তির পূর্ণ বিকাশ হইয়া গিয়াছে এবং ইহার পর ক্ষতিপূরণেরও সম্যক ক্ষমতা উহার থাকিবে কি না সন্দেহ। অক্ষশক্তির ভাগ্য পরিবর্ত্তনের একমাত্র উপায় এই গ্রীষ্ম ও শরৎ অভিযানে বিপক্ষকেও বিষম ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া ঐরূপ অবস্থায় আনা। স্টালিনগ্রাডের দুই যুদ্ধের ন্যায় আরও অনেক যুদ্ধ এখনও বাকী আছে। জয়-পরাজয় নির্ভর করিতেছে এই শিয়রে সংক্রান্তি অবস্থায় সময়ের সদ্ব্যবহারের উপর। ব্রিটেন ও আমেরিকার পক্ষে আফ্রিকার অভিযান উদ্যোগপর্ব্ব মাত্র, মূল যুদ্ধ এখনও ভাবে আহত করা। যে অনুপাতে ব্রিটেন ও আমেরিকার বলবৃদ্ধি ও শক্তিপ্রয়োগ ক্ষমতা বাড়িতেছে ঠিক সেই অনুপাতে রুশের বলক্ষয় না হইলে অক্ষশক্তির পরাজয় আসন্ন হইয়া পড়ে। নির্ব্বিবাদে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিলে অক্ষশক্তি এখনও সোভিয়েটের অতি বিষম ক্ষতি করিতে পারে। অন্য দিকে সময় পাইলে ইয়োরোপের পশ্চিম প্রান্তে দুর্গমালা গঠনের কার্য্যও সম্পূর্ণ হইতে পারে। দেখা যাইতেছে তবে যে ট্যুনিসিয়ায় লড়িয়া অক্ষশক্তি খুঁজিতেছে রুশকে নিঃশেষ করিবার অবকাশ। এবং সেই অবকাশ না পাইলেই অক্ষশক্তির পরাজয় নিশ্চিত। টোব্রুক, বেনগাজী, ট্রিপলি, ট্যুনিস, বিজের্টা এ সব কিছুই নয় কয়েকটা ভৌগোলিক নামমাত্র। সে সকল হারাইয়াও অক্ষশক্তির জয়পরাজয়ের বিষয়ে কিছুই বিশেষ প্রভেদ হয় নাই, হইয়াছে এগুলির পতনের গতিবৃদ্ধিতে এবং আরও হইবে উত্তর-আফ্রিকার যুদ্ধের দ্রুত সমাপ্তিতে।

সোভিয়েটের শীত-অভিযান ক্ষান্ত হওয়ার পর প্রায় আড়াই মাস কাল জার্ম্মান দল অবসর পাইয়াছে। কুবান অঞ্চলে ও নভোরসিস্ক বন্দরের নিকট যাহা চলিতেছে তাহা খণ্ডযুদ্ধ মাত্র। গ্রীষ্ম অভিযানের সময় আর দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যেই আসিবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই অক্ষশক্তির ও মিত্রশক্তির ভাগ্যপরীক্ষার সময় আসিবে। সুতরাং ব্রিটেন ও আমেরিকার পক্ষে এখন প্রত্যেক মুহূর্ত্তই অতি মূল্যবান। এই বৎসরের গ্রীষ্ম ও শরৎকালের মধ্যে ব্রিটেন ও আমেরিকার যুগ্মশক্তির পূর্ণবিকাশ হইবে। তাহার সামনেই আছে এবং আগামী পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যেই সেই যুদ্ধের প্রথম পর্ব্ব শেষ করিতে হইবে। গত বৎসরের শরৎ-কালের শেষে এবং শীতের গোড়ায় যে পরিস্থিতি আসিয়াছিল তাহার ফলে এ যুদ্ধের গতি এক প্রকার নিরূপিতই হইয়া গিয়াছে। এখন অক্ষশক্তি বুদ্ধি ও উদ্যোগের প্রয়োগে সে অবস্থা ফিরাইয়া অন্ততঃ পক্ষে চালমাতের অবস্থা আনিবার চেষ্টায় আছে। ব্রিটেন ও আমেরিকা গত বৎসর স্বর্ণ সুযোগ হারাইয়াছে, এখনও যদি জার্ম্মানিকে আরও সময় এবং ভ্রম-প্রমাদের ছিদ্রপথ দেওয়া হয় তবে মিত্রপক্ষের সমূহ বিপদ ঘটিতেও পারে।

আরাকান অঞ্চলে বর্ষার আগমনের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে জাপানী সেনার তৎপরতার বৃদ্ধি দেখা দিয়াছে। এখন যে অবস্থা তাহাতে জাপানীদের চেষ্টা কেবলমাত্র আরাকান নিষ্কণ্টক করাই মনে হয়। মিত্রপক্ষ স্থলপথে যে যে দিক দিয়া ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিতে পারে তাহার সকল দিকেই দুর্গমালার সৃষ্টি এবং পথরোধের ব্যবস্থাই এখন জাপানীরা করিতেছে। এই পথ রোধ কত দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাহারা করিতে পারে তাহারই সুযোগ-সুবিধার অন্বেষণ করিতে জাপানী ক্ষুদ্র দলগুলি ব্যস্ত। ভারত আক্রমণ রূপ বিরাট ব্যাপারের কোনও চিহ্নমাত্র এখনও দেখা যায় নাই। তবে যেভাবে জাপানের গতিবিধি এখনও নির্ব্বিবাদ রহিয়াছে তাহাতে সময়েরই গতির সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কি ঘটে বলা যায় না। মিত্রপক্ষ আফ্রিকার রণাঙ্গন হইতে মুক্ত হইলেই ইয়োরোপের অতি বিরাট

যুদ্ধক্ষেত্রে অভিযান চালনায় চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিবে মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার নূতন যুদ্ধক্ষেত্রের সৃষ্টি এবং তাহার সকল ব্যবস্থা করার মত সংস্থান মিত্রপক্ষের আছে কি না আমরা জানি না। আট্‌লাণ্টিকের যুদ্ধে মিত্রপক্ষের যে পরিমাণ ক্ষতির পরিচয় আমরা মার্কিন বক্তাদের নিকট পাইয়াছি তাহাতে মনে হয় মিত্রপক্ষের সকল প্রচেষ্টার অন্তরায় মাল ও সৈন্য সরবরাহের জাহাজের অভাব। আফ্রিকার যুদ্ধে ভারতীয় যোদ্ধা ব্রিটিশ ও আমেরিকান বাহিনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম প্রমাণিত হইয়াছে। যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণের বিশাল অনুপাতে ব্যবস্থাও এদেশে হইতে পারিত। সুতরাং সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্রের সরবরাহের প্রশ্ন এতটা জটিল হওয়ার জন্য দায়িত্ব প্রধানতঃ ভারতের কর্ণধারগণের।

পুস্তক-পরিচয়

বাংলা সাহিত্যের কথা—শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা, সংখ্যা ৬। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹।

বাংলা সাহিত্যের একখানি সুখপাঠ্য ছোট ইতিহাসের প্রয়োজন ছিল। এ ধরণের দুখানি মাত্র বই এর আগে আমার চোখে পড়েছে, একখানা দীনেশচন্দ্র সেনের 'সরল বাঙ্গলা সাহিত্য' আর একখানা শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনের 'আমাদের সাহিত্য'। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' ছোট হ'লেও ঠিক ছোটদের জন্য নয়। এ বইখানার একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রথমতঃ, পাছে বালক-বালিকাদের নীরস লাগে, এই ভয়ে গ্রন্থকার সন তারিখের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করেন নি। দ্বিতীয়তঃ, যত দূর সম্ভব গল্পের মতন ক'রে তিনি বক্তব্য বিষয় বলেছেন। বঙ্গসাহিত্যের প্রধান প্রধান ধারা নির্দেশ ক'রে শ্রেষ্ঠ লেখকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। তথ্যকণ্টকিত পথে তিনি তাঁর পাঠকগণকে নিয়ে যান নি। অংশতঃ তাঁদের লেখা তুলে বাকিটার আভাস দিয়ে, রসোপভোগের পথেই পরিচয়সাধন করিয়েছেন।

বইয়ের আরম্ভে ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। তাতে ভাববার বিষয় অনেক থাকলেও বলবার ভঙ্গী খুব সহজ। বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসকে লেখক মাত্র দু'টি যুগে ভাগ করেছেন: প্রাচীন ও আধুনিক। আমাদের মনে হয়, সন-তারিখের অরণ্যে প্রবেশ না ক'রেও তিনি মোটামুটি ভাবে পুরোনো সাহিত্যের খণ্ড যুগগুলি এবং তাদের ব্যাপ্তিকাল নির্দেশ করতে পারতেন।

প্রাচীন যুগের আলোচনায় গ্রন্থকার বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, গীতিকাব্য এবং লোকসাহিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক যুগে গদ্যের প্রচলন, পদ্যের রূপান্তর এবং নাটক, উপন্যাস ও বিবিধ রচনার আরম্ভ ও বিকাশ দেখিয়েছেন। রচনাভঙ্গীর দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি অনেকের লেখা উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের প্রায় বাদ দিয়ে গেছেন। বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্পর্কে বোধ হয় চৈতন্যদেবের জীবন-কথাও বলা উচিত ছিল।

আধুনিক কালের কবি ও ঔপন্যাসিকগণের নাম উল্লেখ ক'রেই গ্রন্থকার ক্ষান্ত হয়েছেন। কমশক্তিশালীদের পক্ষে হয়ত' ঐটুকু যথেষ্ট, কিন্তু মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্যিকদের প্রধান প্রধান গ্রন্থের পরিচয় দিলে ভাল হ'ত না কি?

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে আলোচনা যথোপযুক্ত হয় নি। তাঁর বিষয়ে জানবার অনেক উপকরণ আমরা পেয়েছি। বাংলা-গদ্যের



ব্রিটেনের একটি ট্যাঙ্ক-কারখানার ভিতরকার দৃশ্য



ব্রিটেনে সামরিক 'হারিকেন' বিমান নির্মাণের কারখানা



দেশীয় রীতিতে নিউ গিনির অধিবাসীরা ঘরের চালা নির্ম্মাণে রত। মার্কিন সেনাদ্বয় ইহা অবলোকন করিতেছে



সলোমন দ্বীপে জাপানীদের এই বিমান-বিধ্বংসী কামানটি মার্কিন নৌ-সেনারা অধিকার করিয়াছে



গুয়াদালকানালে এই তাঁবুতে মার্কিন নৌ-সেনাধ্যক্ষ অবস্থান করিতেছেন



গুয়াদালকানালে মার্কিন নৌ-সেনাদের তাঁবু

গড়ে তুলেছেন—তবু সাহিত্যক্ষেত্রে আকাশ কুসুমের মত অলীক বস্তু নয়; রূপ রস গন্ধে পরিমল বাবুর সৃষ্টি পরম উপভোগ্য বস্তু।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নব্য-বিজ্ঞান-কথা—শ্রীসুধাংশু প্রকাশ চৌধুরী। শতাব্দী গ্রন্থমালা প্রদর্শিকা। ১২, ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, সুইট ৬-এ, কলিকাতা। পৃ. ৭০; মূল্য এক টাকা।

আজকাল আমাদের দেশে বিজ্ঞান সম্পর্কিত পুস্তকাদির পাঠকসংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা খুবই শুভ লক্ষণ। কারণ বিজ্ঞান-বলেই মানুষ আজ প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিজ্ঞানানুশীলনে আজও আমরা পৃথিবীর অন্যান্য উন্নতিশীল জাতিগুলির সহিত সমান তালে চলিতে পারিতেছি না। তাহার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এখনও আমরা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারি নাই! শিক্ষিত জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিই এই ভিত্তির দৃঢ়তা সম্পাদনে সহায়তা করিয়া জাতীয় জীবনে উন্নতি আনয়ন করিতে পারে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত বিবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ সহজ কথায়, সুখবোধ্য ভাবে মাতৃভাষায় প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। নব্য-বিজ্ঞান-কথা এই উদ্দেশ্য সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই। পুস্তকখানিতে সুধাংশু বাবু কথোপকথনচ্ছলে 'একটি অসম্ভব রূপকথা'য় অণুপরমাণু এবং ইলেকট্রন প্রোটন সম্পর্কিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদ, 'আজগবি নাটকে' ইলেকট্রন প্রোটন মিলনতত্ত্ব এবং 'বুদ্বুদ-বিদারণ কাহিনী'তে বিশ্ব-রহস্যের বিষয় সহজভাবে এবং সরল ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে উৎসাহী পাঠক মাত্রেই পুস্তকখানি পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রাচীন ভারত: বৈদিক ও মধ্যযুগ—শ্রীবিনোদবিহারী রায় বেদরত্ন। রিসার্চ হাউস, রাজসাহী হইতে প্রকাশিত, পৃ. ।/০ + ২৬৪, মূল্য ২৲ টাকা।

বর্ত্তমান পুস্তক গ্রন্থকারের পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব গ্রন্থমালার তৃতীয় খণ্ড। ইহাতে বৈদিক ও মধ্যযুগ (অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৬৮২০ হইতে খ্রীষ্টাব্দ ১২০০ পর্য্যন্ত) আলোচিত হইয়াছে। পূর্ব্বের দুই খণ্ডে পৃথিবীসৃষ্টি ও আর্য্যগণের মরু-প্রদেশের আদিবাস প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের দিক হইতে আলোচনা করা হইয়াছে। লেখক ঋগ্বেদ হইতে যে প্রাচীন অব্দ-গণনা প্রণালী উদ্ধার করিয়াছেন তাহা দ্বারাই অনেক প্রাগৈতিহাসিক ঘটনা সন তারিখের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছেন। অবশ্য এরূপ আলোচনা-প্রণালী ও সিদ্ধান্তগুলির অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ স্বীকার নাও করিতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থকারের গবেষণা ও চিন্তার মৌলিকত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। লেখকের মতে সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক ঘটনা শাস্ত্র হইতেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে ব্রহ্মা একজন ঐতিহাসিক পুরুষ—জন্ম খ্রীঃ পূর্ব্ব ৬৮২০। লেখকের মতে, দেবাসুর-যুদ্ধ আর্য্য-অনার্য্যের যুদ্ধ নহে—আর্য্য বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের মধ্যে যুদ্ধ। ভূতপ্রেতাদি অসভ্য জাতি ব্যতীত কিছু নহে। উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ গন্ধর্ব (মঙ্গোলিয়ান) জাতীয় ছিল। সুমেরিয়ানদিগকে দ্রাবিড়িয়ান বলিলে চলিবে না। তাহারা আর্য। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ১৯৩৭ সনে ভারত-যুদ্ধ হয়। ঋগ্বেদে 'আল্লা' শব্দের মূল পাওয়া যায়। জরথুস্ত্র অগ্নির সন্তান। হারাপ্পা যে হরিযূপীয়া (যযাতি পুত্র অনুর রাজধানী) তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ অনেক মতামত প্রকাশ করিয়া লেখক সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন আলোকপাতের প্রয়াস পাইয়াছেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

ছবি—"মেঘদূত" প্রণীত। প্রকাশক—রূপেন ঘোষ। কথা প্রেস, ১ নং অপূর্ব্ব মিত্র রোড, কালীঘাট। মূল্য এক টাকা। পৃ. ১০২।

উপন্যাস। মার্কস ও এঞ্জেলসের নীতিকে ভিত্তি করিয়া কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে লেখক বর্ত্তমান সমাজের সমস্যা সমাধান করিতে চাহিয়াছেন। গল্পের সূত্র ক্ষীণ, স্বল্প পরিসরে চরিত্রগুলি তেমন বিকশিত হইতে পারে নাই।

অভিচার—শ্রীবাণী কুমার। প্রকাশক—রাসবিহারী চ্যাং, ৪৫, শ্রীরাম চ্যাং রোড, সালকিয়া, হাওড়া। দাম দেড় টাকা। পৃ. ৯৪।

তন্ত্রোক্ত অভিচার প্রক্রিয়ার দ্বারা মানুষের কত দূর ক্ষতিসাধন করা যাইতে পারে—তাহা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। চরিত্র-চিত্রণের চেয়ে অভিচার-প্রণালীর বীভৎসতা দেখাইবার প্রয়াস লেখক করিয়াছেন এবং তাহাতে সফলকাম হইয়াছেন। ভাষা ভাল। পটভূমিকা নির্ব্বাচনে সার্থকতা না থাকিলেও আধা-ডিটেকটিভ কাহিনীটি বরাবর ঔৎসুক্য বজায় রাখিতে পারিয়াছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দেশ-বিদেশের কথা

পরলোকে যোগেন্দ্রনাথ দাস

দীননাথ দাস সুরমা উপত্যকায় চা ও বিবিধ ব্যবসায়ে একজন সফল উদ্যোক্তা। তাঁহার পুত্র যোগেন্দ্রনাথ দাস। তিনি নিজের স্কলারশিপেই অধ্যয়ন করেন। তিনি পাঠ্যাবস্থায় অত্যন্ত মেধা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দেন। শ্রীহট্ট গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইতে স্কলারশিপসহ ১৮৯৩ সালে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। সেখান হইতে স্কলারশিপসহ ১৮৯৫ সালে এফ-এ পাস করেন। সিটি কলেজ হইতে ১৮৯৮ ও ১৯০৭ সালে যথাক্রমে বি-এ এবং বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৯০০-১৯০৬ সাল পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট, ডিব্রুগড় ও তেজপুরে শিক্ষকতা করেন। যোগেন্দ্রনাথ আইন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীহট্টে ফিরিয়া আসেন এবং এখানকার ব্যাঙ্ক ও চা কোম্পানী সমূহের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন।

বিপিনচন্দ্র পালের পরিদর্শক নামক একটি প্রেস ছিল এবং তিনি দীননাথ দাসের নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়াছিলেন। তার পরিবর্ত্তে তিনি প্রেসের সামান্ত উপকরণ দীননাথ দাসকে অর্পণ করেন। তাহাই যোগেন্দ্রনাথ আধুনিক দীননাথ প্রেসে রূপান্তরিত করেন। তিনি ১৯০৮-১৯৩৬ পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট লোন এণ্ড ব্যাঙ্কিঙের ডিরেক্টর ও ১৯৪৩ পর্য্যন্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি রাজারামপুর টি এষ্টেটও পরিচালনা করিতেন। তাঁহার রচিত সুচিন্তিত বেনামী প্রবন্ধ ইতস্ততঃ নানা পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত আছে। তিনি সমবায় আন্দোলনের সহিত বহুকাল যুক্ত ছিলেন।

পরলোকে ডক্টর প্রভু গুহ ঠাকুরতা

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড-এর পাবলিসিটি অফিসার



স্বর্গীয় প্রভু গুহ ঠাকুরতা

ডক্টর প্রভু গুহ ঠাকুরতা সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি আগে অধ্যাপক এবং সাংবাদিক রূপে কিছুকাল কর্ম করিয়াছিলেন। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার বেশ সুনাম ছিল।

আলোচনা

"রবীন্দ্রনাথের বংশলতিকা"

শ্রীঅমল হোম

১৩৫০, বৈশাখ মাসের "প্রবাসী"তে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার সম্পাদিত Calcutta Municipal Gazette-এর Tagore Memorial সংখ্যায় ঠাকুর-পরিবারের বংশলতা-প্রসঙ্গে যে ভুলগুলি দেখাইয়া দিয়াছেন তাহার জন্ত তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি এ সম্বন্ধে মোটেই বিশেষজ্ঞ নই, সুতরাং ভুল করা আমার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে "বন্দ্যোপাধ্যায়" সে-কথা আমি তাঁহার নিকটেই শুনিয়াছিলাম। তিনি যদি আপন "উপাধিভ্রমে পতিত" হইয়া থাকেন ত সে কথা আলাদা। তবে তিনি কখনও এই সব বিষয়ে মাথা ঘামাইতেন না। নেপোলিয়ন যেমন বলিয়াছিলেন "My nobility began with the Battle of Austerlitz,"—রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ও সেই কথা বলা চলে।

আর একটি কথাও হরিচরণবাবু লিখিয়াছেন যে, তিনি আমার "বিষম ভ্রমে"র কথা আমাকে পত্রে জানাইয়াছিলেন কিন্তু "যে কারণেই হউক" আমি তাঁহার উত্তর দিই নাই। আমার সৌজন্তবুদ্ধির উপর এই ইঙ্গিতে দুঃখিত হইলাম। আমি তাঁহার নিকট হইতে এ বিষয়ে কোন পত্র পাই নাই। চিঠি নিশ্চয়ই তিনি লিখিয়া থাকিবেন হয়ত হারাইয়া গিয়াছে। আমাদের কর্পোরেশন আপিসে এরূপ পত্র-বিভ্রাট প্রায়ই ঘটে। হরিচরণবাবুর সঙ্গে তো আমার অনেক দিনের জানাশুনা; তিনি না হয় আমাকে আর একখানি চিঠিই লিখিতেন। যাঁহারা আমাকে জানেন তাঁহারা প্রত্যেকেই সাক্ষ্য দেবেন যে চিঠি পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দেওয়া আমার অভ্যাস নয়।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



পল্লী-নারী

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৫০

৪র্থ সংখ্যা

(বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত)

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী

কল্যাণীয়াসু—

শুক তারকার প্রথম প্রদীপ হাতে
অরুণ আভাস জড়ানো ভোরের রাতে
আমি এসেছিনু উদয়-তোরণে তোমারে জাগাব বলে,
তরুণ আলোর কোলে
যে জাগায় জাগে পূজার শঙ্খধ্বনি
বনের ছায়ায় লাগায় পরশমণি
যে জাগায় মোছে ধরার মনের কালি,
অসীমের কাছে মুক্ত করে সে পূর্ণ মাধুরী ডালি।

জাগে সুন্দর জাগে নির্মল
জাগে আনন্দময়ী
জাগে জড়ত্বজয়ী
রুধিয়া তোমার দ্বার
বন্দী করিয়া রেখো না রেখো না
রাতের অন্ধকার।
বহুক উদার বায়ু
শিরায় শিরায় রক্তে তোমার
দুলুক অমিত আয়ু।
বিশ্বলক্ষ্মী-পাদপীঠতলে
আপনারে করো দান
তোমার জীবনে ব্যর্থ না হোক
কবির এ আহ্বান॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩।৬।৩৯

রবীন্দ্রসংলাপকণিকা

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের বিপুল রচনা পড়িয়া তাঁহাকে অনেক জানা যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ জানা যায় না। যিনি তাঁহার সহিত আলাপ-সালাপের* সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ না করিয়াছেন, তাঁহার অনেকই অজানা থাকিয়া গিয়াছে। তিনি যে কত কৌতুকপ্রিয় ও সুরসিক ছিলেন তাহা তিনি জানিতে পারেন নি। বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাষায় বলা যাইতে পারে, তিনি ছিলেন 'রসিকেন্দ্রচূড়ামণি'। তাঁহার এক পঙ্ক্তি মাত্রও লেখার মধ্যে যেমন কবিত্ব দেখা যায়, তেমনি তাঁহার এক-একটি কথাতেও রসনিস্যন্দ ফুটিয়া উঠিত। শ্রোতারা তাহা পান করিয়া মুগ্ধ হইতেন। প্রতি দিন প্রধানত বৈকালে, সন্ধ্যার পূর্বে কত জন তাঁহার নিকট বসিতেন, কত বিষয়ে কত গুরু ও লঘু আলাপ ও আলোচনা হইত, সকলে মুগ্ধ চিত্তে তাহাতে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিতেন। যাঁহাদের এইরূপ সৌভাগ্য হইয়াছিল বর্তমান লেখক তাঁহাদেরই মধ্যে একজন।

তাঁহার কাছে কত দিন কত কথা শুনিয়াছি, কিন্তু আমি অত্যন্ত বস্তোল, বড্ড ভুলিয়া যাই, যৎসামান্যই কিছু মনে আছে। সেই জন্য নিজেকে ধিক্কার দিই। হায়! কেন তাহা লিখিয়া রাখি নাই!

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়ের ইচ্ছা, যাঁহারা তাঁহার সহিত সংলাপ করিয়াছিলেন তাঁহারা যদি তাহা একটু-একটু করিয়া লিপিবদ্ধ করেন তো বড় ভাল হয়—তা তাহা যতই ক্ষুদ্র হউক না। এই সমস্ত সংলাপ উপরিলিখিত শীর্ষকে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে। সম্পাদক মহাশয় এই কার্যে প্রথমে আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। পরে অন্যরাও লিখিবেন। আজ যতটুকু পারি লিখিতেছি, পরে আবার লিখিব।

দ্রোণাচার্য

আজকাল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই রাজনীতি আলোচনা করেন, তা তাহাতে যোগ্যতা থাকুক আর নাই থাকুক, ইহা আমরা ভাবিয়াই দেখি না। পাখীর পাখায় যতটুকু শক্তি থাকে তদনুসারেই সে যেমন যতটা পারে আকাশের উপরে ওঠে, আমাদেরও গতি সেইরূপ। বর্তমান কালই আমাদিগকে এইরূপ করিয়াছে। আমিও এইরূপ রাজনীতি আলোচনা করিতাম বা এখনো করি। কখনো কখনো মাত্রাটা উপরে উঠিত। সময়ে সময়ে গুরুদেবের সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক্যও হইত। আমার মত প্রধানত মহাত্মাজিকে অনুসরণ করিত, অনেকটা দ্বিজেন্দ্রনাথের মত। দ্বিজেন্দ্রনাথ এক দিন বলিতে ছিলেন "শাস্ত্রী মশায় যত ছোটই হউক আমাদেরও একটা দল আছে।" শান্তিনিকেতনের কয়জনকে মনে করিয়া তিনি ইহা বলিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে তাঁহার সেক্রেটরী ৺অনিলকুমার মিত্র ও আমি ছিলাম।

গুরুদেব এক দিন আমাকে বলিলেন যে, আমি তো শাস্ত্রচর্চা লইয়া থাকি, তবে ওরূপ মতিগতি আমার কীরূপে হইল। আমি উত্তর দিয়াছিলাম যে, রামানন্দবাবুর Modern Review-এর নোটগুলি পড়িয়া। পত্রিকাখানি আসিলেই প্রথমে আমি মনোযোগের সহিত ঐগুলিই পড়িতাম, এবং এখনো তাহাই করি। পত্রিকাখানির প্রথম আরম্ভ হইতেই আমি ইহা করিয়া আসিতেছি। আমার উত্তরে তিনি হাসিতে লাগিলেন। বিশেষ কিছু বলিলেন না।

ইহার পর এক দিন রামানন্দবাবু আশ্রমে আসেন। বৈকালে আমরা উভয়েই গুরুদেবের কাছে যাই। তিনি তখন কোণার্ক† নামক গৃহে ছিলেন। নানা কথাবার্তা হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে গুরুদেব আমাকে লক্ষ্য করিয়া রামানন্দ বাবুকে বলিলেন, "রামানন্দ বাবু, ইনি হইতেছেন

---

*আলাপ-সালাপ <পালি অল্লাপ-সল্লাপ <সংস্কৃত আলাপ-সংলাপ।

† ইহার সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিয়া রাখা মন্দ নহে। গুরুদেব এক বাড়ীতে বেশী দিন থাকিতে ভালবাসিতেন না, তিনি ইহা পরিবর্তন করিতেন। এক-একটি বাড়ী হয়, তাহাতে কিছু দিন থাকেন, তার পর তাহা বিশ্বভারতীকে দিয়া অপর বাড়ীতে যান। এই রূপে পূর্ব দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম এবং পশ্চিম হইতে উত্তরে আসিয়া উপস্থিত হন। আবার সেই দিক্ হইতে পূর্বে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। যখনকার কথা বলিতেছি তখন কোণার্কের আকার ছিল অন্য। ইহা ছিল একখানা অতি সাধারণ মাটির দেয়ালে খড়ে-ছাওয়া ঘর। পাকা ঘরে না থাকাই তখন তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গুরুদেবকে পুরাতন ঘর ভাল লাগিত না, আর ঐ ঘরে তাঁহার প্রয়োজন-নির্বাহও হইত না। স্নানাগারের অভাব খুবই মনে হইতে লাগিল। তখন এক-এক করিয়া ঐ ঘরের চার কোণে চারটি ছোট-ছোট পাকা কুঠরি হইল। তাঁহার অসুবিধা তাহাতেও গেল না। সন্ধ্যার সময় একটু ছাদের উপর বসিয়া দিগন্তবিস্তীর্ণ পশ্চিম আকাশ না দেখিলে তাঁহার ভাল লাগিত না। মাটির দেয়াল খানিকটা ভাঙিয়া তাহার ব্যবস্থা করা হইল। দেখিতে-দেখিতে দেখা গেল ঐ ঘরখানির পূর্বের আর কিছুই থাকিল না, সম্পূর্ণ একটি এমন পাকা ঘর হইল যে, তাহাতে অভিনয় পর্যন্ত হইত। কাটাবাদের প্রতি তাঁহার একটা বিশেষ টান ছিল, তাই কোণার্কের পশ্চিম দিকে

দ্রো ণা চা র্য, আর আপনিই ইহাকে এই করিয়াছেন!" রামানন্দ বাবু স্বভাবতই প্রথমে ইহার রহস্য বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু হাসিতে লাগিলেন। পরে গুরুদেব নিজেই আমার পূর্বোক্ত Modern Reviewএর নোট-গুলি পড়ার কথা ও তাহাতে আমার মত গঠনের ব্যাপার প্রকাশ করিলেন। এই সময়ে আর কেহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি না মনে হইতেছে না।

"সেই জন্যই তো আপনাকে দিতে চাহিলাম।"

গুরুদেব ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া দুই-এক দিন হইল আশ্রমে ফিরিয়াছেন। দুপুরে কো ণা র্কে অথবা তাহার পাশের ঘরে একাকী বিশ্রাম করিতেছেন। ঐ সময়ে তাঁহাকে নিরিবিলি পাওয়া যাইবে ভাবিয়া অসময় হইলেও আমি তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম। তিনি সাধারণতও দিনে ঘুমাইতেন না। বিদেশে তাঁহাকে কত জায়গায় কত আদর-অভ্যর্থনা সম্মান-সৎকার করিয়াছে আমাকে সংক্ষেপে বলিতেছিলেন কেননা ও কথা অত বিস্তৃতভাবে বলা যায় না। বলিয়াছিলেন যে, অনেক রাজা-রাজড়াও তেমন সম্মান ওদেশে পান নি। এই প্রসঙ্গেই আমাকে বলিয়াছিলেন "সম্মানের বোঝা যে কী তাহা আপনারা কল্পনা করিতে পারিবেন না।" আমি ভাবিলাম ভারতবর্ষের ইহাই তো ছিল প্রাচীন আদর্শ। মনু বলিয়াছেন "সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।"

বিদেশে তাঁহাকে অনেকে অনেক জিনিস-পত্র উপহার দিয়াছিলেন। সেগুলির কিছু-কিছু ঐ ঘরে তাঁহার পাশে রাখা ছিল। আমার নজর ঐদিকে গেল, ঐ সম্বন্ধেই কথাবার্তা হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত জিনিসের মধ্যে একটি অতিসুন্দর ও লোভনীয় জিনিস ছিল। গুরুদেব উহা হাতে তুলিয়া আমাকে বলিলেন "শাস্ত্রী মশায়, এটা আপনি নিন, এ আমি আপনাকে দিলাম।" আমি বলিলাম "এ আমি লইয়া কী করিব? এ আমার কোন্ কাজে লাগিবে?" গুরুদেব হাসিয়া বলিলেন "আমি জানি আপনি নেবেন না, সেইজন্যই তো আপনাকে দিতে চাহিলাম, তা না হইলে কি দিতাম?" এই কথায় আমরা উভয়েই খুব হাসিতে লাগিলাম।

"ঐ সময়েই তো ইহা আপনাকে ভাল লাগিবার কথা!"

গুরুদেব ইউরোপ-ভ্রমণের জন্য যাইতেছেন। সমস্ত প্রস্তুত। বোলপুর স্টেশনে যাত্রা করিবার পূর্বে তিনি কো ণা র্কের পাশের ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন। তাঁহাকে বিদায়-প্রণাম করিবার জন্য আশ্রমের সকলে তখনো উপস্থিত হন নি, একটু দেরী আছে। আমি একটু আগেই গেলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখি, শ্রী ভ ব নে র পর্যবেক্ষিকা শ্রীমতী হেমবালা সেন, আর তাঁহার ভাইঝী শ্রীমতী অমিতা আমারও আগে আসিয়াছেন। অমিতা ছিল আমাদের ছাত্রী। গানে তাহার শক্তি ছিল অনন্য-সাধারণ। একবার আশ্রমে বা ল্মী কি প্র তি ভা র অভিনয়ে বাল্মীকির পাঠ সেই লইয়াছিল এবং তাহা অতি সুন্দরভাবে করিয়াছিল। তখন হইতে আমি দেখা হইলেই তাহাকে আদর করিয়া "বন্দে বাল্মীকিকোকিলং" বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও সে আমার ছাত্রী ছিল। সেদিন গুরুদেবের কাছে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম গুরুদেব অমিতাকে নিজের একটি পুরাতন গানের সুর শিখাইয়া দিতেছেন। গানটি হইতেছে "আমি নিশি-দিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসর মত বাসিও।" গানটি শেষ হইলে আমি গুরুদেবকে বলিলাম "সে অনেক দিনের কথা। আমি যখন কাশীতে পড়িতেছিলাম তখন আপনার এই গানটি আমি প্রথমে কোন এক বন্ধুর কাছে শুনি। কিন্তু তাঁহার সুর ভাল না হইলেও ইহা শুনিয়া আমার যে কত ভাল লাগিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না।" গুরুদেব আমার তরুণ বয়সের ইঙ্গিত করিয়া, শ্রীমতী হেমলতা সেন ও শ্রীমতী অমিতার সামনেই আমাকে বলিলেন "ঐ সময়েই তো ইহা আপনার ভাল লাগিবার কথা!" আমি নিরুত্তর।

"মাথাটা নীচু করিয়া রাখাই ভাল।"

গুরুদেব বড়-বড় ঘর অপেক্ষা ছোট-ছোট ঘরেই থাকিতে বেশী ভালবাসিতেন। দে হ লী র উপরের ঘরের

নানা রকমের কাঁটাগাছ লাগান হইয়াছিল। ঐ ঘরের কাছাকাছি কোন গাছ ছিল না। অথচ তিনি গাছ না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। নূতন গাছ লাগাইলে কত দিনে তাহা বড় হইবে, আর তিনি দেখিবেন? তাই কল্পনা করিলেন, তেকাঠির মত তিনটা বড় বড় তালগাছ বাঁধিয়া উঠাইয়া তাহার মূলে লতা লাগাইয়া দিতে হইবে এবং তালগাছের উপরে এমন কয়েকখানি কাঠ লাগাইয়া দিতে হইবে যাহাতে লতা উঠিয়া তাহা ঢাকিয়া ফেলিবে এবং তাহাতে উহা গাছের মত দেখাইবে। তাহাই হইল। পরে সেখানে গাছ লাগান হইয়াছিল, উহা বড় হইয়াছিল এবং তিনি তাহা দেখিয়াছিলেন। গুরুদেবের ইচ্ছা ও কল্পনা, তাহাতে নন্দবাবু ও সুরেন্দ্রবাবুর কল্পনায় কিছু যোগ-বিয়োগ ও রথীন্দ্র-নাথের অকাতরে অর্থব্যয়, এই সমস্ত একত্র মিলিত হইয়া শান্তি-নিকেতনে ও সেখানে এক অপূর্ব সৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছিল। শেষে দেখা গিয়াছিল, গুরুদেবের জন্য সেখানে পর-পর আরার দুই-তিনটি বাড়ী হয় এবং সব শেষেরটির সম্মুখে লাগান গাছগুলিও খুব বড় হইয়া উঠে। ইহা তিনি দেখিয়াই গিয়াছেন। কো ণা র্ক নামটি তিনি কেন করিয়াছিলেন তাহা অন্যত্র বলিয়াছি। ইহা বি শ্ব ভা র তী প ত্রি কা য় (বাঙলা) বাহির হইবে।

বারাণ্ডাটি কত সঙ্কীর্ণ তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন জানেন। ইহারও মধ্যে ছোট্ট একটি টেবিল ও চেয়ার পাতিয়া তিনি আনন্দে কাজ করিয়া যাইতেন। তখন তিনি কোণার্কে। এখানেও তিনি একটি ছোট ঘরে বসিয়া কাজ করিতেন। এক দিন গিয়া গুরুদেবকে দেখিতে পাইলাম না। যে ঘরে তিনি থাকিতেন সেখানে ছিলেন না। এ-ঘর সে-ঘর দেখিতেছিলাম, তিনি কোথায় আছেন চাকরটি বলিয়া দিল। গুরুদেব যে-বাড়ীতে থাকিতেন যত দূর সম্ভব তাহার এখানে-সেখানে এটা-সেটা অদল-বদল প্রায় লাগিয়াই থাকিত। তাঁহার জন্য আর একটা নূতন কুঠরি হইয়াছে। আমি যখন তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি বলিলেন "শাস্ত্রী মশায়, এবার আপনারা আমাকে খুঁজিয়া পাইবেন না!" আমি বলিলাম "রবিকে ঢাকিয়া রাখিবে কে? তাহার প্রকাশই তাহাকে দেখাইয়া দেবে!" ঐ কুঠরিটির ছাদ এত নীচু যে, গুরুদেব দাঁড়াইতেই পারিতেন না, মাথা ছাদে লাগিয়া যাইত। আমি বলিলাম "কীরূপে এ ঘরে থাকিবেন? মাথা যে ছাদে লাগিয়া যায়।" তিনি বলিলেন "মাথাটা নীচু করিয়া রাখাই ভাল।" তিনি অন্যত্র গাহিয়াছেন—"মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।"

মায়াজাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৪

গ্রামে সাধু-সন্ন্যাসী আসিলে সে খবর চাপা থাকিবার কথা নহে। সালঙ্কারে সবিস্তৃত সেই কাহিনী যোগমায়াও একদিন শুনিল। গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ দূরে—পানপাড়ার শ্মশান ঘাটে—এক সাধু আসিয়া ধুনি জ্বালিয়াছেন। যেমন রূপ সাধুর—তেমনই কি মিষ্ট কথা। যোগবলের অলৌকিক মাহাত্ম্যে তাঁহার বয়স নিরূপণ করিবার উপায় নাই। গ্রামস্থ অতি বৃদ্ধেরা শপথ করিয়া বলিতে পারেন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বছর দুই পূর্ব্বে এই সাধু একবার পানপাড়ার এই শ্মশান-ঘাটেই আসন করিয়াছিলেন। তখনও তাঁহার দেহবর্ণ তপ্তকাঞ্চনতুল্য ছিল, তখনও পিঙ্গল জটাভার, দাঁড়াইলে পায়ের গোড়ালিতে আসিয়া লুটাইত, যে ক'টি কুঞ্চন রেখা মুখের বিভূতি বিলেপনের মধ্য দিয়াও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সেদিন ঠাহর করা যাইত—আজও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তেমনই প্রশস্ত ললাট, আয়ত রক্তবর্ণ চক্ষু, বিস্তৃত বক্ষ ও আজানুলম্বিত বাহু। সেই মুখের হাসিটি তাঁহার অক্ষয় আছে ও সেই সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সেবার সন্ন্যাসী বেশী দিন থাকেন নাই। সংসারী মানুষের নানা প্রকার অভাব-অভিযোগের প্রবাহে—তিনি বিরক্ত চিত্তেই স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিলেন। তবে যাইবার পূর্ব্বে সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন—সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষার দিন আসিতেছে। সেই ভীষণ দিনে ঈশ্বরের চরণে শরণ লওয়া ছাড়া জীব যেন অন্য কার্য্য না করে। কারণ, মঙ্গলময় বিধাতার বিধান হাত দিয়া উল্টাইবার ক্ষমতা মানুষের নাই। সে এক অগ্নি পরীক্ষা গিয়াছে। বয়োবৃদ্ধেরা নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন, ইনিই সেই মহাত্মা।

সুতরাং তাঁহার মাহাত্ম্য বহুদিকে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল।

একদিন কুমুদিনী বলিল, যাবি যুগি, হাতখানা একবার দেখিয়ে আসি—চ।

যোগমায়া বলিল, না ভাই, আমার বড় ভয় করে। যদি সন্ন্যাসীঠাকুর কিছু খারাপ বলেন?

কুমুদিনী বলিল, জন্মালেই মানুষের মরণ আছে। যদি মৃত্যুর কথাই বলেন—

বাধা দিয়া যোগমায়া বলিল, মৃত্যু কেন ভাই, মরলে ত সব চুকেবুকেই গেল।

কুমুদিনী বলিল, বেশ, তুই না যাস—আমি যাব। একটু থামিয়া বলিল, ছেলেগুলোর ভাগ্যে কি আছে—জানতে ভারি ইচ্ছে করে। ওরা যদি সুখী হয়—

যোগমায়া বলিল, ওদের হাত দেখে উনি যদি খারাপ কিছু বলেন?

কুমুদিনী বলিল, আমি মন বেঁধেছি ভাই। কথায় বলে না:

অল্প শোকে কাতর।
অধিক শোকে পাথর।

আমারও হ'য়েছে তাই। যার ধন তিনি যদি নেন—কি করব ভাই।

যোগমায়া খানিক কি ভাবিয়া বলিল, তবে চ—

আমিও যাই। যা থাকে কপালে। হাত না দেখাই—কিছু উপদেশ শুনলেও মনটা ঠাণ্ডা হবে।

গঙ্গাস্নানের নাম করিয়া দুই সখীতে প্রাতঃকালে পানপাড়ায় রওয়ানা হইল। পরিচিত পথ। দু'ধারে আমবাগান ও মাঠ। পথে হাঁটুভোর ধুলা। ফাল্গুনের মাঠে শস্যাঙ্কুর নাই, যত দূর চোখ যায় ধূ ধূ করিতেছে। আমবাগানের মধ্যে রাশি রাশি ঘেঁটু ফুল ফুটিয়া আছে। ভোর বেলায় মৌমাছিরা গুন্ গুন্ শব্দ তুলিয়াছে। ঘেঁটু ফুলের সুগন্ধও বাহির হইতেছে। আমের বউল ঝরিয়া ছোট ছোট গুটি বাহির হইয়াছে, ঘেঁটুফুলের গন্ধের সঙ্গে তাহার মিষ্ট গন্ধও পথ চলিবার কালে ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আকুল করিয়া তুলে। শিমুল গাছে বড় বড় লাল লাল ফুল ফুটিয়াছে। কোথাও কোন গৃহস্থবাড়ির উঠানে বাতাবী লেবুর ফুল ফুটিয়া এই পথের ধারে সেই ঘন সুগন্ধকেও বহিয়া আনিয়াছে। অশ্বত্থের কচি পাতায় হাওয়ার কাঁপন সুরু হইয়াছে; লাল লাল পাতাগুলি আগুনের শিখার মত বায়ুর সুখস্পর্শে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। আকাশ নীল।

কিন্তু এসব দিকে যোগমায়ার দৃষ্টি ছিল না। পানপাড়ার সুউচ্চ তটভূমির সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া দুইজনেরই বুক গুরু গুরু কাঁপিয়া উঠিল। তটভূমি হইতে দেখা যায়—গঙ্গাবক্ষের ক্ষীণকায় নৌকাগুলি পাল তুলিয়া স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে। উঁচু পাড়ের নীচেয় উচ্ছে পটোলের ক্ষেত। বড় বড় রুক্ষ মাটির ঢেলার উপর ক্ষীণকায় উচ্ছেগুলা দেহভার ন্যস্ত করিয়াছে, বালুর সমুদ্রে পটোলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারাগুলি সবে ডগাগুলি বাহির করিতেছে। কুমড়ার লতা চক্রাকারে মাটির ঢেলাগুলি ঘিরিয়া ফেলিতেছে এবং তরমুজ কাঁকুড়ের লতায় ফুল ধরিয়াছে।

স্নানের ঘাট হইতে শ্মশানঘাট আধ মাইল রাস্তা।

কুমুদিনী বলিল, চ আগে সাধু দেখে আসি। শ্মশানের রাস্তাটাও ত ভাল নয়, এসে চান্ করলেই হবে।

ওদিকে পা বাড়াইতে যোগমায়ার বুক কাঁপে কেন? অন্তর্যামী সাধু যদি কোন অশুভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করেন? যদি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মত কোন ভাবী প্রলয়ঙ্কর ঘটনার আভাস দিয়া অন্তর্হিত হন? যদি তীব্র দৃষ্টিতে যোগমায়ার পানে চাহিয়া···না না, যোগমায়া কিছুতেই তাঁহার পানে চাহিতে পারিবে না।

কুমুদিনীর আঁচল চাপিয়া ধরিয়া সে অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, না ভাই, ফিরে চ।

কুমুদিনী সবিস্ময়ে পিছন ফিরিয়া কহিল, তুই ভয় পেয়ে গেছিস বুঝি? সাধু-সন্ন্যাসী কি লোকের খারাপ করেন? ভালই করেন ওঁরা।

কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসীর মন্দ করিবার কাহিনীও যোগমায়া অনেক জানে। অবশ্য ইচ্ছা করিয়া উঁহারা কাহারও অমঙ্গল করেন না। কিন্তু লোকে অনবধানতাবশতঃ উঁহাদের অনাদর করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই ডাকিয়া আনে। যাঁহারা লোকের মনে কোথায় কি হইতেছে—চোখের এক পলকের চাহনিতে বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের কাছে ক্ষুদ্র এতটুকু ভয়, তাচ্ছিল্য বা পাপ গোপন থাকিবার কথা নহে। সন্ধ্যা-বন্দনার সময় অতিক্রান্ত হয় দেখিয়া ঋষিধর্ম্ম পালনের জন্যই ত ব্যাকুলা জরৎকারু ঋষির নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছিলেন। পুরস্কার মিলিল—মুনির অভিশাপ! সশিষ্য দুর্ব্বাসার পারণ-দিনে শ্রীকৃষ্ণ না থাকিলে শূন্য অন্নথালি লইয়া দ্রৌপদীকে কি অভিশাপের মুখেই না পড়িতে হইত! অন্যমনস্কতার দরুণ স্বামীচিন্তা-ব্যাকুলা শকুন্তলা সেই অভিশাপের অনলে নির্দ্দোষী হইয়াও ত দগ্ধ হইলেন! অষ্টাবক্রকে উপহাস করিতে গিয়া যদুবংশের ধ্বংসের বীজ রোপিত হইল। আর কর্ণের অজ্ঞানকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত—মেদিনী কর্ত্তৃক রথচক্র-গ্রাস। এমন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত যোগমায়ার মনে পড়িয়া গেল। তবুও সম্মুখের পা দু'খানি আগাইয়া গেল। অমঙ্গলভীরু মন কেবলই বিমুখ হইতে লাগিল।

শ্মশানভূমির পাশ কাটাইয়া বড় শিমুল গাছটার তলায় আসিলেই আশ্রম দেখা যায়। গোটাচারেক ঘনপল্লবিত বট অশ্বত্থ গাছের তলায় ছোট একখানি চালাঘর। চালার সামনে হাত পঞ্চাশেক জমিতে নানা জাতীয় দেশী ফুল। চালায় প্রবেশ করিবার মুখে বাখারি দিয়া একটা গেটও কে তৈয়ারি করিয়া দিয়াছে। গেটের মাথায় অপরাজিতা ও মাধবীলতা ঘন হইয়া আশ্রমের শোভাবৃদ্ধি করিতেছে। মাসখানেক হইল সাধু এখানে আসিয়াছেন। এই অত্যল্প কালের মধ্যে গঙ্গার তীরে শান্তরসাস্পদ এক তপোবন গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই চালার উঁচু দাওয়ায় বাঘছাল বিছাইয়া ভস্মবিলেপিত দেহ কৌপীনধারী সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন।

সন্ন্যাসীর সম্মুখে ক্ষুদ্র জনতা। এক দিকে পুরুষেরা বসিয়া আছেন—অন্য দিকে মেয়েরা। রূপ আছে বটে সন্ন্যাসীর—ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। তেজঃপুঞ্জ কলেবর, সহাস্য আনন, কোমল চক্ষু। চক্ষুর দৃষ্টি যদি তীক্ষ্ণ হইত—যোগমায়া সেদিকে চাহিতে পারিত না। জনতার পিছনেই যোগমায়া ও কুমুদিনী মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিল।

অন্তর্যামী সন্ন্যাসী সহাস্যে চাহিয়া কল্যাণ বাণী উচ্চারণ করিলেন। কি গম্ভীর সুস্নিগ্ধ বাণী। যোগমায়ার মনের যত কিছু ভয়—উদ্বেগ—দ্বন্দ্ব সেই বাণীর প্রশান্তিতে ধুইয়া মুছিয়া গেল। কুমুদিনীর কানে কানে সে বলিল, উনি বুঝতে পেরেছেন, নয়?

কুমুদিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, পারবেন না। ওঁরা কি না বুঝতে পারেন।

সন্ন্যাসী তখন বলিতেছিলেন:

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় গৃহ্ণাতি নরোঽপরানি—এই মৃত্যু কেমন? না, যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে মানুষ নূতন বস্ত্র পরিধান করে—তেমনি আত্মাও জীর্ণ দেহ ত্যাগ ক'রে নূতন দেহ আশ্রয় করে। আত্মার বিনাশ নাই।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি, নৈনং দহতি পাবক:—

এই আত্মা অস্ত্রের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয় না, আগুনে তাকে দগ্ধ করা যায় না, জল বায়ু কোন কিছুর দ্বারাই সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না।

কে একজন প্রশ্ন করিল, আচ্ছা বাবা, আত্মা যদি ধ্বংস হয় না, তবে অকাল মৃত্যু কেন? যে দেহ জীর্ণ হয় না—সে দেহ ত্যাগের জন্য আত্মা চেষ্টা করে কেন?

সাধু বলিলেন, দেহ জীর্ণ হওয়া না-হওয়া আমরা কি বুঝবো। কর্ম্মফল অনুসারে মানুষের ভোগ। এক জন্মের কর্ম্মফল জন্মান্তর অনুসরণ করে। তা যদি না হবে ত—এই জন্মে পাপ কাজ ক'রেও কাউকে দেখলাম সুখে কাটিয়ে গেল—কেউ দিনরাত ঈশ্বরকে ডেকেও অনন্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করলেন।

প্রশ্ন হইল, যদি আমরা মনে করি এই জন্মের সঙ্গেই সব শেষ?

সন্ন্যাসী বলিলেন, আমরা তাই ত মনে করি। তা মনে করি বলেই আমাদের এত দুঃখ। এই দুঃখ ঠেকাবার একমাত্র পথ হচ্ছে দিব্যজ্ঞান। সে দিব্যজ্ঞান আসবে কোথা থেকে? মন থেকে। মনের রাজ্য যিনি জয় করতে পেরেছেন—তিনি পরম যোগী।

কিন্তু মনকে জয় করাই যে সব চেয়ে শক্ত।

শক্ত বলেই ত গীতায় ভগবান বলেছেন:

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহম্ চলম্

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।

অভ্যাসের দ্বারাই মনকে বশীভূত করা যায়। মন বশীভূত না হলে আত্মোপলব্ধি হয় না। আমি কে? কোথা থেকে আসছি—যাবুই বা কোথায়? এই জিজ্ঞাসাই হ'ল—আত্মোপলব্ধির প্রথম সোপান।

অতঃপর সন্ন্যাসী জন্মান্তর রহস্য, আত্মা পরমাত্মা তত্ত্ব, জগৎসৃষ্টির হেতু ও জীবের কামনাময় কর্ম্মফলের পরিব্যাপ্তি অনেক কথাই বলিয়া যাইতে লাগিলেন। বেলা বাড়িতে লাগিল, জনতাও সেই তত্ত্বকথার অন্তরালে গা ঢাকা দিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। সন্ন্যাসীর তন্ময়ত্ব আজ অসীম। তিনি শূন্য শ্মশানভূমিকে উদ্দেশ করিয়াই এই পরম রহস্যময় গুহ্য কথা বলিয়া যাইতে যেন লাগিলেন। যে তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়াও মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে, যে কথার ধ্বনিতে অতীন্দ্রিয় জগতের আভাস পাইয়া মানুষ সুখ-দুঃখ ভুলিয়া যায় এবং যে আত্ম-উদ্বোধনের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হইয়া মানুষ সংসারের আর এক স্তর উর্দ্ধে উঠিয়া ভ্রূমধ্যস্থিত জ্যোতির্বিন্দুর দর্শনাশায় যোগবিভূতির আশ্রয় লইবার জন্য ব্যাকুল হয়। শ্মশান-বৈরাগ্যের মত এই আত্মোপলব্ধিও ক্ষণিকের। গঙ্গার ঐ উচ্চ তটভূমিতে পা রাখিলেই সাধুমুখবিনিঃসৃত এই পরম বাণীও মহাব্যোমের শব্দতরঙ্গে অর্থহীন শব্দসমষ্টিতে পরিণত হয়। তবু মন্ত্রমুগ্ধের মত যোগমায়া ও কুমুদিনী শেষ পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল। এক জন পুত্রশোকের আঘাত ভুলিয়া আর এক জন দারুণ দুঃখকষ্টের আবর্ত্তকে তুচ্ছ করিয়া আকাশের মধ্যপথগামী আদিত্যের কথা ভুলিয়া গেল।

সাধু সস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বেলা হয়েছে, ঘরে যাও মা।

কুমুদিনী বলিল, বাবা, একবার হাতখানা দেখুন, আর কত দুঃখকষ্ট সইব?

—দুঃখ? কিসের দুঃখ মা! যখনই দুঃখ পাবি, মনে করবি, তোদের দুঃখকষ্ট সেই একজন বুক পেতে নিচ্ছেন। তিনি না নিলে মানুষের সাধ্য কি সহ্য করে।

—তবু মন বোঝে না, বাবা।

—বোঝা মনকে। তোর সুখ তোর দুঃখ সেই এক জনের পায়ে ফেলে দে। নিজের বলে কিছু রাখিস নে। জলকে কেউ হাত দিয়ে বেঁধে রাখতে পারে? সময়কেও কেউ পারে না। সময়ে গাছের ফল পাকে, ঝরে পড়ে। অসময়েও পড়ে। যা হবে—কেউ তাকে রোধ করতে পারে না, মা। যখন কিছু হবে—ভাববি তিনি করছেন। তা হ'লেই শান্তি পাবি।

যোগমায়া বলিল, আমায় মন্তর দেবেন বাবা?

সন্ন্যাসী হাসিলেন, মন তৈরি না হ'লে মন্ত্র নিয়ে কি হবে মা? আগে মন তৈরি হোক, গুরু আপনি আসবেন। তোর মন চাইছে সংসার, মন চাইছে সুখ সাধ। মুখে মন্ত্র আওড়ে কোন শান্তি হবে না মা। যারা দু-নৌকায় পা দেয়—তারা ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারে না। আর ঈশ্বরে

ভরসা রাখতে পারে না বলেই সংসারেও শান্তি পায় না।

কুমুদিনী বলিল, সংসারে জড়িয়ে চিরকালই বদ্ধ থাকব আমরা? মুক্তি পাব কবে?

মুক্তি? সন্ন্যাসী হাসিলেন, সংসারের বাইরে মুক্তি কোথায় মা? সংসারের মধ্যেই ত তোমাদের মুক্তি। তোমরা যা পারবে—তাই দেবে। ভক্তি। শুধু ভক্তি আর বিশ্বাসের মধ্যেই তোমাদের মুক্তি মিলবে মা। সংসারের বাইরে যে মুক্তি তা কি ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়? জান ত ভরত ঋষির উপাখ্যান?

যোগমায়া প্রণাম করিয়া অশ্রু গদ্ গদ কণ্ঠে কহিল, জানি।

পথ চলিতে চলিতে কুমুদিনী বলিল, লোকে বলে সন্ন্যাসীঠাকুর হাত গুনতে জানেন, কিন্তু কিছুই তো বললেন না।

যোগমায়া শুধু বলিল, তবু ভাই, ওঁর কথায় আজ ভারি শান্তি পেলাম। হাত গুনিয়ে কি এর চেয়ে শান্তি পেতাম—ভাই?

৫

আশ্চর্য্য, যেমন মনে প্রশান্তির একটু ছায়া পড়িয়াছে, অমনই যোগমায়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। হরিপুর যেন চোখের সম্মুখ হইতে নিবিয়া যাইতেছে, শ্বশুরবাড়ির ভিটা আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

তারিণী বলিল, আজ কি তোমার শরীর ভাল নেই, ঠাকুরঝি? কিছুই তো খেলে না।

বিন্দু-পিসি ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, খাবে কি বাছা, ডাঁটা চর্চ্চড়িতে যে দু'বার নুন দিয়ে মরেছি! দেখলাম তরকারির রঙটা স্যাঁক্ সেঁকে—

যোগমায়া বলিল, না নুন তেমন লাগছে না। তবু কেমন খেতেও ইচ্ছে করছে না। একটু থামিয়া বলিল, কতদিন হ'ল এখানে এসেছি, বউ?

তারিণী বলিল, কতদিন আর, এই তো সেদিন!

বিন্দু-পিসি বলিলেন, তা হবে বৈকি মেয়ে। আমিও এলাম গোপালপুর থেকে—তুমিও—

তারিণী তাঁহার পানে চাহিয়া ধমকের সুরে কহিল, তুমি থাম। ত্রয়োদশীর দিন ঠাকুরঝি এলো—অনেক দিন হ'ল?

তথাপি অবুঝের মত বিন্দু-পিসি বলিলেন, তারপর পূর্ণিমে গেল, আমাবস্যে গেল—

—গেল তো গেল! লোকজন এলে তোমার ভাল লাগে না—তা জানি। কাঁড়ি কাঁড়ি ভাল তরকারি তো খেতে পাও না।

যোগমায়া বলিল, থাম না—বউ? ভারি তো তরকারি।

বিন্দু-পিসি কহিলেন, রাঁড় মানুষের খাওয়ার আর আছে কি মেয়ে? না মাছ, না দুধ। এই তো শাক-পাতা, তাও যদি—

তারিণীকে থামাইয়া যোগমায়া বলিল, এখানে ভাল লাগছে না কেন জান, বউ? ঘরে অথর্ব্ব শাশুড়ী, আমার জা তো সব গুছিয়ে করতে পারে না।

তারিণী হাসিয়া বলিল, তা নয় ঠাকুরঝি। ছেলে-মেয়ের জন্ম তোমার মন কেমন করছে। তা তোমারও অন্যায় ঠাকুরঝি। বিমলের না হয় ইস্কুল আছে—সেখানে রইলো, গৌরীকে কেন নিয়ে এলে না সঙ্গে ক'রে? কোলের মেয়ে—মা ছাড়া হ'য়ে থাকতে পারে কখনও!

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, ঠাকুমার ন্যাওটো কি না, তাই মার কষ্ট হবে ভেবে ওকে আনলাম না। তা ছাড়া যা দুষ্ট মেয়ে।

তারিণী বলিল, তা নয়, ঝাড়া হাত পা হ'য়ে এসেছ, আমাদের পর মনে ক'রো বলে।

যোগমায়া বলিল, পর! পর মনে করার এতে কি হ'ল, বউ। পরই যদি মনে করবো তো এলাম কেন এখানে। যোগমায়ার স্বর অশ্রুরুদ্ধ হইল।

তারিণীর চোখেও জল আসিল। তাড়াতাড়ি ভাতের গ্রাস গিলিয়া সে বলিল, সত্যি বলছি ঠাকুরঝি, আমরা গরিব, তাই অনেক কথা মনে হয়।

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, আমিও তো গরিবের মেয়ে—গরিবের বউ। চাকরির পয়সায় যাদের ভাল জামা কাপড় গহনা জোটে—তাদের বড়লোক বলে না, বউ।

তারিণী বলিল, তুমি রাগ করলে ঠাকুরঝি?

—রাগ নয় ভাই, মনে ভারি কষ্ট হ'ল। রাজভোগ খাব বলে তো বাপের বাড়ি আসি নি—

বিন্দু-পিসি বলিলেন, তা বটেই তো। দুজ্জয়ে শোক—

তারিণী সকাতরে যোগমায়ার হাত ধরিয়া কহিল, আমি বুঝতে পারি নি, ঠাকুরঝি।

বিন্দু-পিসি বলিলেন, আমিও ওর কথা ধরি নে, মেয়ে। তারিণী যতই ক্যাঁট ক্যাঁট ক'রে বলুক, ছেলেমানুষ তো!

সত্য বলিতে কি, চোখের জলের মধ্য দিয়া যোগমায়া আজ তারিণীকে নূতন করিয়া চিনিল। সংসারের অভাব তারিণীর মনের মধ্যেও বাসা পাতিয়াছে। সামান্য আনাজ-পাতির উপর এই প্রীতি, বিন্দু-পিসিকে কটু বাক্য বলা, সংসার গুছাইবার নামে এই কার্পণ্য—সবেরই মূল ভিত্তি

ঐ অভাব। এবং এ কথাও সত্য—মেয়েকে না লইয়া আসার মূলেও হয়ত ভাইয়ের সংসারের এই দিকটার কথাই যোগমায়া এক সময়ে ভাবিয়াছিল। এখানে আসিয়াও তারিণী তাহার সঙ্গে মিশিতে পারে নাই। শোকবিহ্বলা যোগমায়ার এক একবার মনে হইত, তারিণীর এই যত্ন-পরিচর্য্যা কাছে না টানিয়া ব্যবধানই গড়িয়া তুলিতেছে দিন দিন। এ পিত্রালয় নহে। ভাইয়ের সংসার, এবং সেই সংসারে যোগমায়া কয়েক দিনের অতিথি মাত্র। অনেক দিন আগেকার কথা মনে পড়িল। শ্বশুরবাড়ি হইতে আসিলে—মায়ের সেই সযত্ন পরিচর্য্যা। সেই পরিপাটি করিয়া ভাত বাড়িয়া, বাটিতে ডাল ও পাঁচ রকম ব্যঞ্জন সহযোগে মেয়েকে সম্মানীয়া কুটুম্বিনীর মত খাওয়াইবার প্রচেষ্টা! বিবাহ হইলেই চিরদিনের পরিচিত সংসার হইতে কন্যার যে নির্ব্বাসন ঘটে—সেই ইঙ্গিতই বুঝি এই সযত্ন পরিচর্য্যার মধ্যে পরিস্ফুট। তবু মায়ের বেলায় সে কথা ভাবিতে পারে নাই যোগমায়া। চিরদিনের জন্য যে মেয়ে পৃথক্ হইয়া পড়িল—পিত্রালয়ে তাহার আদর-যত্ন—বিশেষ করিয়া মায়ের আদর-যত্ন—সে তো সন্তানস্নেহেরই রূপান্তর। সেখানে মর্য্যাদার প্রশ্ন আসে না, শ্বশুরবাড়ির সম্ভ্রম-ঐশ্বর্য্যের কথাও নহে, ঘটনার তরঙ্গে পৃথকীভূত মেয়েকে বুকে জড়াইয়া ধরিবার ব্যাকুলতা—পরিচর্য্যার নানা আকারে প্রকাশ পায়। সে কালের সেই সদ্য-কুমারীজীবনোত্তীর্ণ যোগমায়া সে কথা হয়তো বুঝিতে পারিত না, কিন্তু আজ জননী যোগমায়ার ভুল হইবে কেন?

চোখের জলে তারিণী নিকটে আসিলেও সেই দিন অপরাহ্ণে যোগমায়া বলিল, কাল-পরশুই যাব ভাবছি, বউ। শাশুড়ী একলা রয়েছেন।

—না। তারিণী দৃঢ়স্বরে বলিল, আর দু'দিন তোমায় না রেখে আমি কিছুতেই যেতে দেব না।

—কেন ভাই!

—জানি না কেন। কষ্ট ভুগতে এসে যে কষ্ট নিয়ে যাবে সে হবে না, ভাই। এই মাসটা তোমার থেকে যেতেই হবে।

যোগমায়া আপত্তি করিল না, একটু হাসিল মাত্র।

কিন্তু পরের দিন দুপুরবেলায় গৌরীকে লইয়া বিমল উপস্থিত। সঙ্গে সে গাড়িও আনিয়াছে।

যোগমায়া শুষ্কমুখে বলিল, হঠাৎ এলি যে বিমল?

—বাঃ রে, কাকিমা যে বাঘনাপাড়ায় চলে গেলেন। ঠাকুমা বললে তোর মাকে নিয়ে আয়, নইলে ইস্কুলের ভাত দেবে কে?

ও-বাড়ির বউ চলে গেল? হঠাৎ যে?

পরশুই তো, তাঁর ভাই এসে উপস্থিত। বললেন, জমির কি গোলমাল হয়েছে—তোমার সই না হ'লে মিটবে না, তাই ত গেলেন।

—কবে আসবে কিছু বলে গেছে?

—তা আমি কি জানি।

মামাতো ভাই ফণি আসিয়া গৌরীর কাছে দাঁড়াইল। খানিক তাহার পরিচ্ছন্ন ও জমকালো বেশভূষার পানে চাহিয়া মৃদু স্বরে কহিল, এই,—তোমার জামায় হাত দেব?

গৌরী ঘাড় বাঁকাইয়া কোঁকড়া চুল নাচাইয়া বলিল, কেন হাত দেবে?

—তোমার জামা যে চক্ চক্ করছে। বাঃ, ভারি নরম তো। বলিয়া সন্তর্পণে দুটি আঙুল দিয়া সে গৌরীর জামার হাতাটি টানিয়া ধরিল।

গৌরী ঘাড় বাঁকাইয়া ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল, ইঃ, তোমার হাতে যে ময়লা, আমার জামা খারাপ হয়ে যাবে না বুঝি?

যোগমায়ার কানে গৌরীর অভিযোগ যাইতেই সে বলিল, দাদা হয়, দিলেই বা জামায় হাত।

দাদা হয়? তবে যে দাদা বললে, মামার বাড়ি যাচ্ছি?

তারিণী হাসিয়া বলিল, মামার বাড়িই তা। আমি যে তোমার মামী হই। বলিয়া আদর করিয়া গৌরীর গাল টিপিয়া দিল।

গৌরী হাততালি দিয়া বলিল, দাদা, সেই ছড়াটা বলবো? বলি? বলিয়া বিমলের চক্ষুর নিষেধ-ইঙ্গিত সত্ত্বেও আরম্ভ করিল:

> তাই, তাই, তাই—মামার বাড়ী যাই
> মামার বাড়ী ভারি মজা—কিল চড় নাই।

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, তোর নিজের বাড়িতে রোজ কত কিল চড় খাস—গৌরী?

গৌরী সে কথায় কান না দিয়া ছড়া আবৃত্তি করিতে করিতে সদ্য-সম্পর্কিত মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

তারিণী বলিল, শাশুড়ী তোমার একলা রয়েছেন, না হলে কিছুতেই ছাড়তাম না, ঠাকুরঝি।

যোগমায়া বলিল, আবার আসবো, বউ।

—তোমার ত কথা। সংসার ঘাড়ে পড়লে আর এসেছ!

যোগমায়া বলিল, সত্যি বউ, সংসার হয়েছে পায়ের বেড়ি। আগে শাশুড়ীর মাথায় ছিল সংসার, যেখানে খুশী গিয়েছি—এসেছি। আজ নিজের সংসার হয়ে নিজের পায়েই পরেছি বেড়ি। তা জগদ্ধাত্রীর পুজোর সময় তুমিও একবার যেয়ো না—বউ।

তারিণী বলিল, যেতে ত সাধ হয়, কিন্তু ওই অসাব্যস্ত মানুষ নিয়ে আমার হ'য়েছে জ্বালা। এমন খাবেন যে পেটের অসুখ যখন-তখন। সাধ ক'রে কি টিক্ টিক্ করি, ঠাকুরঝি। ঐ যে আসছেন।

বিন্দু-পিসি ঘুঁটের ঝুড়ি উঠানের এক পাশে রাখিয়া বলিলেন, হাঁ গা মেয়ে, দুয়োর গোড়ায় ঘোড়াগাড়ি দাঁড়িয়ে কেন?

আমি যাচ্ছি পিসিমা? বলিয়া হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল।

আহা, থাক, থাক। এমনিতেই আশীর্ব্বাদ করছি—রেতের প্রাতঃবাক্যে বেঁচে থাক। জন্ম এয়োস্ত্রী হও—পাকাচুলে সিঁদুর পর। তারিণী, চুলটা বেঁধে—একটু আলতা সিঁদুর পরিয়ে দে বাছা। এইস্ত্রী মানুষ—অমনি ট্যাং-টেঙিয়ে যাবে কি।

—পিসিমা, আপনি একবার আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন।

—দেব বৈকি মেয়ে, দেব বৈকি। তারিণীর সংসার নিয়ে কি আমার নড়বার জো আছে। কচিকাচা···তা যাব শীতকালে। নলেন পাটালি গুড় উঠুক, খাসা মোয়া উঠুক—

তারিণী মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, তাই যেয়ো। খাসা মোয়া উঠলেই যেয়ো।

উৎসাহিত হইয়া বিন্দুপিসি বলিলেন, আহা, ডাক-সাইটে মোয়া! সেই তোর সাধের সময় পাঠিয়েছিল মেয়ে এখনও যেন জিবে লেগে আছে! বলিয়া জিহ্বা দ্বারা সংক্ষিপ্ত একটি 'চুক্' শব্দ করিয়া চুপ করিলেন।

বিদায়ের আয়োজন সর্ব্বত্রই সমান। হৃদয়ের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠুক আর নাই উঠুক বিষাদের একটি ম্লান ছায়া সকলের মুখেই ভাসিয়া উঠে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত এই ভাষার অর্থগ্রহণ করিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। মামাতো ভাইদের লইয়া গৌরী আগেই গাড়ি চাপিয়া বসিয়াছে। এবং গাড়ি চড়িবার আনন্দে পথের অস্পষ্ট অনেক কথা সে অনর্গল বলিয়া চলিয়াছে। মামাতো ভাইয়েরা গৌরীর সঙ্গী হইবে মনস্থ করিয়াছে। উহারাও সেই আমবাগানের পাশ দিয়া—ঘুটঘুটে অন্ধকার-ভরা তেঁতুল গাছটার তলা দিয়া, বক ও হাঁসে ভরা পুকুর দেখিতে দেখিতে গৌরীদের শহরে গিয়া পড়িবে। শহর নহে ত কি! রাস্তায় এমন হাঁটু ভোর ধুলা নাই, কত গাড়ি চলে, কত কোঠা ঘর আছে, রোজ সন্ধ্যাবেলায় কে রাস্তায় আলো জ্বালিয়া দেয়, ইস্কুলের ঘণ্টা বাজে, ঠাকুরের আরতি হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিদায়-প্রণাম সারিয়া তারিণী ছেলেদের উদ্দেশ করিয়া বলিল, আয়, নেমে আয় বলছি সব।

তাহারা প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া আপত্তি করিল।

তারিণী কোমল কণ্ঠেই বলিল, কাল তোদের গাড়ি করে ঠাকুরঝিদের বাড়ি দেখিয়ে আনব। লক্ষ্মীটি—নাম।

বড়ছেলে মণি ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, ইস্, মিথ্যে কথা! রোজই ত বল গাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে যাব। যাও নাকি?

—আচ্ছা নাম ত, এবার সত্যি নিয়ে যাব।

অবাধ্য ঘোটকের মত ঘাড় বাঁকাইয়া ছেলে বলিল, না।

এবার কোমল কণ্ঠস্বর রক্ষা করা তারিণীর পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। শাসনের সুরে সে বলিল, মণে নাম বলছি—

মণি যোগমায়ার পানে চাহিয়া দৃঢ় ভাবে ঘাড় দোলাইয়া বলিল, ইস্, নামবে বইকি?

তারিণী দুই পা আগাইয়া আসিয়া কহিল, দেখবি হতভাগা ছেলে, তোর হাড় এক ঠাঁই—মাস এক ঠাঁই ক'রে দেব। নাম বলছি।

মণি করুণ নয়নে যোগমায়ার পানে চাহিয়া বলিল, ও পিসিমা।

যোগমায়া তারিণীকে বলিল, আমি ওদের বোঝাচ্ছি—বউ। পরে ছেলেদের পানে ফিরিয়া আঁচলের গ্রন্থি খুলিতে খুলিতে বলিল, যে আগে নামবে সে একটা টাকা পাবে।

মুখের কথা বাহির হইতে যা বিলম্ব। হুড়মুড় করিয়া মণি ও ফণি নামিয়া পড়িল, এবং দুই জনেই যোগমায়াকে ঘিরিয়া কলরব তুলিল, আমি আগে নেমেছি পিসিমা—আমি আগে নেমেছি।

এই আগে-নামার স্বত্ব প্রমাণ করিতে দুই জনের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হইতেই যোগমায়া দুই জনের হাতেই দুইটি টাকা দিয়া সব বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দিল।

—তবে আসি বউ। গাড়িতে বসিয়া, যোগমায়া জন্ম-ভিটার পানে সজল নয়নে চাহিয়া রহিল।

ঘড় ঘড় করিয়া গাড়ি অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছু

দূর অগ্রসর হইলে তারিণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এই মণে—এই ক্ষণে, দে বলছি টাকা আমার হাতে। হারিয়ে ফেলবি কোথায়—তুলে রাখি বাক্সে।

—হাঁ—তোমায় দিলে আর দেবে কিনা! পরক্ষণেই ছেলে দুইটির বিকট চীৎকারে যোগমায়া গাড়ি হইতে মুখ বাড়াইয়া সেই দিকে চাহিল। পথের ধুলায় পড়িয়া ছেলে দু'টি হাত-পা ছুঁড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে আর গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিতেছে। তারিণী ধীর পদে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

বিমল বলিল, আমি দেখতে পেলাম মা, মামীমা হাত মুচড়ে ওদের কাছ থেকে টাকা কেড়ে নিলে।

যোগমায়া বিমলের পানে চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিল, নিলে বলতে নেই, নিলেন বলতে হয়।

গৌরী বলিল, হাঁ মা, মামীমা কেড়ে নিলেন! (ক্রমশঃ)

বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের বিচিত্র পরিণতি

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম কি ভাবে কত দূর পর্যন্ত প্রতিপালিত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে সাহিত্যিক-সমাজে কোনও স্পষ্ট মত বা ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে সাধারণতঃ এ বিষয়ে একটা গভীর ঔদাসীন্য ও উপেক্ষার ভাব বর্তমান রহিয়াছে মনে হয়। তাহারই ফলে, আজকাল আর বাংলা পত্র-পত্রিকায় ভাষার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তেমন আলাপ-আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না।[১] সত্য বটে, স্বর্গত পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রভৃতির সংকলিত বাংলা ব্যাকরণে অনেক সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধানের চেষ্টা রহিয়াছে। কিন্তু নানাক্ষেত্রে ইঁহাদের অগণিত মতভেদ[২] দেখিলেই বুঝা যায় সমস্যা কত দূর কঠিন ও বহুল আলোচনার কত বেশী প্রয়োজন। তাহা ছাড়া, ঠিক ব্যাকরণের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না এমন বহু বিষয়ের বিচার ও মীমাংসার প্রয়োজনও পদে পদে অনুভূত হয়। নানা বিষয়ে ইংরেজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় শব্দ-সমূহের সুষ্ঠু অনুবাদ ইহাদের মধ্যে প্রধান[৩]। নানা প্রসঙ্গে নিত্য নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করা আজ বিভিন্ন বিভাগে বাঙ্গালী সাহিত্যিকের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। একই ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন শব্দ সৃষ্টি করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই একজনের উদ্‌ভাবিত শব্দ আর একজনের নিকট নানা কারণে গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। তাই সাহিত্যক্ষেত্রে এক বিরক্তিকর বিপর্য্যয় জনসাধারণকে বিচলিত করিয়া তোলে। বস্তুতঃ, সমস্যা এত বহুমুখী যে সকল বিষয়ের আভাস দেওয়াও একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। সেই জন্য, আমি বর্তমান প্রবন্ধে উহার একটি দিক্‌ মাত্র অবলম্বন করিয়া সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব।

সংস্কৃত ব্যাকরণের কতকগুলি নিয়ম কি ভাবে বাংলায় অজ্ঞানতঃ বা ভাষার স্বাভাবিক গতিতে উপেক্ষিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে—কোন কোন নিয়ম অনেকটা অলক্ষিত ভাবেই কিরূপে বাংলার উপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে তাহারই ইঙ্গিত দেওয়া আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। নিয়মলংঘনের মধ্যেও এমন একটা শৃঙ্খলা বা ধারা দেখিতে পাওয়া যায় যাহাতে এগুলিকে ভুল বলিয়া ঘোষণা করিতে সাহস হয় না—তাহা ছাড়া, ভুল বলিলেই যে বাংলার লেখকবর্গ নির্বিবাদে সেই নির্দেশ মানিয়া চলিবেন এমন ভরসাও কম। তাই প্রকৃত অবস্থাটা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাই ভাল—তাহার পর, লেখকগণ যথা-রুচি কার্য করিতে পারেন। আশ্চর্যের বিষয়, সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব যে-সব স্থানে পরিস্ফুট বলিয়া মনে হয় সে সকল ক্ষেত্রেও সর্বত্র বাংলার ব্যাকরণকারদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সেজন্য সে সকল স্থলেও অনুরূপ ব্যাখ্যার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। তাই সে দিকেও

১। এ সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বানান-সমস্যা' ও 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা' পুস্তিকা দুইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২। অল বেঙ্গল টিচার্স য়্যাসোসিএশনের বাংলা মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্যের' মাঘ (১৩৪৮) সংখ্যায় 'সমাস' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩। এই প্রসঙ্গে 'শব্দতত্ত্বে' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ-চর্চা ও শব্দচয়ন প্রবন্ধ, রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডে (৫৭৯-৮০) প্রকাশিত রবীন্দ্র-নাথের আলোচনা, ভারতীতে (১৩১২ বৈশাখ, পৃঃ ৮৯) প্রকাশিত 'সহানুভূতি ও সহধর্মিতা' শীর্ষক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ ও 'বান্ধবে' (১৩১১, চৈত্র, পৃ. ৫৬৬-৯) প্রকাশিত তাহার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

আমি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। আধুনিক সাহিত্যে নানা স্থানে যে সকল প্রয়োগ নজরে পড়িয়াছে বিনা পরিবর্তনে আমি সেগুলিকে উদাহরণরূপে উপস্থাপিত করিয়াছি। প্রতিপদের শুদ্ধি অশুদ্ধি লইয়া বিস্তৃত আলোচনার স্থান বা প্রসঙ্গ এখানে নাই। আমি এক্ষেত্রে সে চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছি। সংস্কৃত নিয়মে অশুদ্ধ পদের শুদ্ধ রূপও তাই প্রদর্শিত হয় নাই। সে কার্য স্বতন্ত্র পুস্তকে হইতে পারে—প্রবন্ধে নহে।

গালভরা শব্দ ব্যবহারের দিকে আধুনিক বাংলার একটা প্রবণতা এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা দরকার। এই জন্যই, অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রত্যয়াদি ব্যবহারে বাংলার স্বাতন্ত্র্য। শানচ্, স্ত্রী প্রত্যয়, ষ্ণিক প্রত্যয় ও ক্যঙ্ প্রত্যয় ব্যবহারে অত্যধিক ঝোঁক—ক্ত প্রত্যয় ব্যবহারে বাংলার বৈশিষ্ট্য—বিশেষ্যের পর ব্যবহৃত তা প্রত্যয়ের বৈচিত্র্য—'নিঃ' শব্দের অর্থান্তরে ব্যবহার এবং বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণের পরপদরূপে প্রয়োগ—এই সকল ব্যাপারেই এই প্রবণতার আভাস পাওয়া যায়। ইহারই বশবর্তী হইয়া সাধারণ লেখক সংস্কৃত বৈয়াকরণের মর্ম-বেদনার কারণ হইয়া থাকেন। সমর্থ সাবধান ব্যক্তি এই প্রবণতা ক্ষুণ্ন না করিয়াও সংস্কৃত ব্যাকরণের মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন কিনা এবং তাহা রক্ষা করার জন্য যথোচিত চেষ্টা করা উচিত কিনা সে বিষয়ে সাহিত্যিকদিগের স্থির ভাবে বিচার করা দরকার। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই প্রবণতার অনুসরণে রচিত শব্দগুলি অধিকাংশ স্থলেই অতি আধুনিক—প্রাচীন বাংলায় এ জাতীয় প্রয়োগ অজ্ঞাত না হইলেও বিরল।

'কোন কাজ চলিতেছে' বিশেষণ পদের সাহায্যে ইহা বুঝাইবার জন্য সংস্কৃতে শতৃ ও শানচ্ নামক দুইটি প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাচীন ও চলতি বাংলায় শতৃ প্রত্যয়ের বাংলা রূপের নিদর্শন উঠন্ত, পড়ন্ত, বাড়ন্ত, জলন্ত, চলন্ত, ঘুমন্ত, পড়তি বেলা, বহতা নদী প্রভৃতি শব্দের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাহিত্যে বা সাধু ভাষায় এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায় না। তাহার স্থলে শানচ্ প্রত্যয়ের অত্যধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে এই প্রত্যয় কেবল আত্মনেপদী ধাতুর পরই ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু বাংলায় সে নিয়ম মানা হইতেছে না। এমন কি শব্দের পরও এই প্রত্যয় ব্যবহার করিয়া 'অস্তমান' শব্দ প্রয়োগ করা হইতেছে। এই প্রত্যয়ের বহু আধুনিক প্রয়োগের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে—চলমান, ভ্রাম্যমাণ, মুহ্যমান, প্রবহমান, ভাসমান, ধাবমান, মজ্জমান, উদীয়মান, আবহমান কাল, প্রশংসমান দৃষ্টি, অগ্রসরমান সৈন্য, 'অপসৃয়মান জনসঙ্ঘ'। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শব্দগুলির মধ্যে অনেক স্থলেই প্রত্যয় আত্মনেপদী ধাতুর পর ব্যবহৃত হয় নাই। 'অপসৃয়মান' কথাটি কলিকাতায় বিগত ডিসেম্বর মাসে বোমাপতনের সময় কোন সংবাদপত্রে ব্যবহৃত হইয়াছিল—কিন্তু কি ভাবে ইহা গঠিত হইল বুঝা যায় না। এই প্রসঙ্গে বক্ষ্যমান শব্দটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। আকৃতি দর্শনে ইহাও বর্তমান কাল বুঝাইতে কেহ কেহ ব্যবহার করিতেছেন—কিন্তু সংস্কৃতে ইহা ভবিষ্যৎ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। বর্তমান অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহার আসল অর্থ 'যাহা বলা হইবে'।

স্ত্রীপ্রত্যয়ের প্রয়োগে বাংলার অত্যধিক ঝোঁকের কথা আমি প্রবন্ধান্তরে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছি।[৪] শত-বার্ষিকী, স্মৃতিবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, জয়ন্তী, চয়নিকা, চলন্তিকা, সঞ্চয়িতা, রবিদীপিতা, ঐতিহাসী, ব্যাকরণিকা প্রভৃতি অসংখ্য শব্দে—পুংলিঙ্গের বিশেষণ রূপেও—যে স্ত্রীপ্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে ও হইতেছে অন্তিম দীর্ঘস্বরের সাহায্যে শব্দের ধ্বনিগৌরব সম্পাদন ব্যতীত তাহার আর কি সার্থকতা থাকিতে পারে? 'নী' বা 'ইনী' প্রত্যয়ের সাহায্যে বাংলায় শব্দ-গঠনের যে আগ্রহ দেখা যায় তাহার মূলেও শব্দকে প্রসারিত করিয়া তাহার ধ্বনি-গাম্ভীর্য সৃষ্টির অভিলাষ রহিয়াছে মনে হয়। উদাহরণ—অভাগিনী, ননদিনী, সুকেশিনী প্রভৃতি।

বিশেষ্য পদকে বিশেষণরূপে ব্যবহার করিবার জন্য আজকাল দুইটি প্রত্যয় বেশী ব্যবহৃত হয়—ষ্ণিক ও ক্যঙ্ প্রত্যয়। সংস্কৃতেও ইহাদের এত অধিক প্রয়োগ দেখা যায় না। প্রত্যয় দুইটি ব্যবহার করিতে গিয়া সংস্কৃত নিয়মের দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হয় না—ক্যঙ্ প্রত্যয়টির বেলায় ত, ঠিক কি ভাবে বলিতে পারি না, প্রত্যয়ের অর্থেরও পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। বাংলায় ইহা এখন 'যুক্ত' অর্থেও ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। অথচ এই অর্থের কোনও সন্ধান সংস্কৃত ব্যাকরণে পাওয়া যায় না। 'ম্লানায়মান', 'ঘনায়মান', 'শ্যামায়মান'[৫] প্রভৃতি শব্দের মধ্যে মূল সংস্কৃত অর্থ বর্তমান আছে সত্য কিন্তু এলায়িত, রূপায়িত, লীলায়িত, আলুলায়িত, তরঙ্গায়িত, দীর্ঘায়িত এবং রবীন্দ্রনাথের বহুশাখায়িত ও অলঙ্করণ-রেখায়িত

৪। দেশ—২৮শে পৌষ ১৩৪২।

৫। কিন্তু 'পুঞ্জীয়মান' শব্দটি কি ভাবে তৈয়ার হইয়াছে বলিতে পারি না।

(বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ—পৃঃ ৯) প্রভৃতি শব্দে মূল অর্থ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক, স্বাদেশিক, আন্তঃপ্রাদেশিক প্রভৃতি শব্দে ষ্ণিক প্রত্যয়ের ব্যবহার শব্দগুলিকে ফাঁপাইয়া তুলিয়াছে সত্য, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এগুলি বিশুদ্ধ ও শ্রুতিমধুর হইয়াছে বলা চলে না। স্থানভেদে যোগ্যতানুসারে 'ষ্ণ' বা 'ঈয়' প্রত্যয়ের দ্বারা বেশ কাজ চলিতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলনের সময় এই দুইটি প্রত্যয় ব্যবহার করিয়া অনেক স্থলে বেশ সুবিধা হইয়াছে। বর্ণের বিশেষণ 'বার্ণ' ও 'বার্ণিক', রবিবাসরের বিশেষণ 'রবিবাসরিক' ও 'রবিবাসরীয়' এই দুই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি ভাল সাহিত্যিকগণ বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। তাহা ছাড়া, ষ্ণিক প্রত্যয় ব্যবহারে যে অশুদ্ধির আশঙ্কা অন্য স্থলে তাহা নাই।

ক্ত প্রত্যয় ব্যবহারে বাংলার ধ্বনিগৌরব বৃদ্ধির প্রবৃত্তি নানা উপায়ে চরিতার্থ করা হয়। মূল ধাতুকে অকারণে ণিজন্ত করা, ধাতুর উত্তর অস্থানে ইকার যোগ করা, প্রসঙ্গ ব্যতিরেকেও ক্ত প্রত্যয়ের ব্যবহার ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বিস্তৃত স্থলে বিস্তারিত, প্রস্তুত স্থলে প্রস্তারিত, খাত স্থলে খনিত, আবৃত স্থলে আবরিত,[৬] বিবৃত স্থলে বিবরিত, সিক্ত স্থলে সিঞ্চিত, বিতীর্ণ স্থলে বিতরিত, পূর্ণ স্থলে পূর্ণিত, একত্র মিলিত স্থলে একত্রিত, সুরভি স্থলে সুরভিত, উৎফুল্ল স্থলে উৎফুল্লিত, প্রফুল্ল স্থলে প্রফুল্লিত, স্পৃষ্ট স্থলে স্পর্শিত, কৃষ্ট স্থলে কর্ষিত, ব্যূঢ় স্থলে বিবাহিত প্রভৃতি বাংলায় ক্ত প্রত্যয়ের দ্বারা শব্দের আয়তনবৃদ্ধির দৃষ্টান্ত।

সকর্মক ধাতু ক্ত প্রত্যয়ান্ত হইলে তাহা কর্মের বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সর্পদষ্ট বলিতে আমরা দষ্ট পুরুষকেই বুঝি—দংশনকর্তা সর্পকে বুঝি না। কচিৎ ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ এই ব্যতিক্রমকে সমর্থন করিবার জন্য বিপুল আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। চলতি বাংলায় কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—শ্রুত আছি, জ্ঞাত আছি, তুমি ভুক্ত না অভুক্ত, আমি চেষ্টিত আছি, তিনি অস্বীকৃত হইলেন, দেবনরগন্ধর্বকিন্নর বিদিত হে বাহুবল তব (গিরিশচন্দ্র—জনা ১।৩)। সংস্কৃত-রসিকের নিকটও বাংলার এই প্রয়োগগুলি বিশেষ কৌতূহলের বিষয় সন্দেহ নাই।

বিশেষ্য পদের পর পুনরায় বিশেষ্যদ্যোতক তা-প্রত্যয় যোগ করিয়া নিশ্চয়তা, নির্ভরতা, বৈরতা, প্রসারতা প্রভৃতি শব্দ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য শব্দের আয়তন বৃদ্ধি ছাড়া আর কি হইতে পারে? অবশ্য বিশেষ্য বিশেষণের সূক্ষ্ম ভেদ বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে রক্ষিত হয় না। তাই বিশেষণের পর আবার বিশেষণদ্যোতক প্রত্যয় জুড়িয়া দিয়া কুশলী, সুরভিত প্রভৃতি পদ গঠন করা হয়। বিশেষ্য পদকে বিশেষণ-রূপে ব্যবহার করিয়া প্রামাণ্য গ্রন্থ, তিনি মৌন রহিলেন, আশ্চর্য হইলেন, চমৎকার বই, রক্তিম আভা, উন্মাদ লোক, উৎসর্গীকৃত প্রভৃতি প্রয়োগ বহুত্র দেখা যায়। বিধেয় স্থলে এরূপ প্রয়োগ গিরিশচন্দ্রের লেখায় প্রচুর দেখা যায়। যথা—রণসাধ অবসাদ যদি ধনঞ্জয়, আজি যুদ্ধে হবে পরাভব, শীঘ্র সাজি রণসাজে হইব উদয়, পাণ্ডব গৌরব রবি বুঝি অবসান, মহাবীর হইল নিপাত (জনা)। বস্তুতঃ এজাতীয় প্রয়োগ বাংলার রীতিবিরুদ্ধ নহে। আবার বিশেষ্যপদের স্থানে বিশেষণের প্রয়োগও অপরিচিত নয়—যথা, নৈরাশ্য স্থলে নিরাশা, হতাশ ভাব স্থলে হতাশা, বৈরাগ্য স্থলে বিরাগ। বিশেষণ পদকে বিশেষ্যরূপে কল্পনা করিয়াই মনোমুগ্ধকর, আইনঅমান্যকারী, দুস্তরতারিণী, মান্যবান (বা মান্) ব্যক্তি, আবশ্যক নাই প্রভৃতি প্রয়োগের প্রচলন হইয়াছে কিনা কে বলিবে? সম্প্রতি বিশেষণকে বিশেষ্যরূপে ব্যবহারের আর একটা রীতিও দেখা যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

> তারো স্বভাবের গভীরে
> অসাধারণ যদি কিছু লুকিয়ে থাকে কোথাও।

অথবা

> তুমি হয়ত নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে
> দুঃখের চরমে শকুন্তলার মত।

বিশেষ্যবিশেষণের ভেদের উপেক্ষাই নিঃ ও বি শব্দের বাংলায় ব্যবহৃত 'অভাব' (negation)[৭] অর্থের মূলে রহিয়াছে কিনা অনুসন্ধান করা দরকার। বিশৃঙ্খলা, বিধর্মী, বিদেশী, বিরথী, বিরাগ, নিষ্করুণ, নিরুদ্দিষ্ট, নিঃসঙ্গী, নিরলস, নিরাশা, নির্লিপ্ত, নির্বিরোধী, নিরুদ্বিগ্ন, নিরপরাধী, নির্দোষী, নিরহঙ্কারী, নির্বারিত (রবীন্দ্রনাথ), নিরাসক্ত, নিশ্চঞ্চল (রবীন্দ্রনাথ) প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে অচল

৬। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যের প্রথম সংস্করণে এই দুইটি শব্দই ব্যবহার করিয়াছিলেন (পৃঃ ৩৪ ও ৪৪)। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে উহারা সংশোধিত হইয়াছে। তবে আবরিত শব্দ তাঁহার আধুনিক লেখায়ও দেখা যায়।

৭। 'নিঃশেষ' বা 'সম্পূর্ণ' অর্থেও 'নিঃ' শব্দের প্রয়োগ চলতি বাংলায় একেবারে অজ্ঞাত নহে। যথা—নিশ্চপ, নিষ্কালী, নিখালী (পূর্ববঙ্গ)

হইলেও বাংলায় 'সচল।' সচল, সচকিত, সশঙ্কিত, সক্ষম, সঠিক, সকাতর, সকরুণ (রবীন্দ্রনাথ—প্রাচীন সাহিত্য, পৃ: ৩৫) প্রভৃতি স্থলে 'স' 'সহ'র বিকৃতি না আতিশয্য-বাচক স্বতন্ত্র শব্দ? 'সহ'র বিকৃতি বলিয়া ধরিলে প্রয়োগগুলি সমস্তই সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে অশুদ্ধ অথবা এগুলিকে সমর্থন করিতে হইলে 'চল' প্রভৃতিকে বিশেষ্য বলিয়া ধরিতে হয়।

বাংলায় ব্যবহৃত বহুব্রীহি সমাসের একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত বৈশিষ্ট্য হইতেছে বিশেষণ পদের পরপদ-রূপে ব্যবহার। সাধু এবং চলতি দুইরূপ শব্দের মধ্যেই এই জাতীয় প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। আপাত-দৃষ্টিতে এগুলি বিসদৃশ বোধ হইলেও ইহাদের দ্বারা সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম লংঘন করা হইয়াছে এমন বলা চলে না। বস্তুত: সংস্কৃত সাহিত্যেও এরূপ পদ দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে এগুলি আহিতাগ্নিজাতীয় পদ। সুতরাং বাংলায় এই পদগুলি শুদ্ধ বলিয়া প্রতিপাদন করার জন্য কেহ কেহ যে ইহাদিগকে বিভিন্ন সমাসের মধ্যে ফেলিয়াছেন তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। এবার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি - অশ্রুবিগলিত আঁখি, পট্টবস্ত্র-পরিহিতা রমণী, আত্মবিস্মৃত জাতি, মতিচ্ছন্ন পুরুষ, জ্ঞানহত, বুদ্ধিহত (ভারতচন্দ্র ও বলরাম কবিশেখর)। এ ছাড়া চলতি বাংলায়—ঘোমটাপড়া বা ঘোমটাখোলা মেয়ে, আলপনা-আঁকা আসন, ফুলতোলা রুমাল, ঘরছাড়া ছেলে, গোলাভরা ধান ইত্যাদি।

শব্দের গাম্ভীর্য রক্ষার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় বাংলায় বহুব্রীহিনিষ্পন্ন কতকগুলি অকারান্ত শব্দ আকারান্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা—অভাগা, হতভাগা, দুর্ভাগা (রে মোর দুর্ভাগা দেশ—রবীন্দ্রনাথ)। মহারাজ স্থলে মহারাজাও অনেকটা এই জাতীয়। সংস্কৃত নিয়মানুসারে যেখানে আকার হওয়া উচিত এরূপ স্থানে আবার ঈকারের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। অস্ত্যর্থক ইন্ প্রত্যয়ের ব্যবহারের ইচ্ছা হইতেই এরূপ প্রয়োগের সৃষ্টি হইয়া থাকিতে পারে। উদাহরণ—সহকর্মী, স্নেহধর্মী, বিধর্মী, জীবাণুনাশধর্মী (বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন)। সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী 'স্নেহধর্মা' প্রভৃতি পদ বাংলায় আদৌ দেখা যায় না।

আর দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সমাসবদ্ধ পদসমষ্টির মধ্যে পরস্পর সন্ধি না করার একটা প্রথা বর্তমানে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, আধুনিক বাংলায় এরূপ স্থলে সন্ধি করিলেই যেন বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। সত্য সত্যই, ব্যাকরণের শাসনসত্ত্বেও 'প্রতিষ্ঠা-উৎসব' না বলিয়া 'প্রতিষ্ঠোৎসব' বলিতে কানে ঠেকিবে। অন্য দিকে, সন্ধি না করিলে শব্দের আয়তন সংক্ষেপ না হওয়ায় উহার ধ্বনিগাম্ভীর্য সুরক্ষিত হয়।

পূরণার্থক শব্দগঠনে সাধুভাষায় অনেক স্থলে শব্দের কোনও পরিবর্তনই করা হয় না। বিংশতিতম অথবা বিংশ না লিখিয়া অনেকেই বিংশতি অধিবেশন লিখিতে দ্বিধা বোধ করেন না। ইহার অবশ্য বিশেষ কোনও যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

বর্তমান আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে সংস্কৃতের অনুকরণের স্পৃহা বাংলায় ব্যাপকভাবে বর্তমান। এই অনুকরণের ফলে অনেক বিকৃত শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। তবে বিকৃতি সকল স্থলেই ভাষার প্রকৃতির বিরোধী নহে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য হইতে এ সম্বন্ধে আরও অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। তবে উদাহরণের দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি ও পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি করিতে চাই না। বাংলার সাহিত্যিকবর্গের ভাবিয়া দেখা দরকার সংস্কৃত ব্যাকরণের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করিয়া বাংলা ভাষার গৌরব রক্ষা করা কতটা সম্ভব। যদি তাহা আংশিকভাবেও সম্ভবপর হয়—কাহারও কাহারও লেখা দেখিলে তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না—তাহা হইলে, সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম লংঘন করা উচিত কিনা—লংঘন করিলে ভাষায় যথেচ্ছচারিতার প্রবর্তন হইলে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলে ভাষা ক্রমশ দুর্বোধ হইয়া পড়ে, না সকলে এক নিয়ম মানিয়া চলিলে ভাষা বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হয় তাহা ধীরভাবে ভাবিয়া দেখা এবং সেই অনুসারে কাজ করা দরকার। জীবনের কোনও ব্যাপারেই কেবল প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকা শোভন ও সঙ্গত নয়। অবশ্য পদে পদে প্রকৃতির বিরোধিতা করিলেই যে মঙ্গল হইবে এমন কথাও কোন স্থিরচিত্ত ব্যক্তিই বলিবেন না। প্রকৃতির খেয়াল ভাবুকের চিত্ত মুগ্ধ করে—বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের রূপবৈচিত্র্যও অনেক স্থলে বিশেষ কৌতুকজনক। সংস্কৃত ভাষার দীর্ঘ ইতিহাসে এরূপ বৈচিত্র্য নূতন নহে। তবে সে বৈচিত্র্যেরও একটা ধারা আছে। তাহা লক্ষ্য করা উচিত।

স্বর্গীয়া মনোরমা দেবী

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০৬ সালের ৩১এ ডিসেম্বর আমি এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসে চাকরী লইয়া এলাহাবাদে গিয়া উপস্থিত হই। তখন পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এলাহাবাদে প্রবাসী ছিলেন। তিনি সদ্য কায়স্থ পাঠশালার প্রিন্‌সিপ্যালের পদ পরিত্যাগ করিয়া মডার্ন রিভিয়ু বাহির করিয়াছেন। তখন কলিকাতায় কংগ্রেস হইতেছিল। রামানন্দবাবু কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্য কলিকাতায় ছিলেন। আমি অপরিচিত স্থান এলাহাবাদে তাঁহারই ভরসায় গিয়াছিলাম এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ প্রবাসী পত্রের লেখক হিসাবে তাঁহারই গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিব স্থির করিয়া গিয়াছিলাম। আমি তাঁহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার অনুপস্থিতিতেও আমার অভ্যর্থনার কোনো ক্রটি হইল না। কেহ আমাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন না, আমার নাম-ধাম-পরিচয় কিছু জানিতে চাহিলেন না, আমি রামানন্দবাবুর গৃহে আতিথ্যপ্রার্থী বাঙালী ইহাই আমাকে আশ্রয় দানের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হইল। পরে যখন কথা-প্রসঙ্গে আমি আমার নাম বলিলাম, তখন তো সমাদরের আর অন্ত রহিল না, আমি যেন এই পরিবারের কত দিনের পরিচিত আত্মীয় এমনই ভাবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের চক্ষুতে কৌতূহল ও আনন্দ উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইতেছিল, কারণ আমি গল্প লিখি, তাহাদিগকে গল্প বলিয়া পরিতুষ্ট করিবার মতন একজন লোককে তাহারা নিজেদের বাড়ীর মধ্যে অকস্মাৎ পাইয়া গিয়াছে।

রামানন্দবাবু চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছেন। মডার্ন রিভিয়ু বাহির করিয়া নূতন আয়ের প্রচেষ্টা সবে আরম্ভ করিয়াছেন। গৃহিণীর মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে সতর্কতা আমার চোখে পড়িতে বিলম্ব হইল না। ছেলেদের মাথার চুল কাটা হইয়াছে, কিন্তু খুব সমানভাবে হয় নাই; দেখিয়াই বুঝিলাম ইহা নাপিতের হাতের অভ্যস্ত কর্মের নিপুণতার সাক্ষ্য দিতেছে না। মেয়েদের সেমিজ মোটা মার্কিন কাটিয়া ও ব্লাউজ জোলার বোনা ছোট শাড়ী কাটিয়া তৈরি হইয়াছে, এবং কাপড়ের পাড় ব্লাউজের হাতায় ও গলায় বসানো হইয়াছে, এবং তাহাতেও দর্জির দক্ষ হাতের সাক্ষ্য নাই। অভ্যাগত অতিথিকে যে জল-খাবার ও আহার্য্য দেওয়া হইল তাহাও খুব অনাড়ম্বর, অপরিচিতের কাছে মিথ্যা মর্য্যাদা দেখাইবার জন্য গৃহস্থালীর ব্যবস্থায় একটুও ব্যতিক্রম করা হয় নাই। খাদ্য অবশ্য পুষ্টিকর।

আমি মনে করিয়াছিলাম যে কয়েক দিন রামানন্দ বাবুর বাড়িতে থাকিয়া কোথাও একটা বাঙালীর মেস দেখিয়া সেইখানে চলিয়া যাইব। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোনো মেসে স্থান পাইতেছিলাম না। আমি কুণ্ঠিত হইতেছিলাম। কিন্তু রামানন্দবাবু আমার সঙ্কোচ দূর করিয়া দিয়া বলিলেন যে—"আপনি একটুও কুণ্ঠিত হইবেন না, আপনি যত দিন কোথাও ভালো বাসস্থান না পাইতেছেন, তত দিন আমার এখানেই স্বচ্ছন্দেই থাকুন।" এক দিকে ব্যয় সঙ্কোচের জন্য মিতব্যয়িতা, অপর দিকে ভারতের চিরন্তন দাক্ষিণ্য অতিথি-সৎকার, এই পরিবারে সমন্বিত হইয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম।

তখন শ্রীমতী সীতা দেবী অত্যন্ত ছোট। একরত্তি বালিকা আমার জন্য প্রকাণ্ড থালায় করিয়া যখন আমার আহার্য্য লইয়া আসিতেন, তখন আমি ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া পড়িতাম, এবং তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া তাঁহার হাত হইতে থালা তুলিয়া লইতাম। আমি এক দিন তাঁহাকে বলিলাম, "তুমি এই বিদেশে আমাকে মায়ের মতন যত্ন করিতেছ, তুমি আজ হইতে আমার মা।" গোল্ড্‌-স্মিথের বর্ণিত গ্রাম্য পুরোহিতের কাছে যেমন যে-কেহ Claim'd kindred there, and had his claims allow'd, তেমনি আমারও এই আত্মীয়তার দাবী এই পরিবারে অনায়াসেই স্বীকৃত হইয়া গেল; সেই দিন হইতে সীতা হইলেন মা, এবং সেই সম্পর্কে শান্তা হইলেন মাসীমা এবং তাঁহাদের মাতা হইলেন দিদিমা। এই সম্পর্কের জোরে আমি শীঘ্রই তাঁহাদের বাড়ির এক জনের সামিল হইয়া গেলাম। এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হইল যখন আমি প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রের সহকারী সম্পাদক হইয়া কলিকাতায় গেলাম। এইরূপে এই পরিবারের সকলের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল তাহার ফলে সকলেরই স্বভাব-চরিত্রের পরিচয় পাইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং সেই যে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইয়াছিল।

এই পরিবারে সকল ছেলেমেয়েরই আচারে ব্যবহারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু সতর্ক মাতার শ্যেন দৃষ্টি সতত সন্তানদিগকে সুপথে পরিচালিত করিত। কখনো তিনি কোনো সন্তানকে তিরস্কার করিতেন না, কেবল মাত্র তাঁহার আদেশ ও নির্দ্দেশই তাঁহাদিগকে সুপরিচালিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তাঁহাকে কখনো কোনো দাসদাসীকে ভর্ৎসনা করিতে শুনি নাই, কখনো তিনি উচ্চকণ্ঠে কথা বলিতেন না। কেহ খুব অন্যায় করিলে তাঁহার ললাট যেরূপ কুঞ্চিত ও চক্ষে যে ভ্রূকুটি হইত তাহা দেখিলেই সেই অন্যায়কারীর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিত। তিনি অতি শান্ত স্বরে অথচ দৃঢ়ভাবে তাহার দোষ প্রদর্শন করিয়া আস্তে আস্তে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিতেন যে তাহার সংসর্গ তাঁহার সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। এই দৃঢ়তাকে অফিসের কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া পাড়াপ্রতিবেশী নরনারী সকলেই সসম্ভ্রমে ভয় করিত। তিনি প্রত্যহ অফিসের আয়ব্যয় পরীক্ষা করিতেন এবং অপব্যয় বা হিসাবের গরমিল সহ্য করিতেন না।

তাঁকে কখনো সাংসারিক অভাবের বা শারীরিক মানসিক কোনো রকম ক্লেশের সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে শুনি নাই। অথচ স্বামীর বা কোনো সন্তানের একটু অসুখ হইলে তাঁহার মুখে যে চিন্তার ছায়া ঘনাইয়া আসিত তাহা দেখিলেই তাঁহার মনের ব্যাকুলতা বুঝিতে পারা যাইত। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র প্রসাদ বা মুলুর অকাল মৃত্যুতে তাঁহার মনে যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহা তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই।

তিনি কোনো লোককে কটু কথা বলিতেন না বলিয়া তাঁহার ছেলেমেয়েরাও কটু কথা বলিতে জানিত না। সীতা যখন খুব ছোট, তখন তাঁহার দিদির উপর খেলা লইয়া আড়ি হয়, এবং তিনি দিদির প্রতি ক্রোধ জানাইয়া গালি দিয়াছিলেন, "দিদি, তুমি তুই।" এই তুই কথাটাই বালিকা সীতার কাছে চরম গালি বলিয়া মনে হইয়াছিল। এই কাহিনী আমার কাছে শুনিয়া কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত "প্রথম গালি" নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন।

দিদিমা তাঁহার স্বামীর সহধর্ম্মিণী ছিলেন সর্ব্বতোভাবে এবং সহধর্ম্মিণী শব্দ তাঁহাতে অন্বর্থ হইয়াছিল। কোনো রকমের সংস্কারই তাঁহার মনে আধিপত্য করিতে পারিত না, স্বামীর দৃষ্টান্তে তিনি সর্ব্বদা নিজের আচরণ পরিচালিত করিতেন। আবার তিনি স্বামীর সত্যনিষ্ঠা আদর্শনিষ্ঠা ন্যায়নিষ্ঠা ও স্বাধীনচিত্ততার জন্য সমস্ত প্রকারের অসুবিধা প্রসন্ন মনে স্বীকার করিয়া স্বামীকেও অকুণ্ঠিত চিত্তে সংসার-সংগ্রামে সাহায্য করিতেন।

স্বদেশের প্রতি তাঁহার বিশেষ দরদ ও কর্ত্তব্যবোধ ছিল। প্রবাসী বা মডার্ন রিভিউ পত্রে গভর্মেণ্টের কার্য্যের বা নীতির বরাবর নির্ভীক ভাবেই সম্পাদক বিচার করিয়া আসিতেছেন। ইহার জন্য মাঝে মাঝে বিপদের সম্ভাবনা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা শঙ্কিত চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছি, কিন্তু দিদিমাকে কখনো ব্যস্ত হইতে দেখি নাই। তিনি বলিতেন সত্য পথে থাকিয়া সত্য কথা বলিতে ও কর্ত্তব্য করিতে হইলে বিপদকে ভয় করিলে চলিবে কেন? যে বিপদকে ভয় করে সে কখনো সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে না।

মাসিক পত্র যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রকাশ করিবার জন্য মাঝে মাঝে আমাকে অসময়েও অফিসের কাজ করিতে হইত। এক এক দিন বিকাল বেলা পর্য্যন্ত আমি খাওয়ার অবসর পাইতাম না, এক এক দিন রাত্রি ১১টা ১২টা পর্য্যন্তও অফিসে থাকিতে হইত। দিদিমা ঘন ঘন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন আরও কতক্ষণ আমাকে কাজ করিতে হইবে। এক দিন একেবারে অপরাহ্ণ হইয়া গেল, তখনও কিছু খাইবার অবসর পাই নাই; অথচ ক্ষুধায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। আমি শ্রীমান্ অশোককে ও মজলী গাঙ্গুলীকে আমার অফিস ঘরের সামনে দিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহাদের অনুরোধ করিলাম আমাকে একখানা পাঁউরুটি কিনিয়া দিতে। তাঁহারা দয়া করিয়া ও বুদ্ধি করিয়া পাঁউরুটি একেবারে কাটিয়া ও টোস্ট করিয়া মাখন মাখাইয়া রেষ্টর্যাণ্ট হইতে আনিয়া দিলেন। আমি এক হাতে খাওয়ার কাজ ও অপর হাতে প্রুফ দেখার কাজ চালাইতে লাগিলাম। দিদিমা সংবাদ পাইলেন যে আমার সমস্ত দিন খাওয়া হয় নাই এবং আমি কাজ করিতে করিতে খাইতেছি। তিনি তখনই নীচে নামিয়া আসিয়া স্নেহপূর্ণ অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি কি রকম লোক বলুন তো। আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ, সারাটা দিন আমার বাড়িতে না খেয়ে উপোষ ক'রে রয়েছেন, তা আমাকে একটু বলতে নেই।" আমি হাসিয়া বলিলাম—বলিলে কি হইত? তিনি বলিলেন, "কেন, আপনাকে ভাত খাওয়াতাম।" আমি বলিলাম—"আপনাদের হওয়া-ভাতে আমি ভাগ বসালে তো আপনাদের কম পড়ত।" তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমি কি এমনই অকর্ম্মণ্য যে কম পড়লে আর চারটি ভাত রেঁধে নিতে পারতাম না?"

১৯০৭ সালে আমার writer's cramp হয়। আমি আর ডাহিন হাতে লিখিতে পারিতাম না। তখন আমি বাঁ হাতে লিখিতে অভ্যাস করিতে লাগিলাম। আমার উপার্জ্জনের প্রধান সম্বল হাত অকর্ম্মণ্য হইয়া যাওয়াতে তাঁহার যে চিন্তা ও সহানুভূতি পাইয়াছি তাহা আমার নিজের পরিবারের কাহারও নিকটে পাই নাই। কিছু দিন বাঁ হাতে লেখা অভ্যাস করার পরে ডাহিন হাতটা কিছু বিশ্রাম পাওয়াতে অল্পলিখন-ক্ষম হয়; তখন আমি পর্য্যায়-ক্রমে দুই হাতেই লেখা বা প্রুফ দেখার কাজ করিতাম। ইহা দেখিয়া তিনি আমাকে বলিতেন সব্যসাচী, এবং আমার ডাহিন হাত যে আবার কর্ম্মক্ষম হইতেছে ইহাতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করিতেন। খাইবার সময়ে আমার হাতে কিছু লাগিলে আমি অস্বস্তি বোধ করি, সেই জন্য আমি খুব সন্তর্পণে কেবল আঙুলের ডগা দিয়া খাবার তুলিয়া মুখে দি। ইহা আমার আবাল্যের অভ্যাস। এক দিন তিনি আমাকে এই রকম করিয়া খাইতে দেখিয়া চিন্তিত হইয়া বলিলেন—আহা! লিখতেই কষ্ট হতো, এখন আবার খেতেও অসুবিধা হচ্ছে! ও হাতটায় হলো কি?

তিনি আমার হিতৈষিণী ছিলেন। তিনি আমার আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য চিন্তিত হইতেন ও নানা রকম পরামর্শ দিতেন। তিনি আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন যে আমি আমার কন্যার অল্প বয়সেই বিবাহ দিব, না লেখাপড়া শিখাইয়া পরে বিবাহ দিব। আমার কন্যার বিবাহের ব্যয় ও আমার সন্তানদের লেখাপড়া শিক্ষার ব্যয় যে আমি কেমন করিয়া নির্ব্বাহ করিব তাহা ভাবিয়া তিনি চিন্তিত হইতেন। হঠাৎ যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার পরিবারের অবস্থা যে নিরাশ্রয় হইয়া যাইবে এই চিন্তাও তাঁহাকে ব্যাকুল করিত। নিঃসম্পর্ক লোকেরও শুভাশুভের জন্য তিনি চিন্তা করিতেন। আমি "মুদ্রারাক্ষস" নাম লইয়া "প্রবাসী"তে নূতন বইয়ের সমালোচনা করিতাম। অনেক সময়ে সমালোচনা খুব কড়া নির্ম্মম হইত। ইহাতে তিনি সেই অজ্ঞাত অপরিচিত লেখকের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেন; অনেক সময়ে ভয় প্রকাশ করিতেন যে অসন্তুষ্ট লেখকেরা আমাকে কোন দিন বা অপমান করে বা মারে।

এই মহীয়সী মহিলার প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া আমি তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল প্রার্থনা করি।

শিশু-সাহিত্য

শামসুন নাহার মাহমুদ, এম. এ.

যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য নানা ব্যাপারে, তেমনি শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধেও আধুনিক যুগ মানুষের চিন্তা-জগতে বিপ্লব নিয়ে এসেছে,—শিক্ষা-পদ্ধতিতে, সাহিত্যে তার পরিচয় সুস্পষ্ট। মানুষ চিরকাল জেনেছে, ভয় দেখিয়ে, শাস্তি দিয়ে, মারধর করে তবে ছেলেপিলেকে মানুষের মত মানুষ ক'রে তোলা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে প্রচারিত হ'ল এক অভিনব বাণী। সভ্য জগতের পিতামাতা বিস্মিত হয়ে শুনলেন যে সন্তানের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে আর যাই থাকুক না কেন, অন্ততঃ শাস্তি বা কড়াকড়ি শাসনের স্থান এতটুকু নেই; তা শুধু অপ্রয়োজনীয় নয় বরং রীতিমত ক্ষতিকর। ফ্রোবেল, মণ্টেসরী, প্রভৃতি মনীষী শিশুদের স্কুলে আগাগোড়া নতুন পদ্ধতি প্রচলন করলেন—যার ফলে তারা প্রচণ্ড শাস্তি ও উৎপীড়নের বদলে পেল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অপরিসীম আনন্দ। শিশু-চরিত্রের একটা প্রধান কথা হচ্ছে কৌতূহল, ইংরেজীতে যাকে বলা হয়েছে inquisitive instinct; বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মনে অসংখ্য প্রশ্ন নিত্য ভিড় ক'রে আসে। বাড়ীর এবং স্কুলের শিক্ষা আনন্দের ভেতর দিয়ে শিশুর এই কৌতূহলের খোরাক জোগাবে—আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা এই বলেন।

শিশুর এই শিক্ষার সঙ্গে অবশ্য শিশুসাহিত্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শিক্ষার তাৎপর্য্য বোঝাতে গিয়ে স্যার আর্থার কুইলার কাউচ বলেছেন—

"The meaning of education is a leading out, a drawing forth; not an imposition of something upon a child; but an eliciting of what is within him."

আধুনিক শিশু-সাহিত্য শাসন, উপদেশ বা নীতি-কথার চাপে শিশুর ভেতরকার সম্ভাবনাকে শুকিয়ে ফেলবে না—বরং তার কৌতূহলের খোরাক জুগিয়ে, তার

কল্পনার সীমাকে বিস্তৃত ক'রে, তার সমস্ত হৃদয়বৃত্তিকে, সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতাকে বিকশিত ক'রে তুলবে। শিশুর মধ্যে যে সম্ভাবনা বিকাশের অপেক্ষা রাখে, অনেক সময় চার থেকে ষোল বছর বয়সের মধ্যে তা ঠিক ধরা পড়ে না। এ প্রসঙ্গে একটা সুন্দর উপমা দিয়ে কোন লেখক কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। ধরুন, একজন ইংরেজ জীবনে আপেল খান নি। জুলাই মাসে কাঁচা আপেল খেয়ে তাঁর ধারণা হ'ল এ ফল শক্ত, টক, হজম করা কঠিন। কিন্তু সেই একই গাছের পাকা ফল অক্টোবরে খেয়ে ধারণা বদলাতে হ'ল। কারণ তখন দেখা গেল এর মত চমৎকার ফল আর নেই। ঠিক তেমনি চোদ্দ-পনর বছর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেপিলের যে যে গুণ বিকাশের অপেক্ষায় লুকান থাকে, যথাযোগ্য শিক্ষার ফলে যদি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সেগুলো ফুটে উঠবার সুযোগ পায় তাহলে এমনি চমৎকার একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যেতে পারে। শিশু-চরিত্রের এই বিকাশের ব্যাপারে সাহিত্যের দায়িত্ব কম নয়। শিশু-সাহিত্য বলতে আমরা এখানে শিশুমনস্তত্ত্বমূলক সমালোচনা-গ্রন্থ এবং শিশুদের স্কুলপাঠ্য পুস্তক, স্কুলের বাইরে পড়ার উপযোগী গল্প ও কাহিনী সবই আলোচনা করব।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন—'Heaven lies about us in our infancy.' সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যে এই ভাবটাই ছিল প্রবল। জন্ আর্ল একটা শিশুর চরিত্র আঁকতে গিয়ে তাকে পুরোপুরি স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু ব'লে কল্পনা করেছেন। তাদের এই মনোভাবের সঙ্গে আধুনিক শিশুমনস্তত্ত্ববিদদের ধারণার অবশ্য এক দিক থেকে খানিকটা মিল রয়েছে। স্রষ্টা যেমন উর্দ্ধে স্বর্গলোকে ব'সে বিচিত্র ঐশ্বর্য্যময় সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করছেন, তেমনি মানব সন্তানের মধ্যে নিহিত রয়েছে এক বিপুল সম্ভাবনা, তেমনি প্রকাশের আলোতে আসবার জন্য তারও ব্যাকুলতা,—আধুনিক শিশুমনস্তত্ত্বের এই-ই গোড়ার কথা। এই সম্ভাবনাকে বিকশিত ক'রে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য, সাহিত্যের লক্ষ্য।

মধ্যযুগের ইংরেজ সাহিত্যিকরা যতই শিশুকে 'স্বর্গচ্যুত দেবতা' বলে প্রচার করুন না কেন, মানুষের মধ্যে যে পাপের বীজ লুকানো আছে, তা তাঁরা ভুলতে পারেন নি। অষ্টাদশ, এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর শিশু-সাহিত্যেরও আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক শিক্ষাবিদ্ বলেছেন—

Children are mainly brought up on the assumption of natural vice. They might adore father and mother and yearn to be better friends with Papa; but there was the old Adam, a quickening evil spirit.

সে যুগের সাহিত্যেও তাই সব কিছু ছাপিয়ে ফুটেছে পাপের শাস্তি আর নরকের বিভীষিকা। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ The Fairchild Family নামক বইয়ের নাম উল্লেখ করা যায়। এতে দেখানো হয়েছে মিঃ ফেয়ারচাইল্ড তাঁর দুই ছেলেদের মাঠ-ঘাট অতিক্রম ক'রে নিয়ে গেলেন, যেখানে ফাঁসিকাঠে ঝুলছে এক পাপীর মৃতদেহ। তার নীচে দাঁড়িয়ে তিনি ছেলেদের বোঝালেন দুষ্টুমি করলে তাদেরও পরিণাম এ রকম হ'তে বেশী দেরি লাগবে না।

সে যুগের সাহিত্যিকরা সব সময় এমন চোখ রাঙিয়েই আছেন যে কালে-ভদ্রে যদি কেউ হাসবার চেষ্টাও করলেন, তাও যেন আমাদের কানে বিদ্রূপের মত শোনায়। শিশুর কল্পনার উপাদান বা হাসির খোরাক এঁরা যোগান নি। যদি কচিৎ হাসাতে গেছেন, তাকে ব্যর্থপ্রয়াস ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। Reading Without Tears নামক বইয়ে একটি গাধার গল্প বলা হয়েছে। তাতে কোন নীতি-কথা চাপাবার চেষ্টা নেই বটে, কিন্তু শিশুর কল্পনা-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে এই ধরণের গল্প একেবারেই নিরর্থক।

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য অন্য এক শ্রেণীর সাহিত্যও যে ছিল না তা নয়—যাতে শিশুর কল্পনার অবাধগতিকে সহায়তা করে। এই ধরণের সাহিত্যে—Perrault's Fairy Tales-এর অনুবাদ, M. Gulland-এর অনূদিত Arabian Nights প্রভৃতি বইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ফরাসী-বিপ্লবের আগেই এই শ্রেণীর বই অনেক লেখা হয়েছে। Grimm's Tales প্রকাশিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। বছর-দশেক পরে এডগার টেলর তার এক চমৎকার অনুবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর পিতামাতা সন্তানকে Three Bears, Snow-White, Sleeping Beauty প্রভৃতি গল্পের বদলে The Fairchild Family বা Reading Without Tears-এর মত বই-ই গেলাবার চেষ্টা করেছেন বেশী। শিশুর কল্পনা-শক্তির স্ফুরণ ও স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির বিকাশের দিকে পিতামাতার লক্ষ্য ছিল না মোটেই—যতটা ছিল নীতিবাদের দিকে ঝোঁক। উপকথা ও কাহিনী চাপা পড়ে যেত নীতি-উপদেশের তলায়।

মানুষের জীবনে বাস্তব সত্যের চেয়ে কল্পনার স্থান নীচে নয় মোটেই। প্রতিভাশালী চিত্তের সুর, রং ও ইঙ্গিতে বাস্তব সত্যের আধারে যে কল্পনার সৌধ গড়ে ওঠে তা-ই সাহিত্য। কিন্তু কল্পনা জিনিসটা শৈশবে যত প্রবল থাকে জীবনের অন্য কোন সময়ে অতটা নয়।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন :

Truth is important and imagination is important; but imagination developes earlier in the history of individual as in the history of race."

শৈশবের খেলাধূলায় শিশু কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে। কল্পনায় সে রাজা, উজির, কোতোয়াল—কত কি-ই না সাজে। এটা বাস্তব সত্য নয় কিন্তু কল্পনার সত্য—Truth of imagination; শিশু-চিত্তের স্বাভাবিক বিকাশের জন্যে বাস্তব সত্যের চেয়ে এই অবাধ কল্পনা কিছুই কম প্রয়োজনীয় নয়। শুধু খেলাধূলা নয়, সাহিত্যের ব্যাপারেও একই কথা খাটে। শিশুর চিন্তাশক্তিকে বাস্তব সত্যের পিঞ্জরে বন্দী ক'রে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা ঠিক ত নয়ই, বরং অবাধ বিকাশের অবকাশ দেওয়া প্রয়োজন, মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এ কথা বলেছেন।

স্যর ওয়াল্টার স্কট বলেন :

"There is also a sort of wild fairy interest in these tales which makes me think them fully better adapted to awaken the imagination and soften the heart of childhood than the Good Boy stories. Truth is, I would not give one tear shed over little Red Riding Hood for all the benefit to be derived from a hundred histories of Jemmy Good Child."

এ থেকে বোঝা যায় গত শতাব্দীর গোড়ার দিকেই ইউরোপের চিন্তাধারায় একটা পরিবর্তনের সূচনা দেখা গিয়েছে। কেউ কেউ মনে করেছেন—এই পরিবর্তনের জন্যে সব চেয়ে বেশী দায়ী ডেনমার্কের মনীষী Hans Christian Anderson।

"The better way with a child is to draw out, to educate, rather than to repress what is in him."

শিশু-শিক্ষা ও শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে এই নীতি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয় গত শতাব্দীর শেষ দিক থেকে। এই ব্যাপারে উপরোক্ত মনীষীর প্রভাব অনেকখানি কাজ করেছিল এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় শিশু-সাহিত্যের ধারা মোটামুটি আলোচনা করা হ'ল। এবার বাংলা-সাহিত্যের দিকে ফেরা যাক।

আধুনিক যুগে শিশু-মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে ইউরোপের চিন্তা-জগতে যে যুগান্তর এসেছে তারই আওতায় এ দেশের বর্ত্তমান শিশু-সাহিত্য গড়ে উঠছে। পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা এ দেশের সাহিত্যিকদের করেছে প্রভাবান্বিত। যেমন সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে, শিশু-সাহিত্যের ব্যাপারেও তেমনি, এ যুগের সাহিত্যিকদের দান একেবারে তুচ্ছ নয়, এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

মধ্য-যুগের বাংলায় শিশু-সাহিত্যপদবাচ্য তেমন কিছুই রচিত হয় নি। কিন্তু এ যুগের ঠাকুরমার ঝুলি ও ঠাকুরদাদার ঝুলির রূপকথাগুলির বনিয়াদ খুঁজতে হ'লে ফিরে যেতে হয় সেই সুদূর অতীতে। ডক্টর দীনেশ সেন মনে করেছেন কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালা, শীত-বসন্ত এ সব কাহিনী এ দেশে প্রচলিত ছিল মুসলমান-বিজয়েরও অনেক আগে। এ যুগের সাহিত্য পাশ্চাত্যের পটভূমিতে গড়ে উঠলেও রূপকথাগুলি এ দেশেরই নিজস্ব।

প্রাচীন কাল থেকে এ দেশে যে-সব ছেলে-ভুলানো মেয়েলী ছড়া প্রচলিত আছে তা-ও বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে গণ্য হবার দাবী রাখে। "শিশু প্রকৃতির সৃজন। কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে নিজকৃত রচনা; তেমনি ছড়াগুলিও শিশু-সাহিত্য; তারা মানব মনে আপনি জন্মেছে।" কোন্ প্রাচীন কালে যে এই ছড়াগুলো রচিত হয়েছে তার হদিস মেলা ভার। কিন্তু সহজ, স্বাভাবিক কাব্যরসে এই 'হাসিতে কান্নাতে অদ্ভুতে মেশানো' ভাঙাচোরা ভাষার ছড়াগুলো যুগে যুগে এ দেশের শিশুর মনোরঞ্জন ক'রে আসছে।

ছড়াগুলোতে কবিতার বাঁধুনি নেই, পারম্পর্য্য নেই, চরিত্র-বিশ্লেষণ নেই, কিন্তু তাতে শিশুর বিশেষ আপত্তিও দেখা যায় না। কারণ আর কিছু না থাকলেও ছড়াগুলোতে ছবি আছে। 'কতকগুলো অসংলগ্ন ছবি যেন পাখীর ঝাঁকের মত উড়ে চলেছে।' শিশুর কল্পনাপ্রবণ মনে তাদের ছন্দের ত্বরিত গতি, ভাবের দ্রুত পরিবর্তন যেন ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগিয়ে যায়। কল্পনা অসম্ভব হ'লেও তাতে কিছু এসে যায় না।

"আয় রে আয় টিয়ে, নায়ে ভরা দিয়ে
না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে, তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে।"

টিয়াপাখী কোনো কালে নৌকা চড়ে বেড়ায় কি না অথবা বোয়াল মাছের পক্ষে নৌকো নিয়ে পালানো কতখানি সম্ভব, শিশু তা নিয়ে মাথা ঘামায় না; বিশ্বাসও করে না, সন্দেহও করে না। ধ্বনি ও কল্পনার আনন্দটুকুই তার পক্ষে যথেষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ ছেলে-ভুলানো ছড়াকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে কেমন সুন্দর বলেছেন—

"মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনা-বৃষ্টিতে শিশু-হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতা গুণেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতঃই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে; এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা, অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্যবশতঃ চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে।"

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যেমন, শিশু-সাহিত্যেও তেমনি সকলের আগে রবীন্দ্রনাথের নাম করতে আমরা ভুলব না। তাঁর 'শিশু,' 'শিশু ভোলানাথ' প্রভৃতি কাব্য, 'মুকুটে'র মত নাটক, 'ছুটি' ও 'দান প্রতিদানে'র মত গল্প চিরদিন শিশু-সমাজের আদরের সামগ্রী হয়ে থাকবে। 'বীর পুরুষ' প্রভৃতি কবিতা শিশুর কল্পনা-বৃত্তি সজাগ ও সতেজ ক'রে তোলার ব্যাপারে অসাধারণ।

এ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দানও ভুলবার নয়। নজরুল ইসলামের প্রতিভাও শিশু-সাহিত্যের উপর যথেষ্ট রশ্মি সম্পাৎ করেছে। তাঁর 'সাত ভাই চম্পা'র মত কবিতা ছোটদের কল্পনার খোরাক যোগায় বেশ। এ রকম কবিতা অভিনয়ের জন্যেও উপযোগী। অভিনয় ছেলে বুড়ো সবাই ভালবাসে। কিন্তু শৈশবে নাটক ও অভিনয় মনের উপর দাগ কাটে সবচেয়ে বেশী। তাই মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে অভিনয়ের কথাটা বেশ জোরের সঙ্গে বলেছেন। বাংলা-সাহিত্যে শিশুপাঠ্য নাটক রচনার দিকে সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আরও আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। শিশু পাঠ্য জীবনী বা গল্পের বই বাংলায় আজকাল নিতান্ত কম নয়। এটা অবশ্য আশার কথা সন্দেহ নাই। তবে একটা জিনিস বড় বেশী দেখা যাচ্ছে—সেটা অনুকরণ। ইংরেজীর অনুকরণে একই ধরণের রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী বেরুচ্ছে রাশি রাশি। লেখকরা ভুলে যেতে চান তাঁদের পাঠক-সমাজ এ দেশেরই ছেলেমেয়ে। এর অধিকাংশের মধ্যেই intrinsic merit এর চেয়েও বেশী দেখা যায় চোখ ঝলসাবার চেষ্টা। প্রকাশকরা ছোটদের মনের খোরাক যোগাতে গিয়ে যেমন করে হোক বাজার দখলের দিকেই ঝোঁক দেখাচ্ছেন বেশী।

আমাদের স্কুলে যে-সব পাঠ্য পুস্তক পড়ানো হয়ে থাকে তাদের সম্বন্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। কিন্তু পরিবর্তন যে অনেক হয়েছে, তা' নিঃসন্দেহে বলা চলে। রামসুন্দর বসাকের 'বাল্যশিক্ষা' ও আজকের দিনের যে কোন ভাল প্রথম পাঠের বইয়ে তফাৎ বিস্তর। শিশুর শিক্ষায় চিত্রের সাহায্য অপরিহার্য। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দের এই নীতি আমাদের টেকস্‌ট্‌ বুক কমিটি মেনে নিয়েছেন। পাঠ্য পুস্তকে ছেলে-ভুলানো ছড়া এবং উপকথারও স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। এই জন্য তাঁরা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। আজকাল ব্যাকরণ, ভূগোল প্রভৃতি নীরস বিষয়কেও চিত্রের সাহায্যে সরস ও চিত্তাকর্ষক ক'রে তোলবার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। প্রথম-শিক্ষার্থীর উপযোগী বর্ণপরিচয় ও ছড়ার বইয়ের কথা আলোচনা করতে গেলে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নাম উল্লেখ করতে হয় সকলের আগে। 'হাসিখুসি'র অনুকরণ কম হয় নি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে এর জুড়ি মেলে না। শুধু রচনা নয়, চিত্রসজ্জার দিক দিয়েও যোগীন সরকারের বই অভিনব কিছু নিশ্চয়ই। অনেক পরীক্ষা, অনেক এক্সপেরিমেণ্টের ফলে অজস্র অর্থ ব্যয় ক'রে আমাদের দেশে সে যুগে প্রথম তিনিই ব্লক তৈরি সম্ভব করেছেন।

এই সঙ্গে আরও কতকগুলো কথা বলবার আছে। শিশুদের প্রথম পাঠের বইয়ে অপরিচিত শব্দ না থাকাই ভাল। পাঠ্য বইকে স্থান ও পাত্রের বিশেষ ভাবে উপযোগী করবার চেষ্টা না ক'রে সব বইকেই আমরা এক ছাঁচে ঢালি। শহরের ছেলেমেয়ে কলকারখানা, গাড়ী-ঘোড়া ও দালান-কোঠার সঙ্গে পরিচিত, গ্রামের ছেলে-মেয়ের পরিচয় একেবারে অন্য জিনিসের সঙ্গে। পাঠ্য পুস্তক রচনা করার সময় এ কথাটা মনে রাখা বাঞ্ছনীয়। তবে অপরিচিত জিনিসের সঙ্গেও বইয়ের মারফতে ছবির সাহায্যে যে পরিচয় একেবারে হবে না তা নয়। জ্ঞানের সীমা ওতে বাড়বে কিন্তু পরিমাণ যেন বেশী না হয়।

শিশু-সাহিত্যে বানান-সমস্যা দূর করার আশু প্রয়োজন আছে। সব ভাষাতেই বানান স্থায়ী রূপ নিয়ে বাসা বাঁধতে চায়; কিন্তু ভাষা বহতা নদীর মত দেশ কালের প্রভাবে যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয়েই চলেছে। শব্দের উচ্চারণ ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে, অথচ বর্ণসংস্কারের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। বাংলা উচ্চারণে উ ও ঊ, ই, ও ঈ অথবা শ, ষ, স এর মধ্যে কোন তফাৎ নেই, অথচ বানানের বেলায় যত চুলচেরা বিচার। রোমান সম্রাট্ ক্লডিয়াস বর্ণসংস্কার সম্বন্ধে একটা বইয়ে আলোচনা করে-ছিলেন। প্রথম লাটিন অভিধান-প্রণেতা Varrius Flaccusও মাথা ঘামিয়েছিলেন এ বিষয় নিয়ে। ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীতে I ও J, U ও V পৃথক ব'লে ধরা হ'ত না। ক্রমেই বর্ণসংস্কার কিছু কিছু চলে এসেছে। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক আর্ল বলেছেন—

> "The present rigorous examination in orthography ought to be greatly relaxed, if not altogether discontinued as involving a great waste of unprofitable efforts."

আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য এ বিষয়ে মনো-যোগী হয়েছেন, তবে চেষ্টা আরও ব্যাপক ভাবে হওয়া উচিত। বানানের কথা বলতে গেলে যুক্তাক্ষর সমস্যা এসে পড়ে। বাড়ীর ছোট ছেলেকে পড়াতে গিয়ে দেখেছি যুক্তাক্ষরের

ঠেলা সামলাতে গিয়ে শিশুর পড়ার আনন্দ একেবারে উবে যায়। অথচ শিক্ষার জন্য বিতৃষ্ণা সৃষ্টি না ক'রে সহজ স্বাভাবিক আগ্রহ ও কৌতূহল অব্যাহত রাখা এবং বাড়িয়ে তোলা আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির একটা প্রধান কথা। বর্ণপরিচয়ের একেবারে আধুনিক বইতেও 'কুজ্ঝটিকা', 'দুর্দৈব' প্রভৃতি এমন সব অপরিচিত শব্দ মাথা কুটে শেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে, যে সব শব্দ নিজের রচনায় জীবনে একবারও ব্যবহার না করলে ক্ষতি নেই—এমন কি তাতে বড় সাহিত্যিক হবারও কোন বাধা হয় না, এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়। আবার সঙ্গে সঙ্গে এ-ও লক্ষ্য করেছি, যখনই 'আঢ্য,' 'জাঢ্য' প্রভৃতি শব্দ ছাড়িয়ে দু-লাইন ছড়া বা পরিচিত কথা এসে পড়লো, তখনই ছেলের উৎসাহ বেড়ে গেল দ্বিগুণ—তেমনি তা শেখাও হয়ে গেল চট্ ক'রে। 'আম,' 'ইট' শেখার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তাক্ষর-বর্জিত ছোট ছোট গল্প দেওয়া হ'লে বর্ণমালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মায়, আবার গল্পের যে একটা বিশেষ আনন্দ আছে, তা থেকেও শিশু বঞ্চিত হয় না।

ভাষা শেখার সঙ্গে সঙ্গে যাতে সাহিত্যের রসবোধ জন্মায় তাও দেখতে হবে। প্রথম পাঠের প্রায় সমস্তটাই পৃথক্ পৃথক্ গল্পের মত লেখা যেতে পারে। দেখতে হবে গল্পের দৈর্ঘ্য যেন বেশী না হয়, ঘটনা ও ভাব যেন স্পষ্ট হয়, কথার মারপ্যাচে বিষয়বস্তু যেন হারিয়ে না যায়। সহজবোধ্য, সরস গল্প শিশুর মনের উপর যে রেখাপাত করে তা মুছবার নয়। গল্পের মধ্যে নীতিশিক্ষার ভাব মোটেই থাকবে না, গল্পের শেষে নীতি-উপদেশ তো নয়ই। হার্বার্ট স্পেনসারের কথায় বলা যেতে পারে

"Children should be told as little as possible and induced to discover as much as possible."

এ প্রসঙ্গে আরও একজন মনীষীর কথা বেশ প্রণিধান-যোগ্য।

"Eat the pupil's dinner for him if you will, but I beg of you to let him do his own thinking.

একখানা আধুনিক বর্ণপরিচয়ের বই* থেকে দেখাচ্ছি, যুক্তাক্ষর তো নেই-ই, শুধু আকার, ইকার দিয়ে কেমন চমৎকার ছোট ছোট গল্প রচনা করা চলে।

আকার যোগ :—

"মাঠ ভরা ঘাস। এক রাখাল ছাগল চরায়। তাহার তামাসার সাধ হইল। রাখাল কাপড় উড়ায়. ঐ বাঘ এল, বাবা এস, কাকা এস, মামা এস। সবাই এল, বাঘ নাই।

তার পর এক বার বাঘ এল। এবারও রাখাল সাদা কাপড় উড়ায়। রাখাল ঠকায়, তাই ওরা এল না।

রাখাল এবার মারা যায়। বাঘ ছাগল খাইল। ওর ঘাড় মটকাইল। রাখাল তামাসার ফল পাইল।"

ঈ কার যোগ :—

"এক রাজা আর রাণী। রাজা হাতী চড়িয়া শীকার করিল। এক পাখী ধরিল। রাণী কহিল, পাখীর নাম কি?

রাজা কহিল: হীরামন। রাণী কহিল: পাখী গীত গাও। পাখী গীত গাহিল না। পাখী কহিল: বনফল খাই, আর পাহাড়ী গীত গাই, এটা কি গীত গাহিবার জায়গা? রাণী কহিল: এই পাখীর দরকার নাই। রাজা পাখীটিকে ছাড়িয়া দিলেন।"

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি—

শিশু বয়সে নির্জীব শিক্ষার মত এত বড় ভয়ঙ্কর ভার আর কিছুই নেই। তাহা মনকে যতটা দেয়, তাহাকে পিষিয়া বাহির ক'রে আরো অনেক বেশী। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি, যিনি আমাদের জীবনকে গতি দান করিবেন। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি, যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া হউক, সকল দিকেই আমরা মানুষকে চাই; তাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোন কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।"

বানান-সমস্যা, যুক্তাক্ষর-সমস্যা প্রভৃতি আলোচনা ক'রে আরও উন্নত ধরণের শিশু পাঠ্য পুস্তক রচনা যাতে সম্ভব হয় তার জন্যে একটা কমিটি নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। ইউনিভার্সিটি ও টেক্সট-বুক কমিটির প্রতিনিধি, প্রকাশক, লেখক এবং আর্টিষ্টদের প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিটি গঠিত হ'তে পারে।

পাঠ্য পুস্তকে যে-সব কবিতা স্থান পাবে তাদের সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে অধিকাংশ সময় ছন্দ ও ধ্বনির মনোহারিত্বই শিশুর আকর্ষণের হেতু হয়ে থাকে। শিশুমন ধ্বনি ও ছন্দের দোলায় যতটা দোলে অর্থ বুঝবার জন্য ততটা লালায়িত হয় না।

"অতসী ফুটেছে বন-কোণায়
খোঁজ রাখে তার কোন্ জনায়
দোল দোল দোল দিনে রাতে
দুলে দুলে সারা নিরালাতে।"

(সুনির্মল বসু)

অথবা—

ঝিঙে ফুল, ঝিঙে ফুল
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ঝিঙে ফুল
গুল্মে পর্ণে লতিকার কর্ণে, ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলো দুল
ঝিঙে ফুল।

(নজরুল ইসলাম)

* মঈনুদ্দীন প্রণীত

এই ধরণের কবিতায় কি শিশু অর্থের জন্য মাথা ঘামায়? যেখানে ধ্বনির চমৎকারিতা আছে সেখানে নিম্নশ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকেও মাঝে মাঝে এমন কবিতা থাকা চাই—যার সব কথার অর্থ শিশু বুঝবে না, অথচ না বুঝলেও ক্ষতি নেই। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের :—

"ঐ সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ
কাঞ্চনময় দেশ
চন্দন যার অঙ্গের বাস তাম্বুল বন কেশ।"

অথবা

"ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা
তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন বর্ণা"

প্রভৃতি কবিতা অর্থের দিক দিয়ে শিশুর জন্য উপযোগী না হলেও ছন্দের দিক থেকে তাদের উপযোগিতার সীমা নেই।

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলো মনে পড়ে। "সেদিন পড়িতেছি 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা। সেই দিনের কথা আজও যখন মনে পড়ে, তখন বুঝিতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিষটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও হয় না। তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনও তাহার ঝংকার ফুরায় না—মিলটাকে লইয়া কানের মধ্যে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেই দিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।" এই যে জল পড়া পাতা নড়া, এই যে মনের মধ্যে একটা দোলার সৃষ্টি, সাহিত্যের রসবোধ তো ওরই সঙ্গে সঙ্গে জন্মায়। ভাষা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যও তাই। রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন—

"আগাগোড়া সমস্ত বুঝতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নয়।" "কথার মানে বোঝাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় অঙ্গটা বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যেই জিনিষটা বাজিয়া উঠে যদি কোন বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে বলা হয়, তবে সে যাহা বলিবে সেইটা নিতান্ত একটা ছেলেমানুষী কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে, তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশী, যাঁহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া কেবল পরীক্ষার দ্বারাই সকল ফল নির্ণয় করিতে চান তাঁহারা এই জিনিষটার কোন খবর রাখেন না। আমার মনে পড়ে, আমি ছেলেবেলায় অনেক জিনিষ বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব একটা সাড়া দিয়াছে।"

এই ধরণের কবিতা পাঠ্য পুস্তকে সন্নিবিষ্ট না থাকলেও অনেক সময় বাইরের বই থেকে পড়ে শোনান যায়। বাড়ীতে পিতা মাতা ও স্কুলে শিক্ষক এটা স্বচ্ছন্দে পারেন। কুইলার কাউচ্ বলেন মিল্টনের L'allegroর মত কবিতা অর্থ না বুঝিয়ে শুধু ধ্বনির খাতিরে ছোটদের কাছে পড়া যেতে পারে। বাংলা কবিতা সম্পর্কেও তাঁর ভাষায় বলা যায় :—

Just go on reading as well as you can; and be sure that when the children get the thrill of it, for which you wait, they will be asking more questions and pertinent ones, than you are able to answer."

বাংলা-সাহিত্যে ছোটদের পত্রিকার বিষয় কিছু বলতে গেলে সকলের আগে মনে পড়ে 'সন্দেশে'র নাম। অবশ্য গত শতাব্দীতে ঠাকুর-পরিবারের আবহাওয়ায় পুষ্ট হয়ে কিছু দিন বেঁচে ছিল 'বালক'। 'সন্দেশে'র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর নাম করার সঙ্গে সঙ্গে সে পরিবারের সুকুমার রায় চৌধুরী, সুবিমল রায় চৌধুরী ও সুখলতা রাওয়ের নাম এসে পড়ে। এই প্রতিভাশালী পরিবারটির দানে আধুনিক বাংলা শিশু-সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে। আজকাল নিত্য নূতন ছেলেদের কাগজ বেরুচ্ছে। তার মধ্যে 'মৌচাক', 'মাস পয়লা', 'শিশুসাথী', 'শিশু সওগাত' প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূজার বাজারে প্রকাশিত বার্ষিক পত্রিকাগুলিও ছোটদের পড়ার স্পৃহা মেটাবার সাহায্য করছে। এটা অবশ্য আশার কথা। তবে এসব কাগজে পরস্পরের অনুকরণের চেষ্টা প্রবল হওয়ায় খানিকটা একঘেয়ে হয়ে পড়েছে।

শিশুপাঠ্য পত্রিকাগুলি সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা যায় যে, পাঠকদের বয়সের হিসাবনিকাশ সম্বন্ধে যেন পরিচালকদের কোন খেয়াল নেই। প্রথম শিক্ষার্থী বালক এবং স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর বালককে একই পর্য্যায়ে ফেলে সবারই সামনে একই কাগজ ধরে দেওয়া হচ্ছে। তা না ক'রে বিভিন্ন বয়সের ছেলেদের উপযোগী কাগজ পৃথক্ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শিশুপাঠ্য পত্রিকা আলোচনা করতে গিয়ে "আজাদের মুকুলের মহফিল" এবং আনন্দ বাজারের "আনন্দ মেলা"র নাম উল্লেখ করবো। 'বাগবান' এবং 'মৌমাছি' 'মহফিল' ও 'মেলা'র শিশুদের জন্যে রস বিতরণ করছেন প্রচুর। শিশুদের নিজের রচনা এই আয়োজনের বৈশিষ্ট্য। কাঁচা হাতের ছোট ছোট রচনায় শিশুর সহজ পরিচয় ফুটে উঠবার অবকাশ পায়।

এই প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত ছোট ছেলেমেয়েদের রচনার সমষ্টি "আমাদের লেখা"র নাম উল্লেখযোগ্য। নয় পাতায় চোদ্দ জন শিশু লেখক অল্প কয়েকটি কথায় মনের ভাব সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছে।

আজকের এই শিশু-সাহিত্যিকদের কারো কারো প্রতিভা-স্পর্শে হয়ত ভবিষ্যতের বাংলা-সাহিত্য ধন্য হবে।

পরিশেষে শিশু-সাহিত্যের সম্পর্কে মেয়েদের দায়িত্ব স্মরণ করছি। এই ব্যাপারে তাঁরা এখনও যথেষ্ট সজাগ নন। শিশুর লালন পালন ও শিক্ষার সংস্রব বেশী মেয়েদের সঙ্গেই। তাদের অভাব অভিযোগ, প্রয়োজন মেয়েরাই বোঝেন বেশী। তাঁরা শুধু রচনা নয়, চিত্রাঙ্কনের দিক থেকেও শিশু সাহিত্যের সম্পদ বাড়িয়ে তুলতে পারেন।

এ যুগের বাংলা শিশুসাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকদের দান সম্বন্ধে এখনও কিছু বলা হয় নি।

বহু দিন আগে কাজী এমদাদুল হক, চৌধুরী এয়াকুব আলী ও মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ যথাক্রমে 'নবী কাহিনী' 'নূর নবী' এবং 'ওমর ফারুকে' সহজ সরল ভাষায় ছোটদের জন্য মহা-পুরুষের জীবনী রচনা করেছিলেন। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত গল্প, কবিতা, উপকথা ও জীবনী রচিত হয়েছে কিছু কিছু; কিন্তু যতটা হ'তে পারত, হয়ত উল্লেখ করবার মতো তেমন কিছু হয় নি। তবুও আশা করা যায় সাহিত্যের সকল বিভাগে যেমন, শিশু-সাহিত্যেও তেমনি অদূর ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হবে। জগদ্ব্যাপী আজ যে ভাঙাগড়া চলেছে তার শেষে নূতন সৃষ্টি নূতন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। যুদ্ধোত্তর বাংলা-সাহিত্য ধরবে নূতন পথ। সেই সঙ্গে শিশু-সাহিত্যও নূতন ক'রে গড়ে উঠবে—আমরা সেদিনের অপেক্ষায় রইলাম।

শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে যে-কথা এর আগে একবার বলেছি, উপসংহারে সে-কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে এবারে আমার দীর্ঘ বক্তব্যের ইতি করি।

পাঠ্য পুস্তকই হোক আর মাসিক পত্রিকাই হোক, শিশু-সাহিত্য রচনার ভার যাঁরা নেবেন তাঁরা ভুলবেন না যে শিশুর মনে সাহিত্যের রসবোধ জাগিয়ে তোলাই সবচেয়ে বড় কথা। সাহিত্য শিক্ষা দিতে গিয়ে বাড়ীতে পিতামাতা এবং স্কুলে শিক্ষকের আসল লক্ষ্য এই-ই হবে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বলি—

> "তিনিই সাহিত্যের সদ্‌গুরু, যিনি নিজের মনে প্রধানতঃ সাহিত্য-রস উপভোগ করবার ক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে উদ্যোগী হবেন ও তাদের মনের গতি এমন দিকে ফেরাতে পারবেন যাতে চিরজীবন তারা সাহিত্যকে একদিকে বুদ্ধিবৃত্তির সঞ্জীবনী রসায়ন, অপর দিকে কর্ম্মজীবনের অবকাশের নর্ম্মসচিব স্বরূপ মনে করবে।"

কীট-পতঙ্গের পেশীশক্তি

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

আমাদের দেশে কীট-পতঙ্গের অভাব না থাকলেও তাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞানের অভাব আমাদের কিছু আছে।

বর্ষায় জল পড়লেই ঘন সবুজ ঘাসের ফাঁকে ফড়িঙের দল লাফিয়ে বেড়ায়, পুকুরপাড়ে ব্যাঙের সভায় বক্তাদের গোলমালে কান পাতা যায় না, উচুঙ্গের দল এদিক-ওদিকে 'হাই জাম্প' দেয় আবার গুবরে-পোকা সকাল-সন্ধ্যা গান শুনিয়ে যায়, ঝিঁ ঝিঁ পোকা ধরে তার একটানা সুরের তান। কিন্তু আশ্চর্য্য, আমাদের এই সব প্রতিবাসীর খবর রাখবারই বড় একটা সুযোগ ঘটে ওঠে না। চোখের সামনেই দেখি, পিপীলিকার পাখা উঠেছে, কিন্তু সেটা কিসের জন্যে তার খবর নেবার প্রয়োজন বোধ করি না আমরা। জানবার জিনিস ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য—কিন্তু ইচ্ছা বলে যে একটা ছোট্ট কথা আছে অভিধানে তার একটা আঁচড়ও কাটা নেই আমাদের মনে—ঐখানেই বোধ হয় সব চেয়ে বড় ফাঁক!

মানুষের গায়ের উপর একটা নরম চামড়ার আবরণ দেওয়া আছে। এই চামড়ার ঢাকনির তলেই আছে আমাদের দৈহিক যন্ত্রসমূহ—পেশী, স্নায়ু, অস্থি ইত্যাদি।

কীট-পতঙ্গের এই বাইরের আবরণটা কঠিন। আমরা সবাই জানি যে, একটা ডেও-পিঁপড়ে পায়ের তলায় চেপটে গেলে কেমন একটা শব্দ হয়—অনেকটা চিনে বাদামের খোলা ভাঙ্গার মত। ঐ শব্দটা হয় তার বাইরের শক্ত চামড়ার আবরণটা চেপে ভাঙ্গার জন্য। এই শক্ত ঢাকনির মধ্যে থাকে কীট-পতঙ্গের দৈহিক যন্ত্রপাতি। এই যন্ত্রপাতি-গুলির কাজকর্ম্ম আমাদের মত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কল-কব্জার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

কীট-পতঙ্গদের দেহের মোটামুটি তিনটি ভাগ—মস্তক, বক্ষদেশ আর উদর। কীট-পতঙ্গের বাইরের শক্ত ঢাকনির সঙ্গে চমৎকার খাপ খাইয়ে তারই তলায় এক রকম 'জেলি'র মত পেশীর বন্দোবস্ত আছে। শুধু কীট-

পতঙ্গের নয়, মাকড়সা, কাঁকড়া, বিছা এবং চিংড়ি মাছের ন্যায় খোলসধারী প্রাণীদেরও এইরূপ পেশী আছে। এই মাংসপেশী অনেকটা আঁশশূন্য ভিজে পাউরুটি বা চটচটে জেলির মত এবং এগুলি আকুঞ্চনের চাপেই কাজ করে।



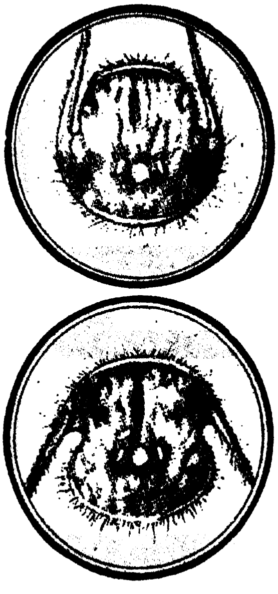
ফড়িঙের পাখা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আণুবীক্ষণিক চিত্র
(a) পেশী-সংবদ্ধ সোজা
(b) ঐ বক্র
(c) দুর্ব্বল পাখা
পাখাটি বদ্ধ করিলে b সরিয়া আসে c-এর কাছ থেকে

কয়েক শ্রেণী কীটের বক্ষদেশের তলে এই নরম পেশীটি কতকগুলি লম্বমান দৃঢ় কণ্ডরা বা ইংরেজিতে যাকে বলে tendons, তাই দিয়ে আঁটা আছে; আবার কতকগুলির এই কণ্ডরা একেবারেই নেই। এই মাংসপেশীর কাজ, আকুঞ্চন আর প্রসারণ দ্বারা কীট-পতঙ্গের পাখা নাড়ার ব্যবস্থা করা।

কীট পতঙ্গের দেহে আর এক শ্রেণীর পেশী আছে তার গঠন দৃঢ় রজ্জুর মত (tendonous muscle) এই পেশীগুলি মসৃণ ও মজবুত। ফড়িং বা ঝিঁ ঝিঁ পোকার পায়ের সব সংযোগস্থলেই (joint) এই পেশী লাগান আছে। ফড়িং বা উচুঙ্গ লম্বা লাফ দিতে পারে; আর ঐ কারণেই তাদের পায়ের গঠন বিচিত্র। যে-সমস্ত কীট-পতঙ্গ খুব লাফাতে পারে, তাদের পিছনের পায়ের জঙ্ঘাস্থি এই শক্ত দড়ির মত পেশী দিয়ে সুন্দরভাবে লাগান আছে দেহের শক্ত ঢাকনির ভিতর দিকে; এই পেশীগুলি আবার ছড়িয়ে দিলে খুব লম্বা হয় অর্থাৎ লাফাবার সময় এদের গুটান পা সোজা করবার সঙ্গে সঙ্গেই তার দৈর্ঘ্য যায় অনেকটা বেড়ে। এই সব কীট-পতঙ্গের জঙ্ঘাস্থি আর জঙ্ঘাস্থির (femur & tibia) সংযোগটা আমাদের জঙ্ঘা-সংযোগের মত নয়।

গুবরে-পোকার পায়েও ঠিক ঐ রকমের পেশীর ব্যবস্থা আছে। তাদের এই পেশীর জোর খুব বেশী, আর এই পা দিয়েই তারা মাটিতে খুব গর্ত্ত করতে পারে। এই সব গুবরে-পোকার সারা দেহটাই দৃঢ় পেশী দিয়ে গড়া। কয়েক শ্রেণীর গুবরে-পোকার শরীরে আবার দৃঢ় রজ্জুর মত পেশীর সঙ্গে নরম পেশীও ব্যবহৃত হয়েছে। এই নরম পেশীগুলি জোড়ের উভয় পার্শ্বে আর দেহের সামনে এবং মাঝখানে সংলগ্ন থাকে।

যে-সব কীট-পতঙ্গ খুব দ্রুত উড়তে পারে তাদের ডানা নিয়ন্ত্রণের পেশীগুলির কথা খুবই চিত্তাকর্ষক। ফড়িং, গুবরে-পোকা, পিঁপড়ে প্রভৃতি যে-সব কীট-পতঙ্গ বেশী উড়তে পারে না, তাদের পাখায় প্রধানতঃ দৃঢ় রজ্জুবৎ পেশীর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই আছে; কিন্তু ভীমরুল, মৌমাছি, দ্বিপক্ষ বড়মাছি (diptera), তসরে-পোকা (moth) এবং প্রজা-পতিদের পাখায় নরম নিয়ন্ত্রণ-পেশীই (soft muscle control) ব্যবহৃত হয়েছে। এই পেশীগুলির নরম হওয়ার সুবিধা এই যে, এগুলি অতিদ্রুত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হতে পারে আর এই দ্রুত সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলেই এদের ডানায় আসে উদ্ধানাচের দোলা।



অনুবীক্ষণ-যন্ত্রে প্রজাপতির পাখার জোড় দেখান হইতেছে। কি ভাবে পাখা ওঠে ও নামে ইহাতে তাহা বুঝা যাইবে

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, উড়বার সময় মৌমাছি তার পাখা সেকেণ্ডে বহুশত বার নাড়ে। মৌমাছি উড়ার সময়ে যে গুন্ গুন্ শব্দ হয়,—কবিরা যাকে 'গুঞ্জন' ব'লে থাকেন, সেটা সত্য সত্যই তাদের মুখের শব্দ নয়—সেটা ওদের ডানার কম্পনে বাজে চপল চলার সুর।



ফড়িঙের সম্মুখের পা
(a) পা-খানিকে টানিয়া উহার 'বল্' ও 'সকেট' দেখান হইতেছে
(b) গুটান অবস্থা। ইহাতে উহার তন্তু-পেশীর ক্রিয়া দেখা যাইবে

নরম মাংসপেশীগুলির কাজ আগেই বলেছি—পাখাগুলিকে চালানো; কিন্তু কেমন ক'রে পাখা চলে প্রশ্ন হতে পারে।

ঐ নরম পেশীসমূহ সঙ্কোচনকারী বহিঃচাপকে বাধা দেয়। এগুলি চালিত হয় ইচ্ছাধীন স্নায়ুদ্বারা। ইচ্ছাধীন স্নায়ুর আদেশ মত এই চাপ-বাঁধা, নরম, জেলির মত পেশী দেহের বিভিন্ন স্থানে কমবেশী সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয়ে বাহিরের শক্ত খোসাটির কোন জায়গায় চাপ দেয় আবার কোন জায়গায় বা আলগা ক'রে দেয়। ফলে, ডানার কাছের দেহের ঢাকনীটা বাইরের দিকে চাপ পায় তাই ডানার নীচের আবরণ আসে নেমে আর ওই ডানাও আসে বুজে। আবার পাখা খুলবার সময় পেশীর সঙ্কোচন-প্রসারণের ফলে ডানার তলার দেহের ঢাকনিটি ওঠে ফুলে আর সঙ্গে সঙ্গে পাখাও যায় খুলে। প্রজাপতি, তসরে-পোকা বা ঝিল্লী-ফড়িঙের (dragonfly) পাখা চলারও ঠিক এই রকম ব্যবস্থা। বড় বড় মাছি, সাধারণ মাছি, মৌমাছি প্রভৃতির পাখায় আবার রজ্জুর মত পেশীরও বাঁধন আছে। এই পেশীটি বুকের সঙ্গে লাগান থাকে আর নরম পেশীর সঙ্কোচন-প্রসারণের তালে তালে এরও কাজ চলে। এই সব পেশী সাধারণতঃ দুর্ব্বল, পাখার গোড়াটাকে ঠিক যায়গায় খুব সন্তর্পণে ধরে রাখাই এই পেশীর কাজ। এদের ডানায় আর একটি কারসাজি লক্ষ্য করবার আছে। দেখা যায়, কারও ডানা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে আটকান নেই—বরং দেহের শক্ত ঢাকনিরই বর্দ্ধিত অংশে অনেক সময় ডানা দুটি জোড়া লাগান থাকে!

পাখার মতই কীট-পতঙ্গের পায়ের পেশীশক্তি ও তার গঠন-প্রণালী আশ্চর্য্যজনক ও বিচিত্র! কেউ বা দিতে পারে মস্ত লাফ, কেউ বা খোঁড়ে মাটি আবার কারও বা ছুটবার সময়ে পায়ে খেলে যায় বিদ্যুৎ!

প্রকৃতির সূক্ষ্ম ব্যবস্থায় একই শ্রেণীর পেশী শুধু সন্নিবেশের পার্থক্যের জন্ম ভিন্ন ভিন্ন কাজ করতে সমর্থ। এক শ্রেণীর কাঠ-পিঁপড়ের দ্রুত চলার গতি তাক্ লাগিয়ে দেয়! একটা পিঁপড়ে তার নিজের দেহের থেকে কয়েকগুণ ভারী মরা মাকড়সা মুখে করে ব'য়ে নিয়ে চলেছে একটা খাড়া দেওয়াল বেয়ে, এমন ঘটনা ত সচরাচরই চোখে পড়ে! এই ক্ষুদ্র জীবের দু-সেকেণ্ডেরও কমে দু-ফুট চলা হয়ে যায়। আমরা যদি মানুষ বিজ্ঞানীর দান—উল্কাগতি যানের সঙ্গে এদের চলার-গতির তুলনা করি তবে অবাক হ'য়ে যাব! এই প্রকৃতির ক্ষুদ্র জীবটি দ্রুত গতিতে মানুষের তৈরি স্থলের সবচেয়ে দ্রুত চলনক্ষম যানকেও হেলায় পরাজিত করেছে! ব্যাপারটা একটু খুলে বলতে গেলে এইরূপ দাঁড়ায়: পৃথিবীর সব চেয়ে দ্রুত রেসিং কার (racing car) ধরা যাক্, চ'লছে ঘণ্টায় দু-শ মাইল বেগে—অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে এই মোটরকার তার নিজ দৈর্ঘ্যের ২৪ গুণ পথ অতিক্রম করে। কিন্তু ঐ গুরুভারবাহী ক্ষুদ্র পিঁপড়েটি সেকেণ্ডে নিজ দৈর্ঘ্যের ৪৮ গুণ পথ অতিক্রম করে অনায়াসে। সুতরাং দৈর্ঘ্যের সমতা রাখতে হ'লে বলা যায়, পিঁপড়েটি পেশীর বলে আমাদের কলের যানের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ জোরে চলে।

পিঁপড়ের কাছেই ত আমাদের কলের গাড়ী দ্রুত গতিতে হার মানল! কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে, পিঁপড়েই কীট-জগতের সব চেয়ে দ্রুতগামী নয়। প্রাণী-তত্ত্ববিৎরা বহু পরীক্ষায় ঠিক করেছেন যে, Agelaena neira ব'লে এক শ্রেণীর মাকড়সাই কীটদের মধ্যে সব চেয়ে চলে জোরে। মাকড়সার থাকে আটটা পা কিন্তু এই আটটা পা-ই মাকড়সাকে দ্রুত চলতে সাহায্য করে না বরং পদে পদে চলতে এরা বাধাই দেয়। এই পাগুলি সাহায্য করে শিকার ধরবার সময়। তবুও দেখা গেছে

যে, এই মাকড়সা সেকেণ্ডে নিজ দৈর্ঘ্যের শতগুণ পথ পার হ'য়ে যায়। যদি ঐ মাকড়সার দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমতা রেখে চলতে হয়, তবে একটা রেলগাড়ীর সেকেণ্ডে ৪০০০ ফুট চলা উচিত—অর্থাৎ কলিকাতা থেকে কোনও রেলগাড়ীর রাণাঘাট যেতে লাগা উচিত মাত্র দশ মিনিট!

দ্রুত চলার মত লাফানতেও কীট-পতঙ্গেরা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হারিয়ে দিয়েছে। সাধারণ লাল পঙ্গপালের শূক কীট (pupa) দৈর্ঘ্যে হয় মাত্র ½ ইঞ্চি ;—কিন্তু এরা লাফ দেয় একেবারে ৪০ ইঞ্চি!

মেরুদণ্ডীদের মধ্যে ক্যাঙ্গারুর লাফ দিবার ক্ষমতা খুবই বেশী; কিন্তু এই অতিক্ষুদ্র কীটের সঙ্গে লাফের পাল্লায় যদি দেহের দৈর্ঘ্যের সমতা রাখতে হয়, তবে মস্তবড় যোয়ান ক্যাঙ্গারুকে লাফাতে হবে একবারে ২০০ ফুট!

ছোট্ট পিসুকে (flea) সাধারণ ভাবে মাপা চলে না; কিন্তু এরা মাটি থেকে এক লাফে লম্বা ঘাসের একেবারে ডগার উপর উঠে বসে অর্থাৎ নিজ দৈর্ঘ্যের ৫০০ শত গুণ লাফ দেয়। ধরুণ, যে কীটটি $\frac{1}{50}$ ইঞ্চি মাত্র দৈর্ঘ্যে সে লাফ দেবে একেবারে ১০ ইঞ্চি! তাজ্জব ব্যাপার নয় কি? এদের লাফ দিবার ক্ষমতার সঙ্গে মানুষের লাফ দিবার ক্ষমতা তুলনা করলে বিস্মিত হ'তে হয়। একজন সাধারণ মানুষ যদি ওদের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে নিজ দৈর্ঘ্যের সমতা রেখে লাফ দিতে চায়, তবে এক লাফেই তাকে সিকি মাইল অর্থাৎ তেরশ কুড়ি ফুট যেতে হবে। এমনি-ধারা 'হাই জাম্প' দিতে পারলে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ী 'এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংস্'-এর মাথায় এক লাফে ওঠা যাবে! ঐ ক্ষুদ্র কীটদের সঙ্গে সমান তালে লাফ দিতে পারলে হনুমানের সাগর ডিঙানো আর তাজ্জব ব্যাপার বলে মনে হবে না!

কাঁচপোকারা যেমন দ্রুত উড়তে পারে তেমনি অসাধারণ তাদের ভার বইবার ক্ষমতা। যে কাঁচপোকাটির ওজন মাত্র ৪$\frac{1}{10}$ গ্রেণ, সেটা তার নিজের ৮৫০ গুণ বেশী ভার অর্থাৎ ৮$\frac{1}{2}$ আউন্সেরও বেশী ব'য়ে থাকে অনায়াসে! কাঁচপোকাকে মস্ত তেলাপোকা ধরতে ত প্রায়ই দেখা যায়। ঐ তুলনায় একটা তিন টন ওজনের হাতীর পিঠে অনায়াসে ২৫০০ টন ওজন চাপাতে পারা উচিত অর্থাৎ এটা সম্ভব হ'লে একটা হাতী 'কুইন মেরী' জাহাজকে পিঠে ক'রে অনায়াসে কলকাতা শহর ঘুরে আসবে!

আর একটা বিষয়ে কীট-পতঙ্গের পেশী-শক্তি মানুষকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। কুড়ি ফুট উঁচু থেকে পড়লেই আমাদের হাত-পা গুঁড়ো হয়ে যায়; কিন্তু একটা ইঁদুর এতখানি উঁচু থেকে যখন তখনই লাফ দিয়ে পালিয়ে থাকে! মনে রাখতে হবে, বিশ ফুট উচ্চতা একটা মানুষের উচ্চতার সাড়ে-তিন গুণ আর এটা একটা ইঁদুরের দৈর্ঘ্যের ষাট গুণ! আবার একটা ইঁদুরকে ৫০ ফুট উঁচু থেকে ফেললে মরে যাবে, কিন্তু একটা ছোট্ট ফড়িং বা গুবরে-পোকাকে অত উঁচু থেকে ফেললে তাদের কিছুই হবে না!

ক্ষুদ্র হলেও, শক্তির তুলনায় বৃহৎকে সে কোন কোন স্থলে হার মানিয়ে দিতে পারে।

নীলরতন সরকার

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ

উদ্বোধন

পৃথিবী জুড়ে চলেছে মৃত্যুর প্রলয় তাণ্ডব। জলে স্থলে আকাশে ধ্বংসলীলা। দেশে দেশে হাহাকার ক্রন্দনধ্বনি। এরি মাঝখানে আজ আমরা মিলিত হয়েছি মৃত্যু মহিমায়॥শুদ্ধ একটি জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। এক হিসাবে মৃত্যুর চেয়ে নিশ্চিত আর কিছুই নেই। অথচ এর মধ্যেই মানুষ বারেবারে বলেছে, যে, মৃত্যু থেকে তাকে অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হতে হবে। মৃত্যু সত্য, কিন্তু মানুষ মৃত্যুকেই চরম সত্য বলে মেনে নিতে পারে নি।

জন্ম মরণ এক সঙ্গে বাঁধা। যে জন্মেছে তাকেই মরতে হবে। তবুও জীবনের গতি কোথাও এসে থামছে না। কোটি কোটি মৃত্যুকে ছাপিয়ে প্রাণের ধারা নিত্য প্রবহমান। তাই মৃত্যুকে আজ আমরা শুধু ক্ষতি শুধু অবসান রূপে দেখব না। মৃত্যুকে আজ দেখব জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে। জন্ম মরণ দুই মিলিয়ে দেখব প্রাণের সেই বিরাট রূপ যাকে দেখলে "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি"—মৃত্যুকে অস্বীকার ক'রে নয়, মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই যাতে ক'রে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে।

দিন ও রাত্রির মধ্যে দিয়ে যেমন চলেছে কালের ধারা।

দিনের শেষ হয় রাত্রিতে। রাত্রির অবসান নূতন দিনের অভ্যুদয়ে। এক এক মুহূর্ত্ত চলে যাচ্ছে নূতন মুহূর্ত্তকে জন্ম দিয়ে। সৃষ্টির মানেই হচ্ছে যা ছিল তা চলে গিয়ে নতুন কিছু আসা। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সৃষ্টির আর লয়ের এই ছন্দ নিরন্তর ধ্বনিত তাই জগৎ চলমান।

ভয়াদস্য অগ্নি স্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

আজ স্মরণ করি সেই মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং—সেই উদ্যত বজ্র মহদ্ভয়কে যাঁর শাসনে অগ্নি ও সূর্য্য তাপ বিকীর্ণ করছে, যাঁর শাসনে জল প্রবাহিত, বায়ু সমীরিত। শুধু জল বায়ু আলো ও উত্তাপ নয় তাঁরই শাসনে মৃত্যুও ধাবমান। জগতের পক্ষে আলো-বাতাস জল ও তাপের যেমন প্রয়োজন মৃত্যুরও তেমনি প্রয়োজন। আজ স্মরণ করি "যস্য ছায়াঽমৃতং যস্য মৃত্যুঃ"—মৃত্যু যাঁর ছায়া, অমৃতও যাঁরই ছায়া।

স্মরণ

আমাদের পরম সৌভাগ্য আজ আমরা মিলিত হয়েছি এমন একটি মানুষকে স্মরণ করবার জন্য যাঁর মধ্যে দেখেছি প্রাণের সেই মহান্ রূপ সেই অফুরান গতি। বিরাশি বৎসর আগে বাংলা দেশের কোন্ এক অখ্যাত পল্লীতে দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। কোথা থেকে খসে-পড়া বীজ যেমন সমস্ত বাধা অতিক্রম ক'রে বৃহৎ বনস্পতি হয়ে ওঠে তেমনই ক'রে এই মানুষটির জীবনও একটি বৃহৎ পরিণতি লাভ করেছিল। ধনসম্পদ সুযোগ সৌভাগ্য নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি। অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য দিয়ে তিনি তাঁর বিচিত্র কর্ম্মবহুল জীবনটিকে গড়ে তুলেছিলেন। কোনো বিঘ্ন তাঁকে ঠেকাতে পারে নি। বিপদ তাঁকে পরাভূত করেনি। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অদম্য তাঁর অধ্যবসায়, অবিচলিত তাঁর ধৈর্য্য, অপরাজিত তাঁর সহনশক্তি। তাঁর জীবনে সংগ্রামকে দেখেছি শান্তির রূপে আর খ্যাতিকে নম্রতার মূর্ত্তিতে। ঔদার্য্যকে দেখেছি চরিত্রের গাম্ভীর্য্যে আর বীর্য্যকে তাঁর মুখের স্নিগ্ধ হাসিতে।

পদে পদে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে তাঁকে বিদ্যালাভ করতে হয়েছে। টাকার অভাবে শিক্ষার ধারা বারে বারে হয়েছে খণ্ডিত। ইস্কুল-মাষ্টারি, সেন্সস-গণনা, পরীক্ষায় পাহারা দেওয়া, যখন যা জুটেছে তাই ক'রে টাকা রোজগার করতে হয়েছে তবে শিক্ষা-লাভের এক এক ধাপে উঠতে পেরেছেন। ছেলেবেলায় তাঁর নিজের মা যখন মারা যান ভালো ক'রে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি। তাই ছেলেবেলা থেকেই তাঁর আন্তরিক আগ্রহ ছিল ডাক্তারি শেখা। মেডিকাল কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার সঙ্গতি ছিল না তাই প্রথমে ক্যাম্পবেল স্কুল থেকে ডাক্তারি পাস করেন। মাঝে চাকরি ক'রে পরে চিকিৎসা-বিদ্যার উচ্চতম উপাধি লাভ করেছিলেন।

অনেক দুঃখে তাঁকে লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল তাই গরীব ছাত্রদের সম্বন্ধে তাঁর ছিল সুগভীর স্নেহ ও বেদনা। শিক্ষা ও বিদ্যা-চর্চ্চার ক্ষেত্রে তিনি আমাদের দেশে খুব বড়ো একজন নেতা ছিলেন সন্দেহ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর তাঁর সম্বন্ধ। সেনেট, সিণ্ডিকেট আর অসংখ্য কমীটির তিনি সভ্য ছিলেন। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের সভাপতি, আর ভাইস্-চ্যান্সেলরের পদও তিনি অলঙ্কৃত করেছেন। শুধু সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় নয়, স্বদেশী যুগের সময় থেকে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তিনি ছিলেন তার আজীবন ট্রাষ্টী।

এই বিচিত্র কর্ম্মধারার মধ্যে তাঁর ছিল প্রধান লক্ষ্য যাতে দেশের দরিদ্রতম ছাত্রও শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। শিক্ষা-ক্ষেত্রে তিনি যা-কিছু করেছেন তার মূলে ছিল গরীব ছাত্রদের সম্বন্ধে তাঁর এই সত্যিকার দরদ।

শিক্ষা-ক্ষেত্রে যেমন ডাক্তারিতেও তেমনি ক'রেই আমরা পরিচয় পাই করুণায় ভরা একটি সজীব হৃদয়ের। নিজের পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার জোরে সমস্ত ভারতবর্ষে চিকিৎসা-জগতের শীর্ষস্থানে তিনি আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বিদেশেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রভৃতি বেসরকারী যত বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন নেতা। অর্থও তিনি কম উপার্জ্জন করেন নি। কিন্তু এ সমস্তই হোলো বাইরের কথা—ইহ বাহ্য। খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করা বা অর্থোপার্জ্জনের জন্য তিনি ডাক্তারি করেন নি। ডাক্তারি করাই ছিল তাঁর স্বভাবের ধর্ম্ম। খ্যাতি-প্রতিপত্তি বা অর্থ হোলো আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র।

মানুষকে রোগ-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করতে হবে, মানুষকে বাঁচাতে হবে এই ছিল তাঁর আজীবন সাধনা। তাই দেখেছি যখন কোনো রোগীকে তিনি হাতে নিয়েছেন টাকার কথা হয়ে গিয়েছে তাঁর কাছে তুচ্ছ। রোগী পয়সা দিতে পারবে কিনা তা কখনো ভাবেন নি। আমি তাঁর কাছে অনেক গরীব ছাত্র, অনেক গরীব লোককে নিয়ে গিয়েছি যাদের তিনি চেনেন না—যারা তাঁকে এক পয়সা ফি দেয় নি। কিন্তু দেখেছি রাজা-রাজড়ার ঘরেও যেমন

এই সব নিতান্ত সামান্য লোকের ঘরেও ঠিক তেমনি করেই তিনি চিকিৎসা করেছেন।

আর দেখেছি রোগীর প্রতি তাঁর গভীর করুণা। তাই শুধু ওষুধ দেওয়া নয়, পথ্যের ব্যবস্থা করা নয়, কী ক'রে রোগীর মন প্রফুল্ল হয় সে দিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল। তাঁর কথায়, ব্যবহারে, চেহারায় ছিল অসীম ভরসা। মরণাপন্ন রোগীর পাশে গিয়ে যখন দাঁড়াতেন তখন তাঁর সেই বরাভয় মূর্ত্তি দেখে সকলের মনে নতুন আশার সঞ্চার হ'ত। নীলরতন সরকার এসেছেন তবে আর কোনো ভয় নেই।

রোগীর চিকিৎসা করার সময় তিনি সত্যিই আহার নিদ্রা ভুলে যেতেন। বৃদ্ধ বয়সে, যখন তাঁর নিজের শরীরে ভাঙন ধরেছে, এক দিন অনেক রাত হয়ে যায় তিনি বাড়ি ফেরেন না। বাড়ির লোকে আকস্মিক দুর্ঘটনার ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো—নানা জায়গায়, হাসপাতালে, পুলিসে টেলিফোন করা হ'ল—শেষে রাত তিনটার সময় তিনি বাড়ি ফিরলেন। একজন রোগীর পাশে রাত দশটা থেকে তিনি বসেছিলেন, বাড়িতে খবর দিতেও ভুলে গিয়েছেন। বাড়ির লোকে অনুযোগ করায় একটু হেসে বললেন—'নিজের খাওয়া ঘুমনোর কথা ভাবলে রোগী দেখা চলে না।'

বাধা-বিপত্তির ঘাত প্রতিঘাতেই তাঁর প্রতিভা যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠত। যখন মনে হয়েছে আর কোনো উপায় নেই, তখনি হয়তো দেখা গিয়েছে একেবারে নতুন কোনো পথ তিনি খুঁজে বের করেছেন। সঙ্কট মুহূর্ত্তে কখনো তিনি হতবুদ্ধি হন নি।

তাঁর এক সহযোগীর কাছে শুনেছি কম বয়সে যখন এক হাসপাতালে কাজ করেন একজন রোগীকে পরীক্ষা ক'রে বুঝতে পারলেন যে obstruction of the intestines—তখনই অস্ত্রোপচার করা ছাড়া আর উপায় নেই—তখন অনেক রাত হয়ে গিয়েছে কোনো সার্জনকে ডেকে আনবার সময় নেই। তিনি নিজে অস্ত্র-চিকিৎসা করতেন না কিন্তু কোনো দ্বিধা না ক'রে তখনই নিজের হাতে এত বড়ো একটা অপারেশন করলেন আর তাইতে রোগীটি বেঁচে গেল।

তাঁর কাছে সত্যিই ছিল "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ" অন্তিমকালেও কখনো হাল ছাড়েন নি। শেষ পর্য্যন্ত লড়াই করেছেন। আবার রোগী ভালোর দিকে যাচ্ছে ব'লে তাঁর সতর্ক-দৃষ্টি কখনো শিথিল হয় নি। মানুষের প্রাণের মূল্য তাঁর কাছে ছিল খুব বেশি তাই তাঁর মন সর্ব্বদা সজাগ থাকত কিসে রোগীর ভাল হয়।

রোগীর সঙ্গে তাঁর শুধু দেনা-পাওনার সম্পর্ক ছিল না। তারকনাথ পালিত যে শুধু রোগের চিকিৎসার জন্যই তাঁর কাছে আসতেন তা নয়। দেখেছি দিনের পর দিন পালিত-সাহেবের গাড়ি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। রোগী-চিকিৎসকের সম্পর্ক দিয়ে যা আরম্ভ হয়েছিল পরে বন্ধুত্বের সম্বন্ধের মধ্যে তার পরিণতি ঘটে। আর অনেকখানি এই বন্ধুত্বের সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই পালিতসাহেবের লক্ষ লক্ষ টাকা বিজ্ঞান-শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে আসে।

যদিও তিনি সারাজীবন ডাক্তারি করেছেন, এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল আন্তরিক। তাঁর নিজের মনও ছিল experimental—সব বিষয়ে নতুন নতুন উপায় পরীক্ষা ক'রে দেখতে ভালবাসতেন। শেষ বয়স পর্য্যন্ত দেখেছি শেখবার জন্য জানবার জন্য তাঁর কৌতূহল। নানা বিষয়ে নতুন নতুন বই কিনতেন আর কর্ম্মবহুল জীবনের সামান্য অবসরটুকু কাটতো এই সব বই প'ড়ে। সব সময়েই খোঁজ নিতেন দেশের কোথায় কেমন ভাবে বিজ্ঞানের চর্চ্চা চলছে। কোথাও কোনো ভাল কাজ হয়েছে শুনলে তাঁর মন খুশিতে ভরে উঠত। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের অনেক ঝুঁকি তিনি বহন করেছেন। মহেন্দ্রলাল সরকারের সায়ান্স এসোসিয়েশনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। আর বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের সঙ্গেও চিরদিন ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়ার অনেক আগে থেকেই জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। বন্ধুকে নানারকমে তিনি সাহায্য করেছেন।

শুধু বিজ্ঞান-চর্চ্চা নয় দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির প্রতিও তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর। সাবানের কারখানা, ট্যানারি ও অন্যান্য ব্যবসায়ের জন্য অনেক সময় দিয়েছেন। অনেক টাকা খরচ করেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যবসায়ীর মন ছিল না। তাঁর আসল আগ্রহ ছিল আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিষ তৈরি হচ্ছে না কী ক'রে সে-সব জিনিষ তৈরি করা যায়। কী ক'রে আমাদের দেশ শিল্প বাণিজ্যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। তাই কী ক'রে জিনিষগুলি ভালো হবে সেদিকে ঝোঁক দিয়েছেন—পয়সা করার দিকে মন দেন নি।

রাজনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। কংগ্রেসের সঙ্গে অনেক দিন আগেই যোগ দিয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যেও পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়েন। পরে কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়ালেও বাংলা দেশের নানা রকম রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মধারার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

খুব কম বয়সেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে আসেন। ব্রাহ্ম-

সমাজের কাজ ও আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর ছিল চিরদিন গভীর শ্রদ্ধা। সেকালের ব্রাহ্মনেতাদের মতো তাঁরও চরিত্র ছিল সততা ও পবিত্রতার আধার। এক সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের কাজ করেছিলেন, শেষবয়সে সমাজের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তাঁর দৃষ্টি ছিল উদার, মন ছিল সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত। তাই তিনি সবরকম মানুষকে নিয়েই কাজ করতে পেরেছিলেন।

তাঁর মধ্যে প্রাণশক্তি ছিল এমন সতেজ ও সবল যে সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত ডাক্তারি ক'রেও শিক্ষা-ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, শিল্প-বাণিজ্য, রাজনীতি ও ধর্ম্ম-সমাজ—দেশের সবরকম উন্নতিমুখীন মঙ্গল-কর্ম্মে ও কল্যাণকর অনুষ্ঠানে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। বহুমুখী প্রতিভা, বিচিত্র কর্ম্মশক্তি ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা তিনি জাতীয় জীবনকে বলশালী করেছিলেন—বর্ষার জল যেমন ক'রে মাটিকে উর্ব্বর ক'রে দেয় অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিকভাবে যার মধ্যে কোনো আড়ম্বর নেই।

নিজেকে তিনি চিরদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে ভালবাসতেন। কাজ হ'লেই হ'ল—তাঁর কৃতিত্ব কিছু আছে কিনা লোকে নাই বা জানুক। শুধু তাই নয়, দশজন লোকের হাততালি বা বাহবা পাওয়া সম্বন্ধে বরঞ্চ তাঁর একটু সঙ্কোচই ছিল। তাঁর স্বভাবের মধ্যে এমন একটি নম্রতা ছিল যে কারুর সঙ্গে কখনো কোনো রেশারেশির ভাব আসে নি। সংসারের হাটে ঠেলাঠেলি তিনি করেন নি। নিঃশব্দে নিজের কাজ ক'রে গিয়েছেন নিজেকে সব সময়ে পিছনে রেখে।

আশ্চর্য্য ছিল তাঁর মনের সহিষ্ণুতা ও উদারতা। মানুষের ভালো দিকটাই দেখতে ভালবাসতেন। কখনো তাঁকে পর-নিন্দা বা পর-চর্চ্চা করতে শুনিনি। তাঁর সামনে কেউ অপরের নিন্দা করলে বিরক্ত হতেন, থামিয়ে দিতেন। তাঁর মন ছিল স্বভাবতই গঠনমূলক। যেখানে যতটুকু পেরেছেন সাহায্য করেছেন। সহকর্ম্মীদের সঙ্গে যখন মতভেদ ঘটেছে তখন চুপ করে গিয়েছেন বা নিজে স'রে দাঁড়িয়েছেন। কোনো বাদানুবাদ এমন কি সমালোচনাও করেন নি। আমরা বা আমাদের মতো কম-বয়সী লোকেরা হয়তো অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছি। আমাদের সঙ্গে মতের মিল থাকলেও তিনি আমাদের নিরস্ত করেছেন। যাঁরা কাজ করছেন যতক্ষণ সম্ভব তাঁদের কাজে সাহায্য করা, অন্তত বাধা না দেওয়া, এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। আমাদের দেশে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মতভেদ প্রবল, কাজের ক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে সর্ব্বদাই ঠোকাঠুকি লাগে এটা তাঁর ভালো লাগতো না। তাই নিজের মতকে জোর ক'রে জাহির করবার চেষ্টা কখনো করেন নি। পরের মত খণ্ডন করা সম্বন্ধেও তাঁর কোনো উৎসাহ ছিল না।

আশ্চর্য্য তাঁর বিনয়। যেখানে নিজের মত ব্যক্ত করার তাঁর ছিল অবিসম্বাদিত অধিকার সেখানেও অপরের মতকে উপেক্ষা করেন নি। নবীনতম চিকিৎসক যে ব্যবস্থা দিয়েছেন, তাঁকে যখন ডাকা হয়েছে, বলেছেন যে ব্যবস্থা ঠিকই হয়েছে তবে এই রকম ভাবে একটু বদলানো যায় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। ডাক্তারি সম্বন্ধে যেমন সভা-সমিতিতেও যখন সভাপতির কাজ করেছেন ঠিক তেমনি করেই সব চেয়ে সামান্য যে সভ্য তার মতও জিজ্ঞাসা করেছেন। তার কারণ সকলের সম্বন্ধেই তাঁর ছিল শ্রদ্ধা।

মতভেদ সম্বন্ধে তাঁর এই রকম সহিষ্ণুতা থাকলেও প্রচলিত রীতি-নীতি বা লোক-মত যে তিনি সব বিষয়ে মেনে নিতেন তা নয়। যেখানে ঠিক বুঝেছেন, মুখে প্রতিবাদ না ক'রে, নিঃশব্দে নিজের আচরণের দ্বারা তিনি প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। শুধু লোক-নিন্দা বা অপবাদ শুনে কোনো মানুষকে তিনি বর্জ্জন করেন নি। বরং দেখেছি, যে, তাঁর নিকটতম বন্ধুবান্ধবরা যখন হয়তো কারুর নিন্দা করেছেন, সমাজ থেকে বর্জ্জন করতে চেয়েছেন, তিনি তখন সকলের মতকে উপেক্ষা করে তাকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর নিজের মন ছিল বড়ো, তাই মানুষের সম্বন্ধে লোকের মন-গড়া বিধি-নিষেধ বা মাপ-কাঠি দিয়ে বিচার ক'রে কোনো গণ্ডী টানেন নি।

তাঁর মধ্যে দেখেছি প্রাণের সেই সহজ প্রবল প্রাচুর্য্য যার মধ্যে কোথাও কোনোও কৃপণতা ছিল না। আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বনস্পতির ন্যায় তিনি এমন একটি বৃহৎ নীড় রচনা করেছিলেন যেখানে নিকট থেকে দূরতম আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধবেরা এসে আশ্রয় লাভ করেছে। পারিবারিক জীবনের সমস্ত দায়িত্ব তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের পরিচয় আমরা পেয়েছি মুখের উচ্ছ্বাসে নয়, তাঁর সদা-জাগ্রত মঙ্গল-দৃষ্টিতে আর অক্লান্ত কল্যাণ-চেষ্টায়।

তাঁর ছয় ভাই বোনের ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনি নিয়ে তাঁর ছিল বিশাল পরিবার। আমাদের পর্য্যায়ে আমরা ভাই-বোন মিলিয়ে ছিলুম প্রায় ত্রিশ জন। আমাদের পরের পর্য্যায়—তাঁর নাতি-নাতনির সংখ্যাও হবে জন চল্লিশ—এ ছাড়াও বাড়ির বউ, জামাই ও অন্যান্য আত্মীয়-কুটুম্ব। এদের সকলকে তিনি ঘিরে রেখেছিলেন তাঁর ভালবাসা দিয়ে। এদের সুখ-সুবিধার

কথা ভেবেছেন। রোগ হ'লে ওষুধ দিয়েছেন, সেবা করেছেন। পথ্যে অরুচি হ'লে নিজের হাতে নতুন রকম ক'রে রান্না করে দিয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর রুগ্না পত্নী যখন বিছানাতে উঠে বসতে পারেন না তখন দেখেছি সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরে বাড়ি ফিরে এসে আগে স্বহস্তে পত্নীকে খাইয়ে তার পরে নিজের মুখে অন্ন তুলেছেন।

তাঁর সহৃদয়তা শুধু তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। তাঁর বন্ধু-বাৎসল্য ছিল অসাধারণ। সুখে দুঃখে আর সত্য সত্যই "শ্মশানে রাজদ্বারে চ" তিনি বন্ধুদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। শুনেছি বন্ধুদের বিবাহ-উৎসবে তাঁর ছিল সব চেয়ে উৎসাহ। অনেক ক্ষেত্রে বাজার করা থেকে অনুষ্ঠানের সমস্ত আয়োজন তিনিই করেছেন। বন্ধুদের বিবাহ-ব্যবস্থায় যেমন, দরকার হ'লে বন্ধু-কন্যাদের বিবাহ-উৎসবেও তেম্‌নি করেই সমস্ত ঝুঁকি তিনি ঘাড়ে নিয়েছেন। কঠিন রোগের সময় চিকিৎসা তো করেছেনই—অনেক সময় ভালো ক'রে দেখতে পারবেন ব'লে ছোঁয়াচে রোগীকেও নিজের বাড়িতে এনে রাখতে দ্বিধা করেন নি।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের তিনি শুধু চিকিৎসক ছিলেন না, ছিলেন পরম আশ্রয়। কোনো দায় তিনি কখনো এড়াতে চেষ্টা করেন নি। যা নিজের দায় নয় তাও হাসিমুখে ঘাড়ে নিয়েছেন। মাঘোৎসবের উদ্যান-সম্মিলনে যাবেন—তাঁর এক বন্ধুকে ডাকতে গিয়ে দেখেন তিনি বিরস-বদনে বসে রয়েছেন—কাল মকদ্দমা, ব্যারিষ্টারের ফি লাগবে হাজার টাকা, হাতে পয়সা নেই। চট্‌ করে বেরিয়ে গেলেন, ফিরে এসে বন্ধুর কোলে হাজার টাকার নোট ফেলে দিয়ে বললেন, এর জন্য বাগানে যাবেন না? এবার হোলো তো! উঠুন, এবার যাওয়া যাক্‌। তিনি ছিলেন বলশালী পুরুষ। তাই—"য আত্মদা বলদা"—সেই রকম ক'রেই তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

তাঁর এই বন্ধু-বাৎসল্য শুধু বাংলা দেশের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি। কতো দূর থেকে, বম্বে, মাদ্রাজ, সিংহল দেশের লোক তাঁর বাড়িতে এসেছে। তাঁর মধ্যে এমন একটি সহজ সামাজিকতা ছিল, যে, বাইরের মানুষকে ঘরে ডেকে এনে তিনি আনন্দ পেতেন। দার্জিলিঙের বাড়িতে এত লোককে নেমন্তন্ন করেছেন, যে, রাতের পর রাত বসবার ঘরে ক্যাম্প খাট ফেলে নিজে ঘুমিয়েছেন। মনে আছে বাড়ি যখন এই রকম ভর্ত্তি তিনি খবর পেলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের সেই সময়ে গণিতের অধ্যাপক Cullis সাহেব দার্জিলিঙ ষ্টেসনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন, বোধ হয় কোথাও জায়গা পান নি, আমাকে বললেন, যাও তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো—এক রকম ক'রে এর মধ্যেই হয়ে যাবে এখন। কত বিদেশী অতিথি তাঁর বাড়িতে এসেছে। Patrick Geddes-এর পত্নী কলকাতায় যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন হ্যারিসন রোডে তাঁর বাড়িতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'ল কিন্তু কিছু করা গেল না। ওঁর বাড়িতেই এই বিদেশী মহিলাটির মৃত্যু হয়। শ্মশান পর্য্যন্ত সমস্ত ঝুঁকিই তিনি বহন করলেন।

এত বড়ো ছিল তাঁর মন। মানুষকে শুধু কাজের সম্পর্কের ভিতর দিয়ে দেখেন নি। তাঁর স্বভাবই ছিল সকলের সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করা। কিন্তু বাইরে তার কোনো উচ্ছ্বাস ছিল না। তাঁর হৃদয়ের গভীরতার পরিচয় পেয়েছি তাঁর চরিত্রের গাম্ভীর্য্যে। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যখন মারা যায় সেই অবধি ব্রাহ্মসমাজে তিনি প্রত্যেক বছর মাঘোৎসবের সময় বালক-বালিকা সম্মিলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। নানা কর্ম্ম-ব্যস্ততা সত্বেও ঐ দিনটিতে তিনি নিজে গিয়ে সমস্ত তদারক করতেন। পুত্র-শোককে তিনি ছোটো ছেলেমেয়েদের আনন্দ-উৎসবের মধ্যে এই রকম ক'রে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছিলেন।

তাঁর কথায়, ব্যবহারে, চরিত্রে কোনো অত্যুক্তি ছিল না। ঘোর বিপদের সময়েও তিনি কখনো বিচলিত হন নি। খুব সুখের সময়েও তাঁকে কেউ অত্যধিক উৎফুল্ল হতে দেখে নি। তাঁর পথ ছিল সেই—"মজ্‌ঝিম-নিকায়"। চিরদিন শান্ত, সংযত, সমাহিত। অন্তর্গূঢ় তাঁর বেদনা। ধীরগম্ভীর তাঁর আচরণ, মুখে চিরপ্রসন্ন হাসি। তাঁর জীবনে দেখেছি প্রাণের সমারোহ।

আরো দেখেছি, সুখে সম্পদে সমৃদ্ধিতে নয়, ভাগ্য-চক্রের বিপর্য্যয়ে দুর্দ্দিন যখন ঘনিয়ে এসেছিল। বহু বিস্তৃত ব্যবসায়ে লোকসান দিতে দিতে যেদিন তিনি হলেন সর্ব্বস্বান্ত। সেই ভয়ঙ্কর সঙ্কটের দিনেও দেখেছি তাঁর অটল ধৈর্য্য, নির্ভীক শান্তি। দিনের পর দিন কোনো কর্ত্তব্যে কোথাও তিল মাত্র ফাঁক পড়ে নি। তখনো অদম্য তাঁর অধ্যবসায়, অক্লান্ত তাঁর পরিশ্রম। সঞ্চয়ী তিনি ছিলেন না, তাই ত্যাগের রিক্ততায় তাঁকে ক্ষুব্ধ করতে পারে নি। দেনার দায়ে তাঁর নিজের বসত-বাড়ি যখন বিকিয়ে গেল, হাসিমুখে বললেন, কলকাতায় কুড়ি টাকা দিলে ঘর-ভাড়া পাওয়া যায়, তাতেই আমার চলে যাবে।

নিজের অবস্থা যখন এই রকম তখনো তাঁর মন ছিল আগের মতোই পরদুঃখকাতর। তাঁর কন্যার পরিচিত

একটি মুসলমান মেয়ে এক দিন তাঁর বাড়িতে এসে একতলা থেকে তাঁকে লিখে পাঠায় যে তার ভয়ানক বিপদ, পাঁচশো টাকা দরকার। বাড়ির কাউকে কিছু না ব'লে তখনই তাকে পাঁচশো টাকা দিয়ে দিলেন। পরে তাঁর নিজের মেয়েও যখন এই নিয়ে অনুযোগ করে তখন বললেন—'একজন ভদ্রলোকের মেয়ের পক্ষে এইভাবে অপরের দ্বারস্থ হওয়া যে কতো বড়ো দুঃখ তা তোমরা বোঝো না, নইলে এমন কথা বলতে পারতে না।' অপরকে এই ভাবে সাহায্য করেছেন কিন্তু নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে কারুর কাছে তিনি দুঃখ করেন নি। তখনো দেখেছি তাঁর উন্নত শির, তাঁর মুখে সেই স্নিগ্ধ হাসি।

তার পরে অর্দ্ধশতাব্দীর ধর্ম্ম-সঙ্গিনী যেদিন পরলোকে চলে গেলেন—অনেক দিন ধরে নিজের হাতে তাঁকে খাইয়ে দিয়েছেন, সেবা করেছেন—সে-সব কাজ তাঁর ফুরিয়ে গেল। তখনো তাঁকে অধীর হ'তে দেখি নি, কিন্তু দেখেছি তাঁর শোকের সংযত মূর্ত্তি। পত্নী যে-ঘরে বাস করতেন, নিজের ঘর ছেড়ে সেই ঘরে এসে তিনি আশ্রয় নিলেন। বহুদিনের স্মৃতি দিয়ে শোককে তিনি আচ্ছাদন করলেন।

তারও পরে দেখেছি, তিন বছর আগে, যখন সেই দুরারোগ্য ব্যাধি—যার ধন্বন্তরি ছিলেন তিনি স্বয়ং—তাঁকে আক্রমণ করলো। ধমনীতে রক্তস্রোত অকস্মাৎ হ'ল বাধাগ্রস্ত। তখনো স্থির তাঁর বুদ্ধি। অবিচলিত তাঁর ধৈর্য্য। শুশ্রূষার ব্যবস্থায় সেদিনও তিনি নিজে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। শুধু বলেছিলেন "বাঘের থাবা এবার ছুঁয়ে গেল।"

তখন আরম্ভ হ'ল তিলে তিলে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই। বার্দ্ধক্যের ভারে দেহযন্ত্র তখন বিকল, পদে পদে হটে আসতে হ'ল। কিন্তু তখনো তাঁর ধৈর্য্য পরাভূত হয় নি। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে গিরিধিতে প'ড়ে গিয়ে তাঁর পায়ে আঘাত লাগে। জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কেমন আছ? আগের মতোই একটু হেসে বললেন, সারছে কিন্তু আস্তে আস্তে, সময় লাগবে। মৃত্যুভয় সেদিনও তাঁর উজ্জ্বল মুখ-শ্রীকে ম্লান করতে পারে নি।

তিনি জন্মেছিলেন বাংলা দেশের এক গৌরবময় যুগে। তাঁর সমসাময়িক অনেক দিকপালের সঙ্গে ছিল তাঁর আদর্শের যোগ, কর্ম্মের যোগ, হৃদয়ের যোগ। তিনি নিজেও ছিলেন তাঁদেরই মধ্যে অন্যতম। একে একে প্রায় সকলেই তাঁর আগে চলে গেলেন। ক্রমেই তিনি সঙ্গীহীন হয়ে পড়েন। মৃত্যুর অল্পদিন আগে গিরিধিতে আমাকে বললেন, বড়ো একা লাগে। তখন তাঁর শরীর জীর্ণ। সেদিন তাঁকে দেখেছি বজ্রাহত বনস্পতির মতো নিঃসঙ্গ একাকী।

তাঁর স্মরণশক্তিও তখন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। কিন্তু ষাট বছর ধ'রে তিনি-যে চিকিৎসা-বিদ্যার চর্চ্চা ক'রে এসেছেন এ কথা তিনি কখনো ভোলেন নি। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর মনে ছিল যে তিনি ডাক্তার—মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করাই তাঁর জীবনের সাধনা। শেষ পর্য্যন্ত এইটুকু তাঁর ছিল অভিমান। হয় তো এ দুঃখও তাঁর মনে ছিল যে, ভগ্নস্বাস্থ্য ব'লে চিকিৎসা করার জন্য তাঁকে আর আগের মতো ডাকা হয় না। রবীন্দ্রনাথের অস্ত্রোপচার করা যখন স্থির হয় তখন তাঁকে বলা হয় নি—কিন্তু কবির অন্তিমকালে তাঁর ডাক পড়লো। বন্ধুশ্রেষ্ঠ কবি-সম্রাটের পাশে গিয়ে তিনি বসলেন। কতবার এঁকে তিনি মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। কিন্তু এখন আর সময় নেই। সব্যসাচীর হাত থেকে তখন গাণ্ডীব পড়েছে খসে। দুই চোখ তাঁর জলে ভরে এল।

তার পরেও, মৃত্যুর অল্প দিন আগে, দেখেছি যখন তিনি খবর পেলেন তাঁর বন্ধু হেরম্বচন্দ্রের পত্নী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, তাঁকে আমি দেখতে যাবো না এ কি হ'তে পারে, আমি ডাক্তার তো বটে। তখন তাঁর নিজের শরীর ভেঙে পড়েছে। কিন্তু তাঁকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না, রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালেন সঙ্গে চিরসাথী তাঁর Stethoscope—সেদিন দেখেছি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করবার আহ্বানে আবার যেন তাঁর লুপ্তশক্তি ফিরে এসেছে।

তার অল্প দিন পরেই এলো নিজের অন্তিমকাল। রোগের যন্ত্রণা সেদিনও তাঁকে অস্থির করতে পারে নি। তখনো তাঁর মুখে হাসি। ছেলেমেয়েদের দেখে বললেন, সকলে কাছে এসেছ বলে ভালো লাগছে। তার পরে বৈশাখী পূর্ণিমার আগের দিন অপরাহ্ণে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন চিরনিদ্রায়। শুক্লা চতুর্দ্দশীর নির্ম্মল জ্যোৎস্না রজনীতে উস্রী নদীর জলস্রোতের মাঝখানে মুক্ত আকাশের নীচে তাঁর দেহ চিতাভস্মে পরিণত হ'ল। তাঁর জীবন ছিল যেমন অনাড়ম্বর গম্ভীর সেদিন রাত্রির পরিবেশও ছিল তেমনি শুভ্র পবিত্র। সেদিন দেখলুম—"সে প্রচণ্ড গতি অবসান।" মৃত্যু তাঁর কাছে বারে বারে হার মেনেছিল, সেদিন মৃত্যুর হ'ল জয়।

মৃত্যুর হ'ল জয়? না, তা নয়। সেদিনও মৃত্যুর হয়েছে পরাজয়। মরণের মধ্যে সেদিনও আমরা দেখেছি প্রাণের জয়। এই মানুষটির জীবনে ত্যাগে, ধৈর্য্যে, বীর্য্যে

আমরা পেয়েছি প্রাণের পরিচয়। যে প্রাণ বিরাট্, যে প্রাণ মৃত্যু—নমস্কার করি সেই প্রাণকে।

প্রণাম

আজ যাঁর পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে আমরা মিলিত হয়েছি, তাঁর সঙ্গে ছিল আমার নাড়ীর যোগ। তাঁর সঙ্গে এই পৃথিবীর পরিচয় শুরু হয় আমার সূতিকা-গৃহে। শৈশব কালে তিনি মৃত্যু-মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন—ঘোর রোগের সময় মৃত্যুর হাত থেকে পাহারা দিয়ে তিনি আমার শিয়রের কাছে রাতের পর রাত ব'সে কাটিয়েছেন। বাল্যকালে যখন আমার মাকে হারাই তিনি আমাকে টেনে নিয়েছিলেন তাঁর স্নেহ-ক্রোড়ে। যৌবনে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচলিত বিবাহ-প্রথা নিয়ে যখন সমাজের সঙ্গে আমার মতভেদ ঘটলো তখন তিনিই আমার বিবাহ-সভার আয়োজন করলেন নিজের বাড়িতে আর তাঁর বন্ধু-কন্যাকে সম্প্রদান করেছিলেন তিনি স্বয়ং। আমার জন্মের আগে থেকেই তাঁর স্নেহ-ভালবাসার অজস্র দান আমি পেয়েছি। শুধু স্নেহ-ভালবাসা নয়, প্রাপ্তবয়সে তাঁকে পেয়েছিলেম বন্ধুরূপে। তিনি আমার চিন্তায়, কর্ম্মে, চেষ্টায় উৎসাহ দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন।

জানি মৃত্যু তাঁকে সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছে, তবু আজ মনে কোনো ক্ষোভ নেই তা বলতে পারি না। মনে হচ্ছে, যদি আরো কিছুদিন তিনি আমাদের কাছে থাকতেন। শুধু আমি নয়, আমার মতো বা আমার চেয়েও বেশি ক'রে যারা তাঁকে পেয়েছিল—তাঁর পুত্র, পৌত্র, বধূ, কন্যা, আত্মীয়স্বজন—জানি সকলেরই মন আজ শোকার্ত্ত। তাঁর বন্ধুবান্ধব, যাঁরা তাঁকে কাছে থেকে দেখেছেন বা যাঁরা দূরে ছিলেন, জানি সকলেই আজ তাঁর বিয়োগ-দুঃখ-কাতর।

কিন্তু আজ আমরা শোক করবো না। আজ আমরা স্মরণ করবো তাঁর স্নেহ-প্রেম, দয়া-দাক্ষিণ্য, তাঁর বিচিত্র কর্ম্ম-শক্তি ও সুদৃঢ় চরিত্রবল যার দ্বারা তিনি আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধতর করেছেন, আমাদের ভবিষ্যৎকালের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর ক'রে দিয়েছেন। আর সর্ব্বোপরি স্মরণ করবো কীর্ত্তির চেয়ে মহত্তর তাঁর জীবনকে, মৃত্যু যাকে ম্লান করেনি কিন্তু যাকে দান করেছে পরম পরিণতি। বাইরের নিন্দা-খ্যাতি মান-অপমান এমন কি অকৃতজ্ঞতাও তাঁকে কখনো বিচলিত করেনি। তিনি ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত আপন মহিমায়। তাঁকে আমরা প্রণাম করি।

অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়।
আবিরাবীর্ম্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন
মাং পাহি নিত্যম্।

জন্ম ও মরণকে ভাগ ক'রে দেখাই শূন্যতা। এই অসত্য দৃষ্টি আমাদের ঘুচে যাক্, অন্ধকারের আবরণ অপসারিত হোক্, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখি প্রাণের অমৃতরূপ। এই একটি মানুষের জীবনে আমরা দেখেছি প্রাণের প্রকাশ—আমাদের জীবনেও যিনি স্বপ্রকাশ তিনি নিজেকে প্রকাশিত করুন। এই মানুষটির জীবনে আমরা বারংবার দেখেছি রুদ্রের আবির্ভাব—বীরের হৃদয় তাতে কম্পিত হয় নি, সঙ্কটের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি ক'রেছিলেন রুদ্রের দক্ষিণ মুখ। মৃত্যুকে অস্বীকার ক'রে নয়, দুঃখকষ্টকে এড়িয়ে গিয়ে নয়, বাধাবিঘ্ন-বিপত্তির মধ্যে, বিপদের মধ্যে, ক্ষতির মধ্যে, অপচয়ের মধ্যে, পরাজয়ের মধ্যে, আমরা যেন লাভ করি রুদ্রের আশীর্ব্বাদ।

১৯৪৩, ২০শে জুন তারিখে কলিকাতা বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে শ্রাদ্ধবাসরে নিবেদিত।

যাত্রাপথে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

দূরের বঁধুর উত্তরীয়ের গন্ধ-বাতাস বহে
পান্থ! নামাও তুচ্ছ-স্মৃতির ঝুলি।
কালের নদীর ধূসর-বেলায় মায়ার কানন ভুলি'
দাঁড়াও এবার,—হিসেব-নিকেশ নেবার সময় নহে।
বঁধুর মিলন-তীর্থে আবার আস্‌ছে তোমার ডিঙা
মরণটারেই পান্থ! তোমার ভয়?
জীবন-জমির ভুলের ফসল বিশ্বে ক'দিন রয়!
নিত্য ধরায় সৃজনমাঝেই বাজ্‌ছে কালের শিঙা।

ঝাউয়ের শাখা হাতছানি দেয়, ঝিমায় চরের পাখী,
কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী সব ঝরে।
মর্ত্ত্যলোকের প্রেমের মধুপ মিথ্যা মধুর তরে
আয়ুর কুসুম খুঁজ্‌ছে তোমার নাম ধরে আজ ডাকি'।
দিনের আকাশ অস্ত-আলোর অর্ঘ্য প্রণাম লভি'
অন্ধকারের গাঁথছে বরণ মালা;
ঘাটের ধারেই রইবে প্রাণের বিদায় প্রদীপ-জ্বালা,
শেষের খেয়ায় পথ চাওয়াতেই জাগছে পারের ছবি।

ডিমের পরিণতি

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

'ডিম আগে কি পাখী আগে ?'—সাধারণের পক্ষে এ সমস্যা রহস্যময় প্রতীয়মান হইলেও জীবতত্ত্বে অন্ততঃ প্রাথমিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই ডিমের পূর্ব্ববর্ত্তিতার বিষয় একবাক্যে অনুমোদন করিবেন। কারণ, উদ্ভিদ ও



কুমীরের ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইতেছে

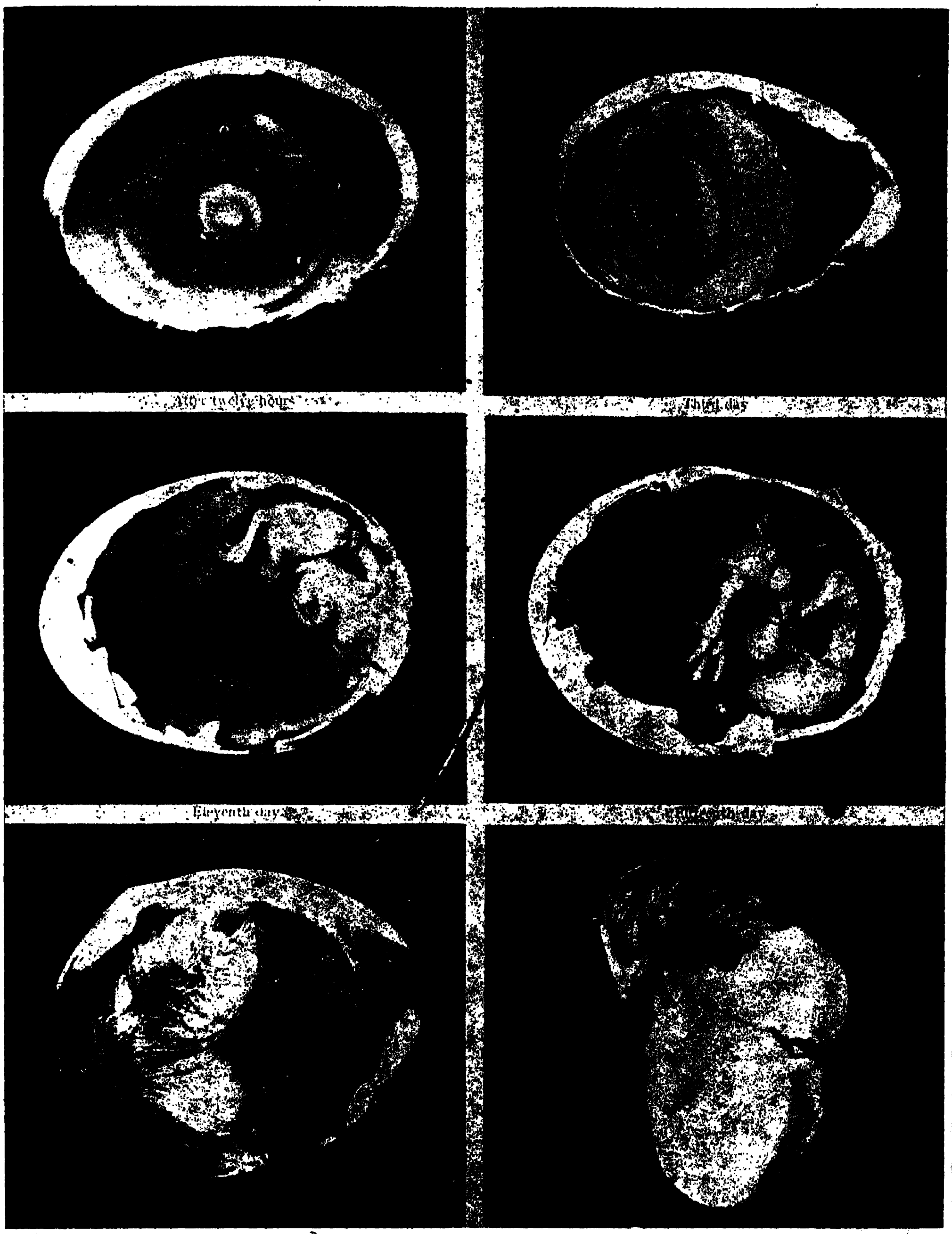
জীবজগতে অভিব্যক্তির সর্ব্বক্ষেত্রেই সহজ, সরল গঠনপ্রণালী হইতে ক্রমশঃ জটিলতার আবির্ভাব ঘটিতে দেখা যায়। ডিম অপেক্ষা পাখীর গঠনপ্রণালী বহুগুণে জটিলতা-পূর্ণ—এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

পাখীর সহিত ডিমের তুলনা করিলে দেখা যাইবে—পাখীর দেহের বাহ্যিক বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়াও আভ্যন্তরীণ যান্ত্রিক কৌশলের অসংখ্য জটিলতা রহিয়াছে। কিন্তু ডিমের মধ্যে কেবল অর্দ্ধতরল পদার্থে ভাসমান হলুদ রঙের একটি বৃহদাকার গোলক পরিদৃষ্ট হইবে। এই হলুদ-গোলকের উপরিভাগে জেলীর মত একটু পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই ডিমের প্রধান উপাদান, জীব-পঙ্ক বা প্রোটোপ্লাজম্। কেবলমাত্র ডিমেরই নহে, জীব-পঙ্ক সর্ব্বপ্রকার জীবিত পদার্থেরই প্রধান উপাদান। এই জীব-পঙ্ক ক্রমশঃ বিভিন্ন দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জীবের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টি করে; অধিকন্তু জাতিগত ও ব্যষ্টিগত বৈশিষ্ট্য এবং আকৃতিগত সাদৃশ্যসমূহ বংশ-পরম্পরায় সন্তান-সন্ততিতে বিকশিত করিয়া তোলে। বিবিধ রকমের উদ্ভিদ ও জীবের জীব-পঙ্কের মধ্যে বিবিধ পার্থক্য বিদ্যমান থাকিলেও আপাতঃদৃষ্টিতে প্রত্যেকের মধ্যেই অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সাদৃশ্য কেবল জীব-পঙ্কের মধ্যেই নহে—বিভিন্ন জাতীয় ডিম হইতে উৎপন্ন ভ্রূণের বিভিন্ন অবস্থায় পরস্পরের মধ্যেও বিস্ময়কর সাদৃশ্য বিদ্যমান। প্রত্যেক ডিমের মধ্যে একই রকমের পদার্থের অস্তিত্ব থাকিলেও বিভিন্ন প্রাণী আত্মপ্রকাশ করে কিরূপে? ডিমের অভ্যন্তরস্থ সামান্য একটু জেলীর মত পদার্থের সাহায্যে হাঁসের ডিম হইতে হাঁস এবং মুরগীর ডিম হইতে মুরগীই বাহির হইয়া থাকে—ইহা একটি অদ্ভুত বিস্ময়ের ব্যাপার। যদি ধরিয়া লওয়া যায়—ডিম উৎপত্তির ব্যাপারটা যান্ত্রিক কৌশলের মত কোন কৌশলে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া বিভিন্ন ডিমের মধ্যে সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা হইলে ভ্রূণের গঠন আরম্ভ হইবার পর বিভিন্ন প্রাণীর বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আত্মপ্রকাশ করে কেমন করিয়া? অবশ্য প্রথমাবস্থায় বিভিন্ন ভ্রূণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির মধ্যেও একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু পরিণত অবস্থায় গুরুতর পার্থক্য আত্মপ্রকাশ করে। যেমন গরু, ঘোড়ার খুর, পাখীর ডানা, বাদুড়ের ডানা, তিমির পাখনা ও মানুষের হাত প্রভৃতি ভ্রূণের প্রথমাবস্থায় দেখিতে একরূপ হইলেও পরিণত অবস্থায় তাহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য বাহির করা দুষ্কর। একই রকম ডিম্বকোষ হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন জীবের দৈহিক গঠন-বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে কি ভাবে সন্তান-সন্ততিতে



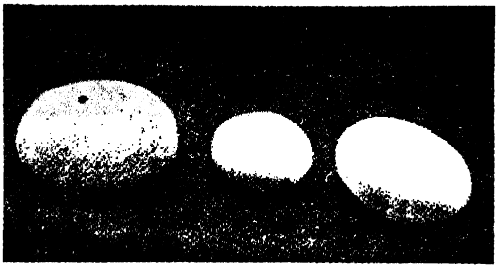
কুমীরের বাচ্চা ডিম হইতে মুখ বাহির করিয়াই ভয় দেখাইতেছে

পরিচালিত হয়? ক্রোমোসোম্ আবিষ্কার এবং 'জিন' সম্পর্কিত মতবাদের ফলে এবিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত হইয়া থাকিলেও প্রকৃত তথ্য এখনও রহস্যাবৃতই রহিয়া গিয়াছে। যান্ত্রিক কৌশলের মত কোন অভাবনীয় কৌশলে



বাম হইতে দক্ষিণে—উপরে (১) ইনকিউবেটারে বসাইবার ১২ ঘণ্টা পরে মুরগীর ডিমের অবস্থা দেখান হইয়াছে। (২) তৃতীয় দিনে মুরগীর ডিমের অবস্থা। মধ্যে—(৩) এগার দিনের অবস্থা। (৪) পনর দিনের অবস্থা। নীচে—(৫) বিশ দিনের অবস্থা। (৬) বাচ্চা বাহির হইতেছে

এরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে—ইহা মনে করিবারও কোন সঙ্গত কারণ নাই। তবে এ সম্বন্ধে এটুকু মাত্র বলা যায় যে, বহুকালের অভ্যাস এবং সংস্কারের প্রভাব কোন অজ্ঞাত উপায়ে এই অদ্ভুত ঘটনা নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।



বামে—পাইথনের ডিম। মধ্যে—পেচকের ডিম। দক্ষিণে—কুমীরের ডিম

কোন নূতন উদ্ভিদ অথবা কোন নূতন প্রাণী প্রথমতঃ একটি নিষিক্ত ডিম্ব-কোষ রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। ডিম্ব-কোষ হইতে উৎপন্ন উদ্ভিদ অথবা প্রাণীর সহিত তাহার কোনই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু একটি-মাত্র কোষ সমন্বিত ডিম হইতে কেমন করিয়া পেশী, তন্তু এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আবির্ভাব ঘটে? এক সময়ে লোকের ধারণা ছিল—পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ অথবা প্রাণী অতি সূক্ষ্মাবস্থায় ডিমের মধ্যে অবস্থান করে এবং তাহা এতই



লতাপাতার নির্মিত বাসায় একজাতীয় কুমীরের ডিম

ক্ষুদ্র যে মানুষের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। কিন্তু এখন আমরা জানি—উদ্ভিদের ডিম্ব-কোষই হউক কি প্রাণীদের ডিম্বাণু বা ডিমই হউক কাহারও মধ্যে এরূপ কোন সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্ব নাই। ডিমের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সূক্ষ্ম শরীরের অস্তিত্বের বিষয় একটা অলীক কল্পনা মাত্র। উদ্ভিদ, কীট-পতঙ্গ, পশুপক্ষী মানুষ, প্রভৃতির দেহগঠনে যত রকমের জটিলতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার উদ্ভব হইয়াছে নিষিক্ত ডিমের একটি মাত্র কোষ হইতে। নিষিক্ত ডিম্ব-কোষটি বাড়িতে আরম্ভ করিবার পর প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। একটি কোষ হইতে দুইটি কোষ উৎপত্তির ব্যাপারটা পরিষ্কাররূপেই দৃষ্টিগোচর হয়। দুইটি কোষ উৎপন্ন হইলেও তাহারা বিচ্ছিন্ন না হইয়া পরস্পর গাত্রসংলগ্ন অবস্থায় অবস্থান করে। এইরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দুইটি কোষ চারিটি কোষে পরিণত হয়। চারিটি হইতে আটটি এবং আটটি হইতে ষোলটি—এই



কচ্ছপের ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইয়াছে

অনুপাতে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়া কিছুকালের মধ্যেই বিশেষ বিশেষ দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কোষগুলি উৎপাদিত হইবার পর বিভিন্ন পার্থক্য প্রকাশিত হইতে থাকে। অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্য্যায়ের প্রাণীর ডিম্ব-কোষ হইতে উৎপন্ন অপরিণত ভ্রূণে এই সময় তিনটি স্তরে সজ্জিত বিভিন্ন কোষ দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্তরের কোষ হইতে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবির্ভূত হয়। স্তরবিন্যাসের পর ভ্রূণ পিতামাতার অনুরূপ সুনির্দ্দিষ্ট আকৃতি পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। বিভিন্ন স্তরের কোষ হইতে কিরূপে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবির্ভূত হয় এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব নহে। মোটের উপর সুসমঞ্জস অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সমন্বিত প্রাণীদেহ গঠন করিবার জন্য ভ্রূণ নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বেই কোষগুলি সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইয়া পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। এই পুঞ্জীভূত কোষসমষ্টি হইতেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন সুরু হয়।

ইন্‌কিউবিটারে বসাইবার পর অথবা মুরগী তা' দিতে সুরু করিবার পর সাত-আট ঘণ্টা অন্তর এক একটি ডিম কাটিয়া ক্রমান্বয়ে পাঁচ-ছয় দিন লক্ষ্য করিলেই ভ্রূণের প্রথম আবির্ভাব ও তাহার ক্রমবিকাশ পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হইবে। সাধারণ একটা তাজা ডিম ভাঙ্গিলেই দেখা যাইবে—বর্ণবিহীন অর্দ্ধতরল স্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে হলুদ রঙের একটা গোলক ভাসিতেছে। ডিমের এই গোলাকার পীতাংশের উপরিভাগে ছোট্ট একটি চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র পদার্থটিই জীবপঙ্ক বা জীব-কোষ। হলুদ রঙের জিনিসটা ভ্রূণের দেহ পোষণোপযোগী পদার্থে পরিপূর্ণ। 'য়্যালবুমেন' নামে পরিচিত বর্ণবিহীন স্বচ্ছ পদার্থ প্রকৃত প্রস্তাবে ভ্রূণ-উৎপাদক কোষের অংশ নহে, বিশেষতঃ ডিম্ব-কোষ ডিম্বাধার হইতে নির্গত হইবার পর উহা পীতাংশের চতুর্দ্দিকে সঞ্চিত হয়। ইন্‌কিউবিটারে বসাইবার দুই-তিন দিন পরেই নিষিক্ত ডিমের পীত-গোলকের উপর রক্তবর্ণের রেখাঙ্কিত ছবির মত আংশিক গোলাকার একটি চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই ভ্রূণের প্রথম পত্তন। দিন পাঁচেক পরেই রক্তবর্ণের গোলাকার রেখা-চিত্রটিকে বর্দ্ধিত আকারে ধনুকের মত বাঁকানো অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়। অধিকন্তু উহার চতুর্দ্দিকে উদ্ভিদের শিকড়ের মত রক্তবর্ণের শিরা-উপশিরা জন্মিয়া থাকে। দিন দশেক পরে ইন্‌কিউবিটারের ডিম ভাঙ্গিলে দেখা যাইবে—ভ্রূণের উদর, মস্তক, চোখ, ঠোঁট প্রভৃতি প্রায় সুনির্দ্দিষ্ট আকৃতি গ্রহণ করিয়াছে এবং পা ও ডানার আভাস পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। অধিকন্তু একটি লেজও গজাইয়াছে। দিন-পনরো পরে সুগঠিত ডানা ও পা সমেত যথেষ্ট বর্দ্ধিত আকারের ভ্রূণ পরিদৃষ্ট হইবে। পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া একুশ দিনে ভ্রূণ মুরগীর বাচ্চা-রূপে ডিম হইতে বহির্গত হইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবে। এস্থলে প্রদত্ত ছবি হইতে মুরগীর ডিমের মধ্যস্থিত ভ্রূণের ক্রম-পরিণতি পরিষ্কার উপলব্ধি হইবে। প্রথম অবস্থায় পাখীর সহিত ভ্রূণের কোনই সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। ভ্রূণের প্রথমাবস্থার সহিত পরিণত অবস্থার তুলনা করিলেই ক্রমবর্দ্ধিত জটিলতার বিষয় বুঝিতে পারা যাইবে।



গাছের ডালে টুয়ামোক-পাখীর ডিম

ভ্রূণের ক্রম-বিকাশের মধ্যে আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। যে-কোন প্রাণীর ভ্রূণ পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে—তাহারা অভিব্যক্তির যে পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে তাহার নিম্নস্তরের সকল প্রাণীদের ক্রমবিকাশের একটা সংক্ষিপ্ত ধারার মধ্য দিয়াই যেন প্রত্যেকটি ভ্রূণ পরিণত অবস্থায় রূপান্তরিত হইতেছে অর্থাৎ প্রত্যেকটি ভ্রূণের জীবনেই যেন জীব-জগতের দীর্ঘকালব্যাপী বিবর্ত্তনের সংক্ষিপ্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। ডিমের এককোষিক অবস্থা অনেকটা 'প্রোটোজোয়া'র অনুরূপ। কোষগুলি সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইয়া স্তরে স্তরে সজ্জিত হইবার পর শূন্যগর্ভ রচিত হয় (এই শূন্যগর্ভই কালক্রমে পৌষ্টিক নালী ও উদর-গহ্বরে রূপান্তরিত হইয়া থাকে।) তখন ইহাকে 'পলিপ' জাতীয় প্রাণী বলিয়াই মনে হয়। আরও কিছুকাল পরে ভ্রূণের কান্‌কোর মত উপাঙ্গ এবং লেজ আত্মপ্রকাশ করে। এ অবস্থায় মৎস্য জাতীয় প্রাণীর সহিত ইহার যথেষ্ট সামঞ্জস্য লক্ষিত হইয়া থাকে। শেষ অবস্থায় ভ্রূণ তাহার নির্দ্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করে। প্রাণি-জগতের সর্ব্বোচ্চ স্তরের মনুষ্য-ভ্রূণেও এক অবস্থায় কান্‌কো ও লেজের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। কেবলমাত্র প্রাণি-জগতের পক্ষেই নহে, উদ্ভিদ-ভ্রূণের পক্ষেও এ কথা সমভাবে প্রযুজ্য। অবশ্য উন্নত প্রাণীর ভ্রূণের সহিত তন্নিম্নস্তরের প্রাণীদের বাহ্যতঃ একটা সাদৃশ্য দেখা গেলেও



প্ল্যাটিপাস বা হংসচঞ্চু

মুরগীর ভ্রূণ প্রকৃত প্রস্তাবে 'পলিপ'ও নহে বা মাছও নহে। মানুষ, পাখী প্রভৃতির ভ্রূণে এক অবস্থায় কান্‌কোর মত একটা জিনিষের আবির্ভাব ঘটিলেও তাহা প্রকৃত কান্‌কো নহে। উন্নত স্তরের প্রাণীদের এই ধরণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনই প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হয় না। ভ্রূণ পরিণত অবস্থায় উপনীত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তাহা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। যদি প্রয়োজনেই না লাগে তবে এগুলি কেনই বা আবির্ভূত হয়? ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলেও জীবতত্ত্ববিদেরা বলেন—উন্নততর জীবের পূর্ব্বপুরুষেরা লক্ষ লক্ষ যুগ পূর্ব্ব হইতে নিম্নতর বিভিন্ন জীবের অবস্থা অতিক্রম করিয়া তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। অভিব্যক্তির ধারায় সমষ্টিগত ভাবে যাহা ঘটিয়াছিল ব্যষ্টিগতভাবে প্রত্যেকের জীবনে তাহার একটা প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। কাজেই বংশানুক্রমে সেই ক্রম-বিবর্ত্তনের বিভিন্ন অবস্থার সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ভিতর দিয়া প্রত্যেকটি জীবকে তাহার পরিণত অবস্থায় উপস্থিত হইতে হয়। প্রত্যেকটি জীবনের বিভিন্ন অবস্থাগুলি যেন আদি জীব হইতে সর্ব্বশেষ বিবর্ত্তিত জীবের জাতিগত বংশধারার পর পর সজ্জিত কতকগুলি নিখুঁৎ জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।



ম্যাটিপাসের বাসা ও তাহার ডিম

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমবায়ে যেমন বৃহৎ ইমারৎ গঠিত হইয়া থাকে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহও সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কোষের সমবায়ে গঠিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমরা যাহাকে ডিম, ডিম্বাণু বা ডিম্ব-কোষ বলি—সেই একটিমাত্র কোষবিশিষ্ট পদার্থ হইতেই অসংখ্য কোষ সৃষ্টি হইয়া থাকে। ডিম বলিতে কেবল হাঁস, মুরগী, সাপ, ব্যাঙের ডিমের কথাই হইতেছে না, উদ্ভিদ, বীজ, স্তন্যপায়ী



উট পাখীর ডিম ভাঙ্গিয়া বাচ্চা বাহির হইয়াছে।

প্রাণীদের গর্ভাবস্থিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অদৃশ্য ডিম্বাণু বা বীজ-কোষও এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে—পাখী, সরীসৃপ প্রভৃতি প্রাণীদের ডিমের আকৃতি ও আয়তনে একটা বৈশিষ্ট্য থাকিলেও উদ্ভিদ্ বীজ হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য মাতৃগর্ভাবস্থিত ডিম্বাণু পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই কোন-না-কোন প্রকারের ডিম ছাড়া আর কিছুই নহে। তফাতের মধ্যে পাখী, সরীসৃপ প্রভৃতির ডিম আয়তনে বৃহৎ এবং মাতৃগর্ভ হইতে বাহিরে আসিবার পর খোলার অভ্যন্তরেই তাহাদের ভ্রূণের ক্রমবিকাশ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু জরায়ুজ প্রাণীদের ডিম বা ডিম্বাণু হইতে মাতৃগর্ভেই ভ্রূণ উৎপাদিত হইয়া ক্রমবিকশিত হইবার পর পরিণত অবস্থায় বাহির হইয়া আসে। মানুষ জরায়ুজ প্রাণী। মানুষের ডিম্ব-কোষ বা ডিম্বাণু এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। পরিমাপে ইহা এক ইঞ্চির ১২৫ ভাগের এক ভাগ মাত্র হইবে। জরায়ুর মধ্যেই ডিম্বাণু হইতে ভ্রূণ উৎপাদিত হইয়া পূর্ণ পরিণতি লাভ করে বলিয়া হাঁস, মুরগীর ডিমের মত বাহিরের শক্ত আবরণী গঠিত হয় না। উদ্ভিদের বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় যেমন প্রথমেই শিকড় বাহির করিয়া তাহার অবস্থান পাকা করিয়া লয়, মনুষ্য ডিম্বাণুও সেরূপ ডিম্বাধার হইতে বাহির হইয়া জরায়ুর গায়ে সূক্ষ্ম তন্তুর সাহায্যে আটকাইয়া থাকে। অণ্ডজ ও জরায়ুজ প্রাণীদের ডিমের আয়তন-বৈষম্যের কারণ সহজেই উপলব্ধি হয়। অণ্ডজ প্রাণীর ডিম বাহিরে আসিবার পর মাতৃ-দেহের সহিত কোনই সংযোগ থাকে না, কাজেই ডিমের মধ্যস্থিত ভ্রূণের পরিপুষ্টির জন্য পূর্ব্ব হইতেই যথেষ্ট খাদ্য-বস্তু সঞ্চিত থাকা আবশ্যক। কিন্তু জরায়ুজ প্রাণীদের

ডিম্বাণু মাতৃগর্ভে নিষিক্ত হইবার পর মাতার দেহ হইতে পুষ্টিকর পদার্থ আহরণ করিয়া বৃদ্ধি পাইতে পারে বলিয়া তাহার জন্ম পৃথকভাবে খাদ্য সঞ্চিত থাকে না। এই কারণেই উভয়বিধ ডিমের আয়তনে এত পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু নূতন জীব উৎপত্তির ব্যাপারে উভয় প্রকার ডিমের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। প্রাণীদের মধ্যে অণ্ডজ এবং জরায়ুজ এই দুই শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া গেলেও কতকগুলি আণুবীক্ষণিক প্রাণী ছাড়া প্রকৃত প্রস্তাবে সকলকেই অণ্ডজ বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক, অণ্ডজ প্রাণীদের মধ্যে মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী হিসাবে ডিম হইতে ভ্রূণের পরিণতির বিভিন্ন অবস্থায় অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। পাখী,



বিরাটাকারের শামুকের ডিম হইতে বাচ্চা শামুক বাহির হইতেছে

সরীসৃপ প্রভৃতি মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ডিমের খোলসের অভ্যন্তরেই ভ্রূণের চরম পরিণতি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কীটপতঙ্গ প্রভৃতি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর ডিম ফুটিয়া মাতা-পিতার অনুরূপ সন্তান জন্মগ্রহণ করে না। ডিম হইতে বাহির হইবার পর বিভিন্ন রূপান্তরের মধ্য দিয়া সর্ব্বশেষে মাতা বা পিতার অনুরূপ আকৃতি পরিগ্রহণ করে। প্রজাপতির ডিম ফুটিয়া প্রথমে শুয়াপোকা বহির্গত হয়। পরে শুয়াপোকা গুটী প্রস্তুত করিয়া পুত্তলীর আকার ধারণ করে। অবশেষে পুত্তলী হইতে পূর্ণাঙ্গ এবং পরিণত গঠনের প্রজাপতি বাহির হইয়া আসে। ফড়িং আকাশে বিচরণ করিলেও তাহাদের ডিম হইতে যে বাচ্চা বাহির হয় তাহারা শৈশব হইতে কৈশোর পর্য্যন্ত জলের নীচেই কাটাইয়া দেয়। তার পর ফড়িং-রূপ ধারণ করিয়া আকাশে বিচরণ করিতে থাকে। কিন্তু কয়েক ক্ষেত্রে অণ্ডজ ও জরায়ুজ প্রাণীদের মধ্যে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায়। যেমন ব্যাঙ, নিউট প্রভৃতি মেরুদণ্ডী প্রাণী হইলেও তাহাদের ডিম ফুটিয়া একবারেই মাতাপিতার অনুরূপ সন্তান জন্মগ্রহণ করে না। ইহাদের ডিমের পরিণতি ঘটে ফড়িং প্রভৃতি অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের ডিমের মত। ব্যাঙাচি জল হইতে উঠিয়া আসিবার পর প্রকৃত ব্যাঙের রূপ পরিগ্রহ করে। আবার প্ল্যাটিপাস, পিপীলিকাভুক একিড্‌না প্রভৃতি স্তন্যপায়ী জীব হইয়াও পাখীর মত ডিম পাড়িয়া থাকে; কিন্তু ডিমের মধ্যেই বাচ্চার পূর্ণ পরিণতি ঘটে না। ইহাদের ভ্রূণ অনেকটা অপরিণত অবস্থাতেই ডিম ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়ে। ভ্রূণটি এমন অবস্থায় বহির্গত হয় যে, তখনও চামড়ার উপর লোম গজায় নাই, চোখ ফোটে নাই এমন কি ঠোঁট দুটিও অতি কোমল এবং অপরিণত। অপরিণত বাচ্চাগুলিকে প্ল্যাটিপাস্ দুগ্ধ-গ্রন্থিসমন্বিত চর্ম্ম-কোটরে স্থাপন করিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। বাচ্চাগুলি মায়ের চর্ম্ম-কোটরে অবস্থান করিয়া অনবরত দুগ্ধ পান করিতে করিতে অল্প সময়ের মধ্যেই পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। ক্যাঙ্গারুর ডিম্বাণু হইতে ভ্রূণ গঠিত হইয়া জরায়ুর মধ্যেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে কিন্তু সম্পূর্ণ পরিপুষ্ট হইবার পূর্ব্বেই জরায়ু হইতে বহির্গত হইয়া মাতার শরীরের নিম্নদেশে থলিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভ্রূণের নাভিমূলে সংলগ্ন থলিতে পাখীর ডিমের পীতাংশের মত পুষ্টিকর পদার্থ সঞ্চিত থাকে। এই পুষ্টিকর পদার্থের সাহায্যে শরীর সুগঠিত হইবার পর মায়ের দুধ পান করিতে আরম্ভ করে। প্রথম অবস্থায় যেন পাম্প করিবার মত প্রক্রিয়ায় বাচ্চার মুখে দুধ ঠেলিয়া দেওয়া হয়।

বিভিন্ন জাতীয় পাখী বিভিন্ন আয়তনের ডিম পাড়িলেও সাধারণতঃ তাহাদের মধ্যে আকৃতিগত একটা সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। সর্ব্বক্ষেত্রেই ইহাদের ডিম শক্ত খোলায় আবৃত। জাতিগত পার্থক্য হিসাবে ডিমের খোলার বর্ণবৈচিত্র্যও কম নহে। কিন্তু ভিতরে সেই একই বস্তু। গোলাকার পীতাংশের এক স্থানে জীব-পঙ্ক নামে জেলীর মত ক্ষুদ্র একটু পদার্থ। এই ক্ষুদ্র পদার্থ হইতে ভ্রূণ উৎপাদিত হইবার জন্ম একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রার উত্তাপের প্রয়োজন। অধিকাংশ পাখীই তাহাদের ডিম ফুটাইবার জন্ম ডিমের উপর বসিয়া উত্তাপের মাত্রা রক্ষা করিয়া থাকে। ডিমের উত্তাপ রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিভিন্ন জাতীয় পাখী ও সরীসৃপেরা বিবিধ উপায় অবলম্বন করে। ম্যালি-ফাউল এবং ব্রাস্-টার্কি তাহাদের শরীরের অনুপাতে

বৃহৎ আকারের ডিম পাড়ে। পালক গজাইবার পর বাচ্চাগুলি ডিম ফুটিয়া বাহির হয় এবং বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উড়িতে পারে। লতাপাতা স্তূপীকৃত হইয়া পচিয়া আছে এরূপ স্থানে ইহারা বালির মধ্যে ডিম পাড়িয়া



আমেরিকান মেঠো সাপ ডিমে তা দিতেছে

রাখে। সাধারণ পাখীর মত ইহারা ডিমে তা' দেয় না। পচনশীল লতাপাতার উত্তাপেই ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। স্ত্রী-পাখী ডিম পাড়িয়াই খালাস। সন্তানের কোন তত্ত্বতালাস করে না। উটপাখীও বালির মধ্যে ডিম পাড়ে, কিন্তু ডিমগুলি প্রোথিত অবস্থায় থাকে না বলিয়া তা' দিবার প্রয়োজন হয়। উটপাখীর আকার যেমন বৃহৎ তাহাদের ডিমও তেমন প্রকাণ্ড। একটা ডিম প্রায় দুই ডজন মুরগীর ডিমের সমান। পাখীরা সাধারণতঃ গাছের উপর অথবা মাটির নীচে বাসা বাঁধিয়া ডিম পাড়ে। কিন্তু আমেরিকার টুয়ামোক বা ফেয়ারী-টার্ণ নামক পাখী কোন প্রকার বাসা নির্ম্মাণের ব্যবস্থা না করিয়াই শয়ানভাবে অবস্থিত কোন গাছের ডালের উপর একটিমাত্র ডিম পাড়িয়া রাখে।

ছোট-বড় বিভিন্ন জাতীয় কুমীরেরা সকলেই শাদা খোলাবিশিষ্ট ডিম পাড়িয়া থাকে। আঠার-উনিশ ফুট লম্বা কুমীরেরা রাজহাঁসের ডিমের মত শ্বেতবর্ণের ডিম পাড়ে। নদীর তীরে বালুকার মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ইহাদিগকে একসঙ্গে কুড়িটা হইতে ষাটটা অবধি ডিম পাড়িতে দেখা যায়। পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জলাভূমির কুমীরেরা জলের ধারে লতাপাতার সাহায্যে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে একসঙ্গে অনেকগুলি করিয়া ডিম পাড়িয়া রাখে। ডিম ফুটিবার সময় হইলে বাচ্চাগুলি খোলার ভিতর হইতে এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ করিতে থাকে। ডিম বালিতে প্রোথিত থাকিলে স্ত্রী-কুমীর এই সময়ে গর্ত্তের মাটি সরাইয়া ফেলে। তখন বাচ্চাগুলি ভিতর হইতে নাক বা ঠোঁটের সাহায্যে খোলা ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসে। অনেক সময় ডিম হইতে মুখ বাহির করিবামাত্রই বাচ্চাগুলি উগ্র স্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকে।

ঘাসের মধ্যে এক প্রকার নির্ব্বিষ সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা নেহাৎ নিরীহ প্রকৃতির না হইলেও মানুষের কোন অপকার করে না। ব্যাঙ, ইঁদুর প্রভৃতি শিকার করিয়া ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই মেঠো সাপগুলি একসঙ্গে অনেক-গুলি করিয়া নরম খোলা-বিশিষ্ট ডিম পাড়ে। বাচ্চাগুলি পরিণতবয়স্ক হইলেই খোলা ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে থাকে। অধিকাংশ সাপই আবর্জ্জনা বা জঞ্জালের স্তূপের নীচে গর্ত্তের মধ্যে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়িবার পর আর কোন খোঁজখবর রাখেনা। পচন-শীল জঞ্জালের উত্তাপে যথাসময়ে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। কতকগুলি সাপ আবার এমনভাবে ডিম পাড়িয়া রাখে যাহাতে সূর্য্যকিরণ হইতে অনায়াসে উত্তাপ সংগৃহীত হইতে পারে। কয়েক জাতীয় সাপ অবশ্য অদ্ভুত অপত্যস্নেহের পরিচয় দিয়া থাকে। পাইথন এবং আমেরিকার 'বুল-স্নেক' ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহারা ডিমগুলিকে স্তূপাকারে সাজাইয়া লম্বা চাবুকের মত শরীরটাকে তাহার চতুর্দ্দিকে থাকে থাকে কুণ্ডলী পাকাইয়া রাখে। তিন মাস ক্রমাগত এরূপে তা' দিবার পর



মেঠো সাপের ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইতেছে

ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। সাপ সাধারণতঃ অণ্ডজ প্রাণী হইলেও কয়েক জাতীয় জরায়ুজ সাপও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ডিম পাড়ে না। পূর্ণাঙ্গ

বাচ্চাই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্ত্তনে কোন কোন অণ্ডজ সাপকে জরায়ুজ সাপে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। অণ্ডজ মেঠো-সাপ এবং অপর কয়েক জাতীয় নির্ব্বিষ সাপ লইয়া পরীক্ষার ফলে এ সম্বন্ধে সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু কোন রকমেই ইহার বিপরীত ঘটনা অর্থাৎ জরায়ুজ সর্পকে অণ্ডজ সর্পে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব হয় নাই।

কচ্ছপেরা জলের ধারে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে একসঙ্গে অনেকগুলি ডিম পাড়িয়া মাটি চাপা দেয়। কেঠো বা কাঠা নামে পরিচিত এক জাতীয় কচ্ছপের ডিম অনেকটা হাঁসের ডিমের মত লম্বাটে ধরণের। কচ্ছপের ডিমের খোলা শক্ত এবং ধবধবে শাদা। মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ উত্তাপে ভ্রূণ পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্রকায় অথচ পূর্ণাঙ্গ কচ্ছপরূপে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসে। শামুকেরাও একসঙ্গে অনেকগুলি করিয়া ডিম পাড়ে। ডিমগুলি পরস্পর গাত্রসংলগ্ন হইয়া থাকে। ডিম ফুটিয়া ক্ষুদ্র অথচ পূর্ণাঙ্গ শামুক নির্গত হয়। ব্রেজিল দেশীয় বিরাটকায় শামুক পায়রার ডিমের মত বড় বড় কয়েকটি ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া মাতাপিতার অনুরূপ ক্ষুদ্রকায় শামুক বহির্গত হইয়া থাকে।

মাছ অণ্ডজ প্রাণী। ডিম্বাণুগুলি পরিপুষ্ট হইলেই স্ত্রী-মাছ সেগুলিকে জলে ছাড়িয়া দেয়। পুরুষ-মাছ সেই সময়ে নিকটেই অবস্থান করে। ডিম্বাণু বহির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পুং-কোষ নির্গত হইয়া তাহাদিগকে নিষিক্ত করিয়া দেয়। নিষিক্ত ডিম হয় স্রোতের সঙ্গে চলিতে থাকে নয় ত জলের নিম্নদেশে স্থিরভাবে অবস্থান করে। কোষ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ডিমের সূক্ষ্ম আবরণী বিচ্ছিন্ন করিয়া ভ্রূণ ক্রমশঃ অনেকটা ব্যাঙাচির আকার ধারণ করে এবং খাদ্য সংগ্রহে ব্যাপৃত হয়। বিভিন্ন অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া কয়েক দিনের মধ্যে মৎস্য-শিশু জাতীয় বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করে। কিন্তু সাধারণতঃ মাছ অণ্ডজ প্রাণী হইলেও তাহাদের মধ্যে কয়েক জাতীয় জরায়ুজ মাছের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা ডিমের পরিবর্ত্তে পরিণত মৎস্য-শিশুই প্রসব করিয়া থাকে। জরায়ুজ মাছের যৌন-মিলন প্রণালীও সাধারণ মাছ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে প্ল্যাটিপাসের মত অণ্ডজ প্রাণীর অস্তিত্ব রহিয়াছে এবং মাছ, টিকটিকি, সাপ, গিরগিটি প্রভৃতি অণ্ডজ প্রাণীদের মধ্যে জরায়ুজ প্রাণীরও দৃষ্টান্ত রহিয়াছে; কিন্তু পক্ষী শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে কোথাও জরায়ুজ প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। জীব-জগতের অভিব্যক্তির দিক হইতে এ রহস্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

বাংলার ইতিহাসের নবাবিষ্কৃত উপাদান

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পি-এচ-ডি

বর্ত্তমান ইংরেজী বর্ষের মার্চ্চ এবং এপ্রিল মাসে আমি পাঁচখানি প্রাচীন লিপি পাঠোদ্ধারের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তন্মধ্যে একখানি দক্ষিণ-কোশল অর্থাৎ বর্ত্তমান ছত্রিশগড়ের অন্তর্গত শরভপুর রাজ্যের অধিপতি মহারাজ নরেন্দ্রের তাম্রশাসন। এই শাসন সম্পর্কে আমার একটি প্রবন্ধ "ভারতবর্ষে"র আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। অপর চারিখানি লিপি বাংলা দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কিত। ইহার মধ্যে একখানি গুপ্তসংবতের ১২০ বর্ষে শৃঙ্গবেরবীথীর আয়ুক্তক অচ্যুতদাস কর্ত্তৃক প্রদত্ত তাম্রশাসন। ইহা বগুড়া জেলার অন্তর্গত কলইকুড়ি গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। "বঙ্গশ্রী"র বৈশাখ সংখ্যায় এই তাম্রশাসন সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধটিতে আমি অবশিষ্ট লিপিত্রয় সম্পর্কে আলোচনা করিব। এই তিনটি লিপির মধ্যে দুইটি মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদের যাদুঘরে রক্ষিত গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের রাজত্বের ১৯শ বর্ষে প্রদত্ত দুইখানি তাম্রশাসন এবং তৃতীয়টি ত্রিপুরা জেলার নারায়ণপুর গ্রামে প্রাপ্ত একটি বিনায়ক মূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ পালবংশীয় প্রথম মহীপালদেবের চতুর্থ রাজ্যবর্ষের একখানি শিলালিপি।

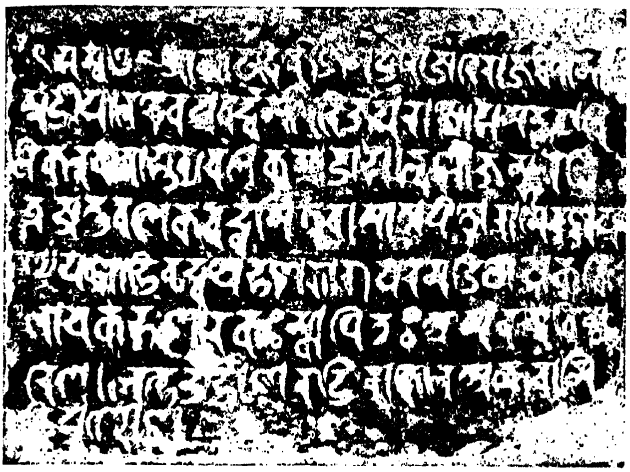
শশাঙ্কের রাজত্বকালের দুইখানি তাম্রশাসন

বিগত ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মেদিনীপুরের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন দুইখানি তাম্রফলক সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখার যাদুঘরে দান করেন। শোনা যায়, দক্ষিণ-মেদিনীপুরের জনৈক মুসলমান গৃহস্থের নিকট হইতে

ফলক দুইটি সংগৃহীত হইয়াছিল। মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদের মাসিক মুখপত্র "মাধবী"র এক সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩৪৫, পৃষ্ঠা ৩-৬) শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী ঐ তাম্রশাসনদ্বয়ের পাঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বসু-মহাশয়ের পাঠ ও ব্যাখ্যা সর্ব্বথা মূলানুগত না হইলেও উহা হইতে লেখ দুইটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন, যে, তাম্রশাসন দুইটি গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের রাজত্বকালে প্রদত্ত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, "মাধবী"তে প্রকাশিত প্রবন্ধটি পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। গত এপ্রিল মাসে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদের একটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলেন। তিনি পরিষদের যাদুঘরে ঐ অমূল্য প্রত্নসম্পদ্ দেখিতে পান এবং সুষ্ঠুরূপে পাঠোদ্ধারের জন্য তাম্রফলক দুইটি কলিকাতায় লইয়া আসেন। ডক্টর মজুমদার বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের উপর শাসনদ্বয়ের সম্পাদন ভার অর্পণ করেন। আমি এই অনুগ্রহের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক ঐতিহাসিক সমাজে সুপরিচিত। তিনি সপ্তম শতাব্দীর প্রথমপাদে (আনুমানিক ৬০০-৬২৫ খ্রীঃ) রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার বাহুবলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিস্তৃত অঞ্চল গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল এবং ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালীর মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বিরাট্ ঐতিহাসিক চরিত্র সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারি নাই। শশাঙ্কের কতিপয় মুদ্রা, রোটাসগড়ে প্রাপ্ত একটি শীলমোহরের ছাঁচ, পূর্ব্ব-গঞ্জামের সামন্তরাজ দ্বিতীয় মাধববর্ম্মার একখানি তাম্রশাসন, গৌড়ের শত্রু হর্ষবর্দ্ধনের বাঁশখেরা ও মধুবন লিপি, কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার নিধনপুর লিপি, বাণভট্টের হর্ষচরিত ও উহার টীকা, চীন-পরিব্রাজক হিউএন-সঙের বিবরণ এবং আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামক বৌদ্ধ গ্রন্থাদি হইতে এই মহাপরাক্রান্ত সম্রাটের রাজত্বকাল সম্পর্কে কিছু কিছু সত্য বা মিথ্যা তথ্য জানা গিয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং প্রথম জীবনে উত্তরকালীন গুপ্তবংশীয় মহাসেনগুপ্ত অথবা মৌখরি রাজগণের সামন্তরূপে শাহাবাদ অঞ্চলের শাসক ছিলেন। মহাসেনগুপ্ত মগধের মৌখরি শক্তি ধ্বংস করেন। তাঁহার অব্যবহিত পরে আমরা মগধে শশাঙ্কের প্রভুত্ব দেখিতে পাই। সুতরাং মনে হয়, সাময়িক ভাবে মগধ হইতে মৌখরি এবং গুপ্ত-প্রাধান্য লোপ করিতে শশাঙ্কেরও কিছু হাত ছিল। সম্রাট্ শশাঙ্ককে গৌড় বা কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অধিপতি বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কর্ণসুবর্ণ শশাঙ্কের রাজধানীর নাম। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এই নগর বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ শহরের কয়েক মাইল দক্ষিণে আধুনিক রাঙ্গামাটি অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। সঙ্কীর্ণ অর্থে পদ্মা নদী ও বর্দ্ধমান অঞ্চলের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র ভূভাগকে গৌড় বলা হইত; অবশ্য ক্রমশঃ এই দেশের ভৌগোলিক পরিধি বিস্তৃত হইয়াছিল। ঠিক কি সূত্রে শশাঙ্ক গৌড়সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। শশাঙ্কের সময়ের খুব কাছাকাছি জয়নাগ নামক জনৈক নরপতি কর্ণসুবর্ণের অধিপতি ছিলেন; তাঁহার রাজত্বকালের (সম্ভবতঃ তাঁহার তৃতীয় রাজ্যবর্ষের) একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার বিস্তৃত অঞ্চল গোপচন্দ্র নামক একজন পরাক্রান্ত নরপতির সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। এই শতাব্দীতে মধ্য-বাংলায় শাসন পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, এরূপ আরও কতিপয় নরপতির অস্তিত্ব অবগত হওয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহাদিগকে গৌড়েশ্বর বলা যায় কিনা তাহা অনিশ্চিত। এই সকল নরপালের সহিত শশাঙ্কের সম্পর্ক কিরূপ ছিল, তাহাও নির্ণীত হয় নাই। অবশ্য মগধের মৌখরি বংশের লিপি হইতে বুঝা যায়, ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড় একটি সামুদ্রিক বাণিজ্যে সম্পন্ন শক্তিশালী রাজ্য ছিল। সম্ভবতঃ এই রাজ্যের সভাকবিগণের রচিত কাব্যসম্পদই সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্ট এবং কাব্যাদর্শকারকে গৌড়ী নামক স্বতন্ত্র রচনা-রীতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিল। কেহ কেহ শশাঙ্ককে গুপ্তবংশীয় বলিয়া মনে করেন; এই অনুমানের সমর্থক কোনই প্রমাণ নাই। যাহা হউক, মগধের মৌখরিশক্তি নির্ম্মূল হইবার পর শশাঙ্ক যুক্ত-প্রদেশের মৌখরিগণের বিরুদ্ধে মালবের রাজার সহিত সন্ধিবদ্ধ হন। সম্ভবতঃ এই মালবরাজের নাম দেবগুপ্ত এবং তিনি গুপ্তবংশীয় ছিলেন। এই গুপ্তবংশের অপর একটি শাখা গৌড়ের শত্রু থানেশ্বর-রাজের মিত্রপক্ষ ছিল। গৌড়-মালবের মিলনের ফলে ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে মিত্রপক্ষ কর্ত্তৃক কনৌজ অধিকৃত হয় এবং মৌখরি-রাজ গ্রহবর্ম্মা নিহত হন। অতঃপর গ্রহবর্ম্মার শ্যালক থানেশ্বর-পতি রাজ্যবর্দ্ধন এই সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন বটে, কিন্তু স্বয়ং শশাঙ্ক কর্ত্তৃক নিহত হন। এই ঘটনা সম্পর্কে থানেশ্বর পক্ষের কিঞ্চিৎ পরস্পরবিরোধী বিবরণমাত্র আমাদের

হস্তগত হইয়াছে। তদনুসারে রাজ্যবর্দ্ধন সত্যানুরোধে শক্র-ভবনে উপস্থিত হইলে শশাঙ্ক কাপুরুষের ন্যায় তাঁহাকে হত্যা করেন। কাহিনীটি মূলতঃ সত্য হইতে পারে; কিন্তু গৌড়পক্ষের বক্তব্য না জানিয়া এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত



প্রথম মহীপালের নারায়ণপুর লিপি

করিতে কিছু সঙ্কোচ বোধ হয়। কারণ গল্পটি পাঠ করিলে শিবাজী ও আফজল খাঁর বিবাদ-সম্পর্কিত বিতর্কের কথা মনে পড়ে। ওদিকে রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধনকে (৬০৬—৪৭ খ্রীঃ) থানেশ্বর ও কনৌজের অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তিনি ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করেন এবং তদুদ্দেশ্যে কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্ম্মার সহিত মিত্রতাবদ্ধ হন। এই সঙ্ঘর্ষে হর্ষবর্দ্ধন কিরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। তবে সম্ভবতঃ প্রথম দিকে তিনি শশাঙ্কের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। কারণ হর্ষের রাজ্যারম্ভের প্রায় পনর বৎসর পরেও গৌড়েশ্বর শশাঙ্ককে বিপুল বিক্রমে সাম্রাজ্য পরিচালনা করিতে দেখা যায়। অনেক দিন পরে (আনুমানিক ৬৪০-৬৪৩ খ্রীঃ) হর্ষ উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-বিহার অঞ্চল অধিকার করেন এবং তদীয় মিত্র ভাস্করবর্ম্মা সাময়িক ভাবে গৌড় রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেন। কিন্তু এই সকল ঘটনা শশাঙ্কের জীবনকালে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতে হয়, যে কনৌজ-কামরূপের সহিত গৌড়ের সঙ্ঘর্ষ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল এবং পরিণামে কিছুকালের জন্য গৌড়ের অধঃপতন ঘটিয়াছিল।

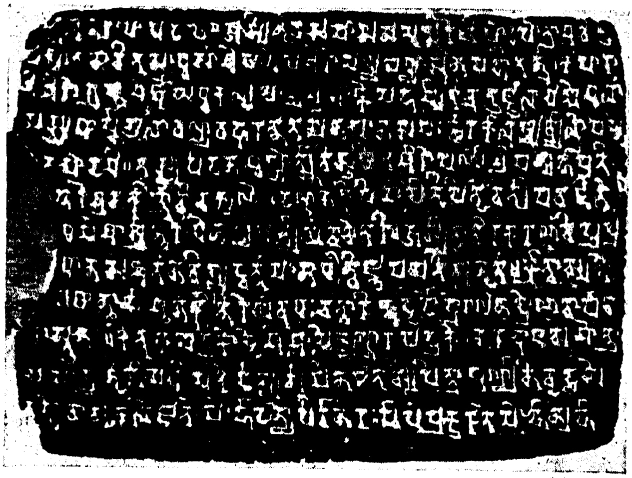
আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের কিংবদন্তী হইতে অনুমান করা হইয়াছে, শশাঙ্ক হর্ষকর্তৃক পুণ্ড্রবর্দ্ধনের (বগুড়ায় অন্তর্গত মহাস্থান) যুদ্ধে পরাজিত হন। এই কাহিনীর সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই। উক্ত গ্রন্থানুসারে শশাঙ্ক ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। কিঞ্চিদধিক সপ্তদশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে অল্পকালস্থায়ী বিশৃঙ্খলার পর তৎপুত্র মানব রাজ্যলাভ করেন। এই কাহিনীও অসমর্থিত। বরং আলোচ্য লিপিদ্বয় হইতে শশাঙ্কের রাজত্বকালের দৈর্ঘ্য বিষয়ক উক্তিটি মিথ্যা বলিয়াই মনে হয়। হিউএন-সং শশাঙ্ককে বৌদ্ধবিদ্বেষী রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক বৌদ্ধ-নিপীড়নের কয়েকটি দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। কিন্তু কর্ণসুবর্ণের বর্ণনায় চীন-পরিব্রাজক তথায় দশ-বারটি বৌদ্ধ বিহারের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং শশাঙ্ক বৌদ্ধ-বিদ্বেষী হইলেও উৎকট রকমের বৌদ্ধপীড়ক ছিলেন কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, শশাঙ্ক সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি, তাহা এই মাত্র। অবশ্য কল্পনাবলে আরও অনেকখানি অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু পণ্ডিতগণ সেরূপ গবেষণার প্রশ্রয় দিতে পারেন না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী তাঁহার *Political History* নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে শশাঙ্ক সম্বন্ধীয় কয়েকটি ভ্রান্তমতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্যঃপ্রকাশিত বাংলার ইতিহাস গ্রন্থে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও কতিপয় অসার মতের সমালোচনা করিয়াছেন।

এতদিন শশাঙ্কের রাজত্বকালের একখানিমাত্র তাম্র-শাসনের বিষয় আমরা অবগত ছিলাম। উহা সম্রাট্ শশাঙ্কের সামন্ত পূর্ব্ব-গঞ্জাম অঞ্চলের কোঙ্গোদরাষ্ট্রপতি শৈলোদ্ভববংশীয় দ্বিতীয় মাধবর্ম্মাকর্ত্তৃক ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল। আলোচ্য লিপিদ্বয় দক্ষিণ-মেদিনীপুরে আবিষ্কৃত। উভয় শাসনই শশাঙ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত দণ্ডভুক্তি নামক প্রদেশের অন্তর্গত তাবীরসংজ্ঞক স্থানের অধিকরণ বা শাসন-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চল এবং উড়িষ্যার সন্নিহিত অংশ লইয়া দণ্ডভুক্তি প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন, বর্ত্তমান দাঁতন নামটি প্রাচীন দণ্ডভুক্তির স্মৃতি বহন করিতেছে। দশম শতাব্দীর ইর্দ্দালিপি, একাদশ

শতাব্দীর তিরুমলৈলিপি এবং দ্বাদশ শতাব্দীর রামচরিত-গ্রন্থে দণ্ডভুক্তি প্রদেশের উল্লেখ দেখা যায়। বর্ত্তমানে জানা গেল, দণ্ডভুক্তি নামটি আরও পুরাতন ; কারণ সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহা শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল। আলোচ্য লিপিদ্বয়ের একটিতে দেখা যায়, এক সময়ে উৎকল দেশ ও দণ্ডভুক্তির শাসনকার্য্য একই শাসনকর্ত্তার দ্বারা পরিচালিত হইত। কাঁসাই নদী এবং বৈতরণী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে (বর্ত্তমান বালেশ্বর-ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে) উৎকল দেশ অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয়। অবশ্য এই সময়ে উৎকল ও দণ্ডভুক্তি কিয়ৎ-কালের জন্য মাত্র পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছিল, কিংবা দীর্ঘকাল ঐ দুইটি দেশ এক রাষ্ট্রীয় বিভাগের অন্তর্গত ছিল তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে মনে হয়, ইহা দণ্ডভুক্তির নবীন শাসক নিয়োগের অপেক্ষায় অবলম্বিত একটা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। তাবীরের অধিকরণকে একটি শাসনে বিপ্রপ্রধানদিগের দ্বারা এবং অপর শাসনে জনসাধারণের দ্বারা গঠিত বলা হইয়াছে। তাবীরের অবস্থান নির্ণয় করিতে পারি নাই। দ্বিতীয় শাসনের দশম শ্লোক হইতে অনুমিত হয় যে, তাবীর একটি মণ্ডল বা জেলার নাম ছিল।

প্রথম তাম্রশাসন

শাসনটি একখানিমাত্র তাম্রফলকের উভয় পৃষ্ঠায় উৎকীর্ণ ; কিন্তু দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় মাত্র অল্প কয়েকটি অক্ষর লিখিত আছে। ফলকের আকার প্রায় ৬½″×৪½″। উহার বামদিকে সংলগ্ন তাম্রপিণ্ডমধ্যে গোলাকার শীল-মোহর ছাপা রহিয়াছে। ঐ পিণ্ডের একপার্শ্বে একটি অগভীর গর্ত্ত এবং পশ্চাদ্দিকে একটি কীলকাকার উন্নমিতাংশ দেখা যায়। শীলের ব্যাস দৈর্ঘ্যে ১⅞″ এবং প্রস্থে ১⅞″। দুইটি ঘনসন্নিবিষ্ট সরলরেখা দ্বারা শীলটি দুই ভাগে বিভক্ত ; এই রেখাদ্বয় আবার কতিপয় ক্ষুদ্র সরল রেখাদ্বারা পরস্পর সংবদ্ধ। শীলমোহরের নিম্নাংশে উন্নমিতাক্ষরে "তাবীরাধি-করণস্য" লিখিত আছে। ঊর্দ্ধভাগে একটি মঙ্গলকলস ; তদুপরি পদ্ম সজ্জিত আছে মনে হয়। কলসের উভয় পার্শ্বে পুষ্পলতার অলঙ্করণ। মঙ্গলকলসটি স্ফীতোদর ; শুনিলাম, তমলুক অঞ্চলে এই আকারের প্রাচীন কলস আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার গায়ে আড়াআড়িভাবে দুইটি মাল্য ; উহাদের সংযোগস্থলে (অর্থাৎ কলসের উদরের ঠিক মধ্যস্থলে) একটি গ্রন্থি দেখা যায়। এই শীলমোহর



শশাঙ্কের মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষৎ তাম্রশাসন—প্রথম শাসন
মন্তব্য :—তারিখ অংশের পাঠ "[সম্বৎ]৮ পৌষদি ১০ ২" হইতে পারে।

তাবীরাধিকরণের নিজস্ব ; ইহার সহিত শশাঙ্কের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই।

ফলকের প্রথম পৃষ্ঠায় দ্বাদশ পঙ্‌ক্তি লেখ উৎকীর্ণ হইয়াছে। অক্ষরগুলি বড় বড় এবং পরিষ্কার। ইহা ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে প্রচলিত পূর্ব্ব-ভারতীয় লিপির অনুরূপ। কিন্তু ফলকের বামদিকের ঊর্দ্ধ ও নিম্নভাগে একটু অংশ ভাঙিয়া গিয়াছে ; ফলে তারিখের প্রথমাংশ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। লিপিতে অ, এ প্রভৃতি আদ্য স্বর এবং "দ্রোণান্" শব্দে বর্ত্তমান আকারের হস্ চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। শাসনটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত ; তারিখের অংশ ব্যতীত সমগ্র লেখটি অনুষ্টুভ্ ছন্দে গ্রথিত। মোট নয়টি শ্লোক এবং একটি শ্লোকার্দ্ধে শাসনটি লিখিত হইয়াছে। ভাষা এবং ছন্দের ত্রুটি কম। রচনা মোটা-মুটি শ্রুতিমধুর। গৌড়ী রীতির রচনায় যে উৎকটতার অপবাদ দেওয়া হয়, ইহাতে তাহা কিছু কম। তবে ইহাতে ওজোগুণের প্রাধান্য এবং সাপেক্ষ সমাস লক্ষিত হয়। তৃতীয় শ্লোকটিতে কিছু অক্ষরাড়ম্বর আছে। লিপির একটি ভাষাগত বৈশিষ্ট্য এই, যে, ইহাতে ছন্দের অনুরোধে বা সংক্ষেপার্থ অধিকরণার্থে করণ, অধিকরণিক অর্থে অধি

এবং দ্রোণবাপার্থে দ্রোণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন দ্রোণবাপ অর্থে এখনও বাংলায় দ্রোণ বা দোণ শব্দ প্রচলিত আছে।

শাসনের তারিখ শশাঙ্কের রাজত্বের উনবিংশ (অথবা, অষ্টম ?) বর্ষ। দশকের অঙ্কটি অস্পষ্ট; কিন্তু ইহাকে প্রাচীনতর "ট" "ল", বা "ল্" আকার হইতে বিবর্ত্তিত "ℓ" আকারের ১০ বলিয়া অনুমান করা যায়। ৯ অঙ্কটি "ল" আকারে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ৩০ অঙ্কটির এই আকার দেখা যায়; কিন্তু গুপ্তবংশীয় রাজগণের মুদ্রায় এবং পরবর্ত্তী কালের লিপিতে "ল" আকারের ৯ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় তাম্রশাসনে এই আকারের ১০ ও ৯ ব্যবহৃত হইয়াছে।

লিপিতে লিখিত হইয়াছে, যখন সম্রাট্ শশাঙ্ক পৃথিবী পালন করিতেছিলেন, তখন তদীয় মহাপ্রতিহার শুভকীর্ত্তি দণ্ডভুক্তি জনপদের শাসক ছিলেন। শুভকীর্ত্তি তাবীরাধিকরণের নিকট হইতে কেতকপদ্রক অঞ্চলে অবস্থিত কুম্ভারপদ্রক গ্রামে ৪০ দ্রোণবাপ কর্ষণযোগ্য ভূমি এবং এক দ্রোণবাপ বাস্তুভূমি ক্রয় করিয়া ভরদ্বাজ গোত্রীয় মাধ্যন্দিন শাখার ব্রাহ্মণ দাম্যস্বামীকে দান করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সম্ভবতঃ তাবীর একটি মণ্ডল বা জেলার নাম ছিল। মহাপ্রতিহার রাজপুরীরক্ষক সেনাদলের প্রধান কর্ম্মচারী। এ স্থলে একজন মহাপ্রতিহারকে প্রদেশশাসকের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে দেখা যায়। এক দ্রোণবাপ ভূমি আধুনিক মাপের আনুমানিক ষোল বিঘা (কিঞ্চিৎ সন্দেহজনক হিসাব অনুসারে, পাঁচ বিঘা) জমির সমান ছিল।

প্রথম শাসনের পাঠ

[মূল তাম্রফলক ও প্রতিলিপির সাহায্যে পঠিত]

(প্রথম পৃষ্ঠা)

১। [সম্বৎ*] [১০] ৯ ([৺ সম্বৎ]৮ ?) পৌষ-দি ১০ ২
অস্মিন্দিবসমাস-সম্বৎসরে ॥
বিষ্ণোঃ পোত্রাগ্রবিক্ষেপ-
২। ক্ষণভাবিতসাধ্বসাং (।*)
শেষাশেষশিরোমধ্যমধ্যাসীনমহাতমুং ॥ (১*)
কামারা-
৩। তিশিরোভ্রষ্টগঙ্গৌঘধ্ব(স্ত*)কল্মষাং (।*)
শ্রীশশাঙ্কে মহীম্পাতি চতুর্জ্জলধিমেখলাং ॥ (২*)
৪। যস্ত গাম্ভীর্যলাবণ্যবহুরত্নতয়ানয়া (।*)
ন সমঃ ক্ষয়কালেপ্যব্যালো[পান্ত]-
৫। তয়োদধি(ঃ*) ॥ (৩*)
তস্য পাদনখজ্যোৎস্নাবিভূষিতশিরোমণৌ (।*)
শ্রীমম্মহাপ্রতি-
৬। হারে শুভকীর্ত্তৌ বিচক্ষণেঃ ॥ (৪*)
দণ্ডভুক্তিমিমাং পাতি পিতৃবৎপাপবর্জ্জিতে (।*)
৭। ধর্মশাস্ত্রানুরোধেন ন্যায়ান্যায়ং বিচেতরি ॥ (৫*)
অস্যাং তাবীরকরণং বিপ্রপ্র-
৮। ধানসজ্জতং (।*)
ভবিষ্যদ্বর্ত্তমানাধীন্বিজ্ঞাপয়তি সূনৃতং ॥ (৬*)
ক্রীত্বাস্মত্তো
৯। যথান্যায়ং শুভকীর্ত্তিরেয়ং বুধঃ (।*)
চত্বারিংশচ্ছদদৌ দ্রোণান্ দ্রোণবাপং চ
১০। বাস্তুনঃ ॥ (৭*)
কে[ত]কপদ্রিকোদ্দেশে গ্রামে কুম্ভারপদ্রকে। (৮*)
ভরদ্বাজসগোত্রা-
১১। য় মাধ্যন্দিনায় ধীমতে (।*)
দাম্যস্বামিন এতস্মৈ পিত্রো(ঃ*)
পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে (॥*) (৯*)
১২। [ত*]দ্যো বাস্মৎকুলে জাতো মোহাদন্যোপি বা
নরঃ (।*)
পাপং প্রকুরুতে মোহান্মহা-

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠা)

১৩। [পা*]তকবান্ভবেৎ ॥ (১০*)

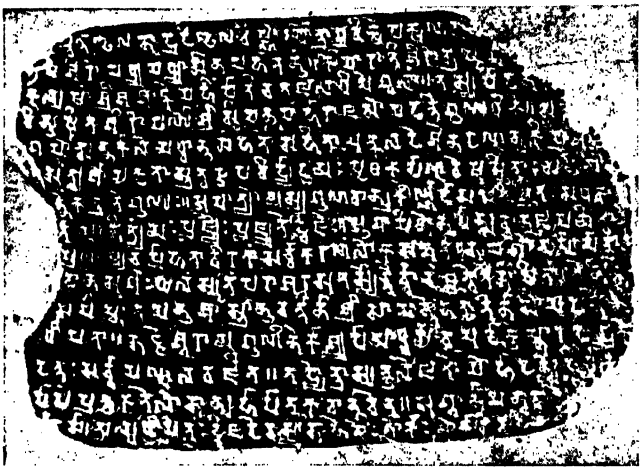
[এ স্থলে শাসনের ভাষা ও ছন্দোগত অশুদ্ধি আলোচিত হইল না]

ভাবানুবাদ

শশাঙ্কের রাজত্বের ১৯শ (অথবা, ৮ম ?) সংবৎসরে পৌষ মাসের ১২শ দিবসে এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হইল ॥

বরাহরূপী বিষ্ণুর দংষ্ট্রাগ্রভাগে কম্পিতভাবে অবস্থানকালে যে পৃথিবীর ভয় জন্মিয়াছিল, যাহার মহাকায় শেষনাগের অগণিত মস্তকের মধ্যবর্ত্তীটির মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং শিবের শিরশ্চ্যুত গঙ্গাস্রোতে যাহার পাপরাশি বিদূরিত হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক যখন সেই চতুঃসমুদ্রান্তরিতা পৃথিবীকে পালন করিতেছেন, তখন সম্রাটের পাদনখরূপ চন্দ্রকিরণে যাঁহার মস্তকমণি রঞ্জিত সেই বিচক্ষণ এবং নিষ্পাপ মহাপ্রতিহার শ্রীযুক্ত শুভকীর্ত্তি পিতার ন্যায় এই দণ্ডভুক্তি প্রদেশ শাসন করিতেছেন এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে ন্যায়ান্যায় বিচার করিতেছেন। সম্রাট্ শশাঙ্কের সহিত গাম্ভীর্য্য, লাবণ্য ও বহুরত্নতাহেতু সমুদ্রের তুলনা করা যায়; কিন্তু তাঁহার কোন অঙ্গবিকৃতি না থাকায় বর্ষাকালের

সমুদ্রের সহিতও তাঁহার প্রকৃত তুলনা হয় না। এই প্রদেশমধ্যস্থ তাবীরের অধিকরণরূপ বিপ্র-প্রধানদিগের সভ্য ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অধিকরণিকদিগকে এই সত্য এবং প্রিয় বাক্য বলিলেন, "এই সুপণ্ডিত শুভকীর্ত্তি পিতার



শশাঙ্কের মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষৎ তাম্রশাসন—দ্বিতীয় শাসন

পুণ্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমাদের নিকট হইতে কেতকপদ্র্য অঞ্চলস্থিত কুম্ভারপদ্রক গ্রামে ৪০ দ্রোণবাপ কর্ষণযোগ্য ভূমি এবং ১ দ্রোণবাপ বাস্তুভূমি ক্রয় করিয়া ভরদ্বাজগোত্রীয় মাধ্যন্দিন শাখার ধীমান্ ব্রাহ্মণ দাম্যস্বামীকে দান করিলেন। অতএব আমাদের বংশে জাত অথবা অপর কোন ব্যক্তি যদি প্রদত্ত ভূমি সম্পর্কে মোহবশতঃ পাপাচরণ করে, তবে সেই মোহের জন্য সে ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকগ্রস্ত হইবে।"

দ্বিতীয় তাম্রশাসন

এ শাসনটি একটিমাত্র তাম্রফলকের প্রথম পৃষ্ঠায় উৎকীর্ণ। ফলকের আকার ৮″×৫১/২″। ফলকসংলগ্ন শীলমোহরটি সর্ব্বাংশে প্রথম শাসনের মোহরের অনুরূপ; তবে এটির ব্যাস ১১/২″ এবং মধ্যবর্ত্তী বিভাজক সরল রেখাদ্বয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল রেখাদ্বারা সংযুক্ত নহে। শাসনে ১৫ পঙ্‌ক্তি লেখ উৎকীর্ণ আছে। ফলকের দক্ষিণ দিকের ঊর্দ্ধ ও নিম্ন ভাগের কতকটা অংশ ভাঙিয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রথম তাম্রশাসনের সাহায্যে ঊর্দ্ধাংশের পাঠোদ্ধার করা যায়। বর্ত্তমান শাসনের লিপিঘটিত বৈশিষ্ট্য পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনের ন্যায়। "পৃথক্" ও "সর্ব্বান্" শব্দদ্বয়ে আধুনিক প্রথায় হস্ চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। শাসনটি সংস্কৃতে রচিত। তারিখের অংশ ব্যতীত এই শাসনও অনুষ্টুভ্ ছন্দে লিখিত। ইহাতে দ্বাদশটি শ্লোক আছে। দুইটি শ্লোক এবং একটি শ্লোকার্দ্ধ অপর শাসনটিতেও দেখা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান শাসনের রচয়িতা পূর্ব্বালোচিত শাসনপ্রণেতা অপেক্ষা অপটু কবি ছিলেন; কারণ এই লিপিটিতে ছন্দের অনেক ত্রুটি দেখা যায়। ইহাতেও অধিকরণ অর্থে করণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এ শাসনের তারিখ শশাঙ্কের রাজত্বের ঊনবিংশ বর্ষ। যখন সম্রাট্ শশাঙ্ক পৃথিবী পালন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অধীন সামন্ত মহারাজ সোমদত্ত উৎকলদেশের সহিত সংযুক্ত দণ্ডভুক্তির শাসক ছিলেন। সম্ভবতঃ পঞ্জিকার সম্বৎসরের প্রথম দিন হইতে প্রাচীন ভারতীয় রাজগণ নূতন রাজ্যবর্ষ গণনা করিতেন। সে হিসাবে প্রথম শাসনের চার মাস পূর্ব্বে (অথবা, প্রায় এগার বৎসর পরে?) দ্বিতীয় শাসনটি প্রদত্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই সময়ে দণ্ডভুক্তির শাসকপদে অপর একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত দেখা যাইতেছে। সম্ভবতঃ সোমদত্ত প্রথমে উৎকলের সামন্ত রাজ ছিলেন; ইতিমধ্যে দণ্ডভুক্তির শাসনকর্ত্তার পদ শূন্য হওয়ায় তাঁহাকে সাময়িক ভাবে উভয় দেশের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করা হয়।

সামন্ত মহারাজ সোমদত্ত ভট্টেশ্বর নামক কাশ্যপগোত্রীয় অধ্বর্য্যুকে মহাকুম্ভারপদ্রক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তদীয় অমাত্য প্রকীর্ণদাস তাবীর মণ্ডলের শাসক সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। মহাকুম্ভারপদ্রক গ্রামটি অপর শাসনের কুম্ভারপদ্রকের সহিত অভিন্ন হইতে পারে; এ শাসন পরবর্ত্তী হইলে অবশ্য এবার পূর্ব্বপ্রদত্ত ৪১ দ্রোণবাপ ভূমি পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের অবশিষ্টাংশ দান করা হইয়াছিল। মহাকুম্ভারপদ্রক (অর্থাৎ বড় কুম্ভারপদ্রক) কুম্ভারপদ্রকের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামও হইতে পারে। দক্ষিণ মেদিনীপুরে এই নামের কোন অপভ্রংশের (যেমন, কুমারপাড়া) অস্তিত্ব আছে কিনা, তাহা অনুসন্ধেয়। তাবীর নামের স্থানও খুঁজিয়া দেখা কর্ত্তব্য। লিপিটিতে গোচর্ম্মপরিমাণ ভূমিদানের উল্লেখ আছে। বশিষ্ঠস্মৃতি অনুসারে "দশ হস্তেন বংশেন দশবংশান্ সমন্ততঃ। পঞ্চ চাভ্যধিকান্ দদ্যাদ্ এতদ্‌গোচর্ম্ম চোচ্যতে।" অর্থাৎ ১৫০ হাত দীর্ঘ ও ১৫০ হাত প্রস্থ

ভূমির সংজ্ঞা ছিল গোচর্ম (আমাদের হিসাবে প্রায় ৩॥০ বিঘা)।

দ্বিতীয় শাসনের পাঠ

[মূল তাম্রফলক ও প্রতিলিপির সাহায্যে পঠিত]
(প্রথম পৃষ্ঠা)

১। [৺স*][ম্ব]ৎ ১০ ৯ ভাদ্র-দি ১০ ৯ (॥*)
বিষ্ণোঃ পোত্রাগ্রবিক্ষেপক্ষণভা[বিতসাধ্বসাং*] (।*)
[শেষাশে*]-

২। যশিরোমধ্যমধ্যাসীনমহাতনুং ॥ (১*)
কামারাতিশিরোভ্রষ্টগ[ঙ্গৌঘধ্বস্ত*]-

৩। কল্মষাং (।*)
শ্রীশশাঙ্কে মহীং পাতি চতুর্জলধিমেখলাং ॥ (২*)
তস্য পাদন[খজ্যোৎস্না*]-

৪। বিভূষিতশিরোমণৌ (।*)
শ্রীসামন্তমহারাজসোমদত্তে গুণাধিকে ॥ (৩*)
স[ত্ব][সমা*]-

৫। গমোৎসন্নকালেয়ধ্বান্তসংহতৌ (।*)
সহিতামুৎকলদেশেন দণ্ডভুক্তিং প্রশা[সতি ॥*] (৪*)

৬। সত্যশৌর্য্যকৃতাস্ত্রস্বরূপবিদ্যাদয়ঃ পৃথক্ (।*)
পাণ্ডবেষাস্থিতাঃ সন্তি য[স্মি]-

৭। ন্নেকত্র তে গুণাঃ ॥ (৫*)
অমাত্যো যস্য গুণবান্ প্রকীর্ণদাস ইতি শ্রুতঃ (।*)
সাধুকারি-

৮। তয়া নিত্যং যঃ পূজ্যৈঃ পূজ্যতে দ্বিজৈঃ ॥(৬*)
আগামিনো নৃপান্সর্ব্বান্ জ্ঞাপয়িত্বা

৯। প্রণম্য চ (।*)
প্রাহ তাবীরকং সর্ব্বং করণং লোকসঙ্গতং ॥ (৭*)
ভূমের্গোচর্ম্মমাত্রা[য়াঃ*]

১০। দানে স্বর্গঃ ফলং স্মৃতং (।*)
পরাশরসুতস্যোচ্চৈর্ব্বাচং শ্রুত্বোত ভাষিতাং ॥ (৮*)
তেনে[দং] [চ*]

১১। সমাম্নাত(ং*) মনুশাস্ত্রানুবর্ত্তিনা (।*)
শ্রীসামন্তেন কৃতিনা সোমদত্তেন

১২। ধীমতা ॥ (৯*)
ভট্টেশ্বরায় গুণিনে কাণ্বপায়াধ্বর্যবে (।*)
মুহাকুম্ভার[পদ্রকো]

১৩। দত্তঃ সর্ব্বমণ্ডলবর্জ্জিত(ঃ*) ॥ (১০*)
তস্তোত্রাস্মৎকুলে জাতো মোহাদন্যোপি
[বা নরঃ] (।*)

১৪। পাপং প্রকুরুতে লোভান্মহাপাতকবান্‌ভবেৎ ॥
(১১*)

সুধানামঘ × × ×

১৫। × × স্যাত্যান্নধীমতঃ (।*)
দ্বিজদেবস্য ভাহেত্তোঃ [শ্লোকাঃ শ্লোকা ?] ×
× × × [॥*] (১২*)

[এ স্থলে শাসনের ভাষা ও ছন্দোগত অশুদ্ধি আলোচিত হইল না]

ভাবানুবাদ

শশাঙ্কের রাজত্বের ১৯শ সংবৎসরে ভাদ্র মাসের ১৯শ, দিবসে এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হইল ॥

বরাহরূপী বিষ্ণুর দ্রংষ্ট্রাগ্রভাগে কম্পিত ভাবে অবস্থান-সময়ে যে পৃথিবীর ভয় জন্মিয়াছিল, যাহার মহাকায় শেষ-নাগের অগণিত মস্তকের মধ্যবর্তীটির মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং শিবের শিরশ্চ্যুত গঙ্গাস্রোতে যাহার পাপরাশি বিদূরিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক যখন সেই চতুঃসমুদ্রান্তা পৃথিবীকে পালন করিতেছেন, তখন সম্রাটের পাদনখরূপ চন্দ্রকিরণে যাঁহার মস্তকমণি রঞ্জিত সেই পরম গুণবান্ সামন্ত মহারাজ শ্রীসোমদত্ত উৎকল দেশের সহিত সংযুক্ত দণ্ডভুক্তি প্রদেশ শাসন করিতেছেন। সোমদত্তের সাধুতার সংস্পর্শে কলির পাপান্ধকার বিদূরিত হইয়াছে। সত্য, শৌর্য্য, অস্ত্রবিদ্যা-নিপুণতা, রূপ এবং বিদ্যা প্রভৃতি পাঁচটি গুণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবে অবস্থিত; কিন্তু সোম-দত্তের মধ্যে সেই পঞ্চ গুণের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। এই সোমদত্তের প্রকীর্ণদাস নামক একজন গুণবান্ অমাত্য আছেন; তাঁহার সাধুতার জন্য পূজার্হ দ্বিজগণও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। ভবিষ্যৎ নরপালগণকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া এবং অবস্থা বিজ্ঞাপিত করিয়া তাবীরের অধিকরণরূপ সমগ্র জনসঙ্ঘ বলিলেন, "স্মৃতিতে আছে, গোচর্ম্ম পরিমাণ (প্রায় সাড়ে তিন বিঘা) ভূমিদানের ফলে স্বর্গলাভ হয়। পরাশরনন্দন ব্যাসদেবের কথিত এই মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া সেই কৃতী, ধীমান্ এবং মনু-শাস্ত্রানুবর্ত্তী সামন্ত শ্রীসোমদত্ত এই বিষয়টি স্মরণ রাখিয়াছেন। তিনি কাণ্বপগোত্রীয় ভট্টেশ্বর নামক গুণবান্ অধ্বর্য্যুকে মহাকুম্ভারপদ্রক গ্রাম দান করিলেন। শাসন ব্যাপারে গ্রামটিকে মণ্ডল বা জেলার অন্যান্য অংশ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দান করা হইল (অর্থাৎ অন্যান্য গ্রামে প্রয়োক্তব্য কতিপয় শাসনবিধি এ গ্রামে অপ্রয়োক্তব্য করা হইল)। অতএব এই ভূমি সম্পর্কে আমাদের বংশজাত কেহ অথবা অপর কোন ব্যক্তি যদি মোহবশতঃ পাপাচরণ করে, তবে সেই লোভের ফলে সে ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকগ্রস্ত হইবে। × × × ×৭"

৪। "জাত" পঠিতব্য। বোধ হয় "পুত্র" বা "সুত" লেখা লিপিকরের উদ্দেশ্য ছিল।

৫। "মিত্রেণ" পঠিতব্য।

৬। "পিত্রো" পঠিতব্য।

৭। ইহা স্থানের নাম হইতে পারে। তাহা হইলে "ভশকাগে" পঠিতব্য। এই স্থানে মূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

৮। কেবল "পরম" শব্দের পাঠ নিশ্চিত। "পরমাজিংঘাসক" পাঠ হইলে অর্থ করা যায়।

৯। "বিনায়ক" পঠিতব্য।

১০। এই স্থান হইতে লিপির পাঠ এবং অর্থ সন্দেহাতীতরূপে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। "অয়নস্ববিষ্টরেণ" এবং "ভোগানহীনান্‌" পাঠ করিলে অর্থ হয়। সম্ভবতঃ "কালাস্তেবাসি-বিপুণ্যোশঃ" পঠিতব্য। এই ব্যক্তি বিনায়ক মূর্ত্তির নির্ম্মাতা ভাস্কর হইতে পারেন।

১১। প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত প্রতিলিপি বিলম্বে আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ও ধর্মপ্রচার

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

১লা মাঘ ১৩৩৩ সাল। খুব সম্ভব ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী। আমেরিকা হ'তে জন সাতেক tourist আশ্রমে এসেছেন। তাঁরা ভারতবর্ষ দেখে বেড়াচ্ছেন। বোধ হয় খ্রীষ্টধর্মের প্রচারের দিকেও তাঁদের উৎসাহ আছে। কিন্তু সাধনা, গীতাঞ্জলি প্রভৃতির খ্যাতির পর রবীন্দ্রনাথের কাছে ঠিক প্রচার করতে আসার কথাও বলতে একটু সঙ্কোচ বোধ করছেন। তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কথাটা একটু অন্য রকম ক'রে পাড়লেন। তাঁরা বললেন, এ দেশের সবাই কি তোমাদের ধর্মের উচ্চ সব আদর্শ বোঝে? যারা তা না বোঝে অন্তত তাদের কাছে এসে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করলে কেমন হয়?

রবীন্দ্রনাথ বললেন, নিরক্ষর হ'লেই যে লোকেরা উচ্চ আদর্শ বুঝতে অক্ষম হয় সে কথা মনে করা ভারি ভুল। আমাদের দেশে যে ব্যবস্থা ছিল তাতে সাক্ষর-নিরক্ষর সবাই ধর্মের আদর্শগুলি সহজে জীবনের মধ্যে নিতে পারত। তার পর অক্ষরগত বিদ্যা দেবার যে ব্যবস্থা পূর্বে ছিল এখন দিন দিন তাও সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। এখনকার সব শিক্ষার প্রতিবেদন দেখলে তা বোঝা যায়। অথচ অন্য সব দেশে দিন দিন শিক্ষা অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। তাই এদের মধ্যে ধরাবাঁধা একটা ধর্মের প্রচার না করেও যদি জ্ঞান বিস্তার করা যায় তা হলেই অনেক ভাল হয়।

তার পর আদর্শ বোঝবার কথা যে বলব, তোমাদের দেশেই কি সবাই খ্রীষ্টের মহান্‌ আদর্শ বোঝেন? সে দেশে আজ যাঁরা বুদ্ধিমান্‌ শিক্ষিত ও পদস্থ তাঁরা কি শ্রদ্ধার সহিত খ্রীষ্টের সব মহান্‌ উপদেশ মানেন এবং তাঁর দ্বারা ব্যক্তিগত ও সমূহগত জীবনকে (Public and Private life) নিয়ন্ত্রিত করেন? তা যদি করতেন তবে জগতে এত প্রচারের প্রয়োজন থাকত না, সর্বত্র সেই সব সত্য আপনি ছড়িয়ে পড়ত। আসলে আদর্শগুলি জীবনে দীপ্ত হয়ে ওঠে নি। তাই আলোক চারিদিকে ছড়াচ্ছে না। বাক্যের দ্বারা যদি এই আলোকের অভাব পূরণ করতে হয় তবে কি আর বাক্যের কোথাও শেষ আছে?

দেখ, আমরা আমাদের দেশে অধিকারীভেদ মানি। বড় বড় আদর্শ দেশে থাকলেও, জোর ক'রে কারও মাথার উপর তা চাপিয়ে দেওয়া যায় না। জগতে জুলুমের তো আর অন্ত নেই। কিন্তু সকল জুলুমের সেরা হ'ল এই মিথ্যার আধ্যাত্মিক জুলুম। এই বলাৎকার আমরা কোন দিন পছন্দ করি নি এবং তা করতেও চাই নি। যার যার আপন আপন শক্তি অনুসারে লোকে আদর্শ বোঝে ও তদনুসারে চলে। সকলকেই সমান ভাবে বুঝতে হবে বা চলতে হবে এমন কোন আইন চলে না। শারীরিক ক্ষেত্রেও এমন আইন চলতে পারে না। কারও বেশি শক্তি, বেশি কর্মক্ষমতা, কারও বেশি খাদ্যের দরকার। এই সব বিচার অগ্রাহ্য করলে মহা অনর্থ উপস্থিত হয়। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য আরও বেশি, সেখানে এই রকম জুলুম চলতেই পারে না। যোগী এবং ধ্যানীর পাশে বসে যদি সাঁওতাল তার স্থূল পূজায় রত থাকে তবে ক্ষতি নেই। তবে দেখতে হবে সাঁওতালেরও যেন উচ্চতর আদর্শ গ্রহণে কোথাও বাধা না থাকে। কারও উচ্চতর আদর্শ গ্রহণের পথে কোথাও বাধা দেব

না, বরং তাতে সকলে যথাসাধ্য সহায়তাই করব অথচ আদর্শের জন্য জুলুমও করব না এই হ'ল ঠিক। আর সহায়তা করতে গেলেও সব চেয়ে বড় সহায়তা হচ্ছে নিজেদের জীবনের আদর্শকে সফল ক'রে নিজেরা দীপ্ত হয়ে ওঠা। সেটা না হলে সেই অভাব কথায় বা আর কিছুতে পূরণ হয় না।

তোমাদের দেশের সকল লোকই কিছু সাধনায় অগ্রসর নয়। জ্ঞানে ধ্যানে অল্পশক্তি লোকও তোমাদের দেশে বিস্তর আছে, সব দেশেই তা থাকে। কিন্তু তোমাদের দেশের সেই সব অল্পশক্তি লোকদেরও তোমরা মহাপ্রভু খ্রীষ্টের বড় বড় বাণী এবং খ্রীষ্টশাস্ত্রের বড় বড় সত্য গিলতে বাধ্য করেছ। যে-সব সত্যের উপযুক্ত তারা হয় নি তা বুঝতে বাধ্য হলে তারা বোঝে অদ্ভুত ক'রে। তাই তারা অর্থহীন অনেক বড় বড় কথা আওড়ায়। এতে একটা অদ্ভুত ভণ্ডামির (hypocrisy) রাস্তা খুলে যায় আর কি। তখন দেখা যায় সেই সব লোকদের ধর্মের সঙ্গে জগতের সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের যোগ নেই, তাদের নিজের দয়া মৈত্রী প্রভৃতি প্রবৃত্তির সঙ্গেও তাদের ধর্মবুদ্ধির সামঞ্জস্য নেই। তখন চার্চ ও লিঞ্চিং (Church, Lynching) এক সঙ্গেই নির্বিরোধে চলে। এরাই যখন ধর্ম-প্রচার করতে উদ্যত হয় তখন সেই প্রচারও হয়ে ওঠে অসত্য। আসলে প্রচারের জন্য চাই স্বয়ং দীপ্ত হওয়া। দীপ্ত না হ'লে প্রচার হবে কেমন করে? অগ্নি যখন জলে নি তখন যদি সকলকে জানান দিতে হয় তবে জানান দিতে হয় ধূমে। সেই উৎসাহের ধূমাবর্তের আলোক পাওয়া যায় না, মানুষ তাতে মরে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে।

এ দেশে প্রচারের জন্য পাঠাতে চাও কাদের? কারা আসবে সকলকে উপদেশ দিতে? তারা নিজেরাই খ্রীষ্টকে মানচে? খ্রীষ্টের আলোকে তারা নিজেদের জীবনকে দীপ্ত করতে পেরেচে? যদি তারা নিজেরা দীপ্ত হয়ে থাকে, তবে মুখে একটি কথা না বললেও জগতের সবাই সেই আলোকে প্লাবিত হয়ে যাবে, জগতের সব স্বার্থ, অপ্রেম, মিথ্যা, অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। কিন্তু তাই কি হয়েছে? এই নিত্য কূটনীতি যুদ্ধপ্রভৃতি সেই ভক্তি ও দীপ্তির প্রমাণ?

ইহুদীরা ধর্মকে রেখেছিল নিজেদের দলের বিষয় ক'রে। খ্রীষ্ট এসে সেই সম্প্রদায়গত স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। কাজেই তাঁকে তারা বধ করলে। এখন দেখছি খ্রীষ্টের অনুবর্তীরা তাঁর নাম ক'রেই রীতিমত সব দল করেছেন। জীবন দিয়ে মহাত্মা খ্রীষ্ট যে মিথ্যার উচ্ছেদ করতে চাইলেন তাঁর অনুবর্তীর দল তাঁর নামেই সেই সব মিথ্যাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে। এই হ'ল তাঁর যুগ যুগ ব্যাপী মৃত্যু-শূল (Crucification)। খ্রীষ্টের সেই মহাদুর্গতি কোনো বিশেষ দুর্দিনে সমাপ্ত হয়ে যায় নি। এখনও তাঁর দুঃসহ যন্ত্রণা (Crucification) সমানে চলেচে তাঁরই নামে প্রবর্তিত সব সম্প্রদায়ীদেরই হাতে। আগে তাঁকে সেই ক্রুশ হইতে নামাইয়া শান্তি দাও, তার পরে আর সব কথার অবসর হবে। যাঁদের হাতে সেই মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক নির্যাতন আজও নানা ভাবে ও নামে চলেছে সেই সব লোকেরা দেবেন মহাপুরুষ খ্রীষ্টের মন্ত্রদীক্ষা? সেই আলোকে জীবন যদি দীপ্ত হয়ে না থাকে তবে কেমন ক'রে এঁরা সেই সব মহাসত্যের দীক্ষা দেবেন? মহাপ্রাণ খ্রীষ্টের যে অতুলনীয় মৈত্রী তা যদি জীবনে থাকে তবে বিনা বাক্যেই চারি দিকে শিক্ষা-দীক্ষা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আর তা না থাকলে শুধু কথা দিয়ে জীবনের দৈন্য কি ঘুচাতে পারা যায়?

যাঁরা প্রচার করতে চান তাঁদের প্রথমে চাই এই দেশের লোকের হৃদয় বুঝতে পারা। এখানে লোকের অন্তরের দুঃখ-বেদনা না বুঝলে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রেমের যোগ না থাকলে শুধু কি ভাষা শিক্ষা ক'রে প্রচার চলে? এমন সস্তা রকমের প্রচার খ্রীষ্টের মত মহামানবের সাধনায় চলে না। এতে শুধু তাঁকে অপমান করা হয় মাত্র।

এই দেশের লোকের সঙ্গে একেবারে প্রেমে একাত্ম যদি না হ'তে পারেন তবে এ দেশের হৃদয়ের নিঃশব্দ ব্যাকুলতা তাঁরা বুঝবেন কিসে? কোথায় এই দেশের সব লোকের ভাবের ও ইঙ্গিতের তারতম্য তা তাঁরা কিসে অনুভব করবেন? এই দেশের মতিগতিদুঃখদুর্গতি-অভাবের জন্য যদি তাঁদেরও অন্তরে সমবেদনা না জাগে তবে কি ক'রে তাদের কাছে তাঁরা খ্রীষ্টধর্মের মতো মহাবস্তু দেবেন। এর চেয়ে তাঁদের পক্ষে ঢের ভাল হবে এবং অনেক সহজ হবে নিজেদের দেশেই আগে খ্রীষ্টকে প্রতিষ্ঠিত করা। তবেই জগতের প্রায় সকল দুঃখই ঘুচে আসবে, তখন মহাপুরুষ খ্রীষ্টের চিন্ময় তনুকে চিরস্থায়ী ক্রুশযন্ত্রণা হ'তে উদ্ধার করা হবে। তখন জগতের লোক বক্তৃতা ছাড়াও সহজে খ্রীষ্টের সত্য বুঝতে পারবে।

“ইওর মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সরভেণ্ট”

শ্রীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

শ্রীসুধাকর দত্ত রাউতারা স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার হ'য়ে পদার্পণ করলেন। রাউতারা স্টেশনটি অতিশয় ক্ষুদ্র ও নগণ্য। আমার কাহিনী স্টেশনকে কেন্দ্র ক'রে নয়, তার নায়ক শ্রীসুধাকর দত্ত; তবুও নায়কের স্থিতি, পরিস্থিতি ও ভিত্তির পরিচয় আবশ্যক বলেই রাউতারা স্টেশনের পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

এ স্টেশনটি ই. বি. আর অধুনা বি. এ. আর লাইনের উপর অবস্থিত। যে লাইনটি সুবিখ্যাত কাটিহার জংশন থেকে পূর্ণিয়ার বুকের ওপর দিয়ে ইংরেজ রাজত্ব ও স্বাধীন নেপাল রাজত্বের সন্ধিস্থলে অবস্থিত রেল-কোম্পানীর শেষ স্টেশন যোগবাণী পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে, সেই লাইনে রাউতারা কাটিহারের পরেই। কাটিহারের নাম হয়ত অনেকে শুনেছেন। কথিত আছে যে, কাটিহার নামটি কটিহারের অপভ্রংশ। কালের চাপে ও বহু দিন অসংখ্য লোকের জিহ্বার আশ্রয়ে—কটিহার থেকে কাটিহার! পূর্ণিয়াগামী ও কাটিহারগামী প্রত্যেক ট্রেনখানাই একবার এখানে থামে, অবশ্য মুহূর্ত্তের জন্য। কোম্পানীর টাইম টেব্‌লে লেখা থাকে দু-মিনিটের স্থিতি, কিন্তু কার্য্যতঃ ট্রেনখানা থেমেই চলতে আরম্ভ করে। বেগ কমিয়ে পুনরায় বেগ নিতে যেটুকু সময় লাগে সেইটুকু সময় মাত্র। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে তিনখানা ট্রেন পূর্ণিয়ায় যায় এবং দুখানা পূর্ণিয়া থেকে আসে। বেলা বারটার পর চারটা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ স্তব্ধতা স্টেশনটিকে গ্রাস করে থাকে। চারটার পর তিনখানা ট্রেন পূর্ণিয়া থেকে আসে এবং দুখানা পূর্ণিয়ায় যায়। দিনের শেষ ট্রেন সন্ধ্যা সাতটা ন মিনিটে কাটিহারের দিকে ছেড়ে গেলে রাউতারার ছুটি সেদিনের মত। মধ্যরাত্রে দুখানা মালগাড়ী যাতায়াত করে, কিন্তু সে দুখানা বৎসরে ন মাস এখানে থামে না। মাত্র তামাকের সময়ে রাউতারার মূল্য বর্দ্ধিত হয়। বস্তুতঃ তামাকের ও সরিষার জন্যই রাউতারা স্টেশনটি কোম্পানী এখনও রেখেছেন, কারণ পূর্ণিয়া জেলার অধিকাংশ তামাক ও সরিষা রাউতারার চতুর্দ্দিকেই জন্মে। এ দুটি ফসলের জন্য পূর্ণিয়ার কিঞ্চিৎ নামও আছে। যাত্রী কখনও কখনও এখান থেকে চার-পাঁচ জন ওঠে ও দু-একজন এখানে নামে। এ সব যাত্রীর অধিকাংশই সদরে যায় মামলার জন্য এবং সকাল ছটা তেত্রিশের গাড়ীতেই রাউতারা সর্ব্বাধিক ভিড় উপলব্ধি করে।

স্টেশনে একটি মাত্র ঘর, সেই ঘরটির ভিতরে কোম্পানীর যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হয়, ঘরটির প্রবেশ-দ্বারের উপরে লেখা—"অফিস্—প্রবেশ নিষেধ"। একখানা ত্রিকোণাকৃতি কাষ্ঠফলের এক দিকে প্রথম শব্দটি, এবং অন্য দিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দটি ইংরেজী ভাষায় লেখা। ইংরেজী-অজ্ঞতার জন্যই হোক কিংবা রাউতারার নগণ্যতার জন্যই হোক বিজ্ঞাপনটির গুরুত্ব কোনদিনই উপলব্ধি করি নাই। ঘরটির অভ্যন্তরের কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। ঘরের পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে দুটি যন্ত্র স্থাপিত। উত্তর দিকেরটির বুকের ওপর সুন্দর পিতলের অক্ষরে লেখা 'রাণীপাত্‌রা' অর্থাৎ পরবর্ত্তী স্টেশনের নাম। সে যন্ত্রটি সেই স্টেশনের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত করে, ট্রেন যাত্রার ও আগমনের ইঙ্গিত জানায়। দক্ষিণ দিকের যন্ত্রটির বুকে লেখা 'কাটিহার', সেটি কাটিহারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত করে। দুটি যন্ত্রেরই পার্শ্বে টেলিফোনের দুটি রিসিভার বিলম্বিত। উত্তর দিকের দেওয়ালের কাছে দুটি মাত্র টেলিগ্রাফের যন্ত্র অহোরাত্র অর্থহীন বিজাতীয় ভাষায় টরে টক্কা, টক্কা টক্কা ক'রে চলেছে। পূর্ণ ইঙ্গিত মাত্র বড়বাবুই বুঝতে পারেন। দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে টিকিটের দুটি ক্ষুদ্র আলমারী দিয়ে স্বল্পপরিসর একটু স্থান পরিবেষ্টিত। দেওয়ালের গায়ে ছিদ্র ক'রে ক্ষুদ্র একটি গহ্বর দিয়ে টিকিটের সময় কয়েকটি বলিষ্ঠ হাত একত্রে প্রবেশ করবার চেষ্টা করে। একটিও প্রবেশাধিকার পায় না। একটি হাতও নির্ব্বিবাদে সে গহ্বর দিয়ে প্রবেশ করতে পারে কিনা সন্দেহ। কোম্পানী মাত্র টিকিটখানা ও খুচরা পয়সা যাতায়াতের জন্য হয়ত সেটা নির্ম্মাণ করেছিলেন, কিংবা ভারতবাসীর শীর্ণদেহ কল্পনা করে সুস্থ ইংরেজ বিলাত থেকে গহ্বরের মাপ অতটুকু করবার আদেশ দিয়েছিলেন—যে-পথে ভারতবাসীর হাত প্রবেশ করবে সে-পথ সংকীর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঘরটির পশ্চিম দিকে লাইন, দুটি মাত্র লাইন নির্জীব সর্পের ন্যায় পড়ে আছে।

মাঝখানে একখানা নাতিক্ষুদ্র টেবিল, তার উপর কয়েকখানা খাতা, ও একখানা ছারপোকাবহুল চেয়ার বড়বাবুর অফিসের পরিচয় দিচ্ছে—সন্ধ্যায় একটি আলো টেবিলের বুকে বসে। তার চিম্‌নিটির প্রায় সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণে আচ্ছাদিত—কর্ম্মচারীর দৃষ্টিশক্তিকে রক্ষা করবার জন্য। নিম্নভাগের আলো এসে পড়ে সম্মুখের নথিপত্রে। চিম্‌নির

দেহে বিসর্পিত গতিতে এক টুকরা কাগজ লাগান। বোধ হয় বহুদিন পূর্ব্বে সেটিতে আঘাত লেগেছিল, তাপে বর্দ্ধিত হবার পথকে বাধা দেওয়া হয়েছে। এইরূপ অপেক্ষাকৃত ছোট আরেকটি আলো টিকিটের টেবিলের উপর স্থাপিত হয়। চন্দ্রগ্রহণের ন্যায় রাত্রে যাত্রী বৎসরে দু-এক বার দেখা দেয়; কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় রামটহল আলো রাখে টেবিলের উপর। টেলিগ্রাফের যন্ত্রের সম্মুখে একখানা ছোট টুল। তারই ওপর ব'সে ছোটবাবু দেশ-বিদেশের বার্ত্তা ধরবার চেষ্টা করেন।

স্টেশন-ঘরের এইটুকুই সম্যক্ পরিচয়।

দুটি লাইন অতিক্রম ক'রে অপর দিকে একটি টিনের গুদাম। তার ভিতরে থাকে তামাক, পাট ও সরিষার সঞ্চয়। বৎসরের অধিকাংশ সময় কয়েক শত চামচিকা অবাধ রাজত্ব করে তার অন্ধকারের নিবিড় বুকে। ফসল চালানের সময় বেচারীদের স্বাধীনতায় বাধা পড়ে এবং তারা মাঝে মাঝে অহিংস সত্যাগ্রহ করবার চেষ্টা করায় সাময়িক প্যাক্ট হয় রাজকর্ম্মচারীদের সঙ্গে। সেই গুদামের মধ্যেই একখানা টেবিল ও চেয়ার থাকে। যথাসময়ে ধূলি-ধূসরিত দেহকে পরিষ্কার ক'রে মালবাবু খাতাপত্র নিয়ে বসেন। অন্য সময়ে সেটাকে সম্মুখে রেখে চামচিকেরা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করে আগামী পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য।

দুটি লাইনের একটি দিয়ে ট্রেন যাতায়াত করে। আর একটি গুদামের সন্নিকটে মৃত সর্পের ন্যায় পড়ে থাকে। তার দু-পাশে সবুজ ঘাস জন্মে থাকে এবং রামটহলের গরুটি নির্ভাবনায় তার দু-পার্শ্বে বিচরণ ক'রে সবুজ ঘাসের সদ্ব্যবহার করে। অন্য লাইনে সশব্দে ট্রেন এলেও সে মুখ তুলে তাকায় না। রামটহলের মত সেও যেন ট্রেনের সঙ্গে নিবিড় ভাবে পরিচিত।

স্টেশনের নাতিদূরে দুটি বাড়ী একত্রে যেন গাঁথা, এর বিশদ পরিচয় অনাবশ্যক। রেল-কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের জন্য যে প্রকার বাড়ী সচরাচর নির্ম্মিত হয় ঠিক সেই রকমই। লাল রঙের বাড়ী, বাহিরের দেওয়ালে কোম্পানীর নম্বর দেওয়া কালো রঙে। নম্বর দেখে বুঝা যায় যে সেখানে দুটি বাড়ী। বস্তুতও তাই। প্রতি বাড়ীতে দুটি শোবার ঘর। অতি ক্ষুদ্র একটি বারান্দা, আর একটি ঘরকে দ্বিভাগ ক'রে এক অংশে ভাঁড়ার ও অপর অংশে রন্ধন সম্পন্ন হয়। দুটি বাড়ীর মাঝখান দিয়ে একটি প্রাচীর, সেটি নাতিউচ্চ, পৃথক্ বাড়ীর বিজ্ঞাপন মাত্র। অন্য বাড়ীর লোক দেখা যায় না বটে, কিন্তু হয়ত দীর্ঘশ্বাসও শোনা যায়। একটি বাড়ী বড়বাবুর জন্য, অপরটি ছোট বাবুর জন্য। ট্রেন থেকে দেখা যায় জানালাগুলো প্রায়ই বন্ধ থাকে, তাতে শাড়ীর পাড় সেলাই ক'রে বিচিত্র পর্দ্দা বিলম্বিত থাকে, এটা রেল বাবুদের সনাতনী প্রথা। পূর্ব্বে পাড়ের পর্দ্দা ও টিনের বাক্সের আবরণ গৃহিণীদের সূচী-শিল্পের নিদর্শন ছিল, এর জন্য বিচিত্র পাড় সংগ্রহ করবার প্রতিযোগিতা চলত। এখন সে-সব ঘরে আসেন আধুনিক মেয়েরা, সুতরাং দোকান থেকে আসে বিলাতী পর্দ্দার কাপড়, আসে সেলাইয়ের কল, কলের গান। রেলের লৌহ-জগতে, জনমানবহীন প্রান্তরেও আধুনিক হাওয়া এসেছে! স্টেশনের পরিচয় এইটুকু।

এবার সেখানকার অধিবাসীদের কিঞ্চিৎ পরিচয়। অধিবাসী বলতে তিনটি মাত্র পুরুষ। বড়বাবু শ্রীসুধাকর দত্ত, ছোটবাবু শ্রীপরিমল দে এবং রামটহল। বড়বাবু সম্প্রতি এসেছেন, পরিমল প্রায় বছর-পাঁচ এখানে আছে এবং রামটহল জন্মাবধি আছে অর্থাৎ তার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্রকে কোম্পানীর কার্য্যে নিযুক্ত ক'রে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। পরিমল যুবক, এক বছর পূর্ব্বে বিয়ে করেছে। সে একাধারে ছোটবাবু, টেলিগ্রাফবাবু, টিকিটবাবু, এবং মালচালানের সময় মালবাবু। রামটহল একাধারে চাপরাশী ও সিগ্‌নালার, সে-ই লাইন-ক্লীয়ার দেয়, ট্রেনের পূর্ব্বে স্টেশন-প্রাঙ্গণের স্তিমিত তিনটি আলোতে আলো জ্বালিয়ে যাত্রীদের অন্ধকার থেকে আলোকে আনবার চেষ্টা করে, মালচালান মরশুম ব্যতীত অন্যান্য সময়ে দ্বিপ্রহর রাত্রির মালগাড়ীটি 'পাস' করিয়ে দিয়ে ছোটবাবুর প্রীতিভাজন হয়। রামটহলের বয়েস প্রায় চল্লিশের কাছে। অভিজ্ঞতাপূর্ণ গোঁফটি তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। রাউতারার পুরাতন দালানটির মতই সে বহু বড়বাবু ও ছোটবাবুকে আকর্ষণ ক'রে কবলিত করেছে। সে ব্যতীত কোন বাবুই এক পা চলা অসম্ভব। তার স্ত্রী দুই বাবুর বাড়ীতেই ঝিয়ের কাজ করে। তার পরিবর্ত্তে বেতন নেয় না, এক বাড়ীতে রামটহল দু-বেলা খায়, অন্য বাড়ীতে তার স্ত্রী রতিয়া। রতিয়া কাজের লোক, রন্ধন ব্যতীত যাবতীয় কাজ সে সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। রাত্রে নিজের ও স্বামীর আহার্য্য নিয়ে নাতিদূরে নিজের বাড়ী যায়। রামটহলও সাতটার গাড়ীর পর বাড়ী আসে, ক্ষণিক বিশ্রাম ক'রে রতিয়া আসার পর খাওয়া শেষ ক'রে স্টেশনে এসেই শোয়। এই তার দৈনন্দিন জীবন। রামটহলের একটি দশ বছরের ছেলে আছে, আর আছে তিন-চারটি গরু। গরুর দুধে পরিমিত জল মিশিয়ে তার দু-পয়সা উপার্জ্জন হয়। বাবুরাও তার বহু পুরাতন গ্রাহক।

পরিমলকে রেল-কোম্পানীতে এনেছিলেন তার শ্বশুর। তিনি তাকে চাকরি দেন প্রথমে, পরে দেন কন্যা। পুরাতন কর্মচারী ব'লে তাঁকে কোম্পানী এ সুবিধা দেয়, জামাইকে চাকরি দিয়ে, একমাত্র পুত্রকেও চাকরী দিয়ে পরিমলের শ্বশুর কিঞ্চিৎ অর্থ নিয়ে দেওঘরে সস্ত্রীক ধর্ম্মকর্ম্মে মনোযোগ দিয়েছেন। সুতরাং পরিমলের স্ত্রী সরলা রেল-কোয়ার্টারে বাসে পারদর্শী, কিছু দিনের মধ্যেই নিজের সংসার মনোমত ক'রে গুছিয়ে নিল।

বড়বাবু এলেন। সঙ্গে এল তাঁর যুবতী স্ত্রী এবং একমাত্র পুত্র নির্ম্মল। বড়বাবুর বয়েস প্রায় পঞ্চাশ, নাতিদীর্ঘ স্থূলাকৃতি, দেহের বর্ণ কালো, উদরের স্ফীতিটুকু কোর্টের উপর থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায়, অনেকটা পাবনার গেঞ্জীর বিজ্ঞাপনের মত। নিজের ভুঁড়িতে তিনি প্রায়ই হাত বুলোতে বুলোতে গড়গড়ায় মন দেন, মস্তকের সম্মুখে ও মধ্যস্থল কেশশূন্য, কানের পাশ দিয়ে ও ঘাড়ের উপর দিয়ে একখণ্ড তরমুজের মত কেশ বৃত্তাকারে টাকটিকে ঘিরে আছে। বৃত্তাকৃতি কেশভাগ-টুকু বেশ সজীব ও কুঞ্চিত। ঐতিহাসিকরা যেমন একখণ্ড শিলা থেকে পৃথিবীর বয়স ও প্রাথমিক রূপ বলতে পারেন, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ যেমন একখণ্ড ভূগর্ভস্থ অস্থি থেকে কোন প্রাণীর রূপ বর্ণনা করতে পারেন, তেমনি বড়বাবুর সেই বৃত্তাকার কেশ দেখে অনুমান করা যায় যে, এককালে তাঁর মস্তকের কেশ কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত ছিল; হয়ত বা যৌবনে তাঁর কেশ অনেকের হিংসার বিষয়বস্তু ছিল। বড়বাবুর মস্তকে কেশের অভাব থাকলেও দেহে ছিল না, বুক পেট বাহু ও পিঠে সর্ব্বত্রই সেই কুঞ্চিত কেশের নিদর্শন, সেজন্য বড়বাবুর লজ্জা ছিল না, কারণ শীতকাল এবং ট্রেনের সময় ব্যতীত তিনি কখনও জামা পরতেন না, যুবতী স্ত্রী কখনো কখনো অনুরোধ করত, তখন বড়বাবু তাকে অসন্তুষ্ট করতে পারতেন না। সকালে কাজে আসবার সময় কোটটি গায়ে লাগিয়ে বোতাম আঁটবার চেষ্টা করতে করতে স্টেশনে পৌঁছে যেতেন এবং বোতাম লাগাবার আর বৃথা চেষ্টা না ক'রে পুনরায় কোটটি খুলে দেওয়ালে পেরেকের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখতেন, দ্বিপ্রহরে বাড়ী যাবার সময় পুনরায় সেই ব্যবস্থা; স্ত্রী কমলমণি দেখে আনন্দিত হ'তেন।

"বোতামগুলো লাগাও না কেন? ও জামা প'রে লাভ?" স্ত্রী কোনদিন বলে।

"বোতাম! চেষ্টা ত করি, গলারটা লাগে কিন্তু তার নীচে আর একটাও লাগে না, যে রেটে বাড়ছি তাতে দু-দিন পরে ওটাও হয়ত লাগবে না, এই ত সেদিন কোটটা কোম্পানী দিল—" বড়বাবু নিজের দেহের দিকে তাকান। এ কথায় কমলমণি রাগ করে।

"তোমার যেমন কথা! আয়নায় চেহারাটা দেখো একবার, আগেই শুনেছিলাম যে পূর্ণিমায় বাঘও শুকিয়ে যায়, তুমি এই দু-মাসেই যা হয়েছ! তোমার কোম্পানীর কাপড় যা! এক ধোপেই ছোট হ'য়ে যায়!" স্ত্রীর কথা শুনে বড়বাবু প্রায়ই বোতাম পুনরায় লাগাবার চেষ্টা করেন, এবং কমলমণি সকালে দুধের বরাদ্দটা বৃদ্ধি করেন, কিঞ্চিৎ ঘৃতের সন্ধানেও থাকেন।

বড়বাবুর জীবনেতিহাস বিচিত্র ও দীর্ঘ। তাঁর সে ইতিহাস গড়ে উঠেছে মাত্র নিজের চেষ্টায়, শ্রমে ও কোম্পানীর প্রতি আন্তরিক নিষ্পাপ সেবায়। অনাথ বালক সুধাকর নিজের চেষ্টায় প্রথম যৌবনে কোম্পানীতে কাজ পান, প্রথমে রেল-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন ভৃত্য হিসাবে, পরে বড়বাবুর স্ত্রীর কৃপায় কোম্পানীতে প্রবেশ করেন। ঘণ্টা দেওয়া, আলো জ্বালান ও অবসরকালে বড়বাবুর স্ত্রীর ছোট খোকাকে কোলে করা, তাঁর পায়ে তেল মালিস করা ইত্যাদি ছিল তাঁর কাজ, পরে তিনি পয়েণ্টস্‌ম্যান হ'তে সমর্থ হন নিজের কার্য্যকুশলতায়। সুধাকর বাবু মাত্র ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়েছিলেন—সুতরাং বিদ্যার জোরে নয়, শ্বশুর কিংবা পিতার চেষ্টায় নয়—নিজের চেষ্টায় আজ একটি স্টেশনের বড়বাবু হ'তে সমর্থ হয়েছেন। কোম্পানীর কাজই তাঁর ইষ্টমন্ত্র—আজ পঞ্চাশ বৎসর বয়েস হ'ল কিন্তু তিনি পরলোকের জন্য তীর্থ ত দূরের কথা, প্রাত্যহিক পূজা পর্য্যন্ত করবার অবসর পান না।

সুধাকর বাবু যখন পয়েণ্টস্‌ম্যান হন তখন তিনি বিবাহ করেন, সে আজ বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তখন তাঁর বয়স প্রায় আটাশ বৎসর। পুত্র নির্ম্মলের বয়স যখন আট বৎসর তখন তাঁর প্রথম স্ত্রী মারা যান দীর্ঘ সূতিকা রোগ ভোগের পর। তখন সুধাকর বাবু বনগাঁ লাইনের কোন ক্ষুদ্র স্টেশনের ছোটবাবু—সংসারের চাপে, অসহায়তার পীড়নে তিনি পুনরায় বিয়ে করেন কমলমণিকে। কমলমণি বাংলার কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতার কন্যা, সুতরাং সুধাকরবাবুকে বিয়ে করতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করে নি, বরং বিয়ের পর সংসারে এসে এমন ভাবে মিশে গেল এবং দুরন্ত পুত্রও আপন-ভোলা সুধাকরকে এমন ভাবে কাছে টেনে নিল যেন কত দিনের পাকা গৃহিণী সে। আজ সুধাকরবাবুর বয়স প্রায় পঞ্চাশ, কমলমণির

প্রায় পঁচিশ, এবং নির্ম্মল উনিশ বৎসর বয়সে গত বৎসর তৃতীয় বারে বহু কষ্টে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

তার পর রাউতারার কাহিনীর সূত্রপাত।

বড়বাবুকে আমরা দেখেছি। যত বার রাউতারার বুকের ওপর দিয়ে গিয়েছি তত বার দেখেছি তিনি সেই ভাবে কোটটি গায় দিয়ে দ্রুতবেগে ক্রমাগত গার্ডের কামরা থেকে এঞ্জিন পর্য্যন্ত যাতায়াত করছেন, হাতে একখানা বাদামী বর্ণের খাতা, কানে একটি তৈলচিক্কণ পেন্‌সিল, পরনে চওড়া লাল পাড় ধুতি, পায়ে জীর্ণ ফিতাহীন জুতো —মুখে ক্রমাগত বলছেন 'ঘণ্টা'। এই 'ঘণ্টা' বলতে আরম্ভ করেন যখন ট্রেন স্টেশনে প্রবেশ করে, এবং ক্রমাগত বলেন যতক্ষণ ট্রেন থাকে। রামটহল পাখা উঠিয়ে, সম্মুখের পয়েণ্ট ঠিক ক'রে প্রায়ই ঘণ্টা দেয় ট্রেন ছেড়ে দিলে। গার্ডের কামরাটি স্টেশনের প্ল্যাটফরম ছাড়লেই বড়বাবু কোটটি ক্ষিপ্রবেগে খুলে ফেলেন। অফিসে প্রবেশ ক'রে কাটিহারকে আহ্বান করেন দেওয়ালের কাছে অবস্থিত যন্ত্রটির দেহে হাতলের আঘাত ক'রে, রিসিভারটি কানে ও মুখে লাগিয়ে বলেন—"হ্যাঁ, হ্যালো—কে কাটিহার? হ্যাঁ, রাউতারা স্পিকিং—সেভেটিন্ আপ পাস থ্রু রাইট টাইম।" রিসিভারটি নামিয়ে রাখেন, পরিমলকে ইঙ্গিত ক'রে ডাকেন—কোথায় হে ভায়া, কোথায় গেলে।" পরিমল হয়ত তখন বারান্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল। বড়বাবুর আহ্বানে তাড়াতাড়ি বিড়িতে শেষটানটুকু দিয়ে সেটাকে পদদলিত ক'রে বলে—এই যে দাদা যাই। এই রামটহল—এই রাম্-ট-হ-ল—! বড়বাবু ডাকছেন—কোথায় গেল ব্যাটা—মরেছে—এই রাম-ট-হ-ল—।" পরিমল এসে উপস্থিত হয় বড়বাবুর সম্মুখে, কিছুক্ষণ পর রামটহলও এসে উপস্থিত হয়।

"কি দাদা—?"

"এই যে পরিমল এসেছ। দেখ টিকিট ক'খানা বিক্রী হ'ল? প্রত্যেক ট্রেনের পর একটা কাগজে নম্বর ও কোথাকার টিকিট তা টুকে রেখ—বুঝলে? তাতে গোলমাল হবার ভয় কম। বোঝ ত—দুটো পয়সা কিছু নয়, কম হ'লে পুরিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু ধরা পড়লে জেল! আর তুমি ছেলেমানুষ, কোম্পানীকে কাজ দেখালেই উন্নতি। বুঝলে, ওরা সাহেব জাত, কাজের আদর করে। আমাকেই দেখ না, পয়েন্টসম্যান থেকে বড়বাবু হলাম ত! ক্লাইভ কি ক'রে বড় হয়েছিলেন—তোমার ঠিক হবে। ওরে রামটহল তামাক দে।" সুধাকরবাবু চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে পড়েন।

"আপনার আশীর্ব্বাদ দাদা। আপনার কাছে কাজ শিখে নেব ভাবছি। আপনি এসেছেন এ আমার ভাগ্য।" পরিমল টিকিটের হিসাব টুকে রাখে। যদিও নিয়ম যে রাত বারোটার পর দৈনন্দিন হিসাব রাখতে হয়, অর্থাৎ ছোট স্টেশনে সে কাজটি সকালেই সম্পন্ন হয়, তথাপি প্রত্যেকখানি ট্রেন ছেড়ে যাবার পর বড়বাবু এমনই একটি বক্তৃতা দেবেন এবং শেষ করেন নিজকে লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে তুলনা ক'রে। পরিমলও তদ্রূপ মতামত জানিয়ে দাদাকে সন্তুষ্ট করে—কোম্পানীর কাজ ও তার পয়সার বিষয়ে বড়বাবু সুধাকর দত্ত অমানুষিক সতর্ক।

জীবনে তিনি ঘুষ নেন নি, পূর্ব্ব থেকে আনীত 'পাস' ব্যতীত নিজের পদের সুযোগ নিয়ে ট্রেনে যাতায়াত করেন নি, স্ত্রীপুত্রকেও যেতে দেন নি, রাউতারা থেকে কাটিহার নিজে যেতেন টিকিট ক'রে। কমলমণি ও সরলাকে কয়েক বার কাটিহারে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেছেন প্রত্যেকের টিকিট ক'রে। প্রথম বার পূর্ণিয়ার বিখ্যাত মেলা ('গুলাববাগ মেলা') দেখতে গিয়েছিলেন স্ত্রী ও সরলাকে নিয়ে, তাও সকলের টিকিট কেটে।

"এ আপনি কি করছেন দাদা, টিকিট ক'রে যাবেন কেন? আপনি বড়বাবু, সকলেই জানে, না হয় পূর্ণিয়ায় একটা মেসেজ্ দিয়ে দিচ্ছি—অনর্থক এই অর্থদণ্ড! এ ত আপনি ন্যায়তঃ পাবেনই।" পরিমল প্রথম বার বলেছিল।

"আমি পাব ঠিক। কিন্তু সে ত ওপর থেকে আনতে হবে। এখন যদি এমনি যাই তার মানে হয় কোম্পানীকে ফাঁকি দেওয়া—সেটা চুরি। তুমিও এটা শিখে রাখ ভাই। বৌমা ওঠ গাড়ীতে।" সরলা ও কমলমণি গাড়ীতে ওঠে, পরিমল আপত্তি করে না, কারণ যাবতীয় ব্যয় দাদাই বহন করেন। বড়বাবু এক বার ছুটে যান অফিসে, রামটহলকে কি যেন উপদেশ দিয়ে আসেন, গার্ডকে গিয়ে কি যেন বলেন, একটা কাগজে তাঁর দস্তখত করিয়ে এঞ্জিনের চালককে এক টুক্‌রো দিয়ে এসে অবশিষ্টটুকু পরিমলের হাতে দিয়ে বলেন—"পরিমল, এ গাড়ীটা আমিই পাস করিয়ে দিলাম। একটু হুঁসিয়ার হয়ে কাজ ক'রো। আমি সাতটার গাড়ীতেই ফিরে আসব। তুমি কাউণ্টারের দিকে একটু নজর রেখ। প্রত্যেক ট্রেনের বিক্রীটা একটু টুকে রেখ। ট্রেন পাস করিয়ে তৎক্ষণাৎ পরের স্টেশনকে জানিয়ে দিও। এটা কিন্তু সাংঘাতিক ডিউটি। রামটহলকে ব'লো যেন একটু চোখ খুলে লাইন ক্লীয়ার দেয়। তুমি বরং পয়েণ্টটা একটু দেখে নিও। আর ভাল কথা, টিকিটের আলমারী বন্ধ

ক'রে চাবি নিজের কাছে রেখ, কোথাও যেন যেও না। দুর্গা—দুর্গা—"

ট্রেন ছেড়ে দেয়।

সাতটার সময় ফিরে এসে পুনরায় সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে নেন, বিশেষ ক'রে টিকিটের আলমারী সম্পর্কে শত প্রশ্ন করেন পরিমলকে।

সাতটার পর দু-জনেই আসেন বাড়ীতে। সেদিন কমলের ওখানেই সকলের আহার হয়। বড়বাবু ও পরিমল খেতে বসে, কমলমণি পরিবেশন করে। মেলার গল্প হয়, পরে দুই বধূ আহারে বসে। রাত্রে সরলা স্বামীকে দেখায় মেলায় কেনা জিনিস—নানা প্রকারের।

"সব বট্‌ঠাকুর কিনে দিলেন। কত বললাম, কিছুতেই আমার কাছ থেকে পয়সা নিলেন না। সত্যিই খুব অন্যায়—" সরলাকে পরিমল যাবার সময় একখানা পাঁচ টাকার নোট দিয়েছিল, সেখানা সে স্বামীকে ফেরৎ দিল। সরলা রেল কর্ম্মচারীর কন্যা, অর্থ চেনে, মেলায় সে এক বারও জিনিসের মূল্য দিতে চায় নি। বড়বাবু ও কমল সানন্দে সেগুলো কিনে দিয়েছেন।

"সত্যিই অন্যায়। দাও, কাল সকালে আমি বৌদিকে দিয়ে আসব—।"

"তুমি আবার দিতে যাবে? তাঁরা কিছু মনে করবেন না ত!" পরিমলের যুক্তি সরলার পছন্দ হয় নি!

পরদিন পরিমল অবশ্য ঋণশোধের চেষ্টা এক বার কমলমণির কাছে করেছিল কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নি। "তুমি পাগল হয়েছ ঠাকুরপো। সরলাকে তাঁর ভাসুর দিয়েছে, আমি পয়সা নিয়েছি শুনলে কেটে ফেলবেন।"

"তুমি বলো না বৌদি, তা'লেই হ'ল, এতগুলো খরচ, এটা অন্যায়।"

"তা হয় না ভাই, তাঁকে লুকিয়েও আমি কোন কাজ করতে পারব না।" কমলমণি পরিমলকে এক কাপ চা দিতে দিতে বলে।

"আচ্ছা বৌদি, দাদাকে টিকিট করতে তুমিও মানা করতে পার না। এ কি পাগলামি, তুমিই বলো না।"

"আমি অনেক দিন বলেছি। ওঁর একটা জিদ্।"

সাতটার গাড়ী স্টেশন ত্যাগ করে, পরিমলের হুঁস হয়। বড়বাবু ভোরে উঠেই স্টেশনে চলে যান। সাতটার গাড়ীর টিকিট তিনিই পাস করিয়ে দেন, তার পর পরিমল যায়। টিকিটের চাবি রাত্রে বড়বাবুর কাছেই থাকে, সুতরাং তিনিই সে গাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্তা। পরিমলের নতুন বউ, সুতরাং ভোরে ওঠা তার পক্ষে অসম্ভব। সরলাকে ঠাট্টা করেছে কমলমণি অনেক দিন। স্বামীকে বলেছে—"নতুন বিয়ে বেচারীর। ঠাকুরপোও ঘুমকাতুরে, ভোরে উঠে সরলা তাকে তুলে দিতে পারে না। সাতটার গাড়ীটা তুমিই পাস করিয়ে দিও। এখন নতুন নতুন, পরে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।" কমলমণির দৃষ্টির সম্মুখে যেন একটা অস্পষ্ট কাল্পনিক ছবি ভেসে ওঠে। অকারণে তার অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে যায়। সে দীর্ঘশ্বাস কমলমণির নয়, তার অন্তরের সুষুপ্ত নারীর।

"নিশ্চয়ই দেব—নিশ্চয়ই! তুমি বরং বৌমাকে ব'লে দিও যেন তাড়াতাড়ি না করে। সাতটার পর আর গাড়ী ত সেই নটায়। পরিমল যেনী ধীরে সুস্থে আসে।"

তার পর থেকে সেই প্রথা প্রচলিত হয়েছে। পরিমল ধীরে ধীরে স্বেচ্ছায় ওঠে। দাদার বাড়ীতে চা খেয়ে দাদার জন্য চা নিয়ে মন্থর গতিতে স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলে।

সরলা তখন সবে মাত্র উঠে মুখ ধুতে বসে। কমলমণি চায়ের পাট শেষ ক'রে রান্না চড়িয়ে দেয়।

জীবনের প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে কালের রথ পুরো একটি বৎসর নিঃশব্দে চলে গেল।

রাউতারায় আমাদের বড়বাবুর ইতিহাসও তেমনই চলন পূর্ণ এক বৎসর। কমলমণির কোন সন্তান হয় নি। বড়বাবুর একমাত্র পুত্র নির্ম্মলকেই সে বুকে তুলে নিয়েছিল। তার আগমনের পর বড়বাবু নির্ম্মলের দিকে দৃক্‌পাত করবার অবসরও পান নি, কারণ তাঁর গৃহে কমলমণির পদার্পণের পর থেকেই বড়বাবুর ক্রমোন্নতি। হস্তরেখার রাহুর বক্ররেখাটি পরিবর্ত্তিত হ'য়ে উর্দ্ধরেখায় পরিণত হবার চিহ্ন তখন তাঁর হস্তে সুস্পষ্ট। বড়বাবু তখন স্বপ্ন দেখেন যে অচিরেই তিনি কলকাতা স্টেশনের স্টেশন মাষ্টার হ'য়ে মুহূর্ত্তের অবসর পাচ্ছেন না, মুহুর্মুহুঃ বিভিন্ন দিক থেকে ডাক আসছে এবং তিনি চঞ্চল হ'য়ে বিভিন্ন প্রকারের রিসিভার কানে তুলে শত শত যাত্রীবাহী ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ করছেন, যাত্রীদের প্রাণের দায়িত্ব তাঁর; কোম্পানীর লাভ-লোকসান মান-সম্ভ্রমের একমাত্র-রক্ষক তিনি—ব্যস্ত, ক্লান্ত, পদমর্য্যাদাগর্ব্বিত শ্রীসুধাকর দত্ত।

এইরূপ স্বপ্ন ভাবতে ভাবতে তিনি এলেন রাউতারায় দু-তিনটি ক্ষুদ্র স্টেশনকে পরিচালিত ক'রে, এবং ভাবলেন যে তার পর পাবেন কাটিহার এবং তারই পর কলকাতা!

সুতরাং এ অবস্থায় নির্ম্মল তাঁর অজ্ঞাতেই কুড়ি বৎসরে

পদার্পণ করল ; তার প্রতি দিনের ইতিহাসও কমলমণিই পরিচালনা করেছে। কমলমণির প্রথম জীবনে নির্ম্মলকে সে নারীস্নেহ দিয়েছে, পরে নিজের সন্তানসম্ভাবনা ক্রম-বিলুপ্ত দেখে তাকে অপর্য্যাপ্ত মাতৃস্নেহ দিয়ে নির্ম্মলের মনুষ্যত্বের হয়ত প্রতিবন্ধকই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

বড়বাবুর বিন্দুমাত্র অবসর ছিল না কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করবার!

রাউতারায় এসেই বড়বাবু যখন প্রতি ভোরে ও সন্ধ্যায় স্টেশনে ধূপ দিতে লাগলেন, দ্বারে জলসিঞ্চন ক'রে কুলবধূর মত লক্ষ্মীকে অচঞ্চলা করবার প্রয়াস পেলেন, তখন পরিমল হেসেছিল গোপনে যেমন অন্যান্য স্টেশনের লোকেও হেসেছিল পূর্ব্বে। কিন্তু ক্রমে পরিমল সেটাকে মেনে নিল দাদার ও বৌদির স্নেহে ও সাহচর্য্যে।

নির্ম্মল প্রথমে এসে কয়েক দিন ছিল রাউতারায়, কিন্তু স্থানের দারিদ্র্য ও সেকেলেমিতে সে সেস্থান ত্যাগ ক'রে কলকাতা যেতে বাধ্য হয় তার এক দূরসম্পর্কের মামার বাসায়। কমলমণি প্রতি মাসে তাকে অর্থসাহায্য করেছে। সে যেদিন যাত্রা করে তার পরের দিন অকস্মাৎ বড়বাবু স্ত্রীকে প্রশ্ন করেন—"নিমু চলে গেছে নাকি?"

"সে ত কালই গেছে—তোমার আজ খেয়াল হ'ল?"

"হ্যাঁ, পরিমল আজ হিসাব দেবার সময় বলল যে কাল একখানা কলকাতার ইন্‌টার বিক্রী হ'য়েছে। জিজ্ঞাসা করায় জানলাম যে নিমু গেছে। এ খুব ভাল কথা যে টিকিট কেটে গেছে।" শেষোক্ত ভাবটিই যেন তাঁকে সবচেয়ে আনন্দ দিয়েছে। "তা হঠাৎ কলকাতা গেল যে?"

"এ জঙ্গলে তার মন টিকল না। সত্যিই ত এদেশে মানুষ থাকতে পারে? বিশেষ তার কলকাতায় থাকা এখন অভ্যেস হ'য়ে গেছে। দেখ, এবার তার একটা বিয়ের ব্যবস্থা করো দেখি—ছেলের বয়েস হয়েছে।"

"হ্যাঁ, এইবার দেব! তুমি একটু চেষ্টা করো না?"

"আমি! মেয়েমানুষ হ'য়ে।"

"ও! হ্যাঁ, তাও ত বটে—" বড়বাবু স্ত্রীকে বাধা দেন। হয়ত তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে যায় যে তাঁর স্ত্রী স্ত্রীলোক। "আমিই করব, এই এবার একটা বড় স্টেশনে গিয়েই।" মনের ইচ্ছা 'কলকাত্তা' শব্দটা হয়ত বা তিনি প্রাণের আশার গোপনীয়তা রক্ষা করবার জন্য উচ্চারণ করেন না। "ওঃ, গাড়ীর সময় হ'ল।" বড়বাবু প্রচলিত প্রথানুযায়ী কোটের বোতাম লাগাবার চেষ্টা করতে করতে এগিয়ে যান স্টেশনের দিকে।

পশ্চাতে কমলমণি স্বামীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে।

অকস্মাৎ নির্ম্মল এক দিন রাউতারার জঙ্গলে এসে হাজির। আগমনের পরের দিন তার আসার হেতু জানা গেল। অবশ্য জানতে পারল শুধু কমলমণি। বড়বাবু দু-এক দিন জানতে পারেন নি, কারণ জানবার অবসরও তাঁর ছিল না। নির্ম্মল কয়েক দিন আধুনিকত্তাবর্জ্জিত অজ্ঞাত স্টেশনের প্রান্তরে 'মণিমা' অর্থাৎ কমলমণির স্নেহের ছায়ায়, সরলা ও পরিমলের সাহচর্য্যে আনন্দেই কাটাল মনে হ'ল। দিনের অধিকাংশ সময় সে সরলার সান্নিধ্যেই অতিবাহিত ক'রে প্রান্তরের বুকে পলাশ ফুলের রক্তচ্ছটা দেখতে পেল, ট্রেনের ধূমাচ্ছন্ন হাওয়ায় পেল অপরিচিত ফুলের গন্ধ।

নির্ম্মল বড়বাবুর পুত্র হ'লেও আকৃতিতে পিতার সঙ্গে তাহার অচিন্তনীয় পার্থক্য, নির্ম্মল সুন্দর ও আশ্চর্য্য সুপুরুষ, কমলমণির পুত্র ব'লে পরিচয় দিলে তার রক্তধারার স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য সূত্র ধরা যায়। বড়বাবু বলেন যে নির্ম্মল নাকি তার স্বর্গগতা মার রূপ-বৈশিষ্ট্য পেয়েছে।

কমলমণি এক দিন জানতে পারল যে নির্ম্মল একটি চাকরি পেয়েছে সুদূর বোম্বেতে, চাকরির সূত্রপাত আশাপ্রদ, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, অর্থাৎ সে চাকরির অনাগত ভবিষ্যৎকে যে কোন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করা যায়। কমলমণি প্রথমে বোম্বাইয়ের দূরত্বটুকু উপলব্ধি করতে না পেরে সম্মতি জানিয়েছিলেন, তাঁর ধারণা ছিল যে সে দেশটি কলকাতারই উপকণ্ঠে কোথাও হবে, কিন্তু পরে যখন শুনলেন যে সেটা ভারতবর্ষেরই একেবারে কণ্ঠে অর্থাৎ বিলাত যাবার দ্বারদেশে তখন তিনি রুদ্ধশ্বাসে অমত জানালেন।

"না খোকা, তোমাকে অত দূরে যেতে দেব না, বুড়ো বাপ, হঠাৎ কিছু হ'লে শেষ দেখাও দেখতে পাবে না, আমি মরলে তোর হাতের জলপিণ্ডি পর্য্যন্ত পাব না—দরকার নেই বাপু অমন চাকরিতে—" কমলমণি শুধু বারণ করে না, সাশ্রুনয়নে মিনতিও জানায়।

"কি যে বলে মণিমা, এমন কি দূর দেশ? এই ত কলকাতা থেকে গাড়ীতে চাপলেই ব্যস্—" কথা-ভঙ্গিটুকু দিয়ে মূর্খ নারীর কাছে সে বোম্বাইয়ের দূরত্বটুকু কমিয়ে দিতে চায়।

"তবে যে সরলা বলল যে সেখান থেকে লোকে বিলাত যায়—!"

"হঃ—বিলেত সেখান থেকে সুয্যি মামার দেশ, কয়েকটা সমুদ্দুর পার হয়ে যেতে হয়। বিলেত ত রাউতারা থেকেও যাওয়া যায়, তাই ব'লে কি তোমার রাউতারা বিলেতের কাছে—যত সব! কেমন চাকরি বল দেখি?

কিছু দিন পর তোমাদেরও সেখানে নিয়ে যাব—এই দেশে মানুষ থাকে—!" চাকুরীর মোহ ও নির্ম্মলের মুখে তার বেতনের বহর শুনে, তার ভবিষ্যৎকে নির্ম্মলের বক্তৃতায় বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত কল্পনা ক'রে, নিজের কল্পনায় তাকে অধিকতর উজ্জ্বল ক'রে কমলমণি অবশেষে নিজের মত দেয় ও স্বামীরও মত ও অনুমতি গ্রহণ করে।

নির্ম্মল কলকাতায় অহরহ ছায়াচিত্র দেখে, কয়েক জন নিম্নশ্রেণীর চিত্রাভিনেতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে, দু-এক দিন কোন ষ্টুডিওর অন্দরে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ ক'রে এবং অবশেষে দু-চার জন অভিনেতা কি প্রকারে বাংলায় বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না পেয়ে সুদূর বোম্বাইয়ে গিয়ে আজ ভারতে সর্ব্বত্র সমাদৃত হচ্ছে শোনে। প্রচুর অর্থের মোহ, সুন্দরী তারকার পার্শ্বে প্রেমাভিনয়—এই সব লোভ একত্র হয়ে নির্ম্মলকে উৎসাহ দিল জীবনারম্ভের প্রথম সোপান প্রস্তুত করায়। কলকাতায় নিজের জীবনের এমন উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করতে করতে, দর্পণে নিজের স্বরূপ দেখে, দেওয়ালে ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় সর্ব্বদা বোম্বাইয়ের সুন্দরী তারকাদের প্রতিচ্ছবি দেখে এক দিন সে স্থির ক'রে ফেললে নিজের জীবনযাত্রা। প্রথম বাধা দিল শূন্য পকেট। পরের ট্রেনেই চলে এল সে অজ্ঞাত রাউতারায়, কারণ কমলমণি তাকে বহুবার বিপদে গোপনে সাহায্য করেছে।

"তোমার কত টাকার দরকার—?" বড়বাবু সেদিন প্রথম প্রশ্ন করেন।

"দু-শ হলেই হবে—বড় শহর, বাসা ক'রে ভালভাবে স্থিতি হতে হবে বলেই একটু বেশী লাগবে—আর ভাড়াও ত কম নয়। তার পর প্রথম মাসের মাইনে পেলেই—" নির্ম্মল অতিশয় বিনীত ভাবে পিতাকে জানায়।

"এখন এক-শ নিয়ে যাও—পরে বাকিটা পাঠিয়ে দেব।"

"তা কি হয়! বিদেশ-বিভূঁয়ে ও টাকা কোথায় পাবে—এই প্রথমটা বইত নয়, মাইনেই ত ও প্রথমে পাবে দু-শ—তার পর ওর দরকার কি! তোমার যেমন কথা!"

"ও! তাইত!" বড়বাবু তাড়াতাড়ি মত দিয়ে স্টেশনে দৌড়ান, সন্ধ্যে দেবার সময় হয়েছে—রামটহলটা এ বিষয়ে বিশেষ ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে।

যথাসময়ে নির্ম্মলের যাত্রার দিন উপস্থিত হয়। কমলমণি যাত্রার পূর্ব্বে কাঁদতে কাঁদতে গোপনে পুত্রের হাতে পঁচিশটি টাকা দেয়।

"এ কয়টা টাকাও রেখে দাও—বিদেশ-বিভূঁই, ওঁকে আর এর কথা জানিও না।" কমলমণি যাত্রা অশুভ হবে ব'লে চোখের জল মুছে ফেলে কিন্তু বার-বার চোখে কেন যেন জল আসে—বাইরের চেষ্টাও মানে না।

"এক মাস পরেই কিন্তু তোমাকে নিয়ে যাব মণিমা—" অতিরিক্ত অর্থ পেয়ে নির্ম্মল পুনরায় সদিচ্ছা জানায়।

"তোমার বাবা পেনসিল্ না পেলে কি ক'রে যাব বাবা—ওঁকে ত চেন, ভাতের গ্রাস তুলে মুখে দিতে ভুলে যান। আমার হয়েছে মহাবিপদ! তুমি একটু স্থিতি হও, তার পর দেখা যাবে—ছুটি-ছাটা হ'লে চলে এস বাবা।"

যথাসময়ে নির্ম্মলের ট্রেন ছাড়ে, সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিল কমলমণি, সরলা ও পরিমল। বড়বাবু গার্ডের কাছে ছিলেন, গাড়ী হুইসিল দেবার পর একবার চিৎকার করলেন—"ঘণ্টা—"

ট্রেন তখন মৃদু চলতে আরম্ভ করেছে। সাতটার ট্রেন, কমলমণির দৃষ্টি কুয়াশাচ্ছন্ন হ'য়ে এসেছিল, ট্রেনের পশ্চাতের রক্তবর্ণ আলোটি অকস্মাৎ যেন তাকে জাগরিত করল। কিছু দূরে এগিয়ে গিয়ে ট্রেনটি বিশ্রী ভাবে বাঁশী বাজিয়ে তাকে আর একটা নাড়া দিল।

গাড়ীটি একটি মোড় ঘুরে যায়, আলোটিও কমলমণির দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

"কি তোমরা এখনও দাঁড়িয়ে যে? নির্ম্মলের গাড়ী ছেড়ে গেল?" কমলমণি কোন উত্তর না দিয়ে সরলার হাত ধরে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলে, সরলার হাত তাঁর হাতে মৃদু কাঁপে ও সিক্ত প্রতীয়মান হয়।

জীবনযাত্রা পুনরায় নিজপথ ধরে।

নির্ম্মলের যাত্রার এক দিন পর রাউতারা স্টেশনে যে ঘটনা ঘটে, সেরূপ ঘটনা বড়বাবুর জীবনে এই প্রথম, এবং তিনি প্রায় উন্মাদ হয়ে ওঠেন। পরিমল হিসাব মিলাতে গিয়ে ও টিকিটের আলমারীর শেষ টিকিটের নম্বর নিতে গিয়ে দেখে যে একখানা টিকিট টিউবে কম পড়ছে, সেখানা কলকাতার টিকিট। প্রতি সপ্তাহে টিউবের শেষ নম্বরটি এবং সাপ্তাহিক খতিয়ান কোম্পানীতে পাঠাতে হয়। পরিমল নিকটবর্ত্তী স্টেশনের জমাখরচ ও শেষ টিকিটের নম্বর প্রতি দিন সন্ধ্যায় বড়বাবুর কড়া নজরের আধিপত্যে যথাস্থানে লিখে রাখে, কিন্তু দূরের টিকিট যাহা সচরাচর বিক্রয় হয় না, কিংবা মাসে ও দু-মাসে দু-একখানা মাত্র নিজের স্থানচ্যুত হয় সে-সব টিউবের নম্বর পরিমল সপ্তাহে একবারই দেখে, কারণ তাদের নম্বর সপ্তাহের পর সপ্তাহ পরিমল একই পাঠায়, সে সংখ্যা সমুদ্রের জলের মত বাড়েও না কমেও না!

সেদিন হঠাৎ এই দুর্ঘটনা!

"তোমাকে রোজ বলি, পরিমল, কোম্পানীর কাজ, কোম্পানীর টাকা, রোজ হিসেব টুকবে, রোজ নম্বর টুকে টিউব দেখে তালা বন্ধ করবে। এখন দেখ, বোঝ মজা! তুমিও মরবে, আমাকেও মারবে।" বড়বাবুর দৃষ্টির সম্মুখে যেন তাঁর কলকাতা স্টেশনের বড়বাবু হওয়ার আশা মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হ'ল। চিৎকারে, বক্তৃতায়, উপদেশে রাউতারার প্রান্তর পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল। সুধাকর দত্ত নিজে কাঁপতে কাঁপতে শেষে শিশুর মত কেঁদে ফেললেন। পরিমল ত্রস্ত ও সঙ্কুচিত, রামটহল সেদিন বিকাল চারটার সময়ই ধূপ দিল, স্টেশনের লোহার সিন্দুকে গঙ্গাজল সিঞ্চন করল। কমলমণি সংবাদ পেয়ে নিজে স্টেশনে চলে এল।

বড়বাবু অপহৃত টিকিটখানার নম্বর দিয়ে কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষকে তার দিলেন, কলকাতার বড়বাবুকেও জানালেন যাতে সেখানে ছাড়পত্র দেখার সময় টিকিটের নম্বর দেখা হয় এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয় অপহৃত নম্বরটির ওপর। কোম্পানীও ক্ষুদ্র কার্য্যে বৃষোৎসর্গ করতে পটু। কতকগুলি বড়বাবু ও পরিমল নিয়ে কোম্পানীর সম্পূর্ণতা। টিকিটের মূল্য তাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় নয়, সে টিকিট ধরে তার বিরাট্ বন্দোবস্তের, বিভাগীয় সুচতুরতার সুনামই তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 'বদনা'র জন্য হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মামলা করার মত তাদের জিদ!

সর্ব্বত্র ট্রেনের চেকারের কাছে পর্য্যন্ত সে টিকিটের নম্বর চলে গেল। চেকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিল সেটার জন্য পুরস্কারের ও পদোন্নতির লোভে। ফলে বহু বিনা-টিকিটের যাত্রী সেদিন নিষ্কৃতি পেল সে দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে।

"দাদা, এত গোলমাল না ক'রে টিকিটের দামটা দিয়ে হিসাবটা ঠিক রাখলেই হ'ত না? এ কি কম হাঙ্গাম হবে! গোটাসাতেক টাকার ত মামলা—" পরিমল পরদিন বড়বাবুকে বলে।

"আমিও তাই বলেছিলাম ঠাকুরপো! এই দেখ না কাল সারারাত নিজেও ঘুময় নি, আমাকেও ঘুমতে দেয় নি। একটা অসুখ-বিসুখে না পড়লে বাঁচি—ক'টাই বা টাকা, না-হয় গচ্চা যেত—।" কমলমণি সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

"তোমরা ত এমন বলবেই, টাকা না-হয় মিলে গেল, কিন্তু সে টিকিট নিয়ে যদি পরে কিছু হয়—" দাদার চেহারা এক রাত্রে উন্মাদের মত হয়েছে, নগ্নদেহে তিনি একটা বন্য মহিষের মত শয্যায় পড়ে আছেন, আজ সকালে স্টেশনেও যান নি।

"কি আবার হবে—কোথাও হারিয়েছে, কেউ নেয় নি; আর নিলেই বা, কোম্পানী টাকা পেলেই হ'ল।"

"তা ত বলবেই! স্ত্রীবুদ্ধি কি না! টিকিটে কবেকার তারিখ পাঞ্চ করেছে কে জানে, চুরি, ডাকাতি, স্বদেশী—কত কি হ'তে পারে, হয়ত ঐ টিকিট দেখিয়ে সব জল ক'রে দেবে—কবে হারিয়েছে কেউ বলতে পারে? পরিমলবাবুর কাজ—উঃ—।" বড়বাবু বোধ হয় চোখের সম্মুখে দেখেন বিরাট্ এক চাপ অন্ধকার এবং তার বুকে কয়েকটি তারা।

পরিমল দৃষ্টির সম্মুখে দেখছে যে, যে-কাজটা কয়েকটা টাকা দিয়ে জলের মত মীমাংসা করা যেত সেটাতে দাদার বুদ্ধিতে পড়ে কয়েক মাসব্যাপী হবে বিভাগীয় তদন্ত, সে হবে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত, চিঠির আদান-প্রদানে ভারগ্রস্ত—অবশেষে পর্ব্বতের মূষিক প্রসব!

বড়বাবুর পুরাতন বুদ্ধি, পরিমলের আধুনিক চাতুর্য্য!

সেই দিনই সংবাদ এল যে, চোর ধরা পড়েছে এবং পুলিসের হেপাজতে তাকে পাঠান হচ্ছে পূর্ণিয়ার সদরে!

"দেখলে? ফল হ'ল কিনা? কোম্পানী কত খুশী হবে বল ত?"

সেদিন বড়বাবুর বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজা হয়, স্টেশনের সিন্দুকে চন্দনের ফোঁটা পড়ে এবং পরিমলের প্রতি তিনি সুদীর্ঘ উপদেশের রোমন্থন করেন।

হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি দিয়ে চোরকে যখন এনে উপস্থিত করা হয় তখন দেখা গেল চোর স্বয়ং নির্ম্মল!

পুলিস আসামীকে সদরে সদর্পে চালান দিল। দেখেই কমলমণির জ্ঞান লুপ্ত হ'ল এবং তার জ্ঞান ফিরে এল দু-দিন পরে।

স্টেশন মাস্টার শ্রীসুধাকর দত্ত আসামীর সঙ্গে সদরে গেলেন এবং সদর মহকুমা হাকিমের সম্মুখে যখন পূর্ণিয়া স্টেশনের অন্যান্য কর্ম্মচারীরা, বড়বাবুর হিতৈষী বন্ধুরা সদরের খ্যাতনামা উকিল দ্বারা আসামীর জামানতের জন্য দাবী করছেন, মিনতি করছেন, সম্মুখে দণ্ডায়মান বৃদ্ধ পিতাকে দেখিয়ে তাঁর বয়স, তাঁর পদমর্য্যাদা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়ে হাকিমকে বিচলিত করবার প্রচণ্ড প্রচেষ্টা চলছে, এমন কি পুলিসের লোকও সে জামানতে কোন প্রকাশিত আপত্তি করছে না, তখন বড়বাবু হাকিমকে বললেন, "হুজুর, আমার মালিক কোম্পানীর তরফ থেকে আজ কেউ উপস্থিত নাই, আমি অতি ক্ষুদ্র দাস তার, আমার কোম্পানীর তরফ থেকে আমি এই আসামীর জামানত না দেবার জন্য প্রার্থনা করছি—"

সকলে স্তব্ধ ও হতবাক্ হয়ে গেল।

নাতিদীর্ঘ বিচারে যথাসময়ে আসামী নির্ম্মলের প্রতি দু-বৎসর কঠোর কারাবাসের আদেশ হয়, কমলমণি স্বামীর হিতৈষীদের সাহায্যে স্বামীর অর্থে আসামীর জন্য বিশিষ্ট উকিল নিযুক্ত করতে সাহায্য করলে বড়বাবু প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন কোম্পানীর স্বপক্ষে এবং আসামীর বিপক্ষে।

তিনি নাকি তাঁর কর্ত্তব্য করেছেন এবং চিরদিন করবেন। মামলা যখন পূর্ণ বেগে চলছে তখন কোম্পানীর এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী উপস্থিত থেকে মামলার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করছিলেন, তিনি দেখলেন যে বড়বাবু স্ত্রী ও পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন প্রাণপণ শক্তিতে কোম্পানীর স্বপক্ষে, তিনি জানতে পারলেন যে বড়বাবু আসামীর জামানতে আপত্তি করেছিলেন। কর্ম্মচারীটি জাতে সাহেব, কর্ত্তব্যজ্ঞানই তাদের জীবনের প্রধান বিষয়বস্তু!

কিছু দিন পর কোম্পানী থেকে তাঁর কাছে একখানা দীর্ঘ পত্র আসে, পত্রখানির অধিকাংশই সুধাকর বাবুর প্রশংসায় মুখরিত, শেষের দিকে তাঁকে জানান হয়েছে যে, তাঁর কর্ত্তব্যবোধে কোম্পানী খুশী হয়ে বড়বাবুর বেতন পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন, এবং তিনি কোম্পানীর যে-কোন ভাল স্টেশনে নিজের বদলির দাবী করতে পারেন।

চিঠিখানা যখন পেলেন তখন বড়বাবু দুরন্ত রক্ত-চাপাধিক্যে কয়েক দিন যাবৎ শয্যাগত। কমলমণি পাশে ব'সে ফলের রস স্বামীর জন্য প্রস্তুত করছিল, বড়বাবু চিঠিখানা তাকে দিলেন, কমলমণির অন্তর পুনরায় কোন অশুভের আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হ'য়ে গেল।

"আবার কিসের চিঠি গো? কোন খারাপ খবর নয় ত?"

"না গো না—এবার ভাল খবর! ইচ্ছে করলে এবার কলকাতায় যেতে পার, কোম্পানী খুব খুশী হয়েছে।" বড়বাবু মৃদু হাসলেন।

"পোড়াকপাল তোমার কোম্পানীর—এবার পেন্‌সিলের চেষ্টা করো—" ইতিমধ্যে পরিমল এসে দাঁড়াল, বড়বাবু চিঠিখানা তাকে তুলে দিলেন। চিঠি পড়ে পরিমল ছুঁড়ে ফেলে দিল সেখানা কমলমণির গায়ে— "দাদা লিখে দিন আপনি, এ দয়ায় দরকার নেই, ছেলেমানুষ একটা ভুল না হয় করেই ফেলেছিল—"

"ছিঃ পরিমল! তুমি কমল নও, তুমি পুরুষ ও কোম্পানীর চাকর! যাও চারটের গাড়ীর সময় হ'ল—একটু হুঁসিয়ার হ'য়ে কাজ করো। রাত্রে তোমাকে দিয়ে একখানা চিঠি লেখাব।"

চিঠি তিনি নিজেই লেখেন এবং তখনই লেখেন। অশুদ্ধ ইংরেজীতে বড়বাবু কোম্পানীকে নিজের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান, নিজের কর্ত্তব্যটুকু তিনি করেছেন মাত্র, যা তিনি আজীবন করেছেন ও করতেনও, চিঠিখানা তাঁর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাথেয় ইত্যাদি। অবশেষে তিনি প্রার্থনা করেন যেন তাঁকে সেই ছুটির সঙ্গেই পেন্‌সেন দেওয়া হয়, বার্দ্ধক্যের জন্য তাঁর দেহ ও মন কর্ত্তব্যতে মাঝে মাঝে বাধা দিচ্ছে। সুতরাং ভবিষ্যতে তাঁর সেবায় ত্রুটি হ'তে পারে। সেই আশঙ্কায় পুরস্কার হিসাবে এই প্রার্থনা জানাচ্ছেন, যাতে এই প্রশংসাই তাঁর কর্ম্মজীবনের শেষ পূর্ণচ্ছেদ হয়, তাঁর জীবন কালিমাহীন হয়। প্রার্থনা নিয়ে পত্রের শেষে বড়বাবু বড় অক্ষরে লেখেন—"ইওর মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সরভেণ্ট—শ্রীসুধাকর দত্ত।"

পত্রের কথা পৃথিবীতে জানল মাত্র দু-জন—বড়বাবু ও তাঁর মালিক মহামান্য কোম্পানী!

বড়বাবুর প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছিল।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিগত ৯ই ও ১০ই জুলাইয়ের মাঝের রাত্রে সিসিলি দ্বীপের উপর মিত্রশক্তির আক্রমণ আরম্ভ হয়। প্রথম মুখে বিপক্ষ দল কোথায় প্রথম চড়াও হইবে তাহা না জানায়, বিশেষ কঠিন প্রতিরোধ চেষ্টা করিতে পারে নাই। শেষ খবরে (১৬ই জুলাই) জানা যাইতেছে যে, এখন মিত্রপক্ষের সেনা অগ্রগতির মুখে প্রবল বাধা পাইতেছে। ইতিমধ্যে সিসিলি দ্বীপের উপকূলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ আক্রান্ত হইয়াছে এবং সমস্ত দ্বীপের এক-দশমাংশ এখন স্থলযুদ্ধের আবর্ত্তে আসিয়া পড়িয়াছে। এখনকার পরিস্থিতি ঠিক স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইতেছে না, তবে যেরূপ প্রচণ্ড ভাবে মিত্রপক্ষের জল, স্থল ও আকাশের শক্তি এই অতি ক্ষুদ্র প্রান্তে বিপুল পরিমাণে প্রয়োগ করা হইতেছে তাহাতে মনে হয় মিত্রপক্ষ অতি শীঘ্র এখানে একটা নিষ্পত্তি করিতে চাহে।

সিসিলি দ্বীপ এক জায়গায় ইটালীর মহাভূমি হইতে মাত্র দুই মাইল খাড়ি দ্বারা বিচ্যুত। কিন্তু মেসিনা হইতে রেলখেয়া উহা অপেক্ষা অধিক পথ অতিক্রম করিয়া পারাপার করে, সুতরাং নিকটতম অংশেও ইটালী ও সিসিলির যোগাযোগ পথ নৌ- ও আকাশ- বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে মার্কিন নৌ- ও আকাশ- বহরের বিশেষ বলশালী অংশ প্রবেশ করার পর হইতেই মিত্রপক্ষের জলে ও আকাশে প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং সেই কারণেই এরূপ বিস্তৃত ক্ষেত্রের উপর দিয়া আক্রমণ আরম্ভ করা সম্ভবপর হয়। সিসিলি ইটালীর অংশ বিশেষ, অধিকৃত অঞ্চল নহে, সুতরাং এখানে জয়-পরাজয়ের উপর ইটালীর জনসাধারণের মনোভাবের স্থিতি নির্ভর করে সন্দেহ নাই। সিসিলি অধিকৃত হইলে মিত্রপক্ষের প্রধান লাভ হইবে ভূমধ্যসাগরে নৌচালনের সুবিধা বৃদ্ধিতে। ইয়োরোপ মহাদেশ আক্রমণের সুবিধাও অল্প কিছু তাহাতে বাড়িতে পারে। সুতরাং সিসিলি আক্রমণ দ্বিতীয় প্রান্ত স্থাপনের পথ পরিষ্কার করার অংশ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

গত ছয় দিনের যুদ্ধ যেভাবে চলিয়াছে তাহাতে মনে হয় এত দিনে মিত্রপক্ষ মূল অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। কোন্ পথে মূল অভিযান চলিবে তাহার নির্দ্দেশ এখনও পাওয়া যায় নাই। বিদেশের মতামত যাহা অল্প-স্বল্প আসিতেছে, তাহাতে নির্দ্দেশ ছিল যে মিত্রপক্ষ বহুদূর বিস্তৃত এবং পরস্পরসংযোগ বিচ্যুত প্রান্তে ব্যাপক আক্রমণের চেষ্টা করিতেছে। সেরূপ আক্রমণের উপযুক্ত সময় শীঘ্রই উপস্থিত হইবে এবং সেই জন্যই সিসিলির উপর আক্রমণ ক্ষতির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এরূপ প্রবলভাবে চালানো হইতেছে। ভূমধ্যসাগরে অক্ষশক্তির নৌবল বৃদ্ধির কোনও বিশেষ সম্ভাবনা নাই, তবে আকাশের কথা সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং সেখানে প্রাধান্য রাখার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করিতেছে। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সে ক্ষেত্রে অক্ষশক্তির অবস্থা কি তাহা বুঝা যাইবে।

রুশ যুদ্ধপ্রান্তে কি ঘটিতেছে তাহা বুঝা কঠিন। উভয় পক্ষই এখনও অপর পক্ষকেই আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। ইহার সোজা অর্থ এই যে, সেখানে কোন পক্ষই এখন হার-জিতের বিষয়ে নিশ্চিত নহে। বিদেশী কাগজে প্রকাশ যে এতাবৎ আমেরিকা যাহা "লিজ্ লেণ্ড" ব্যবস্থায় মিত্র পক্ষের অন্যদের সাহায্য দিয়াছে তাহার শতকরা ২০ ভাগ মাত্র রুশ দেশে পাঠানো হইয়াছে, পৌঁছিয়াছে কত তাহা বলা সম্ভব নহে। সোভিয়েটের কলকারখানা অঞ্চলের শতকরা ৬০ ভাগ বিনষ্ট বা শত্রুহস্তগত এবং তাহার কাঁচা মালের আকরের কোন কোনটির শতকরা ৮০ ভাগের অধিক শত্রুহস্তগত। নিপুণ কারিগরও বহু সংখ্যায় শত্রু-অবরোধে রহিয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। এমত অবস্থায় সোভিয়েট রুশের অস্ত্রবলের যোগানের ব্যবস্থা যে কিরূপ সঙ্কীর্ণ হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। অন্য দিকে জার্ম্মানীর শক্তি-সামর্থ্যের শতকরা ৭৫ ভাগও রুশ যুদ্ধপ্রান্তেই নিযুক্ত হওয়ার কোন বাধা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। এই মত অবস্থায় উক্ত লিজলেণ্ড সরবরাহের শতকরা ২০ ভাগ—যাহার সব কিছুই সোভিয়েটের হস্তগত হয় নাই ইহা নিশ্চিত—সোভিয়েটের বলক্ষয়ের কতটুকু পূর্ণ করিতে পারে তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহার উপর বিগত শীত অভিযানে রুশ সেনা অশেষ ক্ষতি স্বীকার করিয়া জার্ম্মাণীর পূর্ব্বদিকের গতির পথ রোধ করার চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং সোভিয়েটের পক্ষে ব্যাপকভাবে কোনও প্রকার আক্রমণ চালনা করা সম্ভব মনে হয় না। তবে যে সময়

মিত্রপক্ষের অন্য দুই শক্তি দ্বিতীয় রণপ্রান্ত যোজনের চেষ্টা করিবে সে সময় জার্ম্মানদল যাহাতে রুশপ্রান্ত হইতে সৈন্য বা অস্ত্র স্থানান্তরিত না করিতে পারে ইহার জন্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধভাবে সাময়িক প্রবল আক্রমণ সোভিয়েট উচ্চতম যুদ্ধচালন কেন্দ্রের পরিকল্পনায় থাকা অসম্ভব নহে। অন্য দিকে জার্ম্মানীর রণনায়কগণ মিত্রপক্ষের দ্বিতীয় যুদ্ধপ্রান্ত যোজনার চেষ্টায় কোথায় কি হয় তাহা না দেখিয়া বোধ হয় নূতন অভিযান চালনায় অনিচ্ছুক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রুশের লোকবল ও অস্ত্রবল সঞ্চয়ের কার্য্যে বাধা না দিলেও অক্ষ-শক্তির সমূহ বিপদ। সুতরাং যেখানে সোভিয়েটের সৈন্য সমাবেশ হইলে জার্ম্মান সেনাদলের বিপদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেখানে যুদ্ধদান করিয়া দুই কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করাও অসম্ভব নহে। অতএব এখনও বলা যায় না যে রুশ রণাঙ্গনে ১৯৪৩ সালে গ্রীষ্ম ও শরৎকালীন অভিযান আরম্ভ হইয়াছে কিনা।

যুদ্ধের কারণ যাহাই হউক ইহার রূপ অতি ভয়ানক। যেটুকু সংবাদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহাতেই বুঝা যায় যে এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ডতম যুদ্ধ অতি বিরাট্ দাবানলের ন্যায় বিয়েলগোরোভ, ওরেল ও কুর্স্ক অঞ্চলে চলিতেছে। যে যুদ্ধ সেখানে চলিতেছে তাহার তুলনায় সিসিলির ব্যাপার খণ্ডযুদ্ধ মাত্র এবং সলোমন দ্বীপের ব্যাপার উল্লেখযোগ্যও নহে। জার্ম্মানীর বর্ম্মশকট ও এরোপ্লেন নাশের যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যদি সত্যের কাছাকাছিও যায় তবে ইহাতে সন্দেহমাত্র থাকিতে পারে না যে এই স্থানীয় যুদ্ধেই জার্ম্মানদল যে বর্ম্মশকট ও আকাশবাহিনী নিযুক্ত করিয়াছে তাহা পরিমাণে সমস্ত ফ্রান্স ও ফ্লাণ্ডার্স জয়ে যে শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহার পাঁচ গুণ এবং সমস্ত উত্তর-আফ্রিকায় অক্ষশক্তির বর্ম্ম ও বিমান বল যাহা ছিল তাহার অন্ততঃপক্ষে বারো গুণের অধিক!

সোভিয়েটের অগ্নিপরীক্ষা এখনও চলিতেছে, এবং এখনও একা সোভিয়েটই মিত্রশক্তির পক্ষে এই মহাযুদ্ধের শতকরা ৮০ ভাগ বহন করিতেছে। চার্চ্চিলের "শরৎ-কালীন পাতা ঝরার পূর্ব্বেকার বিষম সমরানল" কবে জ্বলিয়া উঠিবে জানা নাই—যদিও এখন মনে হয় তাহার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে—তবে যত দিন না তাহা ঠিকভাবে জ্বলে সোভিয়েটের অতুলনীয় গণসেনাকে এই ভাবেই আহুতি দিতে হইবে। রুশসেনার শৌর্য্য ও সহ্যশক্তি অসীম, কেবলমাত্র স্বাধীন চীনসেনা তাহার তুলনা দেখাইয়াছে, কিন্তু অস্ত্রবলের সীমা আছে এবং দৈহিক বল কেবল মাত্র বীরত্বের সাহায্যে জয়ী হইতে পারে না ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সত্য।

পূর্ব্ব-এসিয়ায় স্বাধীন চীনের অবরোধ এখনও চলিয়াছে। পূর্ব্বে যে "লিজলেণ্ড" ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অনুযায়ী মার্কিন দেশ হইতে মিত্রপক্ষের অন্যেরা যে অস্ত্র-রসদ ইত্যাদি পাইয়াছে তাহার শতকরা **দুই ভাগ** মাত্র চীনদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়, পৌঁছাইয়াছে বোধ হয় শতকরা এক ভাগ মাত্র! চীন-দেশের নিজস্ব অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের ব্যবস্থা অতি সামান্য, এত দিন তাহা সত্ত্বেও স্বাধীন চীন যে অদম্য তেজে যুদ্ধ চালাইয়াছে তাহা সম্ভব হইয়াছে জ্বলন্ত স্বাধীনতা-স্পৃহার বলে এবং অতি ভয়ানক রক্তক্ষয়ের ও বিত্তক্ষয়ের বিনিময়ে। কয়েক দিন পূর্ব্বে চীন-জাপান যুদ্ধের ছয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই ছয় বৎসরে স্বাধীন চীন যে আত্মোৎসর্গ, পুরুষকার ও অদম্য বীরত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে তাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে পাওয়া কঠিন।●

চীন ও রুশ এইরূপ আত্মবলিদানের দ্বারা মিত্রপক্ষের অন্য সকলকে আত্মরক্ষার ও বলগঠনে যে অবকাশ দিয়াছে তাহার ফলেই মিত্রপক্ষের জয়লাভের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই দুই শক্তির একটিও যদি ইতিপূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া বা বসিয়া পড়িত তাহা হইলে মিত্রপক্ষের জয়লাভের সম্ভাবনার লেশমাত্র থাকিত না। সুতরাং "লিজলেণ্ড" ব্যবস্থায় এই দুই দেশ যাহা পাইয়াছে তাহার শতগুণ দিলেও তাহা প্রকৃত পক্ষে "লিজ" (অর্থাৎ ভাড়া দেওয়া) বা "লেণ্ড" (অর্থাৎ ধার দেওয়া) হইবে না, কতক অংশে ঋণশোধমাত্র হইবে।

সুদূর পূর্ব্বে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধচালনা এখনও ব্যাপক ভাবে দেখা যায় নাই। যাহা চলিতেছে তাহাতে সংবাদ-পত্রে চটকদার লেখা ছাপা যায় সত্য—এবং ইহাও সত্য যে তাহাকে আক্রমণমূলক যুদ্ধ-ব্যবস্থা বলা চলে—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান ঐরূপ ক্ষীণ-ধারায় প্রবাহিত হয় তবে জাপান-মন্ত্রীর "শতাব্দী-ব্যাপী যুদ্ধ" চিন্তার ক্ষেত্র হইতে বাস্তবে আসিয়া পড়িতে পারে। মার্কিন দেশের সংবাদপত্রের দুই-এক খানা তিন-চারি মাসের পুরানো খণ্ড এদেশে আসিয়াছে, সে সকলে যুদ্ধফেরৎ মার্কিন সেনাদের মতামত কিছু আছে। তাহাতে বুঝা যায় যে এখনও সুদূর পূর্ব্বে "সংবাদপত্রে"র যুদ্ধই চলিতেছে, প্রকৃত যুদ্ধের আয়োজনের আরম্ভই এখনও হয় নাই।



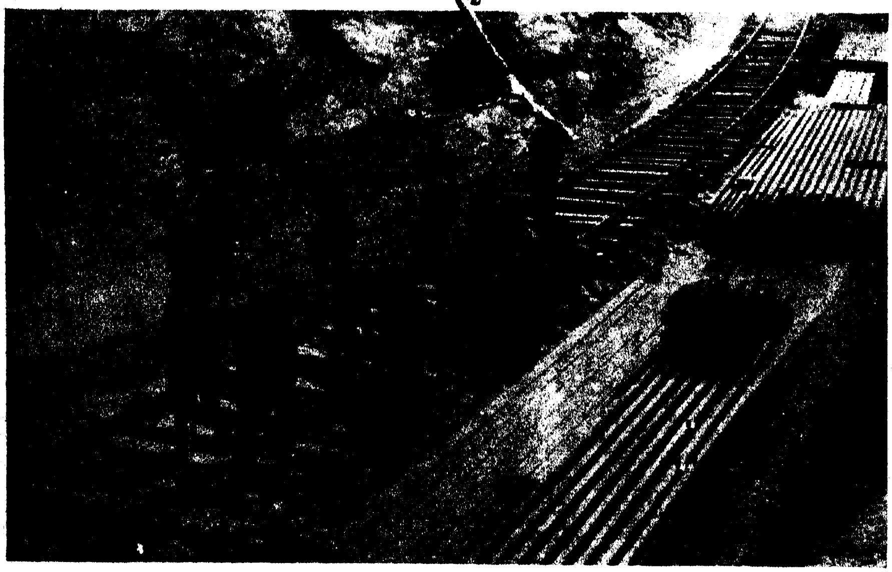
মিত্রপক্ষ কর্ত্তৃক টিউনিস অধিকারের অব্যবহিত পরেই গৃহীত বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত ডক অঞ্চলের আলোক-চিত্র



এলিউশিয়ান দ্বীপমালায় নূতন এ্যামখিটা ঘাঁটিতে মার্কিন বাহিনী বিমান-বিধ্বংসী কামান বসাইয়া জাপানী-বিমানের অপেক্ষা করিতেছে



কলেজ-লাইব্রেরীতে পরিণত চীনের একটি প্রাচীন মন্দির



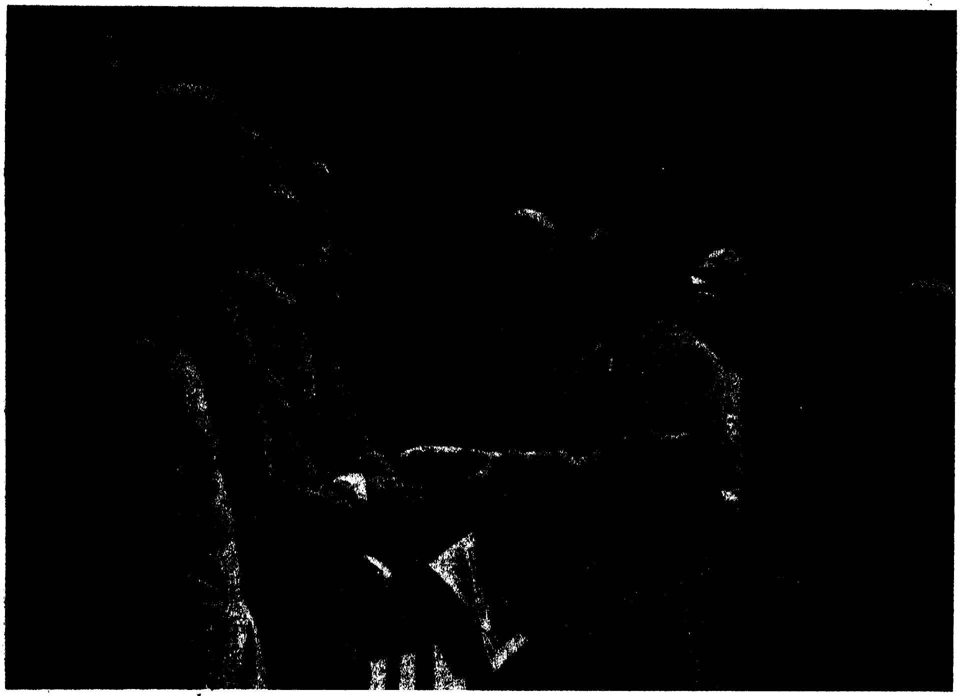
স্বাধীন চীনে অতি দ্রুত রেলপথ নির্ম্মাণ করা হইতেছে



চীন সেনারা অবসর সময়ে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিতেছে



ইয়াংসি নদীরক্ষণ



মাদাম সান ইয়াৎ-সেন চীন-সেনাদের পুরস্কার বিতরণ করিতেছেন



মাদাম চিয়াং কাই-শেক ও যুদ্ধে নিহত সেনাদের সন্তানসন্ততিগণ

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষের নূতন বড়লাট

ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেল ভারতবর্ষের নূতন বড়লাট নিযুক্ত হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে পূর্ব-এশিয়ায় যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। কথা উঠিয়াছে, ভারতবর্ষে মিলিটারী বড়লাট নিয়োগ এই প্রথম। আপত্তিটা কিন্তু অন্তঃসারবিহীন। লর্ড ওয়েলেসলি এবং লর্ড ডালহৌসিকে মিলিটারী বড়লাট না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। গত আগষ্ট মাসে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর সমস্ত দায়িত্ব স্বহস্তে লইয়া লর্ড লিনলিথগো মিলিটারীর সাহায্যে দমন নীতি চালাইয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে ভারতবর্ষের বড়লাটের নামের সঙ্গে সামরিক সম্মানসূচক শব্দ থাকুক বা না-থাকুক, সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে যে-কোন মুহূর্তে তাঁহারা পরিপূর্ণ মিলিটারী মূর্তি ধারণ করিতে সক্ষম। তবে আজীবন সৈনিক বড়লাটের পক্ষে নিরস্ত্র জনতার উপর আক্রমণের আদেশ দানে একটু সঙ্কোচ হইলেও হইতে পারে।

ওয়াভেলের নিয়োগে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে পরিবর্তনের আশা যাঁহারা করিয়াছিলেন, ভারত-সচিব তাঁহাদের সে ধারণা নিরসন করিয়া দিয়াছেন। যে রক্ষণশীল দল ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেলকে বড়লাট পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, ভারতীয় নীতি তাঁহারাই নির্ধারণ করিবেন, ওয়াভেল নহেন, ভারতবাসী এই সত্য উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়া লইয়াছে। ভারত-সচিব 'বহুদিন কাজ করিয়াছেন, এদেশের প্রতি তাঁহার অন্তরের টান আছে' প্রভৃতি শ্রুতি-সুখকর কথা বলিয়া নূতন বড়লাট ভারতবাসীর ভাল করিবার আশ্বাস দিয়াছেন। এ দেশবাসী কিন্তু বিভিন্ন বড়লাটের প্রতিশ্রুতি ও কার্য্যের পার্থক্য সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে, তাহাতে সৈনিক বড়লাটের উক্তিতে তাহাদের পক্ষে আস্থা স্থাপন করা কঠিন হইবে।

সম্প্রতি এক বক্তৃতায় লর্ড ওয়াভেল ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে অনুরাগ এবং শিল্পোন্নতির ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে লর্ড লিনলিথগো ভারতীয় গো-জাতির উৎকর্ষ বিধান করিয়া এ দেশের কৃষির উন্নতির জন্য আন্তরিক অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু মানবতার লাঞ্ছনা তাঁহার হাতে যতখানি হইয়াছে এতটা আর কেহ করিয়াছেন কি না সন্দেহ।

ভারতবর্ষের ভালমন্দের বিচার ভারতবাসীরাই করিতে পারে

মিঃ রেজিনাল্ড সোরেনসেন বিলাতের ইণ্ডিয়ান লীগ পার্লামেণ্টারী কমিটীর সেক্রেটারী। লণ্ডনের গত লেবার পার্টি সম্মেলনে তিনি ভারতবর্ষের নিকট নূতন আপোষ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে অথবা পূর্বের আপোষ-আলোচনা আবার আরম্ভ করিবার দাবী জানাইয়া লেবার পার্টির, নিজের নির্বাচন-কেন্দ্র এবং আরও তিনটি দলের পক্ষ হইতে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মিঃ সোরেনসেন বলেন :

> লেবার পার্টি ভারতীয়দিগের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং স্বায়ত্তশাসনের অধিকার সমর্থন করিয়াছে, ইহার অর্থ এই নয় যে, ভারতীয়গণ কিরূপ গবর্মেণ্ট পছন্দ করিবে, তাহা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টই স্থির করিয়া দিবেন। স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের যদি কোন অর্থ থাকে, তাহা হইলে ভারতে কিরূপ গবর্মেণ্ট স্থাপিত হইবে, তাহা রাজনৈতিক চেতনায় সমুদ্ধ ভারতই স্থির করিবে—তাহাতে যদি আমাদের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ছেদনও হয়, তাহা হইলেও। তবে আমি আশা করি, এরূপ হইবে না। আমি আশা করি ভারত স্বাধীনভাবে ব্রিটেনের সহিত এবং চীন ও অন্যান্য প্রাচ্য জাতিগুলির সহিত সহযোগিতা করিবে। কিন্তু ইহা তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আমরা হয়ত কখন কখন মনে করিতে পারি যে, ভারতীয়গণ ভুল পথ বাছিয়া লইয়াছে এবং অবিবেচকের মত কাজ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের ভাল-মন্দের বিচার তাহারাই করিতে পারে। অন্যান্য গণতন্ত্রী জাতিগুলি তাহাদের আইন-সভায় কিরূপ গণতন্ত্রের প্রবর্তন করিবে, তাহার নির্দেশ দিবার বিষয় যেমন আমরা কল্পনাও করিতে পারি না, সেইরূপ ভারতের আপন পথ বাছিয়া লইবার অধিকারও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।

মিঃ আর্থার গ্রীনউড এই প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রস্তাবের সমর্থকদিগকে উহা প্রত্যাহারে রাজি করান যে, লেবার পার্টির কার্য্যনির্বাহক সভায় অবিলম্বে ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত নীতি সম্বন্ধে নূতন আলোচনা আরম্ভ হইবে।

ভারতবর্ষ চিরদিন পরাধীন থাকিবে না, ভারতবাসীর স্বাধীনতার অধিকার এক দিন ব্রিটেনকে স্বীকার করিতেই হইবে—এ কথা শতবর্ষ পূর্বেও কোন কোন দূরদর্শী রাজনীতিবিদের মনে জাগিয়াছে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে অযোধ্যার তৎকালীন চীফ কমিশনার এবং ভারতবর্ষের অস্থায়ী বড়লাট স্যর্ এইচ এম লরেন্স লিখিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষকে চিরদিন পদানত রাখিব এ আশা আমরা করিতে পারি না। এখন হইতেই আমাদের সামরিক ও বে-সামরিক ব্যবহার

এমন হওয়া উচিত যে ভারতবর্ষের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অবসানের দিন যখন আসিবে তখন যুদ্ধ-বিগ্রহ যেন না ঘটে, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি লইয়াই যেন আমরা পৃথক্ হইতে পারি। তার পর হইতে ভারতবর্ষের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব যেন সুদৃঢ় হয়।"

ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির উপরে ব্রিটিশ বিবেক অন্তরের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে শুধু ব্রিটেনের ও ভারতের নয়, সমগ্র জগতের কল্যাণ হইত।

—

বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্বদেশী যুগের সহিত বর্তমান বাঙালীর যে অল্প কয়েকটি যোগসূত্র অবশিষ্ট ছিল, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে তাহারও একটি ছিন্ন হইল।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার পাঁচগাঁও তাঁহার পৈত্রিক বাসভূমি। তিনি আই-সি-এস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ইংলণ্ডে যান, কিন্তু ১৯০৫ সালে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসেন। তিনি যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন বাংলা দেশে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন অতিশয় তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলনে তিনি যোগদান করিলেন। কিছু দিন তিনি শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'নিউ ইণ্ডিয়া'র পরিচালনা করেন এবং পরে শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার যুক্ত-সম্পাদকরূপে কার্য্য করেন। তিনি বরিশালের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সম্মেলন ও সুরাট কংগ্রেসে যোগদান করেন। সুরাটে কৃষ্ণকুমার মিত্র ও বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে আপোষের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুরাটে উভয় দলের মধ্যে বিচ্ছেদের পর তিনি বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীঅরবিন্দ ও অপরাপর কয়েক জন সহ কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ফৌজদারী মামলা পরিচালনায় তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং রাজনৈতিক মামলাগুলি নামমাত্র পারিশ্রমিক লইয়া অথবা কোনরূপ পারিশ্রমিক না লইয়া পরিচালনা করেন। তিনি প্রসিদ্ধ দিল্লী, বারাণসী ও বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার আসামী পক্ষ সমর্থন করেন।

—

ভারতের মুসলমান বিশ্বমানবের বিদ্রূপ সহিতে চাহে না

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য সামসুলউলেমা কমলউদ্দীন আহমদ এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

মিঃ জিন্না তাঁহার পাকিস্থানের কোন সংজ্ঞা এ পর্য্যন্ত দেন নাই, কখনও দিবেন বলিয়াও তো মনে হয় না, কেন-না তিনি জানেন যে এই চেষ্টা করিতে গেলেই পাকিস্থান যে তুচ্ছ পরিকল্পনা তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। দুনিয়ার হাসি ও বিদ্রূপের বস্তু হইয়া ভারতের মুসলমান আমরা আর থাকিতে চাহি না। বন্ধ্যা নেতৃত্বের দরুনই আমরা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান করিতে পারিতেছি না। কল্পনার দিক হইতে ভ্রান্তপথচালিত এই নেতৃত্ব ভাবীকালের সকলের—বিশেষ করিয়া মুস্লিমদের জন্য বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করিতেছে, মুস্লিমরা আজ যে কি ভাবে বিপদের সম্মুখীন হইয়া আছে, তাহা বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

ভারতীয় মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক চেতনা কত দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, উপরোক্ত মন্তব্য তাহারই পরিচয়। এই প্রসঙ্গে পঞ্জাবের বিশিষ্ট মুসলিম নেতা আবদুল মজিদ খাঁর মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য :

আমি এক এবং অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী। ভারতভূমি আমার মাতৃভূমি। জাতীয় স্বার্থের বিরোধী যুক্তিবিহীন অনিষ্টকারী লোকেরা এই মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদের যে প্রয়াস পাইতেছে, আমি সেই অপচেষ্টা হইতে মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিব। এই আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনাশ করার জন্য আমাদিগকে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে, কেন-না ভারতভূমির অঙ্গচ্ছেদ পৃথিবীর পক্ষে মহা অনিষ্টকর হইবে।

—

উৎকোচ-গ্রহণ প্রবৃত্তি

দৈনিক 'যুগান্তর' ১৪ই আষাঢ়ের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

অফিস, আদালত, থানা সর্ব্বত্র ঘুষ দিয়া কার্য্য উদ্ধার এদেশের সনাতন প্রথা। সঙ্কটের দিনে মুনাফার লোভ যেমন বাড়িয়াছে, উৎকোচ দাতা ও গৃহীতার সংখ্যাও তেমনি বাড়িয়াছে। কথাটা সকলেই জানেন, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলার উপায় নাই। সরকারী বিবিধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় উৎকোচের প্রসার এত অধিক হইয়াছে যে, কোন ব্যবস্থাই কার্য্যকরী হয় নাই। ছোটরাই ঘুষ লয়, বড়সাহেবরা নির্লোভ নিষ্কাম পুরুষ এমন কথা আজ বলিলে সত্য কথা বলা হইবে না। অথচ পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীরা এই ব্যাপারটার বিরুদ্ধে কোন বাঙনিষ্পত্তি করেন না। সরকারী দপ্তরখানা হইতে গোপন মজুতদার ও মুনাফালোভীদের সায়েস্তা করিবার হুমকি দেখাইয়া বহু ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু ঘরের ঢেঁকি কুমীর হইয়া দাঁত মারিতেছে, ইহা প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রকাশ্যে কোন ভয় দেখান হয় নাই। যে দুই-চারিটি মামলা হইয়াছে তাহাতে উৎকোচগ্রাহীদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ ঘটে নাই। কলিকাতায় সম্প্রতি যে 'বাস' ধর্ম্মঘট হইয়া গেল, তাহাতেও ধর্ম্মঘটীদের অন্যান্য আপত্তির সহিত এই আপত্তিটাও পুলিস কমিশনারের গোচরে আনা হইয়াছিল যে, ট্রাফিক পুলিস জবরদস্তি করিয়া ঘুষ আদায় করিয়া থাকে। শিয়ালদহ ষ্টেশনে রিক্সওয়ালাদের পুলিসকে নিয়মিত প্রণামী দিতে হয় কয়েক মাস পূর্ব্বে একথা আমরাও কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিয়াছিলাম। ঘুষ লওয়ার বিরুদ্ধে বেসরকারী তরফ হইতে মামলা-মোকদ্দমা করিতে গেলে ন্যায় বিচার অপেক্ষা লাঞ্ছনাই বাড়ে—জনসাধারণের ইহাই অভিজ্ঞতা।

এই সর্ব্বব্যাপী উৎকোচের অবাধ ছড়াছড়ি দেখিয়া আসামের জনরক্ষামন্ত্রী মৌলবীবাজারে এক জনসভায় সখেদে বলিয়াছেন, "যাহাতে নৌকায় চাউল রপ্তানী না হয় সেজন্য স্থানে স্থানে পুলিস মোতায়েন করা হইল।

ফলে দেখা গেল, পুলিস ঘুষ লইয়া ধান্ত-বোঝাই নৌকা ছাড়িয়া দিতেছে। পুলিসের বড়কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের চৌকিদার পর্য্যন্ত ঘুষ লওয়ার দাঁও মারিতেছে। পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসিলে ভলান্টিয়ার (সিভিক গার্ড ?) নিযুক্ত করা হইল। পুলিস যেখানে ৫৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা ঘুষ লইত, সেখানে ভলান্টিয়াররা ২৲ টাকা লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দেয়। অবশেষে অফিসের কেরাণীসহ সাবডেপুটি নিয়োগ করা হইল। কেরাণীরাও লোভ সামলাইতে পারিলেন না। একা সাবডেপুটি আর কি করিবেন ? ঘুষ এমন জিনিষ যে, পুলিস, কেরাণী, চৌকিদারও নয়। এর লোভ সামলান শক্ত। এমন কি ৫০০৲ টাকার লোভ আমিও হয়ত সামলাইতে না পারি।"

মন্ত্রী মহাশয় লোভ সামলাইবার পক্ষে কঠিন যে অঙ্কের কথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহারও কম অঙ্কে বাংলার কেহ কেহ কাজ হাঁসিল করিয়াছে, অতীতের কোন কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুলোকে এমন কুকথা বলিয়াছে। আসামের পুলিস ও কেরাণী অপেক্ষা বাংলার কেরাণী, পুলিস, এমন কি পদস্থ কর্ম্মচারীরা যে অধিক সৎ এবং সাধু নয়, ইহা আমরা জানি। কিন্তু আসামের জনরক্ষা-মন্ত্রী যেমন অকপটে এই দুর্নীতির ব্যাপকতা স্বীকার করিয়াছেন, বাংলার স্থায়ী শাসকমণ্ডলী তাহা করেন নাই এবং নিবারণ করিবার কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টাও হয় নাই। কণ্ট্রোলের চাউলের দোকানের লাইসেন্স প্রদান এবং খবরদারীর ব্যাপারে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দুই-একজন দুর্নীতির অপরাধে অভিযুক্ত হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। আইন যত কড়া হইবে, ব্যবস্থা যত জটিল হইবে, উৎকোচও সেই পরিমাণে ব্যাপক হইবে, ইহা ওয়াকেফহাল ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। যে স্বদেশপ্রীতি, সামাজিক কর্ত্তব্যবোধ থাকিলে উৎকোচগ্রহণরূপ ঘৃণিত প্রথা দূর হইতে পারে, সরকারী কর্ম্মচারীদের অধিকাংশেরই তাহা নাই। দেশাত্মবোধ সরকারী কর্ম্মচারীর পক্ষে শোভনীয় নহে, এই শিক্ষাই তাঁহারা পাইয়াছে। জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা অথবা জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন অপেক্ষা পীড়ন দমনই যেখানে সরকারী কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং রাজনৈতিক কারণে যে-দেশে পুলিসের জনসাধারণের উপর প্রভুত্ব করিবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে উৎকোচের প্রসার অনিবার্য্য। খাদ্য লইয়া যাহারা ব্যবসা চালাইতেছে তাহারা মুনাফা ফাঁপাইবার জন্য উৎকোচ বাবদ যাহা ব্যয় করিতেছে, তাহার সমস্তটাই বহন করিতে হয় দরিদ্র অসহায় ক্রেতাদিগকে।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের বিবিধ প্রসঙ্গে আমরাও লিখিয়াছিলাম :

ফাঁপতি টাকার জোরে যে-সব বড়লোক লক্ষপতি কোটিপতি হইয়াছে তাহাদের তস্কর-মনোবৃত্তি এবং ঐ সঙ্গে একদল সরকারী কর্ম্মচারীর অকর্ম্মণ্যতা ও উৎকোচ-গ্রহণ প্রবৃত্তি এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির সর্বপ্রধান কারণ। অন্য দেশ হইলে এই চৌর্য্য ও তস্করবৃত্তি অবাধে চলিতে পারিত না; জনসাধারণ ইহার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ করিত; প্রয়োজন হইলে চুরি বন্ধ করিবার জন্য সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিত। তস্কর-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণের অজ্ঞতা দেশের সর্বপ্রধান শত্রু। তদপেক্ষাও বড় শত্রু গবর্ন্মেণ্টের কতকগুলি ঘুষখোর এবং অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারী যাহারা বাঙালীর মুখের গ্রাস লইয়া অবাধে চুরি ও ডাকাতি চলিতে দিয়াছে।

ইহার পর সত্য সত্যই সিভিল সাপ্লাই বিভাগের কোন কোন পদস্থ কর্ম্মচারীর গৃহে খানাতল্লাসী হইয়াছে, অপরাধ-পরিচায়ক কাগজপত্র ধরা পড়িয়াছে বলিয়াও প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু ফল কি হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই।

—

দীনেন্দ্রকুমার রায়

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ডিটেকটিভ উপন্যাসের লেখক রূপেই তাঁহার খ্যাতি ছিল বেশী, কিন্তু বাংলা দেশের পল্লীচিত্র রচনাতে তাঁহার সাফল্য সামান্য নহে। পল্লীচিত্র, পল্লীচরিত্র ও পল্লীবৈচিত্র্য নামে তাঁহার রচিত পুস্তকত্রয় বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ হইয়া থাকিবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই রচনাগুলির আন্তরিক প্রশংসা করিয়াছিলেন।

'ভারতবর্ষে' এবং 'মাসিক বসুমতী'তে দীনেন্দ্রকুমারের বহু উৎকৃষ্ট রচনা বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। শেষজীবনে মাসিক বসুমতীতে তিনি তাঁহার আত্মজীবন-স্মৃতি লেখা আরম্ভ করিয়াছিলেন। উহা শেষ করিতে পারিলে তৎকালীন বঙ্গসমাজের ও সাহিত্যের অনেক অপরিজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইত।

—

খাদ্যাভাবের জন্য দায়ী কে ?

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষের খাদ্যাভাব সম্পর্কে মিঃ আমেরী বলেন, মোটের উপর ভারতবর্ষে খাদ্যাভাব ঘটে নাই। তা ছাড়া এই বৎসর ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে গম উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বণ্টন-ব্যবস্থায় বিরাট গলদ রহিয়াছে। ইহার জন্য কৃষক হইতে উপরস্থ সকল শ্রেণীই দায়ী। ভারত-সরকারের খাদ্যদপ্তর হইতে প্রথমে যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ আশানুরূপ হয় নাই। এই জন্য ভারত-সরকার বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত আলোচনা করিতেছেন। ঐ আলোচনার ফলাফল না-জানা পর্যন্ত খাদ্য সম্পর্কে কোন বিবৃতি দেওয়া সঙ্গত হইবে না।

বাংলার নূতন খাদ্যসচিবের ভ্রান্ত উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াই ভারত-সচিব খাদ্যাভাবের দায়িত্ব "কৃষক হইতে উপরিস্থ সকল শ্রেণীর" ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য গবর্ন্মেণ্ট যতটা চেষ্টা করিতে পারিতেন তাহা করা হইয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে তিনি কিছুই না জানাইয়া শুধু বলিয়াছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা "সম্পূর্ণ আশানুরূপ" হয় নাই। অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম এবং দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে চাউল আমদানী করিবার কোন চেষ্টা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট বা ভারত-সরকার করিয়াছেন কিনা সে

সম্বন্ধেও ভারত-সচিব নীরব। আটলান্টিক মহাসাগরে জাহাজ ডুবি প্রায় বন্ধ হইয়াছে বলিয়াই ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট সংবাদ প্রকাশ করিতেছেন, তথাপি এখনও অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে খাদ্য আনিবার জন্য জাহাজ পাওয়া যায় না কেন? বাংলায় খাদ্যের অবস্থা যে প্রকৃতই অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে তাহা আর গোপন না রাখিয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে অবিলম্বে জানাইয়া দেওয়া বর্তমান বাংলা-সরকারের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। ভারতবর্ষে জাহাজ-নির্ম্মাণের পথে যাঁহারা দুরতিক্রম্য বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, গম ও চাউল আমদানীর জন্য জাহাজ পাঠাইবার দায়িত্ব তাঁহাদেরই।

—

জেলে রাজবন্দীদের অবস্থা

দৈনিক 'ভারত' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি কারামুক্ত হইয়াছেন। 'যুগান্তরে' নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখিয়া তিনি রাজবন্দীদের যে-সব অভাব-অভিযোগের কথা দেশবাসীকে জানাইয়াছেন তৎপ্রতি বাংলা-সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। এই সব অভিযোগ দূর করিতে অতি সামান্য অর্থ প্রয়োজন এবং উহা মঞ্জুর করিতে দেশবাসী কুণ্ঠিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। দল রক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিতে যেখানে অসুবিধা হয় নাই, রাজবন্দীদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সেখানে সামান্য অর্থ মঞ্জুর করিতে আপত্তি উঠিবে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। রাজবন্দীদের পরিবারবর্গের জন্য উপযুক্ত ভাতা এবং তাঁহাদের কারা-জীবন একটুখানি সহনীয় করিবার ব্যবস্থার জন্য টাকা বরাদ্দ করিয়া ব্যবস্থা-পরিষদে একটি অতিরিক্ত বাজেট উত্থাপিত করিলে বন্দীদের প্রতি সর্ নাজিমুদ্দীনের আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠিখানি এই :—

রাজবন্দীদের মধ্যে অনেকেই পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি এবং তাঁহারা আটক থাকায় তাঁহাদের পরিবারবর্গের অন্নসংস্থান হওয়া কঠিন হইয়া পড়িতেছে। বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও অনেকেরই এখন পর্য্যন্ত কোনও পারিবারিক ভাতার সংস্থান হয় নাই। বহুক্ষেত্রে "আবেদন বিবেচনাধীন আছে" এইরূপ সংবাদ তিন-চার মাস পূর্বে দিয়াই সরকার-পক্ষ নীরব আছেন।

রাজবন্দীগণকে পূর্বে ব্যক্তিগত ভাতা দেওয়া হইত। নিরাপত্তা-বন্দীদের সম্পর্কে সে ব্যবস্থা না থাকাতে রাজবন্দীগণ পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া চিন্তার খোরাক ও অবসর-বিনোদনের ব্যবস্থা করিতে পারেন না। জেল লাইব্রেরিতে যে-শ্রেণীর পুস্তকাদি থাকে তাহা সুশিক্ষিত মার্জিত রুচি-সম্পন্ন রাজবন্দীদের চিন্তার খোরাকের উপযুক্ত নহে। সেজন্য রাজবন্দী-গণের মানসিক উৎকর্ষের ব্যাঘাত ঘটিতেছে। ব্যক্তিগত ভাতার ব্যবস্থা অন্যথায় জেল লাইব্রেরির জন্য ইঁহাদের উপযোগী পুস্তকাদি ক্রয়ের বিশেষ বরাদ্দ একান্ত প্রয়োজন। জেলে ব্যায়ামচর্চ্চা ও ক্রীড়ার জন্য উপযুক্ত স্থানের অভাবে আটক-বন্দীদের দিন দিন দৈহিক অবনতি ঘটিতেছে। বন্দী ছাত্রদের পড়িবার পুস্তকাদি ক্রয় ও পরীক্ষার ফি দিবার ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্রদের অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। জেলে আহারের বরাদ্দ দৈনিক দেড় টাকা করাতে সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় আটকবন্দীগণ সমান সুবিধালাভ করেন না, এই বরাদ্দ মূলতঃ কাগজপত্রেই পর্য্যবসিত, কেন না বন্দীগণ চাউল, আটা, চিনি প্রভৃতি কোন দ্রব্যই কণ্ট্রোল মূল্যে পান না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বন্দীগণের নিকট চিনির মূল্য মণ-প্রতি ২১৷৹ লওয়া হয়। সরকার-নিয়ন্ত্রিত জেলে কণ্ট্রোল মূল্যে মাল সরবরাহ না করিয়া অধিক মূল্য লওয়া কি অসঙ্গত কার্য্য নহে? মুক্তি দিবার সময় পরিধেয় বস্ত্র ভিন্ন অন্য সকল সরবরাহকৃত বস্ত্রাদি ফেরৎ লওয়া হয়। এই সমস্ত ব্যবহৃত দ্রব্য ফিরাইয়া লওয়াতে সরকারের কোনও লাভ হয় না, সেগুলি নামমাত্র মূল্যে নীলাম হয়; কিন্তু এগুলি পাইলে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের অনেকের যথেষ্ট উপকার হয়। বহু দিন উপার্জন হইতে বঞ্চিত থাকার পর মুক্ত বন্দীগণকে এরূপ এক বস্ত্রে বাহির করিয়া দিলে, এই দুর্মূল্যতার দিনে প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি ক্রয় করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। নূতন রোজগারের অবকাশ হইবার পূর্বে জেলে যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয় সেগুলি সঙ্গে লইয়া আসিতে দিলে মুক্ত বন্দীগণ বহু অকারণ দুর্ভোগের হাত হইতে রেহাই পাইতে পারেন।

শক্তি প্রেস ও ভারত পত্রিকার প্রায় সকল রাজবন্দীই মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এমন কি শক্তি প্রেসের দায়িত্বশীল কর্ম্মিগণ ও ভারত পত্রিকার সম্পাদক পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ করিয়াছেন, কিন্তু শক্তি প্রেসের দুই জন সাধারণ কম্পোজিটার ও ভারত পত্রিকার একজন সহকারী সম্পাদক ও একজন প্রুফ-রীডার মুক্তিলাভ করেন নাই। দায়িত্বপূর্ণ পদাধিকারিগণ যখন মুক্তিলাভ করিলেন তখন অন্নসংস্থানের চেষ্টায় যে সকল কর্মচারী এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন তাহাদের মুক্তি না দিবার হেতু কি?

আনন্দবাজার পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে মুক্তি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেনকেও মুক্তিদান করিলে বাংলা-সরকারের বন্দীমুক্তি নীতির কতকটা সামঞ্জস্যেরও পরিচয় পাওয়া যাইত। ভারত পত্রিকা ও শক্তি প্রেসের সামান্য কর্ম্মচারীদের আটকাইয়া রাখিবার স্বপক্ষে কি যুক্তি থাকিতে পারে তাহা অনুমান করাও কঠিন।

—

নিদারুণ অভাব চুরি-ডাকাতি বৃদ্ধির কারণ

বাংলা দেশের সর্বত্র চুরি-ডাকাতি ও লুণ্ঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী খাজা সর্ নাজিমুদ্দীন স্বীকার করিয়াছেন যে, চুরি-ডাকাতির সংখ্যা প্রত্যহই বাড়িয়া চলিয়াছে এবং গবর্মেণ্ট তাহা দমন করিতে পারিতেছেন না। এই সব চুরি-ডাকাতির মধ্যে অধিকাংশই ধান চাউল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন। সর্ নাজিমুদ্দীন বলিয়াছেন—"বর্তমান

অর্থনৈতিক অবস্থাই ইহার কারণ। এক দিকে নিদারুণ অভাব এবং অপর দিকে গ্রাম ও পল্লী অঞ্চলে অর্থের সচ্ছলতা, ইহা বড়ই বিচিত্র। দুষ্টমনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকের দৃষ্টি ইহাতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। তাছাড়া পুলিস অন্যান্য ব্যাপারে এত ব্যস্ত থাকে যে, পূর্বের মত তাহারা আর পাহারা দিতে পারে না। আমরা আরও সশস্ত্র পুলিস প্রহরী পাইব। প্রকৃতপক্ষে জুন মাসের শেষ সপ্তাহে আমরা অনেক সশস্ত্র পুলিস প্রহরী পাইয়াছি এবং আমরা আশা করি যে, পূর্বের চেয়ে কার্য্যকরী ব্যবস্থা করিতে পারিব।"

আর একটি অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে সর্ নাজিমুদ্দীন বলেন যে ক্ষুধার জ্বালায় যে তাহারা লুঠপাট করিতেছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

কলিকাতার পুলিস কমিশনারও সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে কলিকাতা সহরেও চুরি-ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তিনিও স্বীকার করিয়াছেন যে বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থাই ইহার কারণ।

সর্ নাজিমুদ্দীন সশস্ত্র পুলিস আমদানী করিয়া শান্তি রক্ষার আশ্বাস দিয়াছেন; কিন্তু দেশব্যাপী ক্রমবর্ধমান এই চুরি-ডাকাতি বন্ধ করা পুলিসের সাধ্যায়ত্ত নহে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। যে অপরাধের কারণ অর্থনৈতিক, তাহা নিবারণ করিবার জন্য বন্দুক না দেখাইয়া অর্থনৈতিক উপায় অবলম্বন করিলেই সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হইত।

—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বজেট আলোচনা বন্ধ

মৌলবী ফজলুল হকের পরিত্যাগ-পত্র আদায় করিতে গিয়া অতি ব্যস্ততার ফলে গত মার্চ মাসে বজেট পাস সম্পর্কে যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল, জুলাই মাসেও তাহা দূর হয় নাই, বরং অধিকতর জটিলতারই সৃষ্টি হইয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে বজেট আলোচনা আরম্ভ হইলে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উহার বৈধতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলেন যে বজেটের অবশিষ্ট ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করার প্রস্তাব অবৈধ, কারণ ভারত-শাসন আইন অথবা পরিষদের নিয়মাবলীর কোন ধারার মধ্যে ইহা আনয়ন করা যায় না। ১৯৪৩-৪৪ সালের ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করার প্রস্তাব গত ফেব্রুয়ারী মাসে পরিষদে তদানীন্তন অর্থসচিব আনয়ন করেন। সমস্ত দফার ভোট গ্রহণ শেষ হইবার পূর্বেই পরিষদ ২৯শে মার্চ স্থগিত রাখা হয়। গবর্ণর গেজেটে ঘোষণা করিয়া ৩১শে মার্চ দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং সেই দিনই বিশেষ ক্ষমতাবলে তিনি ১৯৪৩-৪৪ সালের সমগ্র বজেট আইন-সম্মত বলিয়া ঘোষণা করেন। সুতরাং গবর্ণরের বজেট ১লা এপ্রিল আরম্ভ হয় এবং তাহার এক পক্ষ কাল পূর্বে পরিষদ বজেটের যে সমস্ত দফা গ্রহণ করিয়াছিল তাহাও গবর্ণরের বজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তার পর ২৪শে এপ্রিল গবর্ণর তাঁহার ৩১শে মার্চের ঘোষণা প্রত্যাহার করেন এবং পুনরায় নিয়মতান্ত্রিক গবর্ন্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই দিনই গবর্ণর অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন। এখন গবর্ন্মেণ্ট ১লা এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত গবর্ণর যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহাও সমগ্র বজেটের অন্তর্ভুক্ত করিয়া অবশিষ্ট ব্যয়-বরাদ্দের অনির্দিষ্ট অঙ্ক পরিষদ কর্তৃক মঞ্জুর করাইয়া লইতে চান। ইহা আইনসম্মত নহে এবং তাঁহাদের যখন ভারত-শাসন আইনের ৭৮ হইতে ৮০ ধারা অনুযায়ী চলিতে হইবে, তখন ১৯৪৩-৪৪ সালের সমগ্র বজেট সংশোধিত আকারে পুনরায় পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করা উচিত। ৯৩ ধারার বলে গবর্ণর যদি কতকগুলি ব্যয় মঞ্জুর করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পরিষদের তাহার উপর আলোচনা করার বা ভোট দেওয়ার অধিকার থাকিবে না—আইনে এমন কিছু নাই। ৯৩ ধারা বলবৎ থাকা কালীন ব্যয় যদি বাদ দেওয়াও হয়, তাহা হইলেও আইনতঃ ১৯৪৩ ৪৪ সালের সমগ্র বজেট পরিষদে নূতন করিয়া উপস্থাপিত করিতে হইবে। তা ছাড়া মোট ব্যয়-বরাদ্দের অঙ্ক যখন দেখান হয় নাই—তখন ইহা অবৈধ।

প্রধান মন্ত্রী সর্ নাজিমুদ্দীন এই বৈধতার প্রশ্নের কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে না পারিয়া বলেন যে সমগ্র বজেট পুনরায় পরিষদে উপস্থিত করিতে হইলে তিন চারি মাস সময় লাগিবে এবং এই সময় গবর্ন্মেণ্টকে অননুমোদিত খরচ করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহার মতে যেটা কম অনিষ্টকর তাহাই করা উচিত। অর্থসচিব শ্রীযুক্ত তুলসী-চন্দ্র গোস্বামীও ইহার কোন জবাব দিতে পারেন নাই।

পরদিন স্পীকার সৈয়দ নৌশের আলি এ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া বলেন, "আইনে দেখা যায় যে, প্রতি বৎসরের বজেট সমগ্রভাবে পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে; তাহার উপর আলোচনা হইবে, ভোট গ্রহণ হইবে এবং গবর্ণর তাহা অনুমোদন করিবেন। আইনে ইহাও আছে যে, পরিষদের এক অধিবেশনেই বজেট সম্বন্ধে যাহা কিছু করণীয়, শেষ করিতে হইবে। বিরোধী দল বলিতেছেন যে পরিষদের একাধিক

অধিবেশনে খণ্ড খণ্ড ভাবে বজেট আলোচনা আইনতঃ চলিতে পারে না এবং পরিষদ এক বার স্থগিত করা হইলে একমাত্র অসমাপ্ত বিল ছাড়া অন্য কিছু পরবর্তী অধিবেশনের জন্য ফেলিয়া রাখা যায় না। তাহা আইনতঃ বাতিল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ভারত-শাসন আইনের ৭৩ ধারায় এমন কিছু নাই যাহাতে বজেটের অসমাপ্ত আলোচনা পরিষদের পরবর্তী নূতন অধিবেশনেও চলিতে পারে।

খণ্ড খণ্ড ভাবে বজেটের আলোচনা পরিষদের একাধিক অধিবেশনে চলিতে পারে, এ কথা যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলেও আর একটা অসুবিধা দেখা যায়। ৩১শে মার্চ গবর্ণর ৯৩ ধারার বলে দেশের শাসনতন্ত্র স্থগিত করিলেন এবং সেই দিনই সমগ্র বজেটকে সিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সেই বজেটের খানিকটা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। গবর্ন্মেণ্ট বলিতেছেন যে, গবর্ণর সমগ্র বজেট সিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা এবং পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করিলেও ২৪শে এপ্রিল গবর্ণর পূর্বের ঘোষণা প্রত্যাহার করার ফলে পরিষদ ২৯শে মার্চ যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই ফিরিয়া আসিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে গবর্ন্মেণ্ট বলিতেছেন যে, ১লা এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত গবর্ণর যে সমস্ত খরচ করিয়াছেন পরিষদ তাহার আলোচনা করিতে পারিবে না। ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। যদি খণ্ড খণ্ড ভাবে বজেটের আলোচনা আইনসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় (যদিও আমার বিশেষ সন্দেহ আছে) তাহা হইলেও গবর্ন্মেণ্টকে ১লা এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এই সময়ের জন্য নূতন বজেট উপস্থাপিত করিতে হইবে অথবা সেই সময়ে গবর্ণর যাহা খরচ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া অসমাপ্ত সমগ্র বজেট পরিষদে উপস্থাপিত করিতে হইবে। গবর্ন্মেণ্ট কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন তাহা গবর্ন্মেণ্টই জানেন; কিন্তু এই অবস্থা হইতে গবর্ন্মেণ্টের অব্যাহতির কোন উপায় নাই।

ভারতের অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশে মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে ৯৩ ধারা যত দিন বলবৎ থাকিবে গবর্ণর সেই সময়ের মধ্যে যাহা কিছু খরচ করিবেন তাহা পরিষদে আলোচিত হইবে না বা তাহার উপর ভোটাভুটি চলিবে না। তদনুসারে আসাম ও উড়িষ্যার বজেটের আলোচনায় শাসনতন্ত্র রহিত করা হইতে প্রত্যাহৃত হওয়া পর্য্যন্ত সময়ের খরচ সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় নাই। কিন্তু এখানে সেই রকম কোন নিয়ম নাই। তাহার উপর ১লা এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মোট কত খরচ হইয়াছে তাহার কোন মোটামুটি হিসাব গবর্ন্মেণ্ট দেন নাই। গবর্ন্মেণ্ট বলেন তাহা সম্ভব নহে। আমিও স্বীকার করি যে, ঠিক হিসাব দেওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু মোটামুটি একটা হিসাব দেওয়া যায়। আসাম ও উড়িষ্যায় এই হিসাব দেওয়া হইয়াছিল।

সুতরাং স্পীকারের মতে বজেটের ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরের যে প্রস্তাব পরিষদের সম্মুখে আছে (যাহার মধ্যে ১লা হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত খরচের কোন হিসাবই নাই) তাহা অবৈধ।"

নকল পার্লামেণ্টারি শাসনতন্ত্রেরও যে এত জ্বালা পূর্বে তাহা কে জানিত? বজেট পাস না করাইয়া গবর্ন্মেণ্ট কেমন করিয়া জনসাধারণের টাকা খরচ করে, কোন আসল গণতান্ত্রিক দেশ ইহা কল্পনা করিতেও পারে কিনা সন্দেহ।

—

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচ

দেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচ করিয়া গবর্ন্মেণ্ট যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত হিন্দী সংবাদপত্রসেবী সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে "বীর অর্জুন"-এর সম্পাদক পণ্ডিত ইন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি তাহার সমালোচনা করেন। পণ্ডিতজী এইরূপ অভিযোগ করেন যে, ভারতে সংবাদপত্রের প্রতি গবর্ন্মেণ্টের সহানুভূতিহীন মনোভাবের দরুন সংবাদপত্রসমূহকে সর্বদাই এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতে হয়। তিনি হিন্দী সংবাদপত্রের একটি অবস্থার বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এই সম্পর্কে হিন্দী সংবাদপত্রসমূহকে সর্বাপেক্ষা অধিক দুর্দশা ভোগ করিতে হইয়াছে।

শুধু হিন্দী নহে, বাংলা ও ইংরেজী কোন কোন সংবাদপত্রকেও অভূতপূর্ব লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। লক্ষ্ণৌয়ের 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' এবং কলিকাতার 'ভারত' পত্রিকার কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে।

—

বাংলায় কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ভাতা বৃদ্ধি

ভারত-সরকারের অধীনস্থ বাংলার কর্মচারিগণকে সস্তায় খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করা ছাড়াও বর্দ্ধিত হারে ভাতা দেওয়া হইবে বলিয়া ভারত-গবর্ন্মেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র, তবে এখন

হইতেই এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বাংলায় অস্বাভাবিক অবস্থা হওয়াইতেই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে আবার বিবেচনা করা হইবে।

বাংলা-সরকার স্বয়ং এ সম্বন্ধে কি করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিলে ভাল হইত।

—

আয়কর-বৃদ্ধির প্রস্তাব

মাসিক এক শত টাকা আয়ের উপর আয়কর ধার্য্য করিবার প্রস্তাব ভারত-সরকারের বিবেচনাধীন আছে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ। মধ্যবিত্ত পরিবারবর্গের মধ্যে এই প্রস্তাব ভীতির সঞ্চার করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। ভারতবর্ষে আয়কর আদায়ের বর্তমান ব্যবস্থায় অবিবাহিত ব্যক্তি যে হারে কর দেয়, যে উপার্জনশীল ব্যক্তির উপর দশ বারোটি পোষ্য আছে তাহাকেও সেই হারেই আয়কর দিতে হয়। আয়করের নিম্নতম সীমা ক্রমাগত নামাইয়া মাসিক প্রায় ১৩০৲ টাকায় আনা হইয়াছে। উহা আরও নামাইয়া একশত টাকা আয়ের উপর কর আদায় আরম্ভ হইলে মধ্যবিত্ত বহু পরিবারের দুর্দশার পরিসীমা থাকিবে না। বাংলা দেশে বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য মোটামুটি নিম্নলিখিত হারে বাড়িয়াছে :

	টাকা		টাকা	বৃদ্ধি
চাউল	৫৲	হইতে	৩৫৲	৭ গুণ
বস্ত্র	২৲	„	১০৲	৫ „
কয়লা	।৶০	„	১॥০	৪ „
সরিষার তৈল	॥০	„	১।০	২½ „
মাছ	॥০	„	১॥০	৩ „
চিনি	।০	„	১৲	৪ „
সাগু	॥০	„	৪৲	৮ „

অতি দরিদ্র ব্যক্তি এবং শ্রমজীবিগণ নানা উপায়ে কণ্ট্রোলের সুবিধা তবু কতকটা পাইতেছে, মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থের অধিকাংশের পক্ষেই উহার সুবিধা কম। রেলওয়ে, পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতি কোন কোন অফিসে কেরাণীদের জন্য সস্তায় খাদ্যদ্রব্য দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নহে এবং ইহাদেরও অনেকে শুধু নিজের জন্য রসদ পায়, পরিবারের জন্য নহে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে হারে ভাতা দেওয়া হইয়াছে তাহাও অপর্য্যাপ্ত। জীবন-যাত্রার ব্যয় যেখানে অন্ততঃ চারগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে সেক্ষেত্রে আয়করের নিম্ন সীমা উপরে তুলিয়া না দিয়া আরও কম বেতনের লোকের নিকট হইতে টাকা আদায়ের কল্পনা বোধ হয় একমাত্র পরাধীন দেশেই সম্ভব।

অষ্ট্রেলিয়ার সহিত ভারতীয় আয়করের তুলনা করিলে দেখা যায় গত বৎসর সেখানে আয়করের হার মোটামুটি নিম্নলিখিতরূপ ছিল :

আয় টাকা	যাহাদের পোষ্য নাই টাকা	করের পরিমাণ যাহাদের স্ত্রী ও দুইটি সন্তান আছে টাকা
১৪০০	×	×
২০০০	×	×
২৭০০	১১২	×
৩৪০০	২৫০	২০

১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতীয় আয়করের হার :

আয়	করের পরিমাণ (পোষ্য থাকুক বা না-থাকুক)
১৫০০	×
২১৫০	৫০।০ টাকা

বাংলায় কর্মরত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের জন্য ভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া ভারত-সরকার কতকটা সুবিবেচনার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত হওয়া উচিত। বাংলার বর্তমান অর্থ-নৈতিক দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া এখানে অন্যূন মাসিক আড়াই শত টাকা পর্য্যন্ত আয়কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া কর্তব্য। এখনকার আড়াই শত টাকা যুদ্ধের পূর্বে ষাট টাকার সমান। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বাংলার যে-সব প্রতিনিধি আছেন, আয়কর সম্বন্ধে আলোচনা কালে তাঁহারা এই বিষয়টির প্রতি পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

—

বাংলায় খাদ্যাভাবের প্রশ্ন

বাংলায় চাউলের অভাব ঘটিয়াছে কিনা এ সম্বন্ধে কিছু দিন হইতেই প্রশ্ন উঠিতেছিল। বর্তমান খাদ্য-সচিব বার বার জোর দিয়া বলিয়াছেন, খাদ্যাভাব ঘটে নাই, গ্রামাঞ্চলে বহু চাউল মজুত রহিয়াছে, সেগুলি টানিয়া বাহির করিতে পারিলেই চাউলের অভাব ঘুচিবে। তবে সাধারণ সময়ে লোকে যে পরিমাণে ভোজন করে সেই হিসাবে চাউল হয়ত পর্য্যাপ্ত হইবে না। পরিমিত ভোজন করিলে এবং ভাত খাওয়া কমাইয়া ঐ সঙ্গে যত দূর সম্ভব অপর খাদ্য গ্রহণ করিলে আগামী ফসল না-উঠা পর্য্যন্ত যে চাউল আছে তাহাতেই কুলাইয়া যাইবে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি জেলায় জেলায় চাউল খুঁজিবার

জন্য এক অভিযানের পরিকল্পনা করেন এবং ৭ই জুন হইতে চাউলের সন্ধানে সদলবলে বহির্গত হন।

খাদ্য-সচিবের এই ধারণা ঠিক কি না সে সম্বন্ধে অনেকে গোড়াতেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। মিঃ সুরাবর্দির পরিকল্পনা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মৌলবী ফজলুল হক, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর, মৌলবী সামসুদ্দীন আমেদ প্রমুখ কয়েক জন নেতা এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে বলেন, "বাংলায় ধান চাউলের অভাব ঘটে নাই ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।" ঐ সঙ্গে তাঁহারা প্রস্তাব করেন "চাউল রপ্তানী সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হউক এবং গবর্ন্মেণ্ট ও কারখানাপ্রভৃতির মালিকেরা যেভাবে অত্যধিক মূল্যে চাউল ক্রয় করিতেছেন তাহাও নিয়ন্ত্রণ করা হউক।"

এই বিবৃতি প্রকাশিত হয় ৪ঠা জুন। ৭ই হইতে সরকারী খাদ্যাভিযান আরম্ভ হয়। ১৩ই জুন পূর্বোল্লিখিত নেতৃবৃন্দ পুনরায় এক বিবৃতিতে বলেন, "আমরা জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের আড়তদার ও অতিলোভী ব্যবসায়ীরা এই খাদ্যাভিযানের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। চাউল চালান দেওয়ার বাধানিষেধ অপসারিত হওয়ায় তাহারা গ্রামাঞ্চলেও চড়া দরে ক্রয় করিতেছে। গ্রামাঞ্চলের সমস্ত চাউল এই ভাবে অপসারণে গবর্ন্মেণ্ট কোন বাধা দেন নাই।"

ইহার চার দিন পরে ১৭ই জুন বাংলা-সরকার নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন :

গত ৭ই জুন তারিখে প্রদেশের সর্বত্র খাদ্য-মজুত-নিবারণী অভিযান সুরু করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে যে বাংলার ১ লক্ষ ২০ হাজার গ্রামের প্রত্যেকটিতে খাদ্য-সমিতি গঠন করিয়া গ্রামের খাদ্য-সম্পদের হিসাব সংগ্রহ করা এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে আপোষে সমান ভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করা। বাংলার প্রাচীন পঞ্চায়েৎ পদ্ধতির একটা নূতন সংস্করণরূপে এই খাদ্য-সমিতিগুলিকে দেখা যাইবে। ইতিমধ্যেই এক লক্ষ এরূপ সমিতি গঠিত হইয়াছে। যে সকল ক্ষেত্রে অনুরোধ-উপরোধে কোন কাজ হইবে না এবং কোন গ্রামের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য যখন অভাবগ্রস্ত কোন গ্রামে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে কেবলমাত্র তখনই গবর্ন্মেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন। উক্ত সমিতিগুলি ছাড়াও প্রায় ত্রিশ হাজার কর্মী সর্বক্ষণ খাদ্য-অভিযানের কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। আশা করা যায় যে, এই খাদ্য সমিতিগুলি কেবলমাত্র মজুত খাদ্য অন্বেষণের কাজেই নিযুক্ত থাকিবে না, এই সমিতিগুলি পরিণামে পল্লী-অঞ্চলের খাদ্যনীতিও নির্ধারণ করিবে। জেলাসমূহ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে দেখা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে যে সকল লোকের অধিক পরিমাণে মজুত খাদ্য ছিল সেই সকল লোক স্বেচ্ছায় তাহাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য প্রতিবেশীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গুজব রটিতে দেখা গিয়াছে যে, কোন বিশেষ অঞ্চল হইতে চাল সরাইয়া লইবার উদ্দেশ্যেই গবর্ন্মেণ্ট এই হিসাব সংগ্রহ করিতেছেন। শিক্ষামূলক প্রচারকার্য্যের ফলে গ্রামবাসীদের এই আতঙ্কের ভাব এক্ষণে কমিয়া গিয়াছে। বৎসরের শেষ ভাগে যাহাতে চালের দর বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্য জেলা-কর্তৃপক্ষকে ব্যবসায়ী ও চাষীদের তিন শত মণের অধিক মজুতের চার ভাগের এক ভাগ হস্তগত করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। খাদ্য-সমিতিসমূহ চাষীদের মজুতের অতিরিক্ত চাল সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

এই অভিযানের ফলে কলিকাতায় চাউলের দর কিছু কমিয়াছে। কতকগুলি জেলাতে, বিশেষতঃ যশোহর ও খুলনাতে চাউলের দর খুবই কমিয়াছে। যশোহরে মণপ্রতি সাত টাকা কমিয়া কুড়ি টাকাতে দাঁড়াইয়াছে। খুলনা জেলাতে মণ-প্রতি দশ টাকা কমিয়া ১৬ টাকাতে দাঁড়াইয়াছে।—এ, পি

বিবৃতির শেষ অংশের উক্তিগুলি যে সত্য নহে কলিকাতাবাসী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

আরও দশ দিন পর ২৭শে জুন কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে খাদ্য-সম্মেলনের অধিবেশন আহূত হয় এবং সম্মেলনের প্রথম প্রস্তাবে বলা হয় যে "৭ই জুন হইতে ২০শে পর্য্যন্ত খাদ্যাভিযানের ফলাফল সম্পর্কে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় বাংলার অধিকাংশ স্থানেই খাদ্যশস্যের অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে।" প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, "আজ বাংলায় কেন এমন খাদ্যসঙ্কট তার দীর্ঘ আলোচনা আমি করিতে চাই না, কিন্তু একথা ঠিক যে, যদি প্রথম হইতে খাদ্যের সুব্যবস্থা করা হইত তাহা হইলে এরূপ সঙ্কট আসিত না। কিন্তু বাংলা দেশের এমন দুর্ভাগ্য যে, দেশের প্রয়োজনের দিকে চাহিয়া খাদ্যের সুব্যবস্থা করার সাহস বা শক্তি গবর্ন্মেণ্টের নাই। দেশের খাদ্য-তালিকা যে সংগ্রহ করা উচিত এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট বলিলেন যে, দেশে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য মজুত আছে এবং কয়েক শ্রেণীর লোক তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছে।

গবর্ন্মেণ্ট এ বিষয়ে কোনই দায়িত্ব লইলেন না। আজ গবর্ন্মেণ্ট বলিতেছেন, সত্যই খাদ্যদ্রব্যের অভাব। আমার কাছে প্রমাণ আছে যে গবর্ন্মেণ্ট এক দিকে যেমন বলিলেন, খোঁজ করো, আর অন্য দিকে এমন কয়েক জনকে ছাড়িয়া দিলেন যাহারা এই সমস্ত আটক চাল বেশী দামে কিনিতে লাগিল।"

• বাংলায় চাউলের অভাব হয় নাই, গ্রামের মজুত চাউল টানিয়া বাহির করিতে পারিলেই খাদ্যসমস্যা সমাধান হইবে, এই ঘোষণার এক মাস আট দিন পরে অবশেষে ১২ই জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মৌলবী ফজলুল হকের এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ সুরাবর্দী স্বীকার করিয়াছেন যে, খাদ্যাভিযানের ফলে দেখা গিয়াছে প্রায় প্রত্যেক স্থানেই প্রয়োজনের তুলনায় চাউল কম আছে।

—

মেদিনীপুরের তদন্ত হয় নাই কেন ?

মেদিনীপুরের ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের জন্য দেশব্যাপী যে দাবী উঠিয়াছিল তাহার যৌক্তিকতা অস্বীকার করিতে না পারিয়া মৌলবী ফজলুল হক প্রধান মন্ত্রী থাকাকালে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে উপযুক্ত ট্রিবিউনালের দ্বারা এই তদন্তের ব্যবস্থা হইবে। একমাত্র ইউরোপীয় দল এই তদন্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। মিঃ হক কেন তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারেন নাই সম্প্রতি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ৫ই জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে তিনি বলেন :

"আমাকে মন্ত্রিপদচ্যুত করার জন্য ফেব্রুয়ারী মাসের পর হইতেই আমার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সহিত ইউরোপীয় দলের ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে একটা চুক্তি হইয়াছিল। ঐ অবস্থা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছিলাম। অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে আমাকে কাজ করিতে হইতেছিল ; যাহাদের সহযোগিতা ও সমর্থন আমি প্রত্যাশা করিতাম, দেখিতেছিলাম যে তাহারাই আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করিতেছে।

এই সময় আমি মেদিনীপুরের ঘটনাবলী সম্পর্কে মন্ত্রিসভার নীতি ব্যক্ত করিয়া পরিষদে বিবৃতি দান করি। একটি প্রস্তাবের আকারে বিষয়টি পরিষদে উত্থাপিত হইয়াছিল এবং ইউরোপীয় দল ব্যতীত পরিষদে অন্য সকল দলই একটি তদন্ত-কমিটি নিয়োগের দাবী জানাইয়াছিল। অভিযোগগুলি এত গুরুতর ও বিশেষ বিশেষ ঘটনা সম্পর্কিত যে কর্ম্মচারীদের স্বার্থের জন্যই অভিযোগকারীদিগকে ঐ সকল অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করিতে বলা উচিত বলিয়া মনে হইয়াছিল। আমিও ঐ যুক্তিতে একমত হই এবং তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিই। উহা শুনিয়া গবর্ণর আমার নিকট নিম্নোদ্ধৃত পত্র লেখেন,—

কলিকাতা, ১৫ই ফেব্রুয়ারী

প্রিয় প্রধান মন্ত্রী,—

আমি সংবাদ পাইয়াছি (গত বার আমাদের মধ্যে কথাবার্ত্তার সময় আপনি মেদিনীপুরের ঘটনাবলী সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহা মনে করিয়া আমার পক্ষে এই সংবাদ বিশ্বাস করা কষ্টকর) যে, আপনি মেদিনীপুর জেলায় কর্ম্মচারীদিগের আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা হইবে বলিয়া আজ আইন-সভায় প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আপনি ভাল ভাবেই জানেন যে এই বিষয়টি আমার বিশেষ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত, আপনি আরও জানেন যে এই বিষয়ে কোন তদন্ত করা আমি অবাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে করি। এই সংবাদ সত্য হইলে, সরকারের সিদ্ধান্ত বলিয়া বর্ণিত এই বিষয়ে পূর্ব্বেই আমার সহিত কোন আলোচনা করেন নাই। আগামী কল্য প্রাতঃকালে আমার সহিত সাক্ষাৎ করার সময় সে সম্পর্কে আপনার কৈফিয়ৎ প্রত্যাশা করিব।

ভবদীয়
স্বাঃ জে, এ, হার্বার্ট

মিঃ এ কে ফজলুল হক সমীপেষু

সম্পূর্ণ নীরবে এই অবস্থা মানিয়া লইতে না পারায় আমি নিম্নলিখিত উত্তর দিয়াছিলাম :—

কলিকাতা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী

প্রিয় স্যার জন,

আপনার ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রের উত্তরে আপনাকে জানাইতেছি যে, (এই সম্পর্কে) আপনার নিকট কোনও কৈফিয়ৎ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আমি স্বীকার করি না, তবে মৃদু ভর্ৎসনার সহিত আপনাকে একথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য যে,—আপনার পত্রে যেরূপ অসৌজন্যমূলক ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে গভর্ণরের ও প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে পত্রে সেরূপ ভাষা বর্জ্জন করাই বাঞ্ছনীয়।

মেদিনীপুরের ঘটনাবলী সম্পর্কে শুক্রবার মুলতুবী প্রস্তাবের নোটিস দেওয়া হইয়াছিল। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রত্যেকেই এবং আমার নিশ্চিত ধারণা আপনিও জানিতেন যে মেদিনীপুরের ঘটনাবলী সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ

করা হইবে, সুতরাং পরিষদের সকল দলই যে তদন্তের জন্য বারম্বার ও অপ্রতিরোধ্য ভাবে দাবী করিবেন তাহা আপনি বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কোনরূপ তদন্তের ব্যবস্থা না করাই আপনার ইচ্ছা থাকিলে, আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া স্পষ্ট ভাবে আপনার বলা উচিত ছিল যে, যে দিক্ দিয়া যে দাবীই উত্থাপিত হউক না কেন, আমাকে পরিষদে বলিতে হইবে যে, আপনি ঐরূপ তদন্তের বিরোধী, সুতরাং সরকার ঐরূপ কোন তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। আপনাকে আমি আরও জানাইতে পারি যে, শনিবার হইতে আমরা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সহিত ক্রমাগত আলোচনা করিয়াছি এবং তাঁহারা জানিতেন যে, আমরা তদন্তের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি কি করিয়া বিশ্বাস করিব যে, তদন্তের দাবী নিশ্চিতভাবে উত্থাপিত হইবে বলিয়া আপনি কিছুই জানিতেন না? আমাকে ডাকিয়া পাঠাইবার কর্তব্যে আপনি অবহেলা করিয়াছেন, আবার এখন আপনি অনুযোগ করিতেছেন যে, সরকারের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি কর্তৃক অননুমোদিত একটি সিদ্ধান্ত আমি পরিষদে প্রকাশ করিয়াছি।

আপনার পত্র পড়িয়া মনে হইতেছে যে, আপনি তদন্ত-কমিটি গঠনের প্রস্তাবে সম্মতি দিবেন না। তাহা হইলে আমার সম্মুখে মাত্র একটি পথ খোলা আছে, আমাকে পরিষদে একটি বিবৃতি দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে যে, আমার গতকল্যকার বিবৃতি সরকার কর্তৃক তদন্ত-কমিটি গঠনের ব্যবস্থায় সম্মতি বলিয়া মনে করা উচিত হইবে না। আমার অবস্থা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে আপনার লিখিত আলোচ্য পত্রখানিও আমি পরিষদে পড়িতে চাহি। তবে, পূর্বাহ্নে আপনাকে না জানাইয়া আমি তাহা পড়িব না। আমি ও আমার সহকর্মিগণ আইনসভার নিকট দায়ী এবং কেন তদন্ত-কমিটি গঠন করা যাইবে না আইনসভা তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ প্রত্যাশা করার অধিকারী। আপনার নিকট হইতে যে পত্র পাইয়াছি তাহাই এই বিষয়ে আমার একমাত্র কৈফিয়ৎ।

আজ প্রাতে ১০টার সময় আপনার সহিত আমার দেখা করার কথা ছিল। ইতিপূর্বেই আমি আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে মৌখিক জানাইয়াছি যে আপনার নিকট যাওয়া ও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না, কেন-না আমি মনে করি যে আপনার পত্রে লিখিত ভাষার জন্য সন্তোষজনক ত্রুটি স্বীকার না করিলে ক্রোধজর্জরিত মনোভাব লইয়া যে কথাবার্তা হইবে তাহাতে কোনই লাভ হইবে না।

ভবদীয়

এ, কে, ফজলুল হক

বর্তমান মন্ত্রিসভা এই গুরুতর বিষয়টি সম্পর্কে একটি কথাও বলেন নাই।

—

স্বাধীনতা অর্জনে ভারতবাসী বিদেশের সাহায্য চাহে না

সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ার শহরে এক জনসভায় ডাঃ খাঁ সাহেব বলেন, "রাজনৈতিক দলবিশেষের বিরোধিতা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যে ব্যক্তি অথবা দল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিক্রিয়াশীল দলকে সাহায্য করে তাহাদিগকে আমরা দেশের শত্রু বলিয়া মনে করি এবং এই কারণেই আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াই। দল হিসাবে একমাত্র কংগ্রেসই ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে এবং আজও করিতেছে।" স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কংগ্রেস বিদেশের সাহায্য চাহে বলিয়া যে গুজব রটানো হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ করিয়া ডাঃ খাঁ সাহেব বলেন, "এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমাদের স্বাধীনতা আমরা একমাত্র নিজেদের শক্তি দ্বারাই অর্জন করিতে পারিব।" সীমান্ত প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি খাঁ আমিণুল খাঁ ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সীমান্ত প্রদেশের পাঠানেরাও যে কংগ্রেসের মূলনীতি উপলব্ধি করিয়াছে এবং মন্ত্রিত্বের মোহ সম্বরণ করিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়াছে, ইহা কংগ্রেসের সুদৃঢ় শক্তির পরিচয়।

—

খাদ্যসমস্যা সমাধানে ভারত-সরকারের চেষ্টা

নয়া দিল্লীতে সম্প্রতি যে সরকারী খাদ্য-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ হয় নাই বটে, কিন্তু সিদ্ধান্তের যে কয়েক দফা জানা গিয়াছে তাহাতে ভরসার কথা একটিও নাই। প্রথমতঃ গবর্ন্মেণ্ট বলিয়াছেন ক্রমবর্ধমানভাবে এবং প্রায় অতি শীঘ্র (in a progressively increased measure and almost immediately) শহরাঞ্চলে খাদ্য-দ্রব্য রেশনিং করিবার ব্যবস্থা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ, বাংলা-সরকার নাকি সপ্তাহকাল মধ্যেই সরিষার তৈল প্রভৃতি কয়েক দফা খাদ্যদ্রব্য রেশনিং করিবেন, কিন্তু চাউল বণ্টনের কোন ব্যবস্থা

তাঁহারা করিতে পারিবেন না। মাসিক কুড়ি টাকা আয়ের ব্যক্তিগণকে কিঞ্চিৎ চাউল বিতরণের বন্দোবস্ত মাত্র হইতে পারে। সুতরাং সরকারী খাদ্য-সম্মেলনের প্রথম সিদ্ধান্তে বুভুক্ষু বাঙালীর কোন লাভ নাই।

দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান সময়ে খাদ্যদ্রব্যের উর্ধ্বতম মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে না; তবে সব জিনিসেরই দর কমাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা হইবে। এ দেশে সরকারী যথাসাধ্য চেষ্টার পরিণাম কি হয় তাহা অজানা নাই। বহু পূর্বেই চাউল প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্যের উর্ধ্বতম মূল্য নির্ধারণ করিয়া যথাবিহিত কঠোরতার সহিত তাহা কার্য্যে পরিণত করা উচিত ছিল। যুদ্ধের সময় কোন সভ্য দেশ যোগান ও চাহিদার স্বাভাবিক নীতি অনুসারে মূল্য নির্ধারিত হইতে দেয় না, বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে গবর্ন্মেণ্ট এই সময় বাণিজ্যক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে এবং প্রত্যেক নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে। স্বাধীন ভারতবর্ষেও এই প্রথাই যে প্রচলিত ছিল, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র তাহার প্রমাণ। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান রাজত্বে বণিক্-স্বার্থ বৃহত্তর গণ-স্বার্থের স্থান অধিকার করিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই বোধ হয় একমাত্র দুর্ভাগা দেশ যেখানে যুদ্ধের সময় যোগান ও চাহিদার নীতির উপর শাসকবৃন্দের ভক্তি বাড়িয়া উঠে, যেখানে মন্ত্রিমণ্ডল গ্রামাঞ্চলে মজুত চাউল খুঁজিতে বাহির হন, কিন্তু রাজধানীর শ্বেত ও কৃষ্ণ বণিক বৃন্দকে গুদামের চাবি খুলিতে বলিবার সাহস সঞ্চয় করিতে পারেন না। দিল্লী-সম্মেলনের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তেও বাঙালীর কোন আশা নাই।

তৃতীয়তঃ, যাহারা খাদ্যদ্রব্য গুদামে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে এবং এই সুযোগে অতিলাভ করিতেছে, ভারত-সরকার তাহাদের বিরুদ্ধে 'নিষ্ঠুর আক্রমণ' চালাইবার সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই দুই শ্রেণীর ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে সরকার বহু দিন যাবৎ হুমকি দিতেছেন, কিন্তু কার্য্যকালে যাহা করিতেছেন তাহাতে ইহাদেরই সুবিধা হইতেছে বেশী, সুতরাং তৃতীয় সিদ্ধান্তেও বুভুক্ষু বাঙালী আশ্বস্ত হইবে না।

—

বস্ত্রের মূল্য হ্রাস

ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের কল একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ-বোর্ডের অধীনে আসিবার অব্যবহিত পরেই কাপড়ের দর কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিয়ন্ত্রণ-বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস ঠাকরসি বলিয়াছেন যে, গত দুই-তিন মাস বাজারে কাপড়ের যে দর ছিল অবিলম্বে তাহা শতকরা ২৫ ভাগ তো কমিবেই, ৩০।৪০ ভাগ কমিয়া আসাও অসম্ভব নয়। কাপড়ের দর প্রকৃতপক্ষে কমিয়াছেও। এই নিয়ন্ত্রণে প্রমাণিত হইল যে, মিল-মালিকেরা যোগান হ্রাসের সুযোগে অতিলাভ করিতেছিলেন, কাপড় তৈরির ব্যয়বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে ধুয়া তাঁহারা তুলিয়াছিলেন তাহা অন্তঃসারশূন্য। যে ষ্টাণ্ডার্ড কাপড় তাঁহারা ৪৷৷৹ টাকায় লোকসান না করিয়াও দিতে পারিতেছিলেন, বাজারে তাহারই দর ছিল দশ টাকা। উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধির অনুপাতে মূল্যবৃদ্ধি তাঁহারা করেন নাই, যে কোন প্রকারে দাম বাড়াইয়া অতিলাভ করাই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষের কাপড়ের কলের মালিকেরা এই যুদ্ধে যে অবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন তাহার ফল সমগ্র দেশকে ভবিষ্যতেও ভোগ করিতে হইবে। এই যুদ্ধের পরেও বিলাতী কাপড়ের স্রোত বন্ধ করিবার জন্য পূর্বের ন্যায় ভারতীয় মিল-মালিকদের আর্তনাদ করিতে হইলে, উহা তখন ক্রেতা-সাধারণের কর্ণে প্রবেশ করিবে কি?

—

রমেশচন্দ্র আর্য্য

আলিগড় জেলে "অর্জ্জুন" পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক রমেশচন্দ্র আর্য্যের রহস্যজনক মৃত্যু সম্বন্ধে যুক্ত-প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট যে সংবাদ দিয়াছেন তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ১২ই জুন রমেশচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়, ১৮ই জুন তাঁহার পরিবারবর্গকে জানানো হয় যে তিনি কারাপ্রাঙ্গণে এক কূপের ভিতর লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। প্রকাশ, মৃতদেহ তুলিয়া আনিবার পর উহার বহু স্থানে আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। ঘটনাটি আদ্যোপান্ত রহস্য-জনক। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহার তদন্ত হওয়া উচিত।

—

এশিয়াবাসী বুঝাইয়া দিক তাহারা তুচ্ছ নহে

পার্ল বাক্ তাঁহার নবপ্রকাশিত পুস্তকের শেষাংশে লিখিয়াছেন, "এশিয়াবাসী আমাদিগকে বুঝাইয়া দিক তাহারা আমাদের ছোট্ট ভাইটি মাত্র নহে। যে-কোন উপায়ে হউক তোমরা নিঃসন্দেহে এবং সক্রিয় ভাবে প্রমাণ কর যে তোমরাও আমাদেরই সমকক্ষ এবং বহু ক্ষেত্রে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি স্পষ্টই বলিতেছি, শুধু মাত্র নৈতিক উৎকর্ষ আমরা বুঝি না। এই জন্যই তোমাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠতার মূল্য দেওয়া আমাদের উচিত

হইলেও আমরা তাহা দিই না। গান্ধী বর্তমান যুগের মুষ্টিমেয় কয়জন সাধু ও শ্রেষ্ঠ পুরুষের অন্যতম হইলেও তাঁহাকে আমরা বুঝিতে পারি না। চিয়াং কাই-শেকের অনেক বড় বড় উক্তির মর্মও আমরা উপলব্ধি করি না। সকল মানুষের সমান অধিকারের মূলনীতি না বুঝিলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ভারতবাসী তোমরা তোমাদিগকে যে-কোন মূল্যেই হউক শ্বেতাঙ্গ-সমাজকে ইহা বুঝাইয়া দিতে হইবে।"

চীন ও ভারতবর্ষ এই দুই মহাজাতি সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ, শাসন ও শোষণ অকুতোভয়ে প্রতিরোধের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদের অবসানের যে সূচনা করিয়া গিয়াছে, তাহার পরিণাম হৃদয়ঙ্গম করিতে শ্বেতাঙ্গ সমাজের আর খুব বেশী দিন লাগিবার কথা নহে।

—

আমেরিকানদের বর্ণ-ভেদ

অমৃতবাজার পত্রিকা লিখিতেছেন, "৪ঠা জুলাই রবিবার কলিকাতা-প্রবাসী আমেরিকানরা স্বাধীনতা-দিবস পালন করিয়াছেন। শ্বেতাঙ্গ অফিসারেরা ডালহৌসি ইনষ্টিটিউটে নাচের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, নিগ্রো অফিসারদের নাচের আলাদা বন্দোবস্ত হইয়াছিল টাউন হলে। আমেরিকাবাসী সকলে যখন চারি দফা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছে, সেই সময়ে বর্ণ-বৈষম্য-পূর্ণ সুদূর ভারতবর্ষেও তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে এরূপ বর্ণ-ভেদ কিরূপে সম্ভব তাহা বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন। ৪ঠা জুলাই ফিরপোর রেস্তর্াঁয় বক্তৃতায় "জন্ম হইতেই সকল মানুষ সমান" প্রভৃতি বড় বড় কথা ঘোষণার সময় একজনও নিগ্রো অফিসার আমন্ত্রিত হন নাই ইহা দেখিয়া ভারতবাসী বিস্মিত না হইয়া পারে না।" অল্প দিন পূর্বে আমেরিকার এক শহরে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান ও নিগ্রোদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গার সংবাদও এ দেশে আসিয়াছে। কোন দেশে বর্ণবৈষম্য থাকিলেই অথবা মাঝে মাঝে দাঙ্গা প্রভৃতি ঘটিলেই সেই দেশ স্বাধীনতাভোগের অনুপযুক্ত হয় না এই ধরণের ঘটনায় তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়; অথচ ভারতবাসীকে বার বার শুনিতে হয় জাতিভেদ, বর্ণভেদ ও সম্প্রদায়-ভেদ তাহার স্বাধীনতা লাভের অন্তরায়। দোষ-ত্রুটি সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই থাকে, ইহাতে অস্বাভাবিক কিছু নাই। পরাধীন দেশের রাজনৈতিক প্রগতির পথরোধ করিবার সময়ে ঐগুলিকেই খুঁজিয়া বাহির করিয়া ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরা হয়।

—

আটলাণ্টিক চার্টারের সমাধি

আটলাণ্টিক চার্টার রচনার পর অল্প সময়ের মধ্যেই উহা যে ভারতবর্ষ বা ব্রিটিশ উপনিবেশ-সমূহের প্রতি প্রযোজ্য নহে, ইহা এক প্রকার পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি আমেরিকার কোন কোন সিনেটর কথা তুলিয়াছিলেন যে আটলাণ্টিক চার্টার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া থাকিলেও আমেরিকান কংগ্রেস অথবা রুজভেল্টের পরবর্তী কোন রাষ্ট্রপতি উহা মানিয়া লইতে বাধ্য নহেন। আমেরিকান কংগ্রেস বিধিবদ্ধ উপায়ে চার্টার মানিয়া লইয়া উহাকে আইনের মর্যাদা দান করিলে তবেই উহা বাধ্যতা-মূলক হইতে পারে। আমেরিকাতে ইহার কোন সম্ভাবনা এখনও দেখা যায় নাই। ইংলণ্ডেও প্রশ্নটি উঠিয়াছে। মিঃ চার্চিল চার্টারকে আইনের মর্যাদা দান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন উহাতে কয়েকটি মূলনীতির উল্লেখই শুধু করা হইয়াছে। আটলাণ্টিকের দুই পারের উভয় দেশই উহাকে আইনের মর্যাদা দানের প্রয়োজন অনুভব করে না।

যে যুদ্ধ-জাহাজে আটলাণ্টিক চার্টার স্বাক্ষরিত হইয়াছিল সেই প্রিন্স অফ ওয়েলস প্রশান্ত মহাসাগরে ডুবিয়াছে। এশিয়ার কোন পরাধীন দেশে আটলাণ্টিক চার্টারের নীতি প্রযুক্ত হইবে না, ইহা বুঝিবার পর এশিয়াবাসী উহার উপর আর কোন আস্থা রাখিতে পারিবে না। নূতন যে প্যাসিফিক চার্টারের কথা উঠিয়াছে, এশিয়াবাসীকেই উহা রচনা করিতে হইবে।

—

কংগ্রেসের ৮ই আগষ্টের প্রস্তাব

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির যে-সব সদস্য বর্তমানে কারাগারের বাহিরে আছেন তাঁহাদের দ্বারা কমিটির এক অধিবেশন আহ্বান করাইয়া কংগ্রেসের ৮ই আগষ্টের প্রস্তাব প্রত্যাহারের কথা কোন কোন কংগ্রেস-নেতা তুলিয়াছেন। ডাঃ কিচলু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উহার প্রতিবাদও করিয়াছেন। ৮ই আগষ্টের প্রস্তাব যাঁহারা আনিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এখন কারাগারে। কংগ্রেসের তাঁহারা বিশিষ্ট নেতা, দেশের জন্য বহু ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ বরণ তাঁহারা করিয়াছেন। ইহাদের উপর জনসাধারণের পূর্ণ আস্থা আছে। যে সভায় ইহারা নিজ বক্তব্য বলিবার সুযোগ পাইবেন না, সেই সভায় তাঁহাদেরই আনীত প্রস্তাব বাতিল করিতে চাহিলে তাহা শুধু যে দৃষ্টিকটু হইবে তাহা নহে, উহা ন্যায় ও সুনীতির মূল সূত্রেরও বিরোধী হইবে।

—

হিন্দুস্থান টাইমসের মামলা

হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকার আদালত অবমাননা মামলায় এলাহবাদ হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে যে আপীল করা হইয়াছিল, প্রিভি কাউন্সিল তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। আদালত অবমাননার অভিযোগ হইতে সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক এবং মীরাটের সংবাদদাতা সকলেই অব্যাহতি পাইয়াছেন। জরিমানার এবং খরচার টাকাও ফিরাইয়া দিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রিভি কাউন্সিল রায়ে বলিয়াছেন যে হিন্দুস্থান টাইমসে প্রকাশিত উক্তিতে আদালতের কোন অবমাননাই হয় নাই। উক্ত সংবাদপত্রে এই মর্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে প্রধান বিচারপতি যুক্তপ্রদেশের বিচার-বিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দকে যুদ্ধের জন্য চাঁদা আদায়ে সাহায্য করিতে বলিয়াছেন এবং একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছিল যে এই সংবাদ সত্য হইলে ইহা দ্বারা হাইকোর্টের মর্য্যাদাহানি ঘটিবে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সর্ ইকবাল আমেদ ইহাতে আদালতের অবমাননা হইয়াছে মনে করিয়া হিন্দুস্থান টাইমসের সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক এবং যে সংবাদদাতা উক্ত সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাদের সকলকে দণ্ড দান করেন। বিচারকের কর্তব্যের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, প্রধান বিচারপতির এরূপ কোন কার্য্যের সমালোচনা দ্বারা আদালতের অবমাননা হয় না, প্রিভি কাউন্সিলের মন্তব্যে তাহাই প্রমাণিত হইল। আদালত অবমাননার মামলার উপর আপীল চলে না, প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে এই ভুল ধারণাও দূর হইয়াছে।

—

বিমাতার সংসার

বাংলার লোকসংখ্যা কর্ষণযোগ্য জমির অনুপাতে বেশী; কোন কোন অঞ্চলে লোকসংখ্যা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ঘন বসতিপূর্ণ দেশসমূহ হইতেও বেশী। প্রতি বর্গমাইলে বাংলার সহিত পৃথিবীর অপর কয়েকটি দেশের লোকসংখ্যার তুলনা নিম্নে দেওয়া হইল :

বেলজিয়াম (১৯৩৮)	৭১২	বাংলা	(১৯৪১)	৭৭৯
ইংলণ্ড (১৯৩২)	৬৯৫	বর্দ্ধমান বিভাগ		৭২৮
হলাণ্ড (১৯৩৮)	৬৮৫	প্রেসিডেন্সি	"	৭৮১
জার্মেনী (১৯৩৯)	৩৮২	রাজশাহী	"	৬১৩
জাভা (১৯৩০)	৮১৭	ঢাকা	"	১০৭৭
		চট্টগ্রাম	"	৭২১

ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলি কৃষির উপর নির্ভর করা অসম্ভব বুঝিয়া শ্রমশিল্পকে প্রধান উপজীবিকা রূপে গ্রহণ করিয়াছে। বাঙালী কি করিবে? ১৯৪১-এর পর ব্রহ্ম, চীন, আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ হইতে আরও বহু লোক আসিয়া বাংলায় উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদেরও আহার্য দ্রব্যের সংস্থান করিতে হইতেছে প্রকৃতপক্ষে একা বাংলাকে।

উপরোক্ত দেশগুলির ন্যায় বাংলা দেশও যে ক্রমেই শ্রমশিল্পের দিকে ঝুঁকিতেছে, ভারতীয় কলকারখানাগুলির সংখ্যা দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। বাংলাতেই কারখানার সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। বাঙালীর বাঁচিবার দুইটি উপায় আছে—প্রথম, শিল্পোন্নতি; দ্বিতীয়, বিদেশযাত্রা। যুদ্ধ থামিবার পূর্বে কোনটিই করিবার উপায় নাই, কিন্তু এখন হইতেই উভয়টির প্রতিই মনোযোগ দিয়া সমস্ত পরিকল্পনা ঠিক করিয়া না রাখিলে যুদ্ধের পরবর্তী নিদারুণ প্রতিযোগিতায় টিঁকিয়া থাকা বাংলার পক্ষে ভয়ানক কঠিন হইবে।

বাংলার বর্তমান খাদ্যসমস্যাও বাংলা দেশ একা সমাধান করিতে পারে না, ভারত-সরকারের ইহা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। ভারত-সরকারের কার্য্যকলাপে সে পরিচয় খুবই অস্পষ্ট। সকলের সঙ্কট-ত্রাণে বাংলা অগ্রসর, কিন্তু বাংলার বিপদে কেহ আসে না—এই অবস্থাকে একমাত্র বিমাতার সংসারের সঙ্গেই তুলনা করা যায়।—শ্রীপরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

—

সর্ গুরুদাস শতবার্ষিকী

বাংলার যে সকল কৃতী সন্তান স্বীয় চরিত্র, বিদ্যাবত্তা ও সততার জন্য দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয়। পণ্ডিত ও শিক্ষাদাতা, আইনজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ণ বিচারক, ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্মনীতি ও আদর্শের সেবক সর্ গুরুদাসের নাম বাঙালী কোনদিন ভুলিবে না। বাংলার এই সুসন্তানের জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের যে আয়োজন হইয়াছে তাহাতে যোগদান করিয়া সকলে সর্ গুরুদাসের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন সন্দেহ নাই।

—

ভারতবর্ষে রাসায়নিক সার উৎপাদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে ভারতীয় লাক্ষা গবেষণাগারের ডিরেক্টর ডাঃ এইচ কে সেন ভারতবর্ষে সার উৎপাদনের কথা আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন এ দেশে রাসায়নিক সার সাধারণতঃ আখ, তুলা, কফি ও চায়ের ক্ষেতে ব্যবহৃত হয়, কখনও কখনও

গম বা অন্য ফসলের জন্যও ব্যবহৃত হয়। এ দেশে ধানের ক্ষেতের পরিমাণ প্রায় ৮ কোটি একর। এই সব জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয় না। ধানের ক্ষেতে সার দিলে উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে ইহা নিঃসন্দেহ। ভারতবর্ষে প্রতি একর জমিতে ধান উৎপন্ন হয় ১৩৫৭ পাউণ্ড, ইতালিতে হয় ৪৬০১ পাউণ্ড, জাপানে ২৭৬৭ পাউণ্ড, মিশরে ২৩৫৬ পাউণ্ড এবং আমেরিকায় ২১১২ পাউণ্ড। ভারতবর্ষে এমোনিয়াম সালফেটের কারখানা স্থাপন করিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সার তৈরি আরম্ভ হইলে দেশের খাদ্যসঙ্কট অনেক কমিয়া যাইবে, ডাঃ সেন দৃঢ়তার সহিত এই কথা বলেন।

বর্তমানে ভারতবর্ষে ১৮০০০ টন এমোনিয়াম সালফেট তৈরি হয় এবং আমদানী হয় ৭৬ হাজার টন। সাধারণ সময়ে আমদানী সালফেটের দর থাকে ৯০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা টন। ডাঃ সেন হিসাব করিয়া দেখাইয়া দেন যে এ দেশে উহার অর্দ্ধেক খরচে এমোনিয়াম সালফেট তৈরি হইতে পারে। এই অতি প্রয়োজনীয় সারটির দাম সস্তা হইলে কৃষকেরা উহা ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে এবং ধানক্ষেতে এমোনিয়াম সালফেট ব্যবহার আরম্ভ হইলে ফসল উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইবে। এমোনিয়াম সালফেট ব্যবহারের সুবিধা এই যে, উহা দ্বারা জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

ডাঃ সেন ইহাও প্রমাণ করেন যে এমোনিয়াম সালফেট তৈরি এখন হইতেই আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই কারখানা স্থাপনের জন্য যে সব যন্ত্রপাতি আবশ্যক, তাহার অধিকাংশই এদেশে নির্ম্মিত হইতে পারে, অবশিষ্ট যাহা এ দেশে এখনই তৈরি হইবে না সেগুলি ঋণ ও ইজারা বন্দোবস্তে আমেরিকা হইতে আনা যাইবে।

এমোনিয়াম সালফেটের ব্যবসা বর্তমানে বিলাতী বণিক্‌দের একচেটিয়া। ডাঃ সেনের উপদেশ গবর্ন্মেণ্টের কর্ণে প্রবেশ করিবে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

—

রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেস দল রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। দলের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা প্রস্তাবটি আনয়ন করেন। সেটি এই :—

রাজনৈতিক মতবাদ অথবা কার্যকলাপের জন্য যে সকল ব্যক্তিকে ১৮১৮ সালের ৩ আইনের বলে অথবা ভারতরক্ষা-আইনের বলে জেলে আটক রাখা হইয়াছে অথবা যাঁহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে এবং ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে কংগ্রেসী নেতৃবর্গের গ্রেপ্তারের পর যে আন্দোলন হয় সেই সূত্রে বিবিধ অপরাধের দায়ে যাঁহাদিগকে দণ্ডিত করা হইয়াছে সেই সকল ব্যক্তিকে মুক্তি দিবার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাংলা-সরকারের কর্তব্য বলিয়া পরিষদ্ মনে করে। পরিষদের মতে সিকিউরিটি বন্দীগণকে এবং দণ্ডিত রাজবন্দীগণকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া সম্ভব না হইলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির মর্য্যাদা বিশিষ্ট অন্ততঃ ২ জন ব্যক্তিকে লইয়া একটি ট্রাইবুন্যাল গঠন করা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর রাজনৈতিক এবং আটক-বন্দীদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উপযোগী ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দিবার জন্য ব্যবস্থা-পরিষদের এবং ব্যবস্থাপক সভার সকল দলের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি বে-সরকারী কমিটি গঠন করা বাংলা-সরকারের কর্তব্য।"

মন্ত্রীদের মধ্যে কেহই এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বলেন নাই। তাঁহাদের দলের মিঃ আবদর রহমান সিদ্দিকী এবং মিঃ ডেভিড হেণ্ডরী উহার বিরোধিতা করেন। শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা রাজবন্দীদের হইয়া গবর্ন্মেণ্টের নিকট দয়া ভিক্ষা করেন নাই, তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করা গবর্ন্মেণ্টের অবশ্যকর্তব্য এইটুকুই শুধু তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। যে-কোন স্বাধীন দেশের গবর্ন্মেণ্টের পক্ষে এই তিরস্কারই যথেষ্ট হইত।

—

হায়দরাবাদের তাঁতের কাপড়

হায়দরাবাদ গবর্ন্মেণ্ট তাঁতের কাপড় বোনার জন্য নয়টি কেন্দ্র খুলিয়াছেন। এই নয়টি কেন্দ্রে দুই হাজার তাঁত চলিতেছে এবং দশ হাজার লোকের অন্নসংস্থান হইতেছে। নিজাম গবর্ন্মেণ্টের বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের নেতৃত্বে এই বয়নকার্য্য পরিচালিত হইতেছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ইহার পরিকল্পনা। তাঁতীদের সুতা সরবরাহ করা হয় এবং কাপড় বোনা হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে উহা ন্যায্য মূল্যে কিনিয়া লওয়া হয়।

বাংলা দেশের শিল্পবিভাগ গোটাকয়েক বস্ত্র বয়ন প্রদর্শন কেন্দ্র চালানো ভিন্ন এ সম্বন্ধে আর কিছু করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। বাংলার দরিদ্র ও ঋণভার-জর্জরিত কৃষকগণকে হায়দরাবাদের পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া তাঁত চালাইবার সুযোগ দিলে বাংলার অর্থনৈতিক

অবস্থা অনেক উন্নত হইতে পারিত। কাপড়ের কলের সংখ্যা কমাইয়া অধিকাংশ কাপড় কুটীরে উৎপাদনের ব্যবস্থা হইলে বহু লোকের অন্ন সংস্থান হইতে পারিবে। প্রয়োজনানুসারে এক-একটি কেন্দ্রের জন্য নিজস্ব সুতা কাটার কল থাকিলে সস্তায় সুতা প্রাপ্তিতেও বিঘ্ন ঘটিবে না। বর্তমান যুদ্ধে ভারতবর্ষের কাপড়ের কলওয়ালাদের অতিলোভের ফলে যে সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে বস্ত্র উৎপাদনের উপর মুষ্টিমেয় কতিপয় কলওয়ালার কর্তৃত্বের অবসান একান্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া বুঝা গিয়াছে।

কুটীরে কুটীরে তাঁতে কাপড় বোনা আরম্ভ করিতে গেলে বাংলা দেশকেও প্রথমটা তাঁতীদের সুতা সরবরাহ করিয়া তৈরি কাপড় কিনিয়া লইবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সম্ভব হইলে তাঁত বিলি করিবারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলার শিল্প-বিভাগ ইচ্ছা করিলে বর্তমান অবস্থাতেও হায়দরাবাদের অনুকরণে অন্ততঃ কতকগুলি গ্রামের লোকের আয়ের পথ করিয়া দিতে পারিতেন।

খুচরা মুদ্রার অভাব

খুচরা মুদ্রার অভাব পুনরায় তীব্র ভাবে অনুভূত হইতেছে। দেশে খুচরা মুদ্রার বন্যা বহাইয়া দিবেন বলিয়া কয়েক মাস পূর্বে ভারত-সরকার যে আশ্বাস দিয়াছিলেন তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। একটি প্রস্তাব উঠিয়াছে পেষ্ট বোর্ডে ষ্ট্যাম্প আঁটিয়া উহাকেই খুচরা মুদ্রা রূপে চালানো হউক। যে গবর্ন্মেণ্ট কোম্পানী-বিশেষের পয়সা-কুপন বাজারে চলিতে দেখিয়াও কিছু বলে নাই, তাহার পক্ষে বোর্ডে আঁটা ষ্ট্যাম্প চালাইতে লজ্জা পাইবার কথা নহে।

কলিকাতা ও হাওড়ায় চাউলের সন্ধান

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে তিন দিবসব্যাপী বিতর্কের শেষ দিনে মিঃ সুরাবর্দি বলিয়াছেন যে কলিকাতা এবং হাওড়ায় চাউলের সন্ধান এবার আরম্ভ করা হইবে। অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার পূর্বে কলিকাতা ও হাওড়ার চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিবার জন্য গবর্ন্মেণ্ট আদেশ জারিও করিয়াছেন। ইউরোপীয় দলের নেতা মিঃ হেণ্ডরী তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে কলিকাতা ও হাওড়াকে খাদ্যান্বেষণ-অভিযান হইতে কেন বাদ দেওয়া হইল তাহা নাকি তিনি বুঝিতে পারেন নাই। ইস্পাহানী কোম্পানীর হইয়া মিঃ সিদ্দিকী কোন সাফাই দিয়াছেন কি না, সংবাদপত্রের রিপোর্টে তাহা জানা গেল না। খাদ্যান্বেষণ-অভিযান হইতে কলিকাতা ও হাওড়াকে বাদ দেওয়া এত দৃষ্টিকটু হইয়াছিল যে মিঃ সুরাবর্দি ও মিঃ হেণ্ডরীর পক্ষে শেষ পর্যন্ত নীরব থাকা সম্ভব হইল না। কলিকাতার চাউল সরিবার হইলে এত দিনে সরিয়াই গিয়াছে; এত বিলম্বে শহর ঘেরাও করিয়া চাউল আট্‌কানো যাইবে মিঃ সুরাবর্দি কি ইহা বিশ্বাস করিতে বলেন?

বিশ্বাস করা কঠিন হইলেও ইহা সত্য যে খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কিত বিতর্কে সরকার পক্ষ ১৩৪—৮৮ ভোটে জয়লাভ করিয়াছেন। তেরো জন মন্ত্রী, সতেরো জন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটরী এবং চারি শত সরকারী দোকানে বেকার আত্মীয়-স্বজনের কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা—পরাধীন দেশের নকল পার্লামেণ্টে ভোটে জয়লাভের পক্ষে ইহাই বোধ হয় যথেষ্ট।

বোম্বাইয়ে সাংবাদিক সম্মেলন

বোম্বাইয়ে নিখিল-ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের ষ্টাণ্ডিং কমিটির অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসন ভারত-সরকারের প্রচার-বিভাগের কার্য্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট অভিযোগ করিয়াছেন যে, সর্ আকবর হায়দরীর মৃত্যুর পর সর্ সি পি রামস্বামী আয়ারের কার্য্যকালের কয়েক দিন ছাড়া আজ পর্যন্ত এই বিভাগের কার্য্যে বুদ্ধি-বিবেচনার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বর্তমান প্রচার-সচিব সর্ সুলতান আমেদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসন উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

সভাপতি বলেন, "প্রচার-বিভাগের কার্য্যকলাপ এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে মিত্র দেশগুলিতে ভারতীয় নেতাদের কুৎসা প্রচার ছাড়া ইহার যেন আর কোন কর্তব্য নাই। রাজনৈতিক সংবাদের উপর কঠোর সেন্সর বসানো হইয়াছে। ইহার সর্বশেষ নিদর্শন লুই ফিশারের লেখা প্রকাশ নিষেধ করিয়া ঢালা হুকুম জারী। টিউনিসিয়ার জয় উপলক্ষে সংবাদপত্রগুলিতে ক্রোড়পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে গিয়াও এই বিভাগ দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়াছেন। সংবাদপত্র-সম্পাদকগণকে ক্রোড়পত্র বাহির করিতে বলা হইয়াছিল কিন্তু তাঁহারা ঐ জন্য অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহারের অনুমতি চাহিলে উহা প্রত্যাখ্যান করা হইল। শুধু তাই নয়, এই উপলক্ষে এক দিন ছুটি দিয়া সেই কাগজ বাঁচাইয়া ক্রোড়পত্রে ব্যবহার করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইল। এই ভাবে ব্যবহার করিলে গবর্ন্মেণ্ট আমাদের নিকট হইতে সহযোগিতার আশা করিতে পারেন না।"

ভারতবর্ষের সংবাদপত্রগুলির উপর কোন বন্ধন নাই বলিয়া যে প্রচার-কার্য্য চলিতেছে তাহার প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসন বলেন, "গবর্ন্মেণ্টের বক্তব্য এই যে, যুদ্ধের সময় যে-কোন দেশে সংবাদপত্রের যতখানি স্বাধীনতা থাকা সম্ভব, ভারতবর্ষে তাহা আছে। আমরা এই মন্তব্য সমর্থন করিব, সর্ সুলতান আমেদ নিশ্চয়ই



একজন গৃহরক্ষী বোমাবর্ষণ কালে কিরূপে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, একজন বয় স্কাউট তাহা দেখাইতেছে

গৃহ হইতে বিস্তর লোকজন উদ্ধার করে। অগ্নি-বোমা বর্ষণের মধ্যে এরূপ কাজ করিয়া যাওয়া কতখানি শক্তি ও সাহসের পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমেয়। উদ্ধার-কার্য্য সমাধা করিয়া তাহারা যখন নিজ ঘাঁটি অভিমুখে রওনা হয় তখন তাহাদের নিকটেই দুইটি বোমা ফাটিয়া যায়। তাহারা নিকটবর্ত্তী একটি আশ্রয়স্থলে গিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল।

ইহার পরে উভয়ে পুনরায় রাস্তায় বাহির হইল। কিন্তু আবার সম্মুখে বোমা বর্ষণ! জনের নির্দ্দেশে উভয়েই মাটির উপরে শুইয়া পড়িল। বোমা ফাটিবার কি গগনভেদী শব্দ! জন বুদ্ধি করিয়া আগেই সতর্ক করিয়া দেওয়ায় দু'জনেই বাঁচিয়া গেল।

বোমা ফাটিবার ফলে নিকটবর্ত্তী বহু গৃহ ধ্বসিয়া পড়িল। ওয়ার্ডেন ও জন—মাত্র দু'জনের পক্ষে এখানে উদ্ধার-কার্য্য সাধন করা অসম্ভব। ওয়ার্ডেনের অনুরোধে জন স্বল্পকাল মধ্যেই কোথা হইতে তাহাদের সাহায্যকারী একদল লোক জোগাড় করিয়া আনিল। কয়েক মিনিট পূর্ব্বেও যেখানে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা দণ্ডায়মান ছিল, ভগ্ন মুহূর্ত্ত মধ্যে অনেকগুলি হয় ভাঙিয়া পড়িল না-হয় বিকৃত রূপ ধারণ করিল। জন দেখিল—একটি বাড়ীর ভগ্ন অংশের মধ্যে দুইটি রমণী অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় রহিয়াছেন, সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিল। ইহার অব্যবহিত পরেই উক্ত বাড়ীটি ধ্বসিয়া পড়ে।

শত্রুবিমান চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে 'অল ক্লীয়ার' ধ্বনি হইল। ষোড়শবর্ষীয় বালক জন গৃহে ফিরিয়া গেল।

পর দিন জন সঙ্গীগণসহ আবার বাহির হইল। যে-সব পরিবারের অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে আটক হইয়া পড়িয়াছে তাহার উদ্ধারে তাহারা লাগিয়া গেল। ওয়ার্ডেন বলেন, জনের মত সাহসী কর্ম্মী যাঁহাদের পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা তাঁহাদেরই।

আর একজন স্কাউটের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য। তাহার নাম ডেনিস্ মেল্‌ভিল। ডেনিসের বয়সও মাত্র ষোল বৎসর। সে ছিল প্রহরীদের সর্দ্দার। এই কার্য্যেই তাহার জীবন সাঙ্গ হইয়াছে। এক অপরাহ্নে যখন সে নিজ কর্ম্মে ব্যাপৃত তখন সাইরেন বাজিয়া উঠে, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই অগ্নি-বোমা বর্ষণ আরম্ভ হয়। ডেনিস তখনই অগ্নিনির্ব্বাপক দলকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। আগুন নিবাইতে তাহার স্কাউটের শিক্ষা খুবই কাজে লাগিল। কয়েকটি অগ্নি-বোমা সে নিবাইতে সক্ষমও হয়। কিন্তু শেষে একটি নিবাইতে গিয়া ফাটিয়া যায় ও তাহার দেহে মারাত্মক চোট লাগে। ইহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

ডেনিসের মৃত্যুর পর তাহার সুকৃতির কথা আরও প্রচারিত হয়। নিজ অঞ্চলে যখনই বোমাবর্ষণ আরম্ভ



টুকরা কাগজ সংগ্রহে দুইজন অল্পবয়স্ক স্কাউট। এই টুকরা কাগজ দ্বারা বোমা প্যাক করিবার কার্ডবোর্ড প্রস্তুত হইয়া থাকে

হইত তখনই সে বাহির হইয়া পড়িত। কত অগ্নি-বোমা যে সে নিবাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার মাতা লিখিয়াছেন, "অন্যের সেবাই ছিল ডেনিসের ধর্ম্ম। সর্ব্বদা সানন্দে সে লোকের উপকারে লাগিয়া যাইত। প্রত্যেক কার্য্যেই সে নেতৃত্ব করিতে ভালবাসিত।"

আমরা এখানে যে দুই জন আদর্শ স্কাউটের কথা বলিলাম তাহারা মাত্র দুইটি বিভিন্ন ধরণের কার্য্যে লিপ্ত ছিল। বয় স্কাউটগণ ইদানীং এইরূপ কমবেশী দুই শত রকমের কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। বোমাবর্ষণের সময় ইহারা ত কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেই, বোমাবর্ষণের আগে ও পরে এমন বহুবিধ কাজ আছে, যাহাতে বিস্তর লোকের আবশ্যক। বয় স্কাউটরা সেই অভাব পূরণ করিতেছে। ধ্বংসস্তূপে প্রোথিত নরনারীদের উদ্ধার, আহত ও ক্ষত লোকদের সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা, বোমা-বর্ষণের পরে বিপন্নদের আশ্রয়স্থলে লইয়া যাওয়া ও তাঁহাদের খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন—এই রকম বিস্তর কাজে বয় স্কাউটদের সংঘবদ্ধভাবে লাগানো হইয়াছে। ইহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই বয়স কিন্তু ষোল বৎসরের কম।

যুদ্ধারম্ভ অবধি বয় স্কাউট সংঘ বোমাবর্ষণ কালে বীরত্ব প্রদর্শন হেতু এক শত ত্রিশ জন বয় স্কাউটকে পুরস্কৃত করিয়াছেন। বহু বয় স্কাউটের সুকৃতির কথা হয়ত এখন পর্য্যন্ত আমাদের গোচরেই আসে নাই। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে বয় স্কাউটদের কৃতিত্ব স্মরণীয়।*

* এফ, হেডেন ডিমকের "Britain's Boy Scouts' Aid to their Homeland" প্রবন্ধ অবলম্বনে

পুস্তক-পরিচয়

শ্রীশারীরক অধিকরণরত্নমালা—প্রকাশ সহিত। মাদ্রাজের তিরুপতি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্‌সিপাল মহামহোপাধ্যায় কলাপূর্ণ কপিস্থলম্ দেশিকাচার্য্য প্রণীত। পদুকোটা-নিবাসী পণ্ডিত এ, শ্রীনিবাস রাঘবন, এম-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। পৃ. ৬১৫, মূল্য ৩৲।

এই গ্রন্থখানি শ্রীরামানুজাচার্য্যের মতে মহর্ষি বেদব্যাসকৃত বেদান্ত-দর্শন বা ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের মুখ্য বিচার্য্য বিষয়ের সংগ্রহ। কলির প্রারম্ভে ব্যাসদেব তাঁহার বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে কতকগুলি স্বল্পাক্ষর বাক্য-রূপ সূত্রমাত্র রচনা করিয়া উপনিষদের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া একখানি দর্শনশাস্ত্র রচনা করেন। ইহাই সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছয়খানি বৈদিক আস্তিক দর্শনের মধ্যে প্রসিদ্ধ বেদান্তদর্শন নামে খ্যাত। ইহাতে তিনি সাংখ্যযোগ ন্যায় বৈশেষিক পূর্ব্বমীমাংসা পাঞ্চরাত্র ভাগবত পাশুপত বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি যাবতীয় আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনের মত খণ্ডন করিয়া বেদান্ত মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বহু দিন পরে এই সব সূত্রের অর্থ, ব্যাস-শিষ্য-সম্প্রদায় মধ্যে, লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক হয়। কিন্তু কালক্রমে এই সূত্রার্থের মধ্যেও মতভেদ ঘটিতে থাকে। ইহার ফলে বোধায়ন, উপবর্ষ, ব্রহ্মদত্ত প্রভৃতি বহুপ্রকার পরস্পরবিরুদ্ধ সূত্র-ভাষ্যের আবির্ভাব হয়। এইরূপ বিরোধের ফলে ক্রমে ক্রমে অপর বহু দার্শনিক মতগুলি প্রবল হইয়া উঠে। তাহার ফলে ব্রহ্মসূত্রের প্রচারও অল্প হইয়া যায়। এই ভাবে সহস্রাধিক বৎসর অতীত হইলে শকীয় সপ্তম শতাব্দীতে ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য প্রচারিত হয়। ইহাতে ব্রহ্ম-সূত্রের পূর্ব্বতন ভাষ্যাদির বিলোপ ঘটে, এবং অপর দার্শনিক মতগুলি নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া যায় এবং অদ্বৈত মতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শাঙ্কর ভাষ্যের দ্বারা অদ্বৈত-মতের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া প্রথমে ভাস্করাচার্য্য উপবর্ষ মতে এক ভাষ্য রচনা করিয়া অদ্বৈত মতের খণ্ডন এবং দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদ প্রচার করেন। ইহার প্রায় তিন শত বৎসর পরে রামানুজাচার্য্য বোধায়ন মতে এক বৈষ্ণব ভাষ্য রচনা করিয়া অদ্বৈত মতের খণ্ডন এবং বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রচার করেন। ইহার পর নিম্বার্কাচার্য্য কিঞ্চিৎ অন্যরূপ দ্বৈতাদ্বৈত-মতে একখানি বৈষ্ণব ভাষ্য রচনা করেন। এই সময় শৈব বিশিষ্টাদ্বৈত মতে শ্রীকণ্ঠ ভাষ্যেরও প্রচার হয়। ইহার পর মধ্বাচার্য্য দ্বৈতমতে আর একখানি বৈষ্ণব ভাষ্য রচনা করিয়া অদ্বৈত মত খণ্ডন করেন ও দ্বৈত মতের প্রচার করেন। এইরূপে শকীয় সপ্তম শতাব্দীর পর অর্থাৎ শাঙ্কর ভাষ্যের পর ব্রহ্মসূত্রের বহু ভাষ্যের আবির্ভাব হইতে থাকে। বস্তুতঃ এখনও পর্য্যন্ত এইরূপ নূতন নূতন ভাষ্যের জন্ম হইতেছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পরন্তু সকল ভাষ্যেই সূত্রের পাঠ, সূত্রের সংখ্যা, সূত্রের অর্থ এবং এই সব সূত্রের এক বা একাধিক মিলিত করিয়া যে এক-একটি বিচার্য্য বিষয় হইয়া থাকে, যাহা এই শাস্ত্রে অধিকরণ নামে পরিচিত, তাহাদের সংখ্যা ও তাৎপর্য্যে মত-ভেদ দৃষ্ট হয়। প্রায় সকলেই ভিন্ন ভিন্ন সূত্র দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণ রচনা করিয়াছেন। এই অধিকরণগুলিতে ৬টি অবয়ব থাকে, যথা—বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত, ফলভেদ ও সঙ্গতি। ইহার দ্বারা সূত্র-সমূহের অর্থ অতি সংক্ষেপে অতি স্পষ্ট ভাবে জানা যায়। এই জন্য ব্রহ্মসূত্রের অর্থাবগতি করিতে হইলে এই অধিকরণমালা-জাতীয় গ্রন্থের বিশেষ উপযোগিতা। কিন্তু তাহা হইলেও এই সব মতভেদ দেখিয়া আজ আর ব্যাসদেবের মত নিঃসন্দেহে জানিবার উপায় নাই। শাঙ্কর মতে সূত্র ৫৫৫ এবং অধিকরণ ১৯১টি। রামানুজ-মতে সূত্র ৫৪৫ এবং অধিকরণ ১৫৬টি। মাধ্ব-মতে ৫৬৪ সূত্র ২২৩ অধিকরণ। এইরূপ সকলের মতেই প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। অথচ এজন্য কেহ প্রাচীন প্রমাণ দেন নাই। শাঙ্কর ভাষ্যের সময় অর্থাৎ শকীয় ৭ম শতাব্দীতে তাঁহার মতে কোন অধিকরণমালা রচিত হইয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় না। কিন্তু প্রায় তিন শত বৎসর পরে শকীয় ১০ম শতাব্দীতে রামানুজ-ভাষ্যের সময় এই অধিকরণমালা বোধ হয় প্রথম রচিত হয়। শাঙ্কর মতের ও তন্মতে সূত্র ব্যাখ্যার সম্যক্ খণ্ডনাভিপ্রায়ে বোধ হয় রামানুজাচার্য্যই তাঁহার বেদান্ত দীপ নামক বৃত্তি গ্রন্থে এই অধিকরণ-মালার সন্নিবেশ করেন। তৎপরে প্রায় তিন-চারি শত বৎসর পরে খ্রীঃ ১৪শ

শতাব্দীতে শাঙ্কর মতে ভারতীতীর্থ এবং অমলানন্দ দুইখানি অধিকরণ-মালা গ্রন্থ রচনা করেন। এবং আরও কিছু পরে খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীতে রামানন্দ স্বামী ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী নামক টীকায় এবং রত্নপ্রভা নামক শাঙ্কর ভাষ্য টীকায় এই অধিকরণমালার কার্য্য সম্পন্ন করেন। আর ইহারও কিছু পরে খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীতে সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকা নামক সূত্রবৃত্তি গ্রন্থে এই অধিকরণ প্রচার করেন। শাঙ্কর মতে এই অধিকরণমালা যেমন বহু, রামানুজ মতেও ইহা তদ্রূপ বহু। শকীয় দশম শতাব্দীতে রামানুজাচার্য্য-কৃত বেদান্ত দীপ নামক অধিকরণমালার পর পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেঙ্কটাচার্য্যের অধিকরণ সারাবলী, এবং উনবিংশ শতাব্দীতে সুদর্শনাচার্য্যের অধিকরণমালা রচিত হয়। এক্ষণে এই উনবিংশ শতাব্দীতে মঃমঃ কপিস্থলম্ দেশিকাচার্য্যের আর একখানি ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিল। আলোচ্য গ্রন্থখানিই এই অধিকরণমালা। দেশিকাচার্য্য ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ৮৩ বৎসর বয়সে দেহ-রক্ষা করেন। মুখবন্ধমধ্যে অধ্যাপক পি, এন, শ্রীনিবাসাচারী এম-এ মহোদয় ইঁহার জীবনচরিত ও ইঁহার রচিত গ্রন্থাদির নাম প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহার সময় ইনি একজন অসাধারণ বহুমান্য পণ্ডিত ছিলেন। এই গ্রন্থে অধিকরণগুলি ইনি এমন ভাবে সাজাইয়াছেন এবং এমন যুক্তি-পূর্ণ ভাবে সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই গ্রন্থ দ্বারা রামানুজ-মতে সূত্রার্থ বুঝিবার যে বিশেষ সুবিধা হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহার প্রত্যেক অধিকরণের শেষে একটি শ্লোকে অধিকরণের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়া ইনি তাঁহার উপাস্য দেবতা তিরুপতির শ্রীনিবাস ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়াছেন। ইনি যেমন পণ্ডিত তেমনি ভক্ত ও সাধক ছিলেন। গ্রন্থখানি আরও ভাল হইত যদি ইহাতে অন্য মতের ব্যাখ্যার সহিত ইহার একটি তুলনামূলক আলোচনা থাকিত।

সম্পাদক মহাশয় ইহার সম্পাদনকার্য্যে অশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থশেষে ১। অধিকরণরত্নমালার শ্লোকসূচী, ২। প্রকাশ নামক টীকার শ্লোকসূচী, ৩। সূত্রসূচী, ৪। উদ্ধৃত বাক্যের আকর নির্দ্দেশ, ৫। সূত্রমধ্যে নামসূচী, ৬। বিষয় বাক্যসূচী, ৭। বত্রিশ প্রকার ব্রহ্মবিদ্যা বর্ণন, ৮। কাম্য বিদ্যার নির্দ্দেশ, এবং ৯। শ্রীভাষ্যের অনুকূল গ্রন্থাদির পরিচয় প্রদান করিয়া পাঠকের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে অধিকরণের নাম ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ প্রদান করিয়া গ্রন্থপাঠে সহায়তা করা হইয়াছে। এইরূপে এই গ্রন্থখানি বেদান্তশাস্ত্র-আলোচনাকারীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী যে হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

চিদ্‌ঘনানন্দ

আত্মপরিচয় —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

কবিগুরুর অনেক লেখা এখনও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থালয় সেগুলি সংগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি এইরূপ একটি সংকলন।

'আত্ম-পরিচয়' কবির অন্তর্জীবনের পরিচয়। ইহার প্রথম প্রবন্ধটি ৺হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনা অনুভূতিপ্রধান। কাজেই তাহা

ভাল ভাবে বুঝিতে হইলে তাঁহার বিভিন্ন সময়ের মনোভাব বা মনোগতি বুঝা দরকার। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি নিজেই এই বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন, মনের গতিপথের ইঙ্গিত দিয়াছেন। না হইলে তাঁহার কাব্যের ইতিহাস অনেকটা অস্পষ্ট রহিয়া যাইত।

"বাহির হইতে দেখো না এমন ক'রে, আমায় দেখো না বাহিরে",—বহির্জীবন অপেক্ষা কবির ভাবজীবনই পাঠকের নিকট অধিকতর মূল্যবান্। তাই নিজের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি 'আত্মপরিচয়ে' "বৃত্তান্তটা বাদ" দিয়াছেন। "কেবল কাব্যের মধ্য দিয়া" তাঁহার কাছে "জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা" করিয়াছেন।

বিভিন্ন সময়ে লিখিত ছয়টি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। প্রথমটির রচনাকাল বাংলা ১৩১১ সাল—কবির বয়স তখন তেতাল্লিশ। দ্বিতীয়টির ১৩১৮—তাঁহার পঞ্চাশৎপূর্ত্তির সময়। তৃতীয়টির ১৩২৪—রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত সম্বন্ধে জনৈক সমালোচকের মন্তব্যের উত্তরে ইহা লিখিত হইয়াছিল। চতুর্থটির ১৩৩৮—তাঁর সপ্ততিপূর্ত্তির দিন। পঞ্চমটির ওই একই বৎসর,—কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জয়ন্তী উৎসবে কবির ভাষণ। আর ষষ্ঠটির ১৩৪৭ সাল, মৃত্যুর পূর্ব বৎসর 'জন্মদিন' উপলক্ষে ইহা রচিত।

কবির চিন্তাধারার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পক্ষে প্রবন্ধ কয়টি অপরিহার্য। পঞ্চম প্রবন্ধ 'জয়ন্তী উৎসবের ভাষণে' কবির বাল্য-জীবনের স্মৃতি, জীবনগঠনে সেদিনের পরিবেশের প্রভাব, অনুভূতি-রঞ্জিত হইয়া সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

উপসংহারে মুদ্রিত পত্রে কবি তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-জীবনের অনুরাগীমাত্রেরই নিকট এই গ্রন্থ পরম মূল্যবান্।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মাধবীর জন্য—প্রতিভা বসু। কবিতা-ভবন। মূল্য ১৮০।

লেখিকার প্রথম গল্পের বই প'ড়ে বিস্মিত হতে হয়। তার কারণ এতে ভাষার সৌকর্য, স্বকীয়তা এবং ঘটনা জমাবার শিল্প অসামান্য পরিণতরূপে দেখা দিয়েচে। বাঙালি মেয়ের ছবিতে ভরা ছয়টি গল্প। আধুনিকার মর্মকথা দৃঢ় রেখায় আঁকা পড়ল, অথচ রঙে রসে রচিত নবযুগের চিত্রণে একটি পরিবেদনশীল সূক্ষ্মতা আছে যা সাম্প্রতিক হলেও চিরকালের। গল্পের পরিবেশ প্রধানত মধ্যবিত্ত কলকাতায়, কিন্তু বিচিত্র সাংসারিক সূতোয় গ্রন্থি বাঁধা হয়েচে; "দৈবাৎ" গল্পটি পূর্ববঙ্গীয় গ্রাম্য। "মুক্তির" এবং "নিরুপমার চোখ" সব চেয়ে নিখুঁৎ, কারুদক্ষতায়; ছোট গল্পের বিশেষ একটি লগ্ন আছে, সেই মুহূর্তটিকে চমৎকার ফোটানো হ'ল। প্রতাপের মতো পুরুষ আধুনিক গল্পে দুর্লভ্য—জীবন্তেও কি তাই—"মুক্তি"র এই প্রতাপ, এবং "দৈবাৎ"-এর অরুণকে দেখলে তাই এত উৎসাহ জাগে। "পরিশেষ"-এর অরবিন্দ খাঁটি পতি-জাতীয় পুরুষ, তার পরিবর্তন হোলো সত্য, কিন্তু যে-ভাবে ঘট্‌ল তা একটু আকস্মিক মনে হয়। মেয়েদের অনন্যতাই গল্পগুলির প্রধান উপকরণ। বিবিধ মানসিক আর্থিক সমস্যার যোগে তাদের চরিত্রচিত্রণে লেখিকা অন্তর্দৃষ্টিশক্তি দেখিয়েচেন। মনস্বিনী তেজস্বিনী এমন বাঙালি মেয়ের পরিচয় আধুনিক সাহিত্যে বিরল। গৃহদীপে যে অগ্নিশিখা আছে পুরুষেরা যদি তা ভোলে, নারীত্বের নূতন প্রকাশে

তাদের ভুল ভাঙুক ; অতি দুঃখের মধ্যেও গৃহরক্ষার সেইটে উপায়। প্রাণপ্রজ্বলন্ত নারীর মূর্তি দেখে ধন্য হই। স্বাধীন যুগের কড়া আলো? হোক। স্তিমিত দীপের ব্যাখ্যান আমরা চাই না। বইয়ের নামিক গল্পে মাধবী কড়া মেয়ে—বকুল আসলে তারও চেয়ে স্বাধীন তাই কম কড়া হওয়া তার সাধ্য—লেখিকা দুইয়েরই মন চেনেন। "অনর্থক" গল্পের "আমি" আশ্চর্য সৃষ্টি ; ঐ যে সাধ্বীর শক্তি, অথচ বান্ধবীরূপেও দ্বিধা বাল্যবন্ধুকে কষ্ট দিতে—তবু কষ্ট দেওয়াই কম কষ্টের সত্য পথ—কী সুন্দর তা ফুটেচে।

ছোটো গল্পের উৎকর্ষ আধুনিক বাংলা রচনার অন্যতম ঘটনা, "মাধবীর জন্য" বইখানি সেই সৃজনধর্মী ঘটনার ধারায় বিশিষ্ট নূতন আগন্তুক।

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী

দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নার্স-বাহিনীর অধ্যক্ষা কর্ণেল ফ্লোরেন্স এ. ব্লান্সফিল্ড

পৃথিবীর বহু অঞ্চলে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র-বাহিনী বর্ত্তমানে যুদ্ধে ব্যাপৃত। এই সব অঞ্চলে বিভিন্ন সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তেইশ হাজার নার্স সেবাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহাদের অধ্যক্ষা হইলেন কুমারী কর্ণেল ফ্লোরেন্স এ. ব্লান্সফিল্ড মহোদয়া। তিনি নিজ কৃতিত্ব গুণে সামান্য নার্স হইতে ধীরে ধীরে অতীব দায়িত্বপূর্ণ এই পদে উন্নীত হইয়াছেন। তাঁহার জীবনকাহিনী যেমন মনোরম তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক।

ব্লান্সফিল্ড মহোদয়ার বয়ঃক্রম বর্ত্তমানে উনষাট বৎসর। ইহার মধ্যে



কর্ণেল ফ্লোরেন্স এ, ব্লান্সফিল্ড

ছত্রিশ বৎসরই তিনি নার্সের কার্য্যে কাটাইয়াছেন। তিনি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হইবেন, প্রথম জীবনে এই-ই ছিল তাঁহার সঙ্কল্প। কিন্তু ১৯০২ সালে তাঁহার অভিভাবক অগ্রজ ভ্রাতার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হয়। তিনি ঐকান্তিকভাবে ভ্রাতার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। যে-ডাক্তার ভ্রাতার চিকিৎসা করেন তাঁহারই উপদেশে ব্লান্সফিল্ড নার্সের বৃত্তি গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন।

শিক্ষাকার্য্য সমাপ্ত হইলে ১৯০৭ সালে তিনি নার্সের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। স্বদেশে বিভিন্ন হাসপাতালে নার্সের কার্য্য করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বিগত মহাসমরের মধ্যে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রান্সের এ্যাঙ্গার্সে সাতাশ সংখ্যক বেস্ হাসপাতালে তিনি নার্সের কার্য্য লইয়া যান। ১৯১৯ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং পেন্‌সিলভেনিয়া হাসপাতালে পূর্ব্ব কার্য্যে বাহাল হন। তিনি সেখানে একটি নার্সিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এক বৎসর পরে তিনি পুনরায় সামরিক নার্স-বাহিনীতে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বহু সামরিক হাসপাতালে ও সামরিক ঘাঁটিতে গমন করেন। ফিলিপাইন্‌স্ ও

চীনের তিয়েনসিনেও তিনি কর্ম্মোপলক্ষে যান। ১৯৩৫ সাল হইতে সাত বৎসর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সার্জ্জন জেনারেলের আপিসে নিয়োজিত ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্র বর্ত্তমান মহাসমরে অবতীর্ণ হইলে কুমারী ব্লাসফিল্ড লেফ্টেন্যাণ্ট কর্নেল পদে নিযুক্ত হন এবং সামরিক নার্স-বাহিনীর অধ্যক্ষা জুলিয়া ও. ফ্লিকের প্রথম সহকারিণী হন। বর্ত্তমান ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে তিনি বর্ত্তমান পদে উন্নীত হন। এই অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সামরিক নার্স-বাহিনীতে নূতন উদ্যম, উৎসাহ ও প্রেরণা দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ভারতবর্ষ

পরলোকে বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙ্গালী

টাটানগরের ওয়েলফেয়ার অফিসার সুস্থিরকুমার বসু মহাশয় গত ৮ই জুন কলিকাতায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের ভিতর যে সকল ব্যক্তি নিজের অধ্যবসায় ও চেষ্টায় যশস্বী ও কৃতী হইয়াছেন সুস্থিরকুমার বসু তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ছাত্রজীবন হইতেই নানা প্রকার সামাজিক ও জনহিতকর কর্ম্মে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ইউনিভারসিটি ইন্স্টিটিউটের বিশিষ্ট সভ্য ও কর্ম্মী ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানেই সুকণ্ঠ গায়ক, সুমধুর আবৃত্তিকার ও সুঅভিনেতা হিসাবে তাঁহার প্রতিভা প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষ্যে ৺সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৺কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন ও প্রত্যেক বড় স্বদেশী সভাতে তাঁহার সুমিষ্ট গান সকলের আকর্ষণের বিষয় ছিল।

তিনি টাটানগরে চাকরি লইবার পর তাঁহার কর্ম্মপ্রেরণা ও সংগঠনের ক্ষমতা বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরিস্ফুট হইবার সুযোগ পায়। জীবনের



সুস্থিরকুমার বসু

অর্দ্ধেকেরও বেশী সময় তিনি টাটানগরের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রথমে ইলেক্ট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে যোগ দিয়া তিনি নিজের প্রতিভাগুণে ক্রমশঃ ওয়েলফেয়ার অফিসার পদে উন্নীত হন। তিনিই

সর্ব্বপ্রথম এই পদ লাভ করেন। তিনি এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ওয়েলফেয়ার অফিসার রূপে তিনি টাটা কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের বাৎসরিক শিশু ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী, খেলা-ধূলা ও প্রতিযোগিতার যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেগুলি খুবই সাফল্য লাভ করিয়াছিল। শুধু কোম্পানীর সাক্ষাৎ সম্পর্কিত কাজ ছাড়াও তিনি জামসেদপুরের সকল প্রকার সামাজিক ও জন-হিতকর কর্ম্মে অগ্রণী ছিলেন। "মিলনী"র গঠনে ও রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহার আগ্রহ, যত্ন ও দান জামসেদপুরবাসীরা বহুকাল স্মরণ করিবে। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের টাটানগর অধিবেশনের সময় ইহার অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক হইয়াছিলেন। সেবাপরায়ণতা, আতিথেয়তা, কর্ম্মকুশলতা প্রভৃতি গুণ তাঁহার চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল।

প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব

শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবার দিল্লী য়ুনিভার্সিটির এম্-এ (ইকনমিক্স্) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় স্বর্ণপদক ও য়ুনিভার্সিটির বৃত্তি পান। আই-এস্‌সি পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া তিনি বৃত্তি পাইয়া-



অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

ছিলেন। বি-এ পরীক্ষাতেও তিনি অর্থশাস্ত্রে অনার্সে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান প্রাপ্ত হন। অরুণকুমার স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় উপর্য্যুপরি তিন বৎসর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

বাংলা

বিষ্ণুপুর সঙ্গীত কলেজ

বিষ্ণুপুরের "অনন্ত সঙ্গীত বিদ্যালয়" বাঙ্গলা দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের মধ্যে অন্যতম। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ এই বিদ্যালয় বাঙ্গলার সঙ্গীত-শিক্ষা-বিস্তারে যে সাহায্য করিয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্গত অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তদীয় পুত্র রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন এবং বহুদিন যাবৎ ইহা সরকারী সাহায্যে পরিপুষ্ট। পূর্ব্বে এই বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র বালকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু এই বৎসর হইতে বালিকাদিগের জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং এই জুলাই মাস হইতে কলেজের শ্রেণী খোলা হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীগণ উক্ত কলেজ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য-তালিকা সমাপ্ত করিয়া মানপত্র ও ডিগ্রী লাভ করিবেন। নবনির্ম্মিত কলেজ-গৃহের সহিত ছাত্রাবাসও শীঘ্র নির্ম্মিত হইবে। বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন এবং স্কুল ও কলেজের শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় গঠনকার্য্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সঙ্গীত বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা এবং কলিকাতার বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সঙ্গীত শিক্ষা কার্য্যে তাঁহার দান সর্ব্বজন-বিদিত। বিষ্ণুপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আই, এ, আলি, আই-সি-এস, এই কলেজের উন্নতির জন্য আন্তরিক চেষ্টা ও নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন। সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্প চর্চ্চার কেন্দ্ররূপে বিষ্ণুপুর এক সময়ে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ছিল। এইরূপ একটি উচ্চ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে আশা করা যায়।

পরলোকে রমণীমোহন দত্ত

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব রেভিনিউ অফিসার ও কণ্ট্রোলার অফ্ মার্কেটস রমণীমোহন দত্ত মহাশয় গত ১৯শে জুন তাঁহার টালিগঞ্জস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। মাত্র নয় বৎসর বয়সে তাঁহার পিতাকে হারাইয়া স্বকীয় চেষ্টা, উদ্যোগ ও অধ্যবসায় দ্বারা বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি ১৮৯৮ সালে ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পাস করেন। এম-এ পাস করিয়া কয়েক বৎসর সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে হেড্‌মাষ্টারের পদে কাজ করিবার পর ১[illegible]৭ সালে তিনি কর্পোরেশনের কাজে যোগদান করেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত তাঁহার কার্য্য পরিচালনা করেন। কর্পোরেশনের মার্কেট-সমূহের, বিশেষতঃ হগ মার্কেটের প্রভূত উন্নতি তাঁহার চেষ্টাতেই সম্ভব হইয়াছে। কর্পোরেশনের কার্য্যের পর তিনি কিছুদিন ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় কাজ করেন।

হুগলী ব্যাঙ্ক

হুগলী ব্যাঙ্কের ১৯৪২ সালের ব্যালান্স শীটে দেখা যায় যুদ্ধের এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যেও ব্যাঙ্কটি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই এক বৎসরে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। চলতি মূলধন গত বৎসর অপেক্ষা সাড়ে আট লক্ষ বাড়িয়া এবার ৫৭ লক্ষ হইয়াছে। সুদের হার কমানো সত্ত্বেও জমার টাকা বাড়িয়াছে; ইহা ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণের আস্থার পরিচয়। বর্ত্তমান অবস্থা কখন কি ঘটিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই বলিয়া ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ টাকা লগ্নী সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। এই বৎসরে ৬৯ হাজার টাকার নূতন শেয়ারও বিক্রয় হইয়াছে। রিজার্ভ ফাণ্ড গত বৎসর ছিল এক লক্ষ টাকা। এবার উহা বাড়িয়া ১,২৭,৫০০৲ টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কের এই উন্নতিতে অংশীদারেরাও লাভবান্ হইয়াছেন। গত বৎসর তাঁহারা লভ্যাংশ পাইয়াছিলেন শতকরা ৯৲ টাকা, এবার পাইয়াছেন ১০৲ টাকা।



মাছ ধরা

[redacted]

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৩শ ভাগ, ১ম খণ্ড | ভাদ্র, ১৩৫০ | ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি

আধুনিক রাষ্ট্রে নরনারীর অন্নবস্ত্র সংস্থানের প্রাথমিক দায়িত্ব গবন্মে´ণ্টের। যে রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত উপার্জনের বিভিন্ন পথ, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিবিধ আইনের বেড়াজালে কণ্টকিত, সেখানে গবন্মে´ণ্টের দায়িত্ব আরও বেশী। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনসাধারণের মতামতের মূল্য নাই বলিয়া এখানে গবর্ন্মেণ্ট নিজের আপাত প্রয়োজন মিটাইতে এবং বিলাতী কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে ব্যস্ত, অন্নহীনকে অন্নদান ও বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদানের জন্য যে স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন তাহাতে সে কুণ্ঠিত। দুর্ভিক্ষের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বাঙালী মর্ম্মে মর্ম্মে এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছে। আত্মনির্ভরশীলতা ছাড়া তাহার বাঁচিবার অন্য পথ নাই ইহা সে ভাল করিয়া বুঝিয়াছে সেই দিন যেদিন বাংলার লাটের স্বহস্তে গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত খাদ্যসচিব প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন, "গবন্মে´ণ্টের পানে তাকাইও না। বুভুক্ষু নরনারী শিশু ও বৃদ্ধকে আহার্য বিতরণের ভার তোমরা নিজেরা গ্রহণ কর।"

গবন্মে´ণ্টের আশায় বাংলা দেশ বসিয়াও থাকে নাই। অনাহারে মৃত্যুর দৃষ্টান্ত পথে পথে চক্ষুর উপর দেখিয়া হৃদয়বান্ ভারতবাসী মাত্রেই যথাসাধ্য তাহাদের দুঃখ লাঘবে অগ্রণী হইয়াছেন। বাঙালী-অবাঙালী-নির্বিশেষে কলিকাতার ধনী-নির্ধন যাঁহার যাহা সাধ্য তিনি তাহাই দান করিয়া বিনামূল্যে আহার্য বিতরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। নববিধান রিলিফ মিশন, দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার, মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটি, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি সর্বজনপরিচিত বহু প্রতিষ্ঠান এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; কলিকাতা রিলিফ কমিটি, বেঙ্গল রিলিফ কমিটি প্রভৃতি নূতন প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠিয়াছে। পাড়ায় পাড়ায় ছাত্র ও যুবকেরা এই পুণ্যকার্য্যে সাধ্যানুসারে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষে সর্ব্বস্ব হারাইয়া যাহারা পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাদের সেবার চেয়ে বড় পুণ্যকার্য্য আর নাই। ঈশ্বর আজ আমাদের নিকট হইতে পূজা চান, প্রীতি চান এবং আমাদের প্রীতির দান চান। মানবসেবার পুণ্যব্রতে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, সর্ব্বহারা নরনারীর অশ্রুধারার শব্দে যাঁহারা আকুল হইয়াছেন, তাঁহাদের কর্ম্ম সার্থক হউক, বাহুতে শক্তি সঞ্চারিত হউক, হৃদয় আরও প্রসারিত হউক।

—

আর্ত্তত্রাণে খাদ্যের ব্যবস্থা

কলিকাতা রিলিফ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী স্বল্পতম ব্যয়ে বহু লোককে পুষ্টিকর আহার্য্য দিবার যে পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। ইনি এক প্রকার খিচুড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন যাহা সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর অথচ যাহার দ্বারা দশ টাকারও কম ব্যয়ে ১৫০ জন লোককে খাওয়ানো যায়। খিচুড়ীর প্রস্তুত-প্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল। দৈনিক পত্রিকাগুলি ইহা ছাপিলে মফস্বলের জনসেবা-প্রতিষ্ঠানগুলিরও সুবিধা হইতে পারে।

চাউল	৮ সের	৩।০ টাকা
মুসুরির ডাল অথবা বাজরা অথবা জোয়ার	৩ সের	১।/০ আনা
পেঁয়াজ	২ সের	।৶০ ,,
কুমড়া ২টি	৬ সের	।৶০ ,,

ডাঁটা	২ সের	।৵০	„
মিষ্টি আলু	৪ সের	১৲	
ছাতু	৴॥০ সের	।৵০	„
হলুদ ও লঙ্কা		।৶০	„
লবণ	২ সের	।৴০	„
গুড়	৴॥০	।৴০	„
সঃ তৈল	৴।০	।০	„
কৃষ্ণ তিল	৴১	॥০	„

বিস্কুটের গুঁড়া অথবা শটি ফুড পাওয়া গেলে ২ সের গুঁড়া বা শটি দিয়া এক সের চাউল বাদ দেওয়া যায়। চারি শত পঞ্চাশ জনের আহার্য্য প্রস্তুত করিতে কয়লা ও রান্নার ব্যয় পড়ে ছয় টাকা।

উল্লিখিত প্রণালীতে প্রস্তুত খিচুড়ী কতখানি পুষ্টিকর (Food Value কত) নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

প্রতি এক শত গ্রামে (দেড় ছটাকে) খাদ্যপ্রাণ

	প্রোটিন	স্নেহ পদার্থ	কার্ব্বো-হাইড্রেট	ক্যালোরি	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লৌহ
চাউল	৬·৪	০·৪	৭৯·২	৩৭১	০ ০১	০·১৫	০·৭৫
মুসুরির ডাল	২৫·১	০·৭	৫৯ ৭	৩৭১	০·১৩	০·২৫	৩·১৪
বাজরা	১১·৬	৫·০	৬৭·১	৩৬০	০·০৫	০·৩৫	৮·৮
কৃষ্ণ তিল	১৮·৩	৪৩·৩	২৫·২	৫৮১	১·৪৫	০·৫৭	১০·৫
ছাতু	২·৫	৫·২	৫৮·৯	৩৯৭	০·০৭	০·৩১	৮ ৯
মিষ্টি আলু	১·২	০·৩	৩১·০	১৩৫	০·০৩	০·০৫	০ ১

চাউল ও ডাইলের যে দর ধরা হইয়াছে জনসেবা-প্রতিষ্ঠান বিনামূল্যে খিচুড়ী-বিতরণ-কেন্দ্র খুলিলে গবন্মেণ্ট তাঁহাদিগকে ঐ দরে চাউল ও ডাইল দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

—

বড়লাটের বিদায়-বক্তৃতা

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো যে বিদায়-বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার প্রতি ছত্রে হতাশা ও ব্যর্থতার সুর প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। দীর্ঘ সাড়ে সাত বৎসর যে গুরু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার তিনি বহন করিয়াছেন, তাহার ভিতর একটি বারের জন্যও তিনি ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। বড়লাটরূপে বোম্বাইয়ে অবতরণ করিয়া ভারতবর্ষের কৃষির উন্নতির যে-সব প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা রক্ষিত হয় নাই। যুদ্ধের মধ্যে তীব্র অসুবিধা সহ্য করিয়াও ব্রিটেন তাহার কৃষিকার্য্যের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছে, দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন অনেক বাড়াইয়াছে, কিন্তু কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে লর্ড লিনলিথগো সাড়ে সাত বৎসর সময় পাইয়াও তাহার কোন উন্নতি করিতে পারিলেন না। বিদায় গ্রহণের সময় রাখিয়া গেলেন দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ। বৈদেশিক শাসনযন্ত্রের প্রধান এজেণ্ট রূপে তিনি এ দেশে কাজ করিয়া গিয়াছেন এবং ভারত-ত্যাগের প্রাক্কালে হতাশ ডিপ্লোম্যাটের ন্যায় তাঁহার অক্ষমতা ও ব্যর্থতার দায়িত্ব ভারতবাসী ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:

"যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে আমি সমস্ত দলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাহাতে কোন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না হয় তজ্জন্যও আমি চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ইহা দুঃখের বিষয় যে আমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এখনও আমাদের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে।"

লর্ড লিনলিথগো কোন সময়েই সকল দলকে একত্র করিবার চেষ্টা করেন নাই। সর্ তেজ বাহাদুর সপ্রু, ডাঃ জয়াকর প্রমুখ ধীরবুদ্ধি নেতৃবৃন্দ পর্য্যন্ত তাঁহার আন্তরিকতায় আস্থা হারাইয়াছিলেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে তিনি একত্র হইতে উৎসাহ দেন নাই, বরং মহাত্মা গান্ধী মিঃ জিন্নার নিকট পত্র লিখিলে উহা আটকাইয়া কংগ্রেস-লীগ-মিলনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন। কংগ্রেস ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের যুদ্ধের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিয়াছিল, ঐই দাবীর উত্তর না পাইয়া কংগ্রেস অসহযোগের পথ বাছিয়া লইতে বাধ্য হয়। "ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহাতে কোন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না হয়" সেজন্য তিনি আন্তরিক চেষ্টা করেন নাই, করিলে ভারতবর্ষে আজ এই রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দিত না।

বড়লাট বলিয়াছেন, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এখনও

আমাদের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। এই গোলযোগ সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই সৃষ্টি। কংগ্রেসের বোম্বাই প্রস্তাব পাসের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিয়া যে চূড়ান্ত অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তৎপরবর্তী গোলযোগ তাহারই ফল।

লর্ড লিনলিথগোর সব চেয়ে বড় ব্যর্থতা তাঁহার আমলে ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের অবলুপ্তি। সাড়ে সাত বৎসর পরে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের যে-সব সদস্যের সম্মুখে বক্তৃতা করিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা নির্বাচিত হইয়াছিলেন লর্ড লিনলিথগোর ভারতে আগমনের পূর্বে। গত নয় বৎসরের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্বাচন হয় নাই। পরিষদের প্রগতিশীল বহু সদস্য দীর্ঘকাল যাবৎ কারারুদ্ধ। সাতটি প্রদেশ প্রায় চারি বৎসর গবর্ণরের স্বেচ্ছাতন্ত্রের অধীন ছিল, সম্প্রতি অবশ্য বহু কংগ্রেসী সদস্যের অনুপস্থিতির সুযোগে দুইটি প্রদেশে মন্ত্রী-সভা গঠন সম্ভব হইয়াছে। প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলিতে ১৯৪২ সালে যে নির্বাচন হইবার কথা ছিল, অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাহাও স্থগিত রাখা হইয়াছে। অজুহাত যুদ্ধ। অথচ এই যুদ্ধের মধ্যেই আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচন হইয়াছে। আয়র্লণ্ডে, অষ্ট্রেলিয়ায় এবং দক্ষিণ-আফ্রিকাতে নির্বাচন স্থগিত থাকে নাই। ইংলণ্ডে নির্বাচনের কথা উঠে না, কারণ সেখানে সমগ্র দেশ এক ব্যক্তির উপর যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, নির্বাচনের অর্থ তাহারই দলকে জয়যুক্ত করা। পার্লামেন্টের প্রকাশ্য বা গোপন অধিবেশনে মিঃ চার্চিল যুদ্ধ পরিচালনা সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে কখনও দ্বিধা করেন নাই, পার্লামেণ্ট এবং জনসাধারণ উভয়েই ইহাতে সন্তুষ্ট।

কিন্তু ভারতবর্ষের কথা আলাদা। এখানে যুদ্ধ পরিচালন এবং যুদ্ধোত্তর কালের সংগঠন সম্বন্ধে গবর্ন্মেণ্টের বিরোধী মতপোষক বহু ব্যক্তি রহিয়াছেন। আয়র্লণ্ড এবং দক্ষিণ-আফ্রিকাতেও ঠিক এই অবস্থা। সাধারণ নির্বাচনের দ্বারা আয়র্লণ্ডে যুদ্ধে নিরপেক্ষতাকামী দল এবং দক্ষিণ-আফ্রিকায় যুদ্ধে সহযোগী দল জয়যুক্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু দুই দেশেই তাঁহাদের বিরোধী পক্ষ ইহাতে আপন বক্তব্য দেশকে শুনাইবার সুযোগ পাইয়াছে। ভারতবর্ষে নির্বাচন বন্ধ করিয়া গবর্ন্মেণ্টের বিরোধী মত ও ধারণা আলোচনা ও প্রকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। গণতন্ত্রের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার পথ ইহা নহে—কিন্তু লর্ড লিনলিথগোর আমলে ইহাই ঘটিয়াছে।

—

ব্যর্থতার জন্য দায়ী বড়লাট ও ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা—ভারতবাসী নহে

বড়লাট দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, যে, "এত চেষ্টা সত্ত্বেও যুদ্ধের এই চারি বৎসরে আমরা লক্ষ্যস্থলের নিকটবর্তী হইতে পারি নাই। এই সকল আভ্যন্তরীণ অনৈক্য, সাম্প্রদায়িক রেষারেষি, শ্রেণীগত উচ্চাভিলাষ ও ঈর্ষার ঊর্দ্ধে ভারতকে এবং সকলের সমষ্টিগত স্বার্থকে স্থান দানে অনিচ্ছা এখনও অগ্রগতির পথ রোধ করিয়া আছে। ইহা চিরকাল আমার নিকট গভীর নৈরাশ্যের কারণ হইয়া থাকিবে। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের ক্ষমতা হস্তান্তরের অনিচ্ছার দরুণ ঐ সকল অনৈক্যের সৃষ্টি হয় নাই। বরং গবর্ন্মেণ্ট ভারতবাসীদের হাতে ক্ষমতা অর্পণে প্রস্তুত আছেন বলিয়াই এই সকল অনৈক্য দেখা দিয়াছে। এ কথা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি। ঐ সকল মতভেদ আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে মর্ম্মান্তিক। আরও দুঃখের কারণ এই যে, ঐ সময়ের মধ্যে কোন ভারতীয় দলই গঠনমূলক কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই। সমস্যার সাময়িক অথবা চূড়ান্ত সমাধানের জন্য গঠনমূলক প্রস্তাব উত্থাপনের সমগ্র দায়িত্ব ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট এবং আমার ঘাড়ে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে।

"আমরা সকলকেই যথাসাধ্য সাহায্য করিবার ঐকান্তিক আগ্রহে একে একে কয়েকটি প্রস্তাবই করিয়াছি এবং পরস্পর-বিরোধী দাবীগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিয়াছি। শত শত বৎসর পার্লামেণ্টারী গবর্ন্মেণ্ট পরিচালনালব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে সর্বোৎকৃষ্ট প্রস্তাব উদ্ভাবন করিয়া আমরা তাহা অকপটে ভারতবাসীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছি।

"প্রচলিত পদ্ধতি (যুদ্ধের চাপ থাকা কালে ইহা অনুসৃত হইতে পারে না) এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে শাসনতন্ত্র রচিত হয়, এই সকল শাসন-সংস্কার তাহার অনুকল্পরূপে গৃহীত হইতে পারে না। কোন সোজা পথ অবলম্বন করিলে বর্ত্তমানের ঐক্য এবং যুদ্ধোত্তর সমস্যার সমাধানে উভয়ের পক্ষেই তাহা বিপজ্জনক হইবে। এখন আমরা যেখানে পৌঁছিয়াছি সেখানকার প্রকৃত সমস্যা হইতেছে ভবিষ্যতের সমস্যা। আমাদিগকে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে, পিছনে তাকাইলে চলিবে না। ভারতের নিজেরই সমাধানের উপায় আবিষ্কার করা প্রয়োজন। আজ আমি বন্ধুভাবে এবং অকপটে বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। আমি পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও স্পষ্টভাবেই বলিতেছি যে, যাঁহারা দেশের

কল্যাণের জন্য সহযোগিতা করিতে চাহেন, গবর্ন্মেণ্টের সহিত তাঁহাদের সহযোগিতা করার পথ সর্বদাই খোলা আছে। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট এবং রাজপ্রতিনিধি পূর্বের ন্যায় এখনও সাহায্য করার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু ইহার দায়িত্ব ভারতের এবং তাহার নেতৃবৃন্দ ও তাহার জাতীয় জীবনের প্রধান ব্যক্তিদিগের উপর রহিয়াছে। দেশের প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনৈক্য, বিশ্বাসের অভাব এবং সংখ্যাল্প সম্প্রদায়সমূহের, বিভিন্ন দলের কিংবা বিভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ন্যায্য দাবী পূরণে অনিচ্ছাই যে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করিয়াছে, কেবল ভারতবাসীরাই তাহা দূর করিতে পারে। শাসনতান্ত্রিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা থাকিলে ভারতের জননেতাদিগকে একত্র পরামর্শ করিয়া সেই পথ পরিষ্কার করিতে হইবে। ইহা আমার ঐকান্তিক অনুরোধ এবং আমার এই কথাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মনে করিবেন। যুদ্ধোত্তর যুগ দ্রুত নিকটবর্তী হইতেছে। যুদ্ধের পর ভারতীয় নেতৃবৃন্দ দেশের জাতীয় জীবনের প্রধান ব্যক্তিদিগের সকলের সমর্থনক্রমে একটি বৈঠকে একত্র হইয়া শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিবেন বলিয়া ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট যে আশার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা আপনাদের স্মরণ থাকিবার কথা। এইরূপ পরামর্শের সময় উপস্থিত হইলে কি দেখা যাইবে যে, ভারতীয় নেতারা তাহার জন্য প্রস্তুত হন নাই? একটি দিনও বৃথা ক্ষেপণ না করিয়া কাজে লাগিয়া যাওয়া, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা এবং যে মতভেদ বর্তমানের অগ্রগতি রোধ করিয়াছে, দলের সহিত দলের, সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়ের অনৈক্য সৃষ্টি করিয়াছে, আলোচনা চালাইবার জন্য প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে সেই অনৈক্য নিরসনের উপায় উদ্ভাবন কি বিজ্ঞজনোচিত নহে?

"একমাত্র তাঁহারাই (বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ) এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। ইহা না করার দায়িত্ব নেতৃবৃন্দের, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের নহে। সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহাদের সম্মুখে সমস্ত পথ খোলা রহিয়াছে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে কোন প্রস্তাব উত্থাপিত না হওয়ায় ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট সময় সময় যে-সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা যদি মোটামুটিভাবে ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নাই হয়, তবে যথাযোগ্য আলোচনান্তে উহার পরিবর্তে অন্য কোনরূপ শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব উত্থাপনে তাঁহাদের কোন বাধা নাই। ভারতের বিভিন্ন দলের মধ্যে ঘরোয়া আলোচনার দ্বারা সকলের সমর্থন লাভ করিয়া যে কোন ধরণের প্রস্তাবই করা হউক না কেন তাহাতে কিছু যায় আসে না। আমি শুধু বলিতে চাই, এবং ভারতের উন্নতিকামী বন্ধুরূপেই বলি যে, ভারতের জন্য যে-কোন প্রকার পরিকল্পনাই রচিত হউক না কেন, তাহা ভারতের জাতীয় জীবনের প্রধান অংশগুলি কর্তৃক যাহাতে সাধারণভাবে সমর্থিত হয় ;সেদিকে লক্ষ্য রাখিতেই হইবে। ভারতের প্রধান প্রধান দল ও সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করিয়া এবং ভারতের অভ্যন্তরে যথাসম্ভব ঐক্য স্থাপনের ভিত্তিকে অবহেলা করিয়া কাগজে কলমে দেখিতে যত ভাল পরিকল্পনাই রচিত হউক না কেন, তাহা বেশী দিন টিকিতে পারে না। সকল দল ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব এবং প্রধান প্রধান দল ও জনসাধারণের সমর্থনের দ্বারাই কেবলমাত্র প্রকৃত জাতীয় গবর্ন্মেণ্ট গড়িয়া উঠিতে পারে।"—(যুগান্তর)

এই উক্তির ভিতর অনেকগুলি অসত্য ও ভ্রান্ত কথা আছে। ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক রেষারেষির দায়িত্ব ভারতবাসীর ততটা নয়, যতটা কৃতিত্ব বড়লাটের। মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রগতির পরিচয় পাইলেই তাহার প্রসারের পথ রোধ করিবার জন্য সর্ববিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। মিঃ আল্লাবক্সের রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব করিবার জন্য একটি সামান্য অছিলার সুযোগ লইতে স্বয়ং বড়লাটও সঙ্কুচিত হন নাই। বাংলার প্রগতিশীল কোয়ালিশন দল ভাঙিয়া দিয়া লীগ-ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়াশীল দলকে মন্ত্রীর মসনদে বসাইবার ইতিহাস আজ সুবিদিত। ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক রেষারেষির জন্য গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ না করিয়া বড়লাট সাফল্যের কৃতিত্ব দাবী করিলে অন্যায় হইত না।

কোন ভারতীয় দলই রাজনৈতিক সমস্যার সাময়িক অথবা পাকা সমাধানের জন্য গঠনমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই—ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। কংগ্রেস জাতীয় গবর্ন্মেণ্ট গঠনের যে প্রস্তাব করিয়াছিল তাহাতে অসম্ভব বা অদেয় কিছুই ছিল না। ক্ষমতা হস্তান্তরে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের ইচ্ছা থাকিলে ঐ প্রস্তাব অনায়াসেই তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিতেন। অ-দলীয় নেতৃগণও বার বার গঠনমূলক প্রস্তাবই উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু বার বার লর্ড লিনলিথগোর দ্বারা তাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারে নির্বাচিত গণ-পরিষদের দ্বারা রচিত হউক, এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি গণ-পরিষদের কোন সিদ্ধান্তে ক্ষুণ্ণ হইলে আন্তর্জাতিক ট্রিবিউনাল গঠন করিয়া তাহার সমাধান করা

হউক—এ প্রস্তাব বহু পূর্ব্বেই কংগ্রেস করিয়াছে। ভবিষ্যতের সম্বন্ধ ভারতবাসী ভাবে নাই এ কথা মিথ্যা।

বড়লাট বলিয়াছেন, শাসনতান্ত্রিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা থাকিলে ভারতের জননেতাদিগকে একত্র পরামর্শ করিয়া সেই পথ পরিষ্কার করিতে হইবে এবং এজন্য একটি দিনও বৃথা ক্ষেপণ করা চলিবে না। পরামর্শের পথে বড়লাট স্বয়ং যে-সব কণ্টক-বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন সেগুলি অপসারিত করিয়া এই কথা বলিলেই ভাল হইত। মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস-নেতাদের সহিত সকল রাজনৈতিক সম্পর্ক লর্ড লিনলিথগো ছিন্ন করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শ ভিন্ন বর্ত্তমান ভারতের কোন রাজনৈতিক সমস্যারই সমাধান যে সম্ভব নয়, ইহা বুঝিবার ক্ষমতা বড়লাটের অবশ্যই আছে। তথাপি গান্ধীজীর দেখা-সাক্ষাৎ ও চিঠি-পত্রের উপর পর্য্যন্ত তিনি অনাবশ্যক কঠোরতা প্রয়োগ করিয়াছেন। বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে এবং বক্তৃতার শেষাংশে লর্ড লিনলিথগো ভারতবাসীর প্রতি যে উপদেশ বর্ষণ করিয়াছেন, দেশবাসী তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। লর্ড লিনলিথগোর হাতে ভারতের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দের যে লাঞ্ছনা ও অসম্মান হইয়াছে, ভারতীয় জনসাধারণ তাহা সহজে ভুলিতে পারিবে না।

—

লর্ড লিনলিথগোর শাসন-পরিষদ

বড়লাট বলিয়াছেন, "সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনার ব্যাপারে যোগদান করেন নাই, ইহা সত্য। তবে বর্ত্তমান শাসন-পরিষদের ১৪ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জনই বেসরকারী সদস্য।" সরকারিত্ব অথবা বে-সরকারিত্ব বড়লাটের শাসন-পরিষদের শ্লাঘার বিষয় নয়। বড়লাটের শাসন-পরিষদ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের প্রতি দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা নহে, দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ উহাতে স্থান লাভ করেন না, শাসন-পরিষদের যে কোন সিদ্ধান্ত উল্‌টাইয়া দিবার ক্ষমতা বড়লাটের আছে—দেশবাসী ইহা জানে এবং ইহার যথাযথ মূল্যও তাহারা অবগত আছে। এগারো জন ভারতীয় উহাতে স্থান লাভ করিয়াছেন, এই পরিচয়েই বড়লাটের শাসন-পরিষদ ভারতেরই প্রতিনিধিস্থানীয় হইয়া উঠে না।

—

বড়লাটের বক্তৃতা সম্বন্ধে মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের মন্তব্য

বড়লাটের বিদায়-বক্তৃতায় শুধু ভারতবাসী নয়, খাস বিলাতেরও অনেকে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের মন্তব্য ইহার দৃষ্টান্ত। গার্ডিয়ান লিখিয়াছেন,—"রাজনৈতিক ভাষণ হিসাবে আলোচ্য বক্তৃতাটি উল্লেখযোগ্য হইয়াছে। মিঃ গান্ধী এবং কংগ্রেস-নেতারা কারারুদ্ধ, কারাগারের বাহিরে যে-সব নেতা রহিয়াছেন তাঁহাদের সহিত কংগ্রেস-নেতাদের সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ। এই সমস্ত নেতার সহিত স্বয়ং মিঃ গান্ধীর পত্রালাপ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ—এই বিষয়গুলির উল্লেখ পর্য্যন্ত না করিয়া বড়লাট সুকৌশলে তাঁহার আমলের একটা পর্য্যালোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই ভাবে আর কত দিন চলিবে? বড়লাট স্বয়ং বলিয়াছেন—'যুদ্ধোত্তর যুগ দ্রুত নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে।' এই যুগ যখন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, তখনও কি আমরা কংগ্রেস-নেতাগণকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিব? অবস্থা যদি এইরূপই, তবে আলাপ-আলোচনা ও মিলিয়া-মিশিয়া কাজ করা সম্পর্কে বড়লাট যে-সমস্ত মধুর মধুর কথা বলিয়াছেন, তাহার কোন অর্থ থাকে কি?"

ভারতীয় সমস্যা সমাধানে বড়লাটের নিজের যেটুকু ক্ষমতা রহিয়াছে, লর্ড লিনলিথগো তাহাও এদেশে প্রয়োগ করেন নাই। মিলিটারী বড়লাট ভাইকাউণ্ট ওয়াভেল ভারতীয় রাজনীতিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিবেন, মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান এ ভরসা করিতেছেন বটে, কিন্তু ভারত-বাসী ইহাতে আশান্বিত হইবার মত কারণ খুঁজিয়া পাইবে না।

—

বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন

চন্দননগরে বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের মূল সভাপতি অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁহার অভিভাষণে চলতি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার দাবীর কথা বিচার করিয়া বলিয়াছেন,

"তবে যদি রাষ্ট্রভাষার কথা ছেড়ে দিয়ে একটি চল্‌তি-ভাষার কথা বলা হয়, তা হলে সে হিসাবে বাংলার দাবি নিশ্চয়ই বিবেচনা করতে হবে। এইখানেই কথা ওঠে যে একটি ভাষাকে সকলের নিকট গ্রহণীয় করতে হ'লে তার কি কি গুণ থাকা দরকার? স্বেচ্ছামূলক গ্রহণের কথা উঠলেই গুণাগুণ বিচারের প্রয়োজন হয়, একথা যুক্তি দিয়ে বোঝাবার আবশ্যকতা নেই। ক্রেতা যখন বাজারে জিনিষ কিনতে যায়, তখন সে দেখে জিনিষের কোয়ালিটি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে একবার তাকান, ওখানে শুধু বঙ্গভাষার সঞ্চিত ঐতিহ্য দেখবেন না, দেখবেন ঐ ভাষার মধ্য দিয়ে আমাদের সংস্কৃতি কেমনভাবে গড়ে

উঠছে। সে সংস্কৃতির মধ্যে কোথায়ও এতটুকু অনুদারতা নেই। বঙ্গভাষা নিজের গৌরবে গৌরবান্বিত, তার মধ্যে এমন শিক্ষা নেই যে অন্য কোনও ভাষা, অন্য কোনও সংস্কৃতি বা অন্য কোনও জাতিকে তুচ্ছ করতে হবে, ঘৃণা করতে হবে। উপরন্তু আমরা হিন্দী, উর্দু, অসমীয়, মৈথিলী, তিব্বতীয়, সাঁওতালী, নেপালী, সিংহলী সর্ব রকমের ভাষার পঠন বা পরীক্ষণীয়তা অঙ্গীকার করে নিয়েছি। এইটাই হ'ল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। আমরা সকলকেই স্থান দিয়েছি, সকল ধর্মকে সম্মান দেখিয়েছি, সকল জাতকে বুকে টেনে নিয়েছি—বঙ্গভাষার এই সংস্কৃতি যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে বাঙালীর আদর্শ সকলকে মেনে নিতেই হবে। যে সংস্কৃতি ভেদ-বুদ্ধি শিক্ষা দেয়, যে ভাষা অপরকে বিদ্বেষ করতে শেখায়—সে ভাষা কখনও বরণীয় হতে পারে না।"

বাংলা দেশ ও বাংলা ভাষা ভারতের সমস্ত প্রদেশের মানুষ ও ভাষাকে যে উন্মুক্ত উদারতার সহিত বক্ষে স্থান দিয়াছে, ইহার জন্য বহু ক্ষেত্রে আপনি কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে, তাহার তুলনা আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। বাঙালী ও বাংলা ভাষার দাবি অবশ্যই রহিয়াছে, কিন্তু চল্লিশ কোটি লোকের কানে উহা তুলিয়া দিবার জন্য যে মুখর ও সঙ্ঘবদ্ধ জনতার প্রয়োজন, বাংলার অভাব শুধু তাহারই।

—

মনের সম্পদই জাতির প্রধান বল

চন্দননগরে বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন,

"বাঙালী যদি জগতে কালজয়ী হইতে ইচ্ছা করেন তবে জাতীয় ভাষা, জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা চাই-ই এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জাতির মধ্যে ভাষার বিস্তার সাধন আবশ্যক। নচেৎ শুধু রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করাই চরম লক্ষ্য থাকিলে চলিবে না। এখন আমাদিগের অক্ষরজ্ঞ লোকের সংখ্যা শতকরা দশের অধিক নয়। এখনকার সভ্য জগতে ইহা সুখ্যাতির কথা নহে। জাতির পক্ষে ইহা কলঙ্কেরই কথা। এ কলঙ্ক ঘুচাইতে হইবে। সে ভার আমাদিগের না লইলে উপায় নাই। ভাষার জ্ঞান ব্যতিরেকে মনের সম্পদ বৃদ্ধি হইতে পারে না। এই মনের সম্পদই জাতির প্রধান বল। যে-জাতির মাতৃভাষা যত সম্পন্ন সে জাতি তত উন্নত।"

সংস্কৃতি সম্মেলন সমগ্র জাতির মধ্যে ভাষা ও জ্ঞানের বিস্তার সাধনে আত্মনিয়োগ করিলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে। গণ-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সুবিদিত। দেশে যে সামান্য অক্ষর পরিচয় হইয়াছে তাহার প্রধান কৃতিত্ব বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহেরই প্রাপ্য। সম্প্রতি বিশ্বভারতীও এই দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া উচ্চশিক্ষার সহিত গণ-শিক্ষা বিস্তারেও মনোনিবেশ করিয়াছেন। সংস্কৃতি সম্মেলনের ন্যায় অন্যান্য সাহিত্য-সম্মেলনগুলিও যদি বৎসর ব্যাপিয়া এই মহৎ কার্য্য সাধনে মন দেন এবং বার্ষিক সম্মেলনে তাহার ফলাফল প্রকাশ করেন, তাহা হইলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। দেহ ও মনের ক্ষুধা মিটাইতে বর্তমান গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্যই যে পাওয়া যাইবে না, ইহা আজিকার মহা সঙ্কটে যেমন স্পষ্ট হইয়াছে এমনটি আর কখনও হয় নাই।

—

শিক্ষকগণের প্রতি গবর্ন্মেণ্টের দায়িত্ব

নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক-সম্মেলনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে :

যুদ্ধের দরুন দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য গত দুই বৎসরের উপর বাংলা দেশের বে-সরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষকগণ ভীষণ দুরবস্থার মধ্য দিয়া দিন কাটাইতেছেন। বর্তমান সময়ে বে-সরকারী স্কুল ও কলেজ এবং শিক্ষক-গণের দুর্দশা এমন অবস্থায় পৌছিয়াছে যে, বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং ফলে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সেই জন্য বাংলার শিক্ষাব্রতীগণের এবং শিক্ষা ব্যাপারে উৎসাহী নাগরিক-গণের এই সভা বাংলা-গবর্ন্মেণ্টকে অনুরোধ জানাইতেছে যে তাঁহারা যেন অবিলম্বে বে-সরকারী স্কুল-কলেজসমূহের সাহায্যার্থ অগ্রসর হন; বে-সরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক-গণকে যেন অত্যাবশ্যক জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়; সরকারী কর্মচারীদের জন্য শহরে দুর্মূল্য ভাতা, খাদ্যদ্রব্য ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় দিবার ব্যবস্থা আছে, শিক্ষক-গণের জন্যও যেন তাহা প্রবর্তিত করা হয় এবং স্কুল-কলেজ যাহাতে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে তজ্জন্য যেন সরকার হইতে অর্থদানের ব্যবস্থা করা হয়।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,

"গত পূজার সময় তদানীন্তন গবর্ন্মেণ্ট সাময়িক ভাবে শিক্ষকগণের সাহায্য-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং যত দিন এই অবস্থা চলে তত দিন প্রতি মাসে গবর্ন্মেণ্টকে বে-সরকারী স্কুল-কলেজ-

সমূহে সাহায্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু শুধু মাত্র স্কুল-কলেজে অর্থসাহায্য ও শিক্ষকগণকে দুর্মূল্য ভাতা দিলেই চলিবে না; সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকগণকে অত্যাবশ্যক জনকল্যাণ-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং অল্প মূল্যে খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

ভদ্র ও সভ্য গবর্মেণ্টের পক্ষে কোন কোন কাজ লজ্জা ও কলঙ্কের পরিচায়ক সে সম্বন্ধে বাংলা-গবর্মেণ্টের ধারণা থাকিলে শিক্ষকের পুণ্যব্রত অবলম্বন করিয়া যাঁহারা জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা উপেক্ষিত হইতেন না।

যে দায়িত্ব ছিল গবর্মেণ্টের তাহারই কতকাংশ মাথায় তুলিয়া লইয়া জনসাধারণের পক্ষ হইতে শিক্ষকদের একটু-খানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ দিবার জন্য যে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহার আভাস দিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন,

"জনসাধারণের অর্থে কলিকাতা ও শহরতলীর স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণের সাহায্যার্থ বে-সরকারী ভাবে যে পরি-কল্পনা করা হইতেছে, তাহাতে কলিকাতা ও শহরতলীর এক হাজার শিক্ষকের পরিবারবর্গের তিন-চার মাসের জন্য অল্প মূল্যে চারি শত মণ চাউল ও চারি শত মণ আটার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতা বাংলা দেশ নহে। বাংলার মধ্যে এমন হাজার হাজার শিক্ষক আছেন, যাঁহাদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। সুতরাং গবর্মেণ্টকে অবিলম্বে ইহার দায়িত্ব লইতে হইবে।"

গবর্মেণ্ট দায়িত্বপালনে অক্ষম এই কথা ভাবিয়া অগ্রসর হইলেই সুবিবেচনার কাজ হইবে।

—

সাম্প্রদায়িক ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন

লণ্ডনে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি আছে; সেখানে ভারতীয় সমস্যার এক একটি দিক্ লইয়া মাঝে মাঝে আলোচনা হয়। ব্রিটেনের ভারত-নীতির প্রশংসায় সভাগৃহ মুখর করিয়া তুলিবার জন্য সর্ মহম্মদ আজিজুল হক, কিংবা সর্ হাসান সুরাবর্দির ন্যায় ব্যক্তির অভাব যেমন সেখানে হয় না, তেমনি আবার দুই-এক জন স্পষ্টবক্তা ব্যক্তির উপস্থিতিতে রসভঙ্গ হইবার দৃষ্টান্তও মাঝে মাঝে দেখা যায়। সম্প্রতি উক্ত এসো-সিয়েশনের এক অধিবেশনে অক্সফোর্ড ইউনিয়নের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত বাহাদুর সিংহ কিছু স্পষ্ট কথা শুনাইয়া-ছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ,

শ্রীযুক্ত বাহাদুর সিংহ ঐ সভায় ভারতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, ১৯০৯ সালে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন প্রবর্তন করিয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতীয়দিগের সহিত সম্পর্কের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় ভুল করিয়াছেন। উহার পর প্রতি বার শাসন-সংস্কারের সময় ঐ ভুল স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু উহা বহালই রহিয়া গিয়াছে। এক বার এই নীতি মানিয়া লওয়ার পর ইহার পরিণাম কত দূর গড়াইবে, কেহই বলিতে পারে না। আজ ভারতের সকল সম্প্রদায়ই একটি বিষয়ে একমত হইয়াছে। তাহারা সকলেই স্বাধীনতা চায়। সুবিধাদানরূপ পাল্টা চালের নীতি নিঃশেষ হওয়ায় এখন ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট বলিতেছেন, "মতভেদ মিটাইয়া ফেল, তবেই তোমরা স্বাধীনতা পাইবে।" সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তন কালে মিঃ লায়নেল কার্টিস বলিয়াছিলেন—"নীরোগ অথচ দুর্বল যে অঙ্গে ব্যায়াম চর্চার দ্বারা শক্তি সঞ্চার করা প্রয়োজন, তাহাকে লোহার শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যে ফল হয় সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-প্রথার পরিণামও সেইরূপ। এই নীতি চলিতে থাকিলে আমরা ভারতে এমন আর একটি জাতিভেদ প্রথার প্রবর্তন করিব, যাহার ফলে তাহার জীবনীশক্তি ক্রমে ক্ষয় হইতে থাকিবে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব প্রথা প্রবর্তন করিয়া আমরা ন্যস্ত বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছি। এই প্রথা ভারতীয় জাতির জীবনে এমন গভীরভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে যে এখন সহজে উহা উৎপাটন করা যাইবে না। অথচ কয়েক বৎসর আগে এই অধিকার অস্বীকার করিলেই চলিত।" মিঃ সিংহ আরও বলেন যে, মর্লে মিণ্টো মিলিয়া যদি এই ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন দানবের সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে ভারতের স্বায়ত্তশাসন অপেক্ষাকৃত সহজে চালু হইত। কিন্তু এখন দানব আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছে এবং তাহার সৃষ্টি-কর্তাকেই বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

মিঃ মলসন ব্রিটিশ নীতি সমর্থন করিয়া সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের সমর্থন করিবার চেষ্টা করিলেও প্রাক্তন সহকারী ভারত-সচিব সর্ ড্রামণ্ড শীল্‌স মিঃ সিংহের যুক্তির সহিত একমত হইয়া বলেন—"আপনারা জোর গলায় বলেন যে ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবে। যদি তাহাই হয় তবে দুষ্টক্ষত-তুল্য সাম্প্রদায়িক নির্বাচন আপনারা বজায় রাখিতে পারেন না। এই ক্ষত দিন দিন বাড়িয়াই চলে। ইহাতে সমস্যার সমাধান হয় না। ভারতকে যদি গণতন্ত্রের পথ ধরিয়া চলিতে হয়, তবে এখনই এই ব্যাধি নির্মূল করিতে হইবে।"

মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন পর্য্যন্ত উহা বজায় রাখিবার সপক্ষে বিলাতের রাজনৈতিক নেতারা প্রচুর 'যুক্তি' দেখাইয়াছেন, ভারতবাসীর তরফ হইতে এই বিষময় পদ্ধতি তুলিয়া দিবার দাবি যত বার উঠিয়াছে তত বারই তাঁহারা উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা কৌশলের দ্বারা দেশে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তনটা বিলাতী রাজনীতিবিদদের ভুল বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই, উহা ইচ্ছাকৃত। ভারতবর্ষ হইতে তৃতীয় পক্ষ অবসৃত না হওয়া পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের আশা করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

—

চাউলের দর বাঁধিয়া দিবার আশ্বাস

আগষ্ট মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রে আমরা খাদ্য-সচিব মিঃ সুরাবর্দিকে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম যে, আগামী ফসল উঠিবার পূর্ব্বেই যেন চাউলের দর বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং এই দরে যাহাতে বাজারে অবাধে বেচাকেনা চলিতে পারে তাহার কঠোর ব্যবস্থা তিনি যেন এখন হইতেই করিতে আরম্ভ করেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে মডার্ন রিভিউ প্রকাশের দিনেই মিঃ সুরাবর্দি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া এই ইচ্ছাই জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

"পূর্বাঞ্চল বিভাগের বাংলা ও অপরাপর প্রদেশের চাউল আমদানী রপ্তানী সম্পর্কে ১লা আগষ্ট হইতে বাধা-নিষেধ পুনরায় আরোপিত হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই আদেশ সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, এই আশায় বহু ব্যবসায়ী ও ফাটকাবাজ স্থানীয় বাজার হইতে চাউল ক্রয় করিতেছে। তাঁহারা সম্ভবতঃ ইহা লক্ষ্য করেন নাই যে উক্ত বাধা-নিষেধ আরোপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার জন্য চাউল সংগ্রহ ও নিয়মিত সরবরাহের একটি নূতন পরিকল্পনাও করা হইয়াছে। আমি এই প্রসঙ্গে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করিয়া দিতেছি যে শীঘ্রই সমগ্র বাংলায় মূল্য- নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কার্য্যকরী করা হইবে। আমি যে দর বাঁধিয়া দিব তাহা বর্ত্তমান বাজার দর অপেক্ষা কিছু কম এবং আউস ধান উঠিতে থাকায় ও আমন ধান কাটার সময় আসিয়া পড়ায় চাউলের দর আরও কমিবে। যাহাতে এই নিয়ন্ত্রিত মূল্য সঠিক-ভাবে কার্য্যকরী হয় সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। যে সকল ব্যবসায়ী তাড়াহুড়া করিয়া বর্ত্তমানে উচ্চ মূল্যে চাউল খরিদ করিতেছে, তাহাদের সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে যে তাহারা নিয়ন্ত্রিত মূল্যের অধিক দরে চাউল বিক্রয় করিতে পারিবে না।"

মিঃ সুরাবর্দির নিকট হইতে বুভুক্ষু জনসাধারণ যে পরিমাণে বিবৃতি ও ইস্তাহার প্রভৃতি পাইয়াছে, কার্য্যতঃ সাহায্য ততখানি পায় নাই। এবার অন্ততঃ একটি বারের জন্যও তিনি প্রকৃত সাহসের পরিচয় দিয়া চাউলের দর বাঁধিয়া দিবেন। তাঁহার আশ্বাস শুধু বিবৃতিতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, এ আশা করা অন্যায় হইবে কি?

—

দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় বিতাড়ন আইনের মৃদু প্রতিবাদ

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় বিতাড়ন আইনের বিরুদ্ধে 'প্রতিশোধমূলক' ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে একটি বিল আনিবার কথা উঠিয়াছিল। একটি মৃদু প্রতিবাদমূলক বিলও অবশ্য আনা হইয়াছে। আলোচনা আরম্ভ করিয়া ডাঃ এন. বি. খারে বলেন,

"দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়গণের বসতি স্থাপনের গোড়ার দিক হইতেই সেখানকার শ্বেতাঙ্গরা উৎকট স্বার্থ-পরতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে। দুঃসময়ে প্রয়োজনের তাগিদে তাহারা সাহায্যের জন্য ভারতের কাছে কাকুতি-মিনতি জানাইয়াছে এবং ভারতীয় শ্রমিক পাইবার জন্য যত রকম ইচ্ছা প্রতিশ্রুতি দিতে চাহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের অবস্থা ভাল হওয়া মাত্র তাহারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে এবং যাহাদের সাহায্য পাইয়াছে, তাহাদিগকেই অপমান করিয়াছে। ভোটাধিকার হইতে আরম্ভ করিয়া নানা সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া সেখানকার শ্বেতাঙ্গ সরকার ভারতীয়দিগের অপমানের একশেষ করিয়াছে। দক্ষিণ-আফ্রিকানরা যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিতেছে সেই উদ্দেশ্যে বহু লড়াইয়ে ভারতীয়গণ যে সময় জীবন দিতেছে, সেই সময় পেগিং আইন বিধিবদ্ধ হইল। দক্ষিণ-আফ্রিকা স্বয়ংশাসিত ডোমিনিয়ন বলিয়াই আধিপত্য খাটাইতেছে এবং ভারতবাসীরা পরাধীন বলিয়াই দুর্গতি ভোগ করিতেছে। এই অবস্থায় ভারতের প্রতি ব্রিটেনের নৈতিক দায়িত্ব খুব বেশী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল স্থানে অবস্থিত স্বজাতীয়দিগের প্রতি তাহার যতটুকু কর্ত্তব্য আছে, ভারতীয়দের প্রতিও ততটুকু কর্ত্তব্য আছে। এই কর্ত্তব্য ব্রিটেন উপেক্ষা করিতে পারে না। ভারত-বাসীরা শাসনতান্ত্রিক কারণে পশ্চাদ্বর্ত্তী বলিয়াই তাহাদিগের

অভিযোগের ন্যায্যতা খণ্ডিত হয় না। এই যুদ্ধের সময়েই ভারতের এবং ভারত-সরকারের মর্য্যাদা বজায় রাখার উপায় করিতে হইবে। নৈরাশ্যের মধ্যেও হয়ত আশা করা যায় যে, দক্ষিণ-আফ্রিকায় নির্বাচনের উত্তেজনা কমিয়া গেলে আবেদন-নিবেদনের ফল হইবে। কিন্তু প্রতিকার-মূলক কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া আবেদনে কোন ফল ফলিবে না। সেই জন্যই পারস্পরিক ব্যবস্থামূলক আইন সংশোধন বিল এই পরিষদে উত্থাপিত হইয়াছে। অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।"

সর্ রাজা আলী বলেন,

"বাণিজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রতিশোধ লওয়া হউক, ভারতে প্রবাসী দক্ষিণ-আফ্রিকানদের উপর পারস্পরিক ব্যবহারমূলক আইন প্রয়োগ করা হউক এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে ভারতীয় হাই কমিশনারকে ফিরাইয়া আনা হউক। ১৯৪১ সাল হইতে ভারত-সরকারের নীতিতে পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। ব্রহ্মচুক্তি এবং ভারত-সিংহল চুক্তির সময় দেখা গিয়াছে যে, ভারত-সরকার যথাযোগ্য প্রভাব খাটান নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় এজেন্ট-জেনারেল সেখানকার ভারতীয়দের নেতা ছিলেন। এখন সেই স্থানে হাই কমিশনার নিয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি আর সেখানকার ভারতীয়দের নেতা নহেন। এখন ডাকঘরের মত তাঁহার মারফৎ সংবাদ আদান-প্রদান হয় মাত্র। এখানকার ভারত-গবর্ন্মেণ্টকে গণতান্ত্রিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই গবর্ন্মেণ্ট কি ভাবে পেগিং আইনটি মৌনভাবে মানিয়া লইয়াছেন, সাবেক আমলাতান্ত্রিক গবর্ন্মেণ্টও কখনই তাহা করিতেন না। এ সম্বন্ধে ভারত-সরকারের কিছু করা উচিত। এখনই ভারত হইতে দক্ষিণ-আফ্রিকায় খাদ্যশস্য ও চটের বস্তা রপ্তানী বন্ধ করা এবং সেখান হইতে ভারতে গাছের বাকল, রং প্রভৃতি আমদানী বন্ধ করা উচিত। আগামী দুই মাসে ভারতে অবস্থিত দক্ষিণ-আফ্রিকানদিগের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।"

সর্ রাজা আলীর একটি সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন করিয়া প্রায় দশ-বার জন বক্তা দাবি করেন যে, যুদ্ধের পর বৈদেশিক সৈন্যদের ভারতবর্ষ হইয়া স্বদেশে ফিরিবার সময় অন্যদের বেলায় এক বৎসর সময় দিলে দক্ষিণ-আফ্রিকার সৈন্যদের যেন ছয় মাসের বেশী ভারতে থাকিতে না দেওয়া হয়। বলা আবশ্যক, ইউরোপীয় দল এই মৃদু প্রতিবাদেও আপত্তি করেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকা ভারতীয় কংগ্রেসে মতভেদের অবসান

দক্ষিণ-আফ্রিকা ভারতীয় কংগ্রেসের ভারতবর্ষস্থ প্রতিনিধি স্বামী ভবানীদয়াল এবং মিঃ মহম্মদ আমেদ জাদোয়াত এক বিবৃতি দিয়া জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় বিতাড়ন আইনের বিরুদ্ধে একযোগে সংগ্রাম করিবার জন্য নাটালের ভারতীয়েরা নিজেদের মতানৈক্য মিটাইয়া ফেলিয়াছেন। ইউনিয়ন গবর্ন্মেণ্টকে কাবু করিবার একমাত্র উপায় তাহার সহিত সমস্ত কারবার বন্ধ করিয়া দেওয়া—ইহাই দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের অভিমত। কেন্দ্রীয় পরিষদে সর্ রাজা আলীও এই দাবীই জানাইয়াছিলেন।

—

পরলোকে চীনের রাষ্ট্রপতি

চীন সাধারণ-তন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ডক্টর লিন সেন বহু দিন রোগ ভোগের পর গত ১লা আগষ্ট রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। জেনেরিলিসিমো চিয়াং কাই-সেক রাষ্ট্রপতির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

চীনের জাতীয় গবর্ন্মেণ্টের রাষ্ট্রপতি ডক্টর লিন সেন ১৮৬৪ সালে ফুকিয়েন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ডক্টর সান ইয়াট-সেনের অনুরক্ত শিষ্য ডক্টর লিন চীনের জাতীয় বিপ্লবে অতি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে তিনি কুয়োমিনটাঙ (জাতীয় দল) কেন্দ্রীয় কার্য্য-নির্বাহক সমিতির সদস্য হন। ১৯২৯ সালে তাঁহাকে কুয়োমিনটাঙ কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধায়ক সমিতির সদস্য নির্বাচিত করা হয়। ১৯২৮ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত ডক্টর লিন জাতীয় গবর্ন্মেণ্টের রাষ্ট্রীয় সদস্য ছিলেন। ১৯৩২ সালে তাঁহাকে চীনের জাতীয় গবর্ন্মেণ্টের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়, এবং মৃত্যুকাল অবধি তিনি এই পদে অভিষিক্ত ছিলেন।

চীনের প্রবীণতম ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত রাষ্ট্রপতি লিন কেবল অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ্ই ছিলেন না; তিনি একজন খ্যাতনামা পণ্ডিতও ছিলেন। বর্তমান চীনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য, এবং স্বদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।—চীনবার্তা

চীনের এই প্রবীণ রাষ্ট্রনায়কের মৃত্যুতে ভারতবাসী বেদনা অনুভব করিবে। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক ইহাই প্রার্থনা করি।

মানবতার সেবাও অপরাধ

রাজপথে শত শত নরনারী বালক-বালিকাকে একমুষ্টি অন্নের জন্য হাহাকার করিয়া ফিরিতে দেখিয়াও বাংলা-সরকার তাহাদিগকে অন্নদানের বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। কয়েক জন মহাপ্রাণ ব্যক্তি মানবতার এই লাঞ্ছনা সহিতে না পারিয়া নিজ নিজ সাধ্যানুসারে বুভুক্ষু নরনারীকে অন্নদান করিতেছেন। শ্রীযুত মতিলাল ক্ষেত্রী তন্মধ্যে অন্যতম। প্রতি রবিবার তিনি দরিদ্রদের চাউল বিতরণ করিতেন এবং এই উদ্দেশ্যে চাউল কিনিয়া মজুত রাখিতেন। অকস্মাৎ পুলিসের শ্যেনদৃষ্টি ইঁহার উপর পড়িল এবং বিনা-লাইসেন্সে চাউল রাখিবার অভিযোগে ভদ্রলোককে আদালতে চালান দিয়া আইনের মর্য্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা হইল।

বিনা-লাইসেন্সে ৬৫ বস্তা চাউল রাখিবার অভিযোগে পুলিস অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাঁহাকে হাজির করে। শ্রীযুত ক্ষেত্রী অপরাধ স্বীকার করিয়া বলেন যে, তিনি প্রতি রবিবার দরিদ্রদের চাউল বিতরণ করেন। পুলিস যে চাউল আটক করিয়াছে তাহা বিক্রয় বা লাভ করিবার জন্য মজুত করা হয় নাই। যে সকল ব্যক্তিকে তিনি ভিক্ষা দিয়া থাকেন তাহাদের নামের তালিকাও তাঁহার নিকট ছিল এবং তাহা তিনি পুলিস কর্মচারীকে দেখাইয়াছিলেন। দান করিবার জন্য চাউল রাখিলেও যে ছাড়পত্র লইতে হয় ইহা তাঁহার জানা ছিল না। বিচারক তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন, ক্ষেত্রী মাসে ২২ মণ চাউল বিতরণ করিয়া থাকেন এবং ইহা আইনের খুঁটিনাটি অনুযায়ী অতি সামান্য অপরাধ মাত্র। আসামী অপরাধ স্বীকার করায় ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ৫১৲ টাকা জরিমানা করিয়াছেন এবং চাউলগুলি ফেরৎ দিবার আদেশ দিয়া বলিয়াছেন যে, অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোক্তা আইন প্রয়োগ না করিলেই সুবিবেচনার কার্য্য করিতেন।

টেকনিকাল অপরাধে ৫১৲ টাকা জরিমানা না করিয়া এক টাকা জরিমানা করিলেই যথেষ্ট হইত। চাউল কাড়িয়া লইবার এই অতি আগ্রহের একাংশও যদি গবর্ন্মেণ্ট উহা সংগ্রহ ও বিতরণের বেলায় দেখাইতেন তাহা হইলে বহু নরনারী অনাহারে অপমৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইত।

—

কয়লার অভাবের দায়িত্ব কাহার?

কলিকাতায় কয়লার অভাব আবার তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় এক মাস যাবৎ কয়লা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ভারত-সরকার নীরব; বাংলা-সরকার ফতোয়ার পর ফতোয়া দিয়া শহরবাসীকে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু কয়লা আসিয়া পৌঁছিতেছে না।

গত জানুয়ারী মাসেও ভারতবর্ষে মোট ৯১ হাজার কয়লার ওয়াগন চালু ছিল। এই লাখখানেক মালগাড়ীর মধ্যে দৈনিক ২৫টিও কি বাংলার জন্য জোটে না? মিঃ সুরাবর্দ্দী স্পষ্টই বলিয়াছেন, কয়লা সরবরাহের দায়িত্ব তাঁহার নহে, ভারত-সরকারের। গত বৎসর ৯ই আগষ্টের ধ্বংসলীলার পর রেলওয়ে-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যর এডোয়ার্ড বেন্থল বলিয়াছিলেন যে, রেল-লাইন উপড়াইবার শাস্তি সকলকেই পাইতে হইবে। কথাটি কি বেন্থল সাহেব এখনও মনে রাখিয়াছেন? রেলওয়ের আয়ের শতাধিক কোটি টাকার অধিকাংশই কিন্তু ভারতবাসীর নিকট হইতেই আদায় হয়।

—

অনশনের দণ্ড

এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ,

"গোরক্ষপুর জেলে আছাইবর সিং ও ৩২ জন সিকিউরিটি বন্দী সম্প্রতি অনশন-ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন; তাঁহাদের প্রত্যেককে এক বৎসর করিয়া কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণ এই যে, গত বৎসর আগষ্ট মাসে তাঁহাদের গ্রেপ্তারের পর তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে রাখা হয়। কিন্তু অক্টোবর মাসে তাঁহাদিগকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হয়। অনশনের পূর্বে তাঁহারা জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে এই মর্ম্মে নোটিস দেন যে, যদি তাঁহাদের অভিযোগের প্রতিকার করা না হয় অথবা পরিবারবর্গের ভাতার সুবন্দোবস্ত করা না হয়, তবে তাঁহারা অনশন-ধর্ম্মঘট করিবেন। জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই, কারণ উহাতে ভয় দেখান হইয়াছে। বন্দীগণ জুলাই মাসের মাঝামাঝি অনশন আরম্ভ করেন এবং ২৭শে জুলাই সন্ধ্যায় অনশন ভঙ্গ করেন। আসামী পক্ষের কৌশুলী মিঃ লক্ষ্মীশঙ্কর বর্ম্মার অনুরোধ অনুসারে তাঁহারা অনশন ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তিনি আসামীদিগকে জানান যে, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রাদেশিক সরকারের নিকট তাঁহাদের অভিযোগ জানাইবেন।"

সখ করিয়া কেহ অনশন করিতে চাহে না। নিজেদের অভাব-অভিযোগের প্রতি সরকারী দৃষ্টি আকর্ষণে রাজবন্দীদের পক্ষে এইটিই চরম ও শেষ অস্ত্র। একেবারে হতাশ না হইলে কেহ শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে না। গোরক্ষপুর জেলের বন্দীদের দাবি অযৌক্তিক বা অন্যায় নয়, জেলের বাহিরেও এই দুইটি বিষয় লইয়াই প্রচুর আলোচনা হইয়াছে। বন্দীদের অভাব-অভিযোগ দূর করিতে অথবা

তাঁহাদের পরিবারবর্গের ভাতার সুবন্দোবস্ত করিতে সরকারের ঔদাসীন্য এবং অক্ষমতা সম্পর্কে ব্যবস্থা-পরিষদে ও সংবাদপত্রে বহু সমালোচনা হইয়াছে। এই দাবির একটিও অন্যায় নয়। প্রতিকারলাভে অক্ষম হইয়া রাজ-বন্দীরা অনশন-ধর্মঘট করিয়া থাকিলে তাঁহাদের লাঞ্ছনা আরও বৃদ্ধি করিলেই আইনের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে বলিয়াই কি গবর্ন্মেণ্টের ধারণা? বিনা-বিচারে গ্রেপ্তার করিয়া অনির্দিষ্টকাল আটক রাখিব, পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তিকে বিনা-বিচারে বন্দী করিব কিন্তু তাহার পরিবার-বর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিব না, ভাতার জন্য আবেদন-নিবেদনে ব্যর্থ হইয়া কেহ অনশন করিয়া বিষয়ের গুরুত্বের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিলে তাহাকে দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিব—এতটা বাড়াবাড়ি কোন গবর্ন্মেণ্টের পক্ষেই শ্লাঘার বিষয় নহে।

—

"আশার নিষ্পেষণে বিদ্রোহের সঞ্চার অনিবার্য্য"—ওয়ালেস

আমেরিকার সহকারী সভাপতি মিঃ হেনরি ওয়ালেস স্পষ্টবাদিতার জন্য জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। সম্প্রতি ডেট্রয়েটে এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, "অনশনের কোন স্বত্বাধিকার নাই, দাসত্বেরও কোন মহাসনদ নাই। মানুষের আশা যেখানে নিষ্পেষিত, বিদ্রোহের সঞ্চার সেখানে অনিবার্য্য।"

Starvation has no Bill of Rights! Slavery no Magna Charta. Wherever the hopes of human family are throttled, there we find makings of revolt.

ভারত-সরকার ও ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের পক্ষে এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

—

খাদি প্রস্তুত কেন্দ্রের উপর নিষেধাজ্ঞা অপসারণের দাবী

নোয়াখালীর কয়েক জন মহিলা তথাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র নারীদের অশেষ দুরবস্থার কথা জানাইয়াছেন এবং অনুরোধ করিয়াছেন যেন তিনি ছোট ছোট কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়া ইঁহাদের জীবিকার উপায় করিয়া দেন। ইঁহারা ভিক্ষা চাহিতেও যান নাই, দয়ার প্রার্থীও হন নাই। সুতাকাটা, কাপড় বোনা ও কাগজ তৈয়ারির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া গবর্ন্মেণ্টের পক্ষে একটা খুব শক্ত কাজ নহে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ফল বিশেষ কিছু হইবে বলিয়া আমরা ভরসা করিতে পারিতেছি না। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ত সরকারী কায়দায় ইঁহাদের অনুরোধ শিল্প-বিভাগের গোচর করিবেন এবং সেখানকার ফাইলের লাল ফিতার বাঁধনে উহা সমাধিলাভ করিবে ইহারই সম্ভাবনা অধিক।

তবে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে একটি ক্ষমতা আছে। খাদি প্রস্তুত কেন্দ্রগুলির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইলে অনেকটা সাহায্য করা হইবে। অন্নবস্ত্র দেওয়ার চেয়ে একটা বাঁধন খুলিয়া দেওয়া সহজ।

—

খাদ্যসঙ্কট সম্বন্ধে ভারত-সরকারের কৈফিয়ৎ

অক্ষমতার কৈফিয়ৎ দানে সরকারের কার্পণ্য এ দেশে কখনও দেখা যায় নাই। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে খাদ্য-সমস্যা লইয়া দুই দিবস ব্যাপী বিতর্কের আরম্ভে খাদ্যসচিব সর্ আজিজুল হক তাঁহার অক্ষমতার দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যে মাস হইতে অবস্থা ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে এবং মনে হইতেছে বাংলা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং ভারত-সরকার পূর্বাঞ্চলে অবাধ বাণিজ্য প্রবর্ত্তন করিয়া ঘাটতি অঞ্চলকে রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

"কিন্তু অবাধ বাণিজ্য ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে উহার উপর নানারূপ বাধানিষেধও আরোপ করা হইল।

"ব্যবসায়িগণ এবং ক্রয়-এজেণ্টগণ ছাড়াও বিভিন্ন রেল-ওয়ের জেনারেল ম্যানেজারগণ, রেলওয়ে বোর্ডের চীফ মাইনিং এঞ্জিনীয়ার, মাইনিং এসোসিয়েশনের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ কর্মচারী, বিমান ঘাঁটি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন চেম্বার-অব-কমার্সের চাউল সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং আরও অনেকে অভিযোগ করিয়াছেন। ব্যবসায়ীদের এজেণ্টদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং প্রেরিত মাল রাস্তায় আটক করা হইয়াছে; এই ভাবে অবাধ রপ্তানী ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয় নাই। একই প্রদেশ সম্বন্ধে জানা গিয়াছে যে, ঐ প্রদেশে অন্যূন ত্রিশ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত ছিল। এই প্রদেশটি জানুয়ারি হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত নিজের প্রয়োজনের জন্য চাউল ক্রয় করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। কিন্তু অবাধ রপ্তানী ব্যবসায় প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানেও নিজ প্রয়োজনে মাল মজুত করিবার তৎপরতা দেখা যায়। অবাধ রপ্তানী ব্যবস্থা দ্বারা ভারতের সর্বত্র মালপত্র সমভাবে সরবরাহ একমাত্র উপায় বলিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছু দিন হইতে আমাদের মনে এই আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, যে, ইহার ফলে হয়ত ঘাটতি অঞ্চলে যে আংশিক

সরবরাহ বজায় আছে তাহারও আরও বিলোপ সাধন ঘটিবে। দুই-একটা ক্ষেত্র ছাড়া কোথাও সমদায়িত্বের নীতি গৃহীত হয় নাই। আশু ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায় নির্ধারণের জন্য জুলাই মাসে একটা সম্মেলন আহূত হয়। সম্মেলনে অবাধ রপ্তানীর বিরুদ্ধেই সকলে স্পষ্ট অভিমত জ্ঞাপন করেন। সম্মেলন এই সুপারিশ করেন যে, ভারত কর্তৃক খাদ্যশস্য সংগ্রহের মূল পরিকল্পনানুযায়ী বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের অধীনে ক্রয়-প্রতিষ্ঠান রাখিয়া কাজ চালান হউক। ভারত-সরকার সম্মেলনের সুপারিশ মানিয়া লন—মালপত্র প্রেরণের সুব্যবস্থার জন্য খাদ্য-সচিব ও যান-বাহন-সচিব ঐ বিষয়ে একটা মীমাংসার জন্য লাহোরে যান; কিন্তু কাজ করিবার অসুবিধাসমূহ বিদূরিত হওয়ামাত্র দামোদরের বন্যা দেখা দিল। জাহাজযোগে তখন কিছু খাদ্যশস্য প্রেরণের চেষ্টা হয় এবং কার্য্যতঃ দুইখানি জাহাজে গম বোঝাই দেওয়াও হয়। কিন্তু তখনই জাহাজের এঞ্জিন বিকল হয়। এখন উহার মেরামত চলিতেছে—জাহাজ-যোগে প্রেরণের জন্য গবর্ন্মেণ্ট গম মজুত করা আরম্ভ করিয়াছেন; জাহাজ পাওয়া গেলেই তৎক্ষণাৎ বোঝাই দেওয়া হইবে।

"আমরা আমাদের যথাসাধ্য করিয়াছি; কিন্তু বাধা-বিপত্তিগুলি এক দিনে বিদূরিত হইবার নহে।"

প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টগুলি ভারত-সরকারের কথা শোনে নাই, নানা অছিলায় ইহারা আন্তঃপ্রাদেশিক অবাধ বাণিজ্যে বাধা দিয়াছে—ইহাই সর্ আজিজুলের প্রধান বক্তব্য। পরিষদের জনৈক শ্বেতাঙ্গ সদস্য ইহার সমুচিত উত্তর দিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টগুলিতে এত বিভিন্ন কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হইতে হয় যে উহারা কথা শুনিবে না ইহা অবিশ্বাস্য। জাহাজ পাওয়া যায় না ইহা ত চিরন্তন কৈফিয়ৎ। করাচী হইতে ফসল আনিবার উপযুক্ত জাহাজ ভারতবর্ষে অনায়াসেই তৈরি হইতে পারিত, ইহাতে বাধা দিয়াছে কে? জাহাজ খুঁজিয়া বাহির করিয়া উহাতে ফসল তুলিয়া দিবার দায়িত্ব গবর্ন্মেণ্টের, দেশবাসীর নহে। জাহাজের অভাব অথবা এঞ্জিন বিগড়াইবার হাস্যকর কৈফিয়ৎ একমাত্র এ দেশেই দেওয়া সম্ভব। বাধা-বিপত্তিগুলি এক দিনে বিদূরিত হইবার নহে ইহা সত্য; কিন্তু যুদ্ধের এই চার বৎসরও কি সেগুলি দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে?

সর্ আজিজুলের স্থলে সর্ জোয়ালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব খাদ্য-সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। সর্ আজিজুল অন্য কাজের সঙ্গে খাদ্য-দপ্তর চালাইতেন, সর্ জোয়ালাপ্রসাদও তাহাই করিবেন। তবে এই পরিবর্ত্তন কিসের জন্য? জনস্বার্থ রক্ষায় অক্ষমতা মন্ত্রী বা সরকারী কর্ম্মচারী কাহারও পক্ষেই বর্ত্তমান গবর্ন্মেণ্টের কর্ণধার লাটবড়লাটদের নিকট দোষাবহ নহে; সর্ আজিজুলের কৈফিয়ৎটা জোরালো হয় নাই বলিয়াই কি এই পরিবর্ত্তন?

অতিলোভী ব্যবসায়ীদের প্রতি সরকারী হুমকি

সর্ আজিজুল হক ঐ বক্তৃতাতেই বলিয়াছেন,

"দেশে এখনও এমন লোক আছে যাহারা আমাদিগকে সাহায্য করে নাই এবং অপরের ভাগ্য সম্পর্কে যাহারা উদাসীন। যে পর্য্যন্ত তাহারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিতে ও সম্পূর্ণভাবে লাভের নিরাপত্তা বিধান করিতে পারিবে সে পর্য্যন্ত তাহারা এইরূপ উদাসীনই থাকিবে। আমি ইহাদের এবং মজুতকারী ও ফাটকাবাজদের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি, আমার বিভাগ এবং আমাদের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে কার্য করিতেছেন, সেই সব প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টগুলির সম্বন্ধে আমি এই কথা বলিতে পারি যে, যাহাতে ইহারা অব্যাহতি না পায় সেজন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

অতিলোভী মজুতদার ও ফাটকাবাজদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার অনেক হুমকি দিয়াছেন, তাঁহাদের বহু বক্তৃতায় বুঝা গিয়াছে ইহাদের কার্যকলাপের সন্ধান তাঁহারা রাখেন। সর্ আজিজুলের বক্তৃতার উদ্ধৃতাংশও তাহারই প্রমাণ। কিন্তু কার্যতঃ আজ পর্য্যন্ত একটিও বড় ব্যবসায়ীকে ধরিয়া শাস্তি দিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সকল বিক্রম গোটাকয়েক পানওয়ালা ও মুদী প্রভৃতির উপর দিয়াই নিঃশেষিত হইতেছে।

মিঃ গ্রিফিথ্‌স্ অতিলোভী ব্যবসায়ীদের চুংকিং-এ যেভাবে সাজা দেওয়া হয় তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় এদেশেও ইহাদিগকে গাধার টুপি পরাইয়া শহর প্রদক্ষিণ করাইবার বন্দোবস্ত করা উচিত। শুধু ইহাদিগকে নহে, যে-সব সরকারী কর্ম্মচারীর পক্ষ-পুটাশ্রয়ে ইহারা অবাধে বর্ধিত হইতেছে তাহাদেরও ধরিয়া এই ভাবে শাস্তি দেওয়া উচিত। বেত্রদণ্ড দানের যদি কোন প্রয়োজন থাকে তবে তাহা এইখানে। কলিকাতায় সিভিল সাপ্লাই বিভাগের কয়েক জন কর্ম্মচারীর গৃহে খানাতল্লাস করিয়া অপরাধজনক কাগজপত্র পাওয়া গিয়া-ছিল বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাদিগকে আদালতে হাজির করা হয় নাই। অসাধু কর্ম্মচারী এবং

অতিলোভী ব্যবসাদার উভয়ের প্রতি সমান কঠোরতার সহিত দণ্ডপ্রয়োগ না করিলে এই পাপ দূর হইবার নহে। এ বিষয়ে জনসাধারণের অভিমত জানিতে চাহিয়া সময় নষ্ট করা নিরর্থক, গবর্ন্মেণ্ট ইহাদিগকে শাস্তিদানের সাহস সঞ্চয় করুন, জনসাধারণ শুধু এইটুকুই প্রার্থনা করে।

—

বর্ধমানের বাঁধ

বর্ধমানের বন্যা সম্বন্ধে ৬ই আগষ্ট তারিখের অমৃত-বাজার পত্রিকায় বাংলা-সরকারের সেচ-বিভাগের অবসর-প্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার মিঃ এ. এন. মিত্রের এক-খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রখানিতে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। নিম্নে উহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল:

"১৭ই জুলাই দামোদরের বিরাট বাঁধের এক হাজার ফুট পরিমিত অংশ ভাঙিয়া প্রবল জলস্রোতে মাইলের পর মাইল স্থান ভাসিয়া যায়। নদীর জল আরও বাড়িলে বাঁধের এই ভাঙন মেরামত করা কঠিন হইবে। জলস্রোত পূর্বাভিমুখে মেমারীর দিকে চলিয়াছে বটে, কিন্তু তার পর উহা কোন্ দিকে যাইবে বুঝা যায় না।

"এই অঞ্চল সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা ত্রিশ বৎসরের। দীর্ঘ কর্মজীবনে বাঁধ সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান আমার হইয়াছে। অতএব কর্তৃপক্ষকে কয়েকটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"১৮৩০ সালে দামোদরের বন্যার জল যখন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত, বর্ধমান ও কলিকাতার মধ্যে তখন নৌকা চলিত। ১৮৫০ সালের পর নদীর বাম পার্শ্ব রক্ষার ব্যবস্থা হয় কিন্তু বন্যার জল ডান দিক দিয়া বাহির হইতে কোন বাধা দেওয়া হয় নাই। ফল এই হইয়াছে যে:

"(১) নদীর ডান দিকের লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে; কিন্তু বাঁ-দিকের লোকের চেয়ে ইহাদের স্বাস্থ্য চতুর্গুণ ভাল।

"(২) ডান দিকের জমি বাঁ-দিক অপেক্ষা ৮ ফুট বেশী উঁচু হইয়া গিয়াছে; এদিককার বন্যার জল বাহিরে যাওয়ার জন্য খাল আছে এবং নৌকাও আছে। অন্য দিকের লোকের এই সুবিধা নাই।

"(৩) ডান দিকের বন্যার জল ধরিয়া রাখিবার সুযোগ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে; বাঁধ নির্মাণের ফলে দামোদরের বাঁ-দিকের ব-দ্বীপের মাথা বর্ধমান হইতে কুড়ি মাইল উজানে সরিয়া গিয়াছে, অথচ ডান দিকের ব-দ্বীপের মাথা নামিয়া আসিয়াছে বর্ধমানের ৩০ মাইল নীচে বেগুয়াতে।

"ইহার ফলে প্রতি বৎসর বাঁধের উপর বন্যার জলের চাপ বাড়িতে থাকিবে। ১৮৮৮, ১৯১৩, ১৯৩৫, ১৯৪০ এবং ১৯৪৩ সালে বাঁধ ভাঙিয়াছে; ইহা হইতে দেখা যায়, প্রতি বৎসর বাঁধ ভাঙার মধ্যবর্তী সময় ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। আমীরপুরের বাঁধ গত এক শত বৎসরের মধ্যে একবারও ভাঙে নাই।

"আমার মনে হয়, নদীর বাম তীরের যেখানে বাঁধ ভাঙিয়াছে সেই স্থান হইতে বন্যার জল রেলের বড় খাল এবং অন্যান্য মরা নদী বাহিয়া গঙ্গায় আনিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এই জল অপসারণ যাহাতে আপনা আপনি হইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করা যায় এবং ইহাকে সামলাইবার বন্দোবস্ত করাও কঠিন নয়। নদীর বাম তীরের পক্ষেও বন্যার জলের খানিকটা অংশ গ্রহণ করিয়া বন্যা-প্রতিরোধে সাহায্য করা উচিত। ইহাতে তাহাদেরও লাভ আছে। বন্যার জলে কলিকাতা ভাসিয়া যাইবার যে কথা উঠিয়াছে তাহা অবিশ্বাস্য।

"বাঁধ মেরামত হইলেই কর্তব্য শেষ হইল এ কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই।"

উদ্ধৃত পত্র হইতে দেখা যায়, বাঁধ ভাঙিতে প্রথম বার লাগিয়াছে ২৫ বৎসর, দ্বিতীয় বার ২২ বৎসর, তৃতীয় বার ৫ বৎসর এবং ইহার মাত্র ৩ বৎসর পরে এবার বাঁধ ভাঙিয়াছে! গবর্ন্মেণ্ট এবার কতকটা জায়গায় ডবল বাঁধ দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

প্রকৃতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া জল-নিকাশের ব্যবস্থা না করিলে শুধু বাঁধ দিয়া স্থায়ী ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে করা কঠিন। বাংলা দেশের নদী-নালা সম্বন্ধে জ্ঞান আছে এরূপ বাঙালী সেচ-বিশেষজ্ঞ নাই এমন নহে। লাহোরের ডাঃ নলিনীকান্ত বসুকে আনিয়া বাংলার নদী-শাসন সম্বন্ধে একটা গবেষণাগার স্থাপনের কথা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু কাজ কত দূর হইয়াছে তাহা আমরা জানি না। মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাংলা-সরকারের সেচ-বিভাগের তদানীন্তন চীফ এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদারকে লইয়া এ সম্বন্ধে কতকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্যতঃ কিছু করিতে পারেন নাই। বাঁধ মেরামত করিয়া অথবা খানিকটা জায়গায় ডবল বাঁধ দিয়া সহজে কাজ সারিবার চেষ্টা না করিয়া বাংলা-সরকারের পক্ষে বিশেষজ্ঞদের সহিত ভাল করিয়া আলোচনার পর এমন ভাবে কার্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত যাহার ফল দীর্ঘস্থায়ী হইবে।

—

অবনীন্দ্র-জয়ন্তী

গুনি আমাদের জাতীয় চৈতন্য জাগিয়াছে। আমরা আর আত্মবিস্মৃত নহি, গুণীর সম্মান করিতে শিখিয়াছি, প্রতিভার

সমাদর করিতে শিখিয়াছি। কথাটি কি সম্পূর্ণ সত্য? রবীন্দ্রনাথ তখনও জীবিত, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, যে-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইবে সে উৎসব যেন অবনীন্দ্রের প্রতিভার উপযুক্ত হয়, সে উৎসবে যেন আমরা তাঁহার প্রতিভার যোগ্য সম্মান প্রদান করিতে পারি। তাঁহার সে অনুজ্ঞা কি আজও আমরা পালন করিয়াছি? অবনীন্দ্রনাথ স্রষ্টা, তিনি শুধু শিল্প সৃষ্টি করেন নাই, শিল্পী সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যের অভাব নাই। ভারতবর্ষের এমন প্রদেশ নাই যেখানে তাঁহার শিষ্য নাই, এবং অনেক প্রদেশেই কলা-বিভাগের উচ্চপদে তাঁহার শিষ্যেরা প্রতিষ্ঠিত। তাঁহারা চেষ্টা করিলে নিখিল-ভারত অবনীন্দ্র-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়ে। কবিগুরুর জয়ন্তীর সময় তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও পরিশ্রম সে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল। ভারতীয় চিত্রকলার ভক্তবৃন্দ আজ কোথায়? পরিকল্পনা, অর্থসংগ্রহ অথবা আনুষঙ্গিক কোন ব্যাপারেই ত শিল্পাচার্য্যের শিষ্য-প্রশিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে কোনরূপ উৎসাহের সঞ্চার দেখিতেছি না।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জন অগ্রণী হইয়া কিছু দিন পূর্বে শিল্পাচার্যের প্রধান শিষ্যদের নিকট এক অনুরোধপত্র প্রেরণ করেন। সে পত্রের উত্তরগুলি ত আশাব্যঞ্জক নহেই, তাঁহার কৃতী শিষ্যমণ্ডলীর পক্ষেও বিশেষ গৌরবদ্যোতক নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে কর্তব্য পালনে কতকটা প্রস্তুত। এক দিকের ভার বহন করিতে তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন। যে জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইবে তদুপলক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য একখানি "গোল্ডেন বুক অফ টাগোর" মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিল্পাচার্যের শিষ্যগণের পক্ষে এখনও উদাসীন থাকা অত্যন্ত অশোভন হইতেছে। এ বিষয়ে প্রথম কর্তব্য ও প্রধান দায়িত্ব তাঁহাদের। তাঁহারা অগ্রণী না হইলে শিক্ষিত জনসাধারণ তাঁহাদের কর্তব্যপালনে কিরূপে উদ্বুদ্ধ হইবে? শিল্পাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্যগণ সকলেই কৃতী। তাঁহাদের পক্ষে কি গুরুদক্ষিণা আনয়ন করিবার এখনও সময় হয় নাই? তাঁহারা উৎসাহিত হইলে তবেই জনসাধারণ উৎসাহিত হইবে। অবনীন্দ্র-জয়ন্তী সফল করিতে হইলে এখনই কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। পত্নীবিয়োগবিধুর, নষ্টস্বাস্থ্য, বর্ষীয়ান্ শিল্পীগুরুর প্রতিভার প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শনে আর যেন আমরা কালবিলম্ব না করি।

বাংলার বর্তমান খাদ্যসঙ্কটে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব

বাংলার বর্তমান খাদ্যসঙ্কটে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার, বিশেষতঃ হক-মন্ত্রিমণ্ডলের দায়িত্ব কতখানি, সর্ আজিজুল হকের বক্তৃতায় তাহার আভাস রহিয়াছে। ১৯৩৯-এর পর হইতে ভারত-সরকার মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য-সমস্যার আলোচনার জন্য একটির পর একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং প্রাদেশিক মন্ত্রীরা এই দুইটি অত্যাবশ্যক ব্যাপারে জনসাধারণের উপকার করিতে না পারিলেও মোটা ভাতা ও ভ্রমণব্যয় প্রভৃতি টানিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন। সর্ আজিজুল বলিয়াছেন, ১৯৪২-এর ডিসেম্বর মাসে খাদ্য-সমস্যা আলোচনার জন্য নয়া দিল্লীতে যে খাদ্য-সম্মেলন হয় তাহাতে চাউল সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল। বাংলার তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক এবং কয়েক জন সরকারী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সর্ আজিজুল বলিয়াছেন,

"বাংলা-সরকারের পক্ষ হইতে তাঁহারা বলেন—ঘাটতি পড়িলেও পরবর্তী কয়েক মাস বাহির হইতে চাউল আনান আমাদের আবশ্যক হইবে না। দরকার হইলে বাংলা-সরকার কি প্রকারে চাউল সংগ্রহ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন জানিতে চাহিলে, প্রধান মন্ত্রী বা সরকারী প্রতিনিধি কোন প্রস্তাব করিতে পারেন নাই। সরকারী প্রতিনিধি বলেন, ঐরূপ অবস্থা ঘটিলে আমাদিগকে কার্য্য-প্রণালী স্থির করিতে হইবে। বাংলার পক্ষ হইতে বুঝান হইয়াছিল যে বাংলায় চাউল উদ্বৃত্ত না থাকায় ও ঘাটতি পড়ায় সর্বভারতীয় শস্যভাণ্ডারে বাংলাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে বলা সমীচীন হইবে না; নিজ প্রদেশের বাহিরে চাউল সরবরাহের দায়িত্ব লইতে না বলিলে বাংলা নিজের ঘর সামলাইতে পারিবে। ঐ বৈঠকে বাংলার প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছিলেন—'আমরা জানি যে আমাদের যথেষ্ট চাউল আছে, বাহির হইতে আমাদের কিছু গম পাওয়া আবশ্যক। আমরা বাঁধাধরা কোন নীতিতে আবদ্ধ হইতে চাহি না। আমরা নিজেদের বিবেচনানুসারে ব্যবস্থা করিব।'—অন্যান্য প্রদেশগুলি তখন বাংলাকে হিসাবের বাহিরে রাখিয়া ঘাটতির ও বাড়তির হিসাব করে। বাংলার প্রতিনিধি বলিয়াছিলেন যে, জোয়ার ফসল সম্পর্কে তাঁহাদের কোন আগ্রহ নাই।"

সর্ আজিজুলের উপরোক্ত উক্তি প্রকাশিত হইবার পরদিন মৌলবী ফজলুল হক এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন,

"১৯৪২ সনের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে খাদ্য-সম্মেলনে

আমি যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তাহার বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত করিয়া সর্ আজিজুল ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির অবকাশ দিয়াছেন। এ সম্পর্কে আগামী কল্য আমি এক বিবৃতি দান করিব। আজ শুধু এইমাত্র বলিয়া রাখিতেছি যে, উক্ত খাদ্য-সম্মেলনে আমি বাংলা হইতে বাহিরে খাদ্যশস্য প্রেরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলাম এবং শুধু এই জন্যই সকল প্রদেশের শস্যসম্ভার একত্র করিয়া ভারতের সর্বত্র সরবরাহের জন্য ভারত-সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিবার পরিকল্পনায় বাংলার যোগদান অনুচিত বলিয়া আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। আমি বুঝিয়াছিলাম, বাংলায় ঘাটতি থাকিলেও বাংলা হইতে যদি বাহিরে রপ্তানি না হয়, তাহা হইলে হৈমন্তিক ফসলের সহায়তায় আমরা একরূপ কুলাইয়া উঠিতে পারিব। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের প্রতি যে ব্যবহার করিলেন তাহা বিশ্বাসঘাতকতারই সমতুল। তাঁহারা বাংলা হইতে চাউল ক্রয়ের জন্য এজেন্টগণকে প্রেরণ করিলেন এবং উক্ত সম্মেলনে আমাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির অমর্য্যাদা করিয়া মন্ত্রীদের অজ্ঞাতেই বাংলা হইতে বেপরোয়াভাবে বাহিরে চাউল রপ্তানি করিতে লাগিলেন। বাংলায় খাদ্যসঙ্কটের উৎপত্তির ইহাই মূল কারণ।"

উভয়ের বক্তব্য হইতে দেখা যায়, হক সাহেবের ধারণা ছিল বাংলা হইতে চাউল রপ্তানি না হইলে এবং কিছু গম আমদানি করিতে পারিলে আগামী ফসল না-উঠা পর্য্যন্ত বাংলার একরূপ চলিয়া যাইবে। সর্বভারতীয় শস্যভাণ্ডারে নাম লেখানো তিনি বিপজ্জনক মনে করিয়াছিলেন। এই ভাণ্ডারটি কি, কাহারা ইহার দ্বারা কতখানি উপকৃত হইয়াছে, কেন হক সাহেব বাংলাকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিতে ভয় পাইয়াছিলেন, সর্ আজিজুল তাহা জানান নাই, হক সাহেবের জানা থাকিলে জনসাধারণকে জানান উচিত।

চাউল রপ্তানির যে হিসাব সর্ আজিজুল দিয়াছেন তাহা সন্তোষজনক নহে। তিনি বলিয়াছেন, জানুয়ারী হইতে জুলাই পর্য্যন্ত এ যাবৎ ৮৫ হাজার টন ফসল রপ্তানি করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বাংলার আইন-সভায় গবর্মেণ্ট হিসাব দিয়াছিলেন ১৯৪৩ সালে দুই লক্ষ চুরাশি হাজার টন চাউল রপ্তানি হইয়াছে। হক-মন্ত্রিমণ্ডলের বাণিজ্য-সচিব এই হিসাব দেন এবং স্বীকার করেন যে এই রপ্তানির উপর বাংলার মন্ত্রীদের কোন হাত ছিল না; তাঁহারা বাধা দিয়াও রপ্তানি বন্ধ করিতে পারেন নাই। মৌলবী ফজলুল হকও এখন ঠিক এই কথাই বলিতেছেন। এই ব্যাপারে হক-মন্ত্রিমণ্ডল একেবারে নিষ্কলুষ একথা বলিতেছি না, কিন্তু ভারত-সরকারের দীর্ঘসূত্রিতা, শৈথিল্য এবং অদূরদর্শিতা যে বর্তমান সঙ্কটের প্রধানতম কারণ এ সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র নাই।

অভাব বিদ্যার নয়, অভাব বুদ্ধি শৃঙ্খলা ও চরিত্রের

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় সম্প্রতি 'বর্তমান বাংলা' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তৎপ্রতি দেশের ছাত্র ও যুবক সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত রায় তাঁহার বক্তৃতায় বাংলার নিদারুণ অন্নবস্ত্রের সমস্যার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, "এই সমস্যা এরূপ ভীষণ যে ভাবপ্রবণ ব্যক্তিগণ ইহা লইয়া উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিতে পারেন। কিন্তু যদিও তিনি ভাবপ্রবণতাকে অশ্রদ্ধা করেন না, তথাপি তাঁহার মতে বর্তমান সমস্যাকে যুক্তি দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাস হইতে ১৯৪৩ সালের মে মাস পর্য্যন্ত এই ৫ মাসে বাংলা দেশে চাউলের মূল্য পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিলাতের সঙ্গে এই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির তুলনা করিয়া তিনি বলেন যে, ইংলণ্ডে বর্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভে বহির্জগৎ হইতে তিন ভাগের দুই ভাগ খাদ্য আমদানি করিতে হইত, সেখানে ডুবো জাহাজের উপদ্রব, জাহাজের অসুবিধা সত্ত্বেও খাদ্য-মূল্য শতকরা ৩০ ভাগের বেশী বৃদ্ধি পায় নাই, কিন্তু ভারত নিজের খাদ্য নিজে উৎপাদন সত্ত্বেও এখানে খাদ্য-মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা পাঁচশত গুণ। ইহার ফলে পল্লীগ্রামে মানুষের দুঃখের আর অন্ত নাই। মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় গরু বিক্রয় করিয়াছে, অখাদ্য খাইয়াছে।

"শুধু অন্ন সমস্যাই নহে, বস্ত্র সমস্যা, কয়লা সমস্যা প্রভৃতি নানা সমস্যা বর্তমানে দেশবাসীর সম্মুখে দেখা দিয়াছে। এই অগণিত সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় কি?" শ্রীযুত রায় মহাত্মাজীর একটি কথা উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, যে পর্য্যন্ত ভারতবাসী নিজেদের দেশ শাসনের ক্ষমতা লাভ করিতে না পারিবে সেই পর্য্যন্ত নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব প্রভৃতি কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না।

"এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতবাসীকে প্রস্তুত হইতে হইবে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ হইতে বর্তমান যুগ পর্য্যন্ত ভারতবাসীর চরিত্রে সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবটির কোন পরিবর্তন হয় নাই। পলাশীর যুদ্ধেও মুষ্টিমেয় ইংরেজের

হাতে বাঙালী সেনাদলের পরাজয়ের কারণ ছিল এই সঙ্ঘ-শক্তির অভাব। কেহ কেহ মনে করেন বাঙালী যুবকগণকে কুচকাওয়াজ করাইতে পারিলেই তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করা যাইবে; 'সঙ্ঘশক্তি' বাহিরের জিনিস নহে, অন্তরের জিনিস।"

সমবেত ছাত্র ও যুবকবৃন্দকে বক্তা শৃঙ্খলানুরাগী এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলেন, "এই দুটি গুণ না থাকিলে রাজনীতিক্ষেত্রে কোন স্বদেশসেবকই দেশকে সেবা করিতে পারে না।

"আমাদের দেশে বিদ্যার অভাব নাই, কিন্তু অভাব আছে বুদ্ধির, শৃঙ্খলার, চরিত্রের এবং জীবনের প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির। এ দেশে অন্নবস্ত্রের অভাবটাই বড় অভাব নয়, চরিত্রের অভাব এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবই বড় অভাব। এই কারণে পরাধীনতার গভীর বেদনা আমাদের মনকে স্পর্শ করে না। কিন্তু যে কেহই একবার এই বেদনার আস্বাদ পায়, সাংসারিক জীবনের সকল সুখ সকল আরামের মধ্যে অগণিত দেশবাসীর বহু ব্যথা, বহু অভাব তাহাকে আরামে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে দেয় না। কর্ম-ক্ষেত্রে তোমরা চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী প্রভৃতি হইতে পার; কিন্তু যে-দেশ তোমাদিগকে ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল দিয়াছে, যে-দেশের বায়ু তোমাদের দেহে জীবনের স্পন্দন আনিয়াছে সেই দেশের প্রতি তোমাদের কর্তব্যকে আশা করি কখনই বিস্মৃত হইবে না।"

—

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় স্মৃতিবার্ষিকী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমনের দ্বিতীয় বার্ষিকী দিবসে বহু প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সভায় সমবেত হইয়া বিশ্বকবির অশেষ দানের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন এবং তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

২১শে শ্রাবণ প্রাতে কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিমতলা ঘাটে সমবেত হইয়া তাঁহাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানায়। তথাকার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইবার পর ইহারা তীর্থযাত্রীর ন্যায় যোড়াসাঁকোর বাসভবনের যে কক্ষে কবি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন সেই কক্ষের সম্মুখে শ্রদ্ধানত চিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করেন। অপরাহ্নে নিখিল-ভারত রবীন্দ্রস্মৃতি সমিতির উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে জনসভা হয়। কলিকাতার লর্ড বিশপ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভার আরম্ভে সমবেত জনমণ্ডলী এক মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া কবির পুণ্যস্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,

"বিরাট মানব সমাজের এমন কোন কিছুই নাই যাহা রবীন্দ্রনাথের চিন্তা প্রবং অনুভূতির রসে পুষ্ট হয় নাই। আমার মানস চক্ষের সম্মুখে কবির সুন্দর আনন এবং তাঁহার অপরূপ ভঙ্গী উদ্ভাসিত রহিয়াছে। প্রেম, সহানুভূতি ও প্রতিভার দ্বারা তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। গভীর চিন্তা-ধারাকে সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করিবার অপূর্ব ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতন তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান কীর্তিস্তম্ভ। ঘৃণা এবং জাতিত্বের গর্ব পৃথিবীতে এক ভীষণ যুদ্ধের সূচনা করিয়াছে। কিন্তু শান্তিনিকেতনের বাণী সৌভ্রাত্রের বাণী। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের বাণী সেই ভগবৎ-প্রচারিত সত্যেরই বাণী। শান্তিনিকেতন বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার কেন্দ্র। চীনাভবন ছাড়াও, চার্লস এণ্ড্রুজের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটি পাশ্চাত্য শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ যে মহান্ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং যাহাকে তিনি সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনায় পুষ্ট করিয়াছিলেন তাহাকে একটি বিরাট শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করার জন্য প্রত্যেকেই যথাসম্ভব সাহায্য করিবেন।"

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের স্পীকার সৈয়দ নৌশের আলী বলেন,

"মানবের মানসিক দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসার জন্য যুগে যুগে যে-সকল মহামানব পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন বিশ্বকবি, দার্শনিক, দেশপ্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার মহান্ আদর্শ, শিক্ষা, সমগ্র মানব জাতির একত্ব ও ভ্রাতৃত্ব বোধ আলোচনা করিলে ক্ষণিকের জন্য আমরা উচ্চস্তরে উন্নীত হই। তাঁহার রচনাবলী সত্যই উপভোগের বস্তু। তাহা বিশ্বমানবের জ্ঞান, সাহিত্য এবং কৃষ্টির ভাণ্ডারে চিরকাল অতুলনীয় সম্পদরূপে বাঁচিয়া থাকিবে। যত দিন পৃথিবী থাকিবে, যত দিন বাংলা ভাষা এবং পৃথিবীর কোন ভাষা বাঁচিয়া থাকিবে, যত দিন পৃথিবীতে ন্যায় সত্যের আদর্শ থাকিবে তত দিন কবিগুরুর স্মৃতি অমর হইয়া রহিবে।"

অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্ বীরেন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন সরকার, শ্রীমতী সুনীতিবালা গুপ্তা, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও বক্তৃতা করেন।

—

বৈদিক বিবাহ

অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

বৈদিক যুগের পরবর্তী ঋষিরা আট প্রকারের বিবাহের উল্লেখ করেছেন। ব্রাহ্ম, আর্ষ, প্রাজাপত্য প্রভৃতি সর্ব প্রকারের বিবাহ বৈদিক যুগেও প্রচলিত ছিল কিনা এবং থাকলেও কি প্রকারের বিবাহ সমাজে অধিক প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তী যুগের নানাবিধ বাধ্যবাধকতা বৈদিক যুগেও মেনে চলা হ'ত কিনা—এ সমস্ত বিষয়ের সংক্ষেপে আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

উপনিষদ্ যুগের শেষের দিকে বা অব্যবহিত পরেই সূত্রসাহিত্য রচিত হইতে থাকে। এ সূত্রসাহিত্যের অন্তর্গত কোন কোনও গ্রন্থে[১] মহাভারত ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত আট প্রকারের বিবাহের বিষয়ে উল্লেখ আছে। আপস্তম্ব[২] ও বাশিষ্ঠধর্মসূত্রে[৩] প্রাজাপত্য ও পৈশাচ বিবাহের উল্লেখ নাই; বলা বাহুল্য, মনুও[৪] এ দু-বিবাহ বিষয়ে কোনও উল্লেখ করেন নি। বৈদিক কোনও গ্রন্থে এ আট প্রকারের বিবাহের কোনও বর্ণনা নাই। এমন কি, শাঙ্খায়ন, গোভিল, পারস্কর, খাদির প্রভৃতি অধিকাংশ গৃহ্যসূত্রেও এ বিষয়ে কোনও উল্লেখ নাই। সুতরাং বৈদিক যুগে এ আট প্রকারের বিবাহের কোন্ কোন্‌টি প্রচলিত ছিল, তা গবেষণার বিষয়।

কোন্ বিবাহের মৌলিক লক্ষণ কি, তা প্রথমেই বলা দরকার। ব্রাহ্ম-বিবাহে কন্যার মাতাপিতা স্বেচ্ছায় কন্যাকে পাত্রস্থ করেন; দৈব-বিবাহে বর পুরোহিত-শ্রেণীর অন্তর্গত হওয়া চাই; আর্ষ-বিবাহে বরের গো-মিথুন উপহার দিতে হয়; প্রাজাপত্যে বরেরই বিবাহের প্রস্তাব আনয়ন করতে হয়; গান্ধর্ব-বিবাহে কন্যা ও বরের স্বীকৃতিই সমধিক প্রয়োজনীয়; আসুর-বিবাহে কন্যার পিতা বরের থেকে অর্থগ্রহণ করেন; পৈশাচ-বিবাহে কন্যার আত্মীয়-স্বজনদের ঘুমন্ত বা অসাবধান অবস্থায় কন্যাকে অপহরণ ক'রে নেওয়া হয়; এবং রাক্ষস-বিবাহে কন্যার আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা ক'রে কন্যাকে জোর ক'রে নেওয়া হয়।

ব্রাহ্ম-বিবাহ আসুর ও পৈশাচ বিবাহের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল নিশ্চয়ই। দৈব-বিবাহও যে বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ এই যে যজ্ঞের সুসমাপ্তির পরে অনেক যজমান স্বকীয় কন্যার সহিত পুরোহিতের বিবাহ দিতেন। যারা বিজামাতা,—কন্যার পাণিপ্রার্থী হলেও গুণপনায় যারা ন্যূন, তাদের যে শ্বশুরকে অর্থ দিয়ে অনেক সময় কন্যা যোগাড় করতে হ'ত, তার প্রমাণ বৈদিক গ্রন্থে[৫] আছে। কিন্তু আসুর-বিবাহ যে বৈদিক সমাজ সুনজরে দেখত না, তার প্রমাণও বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়।[৬] আর্ষ-বিবাহে প্রদত্ত গো-মিথুন বর আবার শ্বশুর মশায়ের থেকে ফিরে পেতেন; সুতরাং আর্ষ-বিবাহের সঙ্গে আসুর বিবাহের কোন সামঞ্জস্য নাই। এ গো-মিথুনের প্রদানের হেতু যাই হোক—শাঙ্খায়ন[৭] প্রভৃতি ঋষিরা এ বিবাহ মেনে নিয়েছেন এবং বৈদিক সমাজেও ইহা প্রচলিত ছিল,—তা সন্দেহের কারণ নাই। প্রাজাপত্য বিবাহের প্রমাণ ঋগ্বেদেও[৮] পাওয়া যায়। বিমদ পুরুমিত্রের কন্যাকে জোর করে পিতার মতের বিরুদ্ধে কিন্তু কন্যার সম্মতিক্রমে নিয়ে যায়[৯]; এর থেকেই পৈশাচ বিবাহের প্রমাণ পাওয়া যায়। কন্যা এবং কন্যার মাতাপিতা সকলের মতের বিরুদ্ধে কন্যাকে জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে যে বিবাহ হ'ত এবং পরবর্তী যুগে যা রাক্ষস বিবাহ নামে চল্‌ত, সে বিবাহ বৈদিক যুগে বিবাহ বলে স্বীকৃত হ'ত কিনা, তার কোনও প্রমাণ নাই। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগেও রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ যে সমাজে চলত, সে বিষয়ে সন্দেহের

১। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, ১, ৬; গৌতমধর্মসূত্র, ৪, ৬, ১৩।
মহাভারতের কোন কোন জায়গায় (যথা ১, ৪৪, ৩এ) কেবল পাঁচ প্রকারের বিবাহের উল্লেখ আছে। স্থানান্তরে 'স্বয়ংবর' সহ নয় প্রকারের বিবাহ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।

২। ২, ১৬, ১৭ ও পরবর্তী সূত্রসমূহ।

৩। ১, ৩০ ও পরবর্তী সূত্রসমূহ

৪। ৩, ২১।

৫। ঋগ্বেদ ১, ১০৯, ২; ৮, ২, ২০; মৈত্রায়ণীয়-সংহিতা, ১, ১০, ১১; তৈত্তিরীয় সংহিতা, ২, ২, ৪, ১; কাঠক-সংহিতা, ৩৬, ৫; তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ, ১, ১, ২, ৪; নিরুক্ত, ৬, ৯ তুলনীয়।

৬। অশিব-জামাতৃ, ঋগ্বেদ, ৮, ২, ২০; নিরুক্ত ৬, ৯ তুলনীয়।

৭। ৮, ১৪, ১৬

৮। ১০, ৭৮, ৪; ৮৫, ১৫, ২৩

৯। ঋগ্বেদ ১, ১১২, ১৯; ১১৬, ১, ইত্যাদি তুলনীয়।

অবকাশ নাই।[১০] জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ[১১] ও বৃহদ্দেবতায়[১২] দেখা যায় যে যথাক্রমে চ্যাবাক এবং শ্যাবাশ্ব কায়িক পরিশ্রমাদির বিনিময়ে কন্যার পাণিগ্রহণ করছেন। ঈদৃশ বিবাহ আসুর বিবাহের অন্তর্গত বলে গণ্য করা যেতে পারে।

গান্ধর্ব বিবাহই সমাজে সমধিক প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। বাৎস্যায়নের মতে গান্ধর্ব বিবাহই সর্বোৎকৃষ্ট এবং এ বিবাহ বৈদিক যুগেও তাদৃশরূপে পরিগণিত হ'ত। বাল্য-বিবাহ ছিল বৈদিক সমাজে অচল; এবং পরিণত বয়স্কা কন্যারা মাতাপিতার মতের বিরুদ্ধেও বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হ'তে প্রয়োজন হ'লে কুণ্ঠিত হ'তেন না। কারণ, তখনকার দিনে কন্যাকে কাকেও সম্প্রদান করতে হ'ত না, আজকালকার দিনের মত দরকার হ'লে ছোটবোনেরা বড়বোনদের আগে বিয়ে করতেন এবং মনোমত বিবাহে অপারগ হলে পিতৃগৃহেই নারীরা জীবনযাপন করতেন।[১৩] বৈদিক যুগের প্রেমের সাবলীল গতি অবলীলাক্রমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঋগ্বেদে দেখা যায়, জুয়া খেলোয়াড়ের তীব্র নেশায় ছুটে চলেছে প্রেমসর্বস্বা রমণী অভিসারের উন্মত্ত বাসনা হৃদয়ে পোষণ করে।[১৪] কুমারী যেমন স্বীয় প্রেমাস্পদকে সাদরে গ্রহণ করেন, তেমনি আদর ভরে অভ্যর্থনা করে সোমরসকে অঙ্গুলিনিচয়।[১৫] নদী তেমনি ক'রে নিজকে ধরা দেয়, যেমনি ক'রে ধরা দেন বৈদিক যুবতী তার প্রিয়ের কাছে।[১৬] প্রিয়া যেমন করে প্রেমাস্পদকে গ্রহণ করে, সোমরস তেমনি আদরে অভ্যর্থিত হয়।[১৭] এ রকমের বহু চিত্র আমরা বেদে পাই।

বৈদিক বিবিধ ক্রিয়াকলাপ ও মন্ত্র থেকেও[১৮] বৈদিক যুগে প্রেমমূলক বিবাহের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। বিবাহ বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা উপযুক্ত বরের আদর-আপ্যায়নে স্বকীয় জীবন সার্থক করে তুলুক—মাতাপিতার এই আকুল প্রত্যাশা।[১৯] প্রিয়ার আকুল বাসনা ও চরম প্রার্থনা যেন তিনি সর্বক্ষণ প্রিয়ধ্যানে, প্রিয়ব্রতে আত্মনিয়োগ করে তারই সর্বস্ব হ'য়ে থাকতে পারেন; তিনি ভাবেন তাঁর প্রিয় মধু, তাঁর বাক্য মধু, তিনি স্বয়ং মধু, মধু ব্যতীত তাঁর কিছুই নাই।[২০] তাদের চক্ষুযুগল মধু; তাদের বদনমণ্ডল অন্যোন্য প্রলেপ; তারা উভয়ে একে অন্যের হৃদয়ে বসতি করে—মন তাদের এক, এর বিভিন্ন সত্তা নাই।[২১] যুবক-যুবতীরা সমানে স্বীয় প্রেম-প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাভূত করবার জন্য কত অসাধ্য সাধনে ব্যাপৃত; মন্ত্র, তন্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় সাধনের সাধনায় নিমগ্ন।[২২] প্রেমসর্বস্বা অনূঢ়া যুবতী স্বীয় প্রিয়তমকে এক দিনের জন্যও চোখের আড়ালে যেতে দিতে রাজী নন; নিতান্ত বাধ্য হ'য়ে যেতে দিতে হ'লেও প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞায় অভিভূত ক'রে দেন প্রিয়বরকে—যে তিনি সম্পূর্ণ তাঁর থাকবেন, তাঁর হ'য়েই ফিরবেন—এর কোনও অন্যথা হবে না। প্রিয়ের বাধা দেওয়ার কিছুই নাই; প্রিয় মৃদু ভঙ্গিতে সর্ববিষয়ে সম্মতি জানান; কারণ দীর্ঘ বক্তৃতা সভায় শোভনীয়, প্রিয়ার কাছে নহে।[২৩] এক দিনের বিরহে প্রিয়া যাতে আকণ্ঠ পিপাসায় শুকিয়ে উঠতে পারেন, প্রিয় কায়মনোবাক্যে তাই প্রার্থনা করেন;[২৪] এবং প্রিয়া স্বকীয় চুলে তাঁকে একবার বেঁধে নেন, যাতে প্রিয় সম্পূর্ণ তাঁর থেকে, তাঁর হ'য়েই ফিরতে পারেন।[২৫] বৈদিক গ্রন্থের বহু স্থলে মিলন-প্রত্যাশী প্রিয়-প্রিয়ার ঈদৃশ কাকুতি-মিনতি ও অধীর আকুলতার অন্ত নাই। সুতরাং প্রাপ্ত বয়সে প্রেমমূলক বিবাহই সমাজের রীতি ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

বৈদিক যুগে নারীদের উচ্চ শিক্ষা সমাজের মূলমন্ত্র ছিল; বড় বড় ঋষির আশ্রমে এবং অন্যান্য বিদ্যামন্দিরে নারী ও পুরুষ সমভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হ'তেন। সহপাঠী ছাত্রছাত্রীদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ অতি স্বাভাবিক; এবং ঐ অনুরাগই অনেক ক্ষেত্রে উত্তর কালে বিবাহে সার্থকতা লাভ করত। উৎসবাদি উপলক্ষে এবং বৈদিক

১০। Schrader-র Prehistoric Antiquities পৃ. ৩৮২-৩৮৩; তুলনা করুন, Lubbock, Origin of Civilisation, পৃ. ৭২; বর্তমান যুগেও যে এ দু-প্রকারের বিবাহ আছে, তার প্রমাণ,—Westermarck, Short History of Marriage, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ. ১১০, ১২০ এবং ভারতবর্ষের স্থানবিশেষে যে ইহা এখনও প্রচলিত আছে, তার প্রমাণ উক্ত পুস্তকের Supplement IIIতে দেওয়া আছে।

১১। ৪, ১২২

১২। ৫, ৪৯, ইত্যাদি।

১৩। ঋগ্বেদ ১, ১১৭, ৭; ২, ১৭, ৭; ১০, ৩৯, ৩; ১০, ৪০, ৫; অথর্ববেদ ১, ১, ১৪ তুলনা করুন, অথর্ববেদ, ১৮, ২, ৪৭।

১৪। ঋগ্বেদ, ১০, ৩৪, ৫; তুলনীয় ১০, ৪০, ৬।

১৫। ঋগ্বেদ, ১০, ৫৬, ৩

১৬। ঋগ্বেদ, ৩, ৩৩, ১০

১৭। ঋগ্বেদ, ৯, ৩২, ৫

১৮। অথর্ববেদ, ২, ৩০ ২-৩, ইত্যাদি; ঋগ্বেদ, ৭, ২, ৫।

১৯। অথর্ববেদ, ২, ৩৬, ৪-৫

২০। অথর্ববেদ, ১, ৩৪, ২।

২১। অথর্ববেদ, ৭, ৩৬; তুলনীয় ৬, ১০২।

২২। অথর্ববেদ, ৬, ১৩৮; ৭, ৯০; ১, ১৪

২৩। অথর্ববেদ, ৭, ৩৮; ঐ ৬, ১, ৩১

২৪। অথর্ববেদ, ৬, ১৩৯।

২৫। অথর্ববেদ, ৭, ৩৬

২৬। অথর্ববেদ, ২, ৩৬, ১; ঋগ্বেদ ৭, ২, ৫; ৪, ৫৮, ৫

"সমন"[২৭] স্থানে নরনারীর স্বচ্ছন্দ মেলামেশার সুযোগ ঘটত। মহাব্রত প্রভৃতি বৈদিক যজ্ঞেও নরনারীর সঙ্গীত, নৃত্যাদির প্রাচুর্য হেতু প্রিয়-প্রিয়াদের মিলনের বহুল অবকাশ ঘটত। চাকচিক্যশীল বেশভূষায় সুশোভিত হয়ে' শুধু যে কুমারীরা সমন স্থলে ঘোরাফেরা করতেন, তা' নয়, এমন কি, জরদ্‌দ্ধারাও এ ব্যাপারে বাদ যেতেন না।

উপরিলিখিত প্রমাণ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে বৈদিক যুগে নারী-স্বাধীনতা, নারীর উচ্চশিক্ষা প্রভৃতির বিদ্যমানতা হেতু জীবনের সহধর্মী মনোনয়নে কোনও বাধা তাঁরা পেতেন না; পেলেও তাঁরা তা' মানতে বাধ্য হতেন না। কন্যা মাতাপিতার দায়স্বরূপ ছিলেন না; সুতরাং তাঁদের স্কন্ধের বোঝা নামানোর প্রশ্ন উঠত না—তাঁরা পুত্রের মত কন্যাকেও স্বকীয় ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতেন মাত্র।

কালক্রমে নারীদের শিক্ষায় দীক্ষায় অবনতি ঘটল এবং সর্বদিকে ভাগ্যবিপর্যয় দেখা দিল। পূর্ববর্তী স্মৃতিকারেরা দিলেন বাল্য-বিবাহের বিধি; পরবর্তী স্মৃতিকারেরা ভ্রূণাবস্থায় বিবাহেরও অনুমোদন করলেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে যত প্রকারের বাধ্যবাধকতা মাথা তুলে দাঁড়াল। হৃদয় বিনিময়ের পরিবর্তে বাহ্যিক আস্থা হয়ে উঠল বিবাহে প্রধান; মাতাপিতার পারিবারিক, সামাজিক অবস্থা প্রভৃতিই বিবাহে কন্যার নির্ভরস্থল হ'য়ে দাঁড়াল।

'সূত্র'-যুগে দেখা যায়—বিবাহের বাধ্যবাধকতা কঠোরতর হ'য়ে উঠেছে। গোভিলগৃহ্যসূত্র,[২৮] মানবগৃহ্যসূত্র,[২৯] হিরণ্যকেশিগৃহ্যসূত্র[৩০] এবং বৈখানসগৃহ্যসূত্রের মতে সগোত্রা বা সমানপ্রবরা কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই; গোভিল এবং বৈখানস মাতৃসপিণ্ডার সহিতও বিবাহ নিষেধ করেছেন। আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রের মতে[৩১] পিতৃ-সগোত্রা ও মাতৃ-বন্ধু পরিণয়যোগ্যা নহেন। মায়ের থেকে পঞ্চম পুরুষ পিতার থেকে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত পিতৃ-সগোত্রা ও মাতৃ-সগোত্রার সহিত পরিণয় নিষিদ্ধ—এ মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারদের মত। অনেকের মতে মাতা ও পিতার থেকে যথাক্রমে পঞ্চম ও সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত সমানপ্রবরাও বিবাহ-যোগ্যা নহেন। কোনও কোনও স্মার্ত মাতা বা গুরু কন্যার সমনামবিশিষ্টা কন্যার সঙ্গে বিবাহ নিষেধ করেছেন। এমন কি, 'ব্রাহ্মণ'-যুগেও যে এ সব বাধ্যবাধকতা শিথিল ছিল—তার প্রমাণ শতপথব্রাহ্মণ—১, ৮, ৩, ৬;—এখানে বলা আছে যে তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত এ বাধ্যবাধকতা মানা চলে; তাও টীকা-প্রসঙ্গে হরি স্বামী বলেছেন যে সে কেবল কাণ্ব ও সৌরাষ্ট্রেরা মানত; দাক্ষিণাত্যবাসীরা, এমন কি, মামাত বোন, পিসতুত বোনকেও বিয়ে করত। এ সব বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ বোধায়ন, অপরার্ক প্রভৃতি স্মার্তদের মধ্যে রয়েছে বটে; তবে দাক্ষিণাত্যবাসীরা, এমন কি, খুড়তুতো বোনকেও বিয়ে করতে পারে, এ মত অনেক স্মার্তই প্রচার করেছেন।

ঋগ্বেদের শেষের দিকে বর্ণ-প্রথার উদ্ভব দেখা যায়। তার পর যজুর্বেদ, অথর্ববেদ প্রভৃতির সময়েও বর্ণপ্রথা তত কড়াকড়ি ভাবে দেখা দেয় নি। উপনিষদ্‌ ও সূত্র যুগেও বর্ণপ্রথা তত বিশ্রীভাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। তদুপরি—গোত্র ছিল পরিবর্তনীয়; যথা—তখনকার দিনে আঙ্গিরসের ভার্গব হ'তে কোনও বাধা হ'ত না—গৃৎসমদের কাহিনী থেকে তা জানা যায়। শুনঃশেপের গল্প থেকেও গোত্র-পরিবর্তনের বিষয়ে জানা যায়। গোত্র-পরিবর্তনের তেমন প্রয়োজন অনুভূত হ'লে পুরোহিত পরিবর্তনের দ্বারাও ঐ সমস্যার মীমাংসা হয়ত অনেকের হ'তে পারত। তার পর খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত অনুলোম অর্থাৎ উচ্চ বর্ণের বরের সঙ্গে নিম্ন বর্ণের কন্যার বিবাহ ত স্মৃতি-অনুমোদিতই ছিল। ফলে সংস্কৃত নাটকাদি, শিলালিপি প্রভৃতি থেকে ঈদৃশ বিবাহের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতিলোম বিবাহও যে সমাজে প্রচলিত ছিল, তা শিলালিপি প্রস্তর লিপি প্রভৃতির থেকে প্রমাণিত হয়। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকার অষ্টম খণ্ডে[৩২] বিবৃত তলগুণ্ড স্তম্ভলিপিতে লিখিত আছে যে ককুৎস্থবর্মার চতুর্থ পুরুষ ছিলেন ময়ুরশর্মন; কাঞ্চীর পল্লব-রাজদের অত্যাচারে তিনি অসিধারণ করতে বাধ্য হন। তদুপরি তিনি গুপ্ত ও অন্যান্য রাজপরিবারে স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। তদবধি তাঁর বংশধরেরা 'শর্মা'র পরিবর্তে 'বর্মা' লিখতে আরম্ভ করে।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বুক্ক রায়ের কন্যা বিরূপা দেবী বোমেন্নওডেয় বা ব্রহ্ম নামক জনৈক ব্রাহ্মণের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা হন; এ বোমন্ন আরগ নামক প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন।[৩৩] সুতরাং প্রাচীন বা মধ্য ভারতেও প্রতিলোম ও অনুলোম বিবাহক্রমে স্বকীয় বর্ণের বাইরে বিবাহ চলত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

২৮। ৩, ৪, ৩-৫
২৯। ১, ৭,
৩০। ১, ১৯, ২
৩১। ২, ৫, ১১, ১৫-১৬

৩২। পৃ. ২৪
৩৩। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ১৫ খণ্ড, পৃ. ১২।

এবং অতি প্রাচীন বা বৈদিক যুগেও যে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে অবাধে বিবাহ চলত, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। হৃদয়ের মিলনই যেখানে বিবাহ-বন্ধনের মূলসূত্র, সেখানে বাহ্যিক বাধা অগ্রাহ্য; জাতি-ভেদ নিয়ে চির-জীবনের ভেদ মিলনোন্মুখ হৃদয়দ্বয় মেনে নিতে পারে না। এবং সামাজিক বন্ধনের দিক থেকেও এ কৃত্রিম আবেষ্টনের প্রয়োজনীয়তাও প্রাচীন ঋষিরা কোন কালেও অনুভব করেন নি। কালক্রমে যে বাধ্যবাধকতা মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়েছিল, স্বভাব-সুগম জীবনপন্থা কণ্টকাকীর্ণ ক'রে তুলেছিল—সেগুলির উদ্ভব সাময়িক প্রয়োজনবশতঃই হয়েছিল; তা বৈদিক নয়—এবং সে জন্যই অগ্রাহ্য। স্বতঃস্ফূর্ত মঙ্গলের পথে কণ্টক ছড়ান বৈদিক ঋষির স্বভাব-বিরুদ্ধ; কৃত্রিম বেড়াজালে জীবন হাঁফিয়ে তোলা তাঁরা বস্তুতঃ ঘৃণা করেন। প্রণয়পূত ধন্য জীবনদ্বয়ের মঙ্গল পথে জাতিগত ভেদ বা তাদৃশ বাধা সৃষ্টি ক'রে দুটি জীবনকে পঙ্গু করার ব্যবস্থা ত্রিকালদর্শী ঋষিরা করতে পারেন না; বেদে তার কোনও প্রমাণ নেই, শুধু নয়—বৈদিক ঋষিরা তার কল্পনাও করতে পারেন না—এ ধ্রুব সত্য।

মায়াজাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৬

শাশুড়ীকে প্রণাম করিতেই তিনি যোগমায়ার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, তুমি বাড়ি নেই—বাড়ি যেন খাঁ-খাঁ করছিল। না যত্ন সংসারের—না যত্ন ছেলেমেয়ের। পর দিয়ে কখনও কাজ চলে।

যোগমায়া বলিল, ছোটবউ চলে গেল কেন মা ?

কে জানে কেন! বিধবা মানুষ—একটু যদি আচার-বিচার আছে? এড়া কাপড়ে কুয়োর জল তোলা, এড়া কাপড়ে ঘর-দুয়োর নৈনেত্য করা—দু-চক্ষে দেখতে পারি না। আর এই ব্যাদড়া ছেলেগুলো—খালি ছুঁই-ছুঁই।

যোগমায়া বুঝিল, সুহাস শুধু শুধু এ গৃহ ত্যাগ করে নাই। এই অনিয়ম-অনাচারের কাহিনীর পিছনে অনেকখানি ঘটনা আছে—যাহার জন্য সুহাসের ভাইয়ের আগমন হইয়াছিল। কে জানে, সুহাস আর আসিবে কি না। মেয়েটা সত্যই সরল ছিল। কাজকর্ম্মের কোন শ্রীছাঁদ ছিল না, আচার-বিচারের খুঁটিনাটি মানিয়াও সে চলিতে পারিত না। তাহার আচরণে যোগমায়াও কতবার বিরক্ত হইয়াছে, কত কটু কথা বলিয়াছে। সুহাস কড়া কথা শুনিয়া রাগ করে নাই কোন দিন। হাসিয়া বলিয়াছে আমার ভুলো মন দিদি, সব ভুলে যাই। শাশুড়ী ছিল না ঘরে—যা করেছি সব আমি। কিসে কি হয় অত আমি বুঝতে পারি নে।

বধূটির উপর শাশুড়ীর অভিযোগ চলিতেই লাগিল। যোগমায়া কতক শুনিল, কতক বা শুনিল না। এ কাহিনী অনেক বার শোনা। বিধবা মানুষের শুচিতা রক্ষার জন্য ওই সব-ভোলা বধূটি কত বার কত অনিয়ম করিয়াছে—কত মর্ম্মভেদী বাক্যও শুনিয়াছে। অথচ শাশুড়ীই দয়াপরবশ হইয়া ওই মূর্ত্তিমতী অনিয়মকে ঘরে ঠাঁই দিয়াছিলেন এক দিন। শাশুড়ীকে ...ন দিনে যোগমায়া বুঝিতে পারিয়াছে। সংসারকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার যত কিছু অনুশীলন বৃত্তি। এই সংসারের ত্রুটি বা অনিয়ম বা অনাচার যাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়—তাহাকেই তিনি নির্ম্মম ভাবে আক্রমণ করেন; যে সংসারকে চালাইবার দক্ষতা লাভ করে—সেই তাঁহার প্রিয়। সংসারের বাহিরে যে জগৎ—শাশুড়ীর চোখে তা অকিঞ্চিৎকর। সেখানে কেহ মরিলে অভ্যাসবশতঃ তিনি খেদ করেন, কেহ সৌভাগ্যবতী হইলে মুখে আনন্দ প্রকাশ করেন। লোকলৌকিকতায়, আচার-ব্যবহারে কোথাও মর্য্যাদা বা সৌজন্যের অভাব ঘটিতে দেন না। উপার্জ্জনে অক্ষম পুত্রের দোষ ও রূপহীনা বধূর ত্রুটি তাঁহার চক্ষে সমান পীড়াদায়ক। কথায় কথায় তিনি ভগবানের দোহাই দেন, কিন্তু ভগবানের আরাধনায় সত্যকারের যে সময় ব্যয়িত হয়—সেটুকু সময় বিলাইবার কার্পণ্যও তাঁহার যথেষ্ট। ষষ্ঠীপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক ক্ষুদ্র-বৃহৎ পূজায় দেবার্চ্চনার ত্রুটি হইবার উপায় নাই, আবার সংসারের অকল্যাণ হইলে দেবদেবীরাও গালি-গালাজ হইতে রেহাই পান না। যেমন হৃষীকেশের মৃত্যু-সংবাদে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, একচোখো ভগমানের এবি অবিচের মা। ... আমি তিন কেলে বুড়ি রইলাম পড়ে, আর... ঘোর কলি কাল, ওনাদের মাহিত্তির আর নেই। অথচ শীতলা লইয়া কেহ ভিক্ষায় আসিলে বলেন, ঠিক দুপুরবেলায় আর কেন তোমরা ... সারাদিন মাকে না খাইয়ে···এই নাও পয়সা খাওয়া হয়ে গেছে চাল তো দিতে নেই। অপরাধ নিয়ো না মা, অপরাধ নিয়ো না।

সংসারে অনেক কাজ। যোগমায়ার ভাবনার অবসর নাই। অবসর থাকিলে সে নিজের বহুকাল বিস্মৃত বধূজীবন লইয়া ভাবিতে পারিত। কিন্তু আশ্চর্য্য, বধূজীবনের কথা আজকাল যোগমায়ার অল্পই মনে পড়ে। কখনও কোন ঘটনায় হয়ত সামা...

ঢেউ উঠে, কিন্তু বুদ্বুদের ন্যায় মুহূর্ত্তকাল স্থায়ী সেই ঢেউ। বুদ্বুদ্ ফাটিয়া যায়—নূতন বুদ্বুদ্ ফুটিয়া উঠে।

পর দিন নিস্তারিণী (তিলিদের সেই ক্ষুদে বউটি। আজ আর সে বধূ নহে—শাশুড়ীর মৃত্যুতে পুরাদস্তুর গৃহিণী হইয়াছে) দেখা করিতে আসিল।

—কই গো দিদি, কবে এলে বাপের বাড়ি থেকে? সব ভাল?

—হাঁ ভাল, তুমি ভাল আছ? নিশু, আশু ভাল আছে?

—হাঁ দিদি, তা গায়ে-পায়ে ভাল আছে। একটু সরিয়া আসিয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া কহিল, এবার একলা সংসার ঠেলা—কত কষ্টই না হবে—

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, তুমিও তো একলা সংসার ঠেলছ ভাই।

নিস্তারিণী চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল, আমার সংসার—আর তোমার! দুখানা ঘর—একটু উঠোন—কতক্ষণই বা লাগে ঝাঁট দিতে। গরু-বাছুরের পাট নেই।

যোগমায়া বলিল, নিজেরই ত সংসার, চলে যাবে কোন রকমে।

একটু থামিয়া নিস্তারিণী বলিল, তা এক কাজ কর না দিদি, একজন ঝি রাখ। গরুর কাজ, বাসন মাজা, উঠোন ঝাঁট, রান্নাঘর নিকোন—

দূর! শাশুড়ীদের আমলে উনি সব করেছেন, আমি রাখবো ঝি? অত বড়মানুষি সইবে না ভাই! তা ছাড়া ভোরবেলায় উঠে নিজের হাতে পাটঝাঁট না সারতে পারলে—আমারই মন খুঁত খুঁত করবে ভাই। যোগমায়া হাসিল।

নিস্তারিণী বলিল, সাধে কি আর পাড়ার সবাই বলে, বউ দেখতে হয়তো মুকুয্যে বাড়ি যা, যেমন অরুণের গতর—তেমনি কাজেকর্ম্মে ছিরিছাঁদ।

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, তাই বুঝি যখন তখন আমায় দেখতে আস?

—আসিই তো। তোমার সঙ্গ পাওয়া তো পুণ্যির কথা—ভাগ্যির কথা। ছোট্টটি ছিলাম, শাশুড়ী বসিয়ে রেখে যেতেন তোমার কাছে। আমার যা কিছু শিক্ষে—

—যাক্ ভাই। নিজের প্রশংসা যোগমায়া বেশিক্ষণ সহ্য করিতে পারে না।

নিস্তারিণী বলিল, একটা কথা শুনলাম, সত্যি?

—কি কথা?

—তুমি নাকি দিদি বাসায় যাবে?

—বাসা! বাসায় যাব যদি ত এখানে সংসার সাজিয়ে বসলাম কেন ভাই। না ভাই, বাসায় আর যাব না। একটি দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে যোগমায়ার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। মুখ নামাইয়া সে কুলার উপর ছড়ানো ডাল হইতে কুটা বাছিতে লাগিল।

সান্ত্বনার কথা নিস্তারিণী বলিল না। বলিলে অবাধ্য চোখের জলকে শাসন করা—মুশকিল বলিয়াই হয়ত বলিল না। খানিক পরে অন্য প্রসঙ্গ পাড়িল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব দিদি? যদি রাগ না কর তো—

—রাগ করব কেন?

তথাপি ইতস্ততঃ করিয়া নিস্তারিণী বলিল, বিশ্বাসদের রাঙুর মা, বেনেদের মুরারির বউ, সুশীল ডাক্তারের বউ, বুন সব জয়দেবে যাচ্ছে। ভাবছিলাম—

যোগমায়া স্থির দৃষ্টিতে নিস্তারিণীর পানে চাহিয়া বলিল, তুমিও যাবে?

মনে করছিলাম, সঙ্গ ভাল, না হয় ওদের সঙ্গে—

যোগমায়া বলিল, তোমার স্বামীকে বলেছ?

সলজ্জে আরও খানিকটা মাথা নামাইয়া নিস্তারিণী জবাব দিল, বলেছি। জানই তো—মাটির মানুষ।

যোগমায়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিল, তবে আর কি, যাও না।

না দিদি তুমি না বললে—, নিস্তারিণীর স্বর আগ্রহ-কম্পিত।

—তোমার স্বামী যখন মত দিয়েছেন, আমি অমত করব কেন?

—না, তবু তুমি বল।

যোগমায়া নিস্তারিণীর পানে চাহিয়া ম্লান হাসিয়া বলিল, আমার কথা শুনে যদি দুঃখু পাও? যদি বলি—যেয়ো না।

নিস্তারিণী বলিল, কক্খনো যাব না। তুমি ত অন্যায় বলবে না।

—তা হ'লে ভাই যেয়ো না। গেরস্থর বৌ-ঝি—হুট হুট ক'রে মেলায় যাওয়া আমি পছন্দ করি নে। দল বেঁধে যাওয়া মানেই—

যোগমায়া কথাটা শেষ করিল না, নিস্তারিণীও শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল না।

একটু পরে নিস্তারিণী বলিল, সত্যি দিদি, তোমার কথায় মন ঠাণ্ডা হ'ল। ওদের সাধাসাধিতে এমন হয়ে গিয়েছিলাম। সংসারের ভাবনা—ছেলে দু'টোর ভাবনা, তুমি বাঁচালে।

—ওঁরা হয়তো আমার মুণ্ডপাত করবেন।

—ইস্! তোমায় কথা বলে এমন মানুষ ত গাঁয়ে দেখি নে, বলিয়া নিস্তারিণী উঠিল। আজ আসি দিদি।

—এসো।

কষ্ট একটু হয় বৈকি। তথাপি যোগমায়া পরম তৃপ্তি অনুভব করে। সময়ের পাখা আছে। এদিকের কাজ সারিয়া উনানে আঁচ দেওয়ার আধ ঘণ্টা পরেই—বিমল স্কুলের ভাতের তাড়া দেয়। আলুভাতে আর আধসিদ্ধ কলাইয়ের ডাল দিয়া সে আহার সারিয়া উঠে। ঘন দুধ খানিকটা পাতে না দিলে যোগমায়ার তৃপ্তি হয় না, কিন্তু এমন ছেলে—দুধ খাইবার কাজে ঘোরতর আপত্তি জানায়। সবটা খায় না। যোগমায়া

অনুরোধ ও মৃদু ধমকেও সে অবিচলিত স্বরে বলে, একপেট খেলেই বুঝি গায়ে খুব বল হয়? মাষ্টার মশায় বলেন, পেটভরে খেলে পড়ার ক্ষতি হয়।

—হয়! এই দশটায় খাওয়া—আর বিকেলে খাওয়া, মানুষ থাকতে পারে? মাষ্টারের কি! যোগমায়া গজ্ গজ্ করিতে থাকে।

বিমল বলে, বাঃ রে, মাষ্টারের বুঝি খিদে পায় না?

—খিদে পেলে আর অমন কথা বলতে হয় না।

অদ্ভুত যুক্তি যোগমায়ার, কাটানো দুষ্কর। বিমল হাসিতে থাকে।

যোগমায়া বলে, তা টিফিনের সময় খাস ত? না পয়সা পুতু পুতু করে রেখে দিস? না মারবেল কি লাটিম কিনিস?

বিমল বলিল, রোজ দু-পয়সার ছোলা-সেদ্ধ কিনি।

—কেন, রসগোল্লা কিনে খেতে পার না। অত ছোলা-সেদ্ধ রোজ রোজ খেলে অসুখ করবে যে।

বিমল জবাব দেয়, আমি একলা খাই কিনা, সবাই মিলে খাই। একটা রসগোল্লা—কার মুখে দেব?

—কেন, যে যার পয়সা দিয়ে কিনে খেলেই ত হয়।

—সবাই পয়সা পায় কি না।

যোগমায়া আর কোন কথা কহিল না। নিজের ছেলে রসগোল্লা খাইবে—অন্যেরা তাকাইয়া তাকাইয়া সেই খাওয়া দেখিবে সে কল্পনা যোগমায়া করিতে পারে না। ভাইয়ের ছেলে মণি ও ফণির কথা তাহার মনে হয়। আহা, কচি ছেলে সব—অভাবের ওরা বোঝেই বা কি!

যোগমায়া ছেলের পুষ্টির জন্য অন্য ব্যবস্থা করে। দুধের সর হইতে মাখন তুলিয়া ঘরে গাওয়া ঘি তৈয়ারি করিয়া রাখে এবং বিমল খাইতে বসিলে গরম ভাতে খানিকটা ঘি দিয়া বলে, ভাত ক'টা বেশ ক'রে মেখে নে।

বিমল বলে, যে গন্ধ তোমার ঘিয়ে!

যোগমায়া বলে, অমন ভুর্ ভুর্ করছে গাওয়া ঘিয়ের গন্ধ তোমার ভাল লাগছে না? তবে ভাল লাগে বুঝি ছোলা-সেদ্ধ?

বিমল বলে, সত্যি মা, দোকানের ছোলা-সেদ্ধ এমন সুন্দর হয়! আর আলুর দম।

—বাড়ির তেল-ঘি দেওয়া আলুর দম বুঝি তেতো লাগে?

—তেতো লাগবে কেন, দোকানের মত হয় না।

—আচ্ছা, এনে দিস ত একদিন, খেয়ে দেখব কেমন আলুর দম তোর দোকানী রাঁধে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিমল বলে, সে আলুর দম তুমি হয়তো খাবে না, মা।

—কেন রে, তোদের ভাল লাগে—আর আমার ভাল লাগবে না।

—সে যে পেঁয়াজ দেওয়া।

যোগমায়া অবাক্ হইয়া বিমলের পানে চাহিয়া বলিল, তুই পেঁয়াজ খাস?

বিমল মায়ের বিস্মিত দৃষ্টির তীব্রতা সহ্য করিতে পারিল না, মুখ নামাইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, সবাই ত খায়।

—হুঁ। যোগমায়ার মুখ ও কণ্ঠস্বর দু-ই গম্ভীর হইল। আর কি খাস খোকা? কুঁকড়োর মাংস?

—কুঁকড়োর মাংস বুঝি দোকানে হয়! বিমল আড়চোখে মায়ের পানে চাহিয়া দুই-এক পা করিয়া পিছনে হটিতে লাগিল।

যোগমায়া একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তাই বাড়ির ভাত-ডাল তোর মুখে রোচে না, বাড়ির তরকারি ভাল হয় না! হাঁরে, পেঁয়াজ খেতে বুঝি খুব ভাল লাগে?

বিমল বলিল, মাংসয় নাকি পেঁয়াজ না দিলে জমে না।

—তুই রাঁধতেও জানিস! আমরা কিন্তু পেঁয়াজ না দিয়ে মাংস রেঁধেছি—সবাই খেয়ে ভালও বলেছে। তবে সেকালের রান্না কিনা—

বিমল বলিল, না মা, আজ থেকে আর আমি পেঁয়াজ খাব না।

যোগমায়া ম্লান হাসিয়া বলিল, তোর যদি ভাল লাগে ত কেন খাবি নে—খোকা। বাড়িতে কোনকালে পেঁয়াজ আসে নি বলে তোরা কেন খাবি নে।

—তুমি রাগ করলে না?

—না। তবে ওই কুঁকড়োর মাংস-টাংসগুলো খাস নে। মাংস খেলে গায়ে যত জোরই হোক, দুধ খেয়ে তার চেয়ে বেশি জোর হয়।

বিমল চলিয়া যাইতেছিল—যোগমায়া ডাকিয়া কহিল, আর একটা বছর পরে তোর এখানকার পড়া শেষ হবে, তখন শহরে গিয়ে যা ইচ্ছে করিস। দেখতেও যাব না—বারণও করব না।

বিমল তর্ক তুলিল, তোমাদের যত সব! বিশ্বামিত্র সৃষ্টি করলেন পেঁয়াজ—তা হ'ল অখাদ্য। সৃষ্টি করলেন—নোনা আতা—হ'ল অখাদ্য।

যোগমায়া হাসিয়া বলিল, নারে, সুখাদ্য। আমাদের কালে অখাদ্য ছিল—এখন হ'য়েছে সুখাদ্য।

বিমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সুখাদ্যই তো। জান, আমাদের বিজ্ঞানের বইয়ে—

যোগমায়া বলিল, ওই ইস্কুলের ঘণ্টা বাজলো, এখন তর্ক রেখে পড়তে যাও।

সত্য বলিতে কি—ছেলের সঙ্গে এই তর্ক যোগমায়ার ভালই লাগে। কিশোর বিমল হাত নাড়িয়া ও ঘাড় বাঁকাইয়া তর্ক করে। ওরা মনে করে, পৃথিবীর সব কিছু রহস্য ওদের জানা হইয়া গেছে। খাওয়া, সাজসজ্জা করা, বেড়ানো, দেশবিদেশের কথা, কত রকমের ভাষা, পৃথিবীর নানাবর্ণের জাতিদের নানা-প্রকারের অদ্ভুত অদ্ভুত আচার-ব্যবহারের কথা—সব-কিছুই বিমল জানে। একাদশীতে উপবাস করিবার হেতু বিমল বোঝে না;

বোঝে না, পূর্ণিমা-অমাবস্যায় মানুষের দেহ কেন খারাপ হইবে; তিথি অনুসারে খাদ্যদ্রব্য কেন অভক্ষ্য হয়; পেঁয়াজ, মসুর ডাল ও পুঁইশাক খাইলে বিধবাদের জাতিপাত হয় কেন—কত কথা লইয়াই সে তর্ক করে। যোগমায়ার ধমক খাইয়া কখনো সে চুপ করিয়া হাসে—কখনো বা ছুটিয়া পলায়। কণ্ঠস্বর বিমলের মিষ্ট হইয়াছে, মাথায় অনেকখানি বাড়িয়াছে, কিন্তু এই সব পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়াও দেহের মেদ তেমন বৃদ্ধি হয় নাই। ছেলে মোটা-সোটা নাদুস-নুদুস না হইলে মায়ের মনের খুঁতখুতানি যে যায় না। তবু অনেকে বলে, কোঁকড়া চুল ও ফরসা রঙের একহারা ছেলেটি তোমার সুন্দর ভাই। অমন টিকলো নাক, টানা চোখ ও ঘন ভ্রূর শোভাই কি কম। ঠোঁটের তিলটি বিমলের মানাইয়াছে। কেননা, পাতলা ঠোঁট—ফুরফুরে বাতাসে ঈষৎ কম্পিত ফুলের মতই মনোহর। ছেলে স্থির হইয়া থাকিতে চাহে না একদণ্ডও। যেন ভিতরে খানিকটা উত্তাপ ওর সঞ্চিত হইয়াই আছে। কথার ঝাঁজে ও চলার গতিতে সে উত্তাপ প্রায়ই অনুভূত হয়। বুক ক্রমশঃ চওড়া হইতেছে—কোমরের কাছটা সরু হওয়াতে বুঝা যায়। বিমলের হাসিটি ভারি সুন্দর। হাসিলে মুক্তার সারির মত না হউক—সাজানো সাদা দাঁতগুলি ঝক্‌ঝক্‌ করিতে থাকে। উপর ওষ্ঠে ঈষৎ কালির রেখা পড়িয়াছে—চোখেও চঞ্চল স্বপ্নময় দৃষ্টি। নিজের ছেলেটিকে কাহারই বা ভাল না লাগে। তবু বিশেষ করিয়া যোগমায়ার মনটা খুঁত খুঁত করিতে থাকে, আর একটু মোটা—আর একটু ফরসা ও যদি হইত। আসলে সেটা সন্তানের শ্রী দেখিয়া মায়ের মনে যে অমঙ্গল আশঙ্কার অস্পষ্ট ধোঁয়া উঠে তাহারই ইঙ্গিত। মনকে যোগমায়া প্রতিনিয়তই বলে, যেমন সুন্দর হইলে লোকের চোখ লাগিয়া ছেলেদের শরীর খারাপ হয়—তেমন স্বাস্থ্য বিমলের নাই। অন্তত যোগমায়ার চক্ষু ভুলিলেও—মন তা স্বীকার করিবে কেন?

৭

পুরা সংসারই যোগমায়ার ঘাড়ে চাপিয়াছে; তবু পুরা দায়িত্ব যেন যোগমায়ার নাই। মাথার উপর বৃদ্ধা শাশুড়ী এখনও বর্তমান। সংসার সম্বন্ধে যা-কিছু আবশ্যক পরামর্শ তাঁহার সঙ্গেই চলে। মাসকাবারে কখনও রামচন্দ্র বাড়ি আসে—কখনও মনিঅর্ডারে আসে টাকা। শাশুড়ী মুখে বলেন, আমাকে কেন আর ওর মধ্যে জড়াও বউমা, তোমার ঘর-দুয়োর তুমি বুঝে সুঝে নিয়েছ—এখন মা দুগ্‌গার চরণ চিন্তে করতে দাও।

সেকথা রামচন্দ্রও এক দিন বলিয়াছিল, মাসকাবারে সংসার খরচের টাকা যোগমায়ার হাতে দিয়া বলিয়াছিল, এই নাও মায়া—সংসার খরচ।

যোগমায়া হাত সরাইয়া উত্তর দিয়াছিল, আমায় কেন, মার হাতে দাও।

—মা যে নিতে চাইছেন না।

—না চান—তবু ওঁর হাতেই দেওয়া উচিত। উনি বেঁচে থাকতে আমার হাতে টাকা দিলে লোকে নিন্দে করবে। তা ছাড়া ওঁরও মনে কষ্ট হ'তে পারে। সে আমি কিছুতেই সইতে পারব না।

অগত্যা শাশুড়ীকেই সে টাকা হাত পাতিয়া লইতে হয়। কিন্তু অত টাকা তিনি নিজের কাঠের ছোট হাতবাক্সটিতে রাখিতে ভরসা করেন না। বলেন, সামান্য বাজার খরচের খুচরো পয়সা রেখে কাঠের সিন্দুকে টাকা তুলে রাখ বউমা। যে ভারি সিন্দুক—আমি কি ডালা তুলে নাড়তে পারি।

প্রকারান্তরে যোগমায়ার হাতেই টাকা আসিয়াছে, কিন্তু খরচের প্রয়োজন হইলে শাশুড়ীর পরামর্শ ছাড়া সে কোন কাজ করে না। কাঠের সিন্দুকের বড় চাবিটা সে-ই জোর করিয়া তাঁহার কোমরের ঘুন্‌সিতে বাঁধিয়া দিয়াছে।

শাশুড়ীর চোখের দৃষ্টি ক্রমশঃ ঘোলাটে হইয়া আসিতেছে। অনেক দূরের জিনিসপত্র কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া ঠেকে। নাতি-নাতিনীদের দূর হইতে ছুটিতে দেখিলে প্রশ্ন করেন, দৌড়য় কে বউমা? গৌরী বুঝি?

লোকে বলে চোখে ছানি পড়িয়াছে—কাটাইলে চক্ষু পরিষ্কার হইতে পারে।

শাশুড়ী বলেন, কেন, কি দুঃখে সতিক জাত ছুঁয়ে চোখ কাটাতে যাব? আমার অন্ধের নড়ি বউমা রয়েছে। বউতো নয়—মেয়ে।

শ্রবণ-শক্তিও তাঁহার হ্রাস হইতেছে বলিয়া যোগমায়াকে কণ্ঠস্বর চড়াইতে হইয়াছে। আজ সেই বহুবর্ষ পূর্ব্বের সলজ্জা ভীরু বধূটির মৃদু কণ্ঠস্বর—যে-কণ্ঠ আমতলা হইতে কাঁঠাল তলায় পৌছিত না—কোমল রাগিণীর মত বাজিয়া উঠে না—সে-কণ্ঠ শাসনের অনুশীলনে গম্ভীর। আদেশের ভঙ্গিতে মর্য্যাদাব্যঞ্জক।

জ্যৈষ্ঠ মাসের তখন শেষ হইতে চলিয়াছে। শেষ জয়মঙ্গল বারের পালন সারিয়া শাশুড়ী যোগমায়াকে বলিলেন, আচ্ছা বউমা, রাম কবে বাড়ি এসেছিল তোমার মনে আছে?

নতমুখে যোগমায়া উত্তর দিল, গুডফ্রাইডের সময়। সেই চোত মাসের শেষে।

শাশুড়ী হিসাব করিতে লাগিলেন, চোত এক, বোশেখ দুই জ্যষ্টি—

যোগমায়া সংশোধন করিল। তিন মাস নয় মা, দু-মাস হ'ল।

শাশুড়ী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কি জানি মা, মনে হচ্ছে যেন কত দিন ওকে দেখি নি। এমনও পোড়া চাকরি—যে সারাটা বছর বিদেশেই থাকে বাছা।

শাশুড়ীকে অন্যমনস্ক করিবার অভিপ্রায়ে যোগমায়া বলিল, আপনি ত আজ ফলার মোটেই খেলেন না মা।

শাশুড়ী বলিলেন, কি জানি মা, খেতে গেলে কেমন বুকের ভেতরটা হাঁচড়-পাঁচড় করে। কতকাল হ'ল—আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে রইছি মা, মরণও নেই। চোখের ওপর সোনার বাছা আমার চলে গেল—আর আমি আবাগী—

যোগমায়া উঠিয়া গেল। কাহারও কান্না সে আজকাল সহিতে পারে না। কেহ কাঁদিলে মনে হয়, তাহারই বুকের গোড়ায় সেই আর্ত্তধ্বনি মাথা কুটিয়া মরিতেছে। সে ধ্বনি ত কাহারও শোকের ধ্বনি নহে—সে মাকে দেখিবার জন্য হৃষীকেশের মৃত্যু-কালীন আকুল প্রার্থনা!

খানিক পরে ফিরিয়া আসিতেই শাশুড়ী বলিলেন, দেখ বউমা, আজকাল আমার মনে ভারি ভয় হয়। তুমি একলা—ছুটো কচি ছেলে নিয়ে নিবন্ধ্যা পুরীতে এই দজ্জা বুড়ীকে আগলাচ্ছ, যদি হঠাৎ আমার কিছু হয়—

যোগমায়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, অমন কথা বলবেন না মা, আমার ভয় করে।

শাশুড়ী হাসিয়া বলিলেন, ভয় করে বললে যম রাজা ছাড়বে কেন মা। আমার নামটা হঠাৎ যদি তাঁর মনে পড়ে—যদি জোর তলব আসে—তুমি কচিকাচা নিয়ে কি আতান্তরে যে পড়বে মা—তাই ভাবি।

যোগমায়া সাহস দিবার ছলে বলিল, এরই মধ্যে ওসব কথা ভাবছেন কেন মা। বিমলের বউ আসুক, নাতবউ নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করুন।

শাশুড়ী বলিলেন, ইচ্ছে হয় বৈকি মা, কিন্তু ভয়ও করে। বেশী দিন বাঁচলে শুনেছি—ভালর চেয়ে মন্দই হয়। রক্তচড়ং থাকতে থাকতে দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে যদি যেতে পারি মা—

যোগমায়া বলিল, মঙ্গলচণ্ডীর কথা বলুন।

আশ্চর্য্য, মঙ্গলচণ্ডীর কথা সেদিন ভাল জমিল না। মৃত্যুর প্রসঙ্গ উঠায় শাশুড়ী ও বধূ দুই জনেই উন্মনা হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাহিনী বর্ণনে শাশুড়ী কতবার ভুল করিলেন, শ্রোত্রী বধূও অন্য-মনস্কতার দরুণ সে ভুল সংশোধন করিবার অবসর পাইল না।

কাহিনী শেষ করিয়া শাশুড়ী বলিলেন, আজ তোমাকে একটা কথা বলে রাখি—বউমা, যদি আমার অসুক-বিশুক করে—যদি কথা বলতে না পারি—তুমি আমার সর্ব্ব অঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকে দিয়ে ইষ্টিনাম লিখে দেবে, কানে ইষ্টি মন্তর শোনাবে। আর—আর—

যোগমায়া আর অমনোযোগী থাকিতে পারিল না। শাশুড়ীকে নিষেধও করিল না। ব্যগ্রস্বরে বলিল—আর কি মা?

—আর রাম যদি না আসতে পারে—বিমল যেন আমার মুখাগ্নি করে—মা। তুমি করলেও ক্ষেতি নেই। বউ ত নও, মা।

আঁচলে চক্ষু মুছিয়া যোগমায়া উঠিল।

শাশুড়ী বলিলেন, কি জানি, আমার খালি মনে হচ্ছে ওপার থেকে ডাক এলো বলে—রামকে বুঝি দেখতে পাব না আর। তাই তার জন্যে মনটা ভারি কেমন করে মা।

শাশুড়ী আজকাল প্রায়ই মৃত্যুর কথা বলেন। যোগমায়া প্রতিবাদ করে, নিরুপায় হইয়া কখনও বা সে কাহিনী শোনে। মরণ যেন চোরের মত ওই কায়েতদের প'ড়ো ভিটায় ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। এ-বাড়ির উঁচু প্রাচীর ডিঙাইয়া যে-কোন মুহূর্ত্তে যে কাহারও কাছে আসিতে পারে। নিষ্ঠুর চোরের মত—যে-কোন প্রিয়বস্তুকেও ছিনাইয়া লইতে পারে। সারা শীতকাল-ভোর বাগানের পিটুলি গাছে কালপেঁচা ডাকিয়াছে। মনে হইয়াছে—কায়েতদের প'ড়ো ভিটার জামগাছটায় পাখী বসিয়া আছে। হৃষীকেশের মৃত্যুর পর যোগমায়ার সে ভুল ভাঙিয়াছে। মৃত্যু-দূতরূপী ওই পেঁচাটা জামগাছে বসিয়া ডাকে নাই—ডাকিয়াছে তাহাদেরই বাগানের পিটুলি গাছটায় বসিয়া। নিস্তব্ধ রাত্রির মধ্যযামে সেই রহিয়া রহিয়া তীব্র ধ্বনি যোগমায়ার বুকের গোড়া কাঁপাইয়া কাটিয়া দিয়া গিয়াছে। সভয়ে সে বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদন নাম স্মরণ করিয়াছে। কিন্তু বিপদ কাটে নাই। এমন পাখীর ডাক, দূরে ডাকিলেও মনে হয়—ঘরের কানাচে বসিয়া বুঝি ডাকিতেছে। পিঠাপিঠি দুই বাগানের সীমা নির্দ্দেশই বা করিবে কে? যাহার সংসারে অশুভ ঘটিয়া যায়—পাখী বসিবার সীমানা পরম দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সে স্মরণ করে। আজ কয়দিন হইতে পাখীটা আবার যেন ডাকিতেছে। কোকিলের ভাঙা কণ্ঠস্বরের তালে তাল দিয়া তাহারই গলার সঙ্গে পাল্লা দিয়া সে চীৎকার করিতেছে বুঝি! শাশুড়ীর মনেও নূতনতর বিপদপাতের আশঙ্কা জাগিয়াছে। তাই তিনি নিজের মৃত্যুকামনা করিয়া সংসারের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন।

পরের দিন সকালে শাশুড়ী বলিলেন, বউমা, আজ আমি শিবপূজো করব।

—আপনি অত দূর যেতে পারবেন কেন মা?

—তা হোক, তুমি ধরে ধরে নিয়ে যাও মা। অনেক দিন বাবার মাথায় জল অঘ্যি দিই নি।

পূজা সারিয়া বলিলেন, আজ ওদের ভোঁদাকে বলে পাঠাও, নতুন বামুন খিচুড়ি করে দাও—মিষ্টি আনিয়ে দাও। সংক্রান্তির দিন।

যথাসময়ে ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে দক্ষিণা লইয়া চলিয়া গেল।

যোগমায়া ডাকিল, এইবার খাবেন চলুন—মা।

শাশুড়ী বলিলেন, একবার কাছে এস তো মা। দেখি তোমার হাতখানি? আঃ—কেমন ঠাণ্ডা!

যোগমায়া চমকিত হইয়া কহিল, আপনার গা যে গরম হয়েছে মা। জ্বর হ'য়েছে নাকি?

শাশুড়ী হাসিয়া বলিলেন, কি জানি মা, কদিন থেকেই যা খাই কেমন তেতো তেতো লাগে। কিছুতেই রুচি নেই। তা ভয় নেই মা, আমি এত শীগ্‌গির মরছি নে। আমি যদি মরবো তো ভুগবে কে!

যোগমায়া ভীত কণ্ঠে বলিল, আপনার ছেলেকে না-হয় আসতে লিখি।

তাকে ব্যস্ত করবে কেন মা? সে এলেই কি আমি ভাল হয়ে যাব? যদি তার হাতের আগুন পাওয়া আমার ভাগ্যিতে থাকে—কেউ ঠেকাতে পারবে না মা। চল খাইগে।

—আজ নয় দুধটুধ খেয়ে—

শাশুড়ী জোর করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কচি ছেলের মত ঢক্ ঢক্ ক'রে দুধ খাওয়া আমি পছন্দ করি নে। কি রেঁধেছ মা? উচ্ছে দিয়ে কলমি শাক চর্চ্চড়ি করেছ তো? শয়ন পড়লে আবার কলমি শাক খাওয়া চলবে না। চল, দুই মায়ে ঝিয়ে খেয়ে নিই গে।

মধ্যরাত্রিতে যোগমায়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অস্ফুট গোঙানির শব্দ—ও ঘর হইতে আসিতেছে। শাশুড়ী গোঙাইতেছেন কি? কি বিশ্রী রাত। গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে অন্ধকার খানিকটা তরল দেখায়, কিন্তু আজ বৈকালে হঠাৎ মেঘ করিয়া রাত্রির আকাশে অন্ধকার জমিয়া উঠিয়াছে। সেই অন্ধকারের মধ্যেও কালপেচকের ঘুৎকার ধ্বনি শোনা যাইতেছে। উঠানের পাতায় কিসের চলাফেরার খস্ খস্ শব্দ। তার উপর পাশের ঘরে অস্ফুট কাতরোক্তি। নানা অশুভ ইঙ্গিতের জঞ্জাল লইয়া রাত্রি ক্রমশঃই ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিতেছে। ভয়ে যোগমায়ার বুকের গোড়া টিপ্ টিপ্ করিয়া উঠিল। অন্য দিন লণ্ঠনটাও স্তিমিত হইয়া জ্বলে—আজ অসাবধানে দমটা বেশি কমাইয়া দেওয়ায় সেটিও নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। এমন সময় শিবাদল প্রহর ঘোষণা করিয়া যদি না ডাকিয়া উঠিত তো বালিশের তলায় আড়ষ্ট হাতে হাতড়াইয়া দীপশলাকার বাক্স খুঁজিয়া লইবার সাহসটুকুও কি যোগমায়া সঞ্চয় করিতে পারিত? আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে বুকের টিপটিপানি কমিয়া গেল। বিমলকে ঠেলা দিয়া তুলিয়া যোগমায়া বলিল, ও বিমল, বিমল রে—ওঠ্ না বাবা।

ঠেলাঠেলিতে বিমল উঠিয়া চক্ষু কচলাইতে লাগিল।

যোগমায়া একহাতে আলোটা লইয়া অন্য হাতে পুত্রের হাত ধরিয়া বলিল, ও ধরে তোর ঠাক্‌মা যেন গোঙাচ্ছে বাবা।

শাশুড়ীর শিয়রে আসিয়া যোগমায়া ডাকিল, মা, ও মা?

মাথা নাড়িয়া শাশুড়ী একবার মাত্র বলিলেন, অ্যাঁ। তার পর ক্রমশঃ যেন সমুদ্রের অন্ধকারে তলাইয়া যাইতে লাগিলেন।

যোগমায়া আবার আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল, মা—ও মা।

সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া শাশুড়ী কোমরের ঘুনসিতে হাত দিলেন। যোগমায়া ইঙ্গিত বুঝিয়া বড় কাঠের সিন্দুকের চাবিটা খুলিয়া তাঁহার হাতে দিল। তিনি মুঠা শুদ্ধ সেই হাত দিয়া যোগমায়ার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বিস্ফারিত নয়নে একবার চারিদিকে চাহিলেন। মুখে সন্তোষ ফুটিল—কি বিষাদের ছায়া গাঢ় হইল—লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় তাহা অপঠিতই রহিল। আর এক বার শেষ উদ্যমের সঙ্গে তিনি ডান হাতখানি উঠাইলেন। কাঁপিয়া কাঁপিয়া সেই হাতখানি শয্যার উপর পড়িয়া গেল। কয়েক বার ঠোঁট নড়িয়া উঠিল ও চক্ষু ধীরে ধীরে বুঁজিয়া আসিল।

যোগমায়া আর্ত্ত চীৎকার করিয়া ডাকিল, মা—ও মা।

পর দিন প্রাতঃকালে রামচন্দ্রের কাছে যথারীতি তার গেল, কিন্তু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও রামচন্দ্র যখন পৌঁছিল না, তখন বিমলকে লইয়াই পাড়াপ্রতিবেশীরা শেষকৃত্যের জন্য শ্মশান ঘাটে রওয়ানা হইল। আকাশে মেঘসঞ্চার না হইলে আরও কিছুক্ষণ তাহারা অপেক্ষা করিত হয়ত।

নিস্তব্ধ রাত্রি। গৌরী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একজন বর্ষীয়সী বিধবা প্রতিবেশিনী যোগমায়াকে আগলাইবার জন্য মেঝের উপর আঁচল পাতিয়া শুইয়াছেন। তাঁহার মৃদু নাসিকা গর্জ্জনও শোনা যাইতেছে। বাগানের গাছে আজ রাত্রিতে পাখীটা আর অশুভবার্ত্তা বহিয়া রাত্রির আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে না। সে অশুভবার্ত্তা শোনাইবার প্রয়োজন বুঝি তার শেষ হইয়াছে। শৃগালও এখন প্রহর ঘোষণা করে নাই। গুমোটে গাছের পাতা নড়িতেছে না, ক্বচিৎ পাকা কাঁঠাল পাতা পড়ার টুপ্ করিয়া শব্দ উঠিতেছে। যোগমায়া কান খাড়া করিয়া বিনিদ্র নয়নে বসিয়া আছে। বিমলেরা এখনও শ্মশান হইতে ফিরে নাই। শ্মশান যাত্রীদের পা ধুইবার জন্য ঘড়ায় করিয়া জল তোলা আছে, আগুন পোহাইবার জন্য কয়েকখানি ঘুঁটে ও খড় এক আঁটি যোগাড় করা আছে, দাঁতে কাটিবার জন্য নিমপাতা ও মিষ্টমুখের জন্য আকের গুড়ের ব্যবস্থাও আছে। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দূরশ্রুত হরিধ্বনির আওয়াজ কানে আসিলেই যোগমায়া নিদ্রামগ্ন প্রতিবেশিনীকে ঠেলিয়া তুলিয়া ওই সব ব্যবস্থাই হয়ত ধীরে ধীরে করিয়া দিবে। ভয় যোগমায়ার মনে নাই, শোকও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান লইয়া দণ্ডোত্তীর্ণ রাত্রি যোগমায়াকে ভ্রূকুটি করিবার সাহস পাইতেছে না। শাশুড়ীর দেওয়া বড় কাঠের সিন্দুকের চাবিটা শুধু মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া দূরশ্রুত হরিধ্বনির জন্য সে কান পাতিয়া বসিয়া আছে।

ক্রমশঃ

শিক্ষার পথ

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আজ আমরা ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতী, যুগ-পথপ্রদর্শকের জন্মস্থানে সমবেত হ'য়েছি। আমাদের দেশের চারিদিকে আজ অন্নকষ্টের হাহাকার, অভাবের অন্ধকার; সীমান্তে নূতন বিদেশী আক্রমণের যথেষ্ট সম্ভাবনা। দুর্ভিক্ষ ও রাষ্ট্রসঙ্কট আমাদের সামনে। এ অবস্থায় শিক্ষাসম্মিলনী কি সমবেত করা উচিত? এ প্রশ্ন হয়ত কারও কারও মনে উঠে থাকতে পারে। বিদেশী শাসকদের মধ্যেও একদল লোক এই কথা বলে থাকেন, যে, শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমরকালে অপ্রয়োজনীয়। এ কথা কি সত্য? বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ এবং শিক্ষার সার্থকতা কোথায় এই দুই বিষয় যাঁরা বুঝেছেন, তাঁরা এই সঙ্কীর্ণ মতের সমর্থন কখনই করবেন না। আজকের এই যুদ্ধে একটা জিনিস পরিষ্কার ফুটে উঠেছে, যে, বেতনভোগী পেশাদারী সৈন্যদল দিয়ে জয়লাভ সম্ভব নয়। এবারের যুদ্ধ সমগ্র জাতি ও জাতির মধ্যে। রণক্ষেত্রে যারা অস্ত্র প্রয়োগ করছে ও পিছনের শহরে যারা অস্ত্রনির্ম্মাণ করছে; সৈন্যদের খাদ্য যারা সরবরাহ করছে ও যারা সেই খাদ্য উৎপন্ন করছে; এক কথায় দেশের সমগ্র আর্থিক যন্ত্র ও তার চালক যন্ত্রীরা সমবেতভাবে যুদ্ধের কাজ চালাচ্ছে। কোথাও যদি চেষ্টার অভাব ঘটে, তাহ'লে শক্তি হ্রাস পায়; অসহযোগ ঘটলে তো কথাই নাই। ফাসিষ্ট দেশ-সমূহে একথা খুব ভাল রকমে জ্ঞাত ও সেজন্য তাদের সমগ্র জাতির শক্তি কেন্দ্রীয় চালনে চালায়। ইংলণ্ডেও জাতীয় মন্ত্রিপরিষৎ গঠন এই একই কারণে আবশ্যক হয়েছে। এবং আমাদের দেশের যাঁরা প্রকৃত কল্যাণকামী তাঁরা সকলেই এখানেও জাতীয় মন্ত্রী সভা গঠন করতে চান। প্রশ্ন উঠছে, এর মাঝে শিক্ষার স্থান কোথায়? তা হ'লে বলতে হয়, শিক্ষা জিনিসটা কি, ও তার উদ্দেশ্যই বা কি।

শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হয় সমাজে, ভবিষ্যতে তার স্থান গ্রহণের যোগ্য করবার উদ্দেশ্যে। মানুষের সভ্যতার ভিত্তি এই শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। একথা অবশ্য সত্য যে মানুষের নিম্নস্তরের স্তন্যপায়ী ও অণ্ডজ জীবদের মধ্যেও শাবককে জাতিধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ায় অল্প চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু এদের কর্ম্মকুশলতা, শিক্ষা বা অভ্যাসের চেয়ে বংশানুক্রমে পাওয়া দৈহিক ছাঁচের উপর বেশী নির্ভর করে। মানুষও এই দেহ-নিগড় হ'তে মুক্ত নয়; কিন্তু তার এই বাঁধন অনেকটা আল্‌গা। এই বাঁধনের মাঝ দিয়েই মানুষ স্বাধীন চেষ্টার ফলে যুগে যুগে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছে, ও এক পুরুষের জ্ঞান-সম্পদ অন্য পুরুষকে শৈশব, বাল্য ও যৌবনের শিক্ষার ভিতর দিয়ে দান ক'রে চলেছে। এই যে পরস্পরের সহযোগিতা, যা শুধু সমসাময়িক নয়, যার বেষ্টনীতে অতীত ও বর্ত্তমান সমানভাবে গ্রন্থিবদ্ধ হ'য়ে রয়েছে, তারই প্রস্ফুরণ প্রতি যুগের সংস্কৃতি ও সভ্যতা। এই সংস্কৃতি রক্ষার জন্যই যুদ্ধের সমর্থন করা চলে। আজ আমরা যদি সমরায়োজনের নামে শিক্ষার ধারা ব্যাহত করি, তা হ'লে এই কৃষ্টির যোগসূত্র আমাদের দেশে ছিন্ন হবে, এবং এ বিচ্ছেদ পরে দূর করা দুরূহ হবে। আপনারা একথাও ভাল রকম জানেন, যে, ভাঙ্গা জিনিস জুড়লেও তার জোড়াতাড়ি আসলের মত মানায় না কোনও দিন। অতএব শিক্ষার কাজ পুরাপুরিই চালাতে হবে, আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেও।

প্রতিপক্ষ হয়ত কথা তুলবেন—কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ রাষ্ট্রবিপ্লবের মাঝে কি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভাল ভাবে চলতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর চীনদেশের জাতীয় সরকার দিয়েছেন। দীর্ঘ আট বৎসর ব্যাপী সংগ্রামের মাঝেও তাঁরা দেশবাসীর নিরক্ষরতা দূর করার কাজ বন্ধ রাখেন নাই; এবং ১৯৩৪ সালের শতকরা চল্লিশ জন লেখাপড়া জানার সংখ্যা আজ শতকরা চৌষট্টিতে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আমরা এখনও চীনদেশের মত আক্রান্ত ও ছিন্নাবয়ব হই নাই। সুতরাং যুদ্ধের নামে এখনই যে শিক্ষাসংকোচের চেষ্টা চলেছে সেটা যে সাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়, এ কথা বলা বাহুল্য। তা ছাড়া, যন্ত্রশিল্পী, রাসায়নিক ও পদার্থবিৎ প্রভৃতিদের তো সমর-উপকরণের জন্যই আবশ্যক। সুতরাং তাদের তৈয়ারীর জন্য যেটা বনিয়াদ—মধ্য ও উচ্চশিক্ষা—তাকে বাদ দিলে চলবে কেন? যুদ্ধের সময় সমস্ত লোকের খাওয়া ও পরার জন্য যেমন সুব্যবস্থা করতে হয়, স্বাস্থ্যের জন্য চিকিৎসার উপকরণ যেমন ঠিক রাখতেই হয়, সংস্কৃতি ও জ্ঞানের ধারা

অবিচ্ছিন্ন রাখবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থাও তেমনই অবশ্য প্রয়োজনীয়।

এবার একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাক, শিক্ষার আদর্শ কি? অবশ্য আগেই বলেছি বহুযুগ সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার শিশুর কাছে মুক্ত ক'রে দেওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এবং শিশু যাতে তার নিজের সমাজে তার নিজের স্থান নিতে পারে, এই জন্যই তাকে পূর্ব্বগতদের অভিজ্ঞতার এই ঐশ্বর্য্য দেওয়া হয়। কিন্তু নিজের সমাজ বলতে কি বোঝায়? নিজের স্থান বলতেই বা কি নির্দ্দেশ দেওয়া হয়? ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদিগণ তাঁদের সন্তান-গণকে এক সময়ে সাম্রাজ্য পরিচালক হিসাবে দেখতেন ও সেই ভাবেই শিক্ষা দিতেন। তাঁদের "পাব্লিক স্কুলে" নিয়ম মেনে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে নেতার অধীনে কাজ করা, মুখ বুজে নেতার অন্যায় ব্যবহারও মেনে নেওয়া শিক্ষার অঙ্গীভূত ছিল। খেলা, ব্যায়াম ও সঙ্ঘনেতৃত্ব ছিল গৌরবের বস্তু; বিচারবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা খুব বেশী মর্য্যাদা পেত না। সেটাকে অন্য গুণের আনুষঙ্গিক অলঙ্কার ব'লে গণ্য করা হ'ত। এই শিক্ষাপ্রসূত একজন বড়লোক স্বীকার করেছিলেন যে বিজ্ঞানের আলোচনার ফলে ভগবানে বিশ্বাস যখন তাঁর মনে শিথিল হয়েছিল, তখন সাম্রাজ্যের প্রতি ভক্তি, ও তার গঠন ও রক্ষার আদর্শ, সেই স্থান অনেক পরিমাণে পূর্ণ করেছিল। জাপানের লোকেরা তাদের সম্রাটকে ভগবৎপ্রেরিত মনে করে, এবং নিজেদের জাতিকে সকলের শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস করে। তাদের দেশে শিশুদের এই ধরণের বিশ্বাসের পোষক শিক্ষা দেওয়া হয়। য়ুরোপে মধ্যযুগে শুধু পাদরী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা লেখাপড়া শিখতে পেতেন। তখন কৃষক ও মজুর তাঁদের সমাজে অর্দ্ধদাসের মত থাকত। তাদের জন্য চিন্তা, কিংবা তাদের মনের বিকাশের ব্যবস্থা, শিক্ষার অঙ্গের ও শিক্ষাবিভাগের বহির্ভূত ছিল। শিল্প শিক্ষা ও হাত এবং চোখের সমন্বয় আধুনিক শিক্ষার একটি প্রধান বিষয়। সে যুগে অভিজাতদিগকে যুদ্ধ ও শাসন, প্রধানতঃ এই দুই কাজ করতে হ'ত। ফলে সমাজের ও রাষ্ট্রের কাজের জন্য অল্পলোকেরই বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও বেশী লোকের অস্ত্র চালন কৌশল, এই দুইটি মাত্র আবশ্যক হ'ত। বেশীর ভাগ লোকেরই বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণধার থাকে না। তাদের বুদ্ধিকে বিকাশের চেষ্টাও বিশেষ হ'ত না অনাবশ্যক ব'লে। তারা হাতিয়ারে ধার দিয়েই কাজ চালিয়ে দিত। সুতরাং আধুনিক শিক্ষার বুদ্ধি বিকাশের অভিনব পদ্ধতি সকল উদ্ভাবন বা প্রয়োগ সে যুগে অপ্রয়োজনীয় ছিল ও অসম্ভব হয়েছিল। আমাদের দেশে প্রাচীন-কালে অদ্বিজকে সে যুগের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার অনধিকারী মনে করা হ'ত। উপনিষৎকার সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় বলা সত্ত্বেও, শূদ্রকে শুধু সাধারণ শিক্ষারই অধিকারী ধরা হ'ত। বেদ ও বেদান্ত পাঠ তাদের পক্ষে দণ্ডনীয় ছিল। আবার যে-দেশে সব মানুষকে শুধু কথায় নয়, হাতে-কলমে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেই সোভিয়েট তন্ত্রে সব দেশের ও পেশার মা-বাপের সন্তানেরা একই সঙ্গে লেখাপড়া শেখে এবং খাদ্য ও পণ্য উৎপাদন ও তার সদ্ব্যয় সম্বন্ধে চোখে দেখে জ্ঞান লাভ করে। তারা শিশুবয়স হ'তে শেখে, ঐক্য, সাম্য, ও ও সহযোগিতা। ঐ সোভিয়েটের দেশে শিশুদের বিদ্যালয়ে খেলাঘরে খেলার ইটকাঠও এমন বড় রাখা হয়, যে-কোন ছেলেই সেগুলি নিয়ে একলা একলষেঁড়ে হয়ে খেলতে পারে না। অন্যের সহযোগিতা তাকে মেনে নিতেই হয়। রাষ্ট্রের ও সমাজের আদর্শ এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য এই ভাবে সমন্বিত হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে সমাজ ও শিক্ষার আদর্শ মোটেই সব দেশে এক নয়। আমরা কোন্ আদর্শ গ্রহণ করব? আমাদের মধ্যে হিন্দু যারা, তারা কি সনাতনী হিন্দু সমাজের সামাজিক পংক্তি বিচারের অনুগমন ক'রে শিক্ষাতেও পংক্তি বিচার করবেন—এবং ছাত্রছাত্রীবৃন্দ সমাজের কোন্ স্তর হ'তে এসেছে সেই হিসাবে তাদের শ্রেণী বিভক্ত করবেন? অথবা মুখে সমান অধিকারের কথা বলে, বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কায়দায় মাসিক বেতনের ও খরচের পরিমাণ এত বাড়িয়ে দেওয়া হবে যে শুধু ধনী সন্তান ও অতি তীক্ষ্ণ মেধাবী বৃত্তিভোগী ছেলেমেয়েরাই তার সিংহদ্বার পার হ'তে পারবে? অথবা আমাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রে যে উক্তি আছে যে, ব্রহ্মন্ সর্ব্বজীবেই বর্ত্তমান; এবং সাধনা সর্ব্বভূমিতে কর্ত্তব্য, এই সত্য গ্রহণ করে, তারই প্রেরণায় নূতন ভারতবর্ষ গঠনের চেষ্টা করব? হিন্দু ও মুসলমান এবং খ্রীষ্টধর্ম্মে এখানে প্রভেদ নাই। প্রকৃত মুসলিম সব লোককেই এক ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে মনে করেন এবং তাদের প্রকৃত সাম্যে বিশ্বাস করেন। খ্রীষ্টের ধর্ম্মেও মানবজাতির সকলকেই ভগবানের সন্তান বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং শ্রেণীবিভাগের সমর্থন নাই। ভগবান তথাগতের বাণীও এই মতবাদের সমর্থন করে। সুতরাং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আমরা ভারতবাসী সব মানুষের সামর্থ্য মত সমান অধিকারের দাবী মেনে নিয়ে শিক্ষার পদ্ধতি বিচার আরম্ভ করতে পারি। নূতন চীনের বিখ্যাত

নেতা সুন্ ইয়াং-সেন তাঁর আদর্শ সম্বন্ধে উক্তিতে চীন জাতির ব্যক্তিমাত্রেরই প্রাপ্য মৌলিক অধিকারের মধ্যে শিক্ষার দাবী মেনে নিয়েছিলেন। আমাদের দেশেও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় মহাসভা, জনসাধারণের যে মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকার ক'রে নিয়েছেন তার মধ্যে শিক্ষার দাবী অন্যতম। আপনাদের মনে থাকতে পারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কলিকাতা কর্পোরেশনের পৌরনেতা হিসাবে জনশিক্ষার ব্যবস্থাকে তাঁর কর্ম্মতালিকায় প্রথম স্থান দিয়েছিলেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সামর্থ্য হিসাবে অধিকার বিচার ক'রে সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা আমাদের দেশের সর্ব্বধর্ম্মসম্মত এবং এশিয়া ভূখণ্ডের শ্রেষ্ঠ মানবকল্যাণকামিগণের দ্বারা সমর্থিত। যে সোভিয়েট-মণ্ডলে সব মানুষের সমান অধিকার পুরাপুরি মেনে নেওয়া হয়েছে, সেখানে শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের এই সিদ্ধান্ত বিগত কুড়ি বৎসরে কার্য্যে পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই আদর্শ কবিকল্পনাপ্রসূত নয়, বাস্তবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

এবার বিচার করা যাক যে এই সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত। প্রথমেই বুঝতে হবে আমাদের দেশের সকল লোক বলতে কি বোঝায় ও তাদের জন্যে কি করা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; বর্ত্তমানে যন্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটলেও, এখন পর্য্যন্ত শতকরা ৭০ ভাগ লোক কৃষি ও তৎ-সংশ্লিষ্ট পশুপালন প্রভৃতি কাজে জীবিকানির্ব্বাহ করে। মাত্র দশ ভাগ শিল্পী ও যন্ত্রশিল্পী। বাণিজ্যে উপায় করে শতকরা পাঁচ জন, এবং ডাক্তারী, ওকালতী, শিক্ষকতা প্রভৃতি মধ্যবিত্ত লোকের প্রিয় পেশাতে অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করেন শতকরা মাত্র তিন জন লোক। শতকরা সাত জন লোক বিভিন্ন যানবাহনের কাজে নিযুক্ত। রেলওয়ে, ষ্টীমার, উড়োজাহাজ প্রভৃতির কাজ যন্ত্রশিল্প ধরা যেতে পারে। গ্রাম ও শহরের সাধারণ শিল্পীদের বাদ দিলে যন্ত্রশিল্পীদের সংখ্যা শতকরা দশের বেশী হয় না। এর মধ্যে কাপড়ের কল, চটকল ও বেশভূষা-সংক্রান্ত শিল্পেই প্রায় অর্দ্ধেক লোক নিযুক্ত থাকে। তার পরেই সংখ্যাগুরু হচ্ছে সাধারণ শিল্পীদের মধ্যে কাঠ ও বাঁশের কাজ যারা করে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভুষিমালের কারবারই প্রধান স্থান অধিকার করে; খাদ্য প্রস্তুতের কাজও বহু লোকের জীবিকার উপায়। বাকী লোক গৃহকর্ম্ম, ভিক্ষা বা অসৎ উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করে। স্ত্রীলোকেরা প্রধানতঃ নিজের নিজের ঘরকন্না দেখে থাকেন ও শিশুপালন ক'রে থাকেন। এই কাজই তাঁদের প্রধান জীবিকা ধরা যেতে পারে।

এই ক্ষুদ্র তালিকাটি হ'তে আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন যে শুধু লেখাপড়া, অঙ্ককষা ও ইতিহাস ভূগোল পাঠে দেশের শতকরা নব্বই ভাগ লোকের পক্ষে সমাজে নিজের স্থান অধিকার করার সুব্যবস্থা করা হয় না। এ কথা অবশ্য সত্য যে এই জ্ঞানটুকু সকলেরই থাকা উচিত; কিন্তু সেইটুকুই যথেষ্ট নয়। জনশিক্ষার বহুল প্রচার য়ুরোপে প্রথম যখন শুরু হয়, তখন একথা লোকের মনে ওঠে নাই। কিন্তু শীঘ্রই এ কথা পরিষ্কার বোঝা গেল, যে ব্যবহারিক শিক্ষা ও সাধারণ লেখাপড়া শেখা একসঙ্গেই করা কর্ত্তব্য। সুইডেনের শিক্ষাব্রতীগণ প্রথমে এ বিষয়ে লোকের দৃষ্টি ভাল ক'রে আকর্ষণ করেন। তাঁরা অবশ্য কাজ আরম্ভের সময় মনে করেছিলেন যে বিদ্যালয়ে তাঁরা প্রকৃত শিল্পশিক্ষা দেবেন, যাতে ছেলেমেয়েরা প্রথম হ'তেই কুটীরশিল্প শিখতে পারে। কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল যে "হাতের কাজ" শেখালে মনের বিকাশেরও সুবিধা হয়। মানুষ প্রাগৈতি-হাসিক যুগে যখন নিম্নস্তরের প্রাণী হ'তে উৎপন্ন হয়েছিল, তখন তার মগজের বিকাশ হ'তে শুরু হয় হাত ও চোখের সমন্বয়ে। পরবর্ত্তী যুগে পাথর ও হাড়ের যন্ত্র ও হাতিয়ার তৈয়ারি ও ব্যবহারে এই বিকাশ আরও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বর্ত্তমান যুগে আমরা সেই আদিম অবস্থা হ'তে বহুদূর অগ্রসর হ'লেও, আমাদের মগজের সেই প্রাচীন ধর্ম্ম এখনও বর্ত্তমান আছে। হাত ও চোখের সমন্বয়ে বুদ্ধির বিকাশ ও কর্ম্মকুশলতা এই দুটি গুণই লব্ধ হয়।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে হাত ও চোখের সমন্বয় কি উপায়ে দেওয়া হবে? একথা বলা বাহুল্য যে ভবিষ্যতে যে উপায়ে জীবনযাপন করতে হবে তার সঙ্গে যোগ রেখে এই শিক্ষা দিতে হবে। সুতরাং প্রধানতঃ কৃষির মারফৎ এই হাত ও চোখের কাজ শেখান দরকার এই কথা বুঝতে বিলম্ব হবে না। আর জীবিকা হিসাবে কৃষির পরেই স্থান পাচ্ছে কাপড় বোনা ও সুতাকাটাই এবং বাঁশ ও কাঠের কাজ। অতএব এইগুলিই হচ্ছে আমাদের শিক্ষালয়ের ব্যবহারিক জ্ঞানের জন্য নির্ব্বাচ্য বিষয়। মেয়েদের প্রধান জীবিকা গৃহকর্ম্ম, রন্ধন ও শিশুপালন। তাঁদের জন্যে এগুলি হবে প্রধান ব্যবহারিক শিক্ষণীয় বিষয়। সূচিশিল্প ও কাপড়ের কাজও মেয়েদের উপযুক্ত।

কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, ছোট ছেলেকে কি ক'রে কৃষিশিক্ষা দেওয়া যায়? মহাত্মা গান্ধী যখন তাঁর ওয়ার্দ্ধার শিক্ষা-প্রণালীর সূচনা করেন, আমি তাঁকে শিক্ষা কৃষিমূলক করতে

অনুরোধ করেছিলাম। আমাকে মহাত্মাজী পরিহাস ক'রে বলেন, "দেখ, লাঙ্গল ধরলে বুদ্ধির ধার বাড়ে না; ছোট ছেলের বুদ্ধি বোধ হয় ভোঁতা হ'য়ে যাবে। আমি একবার এ ধরণের পরখ করেছিলাম; সুবিধা হয় নাই।" মহাত্মাজীর এই আপত্তির আমি যে সমাধান করেছিলাম, সেইটিই আজ আপনাদের সম্মুখে জানাব। একথা খুবই সত্য, যে, ছোট ছেলে লাঙ্গল ধরবার উপযুক্ত নয়। যাঁরা মানব-দেহের অস্থি গঠন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ তাঁরা জানেন যে বার-তের বৎসরের আগে কাঁধের অস্থির জোড় ও দুই পায়ের মাঝের অস্থির সন্ধিস্থান দৃঢ় হয় না। এই বয়সের পূর্ব্বে বেশী চাপের কাজ দিলে, ছেলেমেয়েদের দৈহিক ক্ষতি হয়। কিন্তু কৃষির প্রাথমিক শিক্ষা খুবই হাল্কা ভাবে দেওয়া যেতে পারে ও তাতে বুদ্ধি বিকাশেরও যথেষ্ট সহায়তা হয়।

সাধারণতঃ প্রাথমিক শিক্ষায়তনে যে বয়সে পুরাণের কথা বা ঐতিহাসিক গল্প বলা হয়, সেই বয়সের ছেলে-মেয়েদের মানুষ প্রথম যুগে শীকার ও ফলমূল সংগ্রহ ক'রে কি ভাবে জীবন-ধারণ করত, সে কথা বলা যেতে পারে। সে সময়ে মানুষ গাছের ডাল কেটে তারই ডগা কলম কাটার মত এক পাশ পাতলা ক'রে তার খনন যন্ত্র তৈয়ারী করে, এবং ঐ খনন যষ্টির সাহায্যেই মাটির ভিতর হ'তে মূল ও কন্দ তুলে খাওয়ার ব্যবস্থা করত। ক্রমশঃ মানুষ আবিষ্কার করলে যে মূলের কিছু অংশ অথবা ফলের বীজ মাটিতে পড়ে থাকলে, জল পেলে আবার নূতন জন্ম নেয় এবং পুনরায় খাদ্য উৎপন্ন করে। এই আবিষ্কারটি সম্ভবতঃ মেয়েরা করেছিলেন। পুরুষরা শীকারে বাহির হ'ত; মেয়েরাই ফলমূল সংগ্রহ করতেন ও তার পুষ্করে গোছ-গাছ করতেন। ঘরের পাশের আবর্জ্জনাস্তূপে নূতন গাছের জন্ম সম্ভবতঃ কোনও প্রতিভাশালিনী নারীর দৃষ্টিতে প'ড়ে কৃষির ভিত্তি স্থাপন করেছিল। তারপরে শুরু হ'ল গাছের মূল ও বীজ রোপণ; তখন খনন-যষ্টিতে মাটির ঢেলা খুঁড়ে উল্টানো হ'ত। এই যষ্টির পূর্ব্বভাগ চওড়া হ'লে খন্তার সৃষ্টি হয়; এই অংশ আরও চওড়া হ'লে য়ুরোপের স্পেড এবং আমাদের দেশে কাশ্মীর ও সীমান্ত প্রদেশে ব্যবহৃত লিবান্ ও য়ুম নামক চওড়া পাতাওয়ালা কৃষিযন্ত্রে পরিণত হয়। এগুলি প্রায় আমাদের কোদালের মত ব্যবহৃত হয়; তবে সেগুলি মাটিতে বসিয়ে টানা হয় না, ঠেলা হয়।

কোদালির পূর্ব্বপুরুষ হচ্ছে গাছের দুটি শাখার সন্ধি-স্থলের কাছের টুকরা। এই রকম খোঁচমুখো যন্ত্র মাটি আঁচড়ে বীজ বোনবার জন্য আদিম মানব অনেক দেশেই ব্যবহার করত। তারই মুখ চওড়া হ'য়ে কোদালের সৃষ্টি। আফ্রিকার উত্তরাংশ ভিন্ন সব প্রদেশে এবং সমগ্র আমেরিকা ও অষ্ট্রেলেশিয়া অঞ্চলে বর্ত্তমান যুগের পূর্ব্বে শুধু কোদালির সাহায্যেই চাষবাস হ'ত। এ সব দেশে য়ুরোপীয় জাতির প্রসারের পূর্ব্বে লাঙ্গল অজ্ঞাত ছিল। সরু মুখ কোদালি বা খনন-যষ্টি পশুর সাহায্যে মাটিতে টানলেই লাঙ্গলের রূপ ধারণ করে।

ছোট ছেলেদের এই সকল গল্প খেলার ছলে বলা ও অভিনয় করান চলে। আদিম যন্ত্রগুলি ব্যবহারেও তারা অসমর্থ হবে না। অল্প মাটি খোঁড়া ও বীজ বা মূল বপনের সঙ্গে আদিম জাতির নৃত্য আমরা ব্রতচারী প্রভৃতি দলের মারফৎ জুড়ে দিতে পারি। তার পর আর একটু বড় ছেলেমেয়েদের কোদালি ও নিড়ানির ব্যবহার শেখান যেতে পারে। এগার বার বৎসর বয়সে এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে ফসল ও তরিতরকারী চাষ শেখান যেতে পারে। বিদ্যালয়ের ছেলেদের উদ্যান বা কৃষি স্থানের ব্যবস্থা আপনারা কেহ কেহ বোধ হয় করেছেন। তারই সঙ্গে এ সকল শিক্ষা বিনা খরচে দেওয়া যেতে পারে। কৃষিতে লাঙ্গলের ব্যবহার আসবে আরও অনেক পরে, মধ্যশিক্ষার শেষভাগে, যখন দেহে আরও শক্তি সঞ্চয় হয়েছে।

কিন্তু শুধু কি কোন্ মাসে কোন্ বীজ বপন করতে হয়; কি সার দিতে হয়; ফসল কবে পাকে, এটি জানলেও হাতে-কলমে এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করলেই হ'ল? পূর্ব্বেই শিক্ষাতে যে সমদৃষ্টির আদর্শের কথা বলা হয়েছে, সে সম্বন্ধে কি এই সূত্রে কিছু জ্ঞান দেওয়া চলে না? তা ছাড়া, আর একটা কথা, কৃষি শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি কিছু বোঝান উচিত নয়; শুধু কি তার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ও বর্ত্তমান অবস্থা জানলেই হ'ল? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার পূর্ব্বে অন্য কয়েকটি প্রসঙ্গের আলোচনা করতে হবে। প্রথম হচ্ছে এই যে, কৃষকের ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা ও তাকে কৃষি সম্বন্ধে এ সকল অভিনব উপায়ে জ্ঞান দিলেও সে কি গ্রামে চাষের কাজে খুশী থাকবে? আজ অবশ্য ফসলের যেরূপ দাম, ও বাংলার শহরে যে দুরবস্থা তাতে এ প্রদেশে তাই হবে। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে, এবং সাধারণ অবস্থায়, কি এই কথা খাটে? সারা বছর হাড়ভাঙ্গা খেটে, রোদে পুড়ে জলে ভিজে চাষী যে ফসল উৎপন্ন করে, তার কতখানি সে ভোগ করে ও তার মূল্যই বা কি? এ জন্য আমাদের জমি-রাজস্ব ও জমার ব্যবস্থা বহু অংশে দায়ী; কিন্তু শস্য উৎপাদনও হয় অত্যন্ত কম। আর উন্নত পদ্ধতির কৃষি-অবলম্বনের বাধাও আছে অনেক। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞান-

সম্মত কৃষির পদ্ধতি অবলম্বন করা অল্প জমির কৃষকের সম্ভব নয়; শুধু যদি সমবায় গঠন হয় তবেই তার ব্যবস্থা হ'তে পারে। আমাদের এই জমিতেই বর্ত্তমানের তিন গুণ শস্য সহজেই উৎপন্ন করা যেতে পারে। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ গবেষণা করলে আরও কত উন্নতি করতে পারেন, তার উদাহরণ সোভিয়েট রুশ দেশ হ'তে আপনাদের দেব। ঐখানে গবেষণার ফলে বৈজ্ঞানিক ভাভিলভ শীতপ্রধান দেশে জলা জমীতে চাষ করার উপযোগী তিন মাসের মরুবসন্তে পেকে ওঠে এইরূপ নূতন এক ধান্যের সৃষ্টি করেছেন। ফলে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি যাতে গম হ'তেই পারে না, সেখানে আজ ফসল হচ্ছে। আর এর চেয়ে বড় আবিষ্কার হচ্ছে গম গাছকে এক বৎসর জীবন ওষধি হ'তে স্থায়ী বৃক্ষে পরিণত করা। গত বৎসর একজন সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক এই নূতন সৃষ্টিটি করেছেন। ভবিষ্যতের গম চাষীকে আর বছর বছর জমিতে লাঙ্গল বীজ বপন রোপণ প্রভৃতি করতে হবে না। একবার চা বাগানের মত গম বাগান তৈয়ারী করলে কয়েক বৎসর নানা ঋতুতেই সেই চারা ফসল দেবে। আমাদের দেশে যদি এই রকম ধান্য সৃষ্টি করা যায়, তা হ'লে আর এক আষাঢ় বা এক শ্রাবণের বৃষ্টির অল্পতা বা বাহুল্যে অন্নাভাবের হাহাকার উঠবে না। কৃষকের অবস্থা উন্নত করতে হ'লে এক দিকে যেমন জমা ও করের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে, অপর দিকে উৎপন্ন ফসলেরও উন্নতি বৈজ্ঞানিক উপায়ে সম্ভব করতে হবে। কৃষকের ছেলে যদি শিক্ষায়তনে এই সকল কথা বোঝে, তবেই সে বড় হ'লে তার চেষ্টা ও সহযোগিতার ফলে এই সমস্যার সমাধান হবে। কারণ কৃষি যার ভবিষ্যৎ জীবিকা নয় তার পক্ষে এ সমস্যার সব কথা বোঝা সহজ নয়। আপনারা মনে করবেন না যে সোভিয়েটতন্ত্র ভিন্ন এই সহযোগিতা সম্ভব হয় না। দেনমার্ক রাজতন্ত্রের দেশ এবং কৃষিপ্রধান। তাদের বেশীর ভাগ লোকেরই জীবিকা হচ্ছে চাষবাস ও পশু পালনে। এই দেশের কৃষকের অবস্থা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্য্যন্ত আমাদের দেশের চাষীর মতই হীন ছিল। তাদের না ছিল শিক্ষা, না ছিল অন্ন। তাদের মঙ্গলের জন্য পল্লী-সংস্কার সমিতি গঠনের ও কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা তাদেরই আলস্য ও অসহযোগিতার ফলে ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই কৃষকদেরই যখন সকলকে বাধ্য ক'রে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হ'ল—যে প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের দেশের মধ্য শিক্ষার অনেকটাই অন্তর্ভুক্ত করে—এবং তার পর তাদের প্রাপ্তবয়স্কদের মনে চিন্তাশক্তি সজীব রাখবার জন্য "ফোক্ হাইস্কুল" অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কদের বিদ্যালয় গঠন করা হ'ল, দেখা গেল, তারা অন্য মানুষে পরিণত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত দেন্মার্কে পশুপালন খুব কম হ'ত। গমের চাষই কৃষকের প্রধান জীবিকা ছিল। এই গম ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীর শিল্পপ্রধান প্রদেশগুলিতে ভাল দামে বিক্রয় হ'ত কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে আমেরিকা, বিশেষ করে আর্জ্জেন্টিনা প্রদেশে উৎপন্ন গমের প্রতিযোগিতায় এই শস্যের দাম এত পড়ে গেল যে দেন্মার্কে গমচাষী নিঃস্ব হবার উপক্রম হ'ল। কিন্তু দেন্মার্কের কৃষক তখন নূতন জ্ঞান পেয়েছে, সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ করতে শিখেছে। তারা দেখলে যে গমচাষে আর সাচ্ছল্য লাভ হবে না। কিন্তু ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীতে মাখন ও পনীরের প্রচুর চাহিদা আছে, এবং এ জিনিস আমেরিকা হ'তে আনা সহজ হবে না। তারা তখন গমের জমি গো-চারণের উপযুক্ত শস্যে ভরিয়ে দিল ও পশুপালন কার্য্য, সমবায় সমিতি গঠন ক'রে যন্ত্রশিল্পের মত বিরাট আকারে প্রতিষ্ঠিত করল। যে দৈন্য তার করাল ছায়া কৃষকের উপর ফেলেছিল, সে আর কায়া ধারণ করতে পারলে না, দূরে চলে গেল। আমাদের দেশের কৃষক পাটচাষের ব্যাপারে এরূপ স্বাবলম্বন করতে পারলে কি দুর্দ্দশার নিম্নস্তরে এতদিন পড়ে থাকত? অথবা পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাহির হ'তে চেষ্টার আবশ্যক হ'ত। এই যে সহযোগিতা শিক্ষা, যার ফলে দেনমার্কে সমবায় গঠন অল্প আয়াসে দেশব্যাপী সাফল্য লাভ করেছিল, তার ব্যবস্থা শিক্ষায়তনে কি ভাবে হয়, এবার আপনাদের বলব।

এসবার্গ দেনমার্কের একটি মাঝারী বন্দর; ১৯৩৪ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে সেখানে আমি যাই। শহরটি আয়তনে মাঝারি; আমাদের দেশের জেলা সদর গোছের। পূর্ব্বেই বলেছি এ সব দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমাদের মধ্যশিক্ষার অনেকটা অন্তর্ভুক্ত হয়। দেনমার্কে ছেলেরা সাত বৎসর হতে পনের বৎসর পর্য্যন্ত এই সকল বিদ্যালয়ে পড়ে। পাঠ্য বিষয় আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষার চেয়ে কম নয়। সুতরাং সেখানকার ব্যবস্থা আমাদের মধ্য শিক্ষালয়ের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী। এসবার্গ বন্দরের যে প্রাথমিক বিদ্যালয়টির কথা বলছি সেটির কৃষিউদ্যান ছিল পরিমাণে প্রায় চার বিঘা। এই উদ্যান, কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন ফসলের জন্য ভাগ করা হয়েছিল। বিঘাখানেক বিট, বিঘাখানেক গাজর, কিছু কপি ও কিছু মটরশুঁটি চাষ করা হয়েছিল। ১১ হ'তে ১৩ বৎসর বয়সের ছেলেরা এই কাজের ভার নিয়েছিল। তাদের প্রত্যেকের, প্রতি ফসলের জন্য এক একটি সীমানির্দ্দিষ্ট জমি ছিল। কিন্তু জমিগুলির

মাঝে "আল" ছিল না। সমস্ত উদ্যানটি চারটি লম্বা ফালিতে ভাগ করা হয়েছিল। স্থতরাং প্রতি ছেলের জমি বিক্ষিপ্ত হলেও এক এক রকম ফসলের জন্য এক একটি লম্বা টানা এক চত্বরের জমি পাওয়া গেছল। সমস্ত ছেলে মিলে সামর্থ্যমত কাজ ভাগ করে এই সমস্ত জমি খুঁড়ে, জল দিয়ে, নিড়িয়ে ফসল উৎপন্ন করে। ফসল জমি হতে উঠলে, প্রত্যেকের জমির মাপ হিসাবে ভাগ করে দিয়ে দেওয়া হয়। বিদ্যালয় হতে এ ফসলের ভাগ নেওয়া হয় না। বলা বাহুল্য ছাত্রগণ এই কাজে খুবই উৎসাহী। এখানে একটি কথা বিশেষ করে বলতে চাই। এই কৃষি কাজে ছেলেরা মালী বা মজুরের সাহায্য পায় না, সব পরিশ্রমই তারা নিজেরা করে। আমাদের দেশে অনেক সময়েই কৃষিউদ্যানের প্রধান কার্য্য ছেলেরা ছাড়া অন্য লোকে করে। এ বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

আপনাদের শিক্ষায়তনগুলি প্রধানতঃ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত; সে জন্য কৃষিউদ্যানের কথাই বেশী করে বললুম। আর কৃষি-সমস্যাই আমাদের প্রধান সমস্যা। তবে শিল্প ও যন্ত্র শিল্পও গড়ে তুলতে হবে। তার জন্যও শিক্ষায়তনে লোক তৈয়ারীর ব্যবস্থা থাকা চাই। এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা আজ আর করব না। সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে যে হাত ও চোখ সমন্বয় শিক্ষার জন্য বাঁশ ও কাঠের কাজ এবং সূতা কাটা, কাপড় বোনা—এই জাতীয় শিল্পের ব্যবহার করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সুইডেনের স্লয়েড পদ্ধতি অতি শ্রেষ্ঠ। এ পদ্ধতিতে পর পর অনেকগুলি নমুনার মারফৎ শিক্ষার্থীকে এক একটি যন্ত্র ও তার বিভিন্ন ব্যবহার ধাপে ধাপে শেখান হয়। কোন কাজটিই শিক্ষক ছাত্রের হয়ে করে দেন না; অন্য একটি নমুনা নির্ম্মাণ করে প্রণালীটি দেখিয়ে দেন মাত্র। দেশের কারু-শিল্পের সঙ্গে যোগ রাখবার জন্য প্রতি দুই-তিন বৎসর অন্তর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত আদর্শ ব্যবহৃত হয়। আপনাদের কোনও বিদ্যালয়ে যদি উপযুক্ত অর্থ থাকে তা হলে এই ধরণের ব্যবস্থা আপনারা করতে পারেন। শহরে যেখানে কাছাকাছি অনেকগুলি বিদ্যালয় থাকে সেখানে সকলে মিলে একটি কেন্দ্রীয় কারখানার ব্যবস্থা করে পাঁচ-ছয়টি শিক্ষায়তনে অল্প খরচে হাতের কাজ ভাগ করে শেখান চলে। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমি এই উপায়ে কারখানার জন্য খরচা ছয়ভাগের এক ভাগে পরিণত করেছিলাম। এক একটি কেন্দ্রে ছয়টি করে বিদ্যালয়ের ছেলে হস্তশিল্প শিক্ষা করত। এখানেও ছেলেদের মধ্যে সমবায় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব ও কর্ত্তব্য।

কৃষি উদ্যানের কাজের পরে যেমন শেষ ... লাঙ্গলের ব্যবহার করে পুরাপুরি কৃষিশিক্ষা দেওয়া চলে, তেমনই যারা ব্যবসায়ের পথে যাবে, তাদের জন্য শেষ দুই বৎসরে কারবারের পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। এ সকল বিষয় শিক্ষা শহরেই সুবিধা। তবে ব্যবসায়ের কাজ বেশীর ভাগই ভূষিমালের; স্থতরাং ছোট শহর ও গ্রামের যোগ এ বিষয়ে সম্ভব ও বাঞ্ছনীয়। দেশে যে সকল কারবারী আছেন, তাঁদের কারবারের উদাহরণ দিয়ে, পরিদর্শন করিয়ে ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিয়ে এ জিনিস প্রায় হাতে-কলমে শেখানোর মত করা যায়। সম্ভব হ'লে কারবারীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে ছুটির সময় সপ্তাহ-কয়েক হাতে-কলমে কাজের ব্যবস্থা করা সমীচীন।

আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যবহারিক শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আপনাদের বলেছি। এবার শিক্ষার সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলব। ভাষা-শিক্ষা, গণিতের পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আপনারা নিশ্চয় করেছেন। সে বিষয়ে পুনরুক্তি করতে চাই না। আপনাদের আজ ভূগোল ও ইতিহাস শিক্ষার কয়েকটি গলদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। যে কোন বিষয় ছোট ছেলেকে শিক্ষা দিতে হ'লে জ্ঞাত হ'তে অজ্ঞাত এবং বিশেষ হ'তে সাধারণ জ্ঞানে পৌছাতে হয়। ইতিহাস শিক্ষার সময় কিন্তু মনস্তত্ত্ব অনুমোদিত এই নিয়মটি পরিত্যাগ করা হয়। ভূগোল শিক্ষার সময় ছোট ছেলেকে তার পাঠশালা ও তারই আশপাশের জায়গা মাপজোক ক'রে নক্সা তৈয়ারী করান হয়। মানচিত্র জ্ঞান শুরু হয় সেইখানে; তার পর জানান হয় গ্রাম, থানা, মহকুমা, জেলা ও শেষে প্রদেশ, এবং ভারতবর্ষের কথা। ইতিহাসেও আপনাদের উচিত আগে তাকে সময়ের জ্ঞান দেওয়া, প্রত্যেকের পারিবারিক বংশাবলী হ'তে। তার পর সেই সঙ্গে যোগ করা উচিত বিদ্যালয় স্থাপনের ইতিহাস। তার পর ছেলেদের বলতে হয় গ্রামের প্রাচীন দেবালয়, মসজিদ ও অন্য প্রতিষ্ঠানের কথা। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের ও সেই অঞ্চলের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবনী সম্বন্ধে বিবৃতি দেওয়া কর্ত্তব্য। ভূগোলে যখন ছেলেরা মহকুমা ও জেলা সম্বন্ধে পাঠ করে তখন ঐ অঞ্চলের সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থানের ও পরিবারের সংক্ষেপ ইতিহাস জানান কর্ত্তব্য। এই রকমে যখন ছেলেরা ইতিহাসের মর্ম্ম বুঝবে তখনই সংক্ষেপে রাজনৈতিক ইতিহাস পড়ান উচিত। কিন্তু এখানেও একটি কথা ভাববার আছে। ইতিহাস কি দেশজয়ের বিবরণ? শুধু যুদ্ধ, রাজ্যাভিষেক ও পরাজয়ের তারিখ-সমষ্টি?

বর্ত্তমানে ইতিহাস প্রায় এই ভাবেই পড়ান হয়। কিন্তু এখানে মানুষের সভ্যতায় ইতিহাসকেই কি প্রধান স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নয়? ছাত্রছাত্রীদের সাম্য, মৈত্রী ও সহযোগিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলা আমরা শিক্ষার মূলমন্ত্র ব'লে মেনে নিয়েছি। যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিদ্বেষের ইতিহাস পাঠ ক'রে কি এই সমদৃষ্টি সম্ভব হ'তে পারে? এই ধরণের ইতিহাস রচনা ও শিক্ষায় কি প্রকার সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয় ও সাম্প্রদায়িক কলহের প্রশ্ন ওঠে বাংলা দেশের শিক্ষকমণ্ডলীর সে কথা অজ্ঞাত নয়। প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিহাস পাঠ এই কারণে সরকারী তরফ হ'তে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সরকারী দপ্তরে বা তাদের গঠিত কমিটিতে যদি শিক্ষাব্রতীগণ শুধু বিবাদ না ক'রে একটু ভেবে দেখতেন, তা হ'লে তাঁরা দেখতে পেতেন যে মানুষের সভ্যতার ইতিহাস আগাগোড়া সহযোগিতায় ভরা। তাঁরা যুদ্ধ ও রাজ্যের ইতিহাস না লিখে, মানুষ কি ক'রে প্রকৃতির সঙ্গে রফা ক'রে মানব-সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলেছে সেই বিষয় ছেলেদের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করতে পারতেন। প্রথমে তাঁরা পড়াতে পারতেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা; তখন কি ক'রে পরস্পরের সহযোগিতার ফলে প্রথম মানব-সমাজ গড়ে উঠল প্রস্তর যুগে। তার পর পড়াতে পারা যায় তাম্রযুগ ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতার কথা। কৃষি কি ক'রে উৎপন্ন হ'ল পূর্ব্বেই বলেছি। কোদালির সাহায্যে যে জাতিরা কৃষিকার্য্য করত এবং অন্য যারা পশুপালন শিখেছিল এই দুই জাতির জ্ঞানের সহযোগিতায় কি ক'রে পশু-চালিত লাঙ্গল উৎপন্ন হ'ল সে কথা জানান যেতে পারে। জঙ্গল কেটে জমি তৈয়ার ক'রে কৃষির জন্য উৎপন্ন হ'ল স্থায়ী গ্রাম ও সামাজিক গোত্র। এই ভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতা, খ্রীষ্টীয় ও মুসলিমদিগের দান সব কথাই বলা চলে। তার সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষদের জন্ম ও খ্যাতনামা সম্রাট্‌দের শাসনের তারিখ যুগসন্ধিস্থল হিসাবে উল্লেখ ক'রে শেখান যেতে পারে। তা হ'লে সাম্প্রদায়িকতা বাদ দিয়ে যথেষ্ট প্রকৃত ইতিহাস পড়ান সম্ভব হয়।

ভূগোলের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার আপত্তি অন্য রকমের। আপনারা অবশ্য পাঠশালা হতে গ্রাম ও গ্রাম হতে থানা এই ক'রে ভূগোল শেখান। আবার পৃথিবীর নানারূপ আব-হাওয়া ভেদে ভিন্ন ভিন্ন জাতির কথাও গল্পচ্ছলে পড়িয়ে থাকেন। তারপর ভূপর্য্যটন বৃত্তান্ত দিয়ে পৃথিবীর কথা জানান। পদ্ধতিটি ভালই। কিন্তু মরুভূমির কথা বললে কি সাহারা অথবা বরফের দেশের কথায় কি মেরু-প্রদেশের এস্কিমোজাতির উল্লেখ উচিত হয়? কোন্ শিক্ষক হারা গেছেন বা সেখানকার লোক দেখেছেন? মেরু-প্রদেশ ও এস্কিমো কি তাঁদের কাছে রূপকথার মত নয়? এ অবস্থায় রাজপুতানার মরুভূমি ও তিব্বতের বরফাবৃত অঞ্চলের লোকের কথা বলা কি অনেক ভাল নয়? বাংলা-দেশের শিক্ষকদের কেহ কেহ রাজপুতানা গেছেন; কলিকাতায় তিব্বতী দেখা যায়; দার্জ্জিলিং গেলে তো কথাই নাই।

তারপর ভূপর্য্যটনের কথা। এ অংশটি শুরু করা হয় ভাস্কো-ডা-গামা কর্ত্তৃক ভারত আবিষ্কারের কথা দিয়ে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের শিক্ষাব্রতীগণ নিজেদের দেশ আবিষ্কারের কথা বলতে লজ্জা বা বিস্ময় বোধ করেন না। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র; পশ্চিম য়ুরোপের লোক যখন আমাদের ও গ্রীস দেশের সংস্কৃতির স্পর্শও পায় নাই, খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ভারতবর্ষ মিশর ও বাবিলনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। তারপর বৌদ্ধযুগে মৌর্য্য সম্রাটগণের সময় শুধু গ্রীস ও মিশর নয়, সুদূর প্রাচ্যে চীন, যবদ্বীপ ও কাম্বোজে আমাদের ধর্ম্মপ্রচারকগণ পৌছেছিলেন। পৃথিবীর ভূগোল ভারতবাসীর পক্ষে এই সকল কাহিনীর ভিতর দিয়ে কি পড়া উচিত নয়? অল্প দিনের সভ্যজাতি পশ্চিম য়ুরোপের লোক তাদের পৃথিবী পর্য্যটনের ইতিহাসের মারফৎ পৃথিবীর ভূগোল পড়তে পারে। কিন্তু আমরাও কি নিজেদের গৌরবময় ইতিহাস পরিত্যাগ ক'রে তাদের এই উচ্ছিষ্ট পাঠকে আমাদের বিদ্যামন্দিরে পূজার আসনে বসাব?

এই বার আমার শেষ কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। জীবনে আদর্শ না থাকলে মানুষ সঙ্কীর্ণ দৈহিক সংস্কারের তাড়নায় শুধু স্বার্থের কথা ভেবে বিবাদ ও বিদ্বেষের পথে চলে। যে সাম্য ও সহযোগিতার শিক্ষা দান আমরা আদর্শ ব'লে গ্রহণ করেছি, পৃথিবীর প্রধান চারিটি ধর্ম্মেরই যে এই মর্ম্ম কথা তা আপনারা শুনেছেন। শিক্ষার ভিতর দিয়ে কি ভাবে সমবায় শিক্ষা দেওয়া চলে ও ইতিহাস পাঠের ভিতর দিয়ে সহযোগিতার সার্থকতা কি ভাবে বোঝান যায়, তাও আপনাদের বলেছি। কিন্তু এর উপরেও আর একটি কাজ করা আপনাদের কর্ত্তব্য। সেটি হাতে-কলমে ধর্ম্ম শিক্ষা। তার প্রকৃষ্ট পথ হচ্ছে মানুষের মঙ্গলের কথা ছেলেমেয়েদের ভাবতে শেখান। নিজের গ্রাম ও পল্লীর লোক কি ভাবে দিন যাপন করছে, তাদের কি উন্নতি করা চলে, নিজেদের স্বার্থত্যাগ করে তাদের কতটুকু সাহায্য সম্ভব, এই উপদেশ ও পথপ্রদর্শনই প্রকৃত

ধর্ম্ম শিক্ষা। ভগবানের সান্নিধ্যলাভ ও ভবিষ্যতে সকলের মঙ্গল এই পথেই সম্ভব। সাম্প্রদায়িক মন্ত্রের প্রচারে, এই শিক্ষা কোনও দিন সম্ভব হয় নাই ও হবে না। যে মহা-পুরুষের জন্মতীর্থে আমরা আজ সমবেত তিনি তাঁর অন্তরে এ সত্যের পূর্ণ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও উপদেশ কখনও দেন নাই। তাঁর সারা-জীবনই তাঁর ধর্ম্মবোধের দীপ্ত প্রকাশমান রূপ হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল।*

* বীরসিংহ গ্রামে গত বৈশাখ মাসে ঘাঁটাল মহকুমা শিক্ষক-সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ।

হিন্দুনারী ও প্রস্তাবিত হিন্দু উত্তরাধিকার

অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র পাল, এম-এ, বি-এল

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংশোধন ও সংহিতাকারে নিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। কেহ কেহ নানা আপত্তি তুলিয়া এই সময় ইহার আলোচনা বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নির্ব্বাচিত কমিটি দ্বারা প্রস্তাবিত আইনের বিস্তারিত আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু আইন-বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাব বলিয়া এই আইনের খসড়া গেজেটে প্রকাশিত হয়। তখন কোনও কোনও দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল, কিন্তু এই কমিটি দ্বারা বিবেচিত হইবার পূর্ব্বে বিভিন্ন দিক্ হইতে ইহার আরও বিশদ আলোচনা হওয়া উচিত।

প্রায় দেড় শত বৎসরের ইংরেজী শিক্ষার ফলে হিন্দু-দিগের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সময় ও শিক্ষার পরিবর্ত্তনের সহিত জীবনযাত্রার আদর্শ অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত নানা কারণে যৌথ পরিবার আজ হিন্দুদিগের মধ্যে লুপ্তপ্রায়। পিতার মৃত্যুর পরে পুত্রেরা সকলে একত্রে এক যৌথ পরিবারে বাস করিতেছে, ইহা বর্ত্তমানে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলে পিতার মৃত্যু হইলেই এক যৌথ পরিবার ভাঙিয়া বিভিন্ন পরিবারের সৃষ্টি হইতেছে। যৌথ পরিবারই সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা ধরিয়া যে-সমস্ত আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল, সামাজিক অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হওয়া সত্ত্বেও সেই সমস্ত আইন এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, সম্পত্তি যাহাতে কখনও যৌথ পরিবারের বাহিরে চলিয়া না যায় তাহাই এই সমস্ত আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। যত দিন যৌথ পরিবারের বন্ধন ছিল, তত দিন মা, স্ত্রী, ভগ্নী প্রভৃতির আইনসঙ্গত অধিকারের কথা ভাবিবার বিশেষ দরকার হয় নাই, কিন্তু সে বন্ধন এখন শিথিল হওয়াতে এবং ইহাদের আইনসঙ্গত বিশেষ কোনও অধিকার না থাকাতে আমাদের সমাজে নানা প্রকার অবিচার চলিতেছে এবং পারিবারিক জীবনে নানা প্রকারের অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। সমাজের এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা দূর করিতে এবং স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতির প্রতি সুবিচার করিতে হইলে বর্ত্তমান উত্তরাধিকার-আইন সংশোধন করা প্রয়োজন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের সামাজিক আইন পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করিলেই এক দল লোক ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করেন। ইহকালের কল্যাণ উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা পরকালের কাল্পনিক মঙ্গলের উপর উত্তরাধিকারের ভিত্তি করিতে চান, তাঁহাদিগের সহিত বাদানুবাদ করিয়া কোনও লাভ নাই। যুক্তিদ্বারা তাঁহাদিগকে বুঝান অসম্ভব। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের পক্ষে প্রস্তাবিত আইন উপযোগী কি না, কেবলমাত্র এই দৃষ্টিকোণ হইতেই ইহার আলোচনা সম্ভব। শুনিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা প্রস্তাবিত আইনের বিপক্ষে মত দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পিণ্ডাধিকারীই সম্পত্তি পাইবারও অধিকারী এই ধারণা বাংলা দেশে বহুদিন চলিয়া আসিতেছে, কাজেই সম্পূর্ণ নূতন ভাবে উত্তরাধিকার গঠন করিতে অনেক বাঙালীর মনেই দ্বিধাবোধ হইতেছে। চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে প্রথিতনামা আইনজ্ঞ ডাক্তার জয়াকরের প্রস্তাবে যখন অন্ধ ও বিকলাঙ্গ পুত্রকে পিতার সম্পত্তি পাইবার অধিকার দেওয়া হয় তখনও বাঙালী সভ্যদের আপত্তিতে বাংলা দেশ ছাড়িয়া অন্য সমস্ত প্রদেশে সে আইন প্রযোজ্য হইয়াছিল। সেই মনোভাবের ফলে আজও বাংলা দেশে ভ্রাতার সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া গেলেও ভগ্নীর পাইবার অধিকার নাই। আজ স্ত্রীলোকের আইনসঙ্গত অধিকার বৃদ্ধির প্রস্তাবেও সেই একই মনোভাব প্রকাশিত হইতেছে।

নূতন উত্তরাধিকার-আইনের প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিবার সময় এই আইনের তিনটি উদ্দেশ্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, হিন্দুদিগের উত্তরাধিকার ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র এক হইবে। দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রীলোকদিগের উত্তরাধিকারের দাবি যথোপযুক্তভাবে স্বীকৃত হইবে এবং তৃতীয়তঃ, স্ত্রীলোকের সম্পত্তিতে অধিকার কেবলমাত্র স্ত্রীলোক বলিয়া কোনও প্রকারে সীমাবদ্ধ হইবে না।

প্রস্তাবিত আইন পাস হইলে ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দুগণ উত্তরাধিকারের একই নিয়মের অধীন হইবে এবং মিতাক্ষরা ও দায়ভাগের প্রভেদ তিরোহিত হইবে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিভিন্ন প্রাদেশিক নিয়ম বিলোপ করিয়া সমস্ত দেশের জন্য এক সাধারণ আইন প্রবর্ত্তন করাতে সেই সমস্ত দেশে ক্রমে ক্রমে একটা জাতীয় ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। উত্তরাধিকারের একই নিয়ম ভারতের সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হইলে নানা প্রদেশের হিন্দুদিগের মধ্যেও একতা-বোধ কালক্রমে দৃঢ়তর হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্দেশ্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে বর্ত্তমান অবস্থার কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা আবশ্যক। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোনও হিন্দুর মৃত্যু হইলে তাহার পুত্রেরাই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত। তাহার স্ত্রী, অবিবাহিতা কন্যা এবং বৃদ্ধা মাতার সেই সম্পত্তির উপরে গ্রাসাচ্ছাদনের দাবি থাকিত মাত্র। পিতার পূর্ব্বে কোনও পুত্রের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র বা পুত্রেরা পিতামহের সম্পত্তিতে পিতার অংশের অধিকারী হইত। কিন্তু অপুত্রক অবস্থায় পুত্রের মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা পত্নী কিছুই পাইবার অধিকারী হইত না, এমন কি শ্বশুরের সম্পত্তি হইতে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন পাইবারও অধিকার ছিল না। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার দেশমুখের প্রস্তাবে এই আইন সংশোধিত হয়। তাহাতে বিধবা পত্নী পুত্রের সমান এক অংশ পাইবার অধিকারী হইয়াছে এবং অপুত্রক বিধবা পুত্রবধূকেও তাহার স্বামীর প্রাপ্য অংশ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাতে পারিবারিক জীবনের অনেক অশান্তি দূরীভূত হইয়াছে। কিন্তু দেশমুখের সংশোধিত আইন দ্বারা পিতৃধনে কন্যার অধিকার কোনও প্রকারে পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। প্রচলিত হিন্দু আইন অনুসারে অবিবাহিত অবস্থায় গ্রাসাচ্ছাদন ও বিবাহের ব্যয় ব্যতীত পিতার সম্পত্তিতে পুত্র বর্ত্তমানে কন্যার অন্য কোনও অধিকার নাই। পুত্র এবং কন্যার মধ্যে এইরূপ প্রভেদ বিংশ শতাব্দীতে অন্য কোনও জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান কালে ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত দেশে ও জাপানে পুত্র এবং কন্যা তুল্যাংশে পিতার সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে। প্রাচীনকালেও ঈজিপ্ট, মেসোপোটেমিয়া ও রোমে পুত্র ও কন্যার অধিকারে কোনও প্রভেদ ছিল না। ভারতবর্ষেও যাহাদের উত্তরাধিকার ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় উত্তরাধিকার-আইন অনুসারে হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যেও পুত্র-কন্যারা পিতৃধন সমান অংশে প্রাপ্ত হয়। মুস্লিম আইন অনুসারেও কন্যা পুত্রের অর্দ্ধেক পাইবার অধিকারী। প্রস্তাবিত আইনে কন্যা পুত্রের অর্দ্ধেক পাইবে এই ব্যবস্থা হইয়াছে।

যখন যৌথ পরিবার প্রচলিত ছিল তখন সম্পত্তি যাহাতে বংশপরম্পরায় পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই সমস্ত সম্পত্তি পুত্রকে দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে পিতার মৃত্যুর পরেই যৌথ পরিবার ভাঙিয়া বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত হইতেছে। অতএব যে-সামাজিক অবস্থায় কন্যাকে পিতৃধনে বঞ্চিত করা হইত সে অবস্থা এখন আর নাই। পক্ষান্তরে আজ কন্যা পিতৃধনের অধিকারী নয় বলিয়াই যৌতুক না দিলে কন্যার বিবাহ হওয়া হিন্দু সমাজে অসম্ভব। কিন্তু পিতৃধনের উত্তরাধিকারী হইলে যে মর্য্যাদা লইয়া কন্যা স্বামিগৃহে যাইতে সক্ষম হইত আজ বিবাহের সময় যৌতুক দেওয়া সত্ত্বেও তাহার সে মর্য্যাদা নাই। স্বাভাবিক স্নেহ ও ন্যায় বিচারের দিক হইতে দেখিতে গেলেও কন্যাকে পুত্র হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিবার কোনও হেতু নাই।

নূতন আইনের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, এই আইন কোনও মূলনীতি অনুসরণ করিয়া প্রণীত হয় নাই। প্রত্যেক ব্যবস্থাই একটা আপোষ-নিষ্পত্তির মনোভাবপ্রসূত। আইন-প্রণয়নকারীরা স্ত্রীলোকের অধিকার বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের অধিকার সমান ইহা কোনও অবস্থাতেই স্বীকার করেন নাই। ন্যায় বিচারে এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য কন্যাকে পিতৃধনের অধিকারী করিলে সে পুত্রের সমান না পাইয়া অর্দ্ধেক কেন পাইবে, জনমত ব্যতীত ইহার পক্ষে অন্য কোনও কারণ তাঁহারা দেখান নাই। পিতার সন্তান বলিয়া যদি কন্যার দাবি হইয়া থাকে তাহা হইলে সে অধিকার পুত্রের সমান, অর্দ্ধেক নহে। অতএব প্রস্তাবিত আইন নির্ব্বাচিত কমিটিতে এইরূপ সংশোধিত হওয়া উচিত যাহাতে বিধবা স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যা সমান অংশে পিতার সম্পত্তি পাইবার অধিকারী হইতে পারে।

আমাদের দেশে যৌথ পরিবারের আদর্শ নষ্ট হইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের মত পুত্র বিবাহ করিয়াই পিতার সংসার হইতে পৃথক্ হইয়া বাস করিবার রীতি এখনও প্রচলিত হয় নাই। সে জন্য অনেকেই মনে করেন যে, কন্যাকে উত্তরাধিকারী করিলে সে সম্পত্তি অন্য পরিবারে চলিয়া যাইবে। যত দিন পুত্র বিবাহ করিয়া পিতার পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিবার প্রথা থাকিবে, তত দিন কতক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এবং কতক কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য এক দল লোকের পক্ষে কন্যাকে পিতৃধনের অংশ দিতে দ্বিধা বোধ করা স্বাভাবিক, কিন্তু ন্যায় এবং অপত্যস্নেহের দিক হইতে দেখিতে গেলে কন্যাকে পিতৃধনে বঞ্চিত করা কখনই স্বাভাবিক হইতে পারে না। তাহা ছাড়া হিন্দু সমাজের এখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, প্রত্যেক কন্যারই উপযুক্ত বিবাহ হওয়া অসম্ভব। এই অবস্থায় অবিবাহিতা কন্যা বা অসহায় বিবাহিতা কন্যার জন্য সংস্থান করা পিতারই কর্ত্তব্য। সমস্ত বিষয় নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিলে পিতৃধনে কন্যার দাবি কাহারই অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এক দল লোক অর্থনীতি আলোচনা করিয়া বলিতেছেন যে, কন্যাকে উত্তরাধিকারের অধিকার দিলে সম্পত্তি বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। ভূসম্পত্তি বহু বিভাগ হইলে অনেক সময় বিনষ্ট হইয়া যায় এবং কৃষির ভূমি অধিক বিভাগ হইলে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর এই দুইটি সত্য কথা। কিন্তু প্রস্তাবিত আইন কৃষির ভূমির উত্তরাধিকারে প্রযোজ্য নহে। তাহা ছাড়া যদি উত্তরাধিকার-আইন কেবলমাত্র অর্থনীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তাহা হইলে একাধিক পুত্রের পিতার সম্পত্তি এক পুত্রের পাইবার ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু যে-সমস্ত পাশ্চাত্য দেশে পূর্ব্বে ভূসম্পত্তি এক পুত্রের পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, ন্যায়ের বিধান অনুসরণ করিয়া সে সমস্ত দেশেও পিতার সমস্ত সম্পত্তিতে পুত্র এবং কন্যার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে ঐ সমস্ত দেশের ভূসম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় নাই।

যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নূতন আইনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, একটি ব্যবস্থা সেই উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। দেশমুখের আইন-অনুসারে বিধবা পুত্রবধূকে শ্বশুরের সম্পত্তিতে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, কন্যাকে পিতৃধনের অধিকারী করিয়া তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। সমর্থনে ইহাই কেবল বলা হইয়াছে যে পিতার সম্পত্তি পাইলে স্ত্রীলোকের শ্বশুরের সম্পত্তি পাইবার কোনও প্রয়োজন নাই এবং পিতার এবং শ্বশুরের আর্থিক অবস্থা সমান হইলে পুত্রবধূরূপে যে ক্ষতি হইবে কন্যারূপে তাহা পূরণ হইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, কন্যা পিতার নিকট হইতে যথেষ্ট সম্পত্তি নাও পাইতে পারে। তাহা ছাড়া হিন্দু সমাজে যত দিন পুত্র বিবাহ করিয়াও পিতার সংসারেই বাস করিবার প্রথা থাকিবে, তত দিন পুত্রবধূর এই অধিকার না থাকিলে পুত্রহীন পুত্রবধূকে পিতৃগৃহে আশ্রয় লইতে হইবে। ইহা অনেক সময়ই বাঞ্ছনীয় নহে। পরিবারের মঙ্গলই উত্তরাধিকারের মূলনীতি হইলে যাহাদিগকে উপার্জ্জন করিতে সময় ও সুযোগ না দিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত রাখা হয় তাহারা যাহাতে নিঃসহায় হইয়া না পড়ে উত্তরাধিকার-আইনে তাহারই ব্যবস্থা থাকা উচিত। পুত্রবধূ তাহার পিতা এবং শ্বশুর দুই জনেরই উত্তরাধিকারী হইলে ভাসুর এবং দেবরের অংশ কিঞ্চিৎ কমিয়া যাইবে, কিন্তু ইহাতে পরিবারের কি অমঙ্গল হইবে তাহা ধারণা করা কঠিন।

প্রচলিত হিন্দু আইনে ব্যবস্থা আছে যে, উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীলোকের সীমাবদ্ধ অধিকার হইবে। আদালতগ্রাহ্য আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত তাহার দান-বিক্রীর কোনও অধিকার থাকিবে না এবং মৃত্যুর পরে তাহার উত্তরাধিকারীদের এই সম্পত্তিতে কোনও দাবি থাকিবে না। নারী হইলেই তাহার স্বত্ব সীমাবদ্ধ হইবে এবং পুরুষ মূর্খ এবং অল্পবুদ্ধি হইলেও পূর্ণ অধিকার পাইবে এই ব্যবস্থা সমস্ত হিন্দু নারীকে লোকচক্ষে হীন করিয়া রাখিয়াছে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য কোনও দেশে এইরূপ ব্যবস্থা নাই। এমন কি, ভারতবর্ষেও খ্রীষ্টান, মুসলমান, পার্সী ও জৈন রমণীরাও নির্ব্যূঢ় স্বত্বে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেবল হিন্দুনারীই পূর্ণ অধিকার পাওয়ার অযোগ্য একথা কেহই স্বীকার করিবেন না। অনেক বিচক্ষণ বিচারপতির মতে স্ত্রীলোকের এইরূপ সীমাবদ্ধ অধিকার থাকাতেই হিন্দু-পরিবারে অধিকাংশ মকদ্দমার উৎপত্তি হইতেছে। প্রস্তাবিত আইনে স্ত্রীলোকের সীমাবদ্ধ অধিকারের পরিবর্ত্তে নির্ব্যূঢ় স্বত্বের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাই নূতন উত্তরাধিকার-আইনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং সকলের সমর্থনের যোগ্য তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বিধবা স্ত্রীর উত্তরাধিকার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিলে বর্ত্তমান সময়ের হিন্দু-পরিবারের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে এইরূপ অনেকেই মনে করেন। নূতন আইনের ব্যবস্থা অনুসারে নিঃসন্তান অবস্থায় কাহারও মৃত্যু হইলে

তাহার পিতামাতা জীবিত থাকিলেও তাহার বিধবা স্ত্রী নির্ব্যূঢ় স্বত্বে তাহার সমস্ত সম্পত্তি পাইবার অধিকারী হইবে। আমাদের সমাজে এখনও অনেক পিতামাতা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া পুত্রকে শিক্ষা দিয়া বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের উপার্জ্জনের উপরে নির্ভর করিয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থায় পুত্রের মৃত্যু হইলে জীবন-বীমা প্রভৃতি পুত্রের সমস্ত সম্পত্তি পুত্রবধূর হস্তগত হইলে বৃদ্ধ পিতামাতাকে অশেষ কষ্টভোগ করিতে দেখা গিয়াছে। স্ত্রীর অধিকার সর্ব্বাগ্রে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার জীবনোপায়ের যথেষ্ট ব্যবস্থা হইবার পরে বৃদ্ধ পিতামাতার কতক অংশ পাইবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

পুত্র এবং কন্যাকে তুল্যাংশে পিতৃধনের অধিকারী করিলে স্ত্রীলোকের সম্পত্তি পুত্র এবং স্বামীকে বাদ দিয়া কন্যাকে এবং তাহার অভাবে কন্যার কন্যাকে দিবার ব্যবস্থা সমীচীন মনে হয় না। তাহার সম্পত্তি পুত্র, কন্যা ও স্বামীর সমান অংশে পাইবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য দেশসমূহে পুরুষ এবং নারীর আইনসঙ্গত অধিকারের প্রভেদ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু আমাদের আইন-প্রণেতারা ইহা করেন নাই। পিতার পূর্ব্বে পুত্রের মৃত্যু হইলে পৌত্রের তাহার ভাগ পাইবার ব্যবস্থা আছে কিন্তু পৌত্রীর তাহা পাইবার অধিকার নাই। কন্যাকে যখন পিতৃধনের অধিকারী করা হইয়াছে তখন এই প্রভেদ তুলিয়া দিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় আইনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

পিতা এবং মাতার মধ্যে কোনও প্রভেদ না করিয়া দুই জনকেই সমান অংশে পুত্র এবং কন্যার উত্তরাধিকারী করিলে ভাল হয়। সেইরূপ ভ্রাতা এবং ভগ্নীর অধিকারও এক হওয়া বাঞ্ছনীয়। নির্ব্বাচিত কমিটিতে নারীর স্বার্থ যথোপযুক্তভাবে রক্ষা করিতে সুদক্ষা নারী সভ্যা মনোনীত হইয়াছেন। আশা হয়, তিনি পুরুষ এবং নারীর আইনসঙ্গত অধিকারের প্রভেদ অপসারণ করিতে সমর্থ হইবেন।

আফ্রিকার বাঁটোয়ারা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত

আফ্রিকার রাজনৈতিক ভাগ-বাঁটোয়ারা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের একটা বিশেষ কীর্ত্তি—অন্ততঃ ঐতিহাসিক বিচারের দিক থেকে। উনবিংশ শতাব্দীই আফ্রিকার ভাগ্যের বর্ত্তমান বিপর্য্যয় আনে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের আফ্রিকায় প্রভুত্ব স্থাপনের পূর্ব্বে প্রাচ্যের অটোমান সাম্রাজ্যবাদই ওখানে আস্তানা গেড়েছিল। মিশর, মিশরীয় সুডান, টিউনিসিয়া এবং ত্রিপোলি এক দিন তুর্কী সুলতানের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার আওতায় ছিল। এ ছাড়া আবিসিনিয়া, মরোক্কো, জাঞ্জিবার এবং নিগ্রো সাধারণতন্ত্র লাইবিরিয়া স্বাধীনভাবেই তাদের রাষ্ট্র পরিচালনা করত। গোষ্ঠীতত্ত্বের দিক্ থেকে বিচার করলে এ কথা বলা যেতে পারে যে, আফ্রিকার প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যেই নিগ্রো-বাণ্টু রক্ত প্রবহমান। তা ছাড়া আফ্রিকার অন্যান্য আদিম জাতির বসতি-ভূমিতে নিজেদের রচিত শাসন-ব্যবস্থা ছিল যা অবিরতই বিশেষ কোন শক্তিশালী সর্দ্দার অথবা ঐরূপ কোন নেতার ক্ষমতা-প্রসারের চাপে পরিবর্ত্তিত হত। ইসলাম অথবা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এই সব আদিম জাতিগুলির উপর বিশেষ প্রভুত্ব বজায় রাখতে পারে নি তার কারণ বোধ হয় খানিকটা পরিমাণে ভৌগোলিক সংস্থানই, কেননা, এই আদিম জাতিগুলি আফ্রিকা মহাদেশের ঠিক মধ্যস্থলে বাস করত। সেখানকার শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, এ তিনটেই কি ইসলাম, কি খ্রীষ্ট ধর্ম্মযাজক কারুর কাছেই খুব অনুকূল ছিল না। আদিম জাতিগুলির আদিম সভ্যতা ও সমাজ এখনও কিছু কিছু বেঁচে থাকার তাই বোধ হয় কারণ।

আমরা ইতিহাসে দেখেছি যে, ধর্ম্মবিজয় সাম্রাজ্যবাদ স্থাপন ও রক্ষার পক্ষে একটা বিশেষ অঙ্গ। হিন্দু আমলে হিন্দু-বিজয়, বৌদ্ধ আমলে বৌদ্ধ-বিজয়, ইসলাম আমলে ইসলাম-বিজয়, খ্রীষ্ট আমলে খ্রীষ্টান-বিজয়—এ একটানা সাম্রাজ্যবাদ স্থাপনের বাহনরূপে ইতিহাসে চলে আসছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে ধর্ম্ম অনেক পরিমাণে অর্থনৈতিক শক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। তাই বর্ত্তমান সাম্রাজ্যবাদের রূপ ধর্ম্মমিশ্রিত আর্থিক-স্বার্থের স্তর পেরিয়ে একেবারে পুরোপুরি নগ্ন আর্থিক-স্বার্থে রূপান্তরিত হয়েছে। মূলতঃ শিল্পের ইন্ধন কাঁচা মাল ও ঔপনিবেশিক স্বার্থ এখান থেকেই সুরু হয়। তা ছাড়া বিশেষ ‘প্রভাবপুষ্ট এলাকা’র

জন্ম—ধর্ম্ম, অর্থ ও সামাজিক প্রভুত্বের ত্রয়ী সমন্বয় মাত্র। আফ্রিকায় পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের মূল কারণ— মধ্য-প্রাচ্যের অটোমান সাম্রাজ্যের দুরবস্থা, যেমন জাপানী সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের কারণ মাঞ্চু সাম্রাজ্যের দুরবস্থা। মাঞ্চু সাম্রাজ্য শক্তিশালী থাকলে জাপানের পক্ষে কোরিয়া বা ফরমোজা দখল করা সম্ভব হত না। তুর্কীর সুলতান যদি শক্তিশালী হ'ত তা হলে বেলজিয়মের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ডের পক্ষে 'স্বাধীন কোঙ্গো রাষ্ট্র' তৈরি সম্ভব হত না। আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক লুঠতরাজের ক্ষেত্রে এক দস্যুই যে আর এক দস্যুর পতনের কারণ এ বিষয়ে তিল মাত্র সন্দেহ নেই।

এবারে আমরা আফ্রিকা-বাঁটোয়ারা কার্য্যে পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের চক্রান্তের কিছু আলোচনা করব। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে-সব রাষ্ট্রের স্বার্থ আফ্রিকায় শিকড় গেড়েছিল তাদের মধ্যে ফ্রান্স, পর্ত্তুগীজ, ও ব্রিটেন তিনটি রাষ্ট্রের নামই উল্লেখ করা যেতে পারে। উত্তর-আফ্রিকায় তুর্কীরা ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপোলীর শাসন-ক্ষমতা অধিকার করে। মরোক্কো যদিও স্বাধীন ছিল তবু তার রাষ্ট্রিক ও আর্থিক দুর্গতি ঐ সময় থেকেই সুরু হয়। খেদিব ইসমাইল ডারফার বিজয় ও হারার হস্তগত করেন। তার পর এডেন প্রণালীর বন্দর সোমালী পর্য্যন্ত হস্তগত করেন। ইচ্ছা ছিল যে তাঁর প্রভুত্ব ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত পৌছাক, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি। এদিকে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজ খাল খোলার পর থেকে মিশরের রাজনৈতিক গুরুত্ব নতুন আকার ধারণ করে এবং প্রাচ্যগামী নৌ-চলাচলের প্রধান পথ সুয়েজ ব্রিটিশের আওতায় থাকায় আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, যদিও এই দ্বন্দ্বের আগুন ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল। তা ছাড়া অন্য কারণেও সেটা খুব প্রকট হয় নি। তার কারণ ব্রিটিশের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স তখন ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে একবারে ক্ষতবিক্ষত। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া আফ্রিকার ওপর দুভাবে ফুটে ওঠে। এক হ'ল বিজয়ী জার্ম্মানীর উদ্বৃত্ত শক্তির রক্ষাস্থল হিসাবে; আর এক হ'ল যুদ্ধাহত ফরাসী শক্তির আশ্রয়-স্থল হিসাবে। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের পর থেকে ফরাসীর ইউরোপে শক্তি-বিস্তারের আর কোন পন্থাই রইল না। কাজেই তাকে অন্যত্র আশ্রয় খুঁজতে হ'ল। এদিকে জার্ম্মানী নববলে বলীয়ান হয়ে নিজে সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে মন দিল। যেমন চাই তার নবশক্তির আস্তানা, তেমনি চাই তার শিল্পের খোরাক কাঁচা মাল। অতএব আমরা ধরে নিতে পারি যে ভবিষ্যতে আর একটা ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান ঔপনিবেশিক রেষারেষির ব্যবস্থা এখন থেকেই হয়ে রইল। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিটা সব সময়ই বাঞ্ছিত খাতে ঢালাই হয় না। মধ্যে মধ্যে অবাঞ্ছিত দু-একটা ঘোলাটে স্রোত এসে গতিটাকে জটিল ক'রে তোলে।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়মের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড একটি ইউরোপীয় আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক ডাকেন। এই বৈঠকটি ব্রুসেল্‌সে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বসে। এই বৈঠকে জার্ম্মানী, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, বেলজিয়ম, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী যোগদান করে। এই ইউরোপীয় আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক পরামর্শের উদ্দেশ্য খুব মহৎ বলতে হবে! কেননা, এই বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কি উপায়ে আফ্রিকা দেশটি ষোল আনা পাশ্চাত্য জাতিগুলির মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্ভব হ'তে পারে। বৈঠকের প্রস্তাবের মধ্যে এই কথা কয়টি বেশ স্পষ্ট ছিল:

"....to deliberate on the best methods to be adopted for the exploration and civilization of Africa, and the opening up of the interior of the continent to *Commerce and Industry*."*

এখন আর রাজনৈতিক বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা খুব অস্পষ্ট রইল না। আমরা বুঝতে পারছি যে-কোন উপায়ে হোক আফ্রিকার ঘাড় ভেঙে ব্যবসা এবং শিল্পকে ফলাও ক'রে তুলতে হবে। রাজা লিওপোল্ডের রাজনৈতিক বুদ্ধি খুব সূক্ষ্ম ছিল না। তার কারণ তিনি এই বৈঠক ডেকে সবার চোখ ফুটিয়ে দিলেন। প্রধানতঃ এই যে বৈঠক হয়েছিল তাতে যোগদানকারী রাষ্ট্রের সরকারী সমর্থন ছিল না। তারা শুধু নিজেদের বে-সরকারী প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল এবং পেছন থেকে বৈঠকের আলোচনার পদ্ধতিটা লক্ষ্য করেছিল। রাজা লিওপোল্ড যখন "আন্তর্জ্জাতিক আফ্রিকা সঙ্ঘ" স্থাপনের প্রস্তাব করলেন তখন প্রত্যেকটি বে-সরকারী প্রতিনিধি তাতে সায় দিলে, এবং ব্রুসেলসেই এই সঙ্ঘ স্থাপিত হ'ল। এই বৈঠকের প্রস্তাবগুলির সঙ্গে কোন রাষ্ট্রই নিজেদের কোনরূপ বাধ্যবাধকতা না রেখে সরাসরি স্বাধীন ভাবে আফ্রিকায় স্বার্থ বিস্তারে মনোযোগ দিলে। ক্রমশঃ এই "আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক সঙ্ঘ" বেলজিয়মের নিজস্ব জাতীয় সঙ্ঘ হয়ে দাঁড়াল। শেষে রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ডের একেবারে নিজের আওতায় চলে গিয়ে স্বাধীন কঙ্গো রাষ্ট্র হিসাবে কাজ করতে লাগল। রাজা লিওপোল্ডকে রাজনৈতিক বুদ্ধিতে কাঁচা বলার কারণ হচ্ছে

* *The Encyclopædia Britannica*, 14th Ed.

তিনি সব রাষ্ট্রের নাড়ীর খবর রাখতেন না। যখন রাষ্ট্রগুলি সরকারী ভাবে আলোচনায় যোগ দিল না তখনই বোঝা উচিত ছিল যে এর পিছনে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু বেলজিয়মের রাজা ছিল অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষাপ্রিয় মানুষ, তাই অসম্ভব আশার নেশায় তিনি এ দিকটা আর বিচার করতে চাইলেন না। রাজা লিওপোল্ডের আলোচনা-বৈঠকের পূর্ব্বে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি যে মোটেই বসে ছিল না তার প্রমাণ আছে, যথা, পর্ত্তুগীজ আফ্রিকায় যে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল তার পরিমাপ হবে ৭,০০০,০০০ বর্গমাইল। এর মধ্যে মাত্র ৪০,০০০ বর্গমাইল স্থান পর্ত্তুগীজদের খাঁটি শাসনের আমলে ছিল। ব্রিটেন মালিক ছিল ২৫০,০০০ বর্গমাইল স্থানের, ফরাসী ১৭০,০০০ বর্গমাইল এবং স্পেন ১০০০ বর্গমাইলের। এই যে স্থানগুলি অধিকার বা এদের উপর প্রভাব বিস্তার এসবই রাজা লিওপোল্ডের আলোচনা-বৈঠকের পূর্ব্বে ঘটে, কেননা, রাজা লিওপোল্ডের বৈঠক বসে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আর আমরা আফ্রিকা অধিকারের যে হিসাব দিলাম তা হচ্ছে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের।

তা হ'লেও রাজা লিওপোল্ডের আফ্রিকার রাজনৈতিক স্বার্থ-বিচারের উদ্দেশ্য কতকটা ফলবতী হয়েছিল, তবে কিছু বিলম্বে এই যা। তার কারণ, আফ্রিকায় পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য যে-সব রক্ষা-কবচ তৈরি করেছিল, তাতে দেখা গেল যে নিজেদের মনোমালিন্য উগ্র হয়ে ওঠে। অথচ সেই সব কারণে যুদ্ধ করাও সম্ভব নয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লর্ড গ্রানভিলি আফ্রিকায় ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে পর্ত্তুগীজদের আফ্রিকার রাজনৈতিক স্বার্থ মেনে নিয়ে এক চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তির প্রতিক্রিয়া অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর খুব শুভ হ'ল না। সবাই পর্ত্তুগীজদের অধিকার স্বীকারোক্তির চুক্তিটাকে অনেকটা বাড়াবাড়ি বলেই মনে করলে। মানে পর্ত্তুগীজদের দাবীকে অযথা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই মনোভাবটাও প্রতি রাষ্ট্রে জাগল যে সবাই মিলে কোন একটা বিশেষ নীতি আফ্রিকা সম্বন্ধে গ্রহণ না করলে, ফল সুদূর ভবিষ্যতে ভাল না-ও হ'তে পারে। তাই আফ্রিকায় পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের বিশেষ এক সুসম্বদ্ধ নীতির উদ্ভাবনকল্পে বার্লিনে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর একটি কূটনৈতিক আলোচনার বৈঠক বসে। এই আলোচনা-বৈঠকই বিখ্যাত "বার্লিন কন্‌ফারেন্স"; আর এর ফলাফলকে বলা হয় "জেনারেল এ্যাক্ট অব বার্লিন কন্‌ফারেন্স"। এই আলোচনায় যে-সব রাষ্ট্র যোগদান করেছিল তাদের মধ্যে আমেরিকার প্রবেশটাই একটু কৌতুকপ্রদ। কেননা তার আফ্রিকায় কোন স্বার্থ ছিল না। সম্ভবতঃ এটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের একটা কূটনৈতিক চাল। প্রায় অনেক কাল ধরেই ব্রিটিশের বৈদেশিক রাজনীতিতে আমেরিকার জন্য একটা বিশিষ্ট স্থান বরাদ্দ করা আছে। এটা সম্ভবত প্রাচ্যের ব্রিটিশ ও আমেরিকার অর্থনৈতিক স্বার্থের সহযোগিতার ফল। এ ছাড়া তুর্কী ও ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্রই এই আলোচনা-বৈঠকে যোগ দিয়েছিল।

এই বৈঠকের আলোচ্য প্রস্তাবগুলি বিশ্বশান্তি এনেছিল কিনা বলা মুশকিল, তবে এ কথাটা জোর ক'রেই বলা চলে যে আফ্রিকার মনে কোন শান্তি আনে নি। আফ্রিকার রাজনৈতিক চেতনা সম্বন্ধে অনেক রকম স্বার্থপ্রণোদিত প্রচার পাশ্চাত্য জাতিদের আছে। কিন্তু যদি রাজনৈতিক সুব্যবস্থা কিছুই না থাকৃল, লাইবিরিয়ার সাধারণতন্ত্র কি ক'রে সম্ভব হ'ল? তা ছাড়া অন্যান্য যে-সব ছোটখাট জাতি বা উপজাতি আছে তাদের মধ্যেও রাজনৈতিক চেতনাবোধ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সকে পশ্চিম-আফ্রিকায় উপজাতি সাধারণের নেতাদের সঙ্গে বিয়াল্লিশটি চুক্তিরও বেশী চুক্তি সম্পন্ন করতে হয়েছিল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে "আফ্রিকান ন্যাশনাল কোম্পানি" ব্রিটিশ জাতির স্থিত স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে সোনোটোর ফুলা সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ স্থাপন করে। এই দুটো দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যাবে আফ্রিকায় রাজনৈতিক সুব্যবস্থা না থাকলেও একটা যে গঠনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। আমাদের মনে হয় পৃথিবীতে উপজাতিগুলির বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ সমাজ-ব্যবস্থার আদিম পর্ব্ব মানবেতিহাসের দৃষ্টান্তস্থল হিসাবে সর্ব্বদাই চোখের সামনে থাকা উচিত। এ না হলে ইতিহাসের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রাজনৈতিক গঠনতন্ত্রের দিক থেকেও আদিম উপজাতিদের গঠনতন্ত্র বাঁচিয়ে রাখা একান্ত প্রয়োজন। কেননা, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে যত রকম গঠনতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে তার সবারই মূলসূত্র নিহিত রয়েছে ঐ আদিম উপজাতিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়। পৃথিবীর ইতিহাসে ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্র বা সমাজ-ব্যবস্থা মহৎ ক'রে তুলতে হ'লে এই সব আদিম উপজাতিদের ব্যবস্থাগুলো পর্য্যবেক্ষণসাপেক্ষ। কিন্তু বণিকতন্ত্রের স্বার্থ যেদিন সমাজ-ব্যবস্থায় প্রবল হয়ে উঠল, সেই দিন থেকেই এই সব আদিম বিধি-ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন দেখা দিল।

বার্লিনের আলোচনা-বৈঠককে বৃহত্তর ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে আফ্রিকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের ধ্বংস-যজ্ঞই সেখানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বার্লিন বৈঠকে যে-সব আলোচনা হয় তার মধ্যে ছয়টি প্রস্তাব নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—

(1) Freedom of trade in the basin of the Congo.
(2) The Slave trade.
(3) Neutrality of territories in the basin of the Congo.
(4) Navigation of the Congo.
(5) Navigation of the Niger, and
(6) Rules for future occupation on the Coasts of the African Continent.*

উপরিউক্ত প্রস্তাবের মধ্যে ছয় ধারার প্রস্তাবটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই ছয় ধারার প্রস্তাব থেকেই প্রমাণ হবে যে বিভিন্ন রাষ্ট্র আফ্রিকা দেশটিকে কি ভাবে ভাগ-বাঁটোয়ারা করেছিল।

বার্লিন বৈঠকের পরও যে-সব ভাগ-বাঁটোয়ারা আফ্রিকায় হয়েছে তার মোটামুটি একটা হিসাব খুঁজতে গিয়ে আমরা পাই এই বিলি-ব্যবস্থাগুলো—

(১) ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাইয়ের যুক্ত-সম্মতিক্রমে ব্রিটেন ও জার্ম্মানীর মধ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার প্রভাব-ক্লিষ্ট ও শাসিত এলাকার ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়। জাঞ্জিবারের ওপর ব্রিটিশের অভিভাবক-প্রভুত্ব মেনে নেওয়া হয়। ফলে জার্ম্মানী পায় হেলিগোল্যাণ্ড।

(২) ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্টের এ্যাংলো-ফ্রেঞ্চ ঘোষণায় ফরাসীর মাদাগাস্কারের উপর রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব মেনে নেওয়া হয়। সাহারায় ফরাসী প্রভাবের পত্তনকেও স্বীকার করা হয়। অন্য দিকে ফরাসী স্বীকার করে যে ব্রিটিশের নাইজার ও চাদ হ্রদের মধ্যবর্ত্তী এলাকা ষোল আনা ব্রিটিশ প্রভাব-পুষ্ট।

(৩) ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুনের চুক্তিতে এ্যাংলো-পর্ত্তুগীজ বিলি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়। আফ্রিকার পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী যে স্থান পর্ত্তুগীজ দখলে ছিল তাকে ব্রিটিশের ট্যাঙ্গানিকা এলাকা দ্বারা একেবারে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলা হয়। তার মানে পর্ত্তুগীজ দখলে পূর্ব্ব-উপকূলে রইল মোজামবিক, মাঝে ট্যাঙ্গানিকা এলাকা, পশ্চিম-উপকূলে এ্যাঙ্গোলা। ব্রিটিশের এই মধ্যবর্ত্তী এলাকা হাতে থাকার উদ্দেশ্য হ'ল পর্ত্তুগীজদের ভবিষ্যৎ রাজ্য বিস্তারের পথ বন্ধ করা। কেননা এ্যাঙ্গোলা থেকে মোজামবিক পর্য্যন্ত সরাসরি যদি পর্ত্তুগীজদের রাজ্য থাকত, তা হলে ব্রিটিশের দক্ষিণ-আফ্রিকার সাম্রাজ্যের বিপদের সম্ভাবনা ছিল, এবং ফরাসী সাম্রাজ্যের মত পর্ত্তুগীজও একটা সাম্রাজ্য হিসাবে ব্রিটিশের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠত। উত্তর-রোডেসিয়া ও ট্যাঙ্গানিকা এলাকা ব্রিটিশকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে রক্ষা করেছে।

(৪) ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ যে ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান বৈঠক হয় তাতে মধ্য-সুডান ফ্রান্সকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই এলাকা কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ এক বছর পূর্ব্বে এ্যাংলো-জার্ম্মান চুক্তি অনুসারে জার্ম্মানীর প্রভাব-পুষ্ট এলাকা বলে মেনে নেওয়া হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর ব্রিটেন ও জার্ম্মানীর মধ্যে এই চুক্তি সংঘটিত হয়। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান যৌথ সম্মতির বলে আফ্রিকার যে অংশ ফ্রান্সকে ছেড়ে দেওয়া হয় তা ভাবী ফরাসী-আফ্রিকার সাম্রাজ্যের পত্তন করে, কেননা নাইজিরিয়া, গোল্ড কোষ্ট, লাইবিরিয়া ইত্যাদি ছোট-খাট কয়েকটি দেশ বাদে প্রায় সবটাই ফরাসীর অধিকারে আসে, এবং সাম্রাজ্যের সীমান্ত বেলজিয়ম কঙ্গোর সীমান্তের সঙ্গে মিলিত হয়। ভৌগোলিক সংস্থানের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে এই চুক্তির বলে ফরাসী উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকার প্রায় সবটাই গ্রাস করলে।

(৫) ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চ ও ১৫ই এপ্রিল তারিখের এক চুক্তিতে ইতালী ও ব্রিটেনের মধ্যে পূর্ব্ব-আফ্রিকার সীমানা ধার্য্য হয় ও উভয়ের এলাকা নির্দ্দিষ্ট হয়।

(৬) ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুনের এ্যাংলো-ফ্রেন্স চুক্তিতে ফরাসী ও ব্রিটেনের মধ্যে যে বিলি-ব্যবস্থা হয় তাতে চাদ হ্রদের পশ্চিম তীরস্থ দেশগুলির সীমানা বিলোপ করা হয়। এই সীমানা-বিলোপের ফল ব্রিটেনের পক্ষে শুভ হয়েছিল, তার প্রমাণ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চের শেষোক্ত ঘোষণা। এই ঘোষণা-বলে ফ্রান্স ব্রিটেনের উচ্চ নাইল নদ এলাকার রাজনৈতিক বিশিষ্টতা মেনে নেয়। মনে হয় ফ্রান্স কোন বিশেষ চাপে পড়েই এই স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয়েছে। কেননা এই উচ্চ নাইল নদ এলাকা আফ্রিকা দেশের সব চেয়ে উর্ব্বর ভূমিখণ্ড। এর থেকে বহু কাঁচা মাল নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিল্পপতিরা ধনে ও ক্ষমতায় পরিপুষ্ট হয়েছে।

এক কথায় বলা যেতে পারে যে গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরেই পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকায় রাজ্যবিস্তার করেছে। গত মহাযুদ্ধের সময়ও আফ্রিকার বুকের ওপর দিয়ে ঝড়-ঝাপটা গেছে। সেবারেও আফ্রিকার অধিবাসীরা একটা জাতি হিসাবে পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ঠাঁই পায় নি। এবারেও কি তাই ঘটবে?

* The Encyclopædia Britannica, 14th Ed.

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা হইতে দশ মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত পানিহাটী গ্রামে ইংরেজী ১৮৪৯, ১৯শে জুন পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ণচন্দ্রের পিতা ৺কালিদাস মুখোপাধ্যায় ১৮৪০ সালে বালির ভট্টাচার্য্য বংশের প্রসন্নময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। শৈশব হইতেই কালিদাস নিরহঙ্কার, সদালাপী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি কলিকাতার টাকশালে কর্ম্ম করিতেন এবং একজন বিশিষ্ট হিসাবী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল। কন্যা এবং প্রথম পুত্র শৈশবেই মারা যান। দ্বিতীয় পুত্রের নাম পূর্ণচন্দ্র।

শৈশব হইতেই পূর্ণচন্দ্র তীক্ষ্ণ মেধাবী ও সাহসী ছিলেন। তিনি অতিশয় দুরন্ত ছিলেন। সর্ব্বদাই খেলা-ধুলায় মত্ত থাকিতেন। লেখাপড়ার দিকে তাঁহার মন যাইত না, কিন্তু যখন যেদিকে তাঁহার ঝোঁক পড়িত সে কাজ তিনি শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না। পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে ইতিহাস, ভূগোল ও মানচিত্রে তাঁহাকে কোন ছাত্রই পরাস্ত করিয়া উঠিতে পারিত না। পূর্ণচন্দ্র প্রথম পাঠ আরম্ভ করেন আগড়পাড়ার বিবির (খ্রীষ্টীয়) বিদ্যালয়ে। পিতার তত্ত্বাবধানে বালক পূর্ণচন্দ্র প্রতি বৎসরই ক্লাসের পর ক্লাসে উঠিতে লাগিলেন এবং আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সোদপুর ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পর বৎসরের শেষভাগে ছোট জাগুলিয়া-নিবাসী ৺হরমোহন চক্রবর্ত্তী কাঞ্জিলালের কন্যা শ্রীমতী রক্ষাকালী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর যে সময় তিনি বসিয়া ছিলেন সেই সময় নিজের চেষ্টায় তিনি বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেন এবং পদ্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে গদ্য-পদ্যে নাটকাদিও লিখিতে থাকেন। অতঃপর তিনি লক্ষ্ণৌয়ে যান এবং ক্যানিং কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মন মহাকাব্যে অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছিল; এবং ভারতবর্ষের তৎকালীন দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি ওজস্বী বীরকাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম সর্গ ছাপানও হইয়াছিল, এবং দ্বিতীয় সর্গ কতকটা লেখা হইবার পর সম্পাদক মহাশয়েরা তাঁহার এই নূতন সৃষ্টি দেখিয়া এরূপ কঠিন সমালোচনা করেন যে তাহাতে তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হয় (প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ বাবুকে লিখিত এক পত্রে তিনি এ কথাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে তিনি ভয় পাইয়া এ কাজ করেন নাই)। ইহার পর ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি-এ পরীক্ষা দিয়া সফলকাম হইতে পারেন নাই। পিতার অবস্থা অনুকূল ছিল না বলিয়া তিনি আর কলেজে পড়িলেন না। তাঁহার জীবনের স্রোত অন্য দিকে ফিরিল।

এইবারে তাঁহার দৃষ্টি লক্ষ্ণৌয়ের নবাবী বা বাদশাহী তক্তে আকৃষ্ট হইল। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে আমাদের দেশের শিল্পকার্য্য একেবারে লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। লক্ষ্ণৌয়ের পুরাতন অট্টালিকার অধিকাংশ ধ্বংস পাইতেছিল। এই সময় তিনি *Pictorial Lucknow: History, People and Architecture* লেখেন, এই জন্য তাঁহাকে চিত্র আঁকিতে শিখিতে হইয়াছিল। এই সময় এক সাহেব তাঁহাকে আউধ-রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে একটি চাকরি যোগাড় করিয়া দেন। তিনি মাত্র ছয় মাস (১৮৭৪) এই চাকরি করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে তাঁহার চাকরি হয়। উক্ত স্থানে কার্য্যকালে গবর্ণমেণ্ট খরচ দিয়া তাঁহাকে বম্বে স্কুল অফ্ আর্টে পাঠাইয়া দেন। দুই বৎসর শিক্ষালাভ করিবার পর পুনরায় তিনি লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মের কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

১৮৮২ বা ৮৩ সালে তখনকার ছোটলাট সর্ আলফ্রেড লায়াল তাঁহাকে সরকারী পুরাতত্ত্ববিৎ করেন। সেই সময় হইতে তিনি ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্বে আকৃষ্ট হন। পূর্ণচন্দ্রের কার্য্য দেখিয়া ছোটলাট বাহাদুর বিশেষ খুশী হইয়াছিলেন।

এদিকে কানিংহাম সাহেব রাজকার্য্য হইতে অবসর লওয়াতে ১৮৮৫ সালে পুরাতত্ত্ব-বিভাগের পুনর্গঠন হয়। তখন ছোটলাট সাহেব পূর্ণচন্দ্রের একটি বড় চাকরির জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু যে সাহেব (ডাক্তার ফুহ্‌রার) তাঁহার প্রাপ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এবং যাঁহার সহকারী হইলেন পূর্ণচন্দ্র সেই সাহেবই তাঁহাকে চাকরিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিলেন, সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে পূর্ত্ত-বিভাগে ফিরিয়া যাইতে হইল। সেই সময় তিনি ঝান্সিতে যান এবং ললিতপুর, মোরাদাবাদ, আগ্রা, মথুরা, এলাহা-

বাদ, কালপি, সম্ভল প্রভৃতি স্থানে অনুসন্ধান ও খননকার্য্য দ্বারা পুরাতত্ত্বের নিদর্শন আবিষ্কার করেন।

১৮৮৬ সালে পূর্ত্তবিভাগে পুনরায় চাকরি পাইলে তিনি বুন্দেলখণ্ডে অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত হন। তখন ঝান্সিতে ওয়ার্ড সাহেব কমিশনর ছিলেন। তিনি এদেশীয়দিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি বুন্দেলখণ্ডীয় রাজাদের অট্টালিকার গঠন দেখিয়া তদনুকরণে স্থানীয় বিদ্যালয়-গৃহের নক্সা আঁকিতে বলেন এবং তাঁহার নক্সা দেখিয়া খুব খুশী হইয়াছিলেন। তথাকার কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট হার্ডি সাহেব তাঁহাকে দিয়া ঝান্সী হাঁসপাতালের নক্সা করাইয়া লন।



ললিতপুরের প্রত্নসম্পদ আবিষ্কারের পর পূর্ণচন্দ্র রিপোর্ট লিখিতেছেন

১৮৮৭-৮৮ সালে তিনি বুন্দেলখণ্ডে চান্দেলীয় পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া সচিত্র দুইটি কার্য্যবিবরণ লেখেন। তাহা ১৮৯৯ সালে সরকারী ব্যয়ে মুদ্রিত হয়। ইহার পর এখানকার চাকরি যায় এবং তিনি আগ্রায় চলিয়া যান।

তখন সর্ চার্লস এলিয়ট বাংলার ছোটলাট। তিনি পূর্ণচন্দ্রকে কলিকাতায় আনাইয়া স্থানীয় যাদুঘরে পুরাতত্ত্বাধ্যক্ষ করেন। এই সময় ১৮৯০ সালে তাঁহার পত্নী রক্ষাকালী দেবী ঝান্সীতে দেহরক্ষা করেন। ১৮৯১ সালে তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন টিটাগড় তালপুকুর নিবাসী ৺কীর্ত্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী নলিনী দেবীকে।

১৮৯১-৯৪ পর্য্যন্ত বিহার ও উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানে নিয়োজিত ছিলেন। পরে ১৮৯৭-৯৮ সালে তিনি পাটনায় গিয়া প্রাচীন পাটলিপুত্র অনুসন্ধানকালে বহু স্থান খনন করিয়া অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন। পাটলিপুত্র সম্বন্ধে কার্য্যবিবরণও সরকারী ব্যয়ে মুদ্রিত হয়। ১৮৯৬ হইতে ১৮৯৮ অবধি পাটলিপুত্রের খননকার্য্যে যে সকল বহুপুরাতন দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছিল তাহার উপর ভিত্তি করিয়া পরে পাটনা মিউজিয়ম স্থাপিত হয়।

পরে ডাক্তার ফুহ্‌রার কর্ম্মচ্যুত হইলে ১৮৯৯ সালে তাঁহার স্থলে পূর্ণচন্দ্র নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে তাঁহাকে কপিলাবস্তু ও লুম্বিনী নগরী আবিষ্কারের জন্য নেপাল তরাইয়ে পাঠান হয়। গোরক্ষপুরের উত্তরে তালিবার উত্তরে তিলরাকোটে তিনি কপিলাবস্তুর স্থান নির্ণয় করেন। পরে লুম্বিনী (আধুনিক নাম রুমেনদেই) নামক স্থানে বুদ্ধদেবের জন্মস্থানের অনুসন্ধান পান। পর বৎসর তাঁহার নেপাল রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে মুদ্রিত হয়। ইহাতে জগতের সর্ব্বত্র তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়ে।

১৮৯৯ সালের শেষভাগ হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত তিনি মথুরা নগরের নিকট কঙ্কালী টিলার অনুসন্ধান ও খননকার্য্য শেষ করেন। এই স্থানে জৈনদের একটি বড় তীর্থস্থান ছিল। কপিলাবস্তু ও পাটলিপুত্র নগরী আবিষ্কার করিতে তাঁহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি নিজ অনুসন্ধান দ্বারা এই দুই বিখ্যাত নগরীর অবস্থিতি নির্ণয় করিয়াছিলেন। কতক হিউয়ানসান্ ও কতক ফাহিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে অনুমান করিয়া, কতক নিজ অনুমান দ্বারা তিনি এই দুঃসাধ্য কার্য্য সমাধা করেন। ১৯০১ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত স্যর্ জন্ মার্শালের সহিত তক্ষশীলা ও পঞ্জাবের অন্যান্য স্থান অনুসন্ধান ও সার্ভে করেন।

১৯০৩ সালে তিনি কলিকাতা মিউজিয়মে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণা করিতে থাকেন এবং উক্ত কার্য্য করিতে করিতে আমাশয়ে আক্রান্ত হইয়া ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট রাত্রি তিন ঘটিকার সময় মাত্র তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে কর্ম্মবীর পূর্ণচন্দ্র শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রবাসী-সম্পাদককে লিখিত একখানি পত্রে পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন, "পাটলিপুত্র রিপোর্ট লিখিবার সময় সম্রাট্ অশোক সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। তদ্দ্বারা জানিলাম যে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্ত

করিয়াছেন, তাহা মহা ভুল। অশোকের সময় ২৭০ খৃষ্টাব্দ-পূর্ব্বে নহে—তাহা ৩২৫ বৎসর এবং মৌর্য্য-বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের Sandracottus নহে। অশোকই Sandracottus ছিলেন।" এ বিষয়ে তিনি লক্ষ্ণৌয়ে এক পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন। অধ্যাপক রীস্ ডেভিডস্ তাঁহার মৌলিক গবেষণার খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন।

পূর্ণচন্দ্রের প্রত্যেকটি রিপোর্ট মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে দেখা যায় যে পুরাতত্ত্বের যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য জিনিস জনসাধারণের ঘরে ছিল তাহা বিভিন্ন দেশ হইতে বহু পর্য্যটক ভারতবর্ষে আসিয়া সামান্য মুদ্রা দিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেন, তাহার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। ফলে তাঁহার মৃত্যুর পর-বৎসর অর্থাৎ ১৯০৪ সালে তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের এক বিশেষ আইন জারির ফলে উহা রহিত হইয়া যায়।

পূর্ণচন্দ্র ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে থাকিয়া ভারতের বহু অঞ্চলে অনুসন্ধান ও খনন-কার্য্য দ্বারা বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সমুদয় ধ্বংসাবশেষ ও লুপ্ত নগরী এবং তৎকালীন সভ্যতা আবিষ্কার করিয়া বর্ত্তমান জগতের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন তাহা জগতে অতুলনীয়।

"যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে"

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্ন হচ্ছে—মানুষের অন্তরগুহা থেকে উৎসারিত হচ্ছে কিসের জন্য কান্না। এর উত্তর রবীন্দ্রনাথ চতুরঙ্গে শচীশের মুখ দিয়ে দিয়েছেন। গভীর রাত্রে সত্যের পরিপূর্ণ উপলব্ধি এল শচীশের মনে আর সেই উপলব্ধিকে ভাষা দিতে গিয়ে দামিনী আর শ্রীবিলাসকে সে বলছে :

"তিনি রূপ ভালোবাসেন তাই কেবলি রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত তাই তাঁর লীলা বন্ধনে, আমরা বদ্ধ সেই জন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।"

আনন্দ থেকে এসেছে এই সৃষ্টি—আনন্দের দিকেই এই সৃষ্টির গতি। আমাদের আত্মায় যে কান্না—সেও এই আনন্দের জন্যই আর এই আনন্দ মুক্তিতে। রবীন্দ্রনাথের বাণীতে এই মুক্তির জয়ধ্বনি। মুক্তির বেদীমূলে নিবেদিত হয়েছে তাঁর সঙ্গীতের অর্ঘ্য। অনেক দিন আগে ১৯৩১সালের ১৩ই ডিসেম্বর শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ লেখককে একখানি পত্র লিখেছিলেন আর সেই পত্রে ছিল, "বন্ধন মোচনের দ্বারা আত্মপ্রকাশের এবং আত্মপ্রকাশের দ্বারা বন্ধন মোচনের চেষ্টাই স্বভাবত আমার জীবনের লক্ষ্য একথা সত্য।" ভারতবর্ষে উচ্চস্তরের যত ধর্ম্ম আছে তাদের সবগুলিই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে একই বাণী ঘোষণা ক'রে আসছে আর সেই বাণী মুক্তির জন্য সাধনা করবার বাণী। যে সত্য চতুরঙ্গে শচীশের কণ্ঠ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে সেই সত্যেরই জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ কবির 'হিবার্ট লেকচার'গুলির ছত্রে ছত্রে। সেখানে 'Spiritual Freedom' শীর্ষক রচনাটিতে রয়েছে :

"As in the world of art, so in the spiritual world, our soul waits for its freedom from the ego to reach that disinterested joy which is the source and goal of creation. It cries for its Mukti, its freedom in the unity of truth."

"যেমন আর্টের জগতে, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতে আমাদের আত্মা প্রশান্ত আনন্দের অধিকারী হবার জন্য অহং থেকে মুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে। সৃষ্টির উৎপত্তি যে আনন্দ থেকে এবং আনন্দেই যে তার পরিসমাপ্তি! অখণ্ড সত্যের মধ্যে মুক্তির জন্য আমাদের আত্মা কাঁদছে।"

এই যে সত্যের মধ্যে মুক্তি—এই মুক্তির মধ্যেই আমাদের জীবনের পরিপূর্ণতা। যতক্ষণ জীবন অপূর্ণ রয়েছে ততক্ষণ আনন্দ নেই। ততক্ষণ ছায়া থেকে ছায়ার পিছনে কেবলই ছুটাছুটি, দুঃখ-সুখের ফেনায়িত তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় ইতস্ততঃ কেবলই ভেসে বেড়ানো, নিজের সঙ্গে নিজের অনবরত দ্বন্দ্ব। আমাদের দুঃখের মূলে তো আমাদের জীবনের উপকরণের অভাব নয়; কিসে আমাদের জীবনের যথার্থ আনন্দ—কোথায় আমাদের জীবনের পরিপূর্ণতা—সে কথাটা বুঝি না ব'লেই আমাদের যত দুঃখ, যত নৈরাশ্য। জীবনের এই পরিপূর্ণতা বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

It is our freedom in truth, which has for its prayer : Lead us from the unreal to reality.

সত্য তা হ'লে কি? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সত্য হচ্ছে সবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় আর যেখানে প্রেমে আমরা সকলের

সঙ্গে যুক্ত হ'তে পেরেছি সেখানেই আমাদের যথার্থ মুক্তি। 'যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে, মুক্ত কর হে বন্ধ'—আমাদের দেশে এই হ'ল প্রতি দিবসের ধ্যানের মন্ত্র। বিশ্ব এবং আমার মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে সেই ব্যবধানকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে সকলের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার সাধনাই আমাদের দেশের চিরকালের সাধনা। বিশ্বের সঙ্গে বন্ধনকে অস্বীকার ক'রে বৈরাগ্য সাধনার নিঃসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে যে মুক্তি—সে মুক্তিকে রবীন্দ্রনাথ কখনো মুক্তি ব'লে স্বীকার করেন নি।

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়॥
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

সকলের সঙ্গে প্রেমে বিজড়িত হয়ে যে আনন্দময় মুক্তি—কবি সেই মুক্তির অমৃতকেই আস্বাদন করতে চেয়েছেন।

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই.
এই সূর্য্য-করে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।

মানুষকে বাদ দিয়ে যে অন্তর্ব্বের মুক্তি—সে মুক্তি কোন দিনই কবিকে প্রলুব্ধ করতে পারে নি।

তা হ'লে আমরা দেখতে পাচ্ছি—সত্যের মধ্যে যে মুক্তি—সেই মুক্তিতেই আমাদের জীবন সফল হয়। জীবনকে মুক্তির মধ্যে সফল করাতেই আমাদের আনন্দ। আর জীবনের পরম সত্য হ'ল কি? Unity—প্রেমে সকলের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সাধনা ছিল যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে তাদের হাতের সঙ্গে হাতকে এবং প্রাণের সঙ্গে প্রাণকে মিলিয়ে দেওয়া। সমস্ত লোকোত্তর পুরুষদেরই সাধনার একটা প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মিলনের সেতু নির্ম্মাণ করা। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি হচ্ছে :

For myself, I feel proud whenever I find that the best in the world have their fundamental agreement. It is their function to unite and to dissuade the small from bristling-up, like prickly shrubs, in the pride of the minute points of their differences, only to hurt one another.

আমার নিজের কথা হচ্ছে, পৃথিবীতে যাঁরা মহৎ তাঁদের মধ্যে মূলগত ঐক্য যখনই দেখি তখনই আমি গর্ব্ব অনুভব করি। তাঁদের ব্রত হচ্ছে মিলিয়ে দেওয়া আর ক্ষুদ্রচেতা যারা পরস্পরকে শুধু আঘাত দেবার জন্য উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যগর্ব্বে ছোট ছোট পার্থক্যগুলিকে অত্যন্ত উগ্র ক'রে দেখে তাদের রেষারেষি থেকে নিবৃত্ত করা।

দৃষ্টির মধ্যে যাঁদের কোন আবিলতা নেই, যাঁরা কোন কিছুকে উপর থেকে ভাসা ভাসা ভাবে দেখেন না—তাঁদের চোখে ভিতরের ঐক্যই বড় হ'য়ে দেখা দেয়। যারা ক্ষুদ্রচেতা, দৃষ্টি যাদের গভীরে গিয়ে পৌঁছায় না তারাই শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্যগুলিকে বড় ক'রে দেখে পরস্পরের গায়ে কর্দ্দম নিক্ষেপে ব্যস্ত থাকে। মানুষের মধ্যে যাঁরা অতিমানুষ তাঁরা আসেন মানুষের সঙ্গে মানুষকে আত্মীয়তার সূত্রে বেঁধে দিতে। যেখানে অন্যের কান শুনতে পায় কেবল বিরোধের কোলাহল সেখানে তাঁদের কান শোনে মিলনের গভীর বাণী। সাগরের ওপারে বসে রোমাঁ রলাঁ্যার কান শুনতে পেয়েছে ঐক্যের এই বাণী এবং সেই জন্যই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বাণীর সঙ্গে গান্ধীজীর ও রবীন্দ্রনাথের বাণীর যে ঐক্য রয়েছে সেটা ধরতে তাঁকে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় নি। রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ দুজনেই এসেছিলেন ঐক্যের মহামন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে। সাকার আর নিরাকারবাদ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব—সে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাল তাঁদের দৃষ্টির উদারতা। বেদ, বাইবেল আর কোরাণের মধ্যে যে গভীর ঐক্যের সুর রয়েছে সেই সুর ধরা দিল তাঁদের বাণীতে। জ্ঞান আর কর্ম্ম আর ভক্তির মধ্যে যে বিরোধ ছিল সেই বিরোধের মধ্যে তাঁরা আনলেন সমন্বয়। প্রাচ্যকে তাঁরা স্বীকার করতে গিয়ে পাশ্চাত্যকে তাঁরা অস্বীকার করলেন না—পাশ্চাত্যের অনুকরণ করতে গিয়ে প্রাচ্যের সংস্কৃতিকেও আঘাত দিলেন না। প্রত্যেক ধর্ম্মবিশ্বাসেরই বেঁচে থাকবার অধিকার আছে এবং আমার প্রতিবেশী যাকে শ্রদ্ধা করে তাকে আমারও শ্রদ্ধা করা উচিত—এই উদার বাণী তাঁরা ঘোষণা করলেন দিকে দিকে। তাঁরা মিলনযজ্ঞে আহ্বান করলেন সবাইকে—কাউকে অস্বীকার করলেন না। রামকৃষ্ণের এবং বিবেকানন্দের এই উদার কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ গাইলেন,

এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য, হিন্দু-মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

বিবেকানন্দের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হ'ল,

আভিজাত্য গর্ব্বে গর্ব্বিত আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমাদের দেশের জনসাধারণকে দলিত করেছে। অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জ্জরিত জনসাধারণ একদিন ভুলে গেল তারাও মানুষ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা কেবল গোলামী করে এসেছে—বাধ্য হয়ে গোলামী করে এসেছে। তাদের এই বিশ্বাস করতে শেখানো হয়েছে যে গোলামী করতেই তাদের জন্ম, জন্ম থেকেই তারা ক্রীতদাস।

আগামী পঞ্চাশ বৎসর ধরে আমরা যেন আর আর ভুয়ো দেবতাকে ভুলে যেতে পারি। এখন একটি মাত্র দেবতা জেগে আছেন—সে দেবতা আমাদের জাতি। সর্ব্বত্র তাঁর হাত, সর্ব্বত্র তাঁর পা, সর্ব্বত্র তাঁর কান। সব

কিছুকে ব্যাপ্ত করে আছেন তিনি। আর সব দেবতা ঘুমাচ্ছেন — আমাদের চারিদিকে বিরাট রূপে যে দেবতাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁর পূজা না ক'রে কোন ভুয়ো দেবতার পিছু পিছু আমরা ছুটে বেড়াবো? আমাদের চারিদিকে রয়েছে যারা সেই বিরাটের পূজাই সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য। মানুষ এবং জীবজন্তু—এরাই আমাদের দেবতা। আমাদের স্বদেশবাসিগণই হচ্ছে আমাদের মুখ্য দেবতা যার পূজায় আমরা ব্রতী হবো।

চারিদিকের কোটী কোটী জীবন্ত নর-কঙ্কালকে আমরা অবহেলায় দূরে রেখে দিয়েছিলাম। তারা ছিল আমাদের কাছে অস্পৃশ্য। এই কোটী কোটী মানুষের মধ্যে নেমে এসে তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করবার জন্য তরুণ ভারতবর্ষকে মেঘমন্দ্র স্বরে আহ্বান করলেন স্বামীজী। চণ্ডাল ভারতবাসী, অজ্ঞ ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসীকে ভাই বলে আলিঙ্গন করবার মন্ত্র দিলেন কানে।

Do you feel that millions and millions of the descendants of Gods and of sages have become next-door neighbours to brutes? Do you feel that millions are starving to-day, and millions have been starving for ages? Do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud? Does it make you restless? Does it make you sleepless?

ভেদের সমস্ত প্রাকারকে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে একটা অখণ্ড ভারতবর্ষকে প্রেমের ভিত্তিতে গড়ে তোলবার এই যে আহ্বান—এই আহ্বান রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও বারম্বার ধ্বনিত হয়ে উঠেছে: লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনাদরের ধূলায় ঠেলে ফেলে দিয়ে কল্যাণকে লাভ করবার আশা যে নিতান্তই দুরাশা—আমাদের নিজেদের স্বার্থ চারিদিকের মানুষগুলির স্বার্থের সঙ্গে যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে এবং একের মঙ্গলকে আঘাত ক'রে অন্যের মঙ্গল যে অসম্ভব—এই বাণীই রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে বহন ক'রে আনলেন।

তোমার আসন হ'তে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে,
সেথায় শক্তিরে তব নির্ব্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে ধূলায় সে যায় ব'য়ে
সেই নিম্নে নেমে এসো নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।
অপমানে হ'তে হবে আজি তোরে সবার সমান।

অথবা

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোনখানে যায় থামি',
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে।

এখানে ধনের অহঙ্কারকে, জাতির অহঙ্কারকে, পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে অস্পৃশ্য, সর্ব্বহারা জনসাধারণের কাছে হৃদয়ের প্রণাম নিবেদন করবার কামনাই কবির কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছে।

বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন—সেবিছে ঈশ্বর।

বিবেকানন্দের এই বাণীই কবির গানে নূতন রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

কবির আবেদন কেবল ভারতবাসীদের পরস্পরের মধ্যে মিলনের জন্য নয়—ভারতবর্ষের বাহিরে যে বৃহত্তর জগত রয়েছে তার সঙ্গেও স্বদেশকে প্রেমের সূত্রে গেঁথে দেবার জন্য তাঁর কণ্ঠ থেকে আহ্বান-বাণী উৎসারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মধ্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটেছে। সেখানে কালিদাস আর সেক্সপীয়ার, ইবসেন্ আর বাল্মীকি, হুইট্‌ম্যান আর চণ্ডীদাস, উপনিষদকার আর ব্রাউনিং হাত ধরাধরি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। স্বদেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার আতিশয্যে ভারতবর্ষের ও জগতের মাঝখানে কোন চৈনিক প্রাচীর তিনি উত্তোলন করেন নি। পাশ্চাত্য সভ্যতার দীপ্তিতে মুগ্ধ হ'য়ে প্রাচ্যের সংস্কৃতির মহিমাকেও তিনি কখনও অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি। কর্ম্ম, ভক্তি এবং জ্ঞানের যে অপূর্ব্ব মিলন আমরা দেখলাম বিবেকানন্দের এবং রামকৃষ্ণের মধ্যে—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় সেই ঐক্যেরই নূতন অভিব্যক্তি জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে দেখা দিল।

আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরব দান,
নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

এখানে ভক্ত-হৃদয়ের গভীরতা থেকে প্রিয়তমের চরণ-কমলে আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতারই অভিব্যক্তি।

আবার—

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন প'রে
বাঁধা সবার কাছে।
রাখোরে ধ্যান থাকরে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি,
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হ'য়ে
ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে।

এখানে ভক্তিযোগের চেয়ে কর্ম্মযোগই প্রাধান্য লাভ

করেছে। আর জ্ঞানকে, বুদ্ধিকে তো অজস্র শ্রদ্ধা তিনি নিবেদন করেছেন। শিলাইদহে স্বপ্নের আকাশে ডানা দুটি মেলে দিয়ে যে আনন্দে সঙ্গীতের ইন্দ্রধনু তৈরী করেছেন সেই আনন্দেই বোলপুরের অবারিত প্রান্তরে কর্ম্মের কঠিন সাধনায় ব্রতী থেকেছেন। শেলীর skylark-এর মতো একমাত্র আকাশকেই স্বীকার করেন নি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের skylark-এর মত আকাশ এবং মৃত্তিকা উভয়কেই স্বীকার করেছেন। সত্যের বিচিত্র দিককে স্বীকার ক'রে নেবার এই যে উদারতা—এই উদারতাই ত লোকোত্তর মহাপুরুষদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই যে ঐক্যের উদার আহ্বান—এ আহ্বান গান্ধীজীর কণ্ঠেও। তিনিও বলেন,

"স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হ'তে সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।
মহাবিশ্ব জীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।"

সত্য গান্ধীজীর জীবনের আকাশে ধ্রুবতারা আর বিশ্বের সঙ্গে প্রেমে যুক্ত হ'তে না পারলে সত্যকে পাওয়া সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন মুক্তিতেই আমাদের জীবনের যথার্থ আনন্দ। এই মুক্তি হ'চ্ছে চিত্তের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি। যেখানে আমরা একান্ত ভাবে নিজের ব্যক্তিগত বাসনাগুলি নিয়ে ব্যস্ত থাকি সেখানে আমাদের আত্মার তৃপ্তি নেই। বাসনার কারাগার থেকে আমাদের চিত্ত যেখানে চারিদিকের বৃহৎ জীবনের মধ্যে মুক্তি পায়—সেখানে আনন্দে আমাদের প্রাণ কানায় কানায় ভরে যায়। অতএব যা-কিছু বিশ্ব থেকে তোমাকে তফাতে রেখে দিয়েছে—তার হাত থেকে মুক্ত হও।

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেথানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয় কো বনে, নয় বিজনে
নয় কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।

এখানে সকলের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবার যে স্বার্থপরতা—তার থেকে মুক্ত হবার প্রার্থনাই কবির চিত্ত থেকে উৎসারিত হয়েছে। সকলের সঙ্গে যুক্ত হ'তে না পারলে যে আনন্দ নেই। বিশ্বের প্রবহমান জীবন-ধারার সঙ্গে নিজের জীবন-ধারাকে মিলিত ক'রে দেবার এই যে বাণী—এ বাণী গান্ধীজীরও। তিনিও বলেন সকলের সঙ্গে এই এক হ'য়ে যাওয়ার মধ্যেই আনন্দ—য কারা-প্রাচীর আমাকে সকলের কাছ থেকে আড়ালে রেখে দিয়েছে, তার বন্ধন থেকে মুক্তিতেই আমাদের যথার্থ সুখ।

Realisation of Truth is impossible without a complete merging of oneself in, and identification with, this limitless ocean of life. Hence, for me, there is no escape from social service, there is no happiness on earth beyond or apart from it.*

"এই অন্তহীন জীবনসিন্ধুর মধ্যে একেবারে ডুবে এক হয়ে যেতে না পারলে সত্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। অতএব আমার পক্ষে সমাজ-সেবা না করে গত্যন্তর নেই—সমাজসেবার বাহিরে এই পৃথিবীতে আমার আনন্দও নেই।"

যে ঐক্যের বাণী উৎসারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কণ্ঠ থেকে—গান্ধীজীর কণ্ঠেও সেই বাণী। নিজের বিশ্বাসকে তিনি যেমন শ্রদ্ধা করেন প্রতিবেশীর বিশ্বাসকেও তিনি তেমনি মর্য্যাদা দিয়ে থাকেন। এই জন্যই শুদ্ধি আন্দোলনকে কখনো তিনি সহানুভূতির চোখে দেখতে পারেন নি। অন্যের ধর্ম্মমতকে যে অশ্রদ্ধা করে, সত্য আমার সম্প্রদায়েরই একচেটিয়া, এই যার মনোভাব সেই মানুষই অন্যকে নিজের ধর্ম্মমতে টেনে আনবার জন্য সচেষ্ট হয়। গান্ধীজী বলেন,

The most ignorant among mankind have some truth in them. We are all sparks of truth. The sum total of these sparks is undescribable, as-yet-unknown Truth, which is God.

মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে অজ্ঞ যারা—তাদের মধ্যেও কিছু-না-কিছু সত্য রয়েছে। আমরা সবাই সত্যের স্ফুলিঙ্গ। এই সমস্ত স্ফুলিঙ্গের সমষ্টি যে কি তাকে ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। তা হচ্ছে এখনো পর্য্যন্ত অজ্ঞাত-সত্য অর্থাৎ ভগবান।

এই মনোভাব নিয়ে অন্যকে কখনো অমর্য্যাদা করা চলে না। এই জন্য গান্ধীজী কখনো তাঁর বিরুদ্ধবাদীকে লক্ষ্য করে নিন্দা-শর বর্ষণ করেন না। রামকৃষ্ণের মধ্যে দৃষ্টির যে উদারতা—গান্ধীজীর মধ্যেও তাই। দূরে তাঁরা ঘৃণাভরে কাউকে সরিয়ে দেন নি, প্রেমে সবাইকে তাঁরা কাছে টেনেছেন, সকল সম্প্রদায়ের মানুষগুলিকে পরম সহিষ্ণু হয়ে পরস্পরের ধর্ম্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করবার প্রেরণা দিয়েছেন। রোমা রলাঁ গান্ধীজীকে রামকৃষ্ণের উত্তর সাধক বলেছেন।

At this stage of human evolution, wherein both blind and conscious forces are driving all natures to draw together for "Co-operation or death," it is absolutely essential that human consciousness should be impregnated with it, until this indispensable principle becomes an axiom: that every faith has an equal right to live and that there is an equal duty incumbent upon every man to respect that which his neighbour respects. In my opinion Gandhi, when he stated it so frankly showed himself to be the heir of Ramkrishna, (*Life of Vivekananda*, p. 359).

এই মন্তব্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে রলাঁর দৃষ্টির স্বচ্ছলতা।

---

* M. K. Gandhi: *Contemporary Indian Philosophy*. Edited by S. Radhakrishnan and J. H. Muirhead, p. 20.

রবীন্দ্রনাথের কথা—গুণস্মৃতি

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত অগ্রহায়ণে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথের কথা—আমার পরিচয়' প্রবন্ধে কিরূপ ঘটনাচক্রে কবির আহ্বানে শান্তিনিকেতনের আশ্রমে আসিয়া অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা বলিয়াছি। সেই সময়ে আশ্রমের বিদ্যালয়—ব্রহ্মবিদ্যালয় বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠার দিবস। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সিন্ধুদেশবাসী রেবাচাঁদ, শিবধন বিদ্যার্ণব, জগদানন্দ রায় এই চারি জন তখন আশ্রমের—অধ্যাপকমণ্ডলী। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত, প্রেমকুমার গুপ্ত, অশোককুমার গুপ্ত, সুধীরচন্দ্র নান—এই পাঁচ জন তখন আশ্রমের ছাত্র। পর বৎসর আশ্রমে আসিয়া জগদানন্দ রায়কে দেখিয়াছি, পণ্ডিত শিবধনকে তখন অধ্যাপনা করিতে দেখি নাই, আমার আসার পূর্ব্বেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। ছাত্রগণের মধ্যে রথীন্দ্রনাথ, প্রেমকুমার, অশোককুমারকে দেখিয়াছি, অন্য ছাত্রগণের কথা মনে হয় না। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, ইঁহারা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যাপকমণ্ডলী। তখন আশ্রমের ছাত্রসংখ্যা চৌদ্দ-পনরটি, মনে হয়। রথীন্দ্রনাথ, প্রেমকুমার, অশোককুমার তাহাদের অন্যতম। সন্তোষচন্দ্র মজুমদার আশ্রমের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী আশ্রমের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন।

এই সময় অধ্যাপকগণের ও ছাত্রবর্গের বাসার্থ আশ্রমে একটিমাত্র কুটীর ছিল। ইহাই প্রথম কুটীর—'প্রাক্-কুটীর'। পূর্ব্ব-পশ্চিমে আয়ত এই কুটীর তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ছিল—পূর্ব্ব ও মধ্য প্রকোষ্ঠ এখনও পূর্ব্ববৎ আছে। পশ্চিমের প্রকোষ্ঠ অতি দীর্ঘ ছিল; ইহা ছাত্রাবাস। ইহার পূর্ব্ব ভাগে আড়-দেওয়ালের পাশেই আমার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রাক্-কুটীরের পশ্চিমে গ্রন্থাগার ইহাও তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ইষ্টকালয়। কবি তখন শান্তিনিকেতনের অতিথিশালার দ্বিতলে বাস করিতেন। গ্রন্থাগারের পূর্ব্ব প্রকোষ্ঠে তাঁহার লেখাপড়ার সাজ-সরঞ্জাম সমস্তই থাকিত, এইখানেই লেখাপড়ার কাজ চলিত। পরবর্ত্তী প্রকোষ্ঠদ্বয় গ্রন্থাগার। মধ্যের কুটীরের চতুষ্পার্শ্বে দেওয়ালের নিকট বইয়ের র‍্যাক্, মধ্যে সতরঞ্চিপাতা বসিবার স্থান। পশ্চিমের কুটীর কেবল গ্রন্থাগার। তখন প্রবেশিকা-পরীক্ষা (Entrance Examination) ছিল। রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষচন্দ্র আশ্রমের প্রথম পরীক্ষার্থী ছাত্র। ইহাদের অধ্যাপনা এই স্থানেই করিতাম। অন্য ছাত্রগণের অধ্যাপনার স্থান গাছতলাই নির্দ্দিষ্ট ছিল।

প্রাক্-কুটীরে আমার যে স্থান ছিল, তাহারই নিকটে জানালার কাছে একটি ছোট টেবল-হারমোনিয়ম ছিল। কবি সন্ধ্যার সময় এই স্থানে আসিতেন, বালকেরাও তাঁহার সঙ্গে আসিত। বালকগণের প্রতি কবির পুত্রবৎ স্নেহ ছিল, বালকেরা তাহা বেশ বুঝিত এবং পিতার পার্শ্বে পুত্রগণের ন্যায় তাহারা কবির চতুষ্পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আনন্দে কবির গানে যোগ দিত। ইহার ফলে এক দিকে বালকদিগের যেমন সংগীত শিক্ষা হইত, পক্ষান্তরে কবির সাহচর্য্যে তাঁহার প্রতি তাহাদের সেইরূপ অনুরাগ ও আসক্তিরও বৃদ্ধি হইত। এই বিনোদনের সময় উপভোগ করার আনন্দ বালকগণের বিকশিত মুখচ্ছবিতে সুপ্রকট হইয়া উঠিত। কবির সম্মেলনে বালকদিগের এই আনন্দের ছবি এক অপূর্ব্ব চিত্রপট। এ চিত্র আমার পক্ষে অদৃষ্টপূর্ব্ব—আমার বড় ভাল লাগিত—আমি তন্ময় হইয়া দেখিতাম। এই বালক গায়ক-দলের এখন একটিমাত্র ছাত্রকে জানি—সে অশোককুমার, ডাকনাম—'কালী'। পরে এই পর্ব্ব 'বিনোদন-পর্ব্বে' পরিণত হয়—কবির নির্দ্দেশানুসারে নির্দ্দিষ্ট দিনে অধ্যাপকেরা পর্য্যায়ানুসারে কথাচ্ছলে হাস্য-কৌতুক-জনক হিতকর নানা গল্প বলিয়া ছাত্রগণের চিত্ত-বিনোদন করিতেন।

ছাত্রগণের স্বাস্থ্য ও শারীরিক-মানসিক উন্নতির বিষয়ে কবির বিশেষ দৃষ্টি ছিল; অধ্যাপকদিগেরও স্বাস্থ্য-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য ছিল না। তিনি জানিতেন, প্রভুর প্রতি কর্ম্মীর সানুরাগ-আসক্তি না থাকিলে, কোন কার্য্য সুশৃঙ্খল সহজসাধ্য হয় না—কর্ম্মীও কার্য্যসাধনে তাদৃশ প্রীতি প্রাপ্ত হন না। এই হেতু তিনি কখনও বিদ্যালয়ের অধ্যাপনার বিষয়ের নিয়মাবলীতে হস্তার্পণ

করিতেন না, অধ্যাপকেরাই সম্মিলিত হইয়া নিজ নিজ পাঠ্য বিষয়ের সময়ের তালিকা স্থির করিয়া লইতেন। ইহার ফলে অধ্যাপকেরা স্বেচ্ছায় আনন্দের সহিত প্রত্যহই ছয়-সাত ঘণ্টা পাঠনা করিতেন, কিছুমাত্রও ক্লান্তিবোধ করিতেন না। ইহা আমার নিজেরই অনুভূত বিষয়।

আশ্রম কবির গৃহস্থাশ্রমই ছিল; তাই গৃহীর ন্যায়ই সকলেরই স্বাস্থ্য-সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহার এই মনোগত শুভানুধ্যান যে প্রতিকূল ঘটনার আঘাতে আমার নিকটে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, এক্ষণে সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করিব।

আজকাল অধ্যাপকগণের ও ছাত্রবর্গের বনভোজন-(picnic) উৎসব প্রায়ই দেখা যায়। আশ্রমের প্রথমাংশে বনভোজনের এরূপ বাহুল্য না থাকিলেও, একেবারেই ইহার অসদ্ভাব ছিল না। আমার আশ্রমে যোগদানের কিছুকাল পরে এক দিন অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগকে লইয়া বনভোজন-উৎসব উপভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া কবির নিকটে প্রস্তাব করিলেন। তখন কার্ত্তিক মাস—কার্ত্তিকের হিম সকলেরই, বিশেষত বালকদিগের বিশেষ অপকারক। এই ভয়েই কবি প্রথমে এইরূপ প্রস্তাবে সম্মতি দেন নাই, কিন্তু একেবারেই এই উদ্যোগ রহিত করিয়া সকলকে ইহার আনন্দে বঞ্চিত করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না, এই হেতু বনভোজনে অনুমতি দিয়া বিশেষভাবে বলিলেন,—সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বালকগণকে লইয়া সকলকেই আশ্রমে উপস্থিত হইতে হইবে। সকলে তাহাই স্বীকার করিয়া বনভোজনে উদ্যোগী হইলাম। আশ্রমের পূর্ব্বদিকে রেল-রাস্তার অপর পার্শ্বে পারুলবন বনভোজনের স্থান নির্ণীত হইল। পাচক ও ভৃত্যেরা প্রয়োজনানুরূপ আহার-সামগ্রী প্রভৃতি লইয়া চলিয়া গেল। ছাত্রদিগকে লইয়া পরে আমরা পারুলবনে উপস্থিত হইলাম। কবির নির্দ্দেশানুসারে সন্ধ্যার পূর্ব্বে আশ্রমে উপস্থিতির একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও, কার্য্যত তাহা অসম্ভব হইয়া উঠিল—রাত্রি কিছু অধিকও হইয়া গেল। রথীন্দ্রনাথ সঙ্গে ছিল, তাহার অনুপস্থিতিতে কবি সকলেরই বিলম্ব বুঝিতে পারিলেন। কথানুসারে কার্য্য না হওয়ায়, আমরাও বিশেষ শঙ্কিত হইয়াছিলাম, বিশেষত বালকদিগের নিমিত্ত উদ্বেগের সীমা ছিল না। কবিও স্বাস্থ্য-ভঙ্গের আশঙ্কায় বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রাক্-কুটীরের নিকটে প্রতিক্ষণই উৎসুকভাবে আমাদের আসার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ভবিষ্যৎ অসুস্থতার আশঙ্কায় ভৃত্যকে চা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, আশ্রমে আসিলে সকলকেই চা ও কুইনিন খাওয়াইতে হইবে। আমরা অপরাধী, এই সময়ে আমরা নীরবে বালকদিগকে লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই ভৃত্যের নিকটে কবির আদেশ জানিতে পারিলাম। আমরা কোন উচ্চ-বাচ্য না করিয়া ভয়ে ভয়ে নিজ নিজ স্থানে নিঃশব্দে আসিয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম। চা-পায়ীদিগের তাদৃশ অনুকূল প্রতি-বিধানে বাঙ্নিষ্পত্তির কোন কারণ ছিল না, তাঁহারা আগ্রহপূর্ব্বক উষ্ণ চায়ের পেয়ালা পরম সুখে নিঃশেষ করিয়া কবির আদেশ আংশিক প্রতিপালন করিয়াছিলেন, কিন্তু কুইনিন সেবনের ব্যবস্থায় সেই অর্দ্ধাঙ্গ কবিবাক্য-পালন পূর্ণাঙ্গ হইয়াছিল কি না, জানি না।

কবি স্বভাবতই প্রিয়ংবদ ছিলেন। কোন অপ্রীতির কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি আত্মসংযম করিয়া অপরাধীকে স্নিগ্ধ বাক্যে এমন মিষ্ট ভর্ৎসনা করিতেন যে, অপরাধী বিরক্ত ত হইতেনই না, বরং স্বীয় দোষের জন্য লজ্জিতই হইতেন। এ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখকই ভুক্তভোগী। কবি প্রতি বুধবারে মন্দিরে সান্ধ্যোপাসনা করিতেন, অধ্যাপকগণ ছাত্রবর্গের সহিত মন্দিরে সমবেতভাবে উপাসনায় যোগ দিতেন। এক দিন, জানি না কি কারণে, কবি কিছু অশান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং মন্দিরে বক্তৃতার সময়ে অসংযত হইয়া সাধারণভাবে অধ্যাপকদিগের সম্বন্ধে দুই-চারিটি অপ্রিয় কথা বলিয়াছিলেন। উপাসনান্তে যখন তিনি অধ্যাপকদিগের সহিত প্রাক্-কুটীরে আসিতেছিলেন, তখনও তাঁহার মনঃক্ষোভ সম্পূর্ণ শান্ত হয় নাই। পথের পার্শ্বেই আমার বাসগৃহ ছিল, শাস্ত্রী মহাশয়ও (মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীও) আমার সহিত সেই ঘরে থাকিতেন। আমরা তখন সন্ধ্যাকৃত্য সমাপ্ত করিয়াছি। কবি আমার ঘর ছাড়িয়া দুএক পা অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আমার ঘরের নিকটে আসিয়া ডাকিলেন,—'হরিচরণ'! কবির সেই অতর্কিত আহ্বানে আমি 'আজ্ঞা' বলিয়া সসম্ভ্রমে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কবি বলিলেন,—'তোমরা কি কেবল লেখাপড়া করতে আর পড়াতে এখানে এসেছ? বুধবারে মন্দিরে আমরা সমবেত হই, এটা কি ভাল বোধ কর না?' কবির এইরূপ অসম্ভাবিত প্রশ্নে আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম, বলিলাম, 'ইহা আমার সন্ধ্যাকৃত্যের সময়, এই কারণে যাওয়া সম্ভব হয় নাই।' কবি আর কিছুই বলিলেন না, চলিয়া গেলেন, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। একজন অধ্যাপক বলিলেন, 'আজ কোন কারণে কবির চিত্তক্ষোভ হইয়াছে, মন্দিরেও সাধারণভাবে অধ্যাপকদিগের প্রতি তাঁহার এইরূপ ক্ষুব্ধভাব প্রকাশ পাইয়াছে।' শাস্ত্রী আপনার

ঘরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন, সকলে চলিয়া গেলে, আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, 'আমি কবির মন বেশ জানি; এই কারণে উনি বিশেষ অশান্তি ভোগ করিবেন, এবং আপনাদের মনঃক্ষোভ দূর করিতে না পারিলে, উনি শান্তি পাইবেন না।' আমি আর কিছুই বলিলাম না।

পরদিন বৈকালে কবি অতিথিশালার দক্ষিণের রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন, আমি পিছনে সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিলাম, আর কেহই ছিলেন না। এই সময়ে তিনি বলিলেন, 'হরিচরণ, কাল বৈকালে কোন কারণে মন অশান্ত ছিল, তাই সংযম রক্ষা কত্তে পারি নি, তোমাকে অপ্রিয় কথা বলেছি, তুমি মনে কিছু ক'রো না, ভাববে, এটা আমার চিত্তদৌর্ব্বল্য।' কবির এইরূপ সান্ত্বনার বাক্যে আমি প্রীত হইয়া বলিলাম, 'আপনার কথা স্বভাবতই মধুর, রাগ করিয়াও কিছু বলিলে তাহাতেও মাধুর্য্যের অভাব হয় না, এই জন্য আপনার রাগের কথায়ও আমার অপ্রীতির কারণ নাই, তবে অধ্যাপকেরা উপস্থিত ছিলেন, তাই কিছু লজ্জিত হইয়াছিলাম। আরও, আমরা প্রায় সর্ব্বদাই নানা কারণে আপনার বিরক্তিজনক হইয়া পড়ি, আপনি সংযত-ভাবে সমস্তই সহ্য করেন, আমরা যদি এতটুকু অপ্রিয় সহ্য করিতে না পারি, তাহা হইলে আপনার সাহচর্য্য পাইবার যোগ্যতা আমাদের নাই, ইহাই মনে করিব। আপনি সে কথা মনে করিয়া আর অশান্তি ভোগ করিবেন না, ইহা আমার বিনীত প্রার্থনা।' কবি আর কিছু বলিলেন না।

অনুজীবীর প্রতি অপ্রিয় আচরণে ব্যথিত হইয়া এরূপ স্পষ্টভাষায় নিজের ত্রুটিস্বীকার, আমি কোন প্রভুর মুখে শুনিয়াছি, ইহা আমার মনে হয় না। কবি-চরিত্রের এই মহত্ত্ব আমার জীবনের প্রথম ও চরম স্মরণীয় বিষয় হইয়া আমরণ থাকিবে।

"শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা"—নিগ্রহসমর্থেরই ক্ষমা ভূষণ। প্রভুকবি-চিত্তের অলঙ্কার এই ক্ষমা একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম—প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার চিত্ত-সংযমের গাম্ভীর্য্য অনুভব করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। প্রতিষ্ঠান-মাত্রেরই অভ্যুদয়ের পথে নানা বিঘ্ন-বিপদ্ থাকে; সেই বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয়। এই আশ্রমের পক্ষেও সেই নিয়মের ব্যভিচার হয় নাই; প্রতিকূল অবস্থা ঘটিয়াছে, কিন্তু কবির অসাধারণ ধৈর্য্যের নিকটে তাহা স্থিরপ্রতিবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে নাই।

এই বিষয়ে একটি প্রতিকূল ঘটনার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ইহা অনেক পূর্ব্বের কথা—তখনও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। আশ্রমের ছাত্রসংখ্যার সহিত অধ্যাপকের সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে। এই সময়ে কোন কারণে অধ্যাপকবিশেষের সহিত কোন কোন অধ্যাপকের অকৌশলের সৃষ্টি হয়, এবং অকৌশল ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিদ্বেষভাব ধারণ করে, সুতরাং আশ্রমের কার্য্যে কিছু বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা হইয়া উঠে। অল্পকালেই এই বিদ্বেষের কথা কবির কর্ণগোচর হইলে, ইহা আশ্রমের উন্নতির পথে প্রবল অন্তরায় জানিয়া কবি এক সভায় অধ্যাপকগণকে আহ্বান করেন। সকলে সমবেত হইলে, কবি অভিযোগ-কারীকে বিদ্বেষের কারণ নির্দ্দেশ করিতে আদেশ করেন। দুই জন অধ্যাপক ভিন্ন ভিন্ন কারণ অনেক দফায় সেই সভায় প্রকাশ করেন এবং সেই সকল কারণের কোনটির প্রতিকূলে কিছু বলিবার থাকিলে, তাহা প্রকাশ করিতে অভিযুক্তকে আহ্বানও করেন। অভিযুক্ত দুই-একটি কারণ মিথ্যা বলিয়া আপত্তি করিলেন, কিন্তু মিথ্যা কারণ সপ্রমাণ করিতে পারিলেন না। কবি উভয় পক্ষের বক্তব্য ধীরভাবে সবই শুনিলেন। উপস্থিত সকলে তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া রহিলেন। আমি মনে করিতেছিলাম, এই সকল কারণে কবি নিতান্ত অশান্ত হইয়া না জানি কি-প্রকার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিবেন। কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া চিত্ত সংযত করিয়া কবি শান্তভাবে স্বভাবমধুর মৃদু স্বরে বলিলেন, 'সবই শুনলাম, সবই বুঝলাম, কিন্তু আমার ইচ্ছা [illegible] বল—শান্ত হও। ক্ষমায় পরম সুখ—পরম শান্তি। এই আশ্রমেই আমি ক্ষমা ক'রে পরম শান্তি উপভোগ ক'রেছি। তাই বলি, তোমরা ক্ষমা কর—শান্তি পাবে।' কবির মুখে সেইরূপ অবস্থায় এইরূপ ক্ষমার কথা শুনিয়া তাঁহার ধৈর্য্যের গভীরতা অনুভব করিয়া বিস্মিত হইলাম। মনে হইল, এইরূপ অবস্থাবিশেষে শিক্ষার নিমিত্তই সংসারে মহতের সঙ্গতি নিতান্ত আবশ্যক। মহতের সাহচর্য্য মহত্ত্বের পথে চরিত্র উন্নীত করে। কবি গাইয়াছেন

"সবারে ক্ষমা করি থাক আনন্দে,
চির অমৃত নির্ঝরে শান্তিরস-পানে।"

যে-ঘটনাবলী এইরূপে আঘাত দিয়া কবিচরিত্রে প্রচ্ছন্ন গুণসমূহ প্রকাশ ও পরিস্ফুট করিয়াছে, তাহা আমার নিকটে কবির প্রত্যক্ষ জীবনচরিত। আমার সমসাময়িক অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ জীবিত থাকিতে পারেন, কিন্তু কবিগুণের পরিচায়ক ঘটনাগুলি তাঁহাদের মনে না থাকিতেও পারে, ইহা ভাবিয়াই তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া সহৃদয় পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

মতের মিল

শ্রীশচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

ঘনশ্যামবাবু বিষণ্ণ গম্ভীর বদনে তাঁহার ডিসপেন্‌সারী ঘরটিতে আসিয়া বসিলেন। রোগী অরোগী কাহারও সমাগম এখনও হয় নাই। ভৃত্য তামাক দিয়া গেল। তামাকের ধোঁয়ায় তাঁহার চিন্তাকুল বদন যেন আরও আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। বিশ-পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার মুখের এমন ভাব কেহ কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সদাহাস্যময় আনন্দমূর্ত্তি ; রাগ, বিরক্তি, গাম্ভীর্য্য যেন তাঁহার কাছেও ঘেঁষিতে পারে না।

চিন্তার কারণ গুরুতর, সন্দেহ নাই। প্রায় পঁচিশ বৎসরের উপর তিনি এখানে হোমিওপ্যাথি প্র্যাক্‌টিস করিয়া আসিতেছেন— ডাঃ ঘনশ্যাম ঘোষ, এম-ডি (এইচ), দশ-বিশ মাইল এলাকা জুড়িয়া সুবিখ্যাত। পশার, প্রতিপত্তি, প্রভাব, হাতযশ প্রভৃতি যে-সকল গুণ চিকিৎসকদের থাকা একান্ত প্রয়োজন, তাঁহার মধ্যে সেগুলির একত্র সমাবেশ এমন সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে আছে যে, শুধু চেহারা ও কথাবার্তাতেই রোগীর অর্দ্ধেক রোগ কমিয়া যায় ; তাঁহার উপর অগাধ বিশ্বাস আসিয়া পড়ে।

এত দীর্ঘ দিন ধরিয়া যেখানে তিনি প্রশংসার সহিত একাধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন, আজ সেখানে প্রচণ্ড ব্যাঘাত আসিয়া তাঁহার সিংহাসন টলাইয়া দিয়াছে। কম চিন্তার কথা নহে। রাজ্যনাশ আশঙ্কায় কোন্ রাজা না বিচলিত হইয়া পড়েন ?

তিনি যখন আসিয়া এখানে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন তখন চিকিৎসাশাস্ত্র দু-তিন যুগ পিছাইয়া ছিল। পল্লীগ্রাম, শহর ষোল মাইল দূরে, নিকটবর্ত্তী রেল-ষ্টেশন পাঁচ-ছয় মাইলের উপর। রোগে-ভোগে পড়িলে লোকে প্রথমে ঘরোয়া ঔষধ, টোটকা, পরে দেশী হাকিম, বৈদ্যের চিকিৎসা করাইত। পয়সা থাকিলেও তাহারা চিকিৎসা করাইতে জানিত না। এই সুবর্ণ সুযোগে ঘনশ্যামবাবু এখানে আসিয়া জুটিলেন। বাঙালী—লেখা-পড়া জানা পাস-করা হোমিওপ্যাথ, লোকে প্রথমটা একটু বিভ্রান্ত হইলেও, ক্রমেই তাঁহার কবলিত হইয়া পড়িল। ডাক্তার বাড়িলে রোগও বাড়ে ; চিকিৎসাবিজ্ঞানের নানা প্রকার উন্নতি ও আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ জটিল ও মারাত্মক ব্যাধিরও সৃষ্টি হইতেছে। যে-সব রোগ আগে শুধু ঘরোয়া ঔষধে সারিয়া যাইত, নেহাৎ বাঁকিয়া গেলে বড়জোর হাকিম বৈদ্য পর্য্যন্ত পৌঁছাইত, এখন ডাক্তার না হইলে সে-সব রোগ আর কিছুতেই সামলায় না।

এখানে সরকারের তরফ হইতে একটি দাতব্য-চিকিৎসালয় খুলিবার কথা বহু দিন হইতে হইয়া আসিতেছিল। মাস তিন-চার হইতে তাহার তোড়জোড়, ব্যবস্থা-আয়োজন সুরু হওয়ায় ঘনশ্যামবাবু মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। এবং যত দিন না তাহা চালু হইয়া পড়ে তত দিন পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে তাহার অসাফল্যই কামনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বাঘ সত্যই আসিয়া পড়িল।

এ মাসের পয়লা হইতে হাসপাতাল চালু হইল, এবং তাহার ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসর বেশ একজন প্রবীণ বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞ ডাক্তার আসিলেন। সরকার বাহাদুরের দেখিয়া শুনিয়া এই লোকটির উপর ভার দিবার উদ্দেশ্য বোধ করি ইহাই ছিল যে, আরম্ভ হইতেই সব কাজ বেশ সুশৃঙ্খলায় চলে, রোগীরা ভাল ব্যবহার পাইয়া আকৃষ্ট হয়, তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে এবং হাসপাতালটির সুনাম হয়।

ডাক্তার বনমালী দত্ত ঠিক উপযুক্ত লোক। প্রথম দিন হইতেই রোগীর বন্যা বহিল।

ঘনশ্যামবাবুর মাথায় বাজ পড়িল,—একেবারে এতটা তিনি আশা করিতে পারেন নাই।

রোগীর ভিড়ে তাঁহার ডিসপেন্‌সারীতে তিল ধারণের স্থান এবং তাদের সামলাইতে তাঁহার সারাদিন মরিবার ফুরসৎ থাকিত না। আজ কদিন হইতে ভিড় যেন মন্ত্রবলে উবিয়া গিয়াছে—সময় আর কাটিতে চায় না।

বিপদ একা আসে না। একে ত এই, ইহার উপর দিন-সাতেক হইতে স্ত্রী অসুখে পড়িয়াছেন। বাড়ীতে সাত বছরের মেয়ে টুনি ছাড়া দেখিবার শুনিবার আর কেহ নাই। বড় মেয়ে মলয়া কলিকাতায় পড়িতেছে—এবার আই-এ দিবে। আর সন্তানাদি নাই। মেয়েকে অত পড়াইবার ইচ্ছা বা সাধ্য তাঁহার মোটেই ছিল না ; কিন্তু ছেলে নাই বলিয়া স্ত্রীর এ সাধটুকুতে বাধা দিতে তিনি পারেন নাই।

টুনির সাহায্য লইয়া নিজেই কোন প্রকারে স্ত্রীর সেবা হইতে রান্নাবান্না করা এবং রোগী ঠ্যাঙ্গানো পর্য্যন্ত সবই করিতেছেন।

ইহার উপর আরো মুস্কিল হইয়াছে এই যে, টুনির মা কিছুতেই তাঁহার চিকিৎসা করাইবেন না ;—হোমিওপ্যাথিতে তাঁহার মোটেই আস্থা নাই, মুখ বাঁকাইয়া বলেন, "ওষুধ না ছাই—ওর চেয়ে শুধু জল খেলেই রোগ সেরে যাবে। আমরা আজীবন অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খেয়ে মানুষ, আমাদের ধাতে ও চন্দ্রবিন্দুর ফোঁটায় কিচ্ছু হবে না। অ্যালোপ্যাথির গুষ্ঠি আমরা, জান ত ?"

বস্তুত কথাটার মধ্যে অসত্য বিশেষ নাই। পিতামহ ডাক্তার

ছিলেন, পিতা এবং এক খুড়া ডাক্তার। মাতামহ বিলাত-ফেরত ডাক্তার ছিলেন। চার মামার মধ্যে একজন বিলাতেই ডাক্তারী করিতেছেন; একজন জার্মেনী হইতে পাস করিয়া আসিয়াছেন, একজন কোন ষ্টেটের চীফ মেডিকেল অফিসর। সুতরাং হোমিও-প্যাথি ইহাদের দুই কুলের ত্রিসীমানায় ঘেঁষিতে পারে না।

কিন্তু কি করিয়া যে এতবড় অ্যালোপ্যাথ-বংশের কন্যা বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকের হাতে গিয়া পড়িলেন, একান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার হইলেও, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ছাড়া আর কি হইতে পারে?

সকালে উঠিয়া স্ত্রী ও কন্যাকে সামান্য কিছু খাওয়াইয়া নিজে জলযোগাদি সারিয়া, ইক্‌মিক্‌ কুকারে নিজের ও টুনির জন্য ভাতে-ভাত চড়াইয়া, বাহিরে আসিয়া বসিয়াছেন। রাঁধুনী বামুনটিও ঠিক তাল বুঝিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

টুনি আসিয়া বলিল, "বাবা থার্মো টারটা দাও, মা চাইছে।"

"এই ত জ্বর দেখে এলুম," বিরক্ত হইয়া ঘনশ্যামবাবু বলিলেন, "এরি মধ্যে আবার দেখবার কি দরকার?"

টুনি চুপ করিয়া রহিল। "তুই যা, আমি যাচ্ছি একটু পরে" বলিয়া হিসাবের খাতায় মন দিলেন।

"মার খুব শীত করছে" কাঁদ-কাঁদ স্বরে টুনি বলিল।

"শীত করছে ত আমি কি করব?—ভাল ক'রে কম্বল চাপা দিগে যা" চাপা স্বরে ঘনশ্যামবাবু খিঁচাইয়া বলিলেন।

খিঁচুনি খাইয়া টুনি চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া একটু জোরে বলিলেন, "আমি এলুম ব'লে—তুই এগো—"

টুনি চলিয়া গেলে নিজের মনে বিড় বিড় করিতে লাগিলেন, ওষুধ খাবে না, শীত করছে! ঠিক সময়ে একটি ফোঁটা পড়লে শীতের বাবা পালাতে পথ পেত না। জল—হুঁঃ—মেয়েটার অত বড় ব্যামো সে-বার সারল কিসে শুনি? হোমিওপ্যাথিতে রোগ সারে না, সারে কেবল ওঁদের ঐ সব 'ভিবজিওর'-মিক্সচারে!—যেমন বর্ণ, তেমনি গন্ধ, স্বাদের কথা আর বলে কাজ নেই—হুঃ—"

মিনিট-দশেক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন দু-চারটি রোগী আসিয়া জুটিয়াছে।

রামচরণ বলিল, "মাইজী আজ কেমন আছেন ডাক্তারবাবু?"

অন্য দিকে চাহিয়া মুখে একটু হাসি আনিবার চেষ্টা করিয়া ঘনশ্যামবাবু বলিলেন, "এক রকম ভালই,—তোমার ছেলের খবর কি আজ?"

আনন্দমিশ্রিত কণ্ঠে রামচরণ বলিল, "বহুৎ ভালো,—কালকের দাওয়াইটা ঠিক লেগেছে। জ্বর নেই, খাসীও বহুৎ কম, রাতে বেশ ঘুমিয়েছিল। আপনার দাওয়াই ত নয় যেন মন্তর। মাইজীও বাবা বৈদ্যনাথজীর কৃপায় দু-দিনে চাঙ্গা হয়ে উঠবেন, আপনি ফিকির করবেন না বাবু।"

পান্নালাল হাঁস-ফাঁস করিতে করিতে আসিয়া একটা চেয়ারে ধপ্‌ করিয়া বসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "হুমুকো পেট্‌কা দরদ নেহি কমা হুজুর, রাতভর ছটফটায়া—"

"কমে নি?" চিন্তিত মুখে ঘনশ্যামবাবু বলিলেন, "তাই ত! আচ্ছা এই ওষুধটা খাওয়াও—এক ঘণ্টায় কমে যাবে—ঠিক।" বলিয়া ঔষধ দিলেন।

রামচরণ বলিল, "শেঠজী যে কাল সাঁঝমে হাসপাতাল গিয়েছিলেন দাওয়াই আনতে হুজুর—"

"নেহি নেহি" লাফাইয়া উঠিয়া পান্নালাল বলিল, "উতো শ্রীনিবাসকো ছাতিমে দরদ হুয়াথা। হুমুকো দাওয়াই আসপাতালসে লেঙ্গে? রাম্‌ রাম্‌—" বলিতে বলিতে ঔষধ লইয়া প্রায় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

রামচরণ চোখ পাকাইয়া বলিল, "ঝুঠ্‌ বাত; শ্রীনিবাস আমাকেও কাল বলছিল ছেলেকে হাসপাতালের ডাক্তার দেখাবার জন্যে। আমি সিধা বলে দিলাম মরে বাঁচে আমাদের ডাক্তার-বাবুর হাতে।—আমি কখনো দুসরা জায়গায় যাবো না।" বলিয়া সকলের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল, "ও ঠিক দুসরা দাওয়াই খাইয়েছে হুজুর—আপনি ঠিক জানবেন—নইলে আপনার দাওয়াইতে বেমারী ছুটবে না!"

ঘনশ্যামবাবু মৃদু হাসিয়া টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "তাই ত বলি, ওষুধে ফল হবে না তা কি করে হবে? অন্য ওষুধ খাইয়ে রোগটি বাড়িয়ে এখন এসেছেন লাফাতে, হুঁঃ।—শ্রীনিবাসকেও আসতে হবে শেষকালে। পয়সা বাকী আছে বলে এদিক মাড়াচ্ছেন না। ওর বুকের ব্যথার ওষুধ এইখানে" বলিয়া নিজের হাতের মুঠাটি দেখাইয়া বলিলেন, "কেউ সারাতে পারবে না ও। রুগী ভাগাচ্ছে—টেরটি পাবেন বাছাধন।

রামচরণ সোৎসাহে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—যাবে কোথায় হুজুর ও হাসপাতাল-টাতাল সব দু-দিন, হুজুগ কমলেই দেখবেন সব সুড় সুড় ক'রে আসবে—

জগদীশ জাতিতে নাপিত হইলেও কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছে। বাংলা দেশে কিছুদিন কাটাইয়াছে—খুব বাঙালী-ঘেঁষা, বাংলা বলেও ভাল; রামচরণের মত অত হিন্দি মিশাইয়া বলে না। বলিল, "কাল বিকেলে হাসপাতালের ডাক্তার রায়বাহাদুরের বাড়ী দেখা করতে গিয়েছিলেন। অনেক কথা হ'ল, কেবল নিজের বড়াই। চন্দ্রমোহন বাবুকে বললেন, 'নতুন হাসপাতাল হ'ল, নতুন লোক আমি, আপনাদের সাহায্য না পেলে কি করে চলবে।' রায়-বাহাদুর চন্দ্রমোহন যে-সে লোক নন, বললেন, 'গরীবের জন্যে হাসপাতাল, গরীবকে সাহায্য করবার জন্যে সরকার তলব দিয়ে আপনাকে পাঠিয়েছেন। আমরা কেন খয়রাতি ওষুধ খেতে যাবো। তা ছাড়া ঘনশ্যামবাবু আমাদের ঘরানা ডাক্তার।'"

ঘনশ্যামবাবু দুলিতে দুলিতে বলিলেন, "তাই নাকি? চন্দ্র-মোহনকে ভজাতে গিয়েছিল বুঝি? খাঁটি লোক, ঠিক জবাব দিয়েছে।—তার পর?"

জগদীশ হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল, "কথায় কথায় আপনার স্ত্রীর অসুখের কথা উঠল। রায়বাহাদুর দুঃখু করতে লাগলেন। ডাক্তার বাবু শুনে বললেন—"আমি ত কিছু জানি

না। তা আমাকে তিনি খবর দিলেই পারতেন,—না দিলেও আমার যাওয়া উচিত—কাল নিশ্চয় যাবো।"

ঘনশ্যামবাবু কোন কথা বলিলেন না। রামচরণ কথাটার জের টানিয়া বলিল, "আসবে বৈকি—আসতেই হবে—আপদে বিপদে আপনার ঘরের কথাও ত শোচতে হবে।"

সকলে ঔষধপত্র লইয়া প্রস্থান করিল।

বাহিরের আলাপ-আলোচনায় মনের বিষন্ন ভাব অনেকটা কাটিয়া গেল। মুখে স্বাভাবিক হাসি ফুটিল। ব্যাপারটা তাহা হইলে একেবারে নিরাশ হইয়া দমিয়া যাইবার মত নহে।

"কৈরে টুনি, তোর মার জ্বর ছাড়ল? এই যে উঠে বসে পড়েছে দেখছি,—শরীরটা একটু হাল্কা বোধ হচ্ছে ত?" কাছে আসিয়া স্ত্রীর কপালে হাত দিয়া উত্তাপ অনুভব করিয়া উৎসাহভরে ঘনশ্যামবাবু বলিলেন, "বাঃ জ্বর ত ছেড়ে গেছে দেখছি, এইবার একটু ওষুধ দিই খাও না, জ্বরটা আর আসবে না তাহলে,—শোনই না কথাটা।"

স্বামীর হাতটি একটু ঠেলিয়া সরাইয়া টুনির মা বলিলেন, "আর জ্বালিও না বাপু,—তোমার ঐ এক ফোঁটায় কি আর ম্যালেরিয়া জ্বর ছাড়ে, কখনো ছেড়েছে কারুর? আমি কুইনিনের গুলি খেয়েছি।"

বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ঘনশ্যামবাবু বলিলেন, "কুইনিন খেলে? সর্ব্বনাশ, পেলে কোথায়?"

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া কথাটাকে এড়াইয়া দিয়া টুনির মা বলিলেন, "তাতে আর হয়েছে কি?" বলিয়া স্বামীকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই বলিলেন, "অনেক বেলা হয়েছে—তুমি নেয়ে খেয়ে নাওগে যাও।" টুনিকে ডাকিয়া বলিলেন, "ও টুনু একটু জল খাওয়া ত মা—বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।" স্বামীকে "কিছু ভাবতে হবে না তোমায়, আজ আমি বেশ ভাল আছি। দুটি ভাত খেতে ইচ্ছে করছে—আজ থাক কি বল?"

কোন কথা না বলিয়া ঘনশ্যামবাবু স্নান করিতে গেলেন। তিনি বেশ বুঝিলেন স্ত্রীর এ কথাগুলি শুধু কুইনাইনের গুলির আঘাতের প্রলেপ মাত্র।

আহারে বসিয়া নানা কথাবার্ত্তার মধ্যে ঘনশ্যামবাবু বলিলেন, "বনমালী ডাক্তার যে তোমাকে দেখতে আসবেন বলেছেন।"

"তাই নাকি? তাহলে বোধ হয় এ যাত্রা বেঁচে যাবো।" মুখ টিপিয়া টুনি রমা বলিলেন, "কি রকম ডাক্তার, লোকে কি রকম বলছে?"

খোঁচাটা হজম করিয়া ঘনশ্যামবাবু পাল্টা দিলেন, "শুনছি একেবারে সাহেব—বিলেত-টিলেত ফেরত হবেন বোধ হয়, পরিচয় শীঘ্রই পাওয়া যাবে—এখন ত কিছু দিন জয়-জয়কার হবেই, যা হুজুগে দেশ।"

"না ডাকতেই আসবেন ভদ্রলোক? কেন, তুমি একটু খবর দিলেই ত পারতে?"

"আমি?" খাওয়া বন্ধ করিয়া ঘনশ্যামবাবু বলিলেন, "কেন আমি কি তোমার চিকিৎসা করতে পারি না নাকি যে অন্য ডাক্তার—"

মুখের কথা কাড়িয়া টুনির মা বলিলেন, "পারলেও, যে চিকিৎসা করাবে তারও ত একটা ইচ্ছে থাকা চাই। যদি একান্ত ওষুধই খেতে হয় ত অ্যালোপাথি ছাড়া অন্য ওষুধ আমি কিছুতেই খাব না।"

ঘনশ্যামবাবুর আর খাওয়া হইল না।

বিকালের দিকে টুনির মার আবার জ্বর আসিল। বনমালী ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, "স্প্লীনটা একটু প্যালপেব্‌ল্ হয়েছে দেখছি—আগে থেকে ম্যালেরিয়া ছিল নাকি? ইঞ্জেক্‌শন দিলে বোধ হয় শীঘ্র উপকার হতে পারে।"

টুনির মা ঘোমটার ভিতর হইতে বলিলেন, "টুনু, যদি দরকার হয় দিয়ে দিতে বল না।"

বনমালী বলিলেন, "এখন জ্বরটার বাড়ের মুখ, এখন থাক, কাল সকালে বরং দিয়ে দেব।"

ঘনশ্যামবাবু এতক্ষণ প্রায় দম বন্ধ করিয়া ছিলেন, স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "সেই ভাল, আমার বড় মেয়েকেও টেলিগ্রাম করেছি—সেও এসে পড়ুক।

উত্তরে একটু হাসিয়া বনমালী ডাক্তার প্রস্থান করিলেন।

জ্বর বাড়িতেছে। টুনির মা শ্রান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, 'মলুকে টেলিগ্রাম করলে যে হঠাৎ?"

কিন্তু কিণ্ণ ভাবে ঘনশ্যামবাবু বলিলেন, "ওষুধ খাচ্ছ না—অসুখ বেড়েই চলেছে, আমার কথা না শুনলেও তার কথা ত ঠেলতে পারবে না।"

"অর্থাৎ সে এসে আমায় তোমার ঐ ওষুধ গেলাবে?"

ঘনশ্যামবাবু অবাক্ বিস্ময়ে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"বেশ দেখা যাবে।" বলিয়া টুনির মা পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

২

হাওড়া ষ্টেশন, চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে লুপ এক্সপ্রেস ছাড়ে ছাড়ে। একটি ছোট ইণ্টার ক্লাস কম্পার্টমেণ্টের চারটি বেঞ্চ জুড়িয়া কয়েকটি যাত্রী শুইয়া, কেহ কেহ ইতিমধ্যে আপাদমস্তক লেপ কম্বল চাপা দিয়াছেন। মাঘ মাস, বেশ কনকনে শীত পড়িয়াছে। বাঙ্ক দুটি যাত্রী কয়েকটির মালপত্রে ঠাসা। একটি বেঞ্চে স্ত্রী এবং চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে লইয়া একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক জড়াজড়ি করিয়া কোন রকমে স্থান সঙ্কুলান করিয়াছেন। একটিতে এক বিশালকায় মাড়োয়ারী আড়াই হাত ভুঁড়ি লইয়া কম্বল মুড়ি দিয়া হাঁপাইতেছে। একটিতে একজন মুসলমান ভদ্রলোক আড় হইয়া শুইয়া এক মুখ পান জর্দ্দা ঠাসিয়া সটকা টানিতেছেন। বাকীটিতে অনিল, এক কাপ চা শেষ করিয়া সিগারেট ধরাইয়া রাগ্‌টি বুক পর্য্যন্ত চাপাইয়া শুইয়া শুইয়া একটি বই পড়িবার উপক্রম করিতেছে। দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে। আরও মিনিট-পাচেক কাটিলেই অন্য যাত্রী উঠিবার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।

বোধ করি মিনিটখানেক বাকী আছে, হঠাৎ দরজা খুলিয়া একটি স্ত্রীলোক এবং তাহার পিছনে, মাথায় ট্রাঙ্ক বিছানা ও হাতে টিফিন-কেরিয়ার ঝুলাইয়া কুলি প্রবেশ করিল। গাড়ীতে স্থান নাই দেখিয়া স্ত্রীলোকটির যেন একটু ইতস্ততঃ ভাব দেখা গেল। কুলি ততক্ষণে বিছানাপত্র অনিলের পায়ের দিকে মাটিতে রাখিয়া জানাইল সব গাড়ীতেই এমনি ভিড়—বলিয়া পয়সার জন্য হাত বাড়াইল। পয়সা পাইয়া মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া সে নামিয়া পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া গেল।

শেষ মুহূর্ত্তে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়া কোন রকমে গাড়ী ধরিতে পারার ভাব মেয়েটির মুখেচোখে তখনও বেশ ফুটিয়া রহিয়াছে। দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস চাপিবার চেষ্টায় নীচের ঠোঁটটি দাঁত দিয়া ঈষৎ চাপা, নাসারন্ধ্রের ঘন ঘন স্ফুরণ ও কুঞ্চন ব্যতীত আর কিছু বুঝিবার জো নাই। বয়স দেখিয়া কুড়ির নীচেই বোধ হয়। মাথার কাপড় খোঁপার উপর আঁটা, এলোমেলো কয়েকগাছি চুল কপালে ও গালে নামিয়া পড়িয়াছে; গায়ে একটা শালঘুরাইয়া রাখা, পায়ে লেডিস্ স্লীপার।

ট্রেন ছাড়িবার পর মিনিট-দুই দরজার সামনে, বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া বোধ করি জিরাইয়া লইল। অনিলের মনে হইল, হয়ত বসিবার স্থানের অভাবেই মেয়েটি ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। একটু পরেই সে ঘুরিয়া আস্তে আস্তে নিজের বাক্স বিছানার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। অনিল ততক্ষণে উঠিয়া বসিয়া বেঞ্চখানি অর্দ্ধেকের উপর ছাড়িয়া দিয়াছে। অন্যান্য যাত্রীদের কোন শব্দসাড়া নাই। হিন্দুস্থানী পরিবারটির অবশ্য নড়িবার-চড়িবার স্থান নাই কিন্তু বাকী দুজন যেন গভীর রাত্রে অগাধ নিদ্রায় মগ্ন!

মেয়েটিকে তবুও দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, অনিল নিজেকে আরও সঙ্কুচিত করিয়া বিনীতভাবে বলিল, "যদি আপত্তি না থাকে ত বসুন না এইখানটায়।"

মেয়েটি এক বার অনিলের দিকে চাহিল মাত্র, কিন্তু বসিল না দেখিয়া অনিল বলিল, "আমার বিছানাটা সরিয়ে দেব ?"

লজ্জিত কণ্ঠে মেয়েটি বলিল, "না না দরকার নেই, বসছি আমি।" বলিয়া বেঞ্চের পাশে রাখা নিজের বিছানাটির উপর বসিবার উপক্রম করিতেই অনিল দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "কি আশ্চর্য্য আপনি ঐখানে বসবেন—সে কি হয়, আমি বরং ঐ ভদ্রলোকের বেঞ্চে একটু জায়গা ক'রে নিচ্ছি, আপনি উঠে বসুন।"

জড়সড় হইয়া বেঞ্চের এক পাশে বসিয়া মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "তাহলে আপনার ভদ্রতা এবং আমার অত্যাচার, দুটোরই বেশী রকম বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ে। আমি ত বসেছি, আপনিও বসুন। দিব্যি আরাম ক'রে এদের মত শুয়েছিলেন—আর শুতে পারবেন না; এই কষ্টটুকু আমি দিতে চাইছিলুম না।"

বসিয়া অনিল বলিল,—কোন কষ্ট হবে না, ট্রেনে আমার মোটেই ঘুম হয় না।

মেয়েটির লজ্জিত ভাব অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে, অনিলের দিকে ফিরিয়া সহজ ভাবেই বলিল, "আমার কিন্তু ঠিক উল্টো—ট্রেনে চড়লেই এত ঘুম পায়, এক মিনিট বসে থাকতে পারি নে।" বলিয়া হাসিয়া মুখ ঘুরাইয়া লইল।

অনিল ব্যস্ত হইয়া বলিল, "বেশ ত বেশ ত আপনি স্বচ্ছন্দে শুয়ে পড়ুন; কিন্তু গায়ে দেবেন কি—বিছানাটা খুলতে হবে ত? কি দরকার, আপত্তি না থাকে আমার রাগ্‌টা নিতে পারেন, গরম কোট র‍্যাপারে আমার চলে যাবে—নিন" বলিয়া রাগ্ ও বালিশটা আগাইয়া দিল।

মেয়েটি যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। পিঠে চাপান শালটি আরও ভাল করিয়া জড়াইয়া, পা দুটি গুটাইয়া বসিয়া বলিল, "তা বলে এদের মত এরই মধ্যে ঘুমুতে হবে? এই ত সবে সাড়ে সাতটা।"

হাসিয়া অনিল বলিল, "এরা কি আর সত্যি সত্যি ঘুমুচ্ছে, ওটা জায়গা না ছাড়বার ফন্দি। দেখবেন না দু-একটা বড় ষ্টেশন পার হ'লেই উঠে বসবে—খেয়ে দেয়ে নিয়ে তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমবে।"

মুখে আঁচল চাপা দিয়া কিছুক্ষণ নীরবে হাসিয়া সে বলিল, "আপনারও ত খাওয়া হয় নি তাহ'লে, ঐ দলে আপনিও ত ছিলেন।"

"আমি ও দলে থাকলে আপনার অবস্থাটা একটু অন্য রকম হত, নিশ্চয়।"

"তা জানি, কিন্তু খাওয়া হয়েছে আপনার, না আমার জন্যে ওটাও বাদ দেবেন ?"

—গাড়ীতে আমি কিছু খাই নে, ঐ দেখুন আপনি হাসছেন, ভাবছেন আমি মিছে কথা বলছি, সত্যিই চা ছাড়া [illegible] আমি কিছু খেতে পারি নে। বর্দ্ধমানে এক কাপ চা খেয়ে নেব ব্যস্।

"তা হ'লে" উচ্ছ্বসিত হাসি চাপিয়া মেয়েটি বলিল, "গাড়ীতে আপনি খান না, ঘুমোন না, কি করেন তবে ?"

"সিগারেট খাই, বই পড়ি এবং সঙ্গী পেলে গল্পগাছা করি," বলিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়া জানলার বাহিরে ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল,—এই অসুবিধেটুকুর জন্যে আমায় ক্ষমা করতে হবে।

কোন উত্তর না দিয়া মেয়েটি অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

সিগারেট শেষ করিয়া অনিল ফিরিয়া দেখিল, মেয়েটি গালে হাত দিয়া জানালার বাহিরে তাকাইয়া বসিয়া আছে। হয়ত ঘুম পাইয়াছে মনে করিয়া সে বলিল, "আপনার ঘুম পেয়েছে বোধ হয়।"

"না" সেই ভাবে বসিয়াই মেয়েটি বলিল।

"খাওয়াও ত হয় নি আপনার, এবার না হয়—"

"আমার খাবার ইচ্ছে নেই।"

"ওটা ঠিক সত্যি কথা হ'ল না। ইচ্ছে না থাকলে টিফিন-কেরিয়ার ভরে খাবার নিশ্চয় সঙ্গে আনতেন না। ঘ্রাণেই আমার প্রায় অর্দ্ধভোজন হয়ে গেছে।"

মেয়েটি গম্ভীর ভাবেই বলিল, "ও জন্যে আমি মোটেই দায়ী

নই—আমার অনিচ্ছাসত্বে মামীমা জোর করেই ওগুলো সঙ্গে দিয়েছেন," একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া কম্পিত স্বরে বলিল, "টেলিগ্রাম পেয়ে মনটা এত খারাপ হ'য়ে গেল—"

"কার টেলিগ্রাম, কিসের ?" উৎকণ্ঠিত স্বরে অনিল প্রশ্ন করিল।

"মায়ের অসুখের—এই দেখুন না—" জামার ভিতর হইতে খামশুদ্ধ টেলিগ্রামটি বাহির করিয়া অনিলের হাতে দিয়া বলিল, "কলেজ থেকে বাড়ী ফিরছি—পিয়ন আমারই হাতে দিলে। মামা-মামীমা কত আপত্তি করলেন, সঙ্গে লোক দিতে চাইলেন, আমার মন কিছুতেই মানল না—একলাই চলে এলুম। বললুম, এ পথে ত অনেকবার যাতায়াত করেছি—লোকের বাঘড়ায় দেরি হয়ে যাবে, একলা খুব যেতে পারব, মায়ের অসুখ শুনে থাকতে পারা যায় ?" কণ্ঠস্বর অশ্রুরুদ্ধ হইয়া গেল।

অনিল টেলিগ্রামটি পড়িল,

"ওয়াইফ ইল্ নো ট্রিটমেণ্ট সেণ্ড মলয়া"

ঘনশ্যাম।

প্রেরক ও স্থানের নাম দেখিয়া সে চমকাইয়া উঠিল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "মানেটা একটু গোলমেলে, পরিষ্কার কিছু বোঝা শক্ত। এর আগে তাঁর অসুখ-বিসু[illegible] আর কোন চিঠিপত্র পান নি ?"

করুণ কণ্ঠে মেয়েটি বলিল, "কই না," [illegible] থামিয়া বলিল, "নো ট্রিটমেণ্ট কথাটাই কি রকম লাগছে। চিকিৎসা হচ্ছে না, কি চিকিৎসার বাইরে চলে গেছেন কে জানে ? আর ভাবতেও পারি নে—" বলিতে বলিতে ঠোঁট দুটি কাঁপিয়া উঠিল। বোধ করি অশ্রু গোপন করিবার জন্য ঘাড়টি [illegible]কে ফিরাইল।

অনিল টেলিগ্রামটার উপর চোখ রাখিয়া খুব চিন্তিত ভাবে বলিল, "না না তা নয়, সে রকম কিছু হ'লে, 'হোপ্‌লেস্' বা ঐ রকম কোন কথা থাকত। এ আমার মনে হয় ব্যাপার খুব সিরিয়াস্ নয়, যা হোক চিন্তা করে মন খারাপ করা ছাড়া কোন ফল নেই, অযথা ভাববেন না, আমি বলছি আপনি গিয়ে দেখবেন, তিনি ভালই আছেন।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মেয়েটি বলিল, "ভগবান্ তাই করুন। মার আবার নানা রকম জেদ আছে কিনা, ওষুধ-বিসুধ শীগগির খেতে চান না, বাবার ওষুধে, শুধু বাবার কেন, হোমিওপ্যাথি ওষুধে একটুও বিশ্বাস নেই ; আমার কথা ঠেলতে পারেন না, আমি থাকলে বুঝিয়ে শুঝিয়ে জোর-জার করে কোন রকমে খাওয়াই—"

অনিল, "তবে ঐ ওষুধ-বিসুধ খাওয়া সম্বন্ধেই কোন গোলমাল হয়ে থাকবে।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছিল" মেয়েটি বলিল, "কিন্তু মা কদিন আগে লিখেছিলেন, নতুন হাসপাতালে একজন বাঙালী ডাক্তার এসেছেন। মা ত তাঁকে পেয়ে বর্তেছেন। তবুও বাবা যে কেন ও ভাবে টেলিগ্রাম করলেন—"

"হয়ত কোন কারণে আপনার যাওয়াটা দরকার হয়ে পড়েছে।" বলিয়া প্রসঙ্গটা বদলাইবার চেষ্টায় অনিল বলিল, "রাত হচ্ছে এবার আপনি কিছু খেয়ে নিন,—না না, কোন আপত্তি শুনব না—যা হোক একটু কিছু মুখে দিন।"

একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া মেয়েটি বলিল, "আপনার স্থান বিছানা ঘুম সবেতেই আমি ভাগ বসিয়েছি, খাবারটা যদি আমাকেই একলা খেতে হয়, তা হ'লে আমার লজ্জার আর সীমা থাকবে না, এবং যদি আপনি খেতে আপত্তি করেন, ও সব যেমনকার তেমনই পড়ে থাকবে, আর সকালবেলা গঙ্গার জলে সব ভাসিয়ে দোব।"

অনিল আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল, "এ কিন্তু আপনার ভারি অন্যায়, গাড়ীতে খেতে আমার কেমন বিশ্রী লাগে—আমি—না না সামান্য কিছু দিন—অত নয়—কি আশ্চর্য্য—এ কি অত্যাচার—"

কোন আপত্তিই চলিল না। আহারাদির পর অনিল বইটি খুলিয়া বলিল, "নিন, এবার শুয়ে পড়ুন, ঘুমলে একটু অন্যমনস্ক হ'তে পারবেন, জেগে থাকলেই দুশ্চিন্তা বাড়বে কেবল।"

শুইবার কোন চেষ্টা না করিয়া সে বলিল, "কি বই ওটা ?"

"রবীন্দ্র-রচনাবলী।"

"আপনি বুঝি খুব রবীন্দ্র-ভক্ত ?"

কথাটা যেন কেমন লাগিল। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অনিল একটু দৃঢ় স্বরেই বলিল, "হাঁ, এবং সেটা একটা গর্ব্বের বিষয় বলেই আমার মনে হয়। আপনি বুঝি—"

"না না, কথাটা আমি ঠিক ওভাবে বলি নি, নিজে আমি ওঁর লেখা বিশেষ বুঝতে পারি নে তাই—" লজ্জায় কথাটা আর শেষ করিতে পারিল না।

অনিল বুঝিল তাহার কথার ধরণে মেয়েটি বিশেষ লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু তবুও "ভগবানের অনেক কাজের বিশেষ কোন মর্ম্মই মানুষে বুঝতে পারে না। তবুও তাঁকে ভক্তি করা মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম,—নয় কি ?" না বলিয়া থাকিতে পারিল না।

মেয়েটি কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনিল ভাবিল কথাটা হয়ত একটু রূঢ় হইয়াছে। ব্যাপারটা হাল্কা করিবার উদ্দেশ্যে বলিল, "বসে বসে ঢুলছেন, শুয়ে পড়লেই হয়" বলিয়া আরও একটু স্থান দিবার জন্য পা-টা একটু গুটাইতে গিয়া "ইস" করিয়া একটা যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি করিয়া উঠিল।

"কি হ'ল" বলিয়া মেয়েটি চমকাইয়া উঠিল। "ও কিছু না" বলিয়া হাঁটুতে হাত বুলাইতে বুলাইতে অনিল বলিল, "কাল টেনিস খেলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়ে হাঁটুটায় একটু লেগেছিল—এখন পা-টা সরাতে গিয়ে খচ্ করে উঠল—ব্যথাটা বেড়েই চলেছে দেখছি।"

"আমি যদি রাত্রের মধ্যে কমিয়ে দিতে পারি ?"

"কি ক'রে ?"

"দেখুন না কি ক'রে। পা মুচড়ে পড়ে গিয়ে চোট লেগে স্প্রেনের মত হয়েছে ত" বলিয়া, উঠিয়া বাক্স খুলিয়া ছোট একটি হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স বাহির করিয়া এক খোরাক ঔষধ তৈয়ারী করিয়া অনিলের হাতে দিয়া বলিল, "মুখটা ভাল

করে কুলকুচু করে পরিষ্কার ক'রে এটা খেয়ে ফেলুন দেখি—আর এক ঘণ্টা সিগারেট খেতে পাবেন না। হাসছেন আপনি, কিন্তু দেখবেন নিশ্চয়ই ব্যথা কমে যাবে,—আর এক ডোজ ভোরবেলা খেয়ে নেবেন।"

ঔষধটি হাতে লইয়া হাসিয়া অনিল বলিল, "ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি ত মস্ত বড় হোমিওপ্যাথ দেখছি—ঔষধ-পত্র একেবারে সঙ্গে সঙ্গে রাখেন।"

"মস্তবড় হোমিওপ্যাথ মোটেই নই, তবে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের মেয়ে এবং জিনিষটাকে খুব বিশ্বাস করি। মনে করছি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে এবার এই করব। অনেক গরীবের উপকার করতে পারা যায়—বিশেষ করে স্ত্রীলোকের অনেক জটিল ব্যাধি সারাতে পারলে, অহেতুক অ্যালোপ্যাথদের হাতে পড়ার বিড়ম্বনার ভোগ কমতে পারে।" একটু থামিয়া বলিল, "মামার বাড়ীর সব এর ওপর বেজায় চটা, মাও ঠিক তাই।"

হাসিয়া অনিল বলিল, "চমৎকার। আমার মা কিন্তু ঠিক উল্টোটি। বাবা অ্যালোপ্যাথ, আমিও ডাক্তারী পড়ি, কিন্তু মা অ্যালোপ্যাথদের ওপর হাড়ে চটা—মরে গেলেও এক ফোঁটা অ্যালোপ্যাথি ওষুধ কিছুতেই মুখে দেবেন না। বলেন, "ও আবার ওষুধ, ও খেলে রোগ ত আরও বেড়ে যায়। অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারদের তিনি যমদূত বলেন। বলেন, ওদের চেহারা সাজ-সরঞ্জাম আড়ম্বর আয়োজন দেখলে রোগ সারা ত দূরের কথা, ভয়েই রুগীর হার্টফেল করে থাকে।" বলিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

"খুব উচিত কথা, খুব সত্যি কথা।" মেয়েটি বলিল, "আপনার কথা শুনে আমার তাঁর ওপর এত ভক্তি হচ্ছে যে বলতে পারি নে।"

"তা বৈকি—আপনি ত ওকথা বলবেনই—আমরা যে আপনাদের চক্ষুশূল" একটু থামিয়া বলিল, "আপনার মত লোক পেলে মা বোধ হয় মাথায় করে রাখেন।"

"আপনার পায়ের ব্যথা কমলে আপনিও—" কথাটা অনিলের হাসির চোটে আর শেষ হইল না। অনিল বলিল, "তাহলে আমিও পড়াশোনা ছেড়ে হোমিওপ্যাথি করব—কি বলেন?"

"না অতটা আশা করি না" ঠোঁটের কোণে হাসি টিপিয়া বলিল, "মতটা হয়ত একটু বদলাতে পারে—"

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিবার পর অনিল দেখিল মেয়েটি সত্যই ঢুলিতেছে। তাহাকে শুইতে অনুরোধ করিয়া সে বই লইয়া বসিল।

সকাল হইয়াছে। অনিলকে আগে নামিতে হইবে, মেয়েটির নামিতে ঘণ্টাখানেক দেরি আছে। অনিলের গন্তব্য ষ্টেশন প্রায় আসিয়া পড়িল, মেয়েটি কিন্তু তখনও নিদ্রামগ্ন।

অনিল অত্যন্ত সঙ্কোচজড়িত কণ্ঠে ডাকিল, "মলয়া দেবী—"

"হুঁ" বলিয়া চোখ খুলিয়া চাহিয়াই মেয়েটি ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। গাড়ী তৎক্ষণে ষ্টেশনে থামিয়াছে।

"আমায় নামতে হবে" অনিল বলিল।

"কি মুস্কিল আমায় এতক্ষণ ডাকেন নি কেন?"

জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া অনিল নামিয়া পড়িল। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যথাটা কমে নি একটুও?"

জানালার উপর হাত রাখিয়া অনিল বলিল, "অনেকটা কম মনে হচ্ছে—নড়লে চড়লে তবে ঠিক বুঝতে পারব।"

"কমলেও কি আর বিশ্বাস করবেন আপনারা?"

"ওষুধ না খেলেও কি আর কমত না?"

অভিমানক্ষুণ্ণ কণ্ঠে মেয়েটি বলিল, "ঐ ত আপনাদের শেষ অস্ত্র, অথচ নিজেদের বেলায়—" গাড়ি হুইসিল দিল। মেয়েটি বলিল, "বিস্তর জ্বালাতন করলুম মাপ করবেন—"

দু-পা চলিয়া অনিল ফিরিয়া বলিল, "পায়ের ব্যথা কমিয়ে দিয়ে যথেষ্ট উপকারও করেছেন, আপনার ঠিকানা আমার জানা রইল, সেরে গেলে জানাবো, অকৃতজ্ঞ হব না।"

গাড়ী ছাড়িল। মেয়েটি একটু ইতস্তত করিয়া দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে কোন রকমে বলিল "আপনার—"

অনিল হাত নাড়িয়া কি বলিল ঠিক বুঝিতে না পারিলেও তাহার মনে হইল "দেরী হবে" নাকি ঐ ধরণের যেন একটা কথা কানে আসিল।

৬

অবশেষে টুনির মার জিদই বজায় রহিল। ঘনশ্যামবাবু ত হাল ছাড়িয়া দিয়াই ছিলেন, তবু মনে মনে আশা ছিল, মলয়া আসিয়া যদি মায়ের মত পরিবর্তন করাইতে পারে। মলয়া অনেক বুঝাইল, রাগ অভিমান করিল, কান্নাকাটি করিয়া দেখিল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। মা কোনমতেই মানিলেন না। শেষে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমাদের যখন এতই আপত্তি, তখন কোন চিকিৎসারই দরকার নেই, থাক্ পেটে পিলে নিয়ে বেঘোরে মরাই আমার অদৃষ্টে ছিল, এই জানব।"

ইহার উপর আর কথা চলে না। বিজয়ী বীরের মত বনমালী ডাক্তার সদর্পে আসিয়া ইন্‌জেকশন দিলেন। ঘনশ্যামবাবু এত বড় লজ্জা ও অপমান নীরবে সহ্য করিয়া, যুদ্ধবন্দী কয়েদীর মত এক পাশে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া সব দেখিলেন। এবং মনে মনে ইহাদের মুণ্ডপাত করিয়া ইহার প্রতিবিধানের জন্য ঈশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

বাস্তবিকই তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া মনে হয়, কে যেন তাঁহাকে বাঁধিয়া মারিতেছে।

মলয়া পিতার অবস্থা কল্পনা করিয়া মনের দুঃখ চাপিতে না পারিয়া, পাশের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, মনে মনে বলিল, "ধরণী দ্বিধা হও।"

বনমালী বলিলেন, আপনার মেয়ে এসেছেন? কই দেখছি না ত?"

গম্ভীর স্বরে ঘনশ্যাম বলিলেন, "শরীরটা তারও ভাল নেই—তাছাড়া সে এসব দেখতেও পারে না।"

"অ" একটু থামিয়া বনমালী বলিলেন, "তা আপনাদের হোমিওপ্যাথিতেও শুনছি আজকাল কি সব ইনজেকশন বেরিয়েছে ?"

ঘনশ্যাম কোন উত্তর দিলেন না। বনমালী বলিলেন, "আপনার মেয়েও বুঝি হোমিওপ্যাথি পড়ছেন ?"

বিরক্তভাবে ঘনশ্যাম বলিলেন, "আজ্ঞে না, সে এবার আই-এ দেবে।"

"তাই নাকি ? বেশ বেশ,—আচ্ছা এবার উঠি ;—খুকী মাকে জিজ্ঞেস কর, কোন কষ্ট হচ্ছে না ত ?"

ঘোমটাসুদ্ধ মাথা নাড়িয়া টুনির মা 'না' জানাইলেন। টুনি, মার জবানীতে জিজ্ঞাসা করল,—মাসীমারা কবে আসবেন ?

দাঁড়াইয়া উঠিয়া বনমালী বলিলেন, "আজকালের মধ্যেই ত আসবার কথা আছে। আমি ত ছুটি পেলুম না, ছেলেকে লিখেছি—সেই নিয়ে আসবে। তারা এলে তোমার মাকে দেখতে আসবে অখন—আসবে বৈকি।" ঘনশ্যা[illegible]কে বলিলেন, "ও জায়গাটা একটু ফোমেণ্ট করিয়ে দিলে [illegible] কম হবে—আচ্ছা নমস্কার।" বলিয়া বাহির হইয়া [illegible]

পরদিন বৈকালের দিকে বনমালী ডাক্তা[illegible] স্ত্রী বেড়াইতে আসিলেন। টুনির মার কাল হইতে জ্বর আর-আসে নাই, কম্বল মুড়ি দিয়া অবসন্নের মত চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছেন। মাথার কাছে বসিয়া টু[illegible] ঠাকুরদের স্তব বলিতেছে। মলয়া উঠানের ও-পাশটায় রৌদ্রে পিঠ দিয়া ভিজা চু[illegible] শুকাইতেছে এবং কি [illegible] বই খুব অভিনিবেশ সহকারে পড়িতেছে।

বনমালীর স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করিতেই, টু[illegible] স্তব বলা বন্ধ করিয়া মায়ের কানের কাছে মুখ দিয়া বলিল—"মা"

মা চোখ বুজিয়াই বলিলেন, "কি হ'[illegible]?"

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বিছানার পাশটিতে গিয়া দাঁড়াইয়া টুনির মার কপালে নিজের হাতটি সস্নেহে রাখিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, "আজ কেমন আছ ভাই ?" টুনিকে—"মাসীকে চিনতে পারলে না খুকী ?" বলিয়া হাসিলেন।

চক্ষু মেলিয়া টুনির মা হাস্যময়ীর মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিলেন। চোখের কোণ দুটি জলে ভরিয়া গেল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "ভাল আছি। কখন এলেন আপনি—বসুন, ও টুনু দিদিকে ডাক ত মা—" বলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেই ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বাধা [illegible] বলিলেন, "না না উঠতে হবে না তোমায়—আমি বসছি—তুমি শুয়ে থাক।" বলিয়া পাশে বসিয়া তাঁহার মাথায় হা[illegible] বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "বোনটি ভেবে আমি কোথায় 'তুমি' বলে আলাপ সুরু করলুম, তুমি কিন্তু ভাই আমায় 'আপনি' করেই রাখলে। আজ বসলুম তোমার অসুখ বলে—নইলে না বসেই ফিরে যেতুম কিন্তু।"

টুনির মা তাঁহা[illegible] হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া লজ্জিত ভাবে বলিলেন, "আচ্ছা আর বলব না ; কিন্তু দিদি বলব ত ?"

ঘাড় দুলাইয়া হাসিয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "তা বলতে হবে বৈকি, তোমার চেয়ে আমি বড় নই ? দিদি না বললে এমন রাগ করব—" বলিয়া উচ্ছ্বসিত হাসি হাসিয়া টুনির মাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

কিছুক্ষণ পরে টুনির মা বলিলেন, "মেয়েমানুষের অসুখ হওয়া বড় পাপ দিদি, কত বিড়ম্বনাই না সইতে হয়।"

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী সহানুভূতির স্বরে বলিলেন, "তুমি ত শুনলুম নিজেই জেদ করে ইঞ্জেক্শন নিয়েছ—"

"তা নইলে কি আর এ যাত্রা বাঁচতুম দিদি ?" গাঢ়স্বরে টুনির মা বলিলেন, "ডাক্তারবাবুর দয়াতেই বেঁচে উঠেছি—পেটে পিলে হয়ে—"

—তোমার আবার সবেতেই একটু বাড়াবাড়ি। কেন, হোমিও-প্যাথিতে কি আর পিলে লিভার সারে না ? ওটা তোমার ভুল।

মলয়া পান লইয়া আসিল। ডাক্তারবাবুর স্ত্রীকে প্রণাম করিতেই তিনি তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন, "বেঁচে থাক মা-লক্ষ্মী আমার, তোমার কথা আমি আগেই সব শুনেছি মা।"

মলয়া ও তাহার মা বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, "তা জানো না বুঝি,—তোমার মেয়ে আর আমার ছেলে, এক সঙ্গেই কলকাতা থেকে এসেছে,—তখন কি ওরা জানত যে আমরা দুজন ওদের দুজনের মা।"

"ওমা তাই নাকি ? ভারি মজা ত ?" টুনির মা হাসিয়া বলিলেন।

"অনিল আমার কাছে সব গল্প করছিল, তোমার ওষুধে তার কিন্তু খুব উপকার হয়েছিল। উনি শুনে বললেন, তবে আর তোমার ভাবনা কি, রোগ হবার আগেই ডাক্তার জোগাড় হ'য়ে রইল। আমি সাতজন্মেও ওদের ওষুধ খাই না কিনা" নাসিকাগ্র কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "মাঝে মাঝে আমার কলিক ব্যথা ওঠে—ওষুধ দেবার জন্যে, ইনজেকশন দেবার জন্যে বাপেতে ছেলেতে ধস্তাধস্তি বাবাঃ, ও সব দেখলেই আমার ভয় করে।" একটু থামিয়া "তোমার ধন্যি সাহস বাপু, কি ক'রে ঐ ছুঁচ ফোটাতে পারলে—উঃ" বলিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

মলয়া লজ্জারক্তিম বদনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—তাহার চিকিৎসার কথা এ ভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, কখনও সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

"বেলা হ'ল—এখনও গোছগাছ কিছুই হয় নি—আজ উঠি ভাই—আবার সুবিধেমত আসব। কেমন থাক খবর দিও। তুমি একদিন বেড়াতে যেও মা, তোমার মা ত এখন যেতে পারেন না" মলয়ার হাতটি ধরিয়া বনমালীর স্ত্রী বলিলেন।

"যাবে বইকি—কালই যাবে ;—আমিও সেরে উঠলেই যাব দিদি।"

"ওঃ—আলাপ-পরিচয় ত হ'ল, এবার এমনি করেই যাওয়া-আসা চলবে। আসি ভাই।"

"আবার এস দিদি" বলিয়া টুনির মা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৫০

৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

সত্তর-পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে আমরা পাঠশালায় প্রতি মাসে শুক্ল-পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা করিতাম। একখানা ধোআ চৌকীর উপরে তালপাতার তাড়ী দোয়াতকলম রাখিয়া পূজা করিতাম। কিন্তু ইস্কুলে সরস্বতী পূজা হইত না। আমরা শ্রীপঞ্চমীতে বাড়ীতে বই শ্লেট দোয়াত কলমে পূজা করিতাম। সেই বই বাংলা কিম্বা সংস্কৃত, ইংরেজী হইতে পারিত না। ইংরেজী ম্লেচ্ছ ভাষা। গ্রামে অদ্যাপি এই রীতি প্রচলিত আছে। নগরে কদাচিৎ কোন ধনাঢ্য সরস্বতী-প্রতিমা পূজা করিতেন। বর্দ্ধমানে মহারাজার সরস্বতী-প্রতিমা-পূজায় মহা-সমারোহ হইত। পাঁচ-সাত ক্রোশ দূর হইতে শত শত লোক ভাসান দেখিতে আসিত। দুই ঘণ্টা যাবৎ নানা বিচিত্র আতসবাজি পুড়িত।

গত ৩০।৩৫ বৎসরের মধ্যে নগরে নগরে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ইস্কুলে কলেজে সরস্বতীর প্রতিমা-পূজা প্রচলিত হইয়াছে। কেহ কেহ নিজের বাড়ীতেও প্রতিমা-পূজা করিয়া থাকেন। এই ক্ষুদ্র বাঁকুড়া নগরেও বাজারে সরস্বতী-প্রতিমা বিক্রয় হইয়া থাকে। ছাত্রদিগের সারস্বতোৎসবে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আমি বর্ষে বর্ষে খানকয়েক নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া থাকি। টোলের বিদ্যার্থীরা সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃত ছন্দে পত্র লিখে; ইস্কুলের ছাত্রেরা সাধু বাংলা ভাষায় লিখে, বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু অধিক বয়সের ছাত্রেরা কলেজের ছাত্রেরা সোজা ভাষায় লিখিতে পারে না, বাক্-বিদগ্ধতা প্রকাশ করে। কারণ তাহারা "ক্লাসিকাল বেঙ্গলি" পড়ে, যাহার বাংলা অনুবাদ শুনি নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লৈখিক ভাষা ও মৌখিক ভাষা তুল্য-মূল্য বিবেচনা করেন। যে যাহা বলে তাহাই বাংলা ভাষা। যাহার কলমে যেমন আসে তাহাই বাংলা বানান। প্রথমে অর্থবোধ পরে পাঠ করিতে হয়। গত সরস্বতী-পূজার আট নিমন্ত্রণের মধ্যে একখানি দুইখানি তিনখানি পত্রে লিখিত ছিল, অমুক দিন বৈকালে "প্রতিমা-নিরঞ্জন" হইবে। 'প্রতিমা-নিরঞ্জন'? কি কর্ম, বুঝিতে পারিলাম-না। নিরঞ্জন অঞ্জনশূন্য নির্মল; ইহা হইতে পরব্রহ্ম। শূন্য ধর্মরাজ নিরাকার নিরঞ্জন। প্রাচীন বাঙ্গালী কবির প্রয়োগে দেখিতে পাই। নিমন্ত্রণ-পত্রের ভাবে বুঝিলাম 'প্রতিমা-নিরঞ্জন' প্রতিমা-বিসর্জন। বিসর্জন কর্ম বুঝাইতে নিরঞ্জন শব্দের প্রয়োগ পূর্বে পড়ি নাই, শুনি নাই, সংস্কৃত কোষেও নাই। কলেজের ছাত্রেরা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্য পড়ে। তাহারা বিসর্জন অর্থে নিরঞ্জন শব্দ কোথায় পাইল?

পাড়ার এক উৎসবক্ষেত্রে যাইয়া দেখি সরস্বতী গিরি-কুঞ্জবাসিনী পদ্মাসনা দ্বিভুজা বীণাধারিণী, অঙ্গে বাহুমূল পর্যন্ত রক্তবর্ণ আচ্ছাদন, তদুপরি নীলাম্বরী। "অহে, এ কি করিয়াছ? গিরিতে পদ্ম ফোটে না। যিনি শুভ্রা যাঁহার আসন বসন পুষ্প শুভ্র, তাঁহার অঙ্গে রক্ত ও নীল বস্ত্র কেন?" "এরূপ না করিলে শ্বেত প্রতিমা মানায় না।"

একটু দূরে কলেজের ছাত্রদের উৎসবক্ষেত্রে গিয়া দেখি, সরস্বতী এক নিকুঞ্জে পদ্মাসনা, দ্বিভুজা বীণাধারিণী। সমুখে দুইটি হাঁসও আছে। "অহে, তোমাদের গণ-পতি কে? সরস্বতীর হাতে পুথী কই? আর, 'প্রতিমা-নিরঞ্জন' কি কর্ম?" "আমরা সরস্বতী বিসর্জন করিতে পারি না, কাজেই নিরঞ্জন লিখিয়াছি।" "তোমরা কেন, মূক ও উন্মত্ত ব্যতীত কেহই পারে না। তোমরা যে মৃণ্ময়ী প্রতিমা সর্জন করিয়াছ, সেই সৃষ্ট প্রতিমূর্তির বিসর্জন করিবার কথা।

ত্যাগ অর্থে নিরঞ্জন শব্দ কোথায় পাইলে?" অনুসন্ধানে জানিলাম শব্দটি পূর্ব-বঙ্গের। কলিকাতা পথে এ দেশে মাত্র দুই বৎসর আসিয়াছে। পূর্ব-বঙ্গে পূজা ও বিসর্জন অন্তে প্রতিমা জলে নিক্ষিপ্ত হয় না, গৃহে রক্ষিত হয়। বৎসরান্তে নূতন প্রতিমা হইলে পুরাতন প্রতিমার নিমজ্জন হয়। পণ্ডিতমানীরা বিসর্জন কিম্বা ভাসান না বলিয়া নিরঞ্জন বলেন।

শব্দটি কোথা হইতে আসিল? রূপে সংস্কৃত কিন্তু প্রযুক্ত অর্থে নয়। অনেক দিনের কথা, এক কবিরাজের বিজ্ঞাপনে "দন্তমঞ্জন-চূর্ণ" এই নাম পড়িয়াছিলাম। আমরা বলি দাঁতের মাঁজন, সংস্কৃতে দন্ত-মার্জন। মাঁজন শব্দ কবির কলমে মঞ্জন হইয়াছে। "আমাশয়" নামে আর এক উদাহরণ আছে। আমরা বলি আমাসা, সংস্কৃত নাম আমাতিসার। আমাসা রোগ আমাশয় হইয়াছে। সংস্কৃত নীরাজন শব্দ কি নিরঞ্জন হইয়াছে? নীরাজন শব্দের দুই অর্থ আছে। (১) এক প্রকার আরতি। দুর্গাপ্রতিমার সম্মুখে পঞ্চপ্রদীপ কর্পূর বস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা যে আরতি হয় তাহা নীরাজন। (২) বিজয়া দশমীর প্রাতঃকালে যুদ্ধাস্ত্রের ও অশ্বের পূজা নীরাজন। ইহা এক বৃহৎ ব্যাপার। দেশীয় রাজ্যে অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেদিন দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জন হয়। হয়ত একই দিনের দুই কৃত্য দেখিয়া নীরাজন শব্দের অর্থ বিসর্জন, পরে অপভ্রংশে নিরঞ্জন শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অথবা নীরে জলে অজনম্ ক্ষেপণম্ নীরাজনম্, তাহা হইতে নিরঞ্জন। কিন্তু ইহাতে 'অঞ্জন' পাইতেছি না। বৈয়াকরণিক বলিতে পারেন নীরে জলে অঞ্জনম্ গমনম্ নীরাঞ্জনম্। কিন্তু স্মৃতি গ্রন্থে নিমজ্জন অর্থে নীরাঞ্জন শব্দের প্রয়োগ পাই নাই। বোধ হয় তৃতীয় অর্থের নীরাজন শব্দ ভ্রমক্রমে নিরঞ্জন হইয়াছে।

কলেজের এক ছাত্রের আকাঙ্ক্ষায় আমি এখানে সরস্বতী প্রতিমার লক্ষণ, পূজার দিন ও প্রতিমার আদি চিন্তায় প্রবৃত্ত হইতেছি। এই প্রবন্ধে মহাভারত ও পুরাণ বঙ্গবাসী সংস্করণ বুঝিতে হইবে। কোন কোন পুরাণ-রচনার যে দেশ ও কাল লিখিত হইল, তাহা আমার অনুমান। কোন কোন বিষয় সংক্ষেপে লিখিতে হইল। কাগজের অভাব; সে সে বিষয় অল্প কথায় বুঝাইবার উপায় নাই।

২। সরস্বতীর প্রতিমা

দেবী সরস্বতী এক শক্তি। সকল দেবদেবীই এক এক শক্তি। শক্তি নিরাকার। নিরাকারের আকার-কল্পনা হইতে পারে না। নিষ্ক্রিয় শক্তির সত্তা অনুভূত হয় না। তাহার ধ্যান ও ধারণা আমাদের অগম্য। শক্তি সক্রিয় হইলে আমরা কর্ম দেখিয়া তাহার সত্তা অনুভব করি। বাক্য দ্বারা সে কর্ম বর্ণনা করিতে পারি। সে বর্ণনা শক্তির বাঙ্‌ময়ী মূর্তি। শব্দজ্ঞানহীন চঞ্চলচিত্ত অল্পমতির নিকটে বাঙ্‌ময়ী প্রতিমা পরিস্ফুট হয় না। তাহাদের নিমিত্ত জড়ময়ী মূর্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। মৃত্তিকা শিলা ধাতু দারু ও চিত্র, এই বিবিধ উপায়ে জড়ময়ী মূর্তি রচিত হয়। কথাটা আর কিছু নয়, ভাষা দ্বারা ধারণা করিবে, না চিত্র দ্বারা করিবে? ছাত্রেরা জানে, যখন ভাষায় কুলায় না, চিত্র স্পষ্ট করে। এমন নির্বোধও কেহ নাই যে প্রতিকৃতি সত্য মনে করে।

যে যে করণ দ্বারা কর্ম সম্পাদিত হয়, এক বা অধিক সে সে করণের বিনিবেশ দ্বারা সে কর্ম ব্যঞ্জিত হয়। যেমন, কাহারও হাতে কাগজ কলম দেখিলে বুঝি সে লেখাপড়া করে। কাগজ কলম তাহার লেখাপড়ার চিহ্ন। সরস্বতী বিদ্যা-বুদ্ধি-স্মৃতি-জ্ঞান-শক্তি, প্রতিভা-কল্পনা-শক্তি, সংখ্যা-কর্তৃত্ব-শক্তি। অতএব পুস্তক সরস্বতী প্রতিমার চিহ্ন। অক্ষমালা সংখ্যাকরণের চিহ্ন।

পৌরাণিক দেবদেবী সম্বন্ধে নানাবিধ উপাখ্যান রচনা করিতে পারেন। কাহারও প্রাধান্য বা প্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারেন, কিন্তু প্রতিমা কল্পনায় গুরুপরম্পরা মানিয়া চলিতেন। আর যিনি কল্পনার গুরু, তিনি ধ্যানমন্ত্রে প্রতিমার মূল ভাব রক্ষা করিয়াছিলেন। ধ্যানমন্ত্র, বাঙ্‌ময়ী প্রতিমা। শিল্পী সে মন্ত্রের চাক্ষুষ রূপ নির্মাণ করেন। কালে কালে দেশে দেশে প্রতিমার বেশ ও ভূষণের প্রভেদ হইতে পারে, কিন্তু আভরণ দ্বারা যে মূলভাব ব্যঞ্জিত হয়, তাহার অন্যথা হইতে পারে না। রাম তিন। হাতে ধনুর্বাণ দেখিলে বুঝি, তিনি দশরথ-পুত্র রাম; পরশু দেখিলে বুঝি তিনি জমদগ্নি-পুত্র রাম; লাঙ্গলাকার অস্ত্র দেখিলে বুঝি তিনি বসুদেব-পুত্র রাম। এইরূপ, নারীমূর্তির হস্তে পুস্তক দেখিলে বুঝি তিনি সরস্বতীর প্রতিমা। বীণাহস্তা নারী অপ্সরা হইতে পারে। অপ্সরা জলকেলি করে, পদ্মে বসিতে পারে।

এখন দেখি প্রাচীনেরা সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্রে তাঁহার কি প্রতিমা কল্পনা করিয়াছিলেন। সাড়ে-তিন শত বৎসর পূর্বে রাঢ়ের মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার চণ্ডীকাব্যে সরস্বতী বন্দনায় লিখিয়াছিলেন, 'শ্বেত পদ্মে অধিষ্ঠান, শ্বেত বস্ত্র পরিধান,' 'শিরে শোভে ইন্দুকলা, করে শোভে জপমালা, শুক-শিশু শোভে বাম করে।' তাঁহার আর এক করে পুস্তক। মসীপাত্র ও লেখনী তাঁহার সঙ্গী। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী

বেণুবীণা নানা বাদ্যযন্ত্র নিরন্তর তাঁহার সেবা করে। তিনি বিধিমুখে বেদধ্বনি, বীণাপাণি, বর্ণময়ী, বিষ্ণুমায়া। দেখা যাইতেছে কবিকঙ্কণের সরস্বতী চতুর্ভুজা, দক্ষিণ-করে পুস্তক ও মসীপাত্র, বাম-করে জপমালা ও শুক-শিশু। শুক শিশু লীলাশুক।*

বিষ্ণুমায়া আদ্যা প্রকৃতি। লীলাশুক দ্বারা প্রকৃতির লীলা বুঝাইতেছে। দুর্গা মহামায়া মহাশক্তি, সরস্বতী সে শক্তির একাংশ। শিরে শোভে ইন্দুকলা। বোধ হয় শুক্ল-পঞ্চমীর কলা, সরস্বতী-প্রতিমার মুকুটের লক্ষণ।

কবিকঙ্কণের প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে পঞ্চদশ খ্রীষ্ট শতাব্দের মধ্য ভাগে নবদ্বীপে স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য শারদা-তিলক নামক তন্ত্র হইতে সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। বর্তমান সরস্বতী পূজায় সেই "তরুণ-শকল-মিন্দোর" ইত্যাদি ধ্যানমন্ত্র বঙ্গদেশের সর্বত্র বিদ্যার্থীরা আবৃত্তি করিয়া থাকেন। সরস্বতী শুভ্রকান্তি, শ্বেতপদ্মে আসীনা, করে লেখনী ও পুস্তক, শিরে তরুণ ইন্দু। এখানে সরস্বতী দ্বিভুজা, কিন্তু বীণাহস্তা নহেন। অতএব ধ্যানের সহিত বর্তমান কালের প্রতিমার ঐক্য হইতেছে না। স্মার্ত-মহাশয় ঘটস্থিত জলে বা শালগ্রামে সরস্বতীর পূজা করিতে বলিয়াছেন, প্রতিমায় বলেন নাই। মনে রাখিতে হইবে, তিনিই আমাদের ধর্ম-কর্ম আচার-ব্যবহার শাসন করিতেছেন।

রঘুনন্দনের প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে পশ্চিম-বঙ্গে ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে বৃহদ্ধর্মপুরাণ নামে একখানি উপ-পুরাণ রচিত হইয়াছিল। ইহাতে (২৫।৩৯) সরস্বতী শুক্লবর্ণা ত্রিনেত্রা, শিরে চন্দ্রকলা, হস্তে সুধা বিদ্যা মুদ্রা ও অক্ষমালা।

কালিকা-পুরাণ এক বিখ্যাত উপপুরাণ। আসামে দশম খ্রীষ্ট শতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল। ইহাতে (৭৫ অঃ) সরস্বতী বীণাপুস্তকধারিণী মালাকমণ্ডলুহস্তা। অথবা বরদ-অভয়হস্তা, মালাপুস্তকধারিণী। (কমণ্ডলু সুধাপূর্ণ।)

নবম খ্রীষ্ট শতাব্দে, বোধ হয় মধ্য প্রদেশে, অগ্নিপুরাণ প্রণীত হইয়াছিল। তাহাতে (৫০ অঃ) "পুস্তকাক্ষমালিকা-হস্তা বীণাহস্তা সরস্বতী"। এখানে সরস্বতী চতুর্ভুজা, হস্তে পুস্তক অক্ষমালা ও বীণা। বীরভূম নান্নুরে এইরূপ এক পাষাণ-প্রতিমা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে মৃত্তিকা হইতে আবিষ্কৃত হইয়া বিশালাক্ষী নামে পূজিতা হইতেছেন। (কিন্তু তন্ত্রমতে বিশালাক্ষী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, দ্বিভুজা খড়্গখেটকধারিণী ও শবাসনা।) বিজ্ঞেরা বীরভূম নান্নুরের সরস্বতী-প্রতিমা অষ্টম খ্রীষ্ট শতাব্দের মনে করেন। এইরূপ সরস্বতী-প্রতিমা বঙ্গের অন্যত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

তান্ত্রিক সাধকেরা বাগীশ্বরীর পূজা করিতেন। নানা তন্ত্রে নানা ধ্যান রচনা করিয়াছিলেন। যথা, অগ্নিপুরাণে (৩১৯ অঃ) বাগীশ্বরীর ধ্যানে তিনি চতুর্ভুজা ত্রিলোচনা। এক হস্তে পুস্তক, অন্য হস্তে অক্ষসূত্র, অপর দুই হস্ত বরদ ও অভয়। লিখিত আছে, বাগীশ্বরীর পূজা করিলে লোকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবি এবং কাব্যশাস্ত্রাদিবিৎ হয়। (সংস্কৃত ভাষার ও সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষার কবি।)

বঙ্গদেশের কৃষ্ণানন্দের বৃহৎতন্ত্রসারে বাগীশ্বরীর পাঁচটি ধ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা, (১) রঘুনন্দনোদ্ধৃত শারদা-তিলকের ধ্যান। (২) শুভ্রা কমলাসনা ত্রিনয়না শিরে ইন্দু-কলা, হস্তে ব্যাখ্যা অক্ষসূত্র সুধাকলস ও বিদ্যা। (৩) শুভ্রা হংসারূঢ়া, মস্তকে অর্ধচন্দ্র, হস্তে বীণা অক্ষসূত্র সুধাকলস ও বিদ্যা। (এখানে দ্রষ্টব্য, সরস্বতী হংসারূঢ়া, তাঁহার মস্তকে অর্ধচন্দ্র। এই দুই নূতন কল্পনা অন্য ধ্যানে নাই।) (৪) শুভ্রা, পদ্মাসনা, বাহুতে জপবটী পুস্তক ও পদ্মদ্বয়। (৫) শুভ্রা, শিরে শশিকলা, বাহুতে ব্যাখ্যা পুস্তক বর্ণমালা ও সুধাকলস। বাগীশ্বরীর কোন কোন মন্ত্রে তিনি বহ্নি-বল্লভা। ইহা স্মরণীয়।

পঞ্চম খ্রীষ্ট শতাব্দের অন্তকালে উজ্জয়িনীতে বরাহ-মিহির তাঁহার বৃহৎ-সংহিতায় প্রতিমালক্ষণ লিখিয়াছিলেন। তিনি সরস্বতী-প্রতিমার উল্লেখ করেন নাই।

মৎস্য পুরাণের দুই অধ্যায়ে প্রতিমালক্ষণ আছে। তাহাতে লক্ষ্মীর আছে, সরস্বতীর নাই। মূল মৎস্যপুরাণ বহু প্রাচীন। বোধ হয় মহারাষ্ট্র দেশে প্রণীত হইয়াছিল। ইহার বিস্তৃত প্রতিমা-লক্ষণ চতুর্থ খ্রীষ্ট শতাব্দের মনে করা যাইতে পারে।

মগধে খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দে কৌটিল্য "অর্থশাস্ত্র" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে (২।৪) তিনি পুরমধ্যভাগে দেব-গৃহ নির্মাণ করিতে বলিয়াছেন। শিব, কুবের, অশ্বিনীকুমার, লক্ষ্মী, আরও কয়েকটি অজ্ঞাত দেবের নাম করিয়াছেন। পুরের চতুর্দ্বারে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যম ও কার্তিকের মন্দির করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু সরস্বতীর উল্লেখ করেন নাই।

উপরিউক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয়, (১) ষষ্ঠ কিম্বা সপ্তম খ্রীষ্ট শতাব্দের পরে সরস্বতীর প্রতিমা কল্পিত হইয়াছে। ইহার বহুকাল পূর্বে লক্ষ্মী-প্রতিমা কল্পিত হইয়াছিল। পরে দেখা যাইবে, আদিতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী একই শক্তি বিবেচিত হইতেন। (২) দ্বিভুজা বীণাপাণি সরস্বতী কোন ধ্যানে

---

* লীলাশুক, লীলামৃগ, লীলাকমল প্রসিদ্ধ ছিল। আমি পুরীতে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার সময়ে কোন কোন পাণ্ডার হাতে শুকপক্ষী, কাহারও স্কন্ধে মর্কট-শিশু দেখিয়াছি।

পাওয়া গেল না। সংস্কৃত কোষে সরস্বতীর নাম বীণাপাণি নাই। অতএব মনে হয় চতুর্ভুজাকে দ্বিভুজা করা হইয়াছে। দ্বিভুজা বীণাপাণি সরস্বতী-প্রতিমা গত ১৫০ বৎসরের মধ্যে কল্পিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা গন্ধর্ব-বিদ্যা অভ্যাস করে না। তাহারা কাহার উপাসনা করে?

৩। শ্রীপঞ্চমী

মাঘ শুক্ল পঞ্চমীতে সরস্বতী-পূজা হইয়া থাকে। এই পঞ্চমী শ্রীপঞ্চমী নামে খ্যাত হইয়াছে। কিন্তু "শ্রী" শব্দের অর্থ লক্ষ্মী। অমরকোষে "শ্রী" শব্দের অর্থ লক্ষ্মী আছে, সরস্বতী নাই। অমরকোষ তৃতীয় খ্রীষ্ট শতাব্দে বর্তমান যুক্তপ্রদেশে প্রণীত হইয়াছিল। ইহার বহু পূর্বে মহাভারতে শ্রীপঞ্চমী লক্ষ্মী-পঞ্চমী। এ বিষয় পরে চিন্তা করা যাইবে।

নারী ষট্‌পঞ্চমী ব্রত করিয়া থাকেন। মাঘ শুক্ল পঞ্চমীতে আরম্ভ করিয়া ছয় বৎসর প্রতি মাসে শুক্ল পঞ্চমীতে লক্ষ্মী-মাধবের পূজা করেন। মাঘ শুক্ল পঞ্চমীতেই ছয় বৎসর পূর্ণ হয়। এই ব্রতের ফলে নারী লক্ষ্মীসমা হন। ব্রহ্ম-পুরাণ (৩৩৭ অঃ) বলেন, লক্ষ্মীর কৃপা হইলে সকল সম্পদ্ লাভ হয়, বিদ্যালাভও হয়। লক্ষ্মী ব্রহ্মশ্রী, যজ্ঞশ্রী, ধনশ্রী, যশঃশ্রী, বিদ্যা প্রজ্ঞা সরস্বতী ইত্যাদি চরাচরে যাহা কিছু আছে, সবই লক্ষ্মীর দ্বারা ব্যাপ্ত।

মৎস্যপুরাণে সারস্বতব্রত নামে এক ব্রতের বিধি লিখিত আছে। ত্রয়োদশ মাস শুক্ল ও কৃষ্ণ পঞ্চমীতে সারস্বত ব্রত করিবার বিধি ছিল। সে ব্রত করিলে মধুরবাণী, জন-সৌভাগ্য, স্মৃতি, বিদ্যায় কৌশল, দম্পতির ও বন্ধু জনের অভেদ ও দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ হয়। বীণা-অক্ষমালাধারিণী কমণ্ডলু-পুস্তক-হস্তা গায়ত্রীর অর্চনা করিতে হইবে। সরস্বতীর অষ্ট তনু আছে। যথা, লক্ষ্মী, মেধা, ধরা, পুষ্টি, গৌরী, তুষ্টি, প্রভা, ধৃতি। এখানে সরস্বতীর প্রাধান্য হইয়াছে। সরস্বতী গায়ত্রী ও কৃষ্ণ পঞ্চমীতেও অর্চনীয়া হইয়াছেন। বোধ হয় যে বৎসর এক (চান্দ্র) মাস বৃদ্ধি হয়, সে বৎসর উক্ত ব্রতের বৎসর ছিল। ত্রয়োদশ মাসে ব্রত পূর্ণ হইবার হেতু এই।

কালিকাপুরাণের দুই স্থানে দুই মত আছে। যথা, মাঘ শুক্ল পঞ্চমীতে শিবা (দুর্গা) পূজা করিবে। শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মীপূজা করিবে। (কালিকাপুরাণ এককালে রচিত নয়।)

স্মার্ত রঘুনন্দন "সম্বৎসর প্রদীপ" হইতে তুলিয়াছেন, "পঞ্চম্যাং পূজয়েৎ লক্ষ্মীং মস্যাধারং লেখনীঞ্চ।'" পঞ্চমীতে লক্ষ্মী মস্যাধার আর লেখনীর পূজা করিবে। ["সম্বৎসর প্রদীপ" বঙ্গদেশীয় হলায়ুধ-কৃত একাদশ খ্রীষ্ট শতাব্দের।]

অতএব দেখা যাইতেছে, শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মীপূজাই বিহিত ছিল। কখন কখন লক্ষ্মী ও সরস্বতী একই বিবেচিত হইতেন। পরে দুই শক্তি পৃথক্ ভাবিয়া প্রথমে লক্ষ্মীপূজা করিয়া পরে সরস্বতী পূজা বিহিত হইয়াছে। পাঁজিতেও লিখিত আছে, লক্ষ্মী-সরস্বতী পূজা। কেবল সরস্বতী পূজা নয়।

৪। মাঘশুক্ল পঞ্চমীতে পূজা কেন?

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ, এই তিন, আমাদের ধর্মকৃত্যের নিয়ামক। শ্রুতি—বেদ; স্মৃতি—স্মরণ; পূর্বকালের ধর্ম-কৃত্যের ব্যবস্থা-স্মরণ। পূর্বকালে বৎসরের কোন্ ঋতুতে কোন্ মাসে কোন্ তিথিতে কি কৃত্য ছিল, কি অনুষ্ঠান হইত, তাহার স্মরণ। পূর্বকালে যেমন হইত এখনও তেমন হইবে, স্মৃতিপরম্পরা ভঙ্গ হইবে না। পুরাণে পূর্বকালের ঐতিহ্য লিখিত হইয়াছে। এই হেতু স্মার্তেরা দেবদেবীর পূজা-বিষয়ে পুরাণ আশ্রয় করিয়াছেন।

তাঁহারা দেবদেবীর পূজার দিন নির্দিষ্ট করিয়াছেন। প্রত্যেক অনুষ্ঠানেরই দিন নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। নচেৎ ক্রিয়া-সম্পাদনের সুবিধা হয় না। সমাজের সকলে একই দিনে সে ক্রিয়া করিতে পারে না। এখানে সে কথা নয়। প্রশ্ন এই, অন্য তিথিতে সরস্বতী-পূজা বিহিত হয় নাই কেন? প্রত্যেক পূজার দিন সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হয়।

বেদই হউক, স্মৃতিই হউক, পুরাণই হউক, হেতু বিনা ধর্মকৃত্যের দিন নির্ধারিত হয় নাই। আমরা সে হেতু জানি না। জানি না বটে, কিন্তু বুঝি কেহ স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না। এক বিদ্বান্ বলিলেন, "আজ সারস্বত যজ্ঞ করা হউক," "এস আজ দুর্গাপূজা করি"। সকলে তাঁহার ইচ্ছা মানিবে না, যজ্ঞ করিবে না, পূজা করিবে না। "আজ কি যে সে যজ্ঞ করিব, দুর্গাপূজা করিব?" এই প্রশ্নের সদুত্তর না পাইলে সে সে দিন নির্দিষ্ট হইতে পারিত না। বেদের কালে নয়, পুরাণের কালেও নয়।

অনুধাবন করিলে কতকগুলি দিন-ব্যবস্থার হেতু পাওয়া যায়। সাধারণের নিকট বৎসরের সকল দিন সমান। কিন্তু যাঁহারা শুভ কর্মের নিমিত্ত, উৎসবের নিমিত্ত দিন অন্বেষণ করেন তাঁহাদের নিকট সকল দিন সমান নয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা দুইটি বিশেষ দিন সহজে লক্ষিত হয়। কেহ অমাবস্যা হইতে কেহ পূর্ণিমা হইতে মাস গণনা করিতেন। বৎসরের মধ্যে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ঋতুভেদ সহজে লক্ষিত হয়। ঋতুর আরম্ভ না জানিলে কৃষিকর্ম অসম্ভব। কেহ শীত ঋতু, কেহ বর্ষা ঋতু, কেহ শরৎ, কেহ বসন্ত হইতে বৎসর গণিতেন। এই হেতু বিষুব

দিনদ্বয়, অয়নাদি দিনদ্বয় এবং ঋতুর আরম্ভ দিবস স্মরণীয় হইয়াছিল। বৈদিক কালে সে সে দিন যজ্ঞ হইত, পৌরাণিক কালে দেব-দেবীর পূজা বিহিত হইয়াছে।

কিন্তু বিষুব দিনদ্বয় ও অয়নাদি দিনদ্বয় স্থির থাকে না। মাস স্থির ধরিলে এই এই দিন পিছাইয়া আসিতেছে। আমরা বলি ঋতু পিছাইয়া আসিতেছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে যে মাসের যে দিন উত্তরায়ণ হইত, এখন তাহা পূর্ববর্তী মাসে হইতেছে। ভারতের পূর্বকাল অল্পকাল নয়, দুই তিন সহস্র বৎসরে গণনীয় নয়। তিন চারি পাঁচ ছয় সহস্র বৎসরের স্মৃতি যজ্ঞ ও পূজার দিনে রক্ষিত হইয়াছে। এত দীর্ঘ কালের স্মৃতি আর কোন জাতির নাই। অনেক স্মৃতি লুপ্ত হইয়াছে। অনেক নূতন স্মৃতি আসিয়াছে। কিন্তু নূতন হইলেও পুরাতন।

মহাভারত বনপর্বে (সংস্কৃত মূলে ১২৮ অঃ, কালী-সিংহ-কৃত বঙ্গানুবাদে ১২৭ অঃ) কার্তিকের জন্ম-বৃত্তান্তে শ্রীপঞ্চমী নামের উৎপত্তি বর্ণিত আছে। উপাখ্যান দীর্ঘ ও জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। বর্তমানে আমাদের যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু উদ্ধৃত করিতেছি। অসুরেরা দেবগণকে পরাভূত করিয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবতা এক মহাবল দেব-সেনাপতি আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক অমাবস্যার পর দিন অগ্নির পুত্র কুমার কার্তিকেয় এক শ্বেত-পর্বতের শরবনে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি শুক্ল পঞ্চমীতে মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। দেবগণ ও মহর্ষিগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। মূর্তিমতী শ্রী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তিনি দেবসেনাপতি বৃত হইলেন। "ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে ষষ্ঠী সুখপ্রদা লক্ষ্মী * * * বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই দেবসেনা স্কন্দের (কার্তিকের) মহিষী হইলেন। তিনি পঞ্চমীতে লক্ষ্মীর সহিত সম্মিলিত হইয়া-ছিলেন। এই জন্য ঐ তিথি শ্রীপঞ্চমী এবং ষষ্ঠীতে তাঁহার প্রয়োজন সুসম্পন্ন হইয়াছিল (অসুরগণ যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিল), এই নিমিত্ত ষষ্ঠী মহাতিথি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।"

এইখানে শ্রীপঞ্চমী নামের প্রথম উল্লেখ পাইতেছি। যে শুক্ল পঞ্চমীর সহিত ষষ্ঠী যুক্ত হয়, তাহার নাম শ্রী-পঞ্চমী, অপর নাম লক্ষ্মী-পঞ্চমী।

কিন্তু মহাভারতের উপাখ্যানে এক বিশেষ মাসের শুক্ল পঞ্চমী শ্রীপঞ্চমী নামে লক্ষিত হইয়াছে। কোন্ মাসের অমাবস্যার পরদিন কুমারের জন্ম হইয়াছিল? বেদে যজ্ঞাগ্নিকে কুমার বলা হইয়াছে। দুই অরণি-যোগে অগ্নি জাত হয়। এই হেতু অগ্নির নাম কুমার। কার্তিকেয় কুমার। তাঁহার পিতা অগ্নি। অর্থাৎ এক যজ্ঞ দিনে কুমারের জন্ম হইয়াছিল। ছয় কৃত্তিকা তারা কুমারের ধাত্রী। এই কারণে কুমার ষড়ানন। ধাত্রী ছয় বলিয়া তাঁহারা ষষ্ঠী, নবজাত শিশুর ষষ্ঠ রাত্রিতে (ষেটেরায়) সূতিকা ষষ্ঠী এবং বটবৃক্ষমূলে ষষ্ঠীঠাকুরাণী। এ সব কথা মহাভারতে আছে। সে যাহা হউক, দেখা যাইতেছে কৃত্তিকা তারাপুঞ্জের নিকটে চন্দ্রসূর্যের অমাবস্যা হইলে পরদিন যজ্ঞ হইত। সে অমাবস্যা বৈশাখী অমাবস্যা, অন্য মাসের অমাবস্যা হইতে পারে না। সে অমাবস্যায় বাসন্ত বিষুব পড়িত। এই কারণে যজ্ঞ হইত। বৈশাখ অমাবস্যায় বাসন্ত বিষুব হইলে ছয় মাস গতে ষষ্ঠতিথিতে, সূক্ষ্মগণিতে সাড়ে পাঁচ তিথিতে, শারদ বিষুব হয়। অতএব মহাভারতের শ্রীপঞ্চমী অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পঞ্চমী। আর সে ষষ্ঠী পঞ্জিকাতে গুহষষ্ঠী নামে লিখিত আছে। গুহ কার্তিক। অর্থাৎ শরৎকালে কার্তিক অমাবস্যার পরদিন কার্তিকের জন্ম হইয়াছিল। তখন শ্বেত পর্বতের শরবন পুষ্পিত ও শুভ্র হইয়াছিল। অগ্রহায়ণ শুক্ল পঞ্চমীতে তিনি দেবসেনাপতি হইয়াছিলেন। সেদিন লক্ষ্মীদেবী তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, অর্থাৎ অগ্রহায়ণ শুক্ল পঞ্চমী-ষষ্ঠীতে এক বিশেষ যোগ হইয়াছিল। সে যোগ শারদ বিষুব ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। এই তথ্য উপলক্ষ্য করিয়া কবি রূপক ও উপরূপকের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বহুকাল পূর্বের ঘটনা। যে কালে কৃত্তিকা তারাপুঞ্জের নিকট বাসন্ত বিষুব হইত। যজুর্বেদের কালে (খ্রী-পূ ২৪৫০ অব্দে) এইরূপ হইত। শারদ বিষুব দিন হইতেও সে কাল গণিতে পারা যায়। অগ্রহায়ণ শুক্ল পঞ্চমী-ষষ্ঠীতে শারদ বিষুব হইত। সেদিন সৌর অগ্রহায়ণের পাঁচ ছয় দিন হইতে পারে। এখন সৌর আশ্বিনের সাত দিনে শারদ বিষুব হইতেছে। অর্থাৎ শারদ বিষুব দুই মাস পিছাইয়া আসিয়াছে। দুই মাসে ৪৩০০ বৎসর গত হইয়াছে।

অবশ্য ঘটনাটি মহাভারতে অনেক কাল পরে লিখিত হইয়াছে। তখন ষষ্ঠী লক্ষ্মীর তিথি গণ্য হইয়াছে, এবং ছয় সৌর মাসে ছয় তিথি বৃদ্ধি না ধরিয়া সাড়ে পাঁচ তিথি ধরিবার বিধি হইয়াছে। মাহেশ্বর যুগ নামে এক যুগ গণনা প্রচলিত ছিল।*

* এই যুগের কি নাম ছিল, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। সৌর সিদ্ধান্তে আছে, এক্ষণে বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশ দ্বাপরে (অর্থাৎ ভারত যুদ্ধ বৎসরে) মহেশ্বর ব্রহ্মা হইয়াছেন। বায়ু পুরাণে (৩২ অঃ) চতুর্মুখ

ভারত যুদ্ধের পর হইতে, খ্রী-পূ ১৪৪০ অব্দ হইতে এই যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার পরিমাণ ২৪৭ সায়ন সৌর-বর্ষ ও ১ সৌর মাস। প্রত্যেক যুগ শুক্ল ষষ্ঠীতে অন্ত ও নূতন যুগ শুক্ল সপ্তমীতে আরম্ভ হইত। যুগটি এখন লুপ্ত ও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পাঁজিতে শুক্ল ষষ্ঠী ও শুক্ল সপ্তমীর নাম লিখিত হইতেছে। এই যুগ হইতে শুক্ল সপ্তমী রবির তিথি হইয়াছে। এই যুগ অনুসারে ছয় সৌর মাসে সাড়ে পাঁচ তিথি আসে।

মহাভারতের উপাখ্যানে পাইয়াছি শুক্ল পঞ্চমীর সহিত ষষ্ঠী যুক্ত হইলে শ্রীপঞ্চমী। এই অর্থে প্রতিমাসেই শ্রীপঞ্চমী হয়। কারণ এক সূর্যোদয়কালে পঞ্চমী আরম্ভ হইয়া পর সূর্যোদয়ে পূর্ণ হয় না। অতি কদাচিৎ পঞ্চমী মাত্র একদিনব্যাপী হয়। 'বট্‌পঞ্চমী ব্রতে প্রতি মাসেই লক্ষ্মীপূজা বিহিত হইয়াছে, কিন্তু মাঘ শুক্ল পঞ্চমীতে সে ব্রতের আরম্ভ। ইহারই বা হেতু কি? অর্থাৎ কি কারণে ষষ্ঠী তিথি লক্ষ্মীর তিথি হইয়াছে। ইহার নিমিত্ত বেদের কালে যাইতে হইবে। সে কালে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দিনে যজ্ঞ হইত। উভয় দিনের অন্তর ছয় সৌর মাস। পূর্ব কালে সৌর মাস গণনা ছিল না, চান্দ্র মাস গণনা ছিল। এই কারণে মাস বলিলেই চান্দ্র মাস বুঝায়। আর, দেবদেবীর পূজার দিন চান্দ্র মাসে ও চান্দ্র দিনে (তিথিতে) নির্দিষ্ট হইয়াছে। এক অমাবস্যায় উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে ষষ্ঠ অমাবস্যা গতে ষষ্ঠ তিথিতে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইবে। তখন বর্ষা আরম্ভ, শস্য বপনের কাল। অন্ন লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর আগমনের কাল। এই সম্বন্ধ হেতু বর্ষা ঋতুর প্রথম মাসের শুক্ল ষষ্ঠী লক্ষ্মীর তিথি হইয়াছিল। তদবধি অন্য মাসের শুক্ল ষষ্ঠী লক্ষ্মীর তিথি হইয়াছে। অন্য দিকে এক অমাবস্যায় দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইলে ছয় চান্দ্র মাস গতে ষষ্ঠ তিথিতে উত্তরায়ণাদি হইবে। সেদিন আমরা সরস্বতী পূজা করি। পূর্বে পাইয়াছি, পরে আরও স্পষ্ট হইবে, লক্ষ্মী-সরস্বতী একেরই দুই অংশ। পৃথক্ কল্পনা করিলে দুয়েরই পূজা করা উচিত। অতএব জানিলাম, উত্তরায়ণাদি দিবসে সরস্বতী পূজা বিহিত হইয়াছে। কিন্তু ষষ্ঠীতে না হইয়া পঞ্চমীতে কেন?

এইখানেই প্রশ্নের শেষ হইল না। যদি উত্তরায়ণাদি দিন চাই, শুক্ল প্রতিপদে হইতে পারিত, মাঘ মাস না হইয়া ফাল্গুন মাসে হইতে পারিত। কারণ এককালে ফাল্গুন মাসে উত্তরায়ণাদি হইত। অতএব এক বিশেষ বৎসর লক্ষ্য হইয়া মাঘ শুক্ল পঞ্চমী শ্রীপঞ্চমী হইয়াছে। আমার বোধ হয় এক মাহেশ্বর যুগ এই বিধির আদি। এইরূপ বিধির উদাহরণ আরও আছে। একটা উদাহরণ দিতেছি। মাঘ শুক্ল সপ্তমী এক বিখ্যাত তিথি। রথসপ্তমী ভাস্করসপ্তমী প্রভৃতি ইহার নানা নাম আছে। সেদিন রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার অপেক্ষায় মহাভারতে ভীষ্মদেব শর-শয্যায় শয়ান ছিলেন। শকপূর্ব ৩৫ অব্দে (৪৩।৪৪ খ্রীষ্টাব্দে) এক মাহেশ্বর যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। সে বৎসর মাঘ শুক্ল পঞ্চমী-ষষ্ঠীতে উত্তরায়ণ প্রবৃত্তি হইয়াছিল।

কার্যের কারণ অনুমান সকল স্থলেই দুরূহ। উক্ত অব্দের মাঘ শুক্ল পঞ্চমী কালক্রমে "শ্রীপঞ্চমী" নামে খ্যাত হইয়াছিল, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ নাই। এই অনুমানের পক্ষে দুইটি দুর্বল যুক্তি আছে। (১) মাহেশ্বর যুগানুসারে উক্ত উত্তরায়ণ পঞ্চমী-ষষ্ঠীর প্রায় সন্ধিক্ষণে ঘটিয়াছিল। (২) সে দিন বুধবার। পর দিন গুরুবার ষষ্ঠী। এই বারে লক্ষ্মী-পূজা প্রচলিত আছে। উক্ত তিথির পূর্বাপর যুগের উত্তরায়ণ তিথি দেখিলে সন্দেহ লঘু হয়। যথা,—

খ্রী-পূ	৪৫০ অব্দে	উত্তরায়ণ	মাঘ	শুক্ল সপ্তমী,	রথসপ্তমী
„	২০৫	„	„	„ ষষ্ঠী,	শীতলাষষ্ঠী
খ্রী-পর	৪৩	„	„	„ পঞ্চমী,	শ্রীপঞ্চমী
„	২৯১	„	„	„ চতুর্থী,	গণেশচতুর্থী
„	৫৩৮	„	„	„ তৃতীয়া,	---

তৃতীয়াতে কোন পূজা নাই। বোধ হয় প্রাচীন পুরাণকার সে যুগ দেখেন নাই। সে যাহা হউক, এই আলোচনা হইতে জানিতেছি, অন্ততঃ আড়াই হাজার বৎসর হইতে শ্রীপঞ্চমী প্রসিদ্ধ আছে। ৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে মাঘ শুক্ল-পঞ্চমী "শ্রীপঞ্চমী" নাম পাইয়াছে। সেদিন রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত।

৫। বেদের সরস্বতী

উপরে দেখা গিয়াছে কেহ কেহ লক্ষ্মী ও সরস্বতী অভিন্ন বিবেচনা করিয়াছেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুর্গাও বটেন। কালিকাপুরাণ মাঘ শুক্ল পঞ্চমীতে দুর্গাপূজা করিতে বলিয়াছেন। দেবীপুরাণে (৩৭ অঃ) লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুর্গার নাম। দেবীপুরাণ রাজপুতানায় সপ্তম খ্রীষ্ট শতাব্দে প্রণীত। রঘুনন্দন ব্রহ্মপুরাণ হইতে সরস্বতীর প্রণাম-মন্ত্র তুলিয়াছেন, 'ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ' অর্থাৎ সরস্বতী ও ভদ্রকালী এক। ভদ্রকালী অতসীকুসুম-শ্যামা।

মহেশ্বরের এক মুখে ভীষণ কলি আরম্ভ হইয়াছে। এই দুই বচন মিলাইয়া যুগের নাম মাহেশ্বর মনে হইয়াছে।

খ্রী-পূ ৬৯৯ অব্দে অগ্রহায়ণ শুক্ল সপ্তমীতে এক যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। সে সপ্তমীর নাম মিত্র-সপ্তমী, পূর্বদিনের নাম গুহষষ্ঠী ছিল। কিন্তু সে বৎসর সে ষষ্ঠীতে শারদ বিষুব হয় নাই, তাহার পূর্বমাসে কার্তিক মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে হইয়াছিল। অতএব মহাভারতের উপাখ্যানের সহিত সম্বন্ধ নাই। আরও জানিতেছি, সে উপাখ্যান সে যুগের পূর্বে রচিত হইয়াছিল।

দুর্গার এক রূপ। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই। কারণ ঋগ্‌বেদে বাগ্‌দেবী সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণী। আমরা দুর্গানামে তাঁহার পূজা করি। এখানে ইহার ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয়। এক কথায়, লক্ষ্মী সরস্বতী ও দুর্গা যজ্ঞরূপা। মহাভারতে বনপর্বে সরস্বতী-তার্ক্ষ্যঋষি-সংবাদে (মূলে ১৮৬ অঃ, বঙ্গানুবাদে ১৮৫ অঃ) সরস্বতী বলিতেছেন, "আমার দিব্যরূপ দর্শন ও আমাকে যজ্ঞস্বরূপা বোধ করিলে মুক্তি লাভ করিবে।" ইহার পরে মহাভারতে সরস্বতীর দিব্যরূপ বর্ণিত আছে।

ঋগ্‌বেদে সরস্বতী দুইটি। একটি স্বর্গে অপরটি মর্ত্যে। মর্ত্যের সরস্বতী এক নদী। স্বর্গের সরস্বতী শুভ্রা জ্যোতির্ময়ী নদী। ইনি দিব্য সরস্বতী। সরস্বতী নামের ব্যুৎপত্তি, যাহাতে সরস্ জল আছে। আমরা জ্ঞাত পদার্থের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া অজ্ঞাত পদার্থের নাম করিয়া থাকি। রাত্রে আকাশে তারা-সন্নিবেশ দেখিয়া বলি যেন নৌকা, যেন সর্প, বৃশ্চিক ইত্যাদি। কালে 'যেন' শব্দটি লুপ্ত হয়, নক্ষত্রের নাম নৌকা সর্প বৃশ্চিক ইত্যাদি হয়। ভূতলের সরস্বতী নদীর সাদৃশ্যে স্বর্গের সরস্বতীর নাম হইয়াছে। পুরাণে স্বর্গের সরস্বতীর নাম সুরগঙ্গা, আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী। কালিদাসে ছায়াপথ। ছায়া শব্দের অর্থ দীপ্তি। এক দুগ্ধশুভ্রা দীপ্তিমতী নদী নভোমণ্ডলকে বলয়াকারে বেষ্টন করিয়াছে। বলয়টি উত্তর দক্ষিণে না থাকিয়া ব্রাহ্মণের উপবীত স্কন্ধ হইতে যেমন তির্যক্ লম্বিত থাকে, সেইরূপ তির্যক্ আছে। অবশ্য সমগ্র বলয় এক কালে দেখিতে পাওয়া যায় না। তির্যক্ অবস্থান হেতু নভোমণ্ডলের দৈনিক আবর্তনে বিচিত্র দেখায়। সন্ধ্যার পরে দেখা অপেক্ষা উষার পূর্বে দেখা ভাল। তখন চারিদিক নিস্তব্ধ, বায়ু নির্মল, চিত্ত প্রশান্ত থাকে। কার্তিক মাসের রাত্রি চারিটার সময় আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সুরগঙ্গার এক অর্ধাংশ প্রায় মাথার উপর দেখিতে পাওয়া যায়। ছয় মাস পরে বৈশাখ মাসে অপর অর্ধাংশ। কার্তিক মাসে দেখি মহাকালের (কালপুরুষের) মাথার উপর দিয়া সুরগঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিণে বহিয়া গিয়াছে। মহাকাল গঙ্গাধর হইয়াছেন। এই গঙ্গা শিব-গঙ্গা। তখন যে গগনপট দেখি তাহার গাম্ভীর্য মহিমা ও শোভায় যাহার চিত্ত চমৎকৃত না হয় এমন মানুষ নাই। বৈশাখ মাসের সুরগঙ্গা ছিন্নবিচ্ছিন্ন। ইহাতে মাথার উপরে পাঁচটি তারায় কর্ণসদৃশ শ্রবণা নক্ষত্র, দক্ষিণে বৃশ্চিক। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ কর্ণ স্থানে শ্যেন পক্ষী দেখিতেন। শ্যেন পক্ষী পুরাণের গরুড়, বিষ্ণুর বাহন। এই গঙ্গা বিষ্ণুগঙ্গা। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ দিব্য সরস্বতী দেখিয়া শীত ঋতুর ও বর্ষাঋতুর আগমন নির্ণয় করিতেন। সে কালে পাঁজি ছিল না, নক্ষত্র দেখিয়া ঋতু নির্ণয় করিতে হইত। তাঁহারা শীত ঋতুর আরম্ভে ও বর্ষাঋতুর আরম্ভে যজ্ঞ করিতেন। সে সময়ে দ্যুতিমতী সরস্বতী বিষ্ণুগঙ্গা ও শিবগঙ্গা নিরীক্ষণ করিতেন। তিনি প্রজ্ঞা-স্মৃতি-দায়িনী অন্নধনদায়িনী। এই হেতু পুরাণের সরস্বতী ও লক্ষ্মী একেরই দুই ভাগ। সুরগঙ্গা দুয়েরই প্রতিমা।

রামায়ণে ও পুরাণে ভগীরথ স্বর্গ হইতে সুরগঙ্গাকে মর্ত্যে আনিয়াছিলেন। সগর রাজার ষষ্টি সহস্র পুত্র তাঁহার জলে প্লাবিত হইয়া তারা-রূপে বিদ্যমান আছেন। সুরগঙ্গা দুগ্ধের ন্যায় শুভ্রা। ইহাই ক্ষীরাব্ধি (ক্ষীর—দুগ্ধ, অব্ধি—সাগর)। লক্ষ্মী ক্ষীরাব্ধি-তনয়া। একবার দেবাসুর মিলিত হইয়া দুগ্ধসাগর মন্থন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে শিব-গঙ্গায় লক্ষ্মী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। পুরাণে বিষ্ণু-গঙ্গার দক্ষিণ ভাগের নাম বৈতরণী। সুরগঙ্গা দক্ষিণে পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন, আমরা দেখিতে পাই না।

অতএব লক্ষ্মী সরস্বতী একই। উভয়েই বেদের দিব্য সরস্বতীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যাঁহার কৃপায় ধনসম্পদ্ বিদ্যা-বুদ্ধি মেধাস্মৃতি লাভ হয়। শীতঋতুর আরম্ভে লক্ষ্মী-সরস্বতীর অর্চনা বৈদিক কালের স্মৃতি। আর আশ্বিন পূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা অতি প্রাচীন বৈদিক কালের বর্ষাঋতুর স্মৃতি। সেই দিন চারি দিক্-হস্তী লক্ষ্মীকে স্নান করায়। যখন আশ্বিন মাস বর্ষা ঋতুর প্রথম মাস ছিল তখনকার স্মৃতি। তদবধি বর্ষাঋতু ভাদ্র শ্রাবণ আষাঢ়, তিন মাস পিছাইয়া আসিয়াছে। অন্ততঃ ছয় হাজার বৎসর পূর্বের স্মৃতি।

পুরাণের সরস্বতী-প্রতিমা শুভ্রা। কারণ বৈদিক প্রতিমা দিব্য সরস্বতী শুভ্রা। প্রতিমার সরস্বতী শ্বেতপদ্মাসনা, পদ্ম জলের চিহ্ন। একই কারণে লক্ষ্মী-প্রতিমাও শ্বেতপদ্মাসনা। উভয়েই যজ্ঞরূপা, যজ্ঞাগ্নিরূপা, শক্তিরূপা। অগ্নি বিশ্বভুবনের শক্তির চিহ্ন। দুয়েরই প্রতিমা দুর্গার ন্যায় তপ্তকাঞ্চনবর্ণা করিলে দোষ হইত না। কিন্তু দিব্য সরস্বতীর বর্ণের অনুরোধে সরস্বতী-প্রতিমা শুভ্রা হইয়াছে। সরস্বতী-প্রতিমার হস্তে সুধাকলস, সুরগঙ্গার বারিপূর্ণ। সে প্রজ্ঞাবারি যে পান করে, সে অমর হয়।*

* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়ে বেদের সরস্বতীর আলোচনা সবিস্তরে করা যাইবে। বোধ হয় তিন চারি মাসের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

রবীন্দ্রসংলাপকণিকা

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

"উদ্ভ্রান্ত কবি"

জানিতে পারিলাম গুরুদেবের সঞ্চয়িতা নামে একখানি সংগ্রহ পুস্তক বাহির হইতেছে। বিদ্যাভবন হইতে তাঁহাকে একটু লিখিয়া পাঠাইলাম যে, ব্যাকরণ-অনুসারে সঞ্চয়িতা না লিখিয়া সঞ্চিতা লেখা উচিত, তবে কষ্টকল্পনা করিলে কোন রূপে উহাও চলিতে পারে। মধ্যাহ্নের পর বেণুকুঞ্জে বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময়ে আমার ঐ কাগজখানিতেই গুরুদেব লিখিয়া পাঠাইলেন, "শাস্ত্রী মশায়, কষ্টকল্পনারই আশ্রয় লইতে হইল: কারণ আর কিছুই নয়, প্রায় ৪০ ফর্মা ছাপা হইয়া গিয়াছে। ইতি আপনার উদ্ভ্রান্ত কবি।"

"দুগ্ধপোষ্য"

গ্রীষ্মকাল। উত্তরায়ণে গুরুদেব একা, তাঁহার কাছে রথী ও বৌমা (শ্রীমতী প্রতিমা দেবী) প্রভৃতি কেহই ছিলেন না, স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে উত্তরায়ণে অনেকগুলি গাই ছিল, দুধও হইত প্রচুর। আমি বেণুকুঞ্জে ছিলাম। হঠাৎ গুরুদেবের একটু চিরকুট পাইলাম। লিখিয়াছেন, "শাস্ত্রী মশায়, আমি আপনাকে দুগ্ধপোষ্য করিব।" কথাটা প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু তার পর দেখি সেই দিন হইতে কিছুকাল তিনি প্রতিদিন আমাকে আমার পক্ষে পর্যাপ্ত দুধ পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন।

"আপনি না বলিয়া কী করি ?"

আশ্রমের গোসাঁইজি অর্থাৎ শ্রীযুক্ত নিতাইবিনোদ গোস্বামী তখন সবেমাত্র সেখানে আসিয়াছেন। পালি ভাষার, বিশেষত অভিধর্মপিটকের বিশেষ অনুশীলন করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে আনান হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে সিংহলেও পাঠান হয়। গোস্বামী প্রভুরা প্রায়ই মোহনভোগ ও মালপোর সহিত বিশেষ পরিচয় রাখিয়া শরীরটি বেশ নাদুশ-নুদুশ করিয়া রাখেন। গোসাঁইজিরও শরীর এইরূপই ছিল, তিনি বেশ একটু মোটা-সোটা ছিলেন। যদিও তিনি আশ্রমে ছাত্র হিসাবেই আসিয়াছিলেন এবং বয়সও তখন তেমন বেশী ছিল না, তবুও গুরুদেব আপনি বলিয়াই তাঁহার সহিত দুই-একদিন আলাপ করিয়াছিলেন। এক দিন গুরুদেব আশ্রম হইতে উত্তরায়ণের দিকে যাইতেছেন; গুরুদেব আগে, আমি মাঝে, আর গোসাঁইজি পেছনে। গুরুদেব গোসাঁইজিকে আপনি বলিয়াই কিছু কহিতেছিলেন। তখন গোসাঁইজি বলিলেন,

"আপনি আমাকে আপনি—"

গুরুদেব উত্তর করিলেন "তা কী করি, বাপু, তোমার যে বপুখানি, তাতে আপনি না বলিয়া কী করি !"

আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

বাসকসজ্জা

তখন বিদ্যাভবনের বারাণ্ডায় অপরাহ্ণে অধ্যাপকগণের চা-চক্র বসিত। (পরে ইহা আমি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম।) গুরুদেব সেখানে স্বয়ং চা-পান না করিলেও মাঝে-মাঝে আসিয়া অধ্যাপকগণের সঙ্গে নানা আলাপ-সালাপ করিতেন। আমিও মাঝে মাঝে এইরূপ করিতাম। গুরুদেব যেদিন আসিতেন আমি সেদিন আসিতামই। চা-চাতকগণ* একবার আমার কাছে চা-চক্রের জন্য কিছু আদায় করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে গুরুদেব আমাকে লক্ষ্য করিয়া একটি কবিতা লেখেন। জানিতে পারিয়াছি, বিশ্বভারতী-পত্রিকায় (বাংলা সংস্করণ) ইহা বাহির হইবে।

গুরুদেব এক দিন চা-চক্রে আসিয়া বসিয়াছেন। আমি আসিয়া কাছে বসিলাম। সেদিনকার তাঁহার পোষাকটা আমাকে দেখিতে ভাল লাগে নি। বলিলাম† "গুরুদেব, আমাদের শাস্ত্রে একটা কথা আছে।"

"ব'লে ফেলুন।"

"কথাটা এই যে, 'সতি বিভবে ন জীর্ণমলবদ্বাসাঃ স্যাৎ,' অর্থাৎ বিভব যদি থাকে, তবে জীর্ণ বসনও পরিবে না, মলিন বসনও পরিবে না।"

গুরুদেব একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "আপনি এটাকে জীর্ণ বলিতে পারেন, কিন্তু মলিন বলিতে পারেন না।"

আমি ও বিষয়ে আর কিছু বলিলাম না, আর গুরুদেবও কিছু বলিলেন না। অন্যান্য কথাবার্তা কিছু হইল।

---

* চা-পানকারী অধ্যাপকগণকে গুরুদেব এই নাম দিয়াছিলেন।

† গুরুদেবের পোষাক-পরিচ্ছদের আমি এক সমালোচক ছিলাম। বিশেষ বিশেষ নিমিত্ত উপলক্ষ্যে কীরূপ বা কোন্ পোষাক তিনি করিবেন অনেক সময় আমি তাহা বলিতাম, এবং গুরুদেবও তাহা শুনিয়া আমার মান বাড়াইতেন।

পরদিন আমি বিদ্যাভবনে ছাত্র পড়াইতেছি। সময় একটু বেশী উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিদ্যাভবনে পড়ান-শুনানর সময়ের তেমন ঘড়ি-ঘণ্টা-মিনিটের নিয়ম ছিল না, টোলের মত যতটা আবশ্যক, পূর্ণ করিয়া পড়ান হইত। গুরুদেবের কাছ হইতে সংবাদ আসিল, তিনি আমাকে ডাকিতেছেন। আমি চাকরকে বলিলাম "চল, এই যাইতেছি।" পড়ান তখনো শেষ হয় নি। আমি তাড়াতাড়ি শেষ করিতেছি এমন সময়ে গুরুদেবের আবার তাগিদ আসিল। আমি তখনই যত শীঘ্র সম্ভব মুখ-হাত ধুইয়া তাঁহার কাছে গেলাম। তখন তিনি উত্তরায়ণে উদয়নের উপরের একটি ঘরে রহিয়াছেন। তাঁহার কাছে অনেকে ছিলেন, মেয়েদেরও মধ্যে কেহ-কেহ ছিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আমি গিয়া দেখি গুরুদেব একটা আগা-গোড়া লাল পোষাক পরিয়া রহিয়াছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন "দেখুন তো মশায়, আমি আপনার জন্য সাজিয়া-গুজিয়া বসিয়া আছি। আর আপনি আমাকে একবারে বাসকসজ্জা করিলেন!" সকলেই হাসিয়া উঠিলেন, আমিও কম হাসি নি। কিন্তু তার পরই হইয়াছিলাম নিরুত্তর। পূর্বদিন তাঁহার পোষাক সম্বন্ধে আমি যে মন্তব্য করিয়াছিলাম, পরদিন তিনি তাহারই দিয়াছিলেন উত্তর।

গুরুদেবের জন্ম-তিথির এক উৎসব উপলক্ষ্যে আমি তাঁহাকে দিয়া উত্তরায়ণের উত্তর পশ্চিম সীমানায় পঞ্চবটী (অর্থাৎ, অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, ধাত্রী অর্থাৎ আমলকী, ও অশোক) রোপণ করিয়াছিলাম। ইহা এখন বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে। এই পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠার আমি যে পদ্ধতি করিয়াছিলাম, তদনুসারে তিনি "ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি, ও "ওঁ বিষ্ণু বিষ্ণুরোং তংসদস্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে উহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উহার প্রতিষ্ঠার পর এই উক্তিটি ঘোষণা করা হইয়াছিল—

পান্থানাং চ পশূনাং চ পক্ষিণাং চ হিতেচ্ছয়া।
এষা পঞ্চবটী যত্নাদ্ রবীন্দ্রেণেহ রোপিতা॥

এই শ্লোকটি একখানি প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ করিয়া সেখানে স্থাপন করিবার কথা ছিল। তাহা তখন হইয়া উঠে নি, সংবাদ পাইয়াছি শীঘ্রই ইহা করা হইবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি জন্মতিথি-উৎসবের কথা বলিয়া লই। ইহাতে আমি গুরুদেবকে দিয়া তুলা দান করিয়াছিলাম। তুলাদানে দাঁড়ি-পাল্লার এক দিকে দাতা বসিয়া অপর দিকে নিজের ওজনের সোনা রূপা বা অন্য তৈজস-পাত্র মাপিয়া তাহা উপযুক্ত পাত্রকে দান করেন। গুরুদেবের তুলা দান হইয়াছিল অন্য রকমের। সোনা, রূপা প্রভৃতির পরিবর্তে তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থাবলী মাপ করা হইয়াছিল, এবং এই সমস্ত গ্রন্থ বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তিকে বা প্রতিষ্ঠানে দেওয়া গিয়াছিল এই অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাঁহার কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীর বিচিত্রা গৃহের বারাণ্ডায়।

উল্লিখিত পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠার দিন কোন জামা গায়ে না দিয়া কেবল ধুতি ও চাদর পরিবার জন্য গুরুদেবকে বলিয়াছিলাম, আরো বলিয়াছিলাম, যে, যাঁহারা ওখানে উপস্থিত থাকিবেন তাঁহারাও যেন তাহাই করেন। গুরুদেব ইহা মানিয়া লইয়াছিলেন, এবং অন্যেরাও তাহাই করিয়াছিলেন—যদিও দুই-এক জনের ইহা ভাল লাগে নি। গুরুদেব কোন্ রঙের ধুতী ও চাদর পরিবেন আমি তাহাও বলিয়া দিয়াছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম, তাঁহার যে অনেকটা গৈরিক রঙের গরদের জোড় ছিল তাহাই যেন তিনি পরেন। তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দীর্ঘ মাংসল সুগঠিত দেহ, উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, এবং ধবল-দীর্ঘ কেশ ও শ্মশ্রুতে ঐ গৈরিকাভ বস্ত্র কী সৌন্দর্যই ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারাই বুঝিয়াছিলেন। আমি ঐ দিন উৎসব আরম্ভ হইবার পূর্বেই উত্তরায়ণে গিয়া দেখি, গুরুদেব পূর্বের ব্যবস্থামত কোন জামা গায়ে না দিয়া কেবল গরদের জোড় পরিয়া বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন "দেখুন, সব ঠিক হইয়াছে তো?" আমি বলিলাম "না। কপালে চন্দন দিতে হইবে।" গুরুদেব বৌমাকে ডাকিয়া বলিলেন "বৌমা, শাস্ত্রী মশায় বলিতেছেন, সব হয় নি, এখনো বাকী আছে। কপালে চন্দন দিতে হইবে।" বৌমা আসিয়া আমার সাক্ষাতেই আমার কথামত তাঁহার ললাট চন্দন-চর্চিত করিয়া দিলেন।

মায়াজাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

এ রাত্রির কিন্তু তুলনা নাই। অমাবস্যা-অভিমুখী তিথি; আকাশে মেঘের সঞ্চার দেখা যায়—কিন্তু এই বাড়িখানির কোথাও মুখ লুকাইবার জায়গা অন্ধকার পায় নাই। কয়েকটা পেট্রোম্যাক্স ও গ্যাস পূর্ণ তেজে জ্বলিতেছে। চারি দিকে আলোর বন্যা। বৈশাখের অপরাহ্নে মাঝে মাঝে দুর্যোগ নামে বলিয়াই যা একটু ভয়মিশ্রিত আশঙ্কা সকলের মুখে। বাড়িতে জায়গা আছে প্রচুর, তবু বৈশাখীর ঝড়ে ও জলে সমস্ত আয়োজন পণ্ড করিয়া দিবার শক্তিও যথেষ্ট। কর্মকর্তারা ঘন ঘন আকাশের পানে চাহিতেছেন। দুর্যোগ শুধুই ভ্রূকুটি দেখাইতেছে—সশরীরে দেখা দিবে না নিশ্চয়। বৈঠকখানায় কিংখাবের বিছানায় কিংখাবের ওয়াড়-দেওয়া বালিশ কয়েকটা সাজান আছে। মোমবাতিযুক্ত ফানুসের আলো দুই পাশে জ্বলিতেছে; ফুলদানিতে গোলাপ, বেলা, গন্ধরাজ প্রভৃতি মিশ্র ফুলের তোড়া সাজান। ময়ূরপুচ্ছসমন্বিত দুখানি সুন্দর পাখা বিছানার উপর পড়িয়া আছে। আতরদান ও গোলাব-

পাশের সঙ্গে একগাছি মল্লিকার মোটা মালাও গুছান রহিয়াছে একখানি রূপার রেকাবির উপর। সে ঘরে উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়া ঘরের স্নিগ্ধতা ও রহস্যময়তাকে কেহ নষ্ট করে নাই। ছোট ছেলে-মেয়েদের এখনও বিছানার ধারে ঘেঁষিতে দেওয়া হইতেছে না। গন্ধ ও ফুলের উপর উহাদের লোভ সর্ব্বজনবিদিত। বাতি-দানের ফানুসের উপর বা কিংখাবে মোড়া বালিশের বিছানার উপরও যে লোভ নাই—এমন কথা বলা যায় না। বরাসনে বসিয়া মালা গলায় দিয়া আরসীতে মুখ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা আর একটু বড় কিশোরদের মধ্যে হয়ত আছে। কিন্তু তাহারা আজ ফরসা ধুতি ও গেঞ্জি গায়ে দিয়া বিজ্ঞের মত এধার-ওধার ঘুরিয়া ছোটদের উপর হুকুম চালাইয়া আরসীর সামনে আসিয়া অকারণেই হয়ত বা একবার মুখ হইতে বুক ও পিঠ যতটা দেখা যায়—ভঙ্গি সহকারে দেখিয়া লইতেছে এবং সেই অপূর্ণ সাধকে মিটাইয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

তবু তাহাদের হুঁসিয়ার করিয়া যুবকেরা অভ্যর্থনার কায়দাগুলি বার বার বুঝাইয়া দিতেছে:

বরযাত্রীরা এলে—গোলাপ জলের পিচ্‌কিরি ছুড়বে। গলায় মালা দেবে সকলের—বাড়ি ঢুকবার মুখে। এই থালায় করে পান-সিগারেট দেবে। যে চায়—চা দেবে। তোমরা দুজনে বিলোবে প্রীতি-উপহার, তোমাদের রইল চা-সরবতের ভার, তোমরা দেবে মালা, তোমরা ছিটোবে গোলাপ জল, তোমরা পান-সিগারেট—

অস্থায়ী রন্ধনশালায় উপদেশ চলিতেছে:

কুমড়োর ছক্কাটা নামিয়ে পটোলের দম চাপিয়ে দাও ঠাকুর। খবরদার লুচি এখন ভাজবে না, বরযাত্রীরা বসলে গরম গরম ভেজে দেবে। পারবে না ঠাকুর? মোটে এক-শ জনের জায়গা হয়েছে ছাদে? আচ্ছা—আচ্ছা—কিছু লুচি ত ভেজে রাখ—তারপর দুটো উনুনে—

বারান্দার মধ্যে যেখানে বিবাহ-অনুষ্ঠান হইবে সেখানে পুরোহিতের কণ্ঠস্বরের প্রভাব: একখানা জলচৌকি ক'রে দানসামগ্রী সাজিয়ে রাখতে হয়—এ ব্যবস্থা কি কোথাও দেখ নি? দূর পাগল! নোট কখনও দেয়! থালায় ক'রে টাকা সাজিয়ে সামনে রাখবে। দুব্বো, তুলসীপাতা, ফুল, চেলি, পৈতে সব এই ডান দিকে রাখ। হাঁ—ঘিয়ের প্রদীপ ত জ্বলবেই। ঘট কই? জলপূর্ণ ঘট? কন্যা-সম্প্রদানের সময় উলু দেবে সব জাঁকিয়ে।

ছাঁদনাতলায় বর্ষীয়সীদের নানাকণ্ঠ:—হাঁগো কলার-তেড়গুলো যেন হেলে রয়েছে—আর একটু পুঁতে দাও না। শিলখানা একটু উত্তুর মুখে সরিয়ে দাও। চিতের কাঠি, ধুঁতরোর পিদীম, মাকু সুতো, ছিরি, বরণডালা সব গুছিয়ে রেখ। এক এক এয়ো মাথায় করে—ঘুরবে—আর উলু দেবে। বাঃ, খাসা আলপনা হয়েছে পিঁড়িতে, কে দিলে? পিঁড়ি-বইয়েদের পিঠে গুমাগুম করে জোরে কিল বসিয়ে দিবি কিন্তু। নাপ্‌তে মুখপোড়া ছড়া বলতে পারবে ত শুভদৃষ্টির সময়, না কল্মলিদের বাড়ির মত—

মেয়েকে ঘিরিয়া তরুণীদের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়: তা যাই বল ভাই—বাউটি নারকোল ফুল ওসব সেকেলে গহনা ন। পরানই ভাল। বরফি-কাটা চুড়ি, হাঙ্গরমুখো বালা, অনন্ত, হেলে হার, সিঁথি বেশ মানাবে। পাইজোড় দিতেও পার। গলার চিকও না হয় থাক। ময়ূরকণ্ঠী বেনারসী শাড়ীতে গৌরীকে বেশ মানাচ্ছে ভাই। আজ বুঝি চুল বাঁধতে আছে? এল খোঁপাই থাক। কাজললতা হাতে করে থাকবি গৌরী, খবরদার ভুলে যেন কোথাও ফেলিস নে।

নীচের ঘরে কমলা যোগমায়াকে বুঝাইতেছিলেন, কাঁদিস কেন বউ, এমন আনন্দের দিনে—

যোগমায়া বলিলেন, মার কথা মনে পড়ে ভাই, হৃষীকেশের কথা মনে পড়ে।

আনন্দের দিনে সবাইয়ের কথা মনে পড়ে। তাঁরা স্বর্গে থেকে ওঁদের আশীর্ব্বাদ করবেন ভাই। আর, আয় কি কি গুছোতে হবে দেখিগে।

আরও কয়েকটি বছরের জোয়ার যোগমায়ার দেহের উপর দিয়া বহিয়াছে। নদীর গতি যেমন বক্রগামিনী, তেমনই বক্রগামিনী রূপের গতিতে যোগমায়ার তট-মৃত্তিকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যেখানে ছিল শ্যামল শস্যক্ষেত্র—সেখানে জমিয়াছে ধূসর বালু। যে তটের উচ্চতা ছিল আকাশমুখী—সে তট ভাঙিয়া ঢালু কিনার গড়িয়াছে। চুলে শুভ্রবিন্দু ফুটিয়াছে, গালের চামড়া লোল হইয়া অসংখ্য রেখায় আকীর্ণ হইয়া মুখ-লাবণ্যকে চুরি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রোমহীন ভ্রূ, ঈষৎ ঝুলিয়া-পড়া ওষ্ঠ, বলিরেখাঙ্কিত ললাট—তবু রঙ যেন আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। প্রৌঢ়ত্বের শেষ সোপানে পা রাখিয়া কোন কোন নারী এমনই মহিমান্বিতা হইয়া উঠেন।

অলসগতিতে যোগমায়া উপরের ঘরে উঠিয়া গেলেন। যে ঘরে সঙ্গিনী পরিবৃতা গৌরী বসিয়া আছে—সেই ঘরের খোলা দ্বারপথে একবার উঁকি মারিলেন। সঙ্গিনীরা গৌরীর বেশভূষা প্রায় সমাপ্ত করিয়া দিয়াছে। সেকালের অলঙ্কার গৌরীর গায়ে দেখা যায় না, তবু গৌরীর মাজা-রঙের সুঠাম তনু ঘিরিয়া ময়ূরকণ্ঠী বেনারসী শাড়ী পরাইবার পারিপাট্য যোগমায়ার ভালই লাগিল। এ কালের গহনাগুলিও গৌরীর গায়ে চমৎকার মানাইয়াছে। ফাঁপাইয়া এলো খোঁপা বাঁধিবার সুষ্ঠু রীতি আর কনেচন্দন আঁকা দেহবর্ণের চেয়ে উজ্জ্বল মুখ—নীলসায়রের জলে রূপসৌন্দর্য্যভরা একটি পদ্ম-ফুলের মতই ফুটিয়াছে। কবরীর উপর গোঁজা কাজললতাটি পদ্ম-কোরকের মতই উদ্যত হইয়া আছে। আজকাল বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইতেছে; চতুর্দ্দশী গৌরীর যৌবন-লাবণ্যের সঙ্গে এই সজ্জা ঝলমলে বা আড়ষ্ট বোধ হইতেছে না। মায়ের চোখে নিজের সন্তান সুন্দরই দেখায় চিরকাল, তবু চিরকালের মমতা-মাখা দৃষ্টি না লইয়াও যে কেহ গৌরীকে আজ অসঙ্কোচে সুন্দরীই বলিবে। উপবাসক্লিষ্টা গৌরী—একবারও ক্ষুধার কথা মাকে জানায় নাই। কোন বর্ষীয়সী যদি বলিয়াছেন: যা হোক একটু কাঁচা দুধ বা সন্দেশ খেতে পার। খাবে মা?

গৌরী হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়াছে সে প্রস্তাব। চতুর্দ্দশী মেয়ে—শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে কোন ভীতিজনক সংস্কার তার মনে নাই, সংসারের কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারও সে বুঝিতে পারে, শুধু আজন্ম-পরিচিত এক বাড়ি হইতে সম্পূর্ণ অপরিচিত অন্য এক বাড়ি যাওয়ার উদ্বেগ ও আনন্দ সেই মুখের লজ্জা-কোমল হাসি বা সংক্ষিপ্ত কথার মৃদু স্বরের মধ্যে মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠিতেছে। চারিদিকে যে-সব সঙ্গিনী—হাসি গল্পে গৌরীকে মাতাইয়া রাখিয়াছে—তাহারাও নারীর এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রমের স্বরূপতত্ত্ব বার বার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেছে বুঝি। মেয়ের বিচ্ছেদে যোগমায়ার মনে ব্যথাও যেমন জমিতেছে, মেয়ের হাসি-হাসি মুখ দেখিয়া খুশী মনে ভগবানকে ডাকিতেছেন তেমনই : হে ভগবান, ওদের দু'টিকে সুখী কর, হে ভগবান!

বাহিরে বাদ্যভাণ্ডের তুমুল ধ্বনি উঠিল। বাড়ির প্রত্যেক ব্যক্তিটি ভীষণ ভাবে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কোলাহলে কে কাহার কথা শোনে! বর আসিতেছে। গৌরীর সঙ্গিনীরা ঠেলাঠেলি করিয়া বারান্দা দিয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল। বৈঠকখানার পাশেই দ্বিতলের ওই ঘরের জানালায় গিয়া দাঁড়াইলেই শোভাযাত্রাসমেত বরকে ভালভাবেই দেখা যাইবে। ঘরে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় অনেকে ছাদের উপর উঠিলেন।

কমলা নীচে হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া যোগমায়ার কাছে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, ছাদে চল বউ। লাজের ধামাটা আমি নিয়ে এলাম, সবাইর আঁচলে কিছু কিছু দেব।

তুমুল শঙ্খ ও হুলুধ্বনি এবং প্রবল বেগে লাজবর্ষণের মধ্যে সদর দুয়ারে আসিয়া বর নামিল।

এ-বাড়ির রোশনচৌকির ক্ষীণ সুর ডুবাইয়া কর্ণবিদারী রবে উহাদের ইংরেজী বাজনা বাজিতে লাগিল। রামচন্দ্র আসিয়া বরকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

ছাদের আলিসায় হেলিয়া-পড়া যোগমায়ার চোখের কোণ হইতে—এমন আনন্দের ক্ষণেও—টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল। তাঁহার হৃষীকেশ বাঁচিয়া থাকিলে—এমনটিই হয়ত হইত।

ছাদের উপর হইতে সকলেই নামিয়া গেল, যোগমায়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন শুধু। প্রায়ান্ধকার ছাদ, সিঁড়ির মুখে একটি আর দক্ষিণ কোণে একটি করিয়া গ্যাস জ্বলিতেছে। অবশ্য একটু পরে আরও কয়েকটি বাতি উপরে জ্বলিলে এইটুকু অন্ধকার আর থাকিবে না। এখন নীচের অত্যুগ্র আলোকরশ্মি ছাদের আলিসা স্পর্শ করিয়া আম-কাঁঠাল গাছের পাতাগুলিকে স্নান করাইয়া দিতেছে। নীচেয় কোলাহল ও কলরব জমিয়া উঠিয়াছে। এই বাড়ির চারিপাশেই একটা ঝড় উঠিয়াছে—আনন্দের ঝড়। তবে এই ঝড়ের পরমায়ু খুব বেশী নহে, কাল-বৈশাখীর মতই সে কয়েকটি মুহূর্ত্তকে সচকিত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। মাথার উপর আকাশের এক কোণে খানিকটা মেঘ এখনও লাগিয়া আছে ; ছড়ানো নক্ষত্রের দ্যুতিতে আকাশের বেশীর ভাগেই প্রসন্নতা সুস্পষ্ট। যোগমায়ার মনে হইল—ওই সর্ব্বব্যাপী নীলাম্বরের নির্ব্বাক মহিমার ছটা তাঁহার ললাট স্পর্শ করিতেছে। আকাশের মত বিস্তারও বাড়িতেছে, আকাশের রত্নদ্যুতিতে তিনি দ্যুতিষ্মান এবং ওর প্রসন্নতার ছোঁয়াচ তাঁহার অঙ্গে আসিয়া লাগিতেছে। কাহাকে ঘিরিয়া এই সংসার? এই সুন্দর রচনা কোন্ শুভ প্রভাতে কোন্ কল্যাণ-ময়ীর কোমল করস্পর্শে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল? এই বংশের গৌরব বহিয়া যে অনামী পূর্ব্বপুরুষেরা এক দিন এই ভিটার কোলে উৎসবের মাঙ্গলিক সুরু করিয়াছিলেন—অনন্ত কাল তাঁহাদের হয়ত বা ওই আকাশের রাজ্যে নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে মিশাইয়া দিয়াছে। বস্তু-ভার-নিপীড়িতা পৃথিবীতে বহু বস্তুরই বিলোপ ঘটিতেছে, কিন্তু সমস্ত মণির গ্রন্থন-কার্য্যে যেমন একটি সূত্রেই পরিচয়-লিপির প্রকট—তেমনই এই বংশের ইতিহাস। ইহার পূর্ব্বের ইতিহাস যোগমায়া জানেন না, পরের ইতিহাস রচনার ভার যাঁহাদের হাতে দিয়া যাইবেন—তাঁহারা প্রথা অনুসরণ করিবেন কি রীতি লঙ্ঘন করিবেন সে-সব ভাবিবার অবসর যোগমায়ার নাই, তবু 'রঘু'র সেই এক প্রদীপ হইতে আর এক প্রদীপ জ্বালার মত—কতকগুলি আচার-নিয়মের মধ্য দিয়া এই বংশের ধারাটিকে লালন করিবার নির্দ্দেশ শুধু তিনি দিয়া যাইবেন। প্রথা নহে—সিন্দুকের চাবি। বংশকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এই সিন্দুকের চাবি যুগযুগান্তর ধরিয়া এক হাত হইতে অন্য হাতে ঘুরিতেছে।...এমনই অস্পষ্ট একটা ভাবতরঙ্গ যোগমায়ার মনকে নাড়া দিতে লাগিল। আজ আকাশের নক্ষত্ররাজির পানে চাহিয়া অপরিচিত পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশে নতি ছাড়া তিনি কিছু দিতে পারিলেন না, আশীর্ব্বাদ ছাড়া অন্য প্রার্থনা তাঁহার মনে আসিল না। আজ সমাগত কুটুম্ব-কুটুম্বিনীগণের মান-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সতর্ক চক্ষু ও অনলস কর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন নৈপুণ্যের মূল্য তাঁহার কাছে নাই।

বিবাহ-বাড়ির প্রচণ্ড কোলাহল ও তীব্র আলোর উর্দ্ধে থাকিয়াও তাই মুহূর্ত্তের জন্যই হয়ত তাঁহার মনে হইল, এই সমস্ত তাঁহারই রচনা। ঈশ্বরকে বাদ দিয়া সে রচনা তাঁহার নহে, কিন্তু মানুষকে কাছে টানিবার আয়োজন ঈশ্বরেরই ইঙ্গিতে মানুষকে নিজের হাতে করিতে হয়। কাজের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য সুকর্ত্রী-ত্বের যথেষ্ট মূল্য আছে।

নীচেয় নামিয়া আসিলেন। বিমলের ব্যস্ততার অন্ত নাই। সকাল হইতে আহার করিয়াছে কি না—সে সংবাদ লইবার অবসর যোগমায়ার হয় নাই। নাই বা খাইল, ওর শুক্‌না মুখের পানে চাহিয়া মাতৃস্নেহ উদ্বেল হইয়া উঠিবার মত অবসর আজ যোগমায়ার নাই। উপবাসী স্বামী কর্ত্তব্যের এক বাহুতে প্রসারিত হইয়া এক দিক ধরিয়াছেন, অর্দ্ধভুক্ত বিমল আর এক বাহুরূপে অন্য দিকের কর্ম্মভার সুশৃঙ্খলিত করিতেছে—মাঝখানে হৃদয়রূপিণী যোগমায়া। আজ কেহ কাহারও পানে চাহিলে কর্ত্তব্যত্রুটিতে বংশের অপযশ ঘটিতে পারে। সুতরাং কেহ কাহারও পানে চান নাই। ক্লিষ্ট মুখের হাসির দ্বারা, কর্ম্মোৎ-

ক্ষিপ্ত করের দ্বারা, চঞ্চল পায়ের গতির দ্বারা শুধু নিমন্ত্রিতদের তৃপ্তি বিধান করিতেছেন ; একটির পর একটি কাজ—শরৎকালের পুকুর ভরিয়া পদ্ম-ফোটার ধ্রুব সৌন্দর্য্যের মত—একটির পর একটি কাজ জন্মলাভ করিতেছে।

মা, পাতাগুলো ধুয়ে কোথায় রেখেছে—জান ? হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিমল প্রশ্ন করিল।

ছুটিতে ছুটিতে যোগমায়া বারান্দার কোণে আসিয়া বলিলেন, এই যে।

ভাঁড়ারে কে আছেন ? জিনিসপত্তর সব ঠিকমত বার ক'রে দিতে পারবেন তো ?

হাঁ—হাঁ—তোর মামীমা আর মামাকে ভাঁড়ারে রেখেছি। গলা নামাইয়া বলিলেন, পাড়ার লোকের স্বভাব ত জানি ! শেষকালে অসম্ভ্রমে পড়ব ! রান্নাঘরের পাশে তর্জ্জন ও ক্রন্দনের ধ্বনি শোনা গেল। যোগমায়া সেই দিকে ছুটিলেন।

—কি হ'ল—ঠাকুরঝি ?

—হবে আবার কি ! তোমার আদরের মুকী-ঝি কুটনোর খোসার মধ্যে মাছ নিয়ে পালাচ্ছিলেন। ধরা পড়ে এখন কান্না !

মুকী ওরফে মোক্ষদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমি কি করে জানব মা যে ওর মধ্যে মাছ রয়েছে। বলি জঞ্জালটা ফেলে দিয়ে আসি। যে এ কাজ করেছে সে যেন চোখের মাথা খায়, সে যেন—

চুপ কর্ মুকী, গাল-গালাজ করিস নে। যেই করুক কাজটা অন্যায়। চুরি বিদ্যে কেন ! যার যত ইচ্ছে পেটপুরে খাও না—বারণ ত কেউ করছে না।

মোক্ষদা ক্রন্দন ছাড়িয়া সবিস্তারে আরম্ভ করিল, খাওয়ার কি কমতি কিছু আছে মা ? এই এত মুড়ি—এত মণ্ডা—এত ভাত মাছ ? এত খেয়েও যাদের এই ব্যাভার—তাদের যেন—

যা—গেলাসগুলো ঝুড়ি ক'রে উপরে উঠিয়ে দিগে। আদেশ দিয়া যোগমায়া মেয়েদের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন, এস—মা এস। বউমাকে নিয়ে এলে না যে ? অসুখ ? কি অসুখ ? কৈ—তা ত শুনি নি ! হাঁ—ভাল আছ তো ? রাঙা খুড়িমা, ওপরে যান—গৌরীকে আশীর্ব্বাদ করে আসুন। আরে আমার এ কি ভাগ্যি—তুমি যে বাপের বাড়ি থেকে এসে পড়বে তা ত স্বপ্নেও ভাবি নি। ছেলেরা এসেছে ত ? বেশ, বেশ। ঠাকুরঝি, তুমি ভাই একটি কাজ কর—মিনিনেমন্তন্নয় যে-সব মেয়েরা এসেছে—তারা যেন ফিরে না যায়। তাদের পাতা পেতে পেট ভরে খাইয়ে দিও ভাই। ওদের খাওয়ানোই আসল কাজ। পুরুত-মশাই বুঝি ডাকছেন ! আমি চললাম ভাই।

কর্ম্মের স্রোতে ঈষৎ ভাটা পড়িলে যোগমায়া বাসর-ঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে-ঘরে তখন হারমোনিয়মের সুরে সানুনাসিক গলায় একটি মেয়ে গান ধরিয়াছে। গান না বলিয়া নাকি সুরের ছড়া আবৃত্তি বলিলেই ভাল হয়। সেই গানের যথেষ্ট প্রশংসা ও শেষ হইলে আর একবার গাহিবার জন্য অনুরোধ চলিতেছে। গৌরী এক কোণে আধ-ঘোমটার মধ্যে মুচ্ কি মুচ্ কি হাসিতেছে, জামাই ইহাদের সুর-সঙ্গতের মধ্যে নিতান্ত অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। বেচারার মুখ দেখিলে মায়া হয়। সারারাত্রি যদি এইরূপ গানের প্রস্রবণ বহিতে থাকে —ছেলেমানুষ জামাইয়ের অসুখ করিতে কতক্ষণ ! যোগমায়ার কয়েকবার নিষেধ সত্ত্বেও মেয়েদের উৎসাহ তিলমাত্রও স্তিমিত হয় নাই। জামাই গান জানে না বলিয়া হাত জোড় করিয়াছে, অনেক তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ সহ্য করিয়াও গীত-শক্তির পরিচয় সে দিতে পারে নাই। সেই আক্রোশে বা সুযোগে মেয়েদের গীত-স্পৃহা হয়ত বা প্রবলতর হইয়াছে। বাড়িতে কাহারই বা গান গাহিবার কতটুকু অবসর মিলে ? এমন দুই-একটি বাসর-ঘর না বসিলে—ছেলে-বেলার শেখা সুর-বিদ্যার কি দুর্দ্দশাই না ঘটিত !

দুয়ারে মাঝে মাঝে আসিয়া দাঁড়াইবার এইটিই একমাত্র হেতু নহে। যোগমায়া জানেন, আজিকার নিষেধ নিষ্ফল। জামাইয়ের কষ্ট হইবে—কিন্তু অসুখ না-ও করিতে পারে ; সকলেরই এমন পরীক্ষার সময় আসে। তবু নিষেধ করার অজুহাতে জামাইটিকে মাঝে মাঝে দেখিবার প্রলোভন তিনি দমন করিতে পারিতেছেন না। এ যে বিমল নহে—তাহা তিনি জানেন, কিন্তু পুত্র না হইয়াও পুত্রের স্নেহে এবং আরও কোন অলক্ষ্য প্রসারিত রজ্জুর দ্বারা ও যেন যোগমায়াকে আকর্ষণ করিতেছে—তাহাও তিনি বুঝিতে পারিতেছেন। শ্যামবর্ণের ছিপছিপে ছেলেটির চোখ দু'টি ভারি সুন্দর ; ঘনযুগ্ম ভ্রূ—কোমল মুখে সলজ্জ হাসি—চন্দন-অঙ্কিত সুগঠিত প্রশস্ত ললাট—ঈষৎ কোঁকড়া ও ঈষৎ লম্বা কালো চুল। ঘাড় হেলাইয়া ও যখন গান গাহিবার অক্ষমতা জানায় ও হাত নাড়িয়া ও যখন পান লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে—তখন কি সুন্দরই যে দেখায় ওকে ! যোগমায়ার ইচ্ছা করে—কাছে বসাইয়া একটু গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া ওকে আদর করেন, খানিকক্ষণ ধরিয়া ওর সঙ্গে কথা বলেন। ওর একবার অস্পষ্ট সলজ্জ 'মা' ডাক শুনিয়া সারা শরীর শিহরিয়া উঠিয়াছে যোগ-মায়ার। না, এমন কোমল চেহারা যাহার—তাহার হাতে পড়িয়া গৌরী সুখীই হইবে।

—ওরে অনেক রাত হ'য়েছে, তোরা একটু শুতে দে বাছাকে।

মেয়েরা কলরব করিয়া আপত্তি জানাইল, আঃ জ্যেঠিমা যেন কি ! আমরা কি তোমার জামাইকে খেয়ে ফেলব বাপু। একটা গান শুনিয়ে দিলেই তো পারেন। এত সাধছি—কাঠের মানুষ হ'লেও গেয়ে ফেলে—তা তোমার জামাই বাপু—

হাসিতে হাসিতে যোগমায়া পলাইয়া যান।

রাত্রি আরও গভীর হইয়াছে। আকাশে মেঘ আর এক টুকরাও নাই—উজ্জ্বল নক্ষত্রে সে আকাশ মাথার উপর ঘন নীল দেখাই-তেছে। বাড়ির চারিদিকে আলোর বন্যার টান ধরিয়াছে। অনেক-গুলি গ্যাসই নিবিয়া গিয়াছে কয়েকটা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে

ডেলাইট দুইটাও প্রায় নিবিয়া আসিতেছে। সকলের আহারাদি শেষ হইয়াছে। যে যেখানে পারিয়াছে—চাদর মুড়ি দিয়া বা খালি গায়ে ঘুম দিতেছে। প্রাচীরের ওপিঠে ফেলিয়া-দেওয়া পাতা গ্লাস ও খুরি-মুচির উপর ভোজ্যলোভী সারমেয় দলের বিবাদ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

দ্বিতলের ছাদে উঠিবার সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া যোগমায়া স্তব্ধ প্রকৃতির পানে একবার ফিরিয়া চাহিলেন। সারা দিনের গুরু পরিশ্রম—সুযোগ বুঝিয়া পায়ে ও সারা অঙ্গে ক্লান্তির বোঝা নামাইয়া দিয়াছে; সেই আলস্যের ভারে চোখের পাতা দুইটিও ভারি হইয়া আসিতেছে। ঘরের মধ্যে আজ স্থানাভাব। ছাদেরই এক কোণে না-হয় একটু বিশ্রামের আয়োজন করিতে হইবে।··· আকাশের অনেকগুলি তারাও ম্লান হইয়া ছল ছল করিতেছে, কৃষ্ণা তিথির কলা-ক্ষীণ চাঁদ পশ্চিম আকাশের প্রান্তে ছোট কাস্তের মত দেখা দিয়াছে, তার একটু দূরে জলজলে প্রভাত-তারাটা উঠিয়াছে। রাত প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আধ-নিবন্ত গ্যাসটা হাতে লইয়া যোগমায়া উপরে উঠিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্রও একটা গ্যাস হাতে করিয়া নামিতেছিলেন। মাঝ পথে দুই জনের দেখা। স্তিমিত গ্যাসের আলোয় পরস্পরকে অদ্ভুত দেখাইতেছিল। যোগমায়া গ্যাসটা সিঁড়ির এক প্রান্তে রাখিয়া কহিলেন, এত রাত্তির অবধি ছাদে কি করছিলে? খাওয়া হয়েছে?

রামচন্দ্রও গ্যাসটা নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, এত রাত্রে খাবার ইচ্ছে নেই, একটু শোবার জায়গা খুঁজছি।

যোগমায়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, বাড়ির কর্তা তুমি—না পেলে খেতে—না হ'ল তোমার শোওয়া!

রামচন্দ্র হাসিলেন, বাড়ির গিন্নীর অবস্থাও বিশেষ সুবিধা বলে বোধ হচ্ছে না।

মাথা নাড়িয়া যোগমায়া বলিলেন, যাই হোক, এ সব ব্যবস্থা বাড়ির গিন্নীরই হাতে। দেখি—বউকে তুলে ভাঁড়ারের চাবিটা খুলি। একটু মিষ্টি অন্তত—

রামচন্দ্র আরও দুই ধাপ নামিয়া আসিয়া যোগমায়ার পাশ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলেন ও তাঁহার কাঁধে একখানি হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, চল, এক সঙ্গেই খাওয়া যাক।

—আমার খিদে নেই।

—আমারও তাহ'লে নেই। বলিয়া প্রৌঢ় রামচন্দ্র একবার দ্রুত দৃষ্টিতে আকাশের পানে চাহিয়া যোগমায়ার মুখের উপরে সেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন, আকাশ ফিকে হ'য়ে আসছে—রাত আর নেই। পরে যোগমায়ার কাঁধের উপর সস্নেহ দোলা দিয়া রহস্য করিলেন, আমাদেরই মত ফিকে হয়ে আসছে, মায়া!

—ধোৎ! প্রৌঢ়ার ক্ষণ-লজ্জিত মুখে অরুণ-রাগ ফুটিল। গ্রীবাভঙ্গী করিয়া যোগমায়া হাসিয়া উঠিলেন।

মুগ্ধ রামচন্দ্র যোগমায়ার মুখের কাছে মুখ নামাইয়া অস্ফুট স্বরে এবং হয়ত বা গদ্‌গদ্ স্বরেও বলিলেন, না মায়া, ভুল বলেছি। আমাদের রাত ফিকে হবে না কোন দিন।

আত্মদমন করিয়া যোগমায়া রামচন্দ্রের হাত ধরিয়া উপরে টানিতে টানিতে বলিলেন, এস। রাত পুইয়ে গেলে অনেক কাজ। তোমার সঙ্গে কথা কইবার সময় এর পর অনেক পাব।

পূবের আকাশ যেমন পশ্চিমের আকাশকে শাসন করিতেছে—এই শাসনও অনেকটা সেই প্রকার। তবে পশ্চিমের আকাশের গায়ে পূর্ণ না হউক—কলাক্ষীণ এক টুকরা ঐশ্বর্য্য এখনও লাগিয়া আছে, তাই পূবের আকাশের রক্তময় ভ্রূকুটিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর তাহার নাই। এখনও সে রাত্রির মায়াস্বপ্নে বিভোর।

(ক্রমশঃ)

চাষবাসের কথা

রায় শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর

ভূমিকর্ষণ

আমাদের ও অন্যান্য প্রাণীদের মত গাছপালা, শস্য ইত্যাদি যাবতীয় উদ্ভিদেরও দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি এবং জীবন-ধারণের জন্য নানাবিধ খাদ্যের দরকার হয়। প্রধানতঃ মাটির মধ্যেই উদ্ভিদের সকল প্রকার খাদ্যের উপাদান সঞ্চিত থাকে এবং মাটির মধ্যে শিকড় বিস্তার করিয়া উহার দ্বারাই উদ্ভিদকে এই সকল উপাদান গ্রহণ করিতে হয়; সুতরাং মাটির ভিতরে শিকড় যাহাতে সহজে ও অবাধে শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া উপযুক্ত পরিমাণে উদ্ভিদের এই সকল খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে তাহার জন্য মাটি উত্তম রূপে আলগা করিয়া দেওয়া দরকার। মাটি যতই গভীর ভাবে কর্ষণ করা যাইবে ও আলগা হইবে, শিকড় ততই সহজে মাটির ভিতরে আশেপাশে শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া গাছের খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিবে। এই জন্যই উত্তম রূপে ভূমি কর্ষণের একান্ত আবশ্যক।

ইহা ছাড়া শিকড় যাহাতে গাছকে মাটির সহিত দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া রাখিতে পারে তাহার জন্যও ভূমি কর্ষণের দরকার। প্রবল ঝড়ের সময়ে বড় বড় গাছ কত বেশী নাড়া পাইয়াও সহজে পড়িয়া যায় না, শিকড়ই তাহাদের সবলে ধরিয়া রাখে। যে-গাছকে মাটির সঙ্গে আটকাইয়া রাখিতে যেমন জোরালো শিকড়ের প্রয়োজন, সেই গাছের শিকড়ও সেইরূপ শক্ত মোটা ও বড় হয়। বট, অশ্বত্থ, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছের শিকড়ের তুলনায় পেঁপে, লেবু, বেগুন, মরিচ, লাউ, কুমড়া, ধান, ভুট্টা ইত্যাদি গাছের শিকড় খুব ছোট ও সরু।

মাটিতে গাছের খাদ্যের যে উপাদানগুলি থাকে, তাহা জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া তরল অবস্থায় না থাকিলে শিকড় তাহা গ্রহণ করিতে পারে না; সুতরাং মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে জল থাকা একান্ত আবশ্যক। যে-মাটির কণা যত সূক্ষ্ম তাহার জলধারণের ক্ষমতাও তত বেশী, এবং সেই মাটির কৈশিক আকর্ষণও তত প্রবল, সুতরাং ভূমি কর্ষণের দ্বারা মাটির কণাগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া খুব সূক্ষ্ম করিয়া দিলে গাছ অধিক পরিমাণে জল ও তাহার সহিত খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে।

মাটিতে এক প্রকারের অসংখ্য জীবাণু বিদ্যমান আছে; ঐ জীবাণুগুলি বাতাস হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া মাটিতে সঞ্চয় করে। যবক্ষারজান গাছের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। মাটিতে বায়ু চলাচল যত বেশী হয়, এই জীবাণুগুলি তত বেশী কার্যকরী হইয়া বায়ু হইতে যবক্ষারজান সঞ্চয় করিতে পারে; মাটির কণাগুলি যতই সূক্ষ্ম হইবে উহাতে বায়ুর চলাচল ততই বৃদ্ধি পাইবে। সেই জন্য ভূমি কর্ষণের দ্বারা মাটিকে গুঁড়া ও আলগা করিয়া দিতে হয়।

জমিতে উত্তাপ বিদ্যমান থাকা বিশেষ প্রয়োজন; বীজ হইতে সহজে অঙ্কুর বাহির হইবার জন্য এবং গাছের বৃদ্ধির জন্য উত্তাপের বিশের দরকার। কর্ষণের দ্বারা জমির মাটি আলগা করিয়া দিলে সূর্য্যের উত্তাপ সহজে মাটির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

এমন অনেক প্রকারের কীট-পতঙ্গ আছে, যাহারা গাছের খুবই ক্ষতি করে; ইহাদের মধ্যে অনেক প্রকারের কীট-পতঙ্গ মাটিতেই ডিম পাড়ে, মাটির ভিতরেই বসবাস করে; ভূমি কর্ষণের দ্বারা ঐ সকল কীট-পতঙ্গকে এবং তাহাদের ডিম, বাচ্চা প্রভৃতিকে অনেক পরিমাণে বিনাশ করিতে পারা যায়।

শস্যক্ষেত্রে আগাছা ও ঘাস-জঙ্গল প্রভৃতি জন্মিলে শস্যের খুবই ক্ষতি হয়; কেননা উহারা মাটিতে যে খাদ্যের উপাদানগুলি থাকে তাহা অনেক পরিমাণে গ্রহণ করিয়া শস্যের উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের অভাব ঘটায়। ইহা ছাড়া



(ক) ধানের শিকড় সরু; মাটির মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য মাটি খুব নরম হওয়া দরকার।

(খ) মাটি যতই গভীর ভাবে কর্ষণ করা যাইবে শিকড় ততই সহজে মাটির ভিতরে শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া গাছের খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিবে।

ঘাস, জঙ্গল, আগাছা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জন্মিলে শস্যের উপযুক্ত পরিমাণে আলো ও বাতাস পাওয়ার পক্ষেও বাধা হয়; ভূমি কর্ষণ করিয়া মাটি ওলট-পালট করিয়া দিলে ঘাস, জঙ্গল, আগাছা প্রভৃতি মরিয়া যায় এবং উহারা জমিতে পচিলে মাটির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। জমিতে যে সকল আগাছা জন্মে, ফুল, ফল ধরিবার পূর্ব্বেই জমি কর্ষণ করিয়া উহাদের নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত, তাহা না করিলে উহাদের বীজ মাটিতে পড়িয়া উহা হইতে পুনরায় নূতন আগাছা জন্মিয়া শস্যের অনিষ্ট করে।

বার বার ভূমি কর্ষণের দ্বারা ভারী মাটিকে হাল্কা করিয়া ফেলা যায়; ভারী মাটি অর্থাৎ এঁটেল মাটিকে হাল্কা করিতে হইলে উহার সহিত ভাল করিয়া বালি মিশাইয়া

দিতে হয়। কর্ষণের দ্বারা এইরূপ মিশ্রণ-কার্য্য সহজে সম্পন্ন হয়।

মাটির সহিত গোবর কিম্বা অন্য প্রকার সার মিশাইবার জন্যও ভূমিকর্ষণের প্রয়োজন।

শস্যক্ষেত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না রাখিলে শস্যের ক্ষতি হয়; সেই জন্য মাঝে মাঝে খুরপি কোদাল প্রভৃতি হস্ত-চালিত কৃষি-যন্ত্রাদির দ্বারা শস্যক্ষেত্রের আগাছা নষ্ট করিয়া দিতে হয়। ইহার দ্বারা কেবল যে আগাছা নষ্ট হয় তাহা নহে, মাটি ঐরূপ ভাবে আলগা করিয়া দিলে মাটির মধ্যে সঞ্চিত রস সূর্য্যের তাপে বাষ্প হইয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে না। বর্ষাকালে দুই-চারি দিন রৌদ্র পাইলে জমি যখন শুকাইয়া যায় ও উহার মাটি আলগা করিবার উপযুক্ত হয়, তখনই মাটি আলগা করিয়া দেওয়া দরকার, তাহা না করিয়া দিলে মাটির রসের অপচয় হয়। বর্ষা শেষ হইয়া যাইবার পর যে সকল জমিতে শস্য থাকে না, সেই সকল জমিও ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আলগা করিয়া দিতে হয়। শস্যক্ষেত্রের এই সকল কাজকেও ভূমিকর্ষণ বলে।

বিভিন্ন প্রকার শস্যের জন্য গভীর ও অগভীর চাষ করিতে হয়। যে সকল শস্যের শিকড় মাটির অনেক নীচে প্রবেশ করে, সেই সকল শস্যের জন্য গভীর চাষের প্রয়োজন। আবার যে সকল শস্যের শিকড় মাটির নীচে বেশী দূর যায় না, তাহাদের জন্য গভীর চাষের প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ শীতকালে বা গ্রীষ্মকালে যে সকল শস্যের চাষ করা হয়, তাহাদের পক্ষে গভীর চাষ অনেক সময় উপকারী। কারণ তাহা দ্বারা ঐ সকল শস্য মাটির নীচের সঞ্চিত রস অনায়াসেই পাইতে পারে। বর্ষাকালের ফসলের জন্য গভীর চাষের তত প্রয়োজন হয় না। কারণ তখন জমির উপরের স্তরেই প্রচুর পরিমাণে রস থাকে। কাদা-মাটিও গভীর ভাবে চাষ করিবার প্রয়োজন হয় না। যে সকল ক্ষেত্রে পলিমাটি পড়ে, তাহাতেও গভীর চাষের আবশ্যক নাই।

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সাধারণতঃ সমতল ভূমিতে শস্য বপনের জন্য ভূমি কর্ষণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু পার্ব্বত্য অঞ্চলের পাহাড়-পর্ব্বতের উপরেও অনেক রকম শস্য জন্মান হয়। ঐ সকল পাহাড়-পর্ব্বতের উপর স্থানে স্থানে শাবলের মত তীক্ষ্ণ যন্ত্রের সাহায্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ঐ গর্ত্তের ভিতরে দুই-তিন রকমের শস্যের বীজ একই সঙ্গে রোপণ করা হয়। এইরূপ ভাবে শস্য উৎপাদন করাকে "ঝুম" কৃষি বলে। ইহাও ভূমিকর্ষণের অন্তর্গত।

হর্নিম্যান মিউজিয়মে ভারতীয় জনশিল্প

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়, এম-এ (লণ্ডন), এফ-আর-এ-আই (লণ্ডন)

ভারতবর্ষের আদিম ও পল্লীশিল্প ইংলণ্ডের বিখ্যাত হর্নিম্যান মিউজিয়মে কি ভাবে সংরক্ষিত হয়েছে তা বিস্ময়কর। এই হর্নিম্যান মিউজিয়মটি লণ্ডন শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের আদিম ও পল্লীশিল্প এই মিউ-জিয়মে স্থান পেয়েছে। এই দিক থেকে হর্নিম্যান মিউ-জিয়মটি মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতির ইতিহাস সংরক্ষণে এক অপূর্ব্ব সার্থকতা লাভ করেছে।

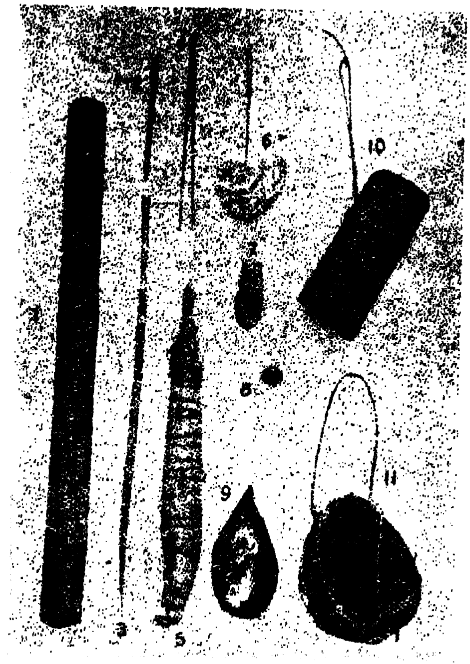
ইংলণ্ডের বিখ্যাত যাদুঘরগুলির মধ্যে হর্নিম্যান যাদুঘরটি অন্যতম। ইহার গোড়াপত্তনের ইতিহাস যাদুঘরটির সম্মুখ ভাগের দেওয়ালে একটি প্রস্তরখণ্ডে এই ভাবে লেখা আছে:

Founded in 1890, by Frederick John Horniman, Esq., M.P., F.R.G.S., F.L.S., rebuilt in 1900; and, in 1901, presented by him, with the adjoining Horniman-gardens, to the London County Council, as Free Gift to the People, for ever.

সত্যই, এই মিউজিয়মটি পরিদর্শনকালে মনে হয় যেন এর প্রত্যেকটি কক্ষ, প্রত্যেকটি গ্যালারি, প্রত্যেকটি রক্ষিত সামগ্রীর সঙ্গে দাতার মহানুভবতা এবং মানবতার ছাপ আজও বিদ্যমান রয়েছে।

যাদুঘরটি বিশেষ ভাবে দুইটি ভাগে বিভক্ত (১) জাতিতত্ত্ব-বিষয়ক, (২) প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক, এবং এই বিভাগেই ভারতীয় আদিম ও পল্লীশিল্পের সংগ্রহ আছে।

ভারতীয় আদিম ও লোকশিল্পের এই অপূর্ব্ব সংগ্রহ সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে বিশ্ব-শিল্প-দরবারে পল্লী কিংবা আদিম শিল্পের কি স্থান সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা দরকার। সম্প্রতি পৃথিবীর সভ্য সমাজে বিখ্যাত শিল্পী ও শিল্পরসিকবৃন্দ নানা জাতির পল্লী ও আদিম শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। এর ফলে পৃথিবীব্যাপী পল্লী কিংবা আদিম সঙ্গীত, নৃত্য এবং শিল্প সংরক্ষণের এবং উহার পুনঃপ্রচলনের এক বিরাট আন্দোলন গড়ে উঠেছে। আজ মনীষীদের মনে এই প্রশ্ন জেগেছে যে, একটা জাতির



হর্নিম্যান যাদুঘরে আন্দামানের কয়েকটি আদিম শিল্প

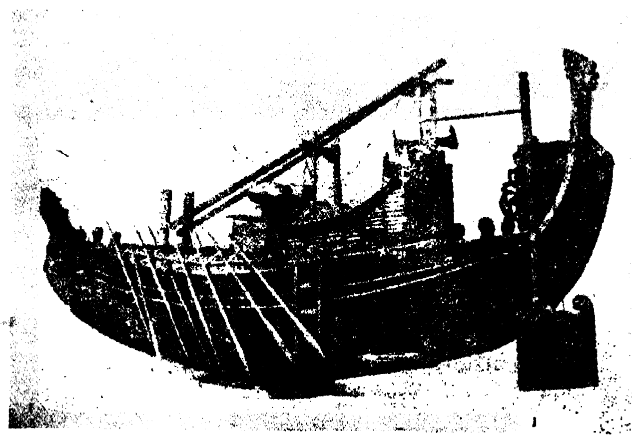
জীবনের ভাবধারা ও সংস্কৃতির মূলে পল্লী-সম্পদের মূল্য ও স্থান সেই জাতির তথাকথিত উচ্চাঙ্গ শিল্পের চেয়ে ঢের বেশী বড়। প্রাচীনের উচ্চাঙ্গ শিল্প যা সাধারণতঃ চারুশিল্প নামে পরিচিত এবং বর্ত্তমানে যাকে আমরা সহজ কথায় বলি শহুরে সংস্কৃতি, তার সঙ্গে কোন জাতির প্রাণের গভীর সংযোগ নেই। কিন্তু পল্লীশিল্প এবং আদিম শিল্পধারা যা পুরুষানুক্রমে অবিচ্ছিন্নভাবে যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ নরনারীর ভিতর প্রবাহিত হয়ে আসছে, তার সঙ্গে সমগ্র জাতির প্রাণের এক অবিচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে। এই সহজ, অনাড়ম্বর শিল্পধারার সঙ্গে যদি আমরা ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত না হই, তবে আমাদের সংস্কৃতির মূল উৎস চিরদিন রহস্যাবৃত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। তাই ইউরোপের বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদুঘরগুলি আদিম ও পল্লী-শিল্প সংরক্ষণের প্রতি অত্যধিকভাবে মনোযোগী হয়ে উঠেছেন এবং লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত এই হর্নিম্যান যাদুঘরটি এত দিনের সার্থক প্রচেষ্টায় বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

এই যাদুঘরে ভারতীয় নানা প্রদেশের, এমন কি সিংহল এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের, নানা বিষয়ের যে-সব শিল্প সংরক্ষিত হয়েছে তার মধ্যে বিভিন্ন মৃৎশিল্প, বাঁশ এবং বেতের কাজ, শীতলপাটি, সূচীশিল্প, বয়নশিল্প, সঙ্গীত-যন্ত্র, যানবাহন, অলঙ্কার, খেলনা ও পুতুল, কাঠের কাজ, দড়ির কাজ এবং পটশিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সংগ্রহগুলি দুইটি আলমারীতে রাখা হয়েছে। এই সংগ্রহগুলির মধ্যে আন্দামানবাসীদের তীর-ধনুক, ঢাল-বর্শা, মাছ ধরবার জাল ও নৌকা, এবং নৌকার বিভিন্ন দাঁড়ও বটে, বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি ও বাক্স, মেয়েদের অলঙ্কার, গাছের লতাপাতা দিয়ে তৈরি নানারূপ দড়ি, জলের ঘড়া এবং মাটির বাসন, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি ধাতুশিল্প সুন্দর ভাবে পর পর সাজিয়ে রাখা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি জিনিসের নীচে তার ব্যাখ্যা করা আছে।

আন্দামান শিল্প-বিভাগের পরেই বিভিন্ন যানবাহনাদির সংগ্রহ বিভাগ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের যত রকম গরুর গাড়ী, টানাগাড়ী, পাল্কী, নৌকা প্রভৃতি সব সময় দেখতে পাওয়া যায় তার সম্পূর্ণ সংগ্রহ এখানে রয়েছে। বিশেষভাবে গঙ্গার ওপর যে-সব বাদাম নৌকা, বাইচের নৌকা দেখতে পাওয়া যায়, তার একটা সুন্দর সংগ্রহ এখানে আছে। যানবাহনাদির সংগ্রহের পরেই মৃৎশিল্প এবং বাঁশ ও বেতের বিখ্যাত সংগ্রহ বিভাগ। এই বিভাগে আমাদের দেশের যত রকম মাটির কলস, ঘট এবং বাসন-পত্রাদি তৈরি করা হয় তার একটা সংগ্রহ রাখা হয়েছে। বেত এবং বাঁশের কাজের ঝুড়ি, ফুলের ঝাঁপি, লক্ষ্মীসরা ধান-মাপার পাত্র প্রভৃতিও সংরক্ষিত হয়েছে। সমস্ত জিনিসই প্রায় রঙীন, মাঝে মাঝে লতাপাতা, ফুল, জন্তু, মানুষের কিংবা দেবদেবীর মূর্ত্তি আঁকা। সমস্ত বিভাগের সঙ্গেই সংগ্রহগুলির সাধারণ একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখা আছে এবং আমাদের দেশের কিংবা অন্য দেশের মেয়ে-ছেলেরা এই সব জিনিস কি ভাবে তৈরি করে, দৈনন্দিন জীবনে এগুলি কি ভাবে ব্যবহৃত হয়, তার ফটোগ্রাফ প্রতি বিভাগে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে।

সব চেয়ে আশ্চর্য্য হতে হয় হর্নিম্যান যাদুঘরে রক্ষিত আমাদের দেশের তাঁতশিল্প দেখে। কি করে আমাদের দেশের লোকেরা সুতা কাটে ও শক্ত ক'রে টানা দেয় এবং পরে কি ক'রে বোনে তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সঙ্গে আছে তার ব্যাখ্যা এবং এই ইতিহাসের ফটোগ্রাফ। এই ভাবে হর্নিম্যান যাদু-ঘরে শুধু আমাদের দেশেরই সংগ্রহ নেই, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের—বিশেষভাবে অষ্ট্রেলিয়া, নিউগিনি, মালয় উপদ্বীপ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, জাপান, চীন, আফ্রিকা এবং

দক্ষিণ-আমেরিকা ও উত্তর মেরুর পল্লীশিল্পের এক বিরাট্ সংগ্রহ করা হয়েছে। এর ফলে দর্শকদের এই সুবিধে হয়েছে যে পৃথিবীর বিভিন্ন সংগ্রহগুলির একটা তুলনামূলক সমালোচনা নিজেরা অনায়াসেই করতে পারেন। আমাদের জানা উচিত যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র, সর্ব্বসময়ে আদিম ও পল্লীশিল্প প্রায় একই ধারায় প্রকাশ পেয়েছে। তাই এই যাদুঘরের সংগৃহীত দ্রব্যগুলির ব্যাখ্যা যদি মুছে ফেলা যায় তবে বোঝা খুবই মুশকিল কোন্ দেশ থেকে কোন্ জিনিসটা এসেছে। যেমন ধরুন বাংলা দেশ থেকে সংগৃহীত পোড়ামাটির যে পুতুল এই মিউজিয়মে রক্ষিত আছে তাকে যদি দক্ষিণ--আমেরিকা থেকে সংগৃহীত পুতুলের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া যায়, তবে চেনা কঠিন হয়ে পড়বে।



ব্রহ্মদেশের মালবাহী নৌকা

আদিম ও লোকশিল্পের ভাষা তাই পৃথিবীর সর্ব্বত্র এক এবং এই গুণের জন্যেই আজ পৃথিবীর বিখ্যাত মনীষীরা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন এই অনাদৃত, অখ্যাত শিল্পধারাকে আবিষ্কার করতে এবং বাঁচিয়ে রাখতে। বিশ্বমানবের সংস্কৃতির ইতিহাসে এই শিল্পপ্রতিভা অদূর ভবিষ্যতে যে এক লুপ্ত অধ্যায় আবিষ্কার করবে সে বিষয়ে আজ সমস্ত বিদ্বৎসমাজ এক মত। অথচ দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে শহুরে সভ্যতার প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই অপূর্ব্ব শিল্প-ধারার চাহিদা ও গুণগ্রাহিতা লুপ্ত হতে চলেছে। বর্ত্তমানে আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজ কৃত্রিমতার পূজারী, তাই পল্লীর এই সংস্কৃতি প্রহেলিকাময় আবর্ত্তনের চাপে পড়ে ধ্বংসের মুখে চলেছে। সাত-সমুদ্র-তের-নদীর পারে আমাদের দেশের এই অপূর্ব্ব পল্লী-শিল্প—যাকে আমরা এত দিন হেয় বলে মনে করেছি, তা কি ভাবে হর্নিম্যান মিউজিয়মে রক্ষিত হয়েছে এবং কি ভাবে বিশ্বের লোকেরা তার রসাস্বাদন করছেন, তা দেখে আমাদের একটা বড় শিক্ষা হওয়া উচিত।

জীবন নৃত্যের মত হোক ছন্দোময়

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

পুঁথির পাতায় শুধু সৌন্দর্য্য অর্চ্চনা
শেষ হোক্! সুন্দরের নিত্য আরাধনা—
জীবনে আরম্ভ হোক তপশ্চর্য্যা দিয়ে।
অস্তিত্ব পুষ্পিত হোক বর্ণগন্ধ নিয়ে
তোমার চরণপ্রান্তে যেন শতদল—
অন্তরে প্রেমের মধু করে টলমল!
জীবন নৃত্যের মত হোক্ ছন্দোময়,
বাজুক বাঁশরী সম! সুন্দরের জয়
দিয়ে করো জীবনের অন্তিম-নিমেষে।
যেদিন চলিয়া যাব অজানার দেশে—
রেখে যাব, হে দেবতা, তোমার চরণে—
আমার জীবন-পদ্ম—সমস্ত জীবনে
ফুটায়ে তুলেছি যারে বহু তপস্যায়
সিক্ত করি মোর মর্ম্ম শোণিতধারায়।

আনন্দমোহন বসু

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে কোন কোন পুস্তক পাঠ করিয়া এমন কয়েক জন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিলাম যাঁহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে এ জীবনে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে আনন্দমোহন বসু মহাশয় একজন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর প্রামাণ্য গ্রন্থে আনন্দমোহনের কীর্ত্তি-কলাপের কথা আগ্রহ-সহকারে পাঠ করিয়াছি। গত শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকের কয়েকখানি সাময়িক-পত্র সম্প্রতি দেখিবার সুবিধা হইয়াছে। ইহা হইতে বিলাতে ছাত্ররূপে এবং ভারতে প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরে ছাত্র-বন্ধুরূপে আনন্দমোহনের কার্য্যকলাপের কথা কিছু কিছু জানা যাইতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সবের নিরিখে তাঁহার এ সময়কার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আনন্দমোহনের জীবন, কর্ম্ম, চরিত্র, ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে যাঁহারা ব্যাপকভাবে গবেষণা ও পুস্তকাদি লিখিতে চান তাঁহাদের পক্ষে এই উদ্ধৃতিগুলি বিশেষ মূল্যবান্।

১২৭৬ সালের ৫ই ফাল্গুন তারিখে আনন্দমোহন বসু উচ্চশিক্ষা লাভার্থ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহিত বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত পৌঁছিয়া আনন্দমোহন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্ট কলেজে ভর্ত্তি হইলেন এবং মাত্র দুই মাস অধ্যয়নের পর গণিতশাস্ত্রের পরীক্ষায় সকল ছাত্রের মধ্যে প্রথম হইলেন। ১২৭৭ শ্রাবণ সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা' এই সম্পর্কে লেখেন,—

> নূতন সংবাদ। বাঙ্গালিরা ইংরেজদিগের অপেক্ষা বুদ্ধিতে নিকৃষ্ট নহেন। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত নামক দুইটী যুবক সিবিল পরীক্ষায় ইংরেজ ছাত্রদিগকে হারাইয়া প্রথম ও দ্বিতীয় পদ লাভ করিয়াছেন। আমাদিগের বন্ধু বাবু আনন্দমোহন বসু দেড় মাস মাত্র বিলাত গিয়া অঙ্ক পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদবাবু কেশবচন্দ্র সেন ইংরেজীতে অনেকগুলি মনোহর বক্তৃতা করিয়া ইংলণ্ডবাসীদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছেন।

উক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়া ইংরেজী ১৮৭১, ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' আরও বিশদ-ভাবে লিখিলেন,—

> বাবু আনন্দমোহন বসু দুই মাস কাল কেম্ব্রিজ কালেজে প্রবেশ করিয়াই অঙ্ক শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রধান হয়েন ও পাঁচশত টাকার স্কলারশিপ পান। কালেজের শেষ পরীক্ষায় তিনি লাটিন গ্রীক ও অঙ্ক শাস্ত্রে সকলের উপর হইয়াছেন। আনন্দমোহন বাবুর বয়স চব্বিশ বৎসর মাত্র। ইহার মধ্যে তিনি কেবল ছাত্র-বৃত্তি দ্বারা তের হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন।

২

বিলাত-প্রবাস কালে অধ্যয়নই আনন্দমোহনের প্রধান কার্য্য ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতের কল্যাণকর কোন কোন অনুষ্ঠানেও নিজ কর্ত্তব্যবোধে তিনি যোগ দিয়াছিলেন। বক্তৃতাদির দ্বারা ভারতবর্ষের সত্যকার অবস্থা তথাকার অধিবাসীদের নিকট ব্যক্ত করিতে তিনি বিরত হন নাই, কারণ স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর হিতসাধনই ছিল তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্রাইটনের এক জনসভায় তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন সে সম্বন্ধে ১৮৭৩, ১৩ই মার্চ্চ হোয়াইট নামক একজন পার্লামেণ্ট-সদস্যের মন্তব্য সমেত 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এইরূপ প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, 'অমৃত বাজার পত্রিকা' তখন দ্বিভাষী সাপ্তাহিক ছিল,—

> "The Brighton Meeting.—Mr. Bose who is no other than our dear friend Babu Ananda Mohan Bose made a brilliant speech of which another speaker Mr. White, M.P., said, "Never in his life had he listened to a more eloquent description of the wrongs of India. Cognizant as he was with the highest flights of oratory, with the greatest efforts of genius in the House of Commons and the House of Lords, he was truly struck with tre wonderful eloquence, the thorough power of language, the admirable description and grasp of the subject and the nobleness of intellect displayed by Mr. Bose."

আনন্দমোহন তখনও কেম্ব্রিজে অধ্যয়নরত ছাত্র, তাঁহার বয়স তখন মাত্র ছাব্বিশ বৎসর। প্রবাসে বিদেশীয় ভাষায় এমন চমৎকার বক্তৃতা দিয়া তিনি যে উপস্থিত জনগণকে বিমোহিত করিতে পারিয়াছিলেন তাহা বড়ই গৌরবের কথা। পার্লামেণ্ট-সদস্য মিঃ হোয়াইট, যিনি হাউস অফ্ কমন্স ও হাউস অফ্ লর্ডস উভয় সভায় শ্রেষ্ঠ বক্তাদের বক্তৃতার সঙ্গে পরিচিত, তিনিও আনন্দমোহনের ভারতবর্ষের দুর্দ্দশাসম্পর্কীয় এই বক্তৃতার বর্ণনাশৈলীতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

ব্রাইটন ব্যতীত লণ্ডন ও কেম্ব্রিজেও ভারতের হিতার্থে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতে আনন্দমোহন বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইহার একটি বক্তৃতা সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান অবজার্ভার'

পত্রের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন যে, "বর্ণ এবং স্বরের কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে আর কেহ বুঝিতে পারিতেন না যে, এই যুবকের জন্মস্থান ইংলণ্ডে নহে,···।"*

তখন সামাজিক মিলন ও রাজনীতি-বিষয়ক আলাপ-আলোচনার জন্য বিলাতে প্রবাসী ভারতীয়দের একাধিক সভা ছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির সভাপতি ছিলেন দাদাভাই নৌরোজী। আনন্দমোহন এইরূপ আর একটি সভা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়াছিলেন।—

১৮৭২ অব্দে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসুর প্রধান উদ্যোগে এবং আরও কতিপয় ব্যক্তির সাহায্যে ইণ্ডিয়ান সোসাইটী নামে লণ্ডনে আর একটী সভা সংস্থাপিত হয়। ভারতবর্ষের নানা স্থানের যে সকল লোক বিলাতে অবস্থিতি করিতেন, তাঁহাদিগের পরস্পর একতাসূত্রে বদ্ধ করা এবং এই একতাজনিত জাতীয় কল্যাণের ভাবী সূত্রপাত করা এই সভার উদ্দেশ্য। এই সভা কতক সামাজিক ও কতক রাজনৈতিক গঠনে নির্ম্মিত।†

৩

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে আনন্দমোহন কেম্ব্রিজের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া র‍্যাংলার হইলেন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম র‍্যাংলার। এই সংবাদ ভারতবর্ষে পৌঁছিলে সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রশংসা হইতে থাকে। ১৮৭৪, ২৬এ ফেব্রুয়ারি 'অমৃত বাজার পত্রিকা' এই শুভ সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দমোহনকে অধ্যয়ন-কালে কিরূপ অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য নিম্নের পত্রাংশও উদ্ধৃত করিলেন। পত্রখানি সম্ভবতঃ পত্রিকা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়কে লিখিত।—

"The result of our examination is just out this morning Out of 106 who have passed the Mathematical Honours Examination, 49 have come out as Wranglers and I stand 16th among them. I am satisfied with my place in the list and I hope you will be so too. In fact after the little work I had been able to do during the last term, and the time I had previously lost I expected a much lower position. If I had only a little more time to give to my revision, this would have I find carried me a good many places higher; and as the result of my Cambridge experience, I can say that I am perfectly satisfied. Our countrymen properly selected, and entering Cambridge with a previous preparation and a full knowledge of the system of working here can expect to take the highest places in Tripos. I hope I will someday be able to illustrate this practically by sending some of our young friends who will not suffer from the same causes as I have done. I cannot tell you how much time and how many advantages I lost by having to get up two new languages I mean Latin and Greek, and which I should have read a little before entering the University; by my giving up all reading for the mathematical Tripos during the greater part of a year and from a few other causes of interruption on my time and study. But now reviewing all I feel glad that I should have been able in spite of all these things to come out as a Wrangler and occupy such a good place in the midst of all the intense competition which exists in the Cambridge mathematical Tripos; and I hope now to be able to devote myself to law. I take my degree here to-morrow."

আনন্দমোহন স্বদেশে ও বিদেশে উচ্চতম শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে মোটা বেতনের একটা সরকারী চাকুরী সহজেই জোগাড় করিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে ধাতুতে গঠিত ছিলেন না। স্বদেশ-সেবা তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। আইন-ব্যবসায়ে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া দেশের সেবা করা সম্ভব, এই জন্য কেম্ব্রিজে অবস্থান-কালে ব্যবহারশাস্ত্রও তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। উক্ত পরীক্ষার অল্প দিন পরে আইনের পরীক্ষা দিয়াও তিনি উত্তীর্ণ হইলেন এবং ব্যারিষ্টার বলিয়া পরিগণিত হইলেন। অতঃপর তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে মনস্থ করেন। ১৮৭৪, ২৮ মে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এ সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়।

আনন্দমোহন স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছেন শুনিয়া চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'সাধারণী' ৩০ আগষ্ট ১৮৭৪ তারিখে লিখিলেন,—

সংবাদ।···কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটীর রাঙ্গলার এবং বারিষ্টার বাবু আনন্দমোহন বসু আগামী মাসের শেষভাগে এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তিনি নিরাপদে স্বদেশে আসিয়া দুঃখিনী বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বল করুন, দেশের হিতকর কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে থাকুন। যেন অপদেবতার দলে না মিশাইয়া যান; ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করিবেন।

আনন্দমোহন স্বদেশে ফিরিয়া অপদেবতার দলে মিশিয়া যান নাই। স্বদেশের সেবাতেই আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

৪

দীর্ঘ চারি বৎসর আট মাস বিলাতে অবস্থানের পর আনন্দমোহন ১৮৭৪, ১২ই অক্টোবর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার খ্যাতি ইতিপূর্ব্বেই শিক্ষিত বাঙালী মহলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঐ দিন হাওড়া ষ্টেশনে তাঁহার বন্ধুরা সদলে গিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। আনন্দমোহন এত দিন বিলাতে রহিয়াছেন, অথচ তাঁহার ভিতরে কোনই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। কথায়-বার্ত্তায়, ব্যবহারে, পরিচ্ছদে তিনি আগেকার সেই খাঁটি বাঙালী আনন্দমোহনই রহিয়া গিয়াছিলেন। অসূচিকীর্ষা তাঁহার মধ্যে আদৌ প্রবেশ করিতে পারে নাই। শ্যেনদৃষ্টি অমৃত বাজার পত্রিকা পরবর্ত্তী ১৫ই অক্টোবর তারিখে লিখিলেন,—

* নববার্ষিকী ১২৮৪, পৃঃ ১৯৩-৪।
† ঐ। পৃঃ ১৫৫।

"We heartily welcome back amongst us Babu Ananda Mohun Bose, who arrived at Calcutta by 11 p.m. on Monday last. He was waited upon at the Howrah Station by a large circle of friends who greeted him most sincerely when he alighted on the platform. The four years' stay in England appears to have produced very little change in him. He is the same frank, genial and unostentatious young man that he was when he left India. Of course, he was neither coated nor hatted, for Ananda Mohun is above imitation."

পণ্ডিতবর শিবনাথ শাস্ত্রী আনন্দমোহনের একজন অকৃত্রিম সুহৃদ্ ছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহাদের এই সৌহার্দ্য উত্তরোত্তর বাড়িয়াই গিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় স্বদেশ-প্রত্যাগত বন্ধুকে এই কবিতা দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিলেন,—

সাধিয়ে অসাধ্য কাজ সুযশে ভূষিত,
হয়ে আজ পুনঃ বঙ্গে হইলে উদিত!
কি দিব তোমারে মোরা দীনহীন বেশে,
দীনহীন হয়ে আছি দুখিনীর দেশে।
দুঃখিনী জনম ভূমি প্রাণের সন্তান
দিলেন তোমারে পুনঃ নিজ কোলে স্থান।
তোমার সুযশ শুনি আজি ঘরে ঘরে,
রত্নগর্ভা বঙ্গভূমি বলে নারী-নরে।
ধন্য তুমি যার নামে উজল ভবন,
দেশের গৌরব তুমি অমূল্য রতন।
বাড়ালে দেশের মান তুমি যে প্রকার
তার মত বঙ্গবাসী কিবা উপহার
দিতে পারে? তাই বলি, হৃদয় খুলিয়া
ঘরে এস বন্ধুবর! লই হে বরিয়া।
ঘরে এস জন্মদুঃখী বঙ্গের রতন,
যা আছে তোমারে সব করি সমর্পণ।
কি আছে? হৃদয় আছে, আছে আলিঙ্গন,
দিব তাহা। অশ্রু আছে করি বিসর্জ্জন।

আনন্দমোহন কলিকাতায় ফিরিয়া পূর্ব্ব বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং দেশ ও সমাজ হিতকর বিবিধ কার্য্যে যোগদানের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

৫

কলিকাতায় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্র-সংক্রান্তিতে হিন্দু-মেলার প্রথম অনুষ্ঠান হয়। পরে বহুকাল যাবৎ প্রতি বৎসরই হয় চৈত্র-সংক্রান্তিতে, নয় মাঘ-সংক্রান্তি বা ইহার নিকটবর্ত্তী সময়ে ইহা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। এই জন্য এই মেলা চৈত্র-মেলা বা মাঘ-মেলা নামেও অভিহিত হইত। ১৮৭৫ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি (৩০ মাঘ ১২৮১) কলিকাতার আপার সার্কুলার রোডস্থ পার্শী-বাগানে হিন্দুমেলার যে অধিবেশন হয় তাহা নানা কারণেই স্মরণীয়। এ বৎসর মেলার পৌরোহিত্য করেন ঋষিপ্রতিম রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। নড়াইলের অন্যতম জমীদার বাবু রাইচরণ রায় নিজ অঞ্চলে একাই দেড় শত বাঘ শিকার করিয়া যে অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করেন তাহার জন্য তাঁহাকে মেলার পক্ষ হইতে একটি স্বর্ণ-পদক পুরস্কার দেওয়া হয়। এইখানেই প্রথম প্রকাশ্য জনসভায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মাত্র চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে তাঁহার 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। হিন্দুমেলার এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—ভারতবাসীর শারীরিক শক্তির উৎকর্ষ বিধান। এই বিভাগে সদ্য-বিলাত-প্রত্যাগত আনন্দমোহন বসু মহাশয় এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া প্রকাশ্য জনসভায় আনন্দমোহনের আবির্ভাব এই প্রথম।

স্বদেশগতপ্রাণ আনন্দমোহন দেশে ফিরিয়াই স্বদেশ-বাসীদের কল্যাণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বিলাতে বসিয়া সেখানকার সঙ্ঘ বা অনুষ্ঠানগুলির কার্য্যকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। হিন্দুমেলা কয়েক বৎসর যাবৎই দেশের আপামরসাধারণের মনে স্বদেশপ্রেমের বীজ ছড়াইতে-ছিল। কিন্তু ইহার এই প্রচেষ্টাকে সমাজে নিবদ্ধ করিতে হইলে, এক কথায় ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনিয়া ইহাকে একটা concrete রূপ দিতে হইলে একটি স্থায়ী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। যুবক ছাত্রদলই সমাজের ভাবী প্রতিপালক ও রক্ষক। তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের মানসিক শারীরিক ধর্ম্মনৈতিক উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলেই দেশমাতার দৈন্য-দশা ঘুচান সম্ভব হইবে, বিশ্বসমাজে তাঁহার নিজ আসন স্থিরীকৃত হইতে পারিবে। আনন্দমোহন যুবক, কাজেই যুব-ছাত্রদের সহানুভূতি সহজেই তিনি লাভ করিতে পারিলেন। আনন্দমোহনের উদ্যোগে ১৮৭৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে 'ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন' বা ছাত্র-সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। হিন্দুমেলার জাতীয় ভাব একটি ছোট সঙ্ঘের ভিতর দিয়া কার্য্যকর করিয়া তুলিবার অবকাশ জুটিল। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' অবিলম্বে (২৯ এপ্রিল) ছাত্র-সভা প্রতিষ্ঠার সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন,—

আমরা শুনিলাম বাবু আনন্দমোহন বসুর উদ্যোগে প্রেসিডেন্সি কালেজের ছাত্রেরা এক সভার অধিবেশন করিয়াছেন। মানসিক শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্মসাধন করা এ সভার উদ্দেশ্য।

আনন্দমোহন স্বয়ং ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশনের সভাপতি হইলেন। সভা প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেই ইহার কার্য্যও সুরু হইল। ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্যতম উপায়—দেশের কৃত-বিদ্য লোকদের দ্বারা বিভিন্ন হিতকর বিষয়ে বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা। এইরূপ দুইটি বক্তৃতার কথা 'ভারত সংস্কারক' সাপ্তাহিক হইতে এখানে দিতেছি। ১৮৭৫, ২রা জুলাই এই পত্রিকা 'সংবাদাবলী' স্তম্ভে লিখিলেন,—

গত শনিবার [২৬ জুন] হিন্দু স্কুল গৃহে ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশনের

অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাবু মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বি, এ, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। বাবু আনন্দমোহন বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

পরবর্ত্তী ১৯শে নবেম্বর 'ভারত সংস্কারক' আর একটি অধিবেশনের কথা এইরূপ লেখেন,—

গত ১০ই নবেম্বর হিন্দু স্কুল থিয়েটরে "ছাত্রদিগের সভার" এক অধিবেশন হয়। বহু লোকের সমাগমে গৃহটী পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, সুরাপান বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। এই সভার সভাপতি বাবু আনন্দমোহন বসুও এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গের চিত্ত হরণ করেন।

৬

এই সভা অনতিবিলম্বে কলিকাতার ছাত্রসমাজের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। কর্ম্মচ্যুত সিবিলিয়ান দেশ-পূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং বিলাতে গিয়া ভারত-সরকারের বিরুদ্ধে আপীল করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হইয়া সবেমাত্র স্বদেশে ফিরিয়াছেন এবং পরম পরোপকারী পিতৃ-বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে মেট্রোপলিটান কলেজে শিক্ষাদানকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, আনন্দমোহন তথা ছাত্র-সভা তেমনি শিক্ষা-ব্রতী সুরেন্দ্রনাথকে নিজেদের মধ্যে টানিয়া লইলেন। বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই যুবকদের শিক্ষা সীমাবদ্ধ নহে, ইহার বাহিরেও তাহাদের শিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র রহিয়াছে—এই বিশ্বাসে শিক্ষাব্রতী সুরেন্দ্রনাথ ছাত্র-সভায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। 'শিখজাতির অভ্যুদয়', ইটালীর অন্যতম উদ্ধারকর্ত্তা 'ম্যাটসিনি' এবং মহাপ্রভু 'শ্রীচৈতন্যদেব' সম্পর্কে ছাত্রদের নিকট তিনি যে তিনটি ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করেন তাহাতে তাৎকালিক যুব-ছাত্র-সমাজে ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত হয়। যেমন ভাষা, তেমনি ভাব, তেমনি ব্যঞ্জনচ্ছটা—যুবকগণ যেন মাতিয়া উঠিলেন। শিখ-সমাজের গণতন্ত্রমূলক শাসন-ব্যবস্থা, স্বদেশের শৃঙ্খলমোচনে ম্যাটসিনির অনুপম আত্মত্যাগ ও ইটালীয়দের সঙ্গে ভারতবাসীদের অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সামাজিক সাম্যের কথা পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী যুবক-সমাজের দৃষ্টি পর ছাড়িয়া ঘরের দিকে ফিরাইয়া দিল; হিন্দুমেলায় উপ্ত স্বদেশপ্রেমের বীজ এই অমৃতবারিসিঞ্চনে অঙ্কুরিত হইবার উপক্রম হইল; যুবকগণ স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ হইলেন। বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, তারাকিশোর রায় চৌধুরী (পরে সন্তদাস বাবাজী) প্রমুখ কয়েক জন যুবক শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে সনাতন হিন্দু রীতি অনুসারে অগ্নি সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'অনাহারে মরিয়া গেলেও আমরা ইংরেজের দাসত্ব করিব না, ভারতবর্ষে স্বশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব,' ইত্যাদি ইত্যাদি। স্বদেশ-সেবার এই যে মহতী প্রেরণা—যাহার ফলে যুবকগণ ঐরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন—ছাত্র-সভার দরুনই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। আর এই ছাত্র-সভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন আনন্দ-মোহন বসু। এই ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন বা ছাত্র-সভা আনন্দমোহনের জীবনের একটি প্রধান কীর্ত্তি; কোন কোন দিক হইতে ইহাকে প্রধানতম কীর্ত্তিও বলিতে পারি।

কলিকাতার ও বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া রাজনৈতিক সভাসমিতি ইতিপূর্ব্বেই গঠিত হইয়াছিল। শিক্ষিত সাধারণ ভারতবাসীর মুখপাত্র-স্বরূপ কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাব কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই হইয়া আসিতে-ছিল, আর এ বিষয়ে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু এ-যাবৎ প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আনন্দমোহন স্বদেশে ফিরিয়া এক দিকে যেমন ছাত্র-সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইলেন, অন্য দিকে তেমনি উক্ত প্রস্তাব মত একটি সাধারণ কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনেও উদ্যোগী হইলেন। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের চেষ্টা-যত্নে ১৮৭৫, ২৫শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামে প্রস্তাবিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। এই সভা প্রতিষ্ঠাকালে ইহার প্রধান উদ্যোক্তা আনন্দমোহন কলিকাতায় অনুপস্থিত ছিলেন। 'প্রতিধ্বনি' এই কথার উল্লেখ করিয়া লেখেন,—

বাবু আনন্দমোহন বসু সভা স্থাপন পক্ষে একজন প্রধান উদ্যোগী, তাঁহার অনুপস্থিতি কালে সভার উদ্বোধন করিয়া ভাল হয় নাই।

যাহা হউক, ইণ্ডিয়ান লীগে অন্যতম সদস্যরূপে আনন্দ-মোহন গৃহীত হইয়াছিলেন। ইহার পর লীগের কার্য্য-প্রণালী সম্পর্কে কর্ম্মকর্ত্তাদের সঙ্গে আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির মতভেদ, শেষোক্তদের কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়ান লীগ পরিত্যাগ ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত-সভা প্রতিষ্ঠা —এসব কথা এখানে আলোচনা করিব না। তবে বঙ্গের এই কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের মূলেও যে আনন্দ মোহন একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এই কথা জ্ঞাপনের জন্যই এখানে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করা গেল। ইহা নিখিল-ভারত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রায় এগার বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা।

৭

এইমাত্র আনন্দমোহনের কলিকাতায় অনুপস্থিতির কথা বলিলাম। ১৮৭৫, সেপ্টেম্বর মাসে আনন্দমোহন পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হন। প্রথমেই তিনি ঢাকায় যান। ঢাকাবাসীরা তাঁহাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন ও সম্মান প্রদর্শন করেন। এই অভিনন্দনের বিষয় এবং তাঁহার কথা-বার্ত্তা, বক্তৃতা প্রভৃতির চুম্বক স্থানীয় 'হিন্দু হিতৈষিণী' পত্রে বাহির হয়। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ও 'সাধারণী' এই বিবরণ হুবহু উদ্ধৃত করেন। এই বর্ণনার মধ্যে আনন্দ-মোহনের ব্যক্তিত্ব যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে এমনটি কোথাও দেখি নাই। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' (৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৫) হইতে এই বিবরণটির কিয়দংশ এখানে দেওয়া হইল,—

"গত শনিবার বিখ্যাত রেঙ্গালার বারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু এম, এ, ঢাকায় উপস্থিত হন, রাত্রে জগন্নাথ স্কুলে ইংলণ্ডের অনেক-গুলি কথা সাধারণের নিকট ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করেন। রবিবার তাঁহাকে সম্ভাষণ করিবার জন্য পূর্ব্ব বঙ্গরঙ্গভূমি গৃহে বিক্রমপুর হিত-সাধিনী সভার অধিবেশন হয়। প্রায় সহস্রাধিক ভদ্রলোক উপস্থিত হন। আনন্দমোহন বাবুকে দর্শন করাই অনেকের উদ্দেশ্য। সভায় তাঁহার প্রকৃত গুণের অনেক কথা কীর্ত্তিত হইলে তিনি অতি সুললিত বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় শিষ্টাচার প্রকাশার্থ যে বক্তৃতা করেন, তাহা সাধারণের অতীব মনোহর হইয়াছিল। তিনি যখন বাঙ্গলা ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করেন তখন অনেকেই অনুমান করেন যে কৃতবিদ্য বাঙ্গালীদের ন্যায় তাঁহার বক্তৃতায় পনের আনা ইংরেজী শব্দ মিশ্রিত হইবে, বিশেষতঃ তিনি ৫ বৎসর কাল ইউরোপে বাস করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কথায় অধিকাংশই ইংরেজী শব্দ থাকা সম্ভব। কিন্তু সাতিশয় আহ্লাদের বিষয় এই যে একটিও ইংরেজী শব্দ ব্যবহার না করিয়া অমৃত তুল্য বাক্যে সকলকে আশাতীত পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শন ও মিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিলে নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তিও সমস্ত দুষ্কর্ম্ম বিস্মৃত হয়। তিনি পেণ্টলুন, চাপকান এবং বাঙ্গালীদের ন্যায় টুপী লইয়া আসিয়া-ছিলেন। তিনি প্রাচীন সম্প্রদায়স্থ শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকিঙ্কর রায় মহাশয়ের নাম ধরিয়া এইরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'বরদাকিঙ্কর বাবু প্রাচীন হিন্দু, আমি কোন কোন বিষয়ে হিন্দু সমাজের নিকট অপরাধী আছি, সুতরাং তিনি এ সভায় আহ্লাদ প্রকাশ করিতে আইসা নিতান্ত সৌভাগ্য স্বীকার করিতে হইবে।' তৎপর তিনি ইউরোপীয়দিগের কতিপয় গুণের প্রশংসা করিয়াছিলেন।"

"...গত সোমবার রাত্রিতে জগন্নাথ স্কুল গৃহে শুভসাধিনী সভা তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের একটি রত্নস্বরূপ সন্দেহ নাই, তিনি যেমন প্রগাঢ় পণ্ডিত, বিদ্যা-নম্র, তেমন মিষ্টভাষী এবং মহদাশয়। এরূপ প্রকৃতির লোকের প্রতি কাহার না শ্রদ্ধা উদয় হইয়া থাকে? তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে যেসকল স্থলে নিজের প্রশংসা উপস্থিত হইবার সম্ভব, সেই সকল স্থানগুলি এমন আশ্চর্য্য বিনয় কৌশল দ্বারা অতিক্রম করিয়াছিলেন যে, তাহাতে সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন।... প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তির মুখেই আনন্দ বাবুর প্রশংসা শুনা গিয়াছে...।"

ছাত্র ও ছাত্রবন্ধু আনন্দমোহনের জীবনের একটি খণ্ডাংশ—মাত্র ছয় বৎসরের কথা এখানে বলা হইল। তাঁহার সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীরা তখন কিরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন 'সাধারণী'তে (৯ জানুয়ারি ১৮৭৬) প্রকাশিত একটি উক্তিতে তাহা অতি সুন্দর রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এই উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গ শেষ করিব।

আনন্দমোহন বাবু বঙ্গদেশের গৌরব স্থানীয়। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ সহৃদয়ত্ব ও অসাধারণ সদ্ব্যবহারে তিনি আমাদের তুচ্ছ ও অজ্ঞাত বঙ্গদেশকে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাস্পর্দ্ধী ইংলণ্ডের শীর্ষস্থানে উত্তোলন করিয়াছেন।"*

* সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে অনুষ্ঠিত আনন্দমোহন বসু স্মৃতি-সভায় ৩রা ভাদ্র ১৩৫০ তারিখে পঠিত।

অতঃ কিম্?

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

মিশনের খুব বড় একজন ব্রহ্মচারী; নাম করিলে সবাই চিনিবেন, কিন্তু যা কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি, সেটা আর স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিলাম না।

মঠে কয়েক বার যাওয়া-আসায় একটু হৃদ্যতা জন্মিয়াছে। প্রচুর স্নেহ করেন, প্রায় চিঠিপত্র দিয়া থাকেন। শেষ চিঠি দিয়াছেন মেদিনীপুর থেকে,—প্লাবন এবং তজ্জনিত নিদারুণ দুঃখকষ্টের কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়া সাহায্য চাহিয়াছেন, অর্থ দিয়া, এবং সম্ভব হয়ত মানুষ দিয়াও।

খুবই দুর্ভাবনায় পড়িয়াছি। বাবাজী এত দিন জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগ লইয়া পত্রাচার চালাইতেন, এদিক ওদিক থেকে জোগাড় করিয়া উত্তর দিয়া ঠাট বজায় রাখিয়া আসিতেছিলাম। বেশ চলিতেছিল নির্বিবাদে; হঠাৎ এ রকম উগ্র কর্ম্মযোগের নমুনা হাজির করিয়া সব যেন ভণ্ডুল করিয়া দিলেন।

যাই হোক, কিছু করিতে ত হইবে, এখন আর উপায় কি? ও'র অন্য এক ভক্তকে দেখাইলাম চিঠিটা। অনাথ।—বাবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় নাই, আমায় লেখা পূর্ব্বেকার চিঠি সব পড়িয়াই ও'র অনুগত শিষ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই চিঠিটা এক নিঃশ্বাসে

শেষ করিয়া এমন ভাবে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না; বলিল, "লোকটার আবার এসব বাই-ও আছে নাকি?···তুই সন্নিসী ফকির মানুষ, তোর এসব সংসারের কথায় থাকা কেন বাপু! হ্যাঁ, যাদের ঘর পড়েছে, বৌ-ছেলে মরেছে, তাদের মধ্যে এই মোওকায় বৈরাগ্য ঢুকিয়ে কেত্তনে মাতাতে পারতিস্, বুঝতুম সন্নিসীর যুগ্যি একটা কাজ হচ্ছে।···যত সব বোগাস, এত দিনে আসল রূপ খুলল।"

বলিলাম—চাঁদা আদায় করিতে সাহায্য না করুক, নিজে কিছু দিক না হয়। অনাথ হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল, আবার হাত দুইটা বিযুক্ত করিয়া সবেগে নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"না ভাই, মাফ করতে হচ্ছে; দিতে হয় অন্য রাস্তা আছে; বড্ড ধোঁকা খেলাম আজকে। ঐ লোকই আবার জ্ঞানযোগ নিয়ে পাঁচ পাতার চিঠি লিখতে আসে;—খুব ভিড়িয়ে দিয়েছিলে যাহোক!"

একটা দিন খুব দুশ্চিন্তা আর অশান্তিতে কাটিল। মনের ভাবটা আমারও অনাথেরই মত, কিন্তু ওর মত একেবারে গা-ঝাড়া দিতে কোথায় যেন বাধিতেছে। অনেক ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে গোবরার কথা মনে পড়িল। গোবরা এসব ব্যাপারে যাকে বলে—'দী ম্যান', মনে পড়ে নাই, তাহার কারণ নীতিধর্ম—এ সবে বিশ্বাস নাই বলিয়া হতভাগাটা ঠিক আমাদের সার্কেল অর্থাৎ গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না—ভলন্টিয়ারি, থিয়েটার, ফুটবল, নেমন্তন্নে পরিবেশন, চাঁদা আদায় এই সব লইয়া থাকে;—ভলন্টিয়ারির হুইস্‌লটা দামী হইলে আর ফেরত দেয় না, পরিবেশন করিবার আগে যে জিনিসটা কম তার একটা মোটা অংশ নিজেদের জন্য নিরাপদ স্থানে সরাইয়া রাখে—এতে ন্যায়ধর্মের দিক দিয়া যে কি ইতরবিশেষ হইল তাহার খোঁজ রাখে না। আরও সব আছে।

কিন্তু কাজের ছোকরা, আর চাঁদা তোলায় অদ্ভুত প্রতিভা! উহারই শরণাপন্ন হইলাম। চিঠিটা পড়িলাম—যতটা সম্ভব আরও মর্মস্পর্শী করিয়া, নিজেও ছোটখাট একটি বক্তৃতা দিলাম, তাহার পর বলিলাম—তোমাকে একটু ব্যবস্থা করে দিতেই হবে গোবর্ধন।

গোবরা দাঁতে তর্জনীর নখ খুঁটিতে খুঁটিতে সবটা শুনিল, ঠোঁট দুইটা কুঞ্চিত করিয়া ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়িয়া বলিল—উহুঃ, অতিশয় শক্ত।

বলিলাম—"শক্ত হোক, অসম্ভব ত নয়? বিশেষ ক'রে তোমার কাছে···"

গোবরা বলিল, "অসম্ভবের চেয়ে শক্ত। কোথায় টাকা পাবে শৈল-দা লোকে? এইটুকু শহরে দু-দুটো সিনেমা চলছে, হপ্তায় অন্তত একটা ক'রে শো না দেখলে সমাজে ব'সে দুটো কথা কইতে পারে না ভদ্দরলোকে, কেমন যেন একঘরে হয়ে পড়ে।···তার পর এই মাগ্গিগণ্ডা, কোথা থেকে পাবে লোকে বল? খাতা নিয়ে যে হাজির হব—একটু আক্কেল করতে হবে তো?"

আমি আবার চাপিয়া ধরিতে যাইতেছিলাম, গোবরা বলিল, "তবুও একটু চেষ্টা করলে যে একেবারে কিছু না হয় এমন নয়। একটা মতলবও ঠাউরেছিলাম, কিন্তু···না দাদা থাক্, যা জাঁদরেল বেহ্মচারী মাঝখানে রয়েছে দেখছি···"

আমি ওর হাত দুইটা ধরিয়া ফেলিলাম, বলিলাম—"কি মতলব করেছ বল, কিছু টাকা তুলতেই হবে, শুনলে তো, উনি নিজেই আসবেন লিখেছেন, দাঁড়িয়ে অপ্রস্তুত হতে হবে—তুমি থাকতেও। আর ব্রহ্মচারীর কথা বলছ, সে তো ভালই আরও, অপব্যয়ের কোন কথাই থাকবে না। হেঁজিপেঁজি নাগাফকির নয় যে বলবে,—যেমন জ্ঞানী, তেমনি কর্মী, আসছেন তো, দুটো কথা কইলেই বুঝতে পারবে।"

গোবরা বলিল, "চলবে না শৈল-দা নাগা-সন্নিসী হলে তো ভাবনাই ছিল না; এ বোধ হয় মাথা ঘামিয়ে, খেটে খুটে একটা জিনিস খাড়া করলাম,—কবে রামকৃষ্ণ কি বিবেকানন্দ কি বলেছেন সেই কথা তুলে সব পণ্ড করে দিলে। মেহনৎই সার হ'ল, উল্টে জোচ্চোর ব'লে বদনাম; মাফ কর শৈলদা।"

আমি বলিলাম, "সে ভার আমি নিচ্ছি, তুমি যা করবে তার মধ্যে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না।"

গোবরা তর্জনীটা একটু তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "দেখ, পাকা কথা তো? শেষকালে সব করে-কর্মে না ভেস্তে যায়!"

একটু থতমত খাইয়া যাইতে হইল, আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, "তুমি তো আর চুরিও করছ না, ডাকাতিও করছ না···"

"আর গেরুয়াধারী যদি বলেন—এর চেয়ে চুরি কিংবা ডাকাতি ঢের ভাল ছিল, তা হ'লে?

আমার পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

এমন কি উৎকট মতলব ঠাওরাইয়াছে গোবরা?—একটু মাথা চুলকাইতে হইল, তাহার পর বলিলাম, "ওঁকে কিছু জানতে দেওয়া হবে না, তুমি নেমে পড়ো গোবর্ধন। একটু ভাল করেই চেষ্টা ক'রো ভাই।"

২

দু-দিন পরে গোবরা নিজেই আসিয়া হাজির হইল, হাতে সবুজ কাগজে ছাপা একতাড়া হাণ্ডবিল, একখানা আমার পানে বাড়াইয়া বলিল, "এই নাও, পড়ে দেখ।"

আমি যতক্ষণ পড়িতেছি, বলিতে লাগিল—"অন্য রকম চেষ্টাও যে না করেছি এমন নয়; বাবাজী রয়েছেন, ভাবলাম ধর্মের পথেই যাওয়া যাক,—আবার পরকাল আছে তো? প্রথমে যুগ্‌লোকে ধরলাম—একটা ফুটবল চ্যারিটি দে। বললে—আমাদের আর সে দিন নেই, তা ভিন্ন ওয়ার-ফণ্ডের-জন্যে দু-বছরে পাঁচ-পাঁচটা চ্যারিটি দাঁড় করাতে হয়েছে; বেটারা টাকা দিয়ে যেন মাথা কেনে, একটা যদি গোল খেলাম, কি একটা যদি মিস্ করলাম তো খেলবো কি গালাগালির চোটে মাথার ঠিক থাকে না। কে ও হাঙ্গামের মধ্যে যায় ভাই?' গেলাম বিমলের কাছে—

পেলাম একটা চ্যারিটি পারফরমেন্স দে বিমল, টিকিট বিক্রির ভারটা আমি নিচ্ছি। বললে—এত তাড়াতাড়ি রিহার্সেল দিয়ে একটা নতুন খাড়া করা চলে না তো, দিতে হলে এক চন্দ্রগুপ্ত দিতে হয়, তোয়ের আছে,—তা সেলুকাস ছায়া দুজনের মধ্যে কেউ নেই—আপিস খুলেছে তারা চলে গেছে।···তখন নিরুপায় হয়ে এই মতলবই করতে হ'ল ; পড়লে ?"

ওর প্ল্যানে হাত দিতে যাইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি মনের ক্ষোভটা মনেই চাপিয়া ঈষৎ হাসিমুখেই হ্যাণ্ডবিলটা ফেরত দিলাম। গোবরা বলিল, "আমার আবার সাহিত্য-টাহিত্য আসে না, পাঁচটা দেখে একটা দাঁড় করালাম, পড়লে ত. একবার শুনে দেখ দিকিন—চটকদার হ'ল কি না—"

হ্যাণ্ডবিলটা একটু তফাতে ধরিয়া পড়িতে লাগিল—

অতঃ কিম্ ?   অতঃ কিম্ ??   অতঃ কিম্ ???

আজ নিরবচ্ছিন্নভাবে যে বিরাট্ প্রশ্ন ছায়াচিত্রাকারে স্থানীয় "অলকা টকিজে" দুই মাস ধরিয়া রূপায়িত হইয়া আসিতেছে, তাহার অর্থ আপনারা সকলেই জানেন—"অতঃ কিম্ ? অর্থাৎ "ইহার পর কি ?" কিন্তু এই ছায়ারূপ দেখিয়া আপনারা বিস্মিত, রোমাঞ্চিত, বিলোল-কটাক্ষ হইলেও কখন কি এই বিরাট্ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিয়াছেন ?···"

যাহা করিয়াছে তাহার ক্ষোভটা ভাষার খুঁৎ ধরিয়াই মিটাইলাম, প্রশ্ন করিলাম, "বিলোল-কটাক্ষ কেন লিখেছ ?

গোবরা উত্তর করিল—"আশ্চর্য হয়ে চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে।"

বলিলাম—"ওর মানে তা নয়—মানে হচ্ছে মেয়েছেলেদের টানা টানা চোখের দৃষ্টিপাত।"

গোবরা একটু অপ্রতিভের মত হইয়া গেল, বলিল—"অলকা টকিজে"র হ্যাণ্ডবিলে পেলাম কথাটা। তা অল্পই তফাৎ, কেউ ধরতে পারবে না। তা ভিন্ন কথাটার মধ্যে বেশ···"

গোবরা দাঁতে দাঁতে পিষিয়া বলিল—"কথাটার মধ্যে বেশ একটা ইয়ে আছে।"

ওকে চটানও ঠিক নয় আবার, বলিলাম—"হ্যাঁ, তা আছে, আমেরিকানরা যাকে বলে zip ; পড়।"

গোবরা পড়িয়া যাইতে লাগিল—কখনও কি এই বিরাট প্রশ্নের উত্তর দিতে পরিয়াছেন ? না পারেন নাই, উগ্র কৌতুক উদ্দীপনা বুকে লইয়া প্রত্যহ বাড়ী আসিয়াছেন, এর পর কি আর জানিবার জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু উত্তর পান নাই। কিন্তু উত্তর কি চান না ?—উত্তরের জন্য কি কোন ব্যাকুলতা নাই ? তাহা হইলে—

আসুন !   আসুন !!   আসুন !!!

আপনাদের কৌতূহল নিবারণ করিবার জন্য সশরীরে শুভাগমন করিতেছেন—

কে ?   কবে ??   কোথায় ???

বর্তমান বাংলার চিত্রাকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক, বর্তমান বাংলার চিত্তাকাশের দীপ্ততম তারকা, আপনাদের চির আদরের সাহানা দেবী—নায়িকার ভূমিকায় যাঁর অপূর্ব অভিনয়ে "অতঃ কিম্" আজ চিত্র-জগতের শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া প্রতিপন্ন—যাঁর অলৌকিক লাবণ্য আর অপ্সরোচিত লাস্যবিলাসে "অলকা"র রূপালী পর্দা আজ দুই মাস ধরিয়া ঝলমল করিতেছে—তিনি আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বয়ং আসিয়া 'অতঃ কিম্' সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন।

সাহানা দেবী ! মঙ্গলবার ৩রা নভেম্বর !! স্থানীয় টাউন হলে !!!

যাঁহাকে ছায়ায় দেখিয়া মুগ্ধ, বিস্মিত হইয়াছেন তাঁহাকে কায়ায় দেখিয়া স্তম্ভিত, নির্বাক হউন, তাঁহার অলৌকিক সঙ্গীত এবং পারলৌকিক নৃত্য দেখিয়া···

অসাবধানতাবশত প্রায় হাসিয়া ফেলিয়াছিাম, সামলাইয়া লইলাম।

গোবরা বলিল—"অলৌকিকের সঙ্গে জোড়া মিলিয়ে ঐ কথাটা বাইরে থেকে এনে বসিয়ে দিলাম, মানেটা কিন্তু ঠিক জানা নেই··· ওসব নিয়ে ত আর মাথা ঘামালুম না কখনও।"

বলিলাম—"পরলোক থেকে হয়েছে আর কি।"

গোবরা আবার একটু অপ্রতিভভাবে আমার পানে চাহিল, বলিল'ভূতের নেত্য' মানে ক'রে বসবে না ত বেটারা ? যা বাংলার বিদ্যে সব !"

বলিলাম, "আবদার নাকি ?—অলৌকিক মানে করবে এক রকম, আর পারলৌকিক মানে করবে অন্য রকম ? একই কথা ত, সাজ আলাদা শুধু, তুমি পড়।"

গোবরা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "করুক গে, টাকা দিলেই হ'ল, কি বল ?"

আবার পড়িতে আরম্ভ করিল—তাঁহার অলৌকিক সংগীত এবং পারলৌকিক নৃত্য দেখিয়া···পারলৌকিক নৃত্য দেখিয়া···

কথাটাকে যেন বেশ করিয়া পরখ করিয়া লইল, বলিল—"না, ঠিক আছে।"

আবার পড়িতে লাগিল—পারলৌকিক নৃত্য দেখিয়া জীবন ধন্য করুন। নৃত্যগীতের পর সাহানা দেবী "অতঃ কিম্"-এর বিস্ময়কর পরিণতি সম্বন্ধে আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবেন।

আসুন ! সপরিবারে সবান্ধবে আসুন !! এ সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না !!!

প্রবেশ মূল্য—

রিজার্ভ ৫৲   প্রথম শ্রেণী ৩৲   দ্বিতীয় শ্রেণী ২৲

তৃতীয় শ্রেণী ১৲   গেলারি ।০

যদি নিরাশ হইতে না চাহেন তবে পূর্বাহ্নেই টিকিট সংগ্রহ করিয়া রাখুন। আসনের সংখ্যা একেবারেই নির্দিষ্ট।

বিক্রয়লব্ধ অর্থ সাহানা দেবী বন্যা-দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের জন্য ব্যয়িত করিতে সংকল্প করিয়াছেন।

পড়া শেষ করিয়া গোবরা বলিল, "এটা নিয়ে আর বেশী

লিখলাম না, অনেকে ভড়কে যেতে পারে, ভাববে—ধান ভানতে শিবের গীত এনে ফেলে কেন রে বাবা ?"

পড়া হইয়া গেলে আমি প্রশ্ন করিলাম, "এ নয় বুঝলাম, কিন্তু ঠিক করলে তুমি কোথা থেকে ?"

গোবরা হাতজোড় করিয়া বলিল, "মাপ করবেন শৈল-দা, ওটি ট্রেড সিক্রেট, বলতে পারব না। তা ভিন্ন অন্য সবাইকে কি বলছি না বলছি তাতেও কান দেবেন না।"

৩

হ্যাণ্ডবিল বিলি করিয়া, দেওয়ালে, গাছে, ল্যাম্পপোস্টে পোস্টার সাঁটিয়া দুই দিকেই গোবরা শহরে একটা সাড়া জাগাইয়া দিল। তিন দিন তাহার দেখা পাইলাম না। চতুর্থ দিন বেশ একটু গা-ঢাকা গোছের হইয়াছে, গোবরা আসিয়া উপস্থিত হইল। একা ছিলাম না, চার-পাঁচ জনে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। গোবরা দেখিয়াই প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া গেল। অবশ্য সেটা আমিই বুঝিলাম, আর কেহ বোধ হয় বিশেষ লক্ষ্য করিল না; একটা খালি চেয়ার দখল করিয়া বসিল। বলিল, "তোমার কাছে একবার এলাম শৈল-দা, একটু উপুর-হস্ত করতে হবে।"

আমি কিছু বলিবার পূর্বেই গোবরা সুরু করিয়া দিল, "মানে, মেদিনীপুরের অবস্থাটা শুনেছ ত ?—জেলাকে জেলা ঝড়ে, সমুদ্রের জলে প্রায় শেষ হয়ে গেছে, ধনে প্রাণে, সম্পত্তিতে যা নষ্ট হয়েছে, তা ত হয়েছেই, বালি আর সমুদ্রের লোনা জলে ক্ষেত পুকুর সমস্ত বরবাদ ক'রে সমস্ত জেলাটার অবস্থা এমন করে দিয়েছে যে বোধ হয় দশ বছরেও সামলে উঠতে পারবে কি না সন্দেহ।..."

আমি ঠায় ওর মুখের পানে চাহিয়া আছি, বোধ হয় মেদিনীপুরের চেয়েও হতভম্ব হইয়া গেছি। গোবরা বলিয়া চলিয়াছে—তাই কিছু টাকা তোলবার জন্যে এই বন্দোবস্তটা করেছি, হ্যাণ্ডবিলটা পড়ে দেখ তা হ'লেই টের পাবে।...আসতে কি চায় ?—একটা ষ্টার এক্ট্রেস, তার ফুরসং কোথায় ?...অনেক লেখালেখি ক'রে, শেষকালে নিজে গিয়ে কোন রকমে রাজি করালাম—একটা দিনের জন্যে...

আমার ত একেবারে বাক্‌রোধ হইয়া গেছে; অনিল প্রশ্ন করিল—ফী কত ঠিক হ'ল ?

গোবরা বলিল—এক পয়সা নয়। সাহানা দেবীর ত ঐখানেই বিশেষত্ব। আর সেটা জানা ছিল বলেই ত ঘেঁষলাম। এমনই, যেমন শুনলাম, কলকাতার কোথাও ডাক্ দিলে ওর এক দিনের ফী পাঁচ-শ টাকা, বাইরে সাত-শ থেকে হাজার।

সকলেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

অনিল বলিল—শুনেছি এক্ট্রেস ভাল, নাচতেও পারে নাকি ?

গোবরা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—কেন অলকাতে ওঁর শো ত চলছে, দেখেন নি ?—লোক ভেঙে পড়ছে, জায়গা দিতে পারছে না—আজ দু-মাস ধরে এই ব্যাপার।...শুধু নাচ নয় ত, গানেও—মার-মার, কাট-কাট লাগিয়ে দিয়েছে; ওঁর টাইটেলই হয়ে গেছে নাইটিংগেল অফ্ বেঙ্গল!...স্ক্রীনেই এই অবস্থা, আবার যখন সশরীরে ষ্টেজে নামে...

অনিল বলিল—দেখলে হ'ত একবার, টিকিট তুমিই বেচছ নাকি ?

হরকালী বলিল—কিছু মনে ক'রো না গোবর্ধন, মেদিনীপুর প্লাবনের জন্যে টাকা তুলতে হবে, তাতে একটা ফিল্ম-এক্ট্রেস এনে ফেলা—এ আমার প্রিন্সিপলে বাধে। যাই হোক, কিছু টাকা পাঠাব পাঠাব করছিলাম—না হয় তোমার থ্রু দিয়ে যাবে। একবার আমার ওখানে যেও।

গোবরা ক্ষণিকের জন্য একটু কি যেন ভাবিল, তাহার পর বলিল—সে আমার সৌভাগ্য হরকালী-দা। টাকাও এসে গেল, টিকিটগুলোও বেঁচে গেল; যে রকম টানাটানি পড়ে গেছে...

খুব সন্তর্পণে একবার চাহিয়া দেখিলাম—হরকালীর মুখটা যেন শুকাইয়া গেল। সামলাইয়া লইয়া বলিল—না, টিকিট—টিকিট—মানে টিকিটগুলো দিয়েই দিও—ফ্রেণ্ডদের মধ্যে কেউ যদি যেতে চায়...ওটা আবার আজকাল একটা ফ্যাশান হয়েছে কিনা...

বিনোদ বলিল—যা বলেছ, দেশের লোক মরছে—একটা খণ্ড প্রলয়—তার জন্যে চাঁদা তুলতে হবে, তার মধ্যেও এক্ট্রেস! কি যে হ'ল কালে কালে!

গোবরা আবার ক্ষণমাত্র কি ভাবিল, বলিল—এ রকম কথা শুধু আপনার মুখেই শুনলাম; যা হাওয়া উঠেছে, কি করি বলুন ? কিছু টাকা না পাঠালেও নয়, অথচ...। আসব একবার আপনার কাছে এ হাঙ্গামটা মিটিয়ে নিয়ে। বাড়ীতে থাকলে টিকিটের জন্যে ত অতিষ্ঠ ক'রে তোলে চারি দিক থেকে সব জুটে, তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি; শো-টা শেষ করেই একবার আসব আপনার ওখানে। মরবার ফুরসং নেই বিনোদ-দা।

বিনোদের পানেও প্রচ্ছন্ন ভাবে চাহিলাম, হরকালীকেও টেক্কা দিয়া বলিতে গিয়াছিল, মুখটা আরও যেন বেশী করিয়া শুকাইয়া গেছে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অল্প হাসিয়া বলিল—তবেই হয়েছে, মাসের গোড়া, হাতে এখন দু-পাঁচটা টাকা আছে, এত ধীরে সুস্থে আসতে গেলে দেখবে ফক্কা। আসতে হয় আজই একবার এস, না হয় কাল সকালে। টিকিটের বইগুলো নিয়েই এস, দেখি পাড়ায় যদি কিছু বিকিয়ে দিতে পারি...সবার ত আর এক প্রিন্সিপল নয়।

সতীশও প্রিন্সিপলের কথাই তুলিয়া বাড়ীতে ঢুকিল। সব শেষে বলিয়া ভাই এমন ভাবে বলিল যেন গীতার ব্যাখ্যা করিতেছে। সমস্ত যুগটাকে গালাগালি দিল, চেতাবনীর কথা তুলিয়া বলিল পয়লা আগষ্টে এ যুগ সম্বন্ধে একটা হেস্তনেস্ত হইয়া না গেলে আর ভরসা নাই।

টিকিটের ব্যাপারটা কিন্তু ওদের মত ভবিষ্যতের জন্য ছাড়িয়া দিল না; মন্তব্য শেষ করিয়া বলিল—তবু, দাও খান-পাঁচেক

টিকিট আমায়, দেখি যদি কাউকে গছাতে পারি—সবার উচিত ত এ সব ব্যাপারে একটু সাহায্য করা।

গোবরা এত ভাল ভাবে গাঁথিয়াছে যে একটু খেলাইয়া তুলিবার আনন্দ থেকে নিজেকে যেন বঞ্চিত করিতে পারিল না, গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে বলিল—আপনারা যে এতটা ইণ্টারেষ্ট নেবেন ভাবতেও পারি নি। কিন্তু কথা হচ্ছে, টিকিট বেচা কি আপনাদের কর্ম? এইখানেই এ রকম উৎসাহ পেলাম, নইলে আমায় যে কী নাকালটাই হতে হয়েছে…

ভানু বলিল—না পারি, তুমি আমার কাছ থেকে টাকা নেবে, খাড়ে করে যখন নিচ্ছি…। কাল সকালে এস একবার।

অনিলের অবস্থাটা দেখিলাম একটু শোচনীয়, এই সব বড় বড় তত্ত্ববাগীশদের মধ্যে সোজাসুজি ভাবে একট্রেস সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দেখাইয়া বড় যেন খাট হইয়া পড়িয়াছে। তবে সে দমিবার পাত্র নয়, এই সব কথাবার্তার মধ্যে নিজের মতলব আঁটিতেছিল, ভানু থামিলে গোবরাকে বলিল—যাক তাহলে আমার আর টিকিট কেনবার দরকার হবে না।

সকলেই বিস্মিত ভাবে তাহার পানে চাহিলাম, গোবরা প্রশ্ন করিল—সে কি অনিল-দা, তার মানে?

অনিল বলিল—আমার ভাই নাচই দেখবার একটু ইচ্ছে, অত নামজাদা একটা ষ্টার আসছে, এ তো আর রোজ হয় না। মেদিনীপুরের ব্যাপার ত ভগবানের দয়ায় বছরে দু-পাঁচটা হচ্ছেই, আজ না পারি এর পরেও সাহায্য করা যাবে…

গায়ে লাগিবার জন্যই বলা, হরকালী প্রশ্ন করিল—কিন্তু টিকিট না কিনে তোমরা ষ্টারের নাচ দেখছ কোথা থেকে শুনি?

অনিল বলিল—কেন, তুমি টিকিটগুলো তো বন্ধুবান্ধবদের জন্যেই কিনছ। আমি কি একটাও আশা করতে পারি না? আমি কিনবও কুঁতিয়ে-কাঁতিয়ে হদ্দ একটা আট আনা কি এক টাকার টিকিট, তার চেয়ে…

ভানু হঠাৎ উঠিয়া পড়িল, বলিল—ওহে শৈলেন, শোন, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম—যার জন্যে এতটা আসা।

আমায় রাস্তার দিকে একান্তে লইয়া সন্দিগ্ধভাবে মাথাটা একটু চুলকাইল, বলিল—"আজ বলব?…থাক্, কালই বলা যাবে'খন, আর একটা দিন দেখি।…আমি তা হলে আসি এখন, সুনীলের কাছে একটু যেতে হবে; কাল কিন্তু থেকো বাড়ীতে—এই সময়।"

বিনোদ গলা তুলিয়া বলিল—"ভানু চললে নাকি হে? দাঁড়াও, আমিও ওই দিকেই যাব।"

৪

অনিল এবং হরকালীও চলিয়া গেল।

গোবর্দ্ধন বলিল—"একটু ঘরের ভেতর চল, শৈল-দা।

দুই জনেই উঠিয়াছি, এমন সময় কানে আসিল—"কে আমাদের গোবর্দ্ধন নাকি?"

রাস্তার পানে চাহিয়া দেখি বিশ্বম্ভর-কাকা।

বিশ্বম্ভর-কাকার একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। ঠিক কাকার মত বয়স নয় ওঁর। একটির পর একটি শেষ করিয়া যথাক্রমে চারিটি বিবাহ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টে মোটা মাহিনার চাকরি করিতেন, শেষ বিবাহটি রিটায়ার করিবার পর; প্রায় বছর-সাতেকের কথা হইল। চুলে কলপ দিয়া এবং সর্বদাই ফিটফাট থাকিয়া বয়সটাকে যেন আটকাইয়া রাখিয়াছেন। কথাবার্তার একটি বিশেষ তো আছে—বড়দের সঙ্গে কথাবার্তায় বলেন—"আপনার ভাদ্দরবউ বললে…" ছোটদের সঙ্গে হইলে বলেন—"তোমার খুড়ী বলছেন…" ইত্যাদি।

এই করিয়া আমাদের মহলে শাশ্বত কাকা হইয়া আছেন।

আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিলেন—"তুমি এখানে, আর তোমার সারা দুনিয়ায় খোঁজ পড়ে গেছে, কিছু নয়ত চার বার তোমার বাড়ীতে লোক পাঠিয়েছে তোমার খুড়ীমা। ভীষণ খাপ্পা, বলছে—এক বার আসুক গোবর্দ্ধন, আমাদের ফাঁকি দিয়ে নাচের ব্যবস্থা করা বের করছি…এই যে শৈলেনও রয়েছ, এ কি কাণ্ড করেছে বল দিকিন! মেদিনীপুরের জন্যে টাকা তুলবে, সোজা কথায় বললেই হ'ত, সিনেমা ষ্টারের হুজুগ তুলে মেয়েদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে একি হয়েছে?…তার পরে নাচ যা হবে তা ত বুঝতেই পারছি—এদিকে হাণ্ডবিলে ত আকাশে তুলে দিয়ে বসে আছ।"

বিশ্বম্ভর-কাকা গোবরা কি উত্তর দেয় শুনিবার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, গোবরা তাড়াতাড়ি বলিল—"আজ্ঞে কাকা সে কি বলছেন?—নাচগান, একটিং, পোজ, ফিগার সবতেই সাহানা দেবী আজকাল ফার্ষ্ট যাচ্ছেন—ওর মধ্যে একটা কথাও যদি মিথ্যে হয় ত…"

বিশ্বম্ভর-কাকার মুখটা একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—বলিলেন "ওসব বাজে কথা ছাড়, রিজার্ভ সিটগুলো সব বিলি করে ফেলেছ ত?"

"আজ্ঞে না, খানকয়েক আছে এখনও।"

"তোমাদের খুড়িমা বললে—আমায় পেছন দিকে সিট দিলে কিছু আর বাকি রাখব না গোবর্দ্ধনের, আমি কানা মানুষ, চোখে চশমা দিয়ে তবে দেখতে পাই, সেটা যেন সে মনে রাখে, চার বার লোক পাঠিয়েছে তোমার কাছে। তোমরা হাঙ্গাম বাধাবে, খরচে খরচে আমার ওষ্ঠাগতপ্রাণ। ফেরবার সময় এক বার ঐ দিক হয়ে যেও।…দাঁড়াও, দেখি…"

পকেট থেকে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া দেখিয়া কহিলেন—"আছে টিকিট তোমার সঙ্গে?"

গোবরা একটা বই বাহির করিয়া বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে।"

"তা হলে দিয়েই দাও খান-তিনেক—মেয়েটার অর্ধেকের বেশী চার্জ দিচ্ছি না কিন্তু।"

ছেলেমানুষের মত পাশের লোককে সাক্ষী রাখিয়া কথা

কহিবার অভ্যাস, আমায় আবার বলিলেন—"কি ভোগান্তি বল দিকিন শৈলেন ? কান দুটো ধরে মলে দিতে ইচ্ছে করে না এ উপদ্রবের জন্যে ? হ্যাঁ, বুঝতাম একটা ভাল লোক কেউ আসছে···"

হাসিয়া বলিলাম—"চিরকালই ত এই রকম ওর।"

তিনখানা টিকিট লইয়া প্রসন্ন মনে শিস দিতে দিতে চলিয়া গেলেন।

ভিতরে গিয়া আমরা টেবিলের সামনে দুইখানা চেয়ার টানিয়া বসিলাম। গোবরা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"তোমায় এর মধ্যে টানতে চাই না শৈল-দা, তাই এই ভাঁওতাটুকু দিলাম।"

পকেটের মধ্যে বাঁ হাতটা প্রবেশ করাইয়া দিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল—"এই হ'ল নমুনা শৈল-দা, মানে নাচ দেখিয়ে মেদিনীপুরের জন্যে টাকা চাওয়া হচ্ছে বলে সবার প্রাণে বড্ডই, আঘাত লেগেছে।"

আমার মুখের দিকে চাহিয়া আবার একটু হাসিল, তাহার পর তিনটা পকেট থেকে টানিয়া টানিয়া একরাশ নোট টেবিলের উপর জড় করিল, এক টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা হরেক রকমের। শেষ হইলে আর এক বার হাসিয়া বলিল—"এক বার, —ওর নাম কি—আঘাতের পরিণামটা দেখো!"

সবগুলা আলাদা আলাদা সাজাইয়া গুনিয়া দেখা গেল একুনে তিন শত বিয়াল্লিশ টাকা।

আমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিলাম, "ভানু—এদের টাকা নিয়ে সাড়েচার-শ'র ওপর ত এইখানেই হ'ল।···পাঁচ-শ পর্যন্ত ঠেকিয়ে দেবে বোধ হয়···তোমায় সে কি বলে···"

গোবরা তাড়াতাড়ি বলিল—"আশীর্বাদ অভিশাপের কথা পরে হবে, শৈল-দা, কাজটা আগে শেষ করি। পাঁচশ-ত গালাগাল শৈল-দা, হাজার পর্য্যন্ত না পারি, এর ডবলে ত সন্দেহই নেই, এখনও দুটো দিন হাতে রয়েছে।"

বলিলাম—"বল কি! আর ঐ যে বললে—সাহানা দেবী ? এক পয়সাও দিতে হবে না, ওটাও কি সত্যি ?"

গোবরা কামিজের গলার বোতাম খুলিয়া ডান হাতটা বুকের কাছে লইয়া যাইতে যাইতে থামিয়া গিয়া বলিল—"নাঃ, গোবরার মুশকিল যে পৈতে ছুঁয়ে বললেও বিশ্বাস করবে না।···এই সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে ওর চেয়ে বড় সত্যি কথা আর একটাও নেই শৈল-দা।···নাও, টাকাগুলো রেখে দাও। আমি আবার কাল এই সময় বা আর একটু পরে আসব। এখন উঠি, এদেরগুলো আদায় ক'রে ফেলিগে···"

উঠিতে যাইতে চাকরটা ট্রে করিয়া সকলের জন্য চা লইয়া উপস্থিত হইল।

গোবরা আবার বসিয়া পড়িল—"ভারতীয় চা!"

চাকরটা প্রশ্ন করিল—"আর সব বাবুরা চলে গেছেন ? এ তিনটে কাপ নিয়ে যাই তাহলে ?"

গোবরাই উত্তর দিল, বলিল, "না, ভাগো।···বিখ্যাত চাঁদারু গোবর্ধনবাবু বলেন যখনই আমার পরের মনিব্যাগ খালি করিবার মহৎ উদ্দেশ্য মনে উদয় হয়, আমি একাদিক্রমে পাঁচ-ছয় কাপ করিয়া চা পান করিয়া লইয়া থাকি। মস্তিষ্কে কূটবুদ্ধি সঞ্চার করিতে ভারতীয় চায়ের মত কোন বস্তুই যে নাই এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।···আমারও একটা ফটো তোলবার ব্যবস্থা ক'রে দাও না শৈল-দা।"

চারিটা কাপ শেষ করিয়া রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে রকের সিঁড়ি পর্যন্ত গেল, তাহার পর আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, কালকে এসে যদি দেখি কেউ বসে আছে ত আজকের চেয়েও জোর ক্যানভাসিং লাগাব শৈল-দা তোমার সঙ্গে, বলব দু-দিন থেকে হাজরি দিচ্ছি, তবুও মন টলাতে পারলাম না তোমার ?"

যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া বলিল—"তুমি অবশ্য টলবে না, তাহলে পরশু আসা আবার বন্ধ হয়ে যাবে আমার।"

তৃতীয় দিন আসিয়া সে দিনের সমস্ত উপার্জন গণিয়া দিয়া গোবরা বলিল—তাহলে হ'ল গিয়ে পরশু তিন-শ বিয়াল্লিশ, কাল তিন-শ পাঁচ, আর আজ এই এক-শ সাতানব্বই ;—সবসুদ্ধ আট-শ চুয়াল্লিশ।

একটু যেন নিরাশ হইয়া বলিল—না, মেহনতই সার হ'ল, ভেবেছিলাম হাজার পর্যন্ত টেনে তুলব।

বলিলাম—গেটে বিক্রি আছে, মনে হয় হাজার টপকেই যাবে।

গোবরা তাড়াতাড়ি বলিল—বাপরে, গেটের হাঙ্গাম কখনও রাখি!···হ্যাঁ, এখন যা আসল কথা—বাবাজী পরশু ঠিক আসছেন তো ?

বলিলাম—হ্যাঁ, আজও তাঁর চিঠি পেলাম।···কিন্তু গোবর্ধন, তাঁকে ও নাচের মধ্যে টেনে তুলতে পারব না ভাই ; তিনি প্রকৃতই একজন সাত্ত্বিক মানুষ, ওসব···

গোবরা এমন ভাবে আমার মুখের পানে চাহিল, যেন আকাশ থেকে পড়িয়াছে, বলিল—গোবরার কি পরকালের ভয় নেই শৈল-দা ? নাচ কোথায় ?···খানকতক হ্যাণ্ডবিল ছাপালেই যদি সাহানা দেবী এসে পড়তো তাহলে তো আর তার ব্যবসা চলত না। এই নিন পড়ুন···থাক্, আমিই পড়ে দিচ্ছি ; কিন্তু একটা সর্ত্ত শৈল-দা, উল্টে দিতে পারবেন না—চার দিন আহারনিদ্রা কাকে বলে জানি নে।

গোবরা পড়িতে লাগিল—

আসুন! শুনুন!! ধন্য হউন!!!

স্থানীয় টাউন হলে মহাপুরুষের অগ্নিময়ী বক্তৃতা!!

৫

'একেই কি বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে ?' মেদিনীপুর প্লাবন-ত্রাণ-সমিতির উদ্যোক্তারা অর্থ সংগ্রহের জন্য টাউন হলে বিখ্যাত

অভিনেত্রী শ্রীমতী সাহানা দেবীর নৃত্য-গীত এবং অভিভাষণের আয়োজন করিয়া স্থানীয় ভদ্র সমাজে বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; যেহেতু পরে জানা গেল এ-উপায় স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণ একেবারেই অনুমোদন করেন না। উদ্যোক্তাগণ যেখানেই গিয়াছেন প্রচুর আনুকূল্য এবং অর্থসাহায্য পাইয়াছেন, কিন্তু একটা মহৎ কার্যের জন্য বিলাস-আয়োজনরূপ হীন পন্থা অবলম্বন করায় সকলেই মর্মাহত হইয়াছেন। উদ্যোক্তারা সবিশেষ লজ্জিত এবং তাঁহাদের একমাত্র নিবেদন এই যে তাঁহারা শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা অত্রত্য মহৎপ্রাণ নাগরিকদের ক্ষমার্হ।

এই সঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে অনুতাপানলে বিদগ্ধ হইলেও এই আয়োজন রদ করিবার উদ্যোক্তাদিগের হস্তে কোন উপায়ই ছিল না। কিন্তু ভগবান্ সাধু ব্যক্তিদের সমবেত মর্মশ্বাস শ্রবণ করিয়া তাঁহার অশেষ করুণায় নিজেই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কল্য রাত্রে উদ্যোক্তারা শ্রীমতী সাহানা দেবীর নিকট হইতে তারযোগে সংবাদ পান যে কোন অনিবার্য কারণে তিনি উপস্থিত হইতে অসমর্থা।

সংবাদ পাইয়াই উদ্যোক্তারা রাত্রের ট্রেনেই মিশনের অক্লান্ত কর্মযোগী, অধুনা মেদিনীপুর-আর্তসেবা-নিরত শ্রীশ্রীল ধীরানন্দ মহারাজজীর নিকট লোক পাঠান। উদ্যোক্তারা বিশেষ হর্ষের সহিত তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকদের বিদিত করাইতেছেন যে অদ্য দ্বিপ্রহরে তারযোগে সংবাদ পাওয়া গেছে যে অত্রত্য শহরবাসীদিগের পক্ষে উদ্যোক্তাদের শ্রদ্ধা ও আগ্রহ দেখিয়া শ্রীশ্রীল মহারাজজী মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য আসিয়া সর্বসমক্ষে মেদিনীপুর সম্বন্ধে তাঁহার নিদারুণ অভিজ্ঞতা বর্ণন ও এতদ্বিষয়ে দেশবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ দিতে সম্মত হইয়াছেন।

বিবেকানন্দের বজ্রনির্ঘোষের প্রতিধ্বনি শতাব্দী অতিক্রম করিয়া আজ আপনাদের কাছে উপস্থিত, কর্ণগোচর করিয়া জীবন ধন্য করুন। নূতন করিয়া দরিদ্রনারায়ণ সেবায় প্রণোদিত হউন।

অভাবনীয় সুযোগ! স্থানীয় টাউন হল!! আগামী ৪ঠা নভেম্বর, শুক্রবার দিবা ৫ ঘটিকা!!! বাংলার নারী, বাংলার পুরুষ, বাংলার যুবা, বাংলার আশা, বাংলার ভরসা—বাংলার যুগ-বিশ্রুত সেবামন্ত্রে আবার দীক্ষিত হউন।

ওঁ তৎসৎ! ওঁ তৎসৎ!! ওঁ তৎসৎ!!!

আমি বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গিয়াছিলাম, এতবড় একটা প্রবঞ্চনার শেষে 'ওঁ তৎসৎ' জুড়িবার ঘটা দেখিয়া একেবারে ডুকরাইয়া হাসিয়া উঠিলাম। গোবরা আমার পানে একটু আড়ে চাহিয়া বলিল—ভেক না হলে কখনও ভিক্ষে মেলে শৈল-দা?... হ্যাঁ, এটা মাষ্টার মশাইকে দিয়েই লিখিয়ে নিলাম, বেশ হয় নি?

অনেক কষ্টে হাসিটা সামলাইয়া লইয়া বলিলাম—তা তো হয়েছে কিন্তু এ করেছ কি গোবর্ধন! এ যে মার খাবার মতলব করেছ, তা ভিন্ন পুলিস কেস হ'তে পারে!

গোবরা একটু ঠোঁট চাটিয়া লইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—পুলিস সাহেব সমস্তটাই জানে, আপনাদের আশীর্বাদে একটু নেকনজরে দেখে। হেসে শুধু বললে—'You will be in deep water Babu' (তুমি মহা ফ্যাসাদে পড়ে যাবে বাবু)...ওদিকে কিছু ভয় নেই শৈল-দা। আর মারের কথা...

গোবরা হঠাৎ নীচু হইয়া আমার পায়ের ধুলা লইল, বলিল—এ শহরে গোবরাকে মারে সে এখনও জন্মায় নি শৈলদা।

ভয় আমার ঘুচিতেছে না, বলিলাম—এর মধ্যে রয়েছেন ভেবে তাঁকেও তো অপমান করতে পারে।

গোবরা বলিল—ঐ তো নয় শৈল-দা, অপমানই যদি গায়ে মাখলেন তো আর বাবাজী কি?...কিন্তু সেদিকে আপনার কিছু ভয় নেই। কি রকম প্রসেসনটা ক'রে ষ্টেশন থেকে নিয়ে আসি একবার দেখবেন না। গোবরা কি এতই অসহায় শৈল-দা? তা ভিন্ন যারা শুণ্ডামি করতে পারে তাদের মধ্যে তো বেচিও নি টিকিট, আর গেটে বেচার হাঙ্গামই তুলে দিয়েছি। সে সব কিছু ভয় নেই শৈল-দা। এখন শুধু এইটুকু দেখতে হবে যে বাবাজী ভেতরকার ব্যাপারটা যেন টের না পান, তাহ'লে আবার হাত গুটিয়ে বসবেন, বিপদ তো এক রকম নয়!

যাইতে যাইতে রাস্তা হইতে ফিরিয়া আসিয়া গোবরা বলিল—আসল কথাই ভুলে যাচ্ছিলাম, কাল সন্ধ্যের সময় কয়েক জন লোককে তোমার এখানে চায়ের নেমন্তন্ন করতে হবে শৈল-দা, তোমার এ বাতিকটা তো আছেই, কালও একবার হয়ে যাক; এই নাও লিষ্ট। খরচটা আমি হ'লে চাঁদা থেকেই টেনে নিতাম, তা—তুমি তো আর...

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—খরচের কথা থাক্, কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি?

ট্রেড সিক্রেট শৈল-দা—ঈষৎ হাস্যের সহিত কথাটা বলিয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

৬

পরদিন যথাসময়ে আমরা জনদশেক সামনে চা আর খাবারের প্লেট লইয়া বসিয়া আছি—ভাদু, বিশ্বম্ভর-কাকা, হরকালী, এরা সবাইও আছে—গোবরা হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া হাজির হইল, একবার সবার উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিল—এই যে সবাই রয়েছেন দেখছি—আপনারা যা চেয়েছিলেন তাই হয়ে গেল—এখন বুঝছি একট্রেসের হাঙ্গাম করাটা সত্যিই ভালও হ'ত না। সবাই যাবেন, কাল পাঁচটা—টাউন হল শৈল-দা, আমার এক তিল দাঁড়াবার ফুরসৎ নেই—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী এক বার অতি অবিশ্যি করে ডেকে পাঠিয়েছেন—দেশী অফিসার হ'লে এই সুবিধে—কবে যে স্বরাজ হবে...একটা কথা, বাবাজীকে এনে আপনার এখানেই তুলব, বেশীক্ষণ নয়—চারটের এ্যারাইভেল—প্রসেসন—পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত—টাউন হল—আবার নটায় গাড়ী—ভাদুদা কি বিশ্বম্ভর-কাকার ওখানেই তুলতাম—বড্ড দূর

পড়ে যায় তাই···আসি তা'হলে···না না, মরবার ফুরসং নেই, বলছেন—চা খেয়ে যাও!

ট্রেড সিক্রেটটা বোঝা গেল। একবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও সবার মুখের উপর দৃষ্টিটা গিয়া পড়িল।

পরদিন ষ্টেশনে গিয়া দেখিলাম প্রায় শ দু-এক স্কুলের ছেলে লইয়া একটি মাঝারি সাইজের প্রসেসনেরও ব্যবস্থা করিয়াছে গোবরা, জন কুড়ি-পঁচিশকে কোথা হইতে যোগাড় করিয়া গেরুয়া আলখাল্লাও পরাইয়া দিয়াছে, সবার হাতেই 'ওঁ তৎসং' পতাকা।

খানিকটা পথ ঘুরিয়া সাড়ে পাঁচটার পর আমরা টাউন হলে প্রবেশ করিলাম। ওঁ তৎসং এর এখানেও ছয়লাপ, কিন্তু অতবড় হলটায় টিকেট সেলের দিক দিয়া যেখানে আমরা অন্তত হাজার দুয়েক লোকের আশা করিয়াছিলাম, সেখানে জোর দুই-শ কি আড়াই-শ চেয়ার পাতা রহিয়াছে। একান্তে গোবরাকে প্রশ্ন করিলাম—করেছ কি!

গোবরা বলিল—ওঁ তৎসং আমার হাতে, তাতে ত কম করি নি; কিন্তু মানুষ ত আমি টেনে আনতে পারি না শৈল-দা, মিছিমিছি কুলিগুলোকে দিয়ে চেয়ার বওয়াই কেন? আধ ঘণ্টারও বেশী হয়ে গেল, আর লোক আশা কর?

একবার শ্রোতাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম—স্ত্রীলোকদের আসনে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ এবং এদিক ওদিক আরও কয়েক জন বর্ষীয়সী মহিলা লইয়া হদ্দ জন-তিরিশেক হইবে, বেটাছেলেদের দিকে গুনিয়া-গাথিয়া এক শতের অধিক নয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি জেলা-আফিসের অফিসার, কেরাণী। আমরা আসিতে ভলন্টিয়ারদের অনেকে গিয়া খালি আসনগুলি দখল করিল।

মেদিনীপুরের প্লাবনের সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া যাইতেছেন—"গিয়ে দেখলাম এক-একটা গ্রামে যে লোক ছিল কোন কালে, এমন কোন চিহ্নই নাই—এক এক জায়গায় মৃত পশুর স্তূপ, তার সঙ্গে মানুষের শব—ধ্বংসের দেবতা লোকালয় ভেঙে নরকের সৃষ্টি করেছে—সমুদ্রের বালি তার তৃষিত লালায়িত জিব দিয়ে সবুজ শস্যের শেষ কণাটি পর্যন্ত যেন নিঃশেষ ক'রে ফেলেছে—কি অসহ্য দৃশ্য! যারা রয়েছে তাদের মানুষ বলে চেনা যায় না—ক্ষুধায়, লজ্জাহীনতায়, নিরাশায় তাদের চোখে অমানুষিক দৃষ্টি—জীবজগতে তারা কি কখনও আমাদেরই স্বজাতি ছিল?···আমি সন্ন্যাসী, কিন্তু ভগবানকে যেন আর দেখতে পাচ্ছি না, তাই গভীর নিরাশায় মানুষের কাছে ছুটে এসেছি—যে ভগবান তাদের মধ্যে লুপ্ত হয়েছেন, তিনি আপনাদের মধ্যে পূর্ণ দীপ্তিতে জাগুন—ভাইয়ের বোনের মুখে অন্ন দিয়ে, লজ্জা নিবারণ করে, একটু মাথা গোঁজবার সংস্থান ক'রে দিয়ে আপনারা আবার আমাদের ভগবানে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলুন···"

সামনের ভাবলেশহীন মুষ্টিমেয় শ্রোতৃবৃন্দের পানে চাহিয়া বসিয়া আছি। বক্তার পাশেই আছি, কিন্তু মনে হইতেছে যেন কত দূর থেকে একটা ক্ষীণ আবেদন কানে ভাসিয়া আসিতেছে—"মানুষের কাছে ছুটে এসেছি···ভগবানে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলুন···"

আমার মনোনেত্রে একটা দৃশ্য কেমন করিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে···এই টাউন হল—রিসার্ভ সীটে সরকারী খুড়ীমা সহ সরকারী খুড়া বিশ্বম্ভর-কাকা—পরিপাটি সাজসজ্জা···আরও সবাই—তাহাদের পিছনেও মানুষের সমুদ্র—ফার্ষ্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস, গেলারী—লোককে আর জায়গা দেওয়া যায় না···সম্মুখে সুসজ্জিত ষ্টেজে নৃত্যপরা তারকা—তারকাই বটে, বিদ্যুতের আলো চঞ্চল রূপের উপর পড়িয়া যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে···

হঠাং ব্রহ্মচারীর ক্ষীণ আবেদনটুকুও নিমজ্জিত করিয়া ব্যাণ্ডের সঙ্গে লাউড স্পীকার সিনেমার বিজ্ঞাপন নিনাদিত করিয়া উঠিল—"আসুন আপনাদের চিরপ্রিয় অতঃ কিম্—অলকায় পঞ্চম এবং শেষ সপ্তাহ—"অতঃ কিম্—অতঃ কিম্···"

ডিগুভামেটার জঙ্গল, করনুল

(সত্য ঘটনা)

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

শিকারের নেশায় ঘুরিতে ঘুরিতে মান্দ্রাজ হইতে পাঁচ শত মাইল দূরে করনুল দেশে ডিগুভামেটা গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছি। এই দুর্দ্দিনে শিকার-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে কুণ্ঠা আসার কথা, কারণ উহা লোকমতে বিলাসিতার একটি অঙ্গ। শিকার আমার নিকট ঠিক বিলাস নহে, বাঁচিয়া থাকার একটি অবলম্বন; প্রকৃতিগত ধর্ম্ম—যাহা অহরহ সভ্যতার নানা উৎকর্ষে সংস্পর্শে আসিয়াও কিছুমাত্র সংস্কৃত হয় নাই, আদিম বুনো অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে।

সংস্কারবদ্ধ ধর্ম্মান্ধ পুণ্যার্থে যে ভাবে নানা ক্লেশ স্বীকার করিয়া তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ অনেক সময় অনাহার ও অনিদ্রা সহ্য করিয়া শার্দ্দূল দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ম্যালেরিয়াক্রান্ত দেশে গভীর অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াই।

ভয়ঙ্করের রূপ দর্শনে মুগ্ধ হই, বধ করিতে পারিলে অবর্ণনীয় আনন্দ পাইয়া থাকি। অহিংসাবাদী এই আনন্দকে বলিবেন পৈশাচিক হিংস্র প্রবৃত্তি। বলুন, তাঁহার আত্মতৃপ্তিতে বাধা দিব না। আমার বক্তব্য বিষয় শিকার, ধর্ম্মনীতি অথবা দর্শনতত্ত্বের গবেষণা নহে। সুতরাং ঘটনাগুলি লিখিয়া যাই।

স্থানটি মাদ্রাজ প্রদেশের একটি বিখ্যাত মৃগয়াভূমি। এইখানে অপ্রত্যাশিতভাবে একটি নূতন রকমের মানুষ আবিষ্কার করিলাম। ভদ্রলোক স্থানীয়, রেঞ্জ অফিসার, নাম শ্রীযুক্ত পি, চিঙ্গেল রেডি। তিনি অযাচিতভাবে পরোপকার করিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে বলিয়া বসেন, ত্রুটি থাকিলে মার্জ্জনা করিবেন। প্রগতির যুগে প্রকাশ্যে এই-রূপ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়া তিনি একঘরে না হইয়া কেমন করিয়া সুস্থভাবে টিকিয়া আছেন জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া বুঝিলাম তাঁহাকে চালাকের সমাজ হইতে দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয়, কারণ তিনি বেপরোয়া ধরণের মানুষ, তাহার উপর মিথ্যা কথা পারতপক্ষে বলিতে চান না। রেডি মহাশয়ের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করিলাম, কারণ এই কাহিনীর সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ আছে।

ষ্টেশনে আসিতেই দেখিলাম তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সদলবলে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। পোষাকে সনাক্তের চিহ্ন ছিল, চিনিতে অসুবিধা হইল না। ট্রেন হইতে নামিয়া আমার সহযাত্রী শ্রীযুক্ত আনসারি পাতসার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলাম। পাতসা সাহেবকে সঙ্গে আনিয়াছিলাম, জঙ্গলের নানা অসুবিধা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায়, কারণ তিনিও জঙ্গল দেশের লোক, ভিন্ন স্থানের রেঞ্জ অফিসার।

ষ্টেশনের বাহিরেই গোযান অপেক্ষা করিতেছিল—রাইফেলের গাদা ও অন্যান্য ভারী মাল তাহাতে তুলিয়া দিয়া আমরা হাঁটিয়া ফরেষ্ট বাংলোর দিকে চলিতে লাগিলাম। বেলা তখন পাঁচটা হইবে।

প্রথমেই কাজের কথা পাড়িলাম—ইতিমধ্যে বাঘ কোন গরু অথবা মহিষ মারিয়াছে কিনা। উত্তর আসিল, "না"। কুড়ি দিনের ছুটি মজুত ছিল—দমিলাম না। পরে কথা-প্রসঙ্গে জানিলাম—আমার শিকারের জন্য ক্রীত তিনটি মহিষ বিভিন্ন মওড়ায় গত চার দিন ধরিয়া বাঁধা হইতেছে, কিন্তু জন্তুগুলি জাবর কাটা ছাড়া অন্য কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই। ইহার পর পথে শিকার সম্বন্ধে উল্লেখ-যোগ্য আর কোন কথা হয় নাই। ফরেষ্ট বাংলো ষ্টেশন হইতে অতি নিকটে, পৌঁছাইতে সময় লাগিল না, চতুষ্পার্শ্বে জঙ্গল, আবেষ্টনী ভাল লাগিল।

অপরাহ্ণ উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, একটু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলাম—প্রশ্ন করিলাম আজ মাচানে বসা চলে না? রেডি মহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন, "সমস্ত রাত, সমস্ত দিন ট্রেনে গেল, আজই মাচানে বসবেন? আজ ক্লান্ত হয়ে আছেন বরং বিশ্রাম করুন। মনে মনে ভাবিলাম, হায় রে আমি কেন দুর্ম্মুখ G. B. S.এর মত বলিতে পারি না—গড়াইল গাড়ীর চাকা, আর ক্লান্ত হইলাম আমি? অনুমান করিলাম, মাচান তৈয়ারি হয় নাই। সন্দেহ ভঞ্জন নিমিত্ত সলজ্জ ভাবে উত্তর দিলাম, ট্রেনে বসিয়া বসিয়া ভ্রমণ করিলে আমার ক্লান্তি আসে না। ভদ্র সন্তানের পক্ষে, এমন একটি উক্তি শোভনীয় হইবে না জানিয়াই কৃত্রিম লজ্জার অব-গুণ্ঠন টানিয়াছিলাম।

আমার অনুমান মিথ্যা হয় নাই। রেডি মহাশয় বলিলেন, মাচান তো তৈরি নেই, বেলা পড়ে গেছে, সন্ধ্যার আগে যদি কোন প্রকারে দাঁড় করান যায় তো আপনাকে live baitএর উপর বসতে হবে। এদিকটা আবার সবই "ষ্ট্রাইপ্‌স" (বড় বাঘ), গুলি না লাগলে ক্ষতি নেই কিন্তু ঠিক জায়গায় তাগ না হলেই বিপদ। বাঘ জন্তুটা বড় বটে, কিন্তু vital part তো বড় নয়। নিশানাটা খুব পাকা হওয়া দরকার, কারণ বাঘ যখন পশু আক্রমণ করে তখন অত্যন্ত সতর্ক থাকে। তাড়াহুড়ায় ভুল জায়গায় গুলি লাগলে সে পশুকে ছেড়ে শিকারীকেই তাড়া ক'রে বসে। এদিককার এলাকায় সব দিকেই মহিষ বাঁধা হয়ে গিয়েছে, এখন সান্দ্রাপাড্ডুর পথে চেষ্টা করা চলে, কিন্তু সেখানে গাছ-গুলো বেজায় নীচু, তার উপর পলকা। জীবন্ত মহিষ রেখে বসা ঠিক হবে না। কয়েক দিন অপেক্ষা করুন একটা-না-একটা মহিষকে ঠিক মেরে দেবে, তখন ধীরে সুস্থে মাচান বেঁধে মারবেন। বসে বসে খাবে, টিপ করবার অনেক সময় পাবেন। পূর্ব্ব হইতে মাচান না বাঁধার ত্রুটি সামলাইতে গিয়া অযথা পাকেপ্রকারে আমার লক্ষ্যভেদ-নৈপুণ্যের উপর কটাক্ষপাত করিতে ছাড়িলেন না। ইচ্ছা হইল রাইফেল বাহির করিয়া তখনই লক্ষ্যভেদের ভেল্কিবাজী দেখাইয়া দি, কিন্তু বিরত হইলাম এই ভাবিয়া, হয়ত ভদ্রলোক অনেক নামকরা শিকারীর টিপ স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়া থাকিবেন। সেই কারণেই নিশানা সম্বন্ধে তিনি সহজে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারেন না, তা ছাড়া আমি ডিগুভামেটায় আসার দরুন তাঁহার অভিভাবকত্বের দাবিও জন্মাইয়াছিল যাহা আমার মত পরমুখাপেক্ষী অস্বীকার করিতে পারে না।



দেখিলাম—সাক্ষাৎ মৃত্যুর করালমূর্ত্তি, চোখ দুইটি অগ্নি-গোলার ন্যায় জ্বলিতেছে

গল্প করিতে করিতে তিনি জানাইয়া দিলেন—কতকগুলি সাহেব ও দেশী অফিসার এখানে শিকার করিতে আসিয়া বাঘের কামড়ে মরিয়াছিল। ঘরের ছেলে ঘরে মরিলে তাঁহাকে শবদেহগুলি লইয়া জ্বালাতনে পড়িতে হইত না। অনভিজ্ঞ শিকারীর দল মরিয়া মরিয়া তাঁহাকে কি ভাবে নাজেহাল করিয়াছিল তাহার বিশদ বিবরণ দিয়া চলিলেন। গল্প চলিতেছিল তাহারই ফাঁকে নিকটেই স্যামবারের (অশ্বের ন্যায় বৃহৎ মৃগ) ডাক শুনিলাম। চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম, বাঘ শিকারে না আসিলে হাতে রাইফেল লইয়া শব্দ অনুসরণ করিতাম। কিছুক্ষণ পরে পাচক আসিয়া জানাইয়া গেল খানা প্রস্তুত। গভীর অরণ্যে কুক্কুট মাংসের সহিত মোগলাই পরোটার যোগাযোগ কল্পনাও করিতে পারি নাই। পরম পরিতোষের সহিত আহার শেষ করিয়া কায়মনোবাক্যে রেড্ডি মহাশয়ের কল্যাণ কামনা করিলাম।

পরের দিন সকলে সান্দ্রাপাড়ুতে যাইবার প্রস্তাব করিলাম। রেড্ডি মহাশয় বিপদের কথা পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন, পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিলেন যে আমি মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করিতে চলিয়াছি—কিন্তু আমার সঙ্কল্প স্থির দেখিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও সান্দ্রাপাড়ুতে মাচান বাঁধিবার আদেশ দিলেন।

মাচানের কামুফ্লাজিং (camouflaging) সম্বন্ধে আমি একটু বাতিকগ্রস্ত। সব দিক হইতে নিজে না দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি না। শিক্ষিত বাঘেদের আবার উঁচু নজরটাই বেশী, বেটের (bait) নিকটে আসিবার আগে গাছের ডালগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইয়া থাকে। আবেষ্টনীর সহিত সামান্য গরমিল দেখিলেই সন্দিগ্ধ হইয়া পড়ে এবং বধ্য জীবটি যতই সুস্বাদু হউক না কেন অবহেলায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

বেলা চারটার সময় রওনা হইলাম। পৌঁছাইতে ঘণ্টাখানেক লাগিয়াছিল। এদিকটা ডিগুভামেটার মত নয়। অনুর্ব্বর জমি, রৌদ্রতাপে স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে। মাচানের নিকটে আসিয়া দমিয়া গেলাম—বেজায় নীচু, সাত-আট ফুটের বেশী হইবে না, তাহার উপর ছোট ঘরের

মত দেখাইতেছে—যথাসম্ভব ত্রুটিগুলি সংশোধন করিয়া বেলা থাকিতেই বর্ণবাস (স্থানীয় বৃদ্ধ শিকারী) সহ উপরে উঠিলাম। রাইফেল ও গান্ পাশাপাশি রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম। মহিষটি মাচান হইতে প্রায় এক শত ফুট দূরে বাঁধা হইয়াছিল—ব্যবধানটি ভালই লাগিল। জখম হইলেও এক লাফে বাঘ ঘাড়ের উপর আসিতে পারিবে না—দুই বার গুলি চালাইবার যথেষ্ট সময় পাইব। কুলীদের মাচানের কাছাকাছি বসিয়া গল্প করিতে বলিয়া দিলাম। লোকগুলি মাচানের নিকট গল্প করিলে বাঘ সন্ধ্যার সময়েও এদিকে আসিবে না, ইত্যবসরে বাঘকে ভড়কাইয়া আমি মহিষের কাঁধে টর্চ ফেলিয়া আলো ঠিক করিয়া রাখিতে পারিব।

যে-স্থানটিতে মহিষ বাঁধা হইয়াছিল সেখানে ঘন ঝোপের জন্য সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কাজ চালানর মত অন্ধকার হইয়া আসিল—বুদ্ধিটি কাজে লাগাইলাম। আলোর ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেলে লোকগুলিকে গল্প করিতে করিতে চলিয়া যাইতে বলিলাম। তখন আকাশের পিঙ্গল-মিশ্রিত ফিকে গোলাপী রং মলিন হইয়া আসিতেছিল। দূরের পাহাড়গুলি একের পর এক অন্ধকারে মিলাইতে সুরু করিয়াছে—মাঝে মাঝে কেকারব শুনিতেছি—এক জোড়া বুলবুল পাশের ঝোপে মিহি সুরে গান ধরিয়াছে। মৃদু সমীরণে, দূর হইতে বনফুলদলের মধুর গন্ধ বহিয়া আসিতেছে। আবেষ্টনীতে রোমান্সের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, প্রকৃতির এই রসলীলায় আমিও মাতিয়াছি, বয়স কমিয়া যাইতেছে, কল্পনা রসরাজ্যে অভিযানের জন্য প্রস্তুত। ঠিক এমনি সময় শুনিলাম, খস্ খস্ খস্ শব্দ—মাচানের পিছনে। শুষ্ক পত্রের উপর সন্ত্রস্ত পদবিক্ষেপে কোন জন্তু চলিয়া আসিতেছে—গতি তাহার মন্থর। সঙ্গে সঙ্গে বর্ণবাস আমাকে স্পর্শ করিল—সঙ্কেতে জানাইয়া দিল প্রস্তুত হও। তাহার সঙ্কেতের অপেক্ষায় আমি ছিলাম না—যথাসময়ে রাইফেল বগলে তুলিয়া লইয়াছিলাম।

শব্দ থামিয়া গিয়াছে, পলে পলে সময় কাটিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সম্মুখের দৃশ্য অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে—কান খাড়া করিয়া বসিয়া আছি।

কিছুক্ষণ পরে আবার শব্দ আসিল খস্ খস্ খস্ আরও নিকটে এবং কিঞ্চিৎ দ্রুত। উত্তেজনায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে, পাশেই জলাধার রহিয়াছে কিন্তু তাহা তুলিয়া পান করিবার সাহস নাই, পাছে কোন শব্দ করিয়া ফেলি। কতক্ষণ এই ভাবে বসিয়াছিলাম স্মরণ নাই, হঠাৎ গলা এমন ভাবেই খুস্ খুস্ করিয়া উঠিল যে, নিজেকে সামলাইতে পারিলাম না, বহুবার কাশিয়া ফেলিলাম এবং কপালে করাঘাতও করিলাম। সব কিছুই পণ্ডশ্রম হইয়া গেল—নিজেকেই ধিক্কার দিলাম। বর্ণবাস ত্বক্ ও জিহ্বার সাহায্যে যে শব্দ বাহির করিল তাহার আনুমানিক অর্থ—এমন সময় না কাশলেই কি চলত না বাবু—বাঘ যে পালাল। সঙ্কেতটি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত লাগিল।

এখন কিছুরই আশা নাই, মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সশব্দে জলাধার তুলিয়া শুষ্ক কণ্ঠকে সিক্ত করিয়া নিলাম। শ্মশান-বৈরাগ্য আসিয়া গিয়াছে, শ্মশানে সকলেই সমান। সাধারণ টর্চটা মাচানের ভিতরে জ্বালাইয়া বর্ণবাসের হাতে একটা সিগারেট গুঁজিয়া দিলাম, বিশুদ্ধ বাংলাতেই বলিলাম, ফোঁকো,—টান, জোরে আওয়াজ করিয়া বোম্ বলিয়া টান। ভাবিলাম জীবনে আর কখন শিকারে আসিব না। কাল সকালেই বার্থ রিজার্ভ করিতেছি—আজ রাত্রিটা কাটিলে হয়। আমার আচরণে বর্ণবাস কি ভাবিতেছিল কে জানে। উৎকট উত্তেজনার শেষ পরিণাম অবসাদ। আমি উহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাই নাই, মাচানের স্বল্পপরিধির ভিতর যেটুকু স্থান করিতে পারিলাম তাহাতেই হাড়-গোড় জুমড়াইয়া শুইয়া পড়িলাম এবং টর্চ নিবাইবার পর অল্প সময়ের ভিতর ঘুমাইয়া গিয়াছিলাম। মাঝে বর্ণবাস আমাকে জাগাইয়া দিয়াছিল। বর্ণবাসের সঙ্কেতে ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ায় রাইফেলের দিকে হাত বাড়াইতেছিলাম। বর্ণবাস কানের নিকট মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিল, "বাঘ আসে নাই, হুজুরের নাক ডাকিতেছিল।" শুইয়া পড়িলাম, পুনরায় বর্ণবাস সঙ্কেত দিল—এবার তাহার আঙুলের দৃঢ় চাপের সহিত মহিষটার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। জীবন্ত মহিষের উপর বাঘ নিশ্চয় লাফাইয়া পড়িয়াছে—এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে মহিষটাকে মারিয়া ফেলিবে। যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতা সহ সন্তর্পণে উঠিয়া বসিলাম—চকিতে প্রস্তুত টর্চের স্যুইচ টিপিয়া দিলাম—দেখিলাম মহিষটার পিঠে বাঘ চড়াও হইয়া ঘাড় কামড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। মহিষটা প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিয়া বাঁধন ছিঁড়িবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। বাঘের মাথাটা টর্চের আলোর বাহিরে অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে, মাত্র পিছনটা এবং বুকের খানিকটা অংশ দেখিতে পাইতেছি। তখন কোন্‌টা গান্ এবং কোন্‌টা রাইফেল বাছিয়া লইবার সময় ছিল না। যেটাকে সামনে পাইলাম সেইটাকেই তুলিয়া বুক লক্ষ্য করিয়া ট্রিগার টিপিয়া দিলাম—সঙ্গে সঙ্গে বাঘ মহিষের অপর দিকে জড়পদার্থের ন্যায় পড়িয়া গেল। বাঘটা মরি-

য়াছে, এখন ওটা স্তূপীকৃত অসাড় মাংসপেশী ছাড়া আর কিছু নয়, তথাপি মাথায় আর একটা গুলি মারিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতাম। কিন্তু মহিষের পিছনটা আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। মাজাতে মারিতে মন চাহিতেছিল না। দু-নলা ব্রিচ-লোডার দিয়া মারিয়াছিলাম—ভোঁতা লিথেলের আর একটা গুলি লাগিলে চামড়ার কিছু থাকিবে না। বিরত হইলাম। অনেকক্ষণ আলো জ্বালাইয়া বসিয়া রহিলাম—বাঘ নড়িল না, উহার মৃত্যু সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইয়া টর্চ্চ নিবাইয়া শুইয়া পড়িলাম—তখন ভোর হইতে কত দেরি আছে অনুমান করিতে পারি নাই। উত্তেজনায় নিদ্রা আসিতেছিল না। খানিকটা সময় কাটিতে দেখিলাম বন্দুক রাখিবার বড় ছিদ্র হইতে আলো আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, ভোর হইতেছিল—উঠিয়া বসিলাম। নিজের অজ্ঞাতেই আমার দৃষ্টি বধ্যভূমির দিকে চলিয়া গেল। বাঘ সেখানে নাই। ভাবিলাম দৃষ্টিভ্রম, আলো-আঁধারিতে ভাল দেখিতে পাইতেছি না। টর্চ্চ জ্বালাইলাম, বাঘ সত্যই অন্তর্ধান করিয়াছে। মুহূর্ত্তে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলাম—টর্চ্চ-সংলগ্ন রাইফেল হাতে মাচান হইতে নামিতেছি দেখিয়া বর্ণবাস করজোড়ে নিষেধ করিল। তখন আমার হিংস্র প্রবৃত্তি উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, অন্তরের পশু কোন বাধা মানিল না। অগত্যা বৃদ্ধ তাহার এক-নলা ঠাসা বন্দুকটা লইয়া আমাকে অনুসরণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। দো-নলা ব্রিচ-লোডারটা লইতে বলিলাম, সে তাচ্ছিল্যের সহিত প্রত্যাখ্যান করিল। অনুমান করিলাম, সেফ্‌টি লক্‌ ইত্যাদি কলকব্জাওয়ালা বন্দুক সে কখন ব্যবহার করে নাই।

মাটিতে নামিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, বাঘের গোঙানী শুনিবার জন্য। আমি নিশ্চয় জানিতাম সে বেশী দূর যাইতে পারে নাই। কোন শব্দ না শোনায় বর্ণবাসকে ঢিল ছুঁড়িতে বলিলাম। প্রথম ইতস্ততঃ করিয়াছিল, পরে কি ভাবিয়া পাথরের নুড়ি আমাদের সামনে ছুঁড়িতে লাগিল। এদিক ওদিক সেদিকে ঢিল পড়িতেছে, কিন্তু কোন সাড়া নাই। বর্ণবাসকে অগ্রসর হইতে বলিলাম, সে কিছুতেই রাজী হইল না। লোকটা বোকা, আগে চলিলে ঢিল ছোঁড়ার কত সুবিধা পাইত। তাহার সঙ্কল্প দৃঢ় বুঝিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া গেলাম। সামনে ঢিল পড়িতেছে, আমি এক-পা দুই-পা করিয়া অগ্রসর হইতেছি। ঘন ঝোপটার কাছে আসিতেই এমন একটি স্থানে পা পড়িল যাহার স্পর্শানুভূতি নরম, রৌদ্রে দগ্ধ কঠিন মাটির নহে। চমকিয়া তিন-চার পা পিছাইয়া আসিলাম, অভ্যাস বশতঃ রাইফেল বগলে তুলিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহার পর নীচের দিকে তাকাইলাম, পাইয়াছি—ঐ ত আমার হাতে মারা বাঘ। লেজের খানিকটা অংশ দেখা যায়—আবার তলার দিকটাও ঝোপের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ণবাসও দেখিয়াছিল। বলিলাম, ওটাকে টানিয়া বাহির কর। আদেশ পালন হইতে দেরি হইতেছিল—ফিরিয়া দেখি অতি পাকা শিকারী বন্দুক-হস্তে কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছে। অগত্যা মাটিতে রাইফেল রাখিয়া বলিলাম—আমি টানিয়া বাহির করিতেছি, তোমার এক-নলাটা ঠিক করিয়া ধর। বাঘকে নড়িতে দেখিলে গুলি চালাইয়া দিও। বলিয়া রাখা ভাল, আমার শারীরিক শক্তি সাধারণ বাঙালী যুবকের তুলনায় কিছু বেশী। কুস্তীর আখড়ায় ইহার প্রমাণ বহুবার পাইয়াছি, কিন্তু একলা বাঘটাকে টানিয়া বাহির করা সহজ বোধ হইল না। এই প্রসঙ্গে একটি স্বীকারোক্তির প্রয়োজন বোধ করিতেছি—হত জন্তুটি একটি অতিকায় লেপার্ড—চিতা নয়, "ষ্ট্রাইপ্‌স‌ও নয়—লম্বায় ৮ ফুট ৪ ইঞ্চি, এত বড় লেপার্ড সচরাচর বড়-একটা দেখা যায় না। ঘুমন্ত চোখে টর্চ্চের অত্যুজ্জ্বল আলোয় ঠিক বুঝিতে পারি নাই, উহার বিরাট্ বপুই দৃষ্টিভ্রম ঘটাইয়াছিল।

আমার টানাটানিতে মৃত লেপার্ড কোন আপত্তি না করায় বর্ণবাস সাহায্য করিতে আসিল।

গত রাত্রিতে বন্দুকের আওয়াজে এ অঞ্চলে সকলেই জানিয়াছিল গুলি চলিয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বাংলো হইতে মালবাহক ও গ্রাম হইতে কৌতূহলী দর্শকের দল আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের মুখ দেখিয়া মনে হইল সকলেই খুশী হইয়াছে। আমি তাহাদের আনন্দে প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতে পারিতেছিলাম না। ইহার জন্য তো ঘর ছাড়িয়া পাঁচ শত মাইল দূরে আসি নাই। তবু মন্দের ভাল। মনে বল পাইলাম—এখনও সাত-আট দিন ছুটি আছে। ঠিক করিয়া ফেলিলাম, নজরানা যাহাই লাগুক বড়কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ফিরিতেছি না।

বাংলোয় ফিরিতে দেখিলাম রেডি মহাশয় অত সকালেই আসিয়াছেন। পাতসা সাহেব তাড়াতাড়ি লেপার্ড পরীক্ষা করিতে ছুটিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার শুভেচ্ছার জন্যই আপনার সাফল্যলাভ হইল।" মনে মনে ভাবিলাম বলি "ঘুমন্ত চোখে দেড় সেকেণ্ডের ভিতর প্রায় এক শত ফুট দূরে চার ইঞ্চি টারগেট (লক্ষ্যভেদ) যতই সোজা মনে হউক না কেন, উহা বহু বৎসরের নিয়মিত সাধনার ফলে সম্ভব হইয়াছে। বিশেষ করিয়া রাত্রিতে টর্চ্চের আলোয় নিশানা ঠিক করা

বরাতের উপর নির্ভর করে না।" কিন্তু বলা হইল না, ভদ্রাচারের শাসনে স্বীকার করিলাম—তিনি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন না করিলে বাঘের গায়ে গুলি লাগিত না।

রেডি মহাশয় মহিষটাকে সুস্থ অবস্থায় চলিয়া আসিতে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "আপনার টিপ অসাধারণ।" এই ধরণের আত্মপ্রশংসা শুনিবার জন্যই তাঁহার দিকে প্রার্থী হইয়া তাকাইয়াছিলাম। তৃতীয় পুরুষকে প্রাপ্য সম্মান দিতে অনেকেই কার্পণ্য করিয়া থাকেন। রেডি মহাশয় বাস্তবিক গুণগ্রাহী, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। তিনি বলিয়া চলিলেন—কপালের কথা যদি বললেন তো সে আমাদের বর্ণবাসের, হরিণ মারতে গিয়েছিল—মেরে দিল বড় বাঘ ঐ এক-নলা ঠাসা বন্দুক দিয়ে যার front sight rear sight কিছুই নেই। শুধু একটি নল। ঝোপের ভিতর লুকিয়ে বসেছিল, চুনমাখান বন্দুকের নলটা বার ক'রে। বাঘ মশাই তার মাথাটা বন্দুকের নলে ঠেকিয়েই চুলকানর ব্যবস্থা করলেন। আর বর্ণবাস ঘোড়া টিপেই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। বাঘ মরল, বর্ণবাসকেও হয়ত বাঘিনী এসে শেষ করত যদি না লামবাডিরা (স্থানীয় জঙ্গলী, জীবিকা গোচারণ) ফিরতি-মুখে ওকে দেখতে পেত।

পরশ্রীকাতরতাবশতঃ আমি কথাটা চাপা দিলাম। ঐ ধরণের ভাগ্যবান্ পুরুষ আমার নিকট চক্ষুশূল। প্রশ্ন করিলাম—আজ কোথায় বসিতেছি।

রেডি মহাশয় উত্তর করিলেন, "এখানে বড় বাঘ নেই, ঐ লেপার্ডটাই বড় বাঘের ঘরোয়ানা চালে দীক্ষিত হয়ে গ্রামবাসীদের অস্থির ক'রে তুলেছিল। আপনি এবার 'চন্তামনিপাড়ুভে চেষ্টা ক'রে দেখুন—সে ভারী জঙ্গল, তবে ১৩-১৪ মাইল দূরে। আমি জানাইয়া দিলাম, পাঁচ শত মাইল যখন আসিয়াছি তখন তাহার সহিত ১৩-১৪ মাইল যোগ দিতে কোন অসুবিধা হইবে না। রেডি মহাশয় কাজের লোক, কালবিলম্ব না করিয়া তখনই কতকগুলি কুলীকে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে পাতসা সাহেবের ছুটি ফুরাইয়াছিল—তিনিও সেই দিন মাদ্রাজের দিকে রওনা হইলেন। লেপার্ডের চামড়া ও মাথার খুলি তাঁহার সহিত দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম—ট্যান করাইবার জন্য।

পরের দিন আমরা বেলা তিনটার সময় রওনা হইলাম। আস্তানায় পৌছাইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সমস্ত অপরাহ্ণ-রৌদ্রে ঝলসাইয়া গিয়াছিলাম—বাহিরের চাতালে বসিয়াছিলাম—ঘরের ভিতর পিঙ্গল মাল গুছাইয়া রাখিতেছিল।

আসিবার পথে পাথরের বিরাট্ রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাহারই কথা মনে আসিতেছিল—অতীতের কত কথাই না উহার অন্তরে লুকাইয়া রহিয়াছে। কালের ধ্বংসলীলায় বহিরাকৃতি স্তরে স্তরে ফাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্তরের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নাই। কবির বাণী মনে পড়িল—'কথা কও কথা কও হে অতীত'। বটের শিকড়ের নিবিড় আবেষ্টন দেখিলাম—কি ভয়ঙ্কর মিলন-দৃশ্য। শিকড়ের দৃঢ় চাপে পাথর নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে তথাপি উহা বন্ধনমুক্ত হইতে চায় না। ইহা প্রেম, না শক্তির পরীক্ষা?—ভাবিলাম শক্তিশালীর ঘনিষ্ঠ মিলন বোধ হয় এই ভাবেই হওয়া স্বাভাবিক। পাদমূলে বনস্পতি ও পাথরের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে—ক্ষীণস্রোতা নদীর বক্ষে। স্রোতস্বিনীর মৃদু কল কল ধ্বনির সহিত তাল রাখিয়া ডাকিয়া চলিয়াছে কাঠ-ঠোক্‌রা পাখীটা।* নদীর ওপারে যেখানে দিনের আলোর প্রবেশ-পথ ঘন পাতার আড়ালে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেইখানে দেখা যায়, শাল সেগুন ও অশ্বত্থ বিরাটাকার দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের গোড়ায় আশেপাশে ঘন ঝোপ। অন্ধকারের অস্পষ্টতায় ভয়াল রূপ ধারণ করিয়াছে। আরও নীচে তাকাইলে দেখা যায় সবুজের গভীরতর অন্ধকার গহ্বর হইতে হিংস্র জন্তুর আকস্মিক আবির্ভাব। দৃশ্যটি নিরবচ্ছিন্ন কল্পনাপ্রসূত—তথাপি ভয়াকুল মন মানিতে চাহে না উহা কল্পনা।

অরণ্যের এই ভয়ঙ্কর জীবন্ত ছবি ও অপরূপ আবেষ্টনী তো আঁকিবার উপায় নাই। তুলির টানে গাছ-পাথর-নদী সবই আসিবে, কিন্তু অরণ্যকে ঘিরিয়া যে ভীতির আশঙ্কা জড়াইয়া আছে তাহা কোন্ শিল্পী চিত্রিত করিবে। সেই অজানা স্রষ্টা মহাশিল্পীর কথা মনে আসিল, মাথা নত করিলাম এবং সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা জানাইলাম, "আমার সকল অহমিকা চূর্ণ করে দাও।" আরও কত কথা ভাবিতেছিলাম মনে নাই, আনমনা অবস্থায় কখন সন্ধ্যা পার হইয়া রাত হইয়া গিয়াছিল তাহা খেয়াল ছিল না।

পরের দিন হইতে বিভিন্ন মওড়ায় দুইটি মহিষ বাঁধা হইতে লাগিল। মহিষদ্বয়ের ভিতর লেপার্ডের উচ্ছিষ্টটিও ছিল। মার্কা-মারা চলন্ত "গুড লাক্" সঙ্গে আনিয়াছিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না—এক দিন দুই দিন করিয়া পাঁচ দিন কাটিয়া গেল, বাঘ কোনটাকেই মারিল না। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে, উচ্ছিষ্ট পয়মন্ত মহিষটার চতুষ্পার্শ্বেই বড় বাঘ ঘুরিয়াছিল, এমন কি লাফ মারিবার জন্য এক বার প্রস্তুতও হইয়াছিল। তাহার পদচিহ্ন ও বসিবার স্থানটি পরীক্ষা করায় উহাই প্রমাণিত হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হয়ত বাঁধা অবস্থায় দেখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ঘটনাটি আশ্চর্য্যজনক হইলেও সত্য।

নিষ্কর্ম্মাভাবে আর কত দিন বসিয়া থাকা যায়! ক্যাম্প তুলিবার আদেশ দিলাম—নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া হাসিলাম। চল্‌তি কথায় একটি প্রবাদবাক্য আছে "কপালে নাইক ঘি ঠক ঠকালে হবে কি?"

পরের দিন সকাল হইতেই মাল তোলার সাড়া পড়িয়া গেল। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছি। এমন সময় কয়েকটি লামবাডি আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল—সাহেব রক্ষা কর আমাদের সর্ব্বনাশ হইতে চলিয়াছে। বাঘ একটির পর একটি গর্ভবতী গাভী মারিয়া ফেলিতেছে। কাল রাত্রে দুইটিকে মারিয়াছে এবং একটিকে টানিয়া গভীর জঙ্গলের ভিতর লইয়া গিয়াছে।

লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, আশা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—মাল নামাইবার আদেশ দিলাম এবং সময় নষ্ট না করিয়া লামবাডিদের সহিত যাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলাম।

অর্দ্ধ ঘণ্টা কালের ভিতরেই আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। পথ চলিতে শুনিলাম, আমাদের গন্তব্যস্থল মাত্র ৪ মাইল দূরে যাহা পৌছাইয়া বুঝিয়াছিলাম ছয় মাইলের কম হইবে না। গরুটাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে একটু সময় লাগিল, কারণ যেখানে মারিয়াছিল সেখান হইতে প্রায় তিন ফারলং টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। পিছনটা খাইয়া ফেলায় বাচ্চাটা গর্ভভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া গিয়াছে, আহা কি নধর কান্তি! হয়ত আর কয়েক দিন পরেই ভূমিষ্ঠ হইত।

গরুর নিকটবর্ত্তী স্থানে মাচান বাঁধিবার জন্য একটি উপযুক্ত গাছ খুঁজিতে লাগিলাম—কোথাও পাইলাম না! নিরুপায় হইয়া মাটিতেই বসিব ঠিক করিয়া ফেলিলাম। নিকটেই বাঁশঝাড় ছিল, উহার গোড়ার দিকে নাড়া দিতেই অধিকাংশই ভাঙিয়া গেল। কোনটার গোড়া পচিয়া গিয়াছে, কোনটার শিকড় মাটি ছাড়িয়া দিয়াছে।

গত্যন্তর না থাকায় নকল ঝাড় প্রস্তুতের নিমিত্ত কুলীদের গোড়া হইতে পাতাসমেত বাঁশ কাটিয়া আনিতে বলিলাম, এবং সেগুলি পুঁতিবার জন্য তিন জনকে মাটিতে গর্ত্ত করিতে লাগাইয়া দিলাম। খননকারীদের ভিতর বৃদ্ধটি জুৎসইভাবে সাবোল চালাইতে পারিতেছিল না। তাহার নিকট হইতে লৌহদণ্ডটা কাড়িয়া লইয়া নিজেই খুঁড়িতে লাগিয়া গেলাম—তাড়া ছিল, অপরাহ্নের পূর্ব্বে বসিবার স্থানটি প্রস্তুত হইয়া যাওয়া উচিত। ভিতরকার বাঁধন ইত্যাদি শেষ করিয়া বাহিরে কামুফ্লাজিং দেখিতে আসিলাম। নিকটে গিয়া পিছনে হটিয়া ছবিতে শিল্পীর শেষ পোঁছ লাগানর মত খুঁৎগুলি ঠিক করিয়া দিলাম। এখন কে বলিবে ইহা আসল বাঁশঝাড় নহে। খুশী হইয়া বর্ণবাস সহ ভিতরে ঢুকিলাম এবং প্রবেশ-পথ দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়া দিতে বলিলাম। কুলীর দল ইতিমধ্যে আদেশমত গরুটাকে টানিয়া বিপরীত দিকের বাঁশ-ঝাড়ে বাঁধিয়া দিল। মাত্র কয়েক গজ টানিয়া আনিতে নয় জন জোয়ান কুলী হিম-শিম খাইয়া গেল। তুলনায় বাঘের আসুরিক শক্তির কথা ভাবিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিলাম।

মাথার উপর ঢাকা থাকার দরুন বাহিরের আলো সত্ত্বেও আমাদের বসিবার স্থানটি গাঢ় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, কুলীদেরও গরু বাঁধার পরেই চলিয়া যাইতে বলিয়াছি। ভিতরে টর্চ্চ জ্বালিবার উপায় নাই, অথচ সিগারেটের নেশা আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। অন্ধকারে মাটিতে বসিয়া আর ধূমপান চলিবে না। প্যাকেটটা পাশেই কোথাও পড়িয়াছিল। হাতড়াইয়া বাহির করিতে গিয়া মনে হইল একটি বহুপদী লম্বা কীট আমার তালুর উল্টা পিঠে উঠিয়া পড়িয়াছে—ভাবিলাম হয়ত বড় কেঁদরাই, কিন্তু বন্দুক রাখিবার ছিদ্রের নিকট হাত আনিতে শিহরিয়া উঠিলাম। একটি বিশালকায় ঘন কৃষ্ণবর্ণ শতপদী বৃশ্চিক! চোখ-কান বুজিয়া হাত ঝাড়িয়া সেটাকে বাহিরে ফেলিয়া দিলাম। বাহিরে পড়িলেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলাম না। আবার যে ফিরিয়া আসিবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি—পর ক্ষণেই মনে হইল ভিতরে যে আরও পাঁচ-ছটা নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে? বৃশ্চিক ছাড়া যদি—আর ভাবিতে পারিলাম না, পলাইবার পথও বন্ধ। ধরিয়া-বাঁধিয়া নিরীহ মহিষকে মাংসভুক্ বাঘের টোপ্ করিবার প্রতিক্রিয়া স্বরু হইয়াছে। সম্ভব-অসম্ভব অনেক ঘটনার আশঙ্কায় যে সময়টি কাটিল তাহারই ভিতর বাহিরে কখন অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। এমন সময় মাত্র কয়েক হাত দূরে মাটি আঁচড়ানর শব্দ শুনিতে পাইলাম। পরিচিত শব্দ। শব্দকারীকে দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। নিঃশব্দে পাতার আড়াল সরাইতে দেখিলাম—একটি প্রকাণ্ড ভালুক নিবিষ্ট চিত্তে উইয়ের ঢিপি খুঁড়িয়া চলিয়াছে এবং মাঝে মাঝে সনাতন প্রথায় শোষণ দ্বারা দধিভোজনের ন্যায় হুস্‌হাস্ করিয়া গর্ত্তে মুখ লাগাইয়া টান মারিতেছে। বাহিরে অন্ধকার হইয়া গেলেও তাহার ছায়ামূর্ত্তি (silhouette) দেখিতে কিছু মাত্র অসুবিধা হয় নাই। এত কাছে যে, বন্দুক গায়ে ঠেকাইয়া মারা চলে। হাত নিস্‌পিস্ করিতেছিল। এত বড় হিংস্র জন্তুকে এত সুবিধার মধ্যে পাইয়া মারিতে পারিলাম না। বন্দুক চালাইলে বাঘের আশা ছাড়িতে

হয়। নিজেকে সংযত করিলাম। অল্পক্ষণ পরে ভালুকটা চলিয়া গেল।

কি অসম্ভব নিস্তব্ধতা, একটি শুকনা পাতা পড়িলে তাহার শব্দ শুনিতে পাইতেছি। হৃদয়ের উপর কে যেন সশব্দে হাতুড়ি পিটিতেছে—বাহিরে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতেছি—অকস্মাৎ দূরে ফেউ ডাকিয়া উঠিল, বনের রাজার আগমনবার্ত্তা—বাঘ আসিতেছে। ক্রমান্বয়ে সঙ্কেত আরও নিকটে আসিতে লাগিল—পরে আমাদের কেন্দ্র করিয়া ত্রিশ-চল্লিশ হাতের ভিতর চতুষ্পার্শ্বে ডাকিয়া চলিল। তবে কি আমাদের উপস্থিতি বাঘ জানিতে পারিয়াছে? —"কীল"-এর নিকটে আসিতেছে না কেন? আমার অনুমান অহেতুক। সন্দেহের কারণ কিছু থাকিলে ভালুক এত কাছে আসিয়া অতক্ষণ ধরিয়া আপন মনে মাটি খুঁড়িত না। হঠাৎ ফেউয়ের ডাক থামিয়া গেল। আবার সেই ভীতিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। পর-মুহূর্ত্তে সমস্ত বনানী বিকম্পিত করিয়া বাঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত গরুটার উপর লাফাইয়া পড়িল। কি অবর্ণনীয় দৈহিক শক্তি—যেমন লাফাইয়া পড়িল অমনি গরুটাকে একটানে বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া দিল। অধিক কাল অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলাম না। টর্চ্চের সুইচ টিপিয়া দিলাম। দেখিলাম সাক্ষাৎ-মৃত্যুর করালমূর্ত্তি আমার সামনে দাঁড়াইয়া আছে! টর্চের আলোয় চোখ দুইটি গোলাকার অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে। রাইফেল তুলিয়া টিপ করিতে যাইব, এমন সময় রিফ্লেক্টর ওপর হইতে কোন ওজনের চাপে ধীরে নীচু হইয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ, আলো আমার সাম্‌নে মাত্র দুই হাত দূরে মাটিতে পড়িয়াছে। Flood light-এর ন্যায় রশ্মিচ্ছটা আমার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, বসিবার স্থান ভিতরে আলোকিত হইয়া গিয়াছে, বাঘের দেহ দেখিতে পাইতেছি না, অন্ধকারে মিশাইয়া গিয়াছে, রাইফেলের first sightএ এতটুকুও আলো নাই, টিপ করিব কেমন করিয়া! মাটি হইতে ঠিকরান রশ্মিতে বাঘের চোখের উপর বিশেষ দিক হইতে উজ্জ্বল আলো না পড়িলে জ্বলে না। যে কারণে তাহার চোখ জ্বলে, সেই কারণে হরিণ, মহিষ, গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ও সাইকেলের পিছন দিককার নিরেট লাল কাচের টুকরাও জ্বলে। সত্যটি লিখিয়া কবির কল্পনায় বাধা সৃষ্টি করিলাম—সেজন্য ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। আর একটি সত্য বলিবার আছে—"ষ্ট্রাইপ্‌স" নরভুক্ এবং আহত না হইলে কখন দলবদ্ধ মানুষকে আক্রমণ করে না—যাহা অতি চালাক লোকও করিয়া থাকে। মানুষের সামনে বাঘের আচরণ কতকটা প্রাচীনপন্থী নব-বধূর ন্যায়। আত্মগোপন করিতে পারিলেই সে অধিক মাত্রায় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে।

ক্ষণিকের ভিতর আমি উত্তেজনায় মরিয়া হইয়া উঠিলাম। সুবিধা-অসুবিধার কথা ভুলিয়াছি। চক্ষু দুইটির মণিস্থল লক্ষ্য করিয়া আন্দাজে ঘোঁড়া টিপিয়া দিলাম। বাঘ হুঙ্কার দিয়া পলাইয়া গেল—গুলি লাগে নাই। দুঃখে, ক্ষোভে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলাম। বালকের ন্যায় কাঁদিতে পারিলে হয়ত সান্ত্বনা পাইতাম। ভাবিলাম, আহত না হইলে বাঘ এইরূপ অবস্থায় কত সময় ফিরিয়া আসে—আজ যে আসিবে না তাহা কে বলিতে পারে! কেন বলিতে পারি না আশান্বিত হইয়া উঠিলাম। তখনও টর্চ্চটা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। বাহিরে হাত বাড়াইয়া রিফ্লেক্টর উঠাইবার চেষ্টা করিতেই অনুভব করিলাম উহা আটকাইয়া গিয়াছে। ঠেলাঠেলিতে কোন লাভ হইল না। নীচু হইয়া দেখি—কামুফ্লাজিং নিখুঁৎ করিতে গিয়া বিভ্রাটটি ঘটিয়াছে। উপর হইতে একটি মোটা ডাল নিজস্ব ওজনে ধীরে নামিয়া আসিয়া রিফ্লেক্টরের উপর কায়েমিভাবে চাপিয়া বসিয়াছে। এখন বাহির হইতে ডালটি কেহ সরাইয়া না দিলে আলোর ব্যবহার বন্ধ। বাঘ ফিরিয়া আসিলেও তাহাকে আর মারিতে পারিব না। বলাই বৃথা, বাঘ আর ফিরিয়া আসে নাই। সারাটা রাত জাগিয়া কাটাইয়া পরের দিনই মাদ্রাজে ফিরিবার ব্যবস্থা করিলাম।

ম্যাজিক

যাদুকর পি. সি. সরকার

'ম্যাজিক' শব্দটা ইংরেজী হইয়াও বাংলা ভাষারই একটা সাধারণ শব্দের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। 'ম্যাজিক' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ যাদুবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, ভোজবাজী প্রভৃতি স্থির হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান করিলে ইহার একটিও ঠিকমত হয় না। Magic এই ইংরেজী শব্দটি বহুবচন এবং ইহার একবচন magus

শব্দ। কিন্তু magus কথাটির আজকাল মোটেই প্রচলন নাই; সকলেই magic কথাটিকে একবচন ধরিয়া লইয়া বহুবচনে magics লিখিয়া থাকেন। Magic শব্দটি গঠিত হইয়াছে Magi (বা Persian Magi = বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি) হইতে। ইংরেজ কবি মিল্টন "Three magi, the star-led wizards" রূপে অভিহিত করিয়াছেন। Greenough and Kittredgeএর 'Words and Their ways in English Speech' ও Mawson-এর *Roget's Thesaurus* আলোচনা করিলে পাওয়া যায় যে···

"Magic is the art of the Persian Magi, a class of wizard priests. Wizard is properly a 'wiseman'; it is 'wise—' with suffix '—ard' or 'art.' Witch (originally of common gender) also means 'a wise man' and is connected with the root seen in 'wit' (knowledge)."

বাইবেলেও Magiদের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেখানেও তাঁহারা প্রাচ্যের বুদ্ধিমান্ লোক বলিয়া খ্যাত। খ্রীষ্টের জন্মের সময় Magi বা wise men of the Eastদের আগমন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতে লিখিত হইয়াছে—

Magic has its name from the Magi, the hereditary cast of priest among the ancient Persians, thought to be of Median origin. Among the Magi the interpretation of dreams was practised, as appear from the story of the birth of Syrus (Herodotus i. 107); later writers describe them in both a sacerdotal and magical capacity: Lucian calling them a Prophetic class and devoted to Gods, while Cicero (De Devinatione, i. 23, 41) writes of them as wise men and diviners. . . . In the New Testament soothsaying and sorcery are so designated (Acts VIII, 9 XIII, 6); while the astrologers who divine the birth of the King of the Jews by the appearance of a star in the East are called Magi (Matt. ii), p. 199.

ম্যাজিকের প্রতিশব্দ হিসাবে ইংরেজীতে conjure কথাটির ব্যবহার পাওয়া যায়, তাহাতেও লাটিন শব্দ con (intensive) এবং juro, "to swear"; "to conjure is to properly pronounce the name of a god in such a way as to gain his assistance." অতি প্রাচীনকালে 'ম্যাজিক' বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের ক্রিয়া অথবা যাদুমন্ত্র দ্বারা দেবতাদের সাহায্যে ক্রিয়া অর্থেই ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন মিশর, বেবিলন ও গ্রীসের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে তাহাই পাওয়া যায়। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত খ্রীষ্ট-জন্মের ১৫৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার রেকর্ড *Westcar Papyrus*এ এই ধরণের অনেক ম্যাজিক ও ম্যাজিসিয়ানের কথার উল্লেখ আছে। মিশর-দেশীয় যাদুকর *Tchatcha-Em-Ankh* খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৭৬৬ শতকে রাজা খুফুর সম্মুখে ম্যাজিক দেখাইয়াছিলেন। *Deda* নামক অপর একজন মিশরীয় যাদুকরও হাঁস, পায়রা প্রভৃতি দ্বারা নানারূপ অদ্ভুত 'ম্যাজিক' দেখান। ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত উক্ত *Westcar Papyrus* হইতে আরও জানা যায় যে "Magician knoweth how to bind on a head which hath been cut off" [ইংলণ্ডের যাদুকর-সম্মিলনীর পূর্ব্বতন সভাপতি হোরেস গোল্ডিন তাঁহার পেটেন্ট করা খেলা 'Sawing a Woman in Half' অপর সকলে নকল করিয়াছে বলিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার আদালতে নালিশ করেন। তখন বিবাদীপক্ষ উক্ত *Westcar Papyrus*এর উল্লেখ করেন এবং প্রমাণ করেন যে এই খেলাটি ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল।]

পারস্যের রাজা জেরেক্সেস্ পারস্য ও গ্রীসের মধ্যবর্তী আসিরিয়া রাজ্য আক্রমণ করেন এবং উহার রাজধানী নিনেভা নগরী দখল করেন। সেখানে আসিরিয়ার রাজা বেলুসের একটি মহামূল্যবান্ স্মৃতিস্তম্ভ ছিল। জেরেক্সেসের আদেশ অনুযায়ী এটি ভগ্ন করিতে গিয়া সৈন্যগণ দেখে যে উহার মধ্যস্থিত একটি চৌবাচ্চা অর্দ্ধেক পরিমাণ তৈল দ্বারা ভর্ত্তি রহিয়াছে এবং উহার গাত্রে লিখিত রহিয়াছে যে "woe unto him who violates this tomb and does not complete the filling of it." এই অদ্ভুত লিপি পাঠ করিয়া জেরেক্সেস্ ঐ চৌবাচ্চাটি তৈল দ্বারা সম্পূর্ণ ভর্ত্তি করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু কিছুতেই সমর্থ হন নাই। ঐতিহাসিকগণের বিবরণে পাওয়া যায় যে উহা তৎকালীন একজন প্রসিদ্ধ যাদুকর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করেন যে সেকালের সেই যাদুকর (নিজের অজ্ঞাতেই হয়ত) অধুনাপ্রসিদ্ধ Siphon system আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আলেকজান্দ্রিয়ার *Heron* নামক এক ব্যক্তি গ্রীস ও রোমের মন্দিরের কতকগুলি গুপ্তকৌশল প্রকাশ করেন যাহা দ্বারা উক্ত মন্দিরের priest wizardগণ নানারূপ ম্যাজিক করিতেন। মধ্যযুগে Benvenuto Cellini নামক ইতালীয় ভাস্কর সিসিলির জনৈক ম্যাজি-সিয়ানের কৌশলপূর্ণ ম্যাজিকের গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। লণ্ডনের *Annual Register* নামক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তকে কতকগুলি ম্যাজিকের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে Cagliostro তাঁহার অপূর্ব্ব ম্যাজিক দ্বারা সমগ্র ইউরোপে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। ঐতিহাসিকগণ Count of Cagliostroকে "last of the magicians" নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'History of Magic' পুস্তকে প্রকাশ

"Cagliostro built his reputation upon two declining sciences—astrology, the forerunner of astronomy; and alchemy, the predecessor of chemistry."

এত দিন পর্য্যন্ত 'ম্যাজিক'—wizard-priestদের ক্রিয়া বলিয়াই অভিহিত ছিল, ক্রমে উহ con-juringএর পর্য্যায়ভুক্ত হয়। এই সময়কার যাদুকরদিগকে নানারূপ যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করিবার উল্লেখ পাওয়া যায়। "An Account of the beginnings of the art of Magic"এ প্রকাশ যে এই সময়কার যাদুকরগণ "Droch myroch, and senaroth betu baroch attimaroth, rounse, farounsee hey passe passe" এইরূপ অদ্ভুত মন্ত্রোচ্চারণ করিতেন। তাঁহারা প্রমাণ করিতে চাহিতেন যে শুধুমাত্র বুদ্ধি বা কৌশল নহে মন্ত্রোচ্চারণ (Satanic connection) দ্বারা অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আধুনিক যাদুকরদের যন্ত্রপাতিতে ও পোষাকে যে নরকঙ্কালের চিত্র অঙ্কিত হয় উহাও সেই উদ্দেশ্যে। আমেরিকার Sphnix নামক (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ম্যাজিকের ম্যাগাজিন) পত্রিকার সম্পাদক লিখিয়াছেন যে অদ্যাপি অনেক লোকের ঐরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে,—

"The power to work magic was supposed to be due to some business arrangement with the Devil. . . . Even today, strange as it may seem, it is possible to find people with the silly belief that no man could perform magic by skill alone and that all magicians are possessed of supernormal powers. . . ."

সেকালে ম্যাজিক প্রদর্শিত হইত রাজার সম্মুখে অথবা মন্দিরে এবং ইহার পশ্চাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই প্রধানতঃ লুক্কায়িত ছিল। সেদিনও ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী গবর্ণমেন্ট ইহা অনুরূপ উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করিয়াছেন। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ আলজিরিয়া প্রদেশে mara-bout (ফকির)গণ নানাবিধ ভেল্কী দেখাইয়া সেখানকার কুসংস্কারাপন্ন, অশিক্ষিত ও সরল আরবদের উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আরবেরা মনে করিত ইহা নিশ্চয়ই ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন, নতুবা এরূপ অদ্ভুত ক্রিয়া কিরূপে সম্ভবপর! এই সব বুজ্‌রুক্‌দের উপর আরবদের শ্রদ্ধা যতই বাড়িতে লাগিল ফরাসীদের প্রতি তাহাদের ভয় ও ভক্তি ততই কমিতে লাগিল। ফরাসী সরকার তখন বাধ্য হইয়া তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর Robert Houdinকে আলজিরিয়াতে পাঠাইলেন যিনি ফরাসীদের পক্ষ হইতে ঐ সব বুজ্‌রুক্‌দের অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য-জনক খেলা দেখাইবেন।

এই ভাবে যুগে যুগে নানা ভাবে নানা স্থানে রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান ম্যাজিক সম্পূর্ণ নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে 'ম্যাজিক' আর যাদুমন্ত্র নাই—ভৌতিকত্ব কমিয়া গিয়া উহা এখন সাধারণ শব্দে পরিণত হইয়াছে যাহার অর্থ চালাকি বা ভোজবাজী। এখানে 'ভোজবাজী' অর্থাৎ 'ভুজবাজীর' অপভ্রংশ (ভুজ=বাহু এবং ভুজবাজী =sleight of hand) বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক ম্যাজিক নূতন রূপ লইতেছে। ইলেকট্রিসিটি, কেমিষ্ট্রি, এন্‌জিনীয়ারিং প্রভৃতির উন্নতিতে ম্যাজিক দিন দিন উন্নত হইতে চলিয়াছে। সেকালের খেলা মানুষ কাটা, খরগোস বাহির করা, বাক্সের খেলা অপেক্ষা আধুনিক কালের এক্স-রে, টেলিভিশন, রেডিও প্রভৃতি অনেক উন্নতদরের ম্যাজিক। সেকালের আরব্য উপন্যাসের কাঠের পক্ষীরাজ ঘোড়া অপেক্ষা 'স্পিট্‌ফায়ার' বা 'হ্যারিকেন' বিমান অধিকতর মূল্যবান্ ম্যাজিকের আবিষ্কার। ম্যাজিকের প্রকৃত অর্থ হিসাব করিলে থার্ম-টন, নিকোলা, কার্টার, হুডিনি অপেক্ষা প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশ-চন্দ্র, রামন, মার্কনি প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ বড় ম্যাজিসিয়ান এবং ইঁহাদের ক্রিয়াই প্রকৃত 'ম্যাজিক'।

জনশিক্ষার সহজ উপায়

শ্রীজীবনময় রায়

বহু বৎসর পূর্ব্বে এবং পরে আরো অনেকবার শ্রদ্ধেয় প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় সহজে, বিনামূল্যে এবং কাহারও কৃপার উপর নির্ভর না করিয়া আমাদের এই নিরক্ষর দেশের সংখ্যাতীত "মূঢ় ম্লান মূক মুখে" ভাষা দান করিবার একটি অতি সহজ সুন্দর উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। উপায়টি এই—ছুটির অবসরে আমাদের দেশের হাজার হাজার ছাত্র—যদি সংকল্প লইয়া মাত্র দুইটি করিয়া নিরক্ষর লোককে সামান্য লিখন-পঠনক্ষম করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে নিরক্ষরতার সমস্যা—যাহা আমাদের দেশের প্রায় প্রধানতম সমস্যা তাহা—ক্রমে দূর হইয়া যায়। ইহার

জন্য আয়োজন দরকার করে না; আবেদন-নিবেদন প্রতি-বেদন হুজুগ হাঙ্গাম পুলিশ ফরিয়াদ জেল ও বন্দেমাতরং কোনো কিছুরই আবশ্যক করে না। অথচ ধীরে ধীরে নীরবে দেশের অপরিমেয় অন-আবাদী জমিতে "আবাদ করলে" সোনা ফলানো যায়। এই পথনির্দ্দেশের পর আজ কত কত বৎসর অতীত হইয়া গেল, আমাদের ছাত্ররা (যাহারা দেশের প্রাণ তাহারা) কত দুঃখ বরণ করিয়াছে, জেলে গিয়াছে, মার খাইয়াছে, প্রাণ দিয়াছে ও দিতেছে কিন্তু দেশের "পতিত"—জমিকে (অর্থাৎ যাহাকে আমরাই আলস্য-বিলাসী আরামপঙ্কনিমজ্জিত নির্ব্বোধ-অবহেলায় "পতিত" করিয়া রাখিলাম) প্রাণবান ও প্রাণপ্রদ করিয়া তুলিবার এই নির্বিরোধ উপায়কে তাহাদের দ্বারা কেহ কাজে লাগাইল না। আমরা লাফাইলাম, ঝাঁপাইলাম, পার্সেণ্টেজ কষিলাম, ছেলেদের খ্যাপাইয়া ভোট সংগ্রহ করিয়া কাউন্সিল প্রভৃতিতে ঢুকিলাম এবং নিরাপত্তা ও "ষ্টেটাসকুয়ো" বজায় রাখিয়া ইংরাজের চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহাদের আড়াইশত বৎসরের কুকীর্ত্তিগুলি দেখাইয়া দিলাম; সবই করিলাম, কেবল নির্ব্বিবাদে, নীরবে, সহজে প্রায় বিনা ব্যয়ে ফসল ফলাইবার যে-জমি আমরা অনায়াসে এতদিনে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে পারিতাম তাহাকে, আমাদের চোখের সামনেই, কণ্টকবনে আকীর্ণ হইয়া যাইতে দিলাম এবং বিপদের সময় আমাদের চলার পথ আমরা নিজেরাই দুর্গম করিয়া তুলিলাম। দেশোদ্ধার-কল্পে(!) অর্থও বড় অল্প ব্যয় করি নাই। ভোট যুদ্ধে এতাবৎ-কাল পর্য্যন্ত যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহার শতাংশ ও যদি এই সহজসাধ্য কল্যাণকল্পে ব্যয়িত হইত তবে আজ চতুর্দ্দিকে এই অন্ধকার দেখিবার কারণ ঘটিত না।

কিন্তু, "ইট ইজ নেভার টু লেট টু মেণ্ড"। আজ দেশের এই বিপদের দিনে আমরা দেশের কর্ম্মী ও বিশেষ করিয়া ছাত্রদিগকে দেশের ভবিষ্যৎ পথ প্রস্তুত করিয়া তুলিবার এই মহাসমস্যার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। দেশে যখন অসংখ্য বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া দেশের শিক্ষা বিস্তারের একটা দিক অবরুদ্ধপ্রায় তখনই এই দুর্দ্দৈবকে আমাদের জাতীয় কল্যাণে পরিণত করিবার একটি মহৎ অবসর উপস্থিত। এই সুযোগকে অবহেলা করিলে দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গল আরো সুদূরপরাহত হইয়া উঠিবে।

এখন ত সহস্র সহস্র ছাত্র পাঠের অবকাশে কর্ম্মহীন, এই সময় তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবমত বা আপন আপন সুবিধা ও ক্ষমতাঅনুযায়ী লোকশিক্ষার এই সহজ কর্ম্মটিতে আনন্দে লাগিয়া যান। দেশে যখন স্বাধীনতা আসিবে তখন তাঁহারা অতীতের দিকে ফিরিয়া প্রসন্নচিত্তে এই কার্য্যের জন্য নিজেদের অভিনন্দিত করিবেন। দেশের সংগঠনে তাঁহাদের এই লোকশিক্ষার কাজই যে প্রধান সহায় হইয়াছে তাহা দেখিয়া নিজেদের জীবনকে সার্থক জ্ঞান করিবার আনন্দ লাভ করিবেন।

কাজটি আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে সামান্য; শ্রম ও অর্থব্যয় কিছুমাত্র নাই—অথচ কাজটি সত্যই অসামান্য। অজ্ঞান মানুষের মনের মধ্যে জ্ঞানের আনন্দলাভ করিবার সুযোগ করিয়া দেওয়ায় একটা সৃজনের আনন্দ আছে। নিজের হাতে গাছ পুঁতিয়া তাহাতে ফল বা ফুল ধরিলেই কত আনন্দ হয়। ইহা ত মানবের অন্ধকার মনের মধ্যে নূতন আলোকে নূতন সৃষ্টি জাগাইয়া তোলা। ইহার আনন্দ যে আরো কতগুণ তাহা অনুমান করা যায় মাত্র। এই ছাত্রদের ছাত্রগণ যখন পড়িতে শিখিবে, বুঝিতে শিখিবে খবরের কাগজ পড়িতে পারিবে, দেশের ও দেশ বিদেশের খবর লইয়া তাহাদের শিক্ষকদিগের সহিত চিন্তা ও আলোচনা করিবে—অন্যের এবং নিজের দেশের সুখ দুঃখ, সমৃদ্ধি ও সর্ব্বনাশের কথা তাহাদিগকে বুঝাইতে গলদঘর্ম্ম হইতে হইবে না—তখন বর্ত্তমান ছাত্রসমাজ নিজেদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চয় আজিকার কর্ম্মের জন্য আপনাদিগকে অভিনন্দিত করিবেন।

ইহার সর্ব্বপ্রধান সার্থকতা এই যে এই শিক্ষায়, মানসিক, নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক প্রভৃতি সর্ব্বক্ষেত্রে, অন্যের রচিত চিন্তা ও নিয়মের শৃঙ্খলে চির-আবদ্ধ অগণিত মানবচিত্ত, জ্ঞানের পথে (সমগ্র মানবজাতির পরমকামনা, ও আজন্ম অধিকার) যে সর্ব্বাঙ্গীন অবিমিশ্র মুক্তি তাহারই আস্বাদন লাভে নবপ্রাণশক্তিতে জাগিয়া উঠিবে। সহজেই ঘুচিয়া যাইবে উদ্ধত মানুষের শ্রেণীগত দূরত্ব ও পার্থক্য এবং জগতের সর্ব্বপ্রকার স্বার্থপর অত্যাচারের চাতুরী ও কৌশল সূর্য্য-অসিঘাতে হেমন্ত-কুয়াসার মত ছিন্নভিন্ন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

উদ্ভিদের রাহাজানি

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মনুষ্য সমাজে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি নীতিবিগর্হিত ব্যাপারগুলির অতিমাত্রায় আধিক্য লক্ষিত হইলেও জীবিকা-নির্ব্বাহের পথ অধিকতর সুগম করিবার নিমিত্ত জীবজগতের প্রায় সর্ব্বত্রই অল্পাধিক এইরূপ গর্হিত উপায় অবলম্বিত হইয়া



নেপেনথেস্ বা ঘটি-লতার পাতার প্রান্তভাগে সরু বোঁটায় ঘটির মত পাত্র পোকামাকড় ধরিবার জন্য মুখ খুলিয়া রহিয়াছে

থাকে। অবশ্য মনুষ্য সমাজের ন্যায়নীতি মনুষ্য কর্ত্তৃক রচিত কৃত্রিম বিধান মাত্র—স্বাভাবিক নিয়ম নহে এবং মনুষ্যেতর জীব-জগৎও এই নিয়মে পরিচালিত হয় না, তথাপি মনুষ্য সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই তাহাদের কার্য্যপ্রণালীর বিষয় আলোচনা করিব।

প্রকাশ্য ক্ষেত্রে দৈহিক সামর্থ্য বা বাহুবলের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদী। কিন্তু গোপনীয়তা বা চাতুরী অবলম্বিত হইলে সে স্থলে বাহুবল পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য। এই কারণেই অসীম শক্তিশালী হইয়াও সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীরাও অনেক সময় গোপনীয়তা অর্থাৎ চুরি, বাটপাড়ির মত হীনবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। বিড়াল অর্দ্ধভুক্ত ইঁদুর লইয়া বসিয়া আছে। কয়েকটা কাক আসিয়া চতুর্দ্দিক হইতে তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। দুই-তিনটা কাক তাহার সম্মুখের দিক হইতে মাংস খণ্ড ছিনাইয়া লইবার ভান করিতে লাগিল; ইতিমধ্যে পিছন হইতে একটা কাক তাহার লেজে ঠোকর মারিল। রাগান্বিত হইয়া বিড়াল তাহাকে তাড়া করিবা মাত্রই সম্মুখের একটা কাক সেই মাংসখণ্ড লইয়া উধাও হইল। এরূপ ঘটনা অনেক সময়েই নজরে পড়িয়াছে। কাক তাহার বাসায় বসিয়া ডিমে তা দিতেছে—কোথা হইতে একটা কোকিল উড়িয়া আসিয়া কুক্-কুক্-কিক্-কিক্ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া কাকেরা তাহাকে তাড়া করিল। কোকিলও পলায়নের ভান করিয়া তাহাদিগকে বাসা হইতে বহুদূরে লইয়া গেল। স্ত্রী-কোকিল নিকটেই কোথাও ডালপালার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া বসিয়াছিল;—সুযোগ বুঝিয়া সে কাকের বাসায় উপস্থিত হইল এবং তাহার ডিম নষ্ট বা উদরস্থ করিয়া সে স্থলে নিজের ডিম পাড়িয়া রাখিল। কাকের বাসা নির্ম্মিত হইবার পর এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়। ডালে বসিয়া নিরিবিলি খাইবে বলিয়া চিল একটা মাছ শিকার করিয়া লইয়া যাইতেছে, হঠাৎ কোথা হইতে আর একটা চিল উড়িয়া আসিয়া তাহার শিকার ছিনাইয়া লইয়া উধাও হইল। যে ছিনাইয়া লইল তাহারই যে উহা ভোগে আসিবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। হয়ত অন্য একটা চিল আবার তাহার উপর বাটপাড়ি করিবে। চিংড়ি, কই, খল্‌সে, বাতাসী, চেলা, পুঁটি প্রভৃতি যে সকল মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে বিচরণ করে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই একের মুখের গ্রাস অপরকে কাড়িয়া খাইতে দেখা যায়। বানর, শিয়াল প্রভৃতি প্রাণীদের চৌর্য্যবৃত্তি সম্বন্ধে অল্পাধিক অনেকেই পরিচিত। সাপেরা প্রধানতঃ পাখীর ডিম চুরি করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। গো-সাপেরা আবার সাপের ডিম চুরি করিয়া খায়।

নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গের মধ্যেও চৌর্য্যবৃত্তি বা রাহাজানির কিছুমাত্র অভাব লক্ষিত হয় না। বিশেষভাবে মৌমাছি, ভীমরুল, বোল্‌তা, পিপীলিকা প্রভৃতি সমাজবদ্ধ কীটপতঙ্গের মধ্যে চুরি, ডাকাতি ও লুঠতরাজ প্রায় অহরহই ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশীয় ক্ষুদ্রকায় এক জাতীয় ঘরো-মাকড়সার বাচ্চা প্রধানতঃ চুরি বা রাহাজানি করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পিঁপড়েদের লাইনের ধারে ইহাদিগকে চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতে দেখা যায়। লাইনের মধ্যে কোন পিঁপড়েকে ডিম অথবা খাবার টুক্‌রা মুখে করিয়া আসিতে দেখিলেই চক্ষের নিমেষে মাকড়সা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং ডিম অথবা খাদ্যকণিকা কাড়িয়া লইয়া বিদ্যুৎ বেগে ছুটিয়া পলায়ন করে। কারণ, ধরা পড়িলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। লুণ্ঠিত বস্তু গলাধঃকরণ করিবার পর পুনরায় লাইনের ধারে নূতন শিকারের আশায় অপেক্ষা করে। আমাদের



এক জাতীয় পরভোজী ঘট-লতা পুরাতন বৃক্ষকাণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছে

দেশে কালো রঙের ছোট ছোট একজাতীয় বিষ-পিঁপড়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পিঁপড়েগুলিকে দেখিতে অনেকটা সুড়সুড়ে পিঁপড়ের মত। কিন্তু এক এক দলে সাধারণতঃ সত্তর-আশীটার বেশী পিঁপড়ে দেখা যায় না। সর্ব্বদাই ইহারা একটার পিছনে আর একটা—এরূপভাবে লাইন করিয়া চলে। ইহাকেই কড়িয়া-জাঙ্গাল বলে। এক দিন দেখিলাম—অসংখ্য সুড়সুড়ে পিঁপড়ে লম্বা লাইন করিয়া এক গর্ত্ত হইতে অপর গর্ত্তে তাহাদের ডিম স্থানান্তরিত করিতেছে। হঠাৎ কোথা হইতে এই বিষ-পিঁপড়েদের প্রায় হাতখানেক লম্বা একটা লাইন সেস্থানে উপস্থিত হইল। তাহারা সুড়সুড়ে-পিঁপড়েদের লাইনের কাছে আসিবামাত্রই চক্ষের নিমেষে উভয় লাইনই বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। কড়িয়া-জাঙ্গালের পিঁপড়েরা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া সুড়সুড়েদের যাহাকে পাইতেছে কাটিয়া দুই খণ্ড করিয়া ফেলিতেছে নতুবা বিষ-প্রয়োগে অসাড় করিয়া দিতেছে। মিনিট দুইয়ের মধ্যেই জায়গাটা পরিষ্কার হইয়া গেল—সুড়সুড়েরা বেমালুম অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কড়িয়া-জাঙ্গালের পিঁপড়েরা লুণ্ঠিত ডিম লইয়া পুনরায় লাইন করিয়া চলিয়া গেল। নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গের মধ্যে রাহাজানি বা লুঠতরাজের এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়াও জীব-জগতে 'প্যারাসিটিজ্‌ম্' বা পরোপজীবিত্ব নামে এক প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা সাধারণ চুরি, ডাকাতি অপেক্ষাও মারাত্মক। জীব-জগতে বিভিন্ন রকমের পরোপজীবিত্বের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—এ স্থলে ধীরে-ধীরে জীবনী-শক্তি ক্ষয়কারী পরোপজীবিত্বের কথাই বলিতেছি। 'ব্যামোরা' পরিবারভুক্ত লাউস-মাছ এবং ল্যাম্প্রে, স্যাজিটা প্রভৃতি প্রাণীরা অন্যান্য মাছের গায়ে ঝুলানোভাবে আটকাইয়া থাকিয়া তাহাদের রসরক্ত শুষিয়া খায়। ল্যাম্প্রের স্বজাতি হ্যাগ্-ফিশ নামক মাছেরা অপর মাছের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কেবল হাড় কয়খানা বাদে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলে। আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে এরূপ অনেক মাছ ধরা পড়ে, হ্যাগ-ফিশের আক্রমণ যাহাদের শরীরের উপরকার চামড়া ও ভিতরের হাড় কয়খানা মাত্র অবশিষ্ট থাকে। আমাদের দেশীয় কয়েক জাতীয় শুয়াপোকাও বিভিন্ন জাতীয় কুমোরেপোকা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কুমোরেপোকারা শুয়াপোকার শরীরে হুল ফুটাইয়া দেহাভ্যন্তরে এবং কোন কোন মাকড়সার শরীরের উপরে ডিম পাড়িয়া যায়। ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইয়া তাহারা শুয়াপোকার শরীরের মাংস কুরিয়া খায়, তারপর চামড়া ফুঁড়িয়া বহির্গত হয়। তাহার কিছুকাল পরেই শুয়াপোকার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু কুমোরেপোকার বাচ্চা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল মাকড়সাকে ক্রমশঃ নিঃশেষে খাইয়া ফেলে। এই সকল ব্যাপার ছাড়াও ব্যাক্টেরিয়া, প্রোটোজোয়া প্রভৃতির পরোপজীবিত্বের ফল যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা কাহারও অবিদিত নহে।

কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, উদ্ভিদ ও প্রাণি-জগতের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান থাকিলেও উভয়ে জীব-জগতেরই



সাপের ফণার মত ডার্লিংটোনিয়া নামক শিকারী-গাছ



'ফ্লাইট্র্যাপ,' শিকারী-শিঙা, সূর্য্যশিশির প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় শিকারী-গাছ

অন্তর্ভুক্ত। উভয়কে একই প্রকার জীবন-সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইতে হয়। কাজেই, উদ্ভিদ-জগতের মধ্যে প্রাণি-জগতের অনুরূপ চুরি, ডাকাতি, ছল, চাতুরীর অস্তিত্ব আছে কিনা—একথা স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়। প্রাণি-জগতের প্রত্যেকেই, কম হউক বেশী হউক, তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বশেই কার্য্য করিয়া থাকে। কাজেই তাহাদের ছল-চাতুরীর কথা অদ্ভুত মনে হইলেও অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু উদ্ভিদ-জগৎ সম্বন্ধে এ কথা খাটে না; কারণ তাহাদের আকৃতি এবং প্রকৃতি দেখিয়া সহজ বুদ্ধিতেই বুঝা যায় যে, চুরি, বাটপাড়ি বা ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে এবং প্রয়োজনও নাই। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র অধিকার বিস্তারের নিমিত্ত ইহারা যে সকল চাতুর্য্যপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করে—বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। সাধারণ উদ্ভিদেরা প্রচুর পরিমাণ খাদ্যোপকরণ এবং পর্য্যাপ্ত আলো, বাতাস সংগ্রহের নিমিত্ত সর্ব্বদাই প্রতিবেশী উদ্ভিদদিগকে বঞ্চিত করিবার নীতি অবলম্বন করিয়া থাকে। কতকগুলি উদ্ভিদ কেবল জল, বায়ু ও মৃত্তিকা হইতে খাদ্য আহরণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে না; তাহারা কীট-পতঙ্গ এমন কি ছোট ছোট পাখী, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীগুলিকে পর্য্যন্ত অদ্ভুত কৌশলে ফাঁদে আটকাইয়া ধীরে ধীরে তাহাদের রক্ত-মাংস শোষণ করিয়া লয়। ছত্রাক-জাতীয় উদ্ভিদেরা সোজাসুজি জল, বায়ু, মৃত্তিকা হইতে তাহাদের দেহ পোষণোপযোগী খাদ্যবস্তু উৎপাদন করিতে পারে না। কাজেই জীবনধারণের জন্য তাহাদিগকে মৃত উদ্ভিদ-দেহের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। কতকগুলি ছত্রাক আবার অদ্ভুত কৌশলে জীবন্ত প্রাণীকে আক্রমণ করে এবং তাহাদের রস-রক্ত শোষণ করিয়াই পরিপুষ্টি লাভ করে। কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদ অপরাপর জীবন্ত বৃক্ষের রস শোষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। কেহ কেহ আবার অন্যান্য জীবন্ত উদ্ভিদের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কালক্রমে আশ্রয়দাতাকেই বেমালুম নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলে। আত্ম-বিস্তার অথবা আত্ম-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত উদ্ভিদ কর্ত্তৃক যে-সকল কৌশল অবলম্বিত হইয়া থাকে, জীবন-সংগ্রামে টিঁকিয়া থাকিবার পক্ষে অপরিহার্য্য হইলেও তাহা যে চুরি, ডাকাতি বা রাহাজানির পর্য্যায়ভুক্ত এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য পরোপজীবী উদ্ভিদেরাই এই সকল গর্হিত উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

লাউ, কুমড়া, শশা, বেগুন প্রভৃতি নিরীহ প্রকৃতির উদ্ভিদের কতকগুলি বীজ অল্পপরিসর স্থানে একত্র বপন করিলে দেখা যাইবে—চারা বাহির হইবার পর তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হইয়া গিয়াছে। অবাধে প্রচুর আলো পাইবার জন্য কিরূপ দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইয়া তাহারা একে অন্যের মাথার উপর দিয়া পাতা ছড়াইয়া দেয় তাহা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এই প্রতিযোগিতার ফলে গাছগুলির প্রত্যেকেই কম-বেশী



মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বটগাছ ডাল হইতে শিকড় নামাইয়া ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ডালে অন্য পরগাছাও দেখা যাইতেছে



·কে-লতা মাঝারি গোছের একটা গাছকে আচ্ছন্ন করিয়া একটা পাম গাছকে আক্রমণের উদ্যোগ করিয়াছে

অস্বাভাবিক রূপে লম্বা হইয়া উঠে। কিন্তু দুই-চারিটি ছাড়া বাকী সবগুলিরই এই দ্বন্দ্বে পরাজয় ঘটে। বিজেতারা পাতার পর পাত ছড়াইয়া পরাজিত গাছগুলিকে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করিয়া ফেলে। আলোর অভাবে ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে হইতে অবশেষে তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। দুর্ব্বলের উপর সবলের এই নিষ্ঠুর পীড়ন-নীতি জীব-জগতের সর্ব্বত্র সমভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আলাদা আলাদা ভাবে এক-একটি বীজ পুঁতিলে এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ ঘটে না। ছত্রাক-জাতীয় উদ্ভিদেরা মৃত বা পচনশীল উদ্ভিদ পাইলেই তাহার উপর দলে দলে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। জীবিত উদ্ভিদগাত্রে কোন কারণে ক্ষত উৎপন্ন হইলে অথবা পচ ধরিলে সেই স্থানে ছত্রাক অথবা অন্যান্য পরগাছা জন্মিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। উদ্ভিদেরাও যেন সেই ভয়েই স্ফীতি উৎপাদন করিয়া অথবা নূতন চামড়া গজাইয়া তাড়াতাড়ি ক্ষতস্থান আবৃত করিয়া দেয়। সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কিন্তু তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই এই সকল দুর্দ্ধর্ষ পরোপজীবী শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। 'কর্ডিসেপ্‌স্‌' শ্রেণীভুক্ত কয়েক প্রকারের ছত্রাক আবার এমনই দুর্দ্ধর্ষ যে, তাহারা জীবন্ত প্রাণীদিগকে কৌশলে আক্রমণ করিয়া তাহাদের রসরক্তেই শরীর পোষণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া লয়। তাহাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজাধারগুলি শুঁয়াপোকা অথবা কোন কোন জাতীয় পুত্তলির গায়ে পড়িয়া অঙ্কুরিত হয় এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য সূত্র বাহির করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ছত্রাক সূত্রের দ্বারা আক্রান্ত হইলেই পোকাগুলি মৃত্তিকাভ্যন্তরে আত্মগোপন করিয়া থাকে। কয়েক দিনের মধ্যেই সূত্র কর্ত্তৃক পোকাটার শরীরের অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় পদার্থ নিঃশেষিত হইবার পর ঘাসের ডগা বা হরিণের শৃঙ্গের আকৃতিবিশিষ্ট ছত্রাক মাটি ফুঁড়িয়া বাহিরে আত্ম-প্রকাশ করে। পোকাটার বহিরাবরণ কিন্তু সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে রংপুর, আসাম এবং ভুলুয়া হইতে বিভিন্ন রকমের এরূপ অদ্ভুত কয়েকটি পোকা আমার নিকট পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। দেখিয়া মনে হয় যেন শুঁয়াপোকা বা পুত্তলির আকৃতিবিশিষ্ট কোন বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গম হইয়াছে।

প্রাণীদের মত উদ্ভিদেরও খাদ্যসমস্যা জটিলতা বর্জ্জিত নহে। দেহ-পুষ্টির জন্য তাহাদিগকে 'পটাস', 'নাইট্রোজেন' প্রভৃতি নানা জাতীয় উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়। সকল অবস্থায় সকল স্থানে প্রয়োজনানুরূপ উপাদান সংগ্রহ করা দুষ্কর। ভাল জমিতে অবশ্য উদ্ভিদের দেহ-পুষ্টির উপযোগী এই সকল পদার্থই যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত থাকে; কিন্তু অনুর্ব্বর ভূখণ্ডে, জলাভূমিতে বা অন্যান্য অসুবিধাজনক স্থানে অনেক জিনিসের অভাব ঘটিতে দেখা যায়। এই সকল অসুবিধায় পড়িয়া বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ খাদ্য-সংগ্রহের অভিনব উপায়



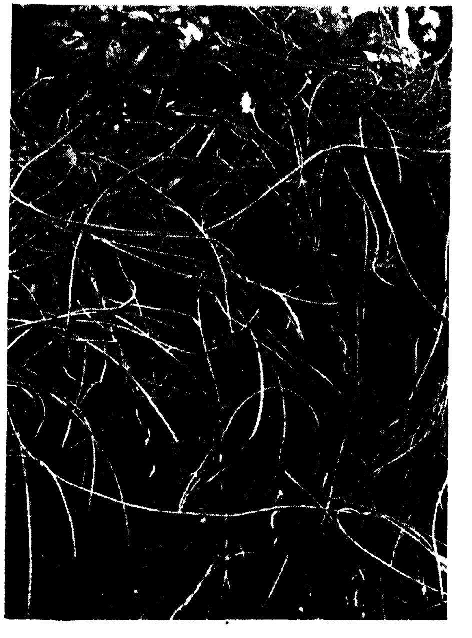
আমের ডালের ক্ষতস্থান হইতে পর-সরিষা গাছ উৎপন্ন হইয়াছে। উৎপত্তিস্থলে ডালের স্ফীতি লক্ষ্য করিবার বিষয়



রঙ্গন-ফুলের গাছের উপর আলোক-লতা জড়াইয়া উঠিতেছে

অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহারা কীট-পতঙ্গ এমন কি ছোট ছোট পাখী, ইঁদুর প্রভৃতি ধরিয়া খাইবার জন্য শরীরের অংশ-বিশেষকে অদ্ভুত অদ্ভুত ফাঁদে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছে। এই সমস্ত প্রাণীর গলিত শবদেহ হইতে উদ্ভিদেরা তাহাদের আহারোপযোগী অধিকাংশ পদার্থই নিজেদের দেহের মধ্যে শোষণ করিয়া লয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শিকার ফাঁদে পড়িবার কয়েক দিন পরেই গাছগুলি যেন হঠাৎ তর্‌তর্‌ করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উদ্ভিদের এই শিকার ধরিবার কৌশল অতি অদ্ভুত। কীট-পতঙ্গ-ভুক বিভিন্ন জাতীয় প্রত্যেকটি উদ্ভিদই, কেহ বর্ণচ্ছটায়, কেহ সুমিষ্ট মধুভাণ্ডে, কেহ বা সাজসজ্জায় এমন ভাবে সুসজ্জিত যে, কীট-পতঙ্গেরা সহজেই তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। একবার ফাঁদের উপর গিয়া বসিলে আর রক্ষা নাই। ফাঁদ হইতে অনেকেই আর বাহির হইয়া আসিতে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের কীট-পতঙ্গ-ভুক তরু-লতা জন্মিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে 'নেপেনথেস্' বা ঘটি-লতা নামক শিকারী গাছগুলিকে প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পাতার ডগা হইতে বহির্গত লম্বা বোঁটার অগ্রভাগে বড় বড় ঘটির মত এক দিকে ঈষৎ বাঁকানো এক প্রকার পাত্র জন্মিয়া থাকে। ঘটির মুখের উপর ঢাক্‌নার ন্যায় একটা পাতা ঠিক বাক্সের ডালার মত যেন কব্জার সাহায্যে উঠানামা করিতে পারে। ঘটি-লতা গাছ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। কাহারও পাতা আনারস পাতার মত লম্বা, কাহারও পাতা গোল; কাহারও ঘটি বড়, কাহারও বা ছোট। কেহ সাধারণ উদ্ভিদের মত মাটিতে জন্মিয়া থাকে, কেহবা আবার পরোপজীবী—বড় বড় বৃক্ষকাণ্ডে জন্মগ্রহণ করে। কতকগুলি ঘটি-লতার পাতার আকৃতি ঠিক শিঙ্গার মত। ইহারা 'হান্ট্‌-স্‌ম্যান-হর্ণ' বা শিকারীর শিঙ্গা নামে পরিচিত। ঘটির মধ্যে এবং ঢাকনার গায়ে মধু উৎপাদনকারী কতকগুলি গ্রন্থি আছে। মধুলোভে কীটপতঙ্গেরা ইহাদের নিকট উপস্থিত হয় এবং মধু খাইতে খাইতে ঘটির ভিতরে প্রবেশ করে। ঘটির ভিতরে গলার চতুর্দ্দিকে নিম্নমুখ কতকগুলি সূচ্যগ্র শুঁয়ার জন্য আর বাহির হইতে পারে না। এদিকে মুখের ঢাকনাটিও বন্ধ হইয়া যায়। আবদ্ধ কীটপতঙ্গ অবশেষে ঘটির অভ্যন্তরস্থ জারক-রসে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

উত্তর-আমেরিকার জলাভূমিতে 'সারাসেনিয়া' নামক এক জাতীয় শিকারী উদ্ভিদ দেখা যায়। ইহাদের বিচিত্র বর্ণে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে কীট-পতঙ্গ আসিয়া ভীড় জমাইতে থাকে। তার পর মধু খাইতে খাইতে ক্রমশঃ ভিতরে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হইতে পারে না। কালিফোর্ণিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে 'ডার্লিং-টনিয়া' নামক ঠিক সাপের ফণার মত এক প্রকার শিকারী উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে। ইহারাও ফাঁদের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণ মশা মাছি ধরিয়া তাহাদের রস শোষণ করিয়া খায়। ঘটির মত শিকার ধরিবার ফাঁদ ছাড়াও কতকগুলি উদ্ভিদ ভিন্ন উপায়ে শিকার ধরিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। 'সান-ডিউ' বা সূর্য্য



অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়া আলোক-লতা রঙ্গন-ফুলের গাছগুলিকে প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে



প্রাচীন একটা গাছের গুঁড়িতে ডালের সন্ধিস্থলে ছোট একটি অশ্বত্থ চারা জন্মিয়াছে। চারাটার তুলনায় তাহার শিকড়ের বৃদ্ধি লক্ষ্য করিবার বিষয়

শিশির, 'ভেনাস-ফ্লাই-ট্র্যাপ' প্রভৃতি গাছের গোড়ার দিকে কতকগুলি পাতা বাহির হয়। 'ফ্লাই-ট্র্যাপে'র পাতার ডগায় উন্মুক্ত মানি-ব্যাগের মত একটা যন্ত্র থাকে। এই যন্ত্রের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি ধারালো কাঁটা সজ্জিত। খুলিয়া থাকিবার সময় কীট-পতঙ্গেরা ভিতরের লাল রঙে আকৃষ্ট হইয়া ইহার উপর উপবেশন করিবামাত্র ফাঁদটি মানি-ব্যাগের মত বন্ধ হইয়া যায়। ব্যাপারটা ঠিক যেন ইঁদুর-ধরা চাপাকলের মত। কীট-পতঙ্গগুলি হজম হইয়া গেলে চাপাকলটা আবার নূতন শিকারের প্রতীক্ষায় হাঁ করিয়া থাকে। সূর্য্য-শিশিরের গোলাকার পত্রগুলির চতুর্দ্দিকে এবং ভিতরে অনেকগুলি বড় বড় শুয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই শুয়াগুলির প্রান্তভাগে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার পদার্থ হইতে এক প্রকার আঠালো রস নির্গত হয়। উহার উপর পোকামাকড় বসিবামাত্রই আঠা জড়াইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে শুয়াগুলি মুড়িয়া শিকারকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া ফেলে। শিকার হজম হইয়া গেলে শুয়াগুলি আবার ধীরে ধীরে মেলিয়া নূতন শিকারের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। আমাদের দেশীয় সূর্য্য-শিশির, জল-ঢেপা, ঘটি-লতা প্রভৃতির এরূপ রাহাজানির ব্যাপারগুলি হয়ত অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

পরভোজী না হইলেও বহুবিধ লতানে-উদ্ভিদ বড় বড় গাছকে অশেষবিধ লাঞ্ছনা দিয়া থাকে। এমন কি লতার আক্রমণে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উদ্ভিদকে অনেক সময় অকালে উদ্ভিদলীলা সংবরণ করিতে হয়। গুলঞ্চ, মাধবী, ঢোল-কল্মী, মধুকলি, গেঁদাল, খাম-আলু, তরুকলা প্রভৃতি লতাগাছগুলি শৈশবাবস্থায় যখন আম, জাম, সুপারি, নারিকেল গাছের কাণ্ড অবলম্বন করিয়া উপরে উঠিতে থাকে তখন তাহাদিগকে নেহাৎ নিরীহ প্রকৃতির উদ্ভিদ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তাহারা একেবারে মাথায় চড়িয়া বসে এবং অসংখ্য ডালপালা বিস্তার করিয়া আশ্রয়দাতাকে শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়া ফেলে। মেহেদী, রঙ্গন এবং অন্যান্য মাঝারি গোছের গাছের উপর পত্রশূন্য হলুদ বর্ণের এক জাতীয় সরু লতা প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। ইহারা সাধারণতঃ আলোক-লতা বা স্বর্ণ-লতা বলিয়া পরিচিত। ইহারা সম্পূর্ণরূপে পরোপজীবী; অন্যান্য গাছের ডাঁটা বা পাতার রস শোষণ করিয়াই জীবনধারণ করে। মাটি হইতে কোন রকমেই খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে না। লতার খানিকটা অংশ ছিঁড়িয়া লইয়া অন্য গাছের উপর ফেলিয়া রাখিলে দেখা যায়, দুই-এক দিনের মধ্যেই সে পাতা বা ডাঁটার গায়ে পাক খাইয়া জড়াইয়া উঠিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার শোষণ-যন্ত্রও বাহির করিয়া দিয়াছে। অল্প দিনের মধ্যেই ইহারা অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া আশ্রয়দাতাকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলে। দেখিয়া মনে হয়, কে যেন মোটা মোটা অসংখ্য স্বর্ণসূত্র স্তূপাকারে অথচ এলোমেলোভাবে গাছের উপর ছড়াইয়া রাখিয়াছে। ইহাদের ব্যাপক আক্রমণে আশ্রয়দাতা গাছগুলি



বটগাছের শিকড় একটা প্রকাণ্ড গাছকে নাগপাশে বন্ধন করিয়াছে। কালক্রমে আশ্রয়দাতা গাছটা বেমালুম বটগাছের কুক্ষিগত হইয়া যাইবে



বটগাছ অপর একটা জংলী গাছকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করিয়াছে। বটের শিকড়ের ফাঁকে ফাঁকে আক্রান্ত গাছটা কয়েকটি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে

অচিরেই অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে। এই ব্যাপারকে চৌর্য্য-বৃত্তি বা রাহাজানি বলিলে কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি হইবে না। আমাদের দেশে একটু অধিক বয়স্ক আম, জাম, জিউল প্রভৃতি গাছের গায়ে পর-সরিষা ও রাস্না নামক কয়েক জাতীয় পরভোজী উদ্ভিদ জন্মিতে দেখা যায়। পর-সরিষার কাণ্ড কালক্রমে আশ্রয়-দাতা বৃক্ষ-কাণ্ডের সহিত বেমালুম মিশিয়া যায় এবং তাহারই রস শোষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতে থাকে; কিন্তু রাস্না প্রধানতঃ গাছের জীর্ণ বাকল বা ডালপালা হইতেই আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। রাস্নার ব্যাপারটা পুরাপুরি চুরি না হইলেও পর-সরিষার আহার সংগ্রহের উপায়টাকে চৌর্য্যবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

উদ্ভিদ-জগতে ভয়াবহ ডাকাতি বা রাহাজনির দৃষ্টান্ত দেখা যায়—বট, পাকুর, অশ্বত্থ প্রভৃতি বড় বড় উদ্ভিদের ব্যবহারে। এই সকল উদ্ভিদ প্রধানতঃ পরভোজী হইলেও নরম অথবা শক্ত মাটি হইতেও স্বাধীনভাবে বাড়িয়া উঠিতে পারে। এক-একটা বটগাছ মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভুমির সমান্তরালে বহু দূর পর্য্যন্ত ডালপালা বিস্তার করিয়া দেয়। ইহাদের আওতায় পড়িয়া অন্যান্য গাছপালা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। পুরাতন বাড়ীর ফাটলে এবং ইষ্টকস্তূপে প্রায়ই বট ও অশ্বত্থ গাছ জন্মিয়া থাকে। শৈশবাবস্থায় এই সকল গাছের তেমন বৃদ্ধি না ঘটিলেও ইষ্টকের ফাঁকে ফাঁকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য শিকড় চালাইয়া দেয়। অসংখ্য শিকড়ের সাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণ রস শোষণ করিবার ব্যবস্থা এবং তৎসহ বনিয়াদ সুদৃঢ় হইলেই গাছগুলি যেন তরতর্ করিয়া বাড়িতে থাকে। তখন অল্পদিনের মধ্যেই ডালপালা বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিকে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। বট, অশ্বত্থের কবলে পড়িয়া অনেক পুরাতন মন্দির, জীর্ণ অট্টালিকা বেমালুম অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রকাণ্ড একটা বটগাছ শিকড়ের পরে শিকড় চালাইয়া একটা জীর্ণ মন্দিরকে কুক্ষিগত করিয়াছে—এ দৃশ্যে বিস্ময় জাগিলেও কারুণ্যরস উদ্রিক্ত হয় না। কিন্তু একটা জীবন্ত উদ্ভিদ তাহার আশ্রয়দাতা অপর একটা জীবন্ত উদ্ভিদকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া ধীরে ধীরে শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়া ফেলিতেছে—এ দৃশ্য বড়ই মর্ম্মান্তিক। অনেক দিন পূর্ব্বে ফরিদপুরের কোনও এক স্থানে চার-পাঁচ বছরের একটা খেজুর গাছের বালতোর খাঁজে তিন-চার ইঞ্চি লম্বা একটা অশ্বত্থের চারা দেখিয়াছিলাম। চারাটার কাণ্ডের দৃঢ়তা দেখিয়া নেহাৎ কচি বলিয়া বোধ হইল না। ইতিমধ্যেই সে প্রায় তিন-চার হাত লম্বা কয়েকটা শিকড় নামাইয়া দিয়াছে। একটা শিকড় হইতে আবার কতকগুলি শাখা-প্রশাখা নির্গত হইয়াছে। এই শিকড়টার অগ্রভাগ প্রায় মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছিল। জিনিসটা তুচ্ছ বটে; কিন্তু মনের মধ্যে একটা ছাপ রহিয়া গেল এই জন্য যে, চারাটা যাহা কিছু আহার্য্য পদার্থ সংগ্রহ করিতেছে, দেহপুষ্টির জন্য ব্যয় না করিয়া তাহার অধিকাংশই শিকড়ের দিকে প্রেরণ করিতেছে। শিকড় বৃদ্ধি পাইয়া একবার মাটির নাগাল পাইলেই তাহার ভবিষ্যৎ আহারের সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান-স্থলের ভিত্তিও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। বছর তিনেক পর পুনরায় সেই গাছটাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। অশ্বত্থের শিকড়গুলি খুবই মোটা হইয়া উঠিয়াছে। আরও অসংখ্য নূতন শিকড় মাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাছাড়া মোটা মোটা কাছির মত কতকগুলি শিকড় খেজুর গাছটাকে যেন নাগপাশে বন্ধন করিয়া ফেলিয়াছে। গাছটাও ইতিমধ্যে অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল; তাহার সর্ব্বোচ্চ ডগাটি খেজুরের ডালকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। খেজুর গাছটাকে আর পূর্ব্বের মত সতেজ দেখিলাম না। তাহার গলার চতুর্দ্দিকে একটা শিকড় সুদৃঢ় ফাঁসের মত জড়াইয়াছিল। তাল, খেজুর প্রভৃতি একপত্রবীজ উদ্ভিদের গঠন-প্রণালী সাধারণ উদ্ভিদের মত নহে। কাজেই গলায় ফাঁস লাগিবার ফলে তাহার রসসঞ্চালন-ক্রিয়া বোধ হয় ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। ইহার পাঁচ বৎসর পরে আর একবার গাছটাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন দেখিলাম, বিরাট্ এক অশ্বত্থ গাছের আওতায় সে স্থানের দৃশ্য সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে খেজুর গাছটির চিহ্ন মাত্রও দেখা যায় না। কেবল এক স্থানে শিকড়ের ফাঁকের মধ্য দিয়া অতিকষ্টে জীর্ণপ্রায় সামান্য একটু অংশ দেখিতে পাইয়াছিলাম। বট অথবা অশ্বত্থ গাছ এই ভাবে বড় বড়

তাল, খেজুর ও অন্যান্য গাছকে নাগপাশে বন্ধন করিয়াছে—ডায়মণ্ড-হারবার, ফলতা এবং অন্যান্য স্থানে এরূপ দৃশ্য প্রায়ই নজরে পড়িবে। বট, অশ্বত্থ গাছ কড়ুই, শিমুল প্রভৃতি বড় বড় গাছকেও আক্রমণ করে। তবে তাল বা খেজুর গাছের মত তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় না। কারণ প্রধান গাছটি মরিয়া গেলেও তাহাদের শাখা-প্রশাখাগুলি অনেক সময় আক্রমণকারীর অঙ্গীভূত হইয়া যায় এবং দুর্ঘটনার সাক্ষী-স্বরূপ পরানুগ্রহ-পুষ্টরূপে কোন ক্রমে জীবন ধারণ করে।

রামানন্দ-জয়ন্তী

জনসাধারণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ৭৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার জামাতা ডাঃ কালিদাস নাগের রাজা বসন্ত রায় রোডস্থ আবাসভবনে জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানপত্র দেওয়া হয়। মানপত্র তিনটি রৌপ্যাধারে বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী তিন ভাষায় খোদিত ও কারুকার্য্য-সমন্বিত সোনালী বর্ডারে খচিত। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলা ও এসেমব্লীর স্পীকার সৈয়দ নৌশের আলি ইংরেজী মানপত্র পাঠ করেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অসুস্থ ছিলেন। সম্বর্দ্ধনা-সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

সায়াহ্নে রামানন্দ-জয়ন্তী কমিটির উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে কলিকাতার নাগরিকগণের এক সভা হয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের স্পীকার সৈয়দ নৌশের আলি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্ভীক সংবাদপত্র-সেবা, উচ্চ আদর্শ ও মহান্ দেশপ্রেমের উল্লেখ করিয়া বিভিন্ন বক্তা সভায় বক্তৃতা করেন।

ডাঃ কালিদাস নাগের ভবনের উৎসবে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আরোগ্য ও আয়ুবৃদ্ধি কামনা করিয়া তাঁহার হাতে দূর্ব্বাসূত্র বাঁধিয়া দেন ও তাঁহাকে চন্দন-চর্চ্চিত ও মাল্যভূষিত করেন। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন বৈদিক স্তোত্র আবৃত্তি করেন।

মানপত্রে বলা হয়:—

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু

মহাত্মন্,

আপনার উনঅশীতিতম জন্মবাসরে আপনার স্বদেশবাসী আমরা আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি। আপনার পূত চরিত্র, অকৃত্রিম স্বদেশভক্তি ও জীবনব্যাপী স্বদেশসেবা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। আপনি আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে অনায়াসলভ্য সুখসম্পদ ও প্রতিষ্ঠা উপেক্ষা করিয়া আপনি শিক্ষকের কৃচ্ছ্রসাধ্য পুণ্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনার দীপ্ত স্বদেশপ্রেম ও আপনার জীবনের সংস্পর্শ বহু ছাত্রকে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাদিগকে স্বদেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। আপনি ধন্য।

আপনার সেবাব্রত বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়া আপনাকে মাসিক-পত্র-সম্পাদনে ব্রতী করিয়াছে। এই তপস্যায় আপনার সিদ্ধি বিস্ময়কর। আপনার প্রবাসী, মডার্ণ রিভিয়ু ও বিশাল ভারত প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া এ দেশকে এক অপূর্ব্ব শক্তি, শুচিতা ও সৌন্দর্য্যের আদর্শ দান করিয়া আসিতেছে। মাসিক-পত্র-সম্পাদন ও প্রকাশে আপনি এ দেশে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

আমাদের স্বদেশী চিত্রকলা বহুদিন দেশবাসীর অবজ্ঞা বহন করিয়া আসিতেছিল। আপনি সকল বিরুদ্ধতা উপেক্ষা করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য দেশবাসীর চক্ষে প্রস্ফুটিত করিয়া তাহার সাধনা ও প্রচারে বিপুল সহায়তা করিয়াছেন। আমরা আজ তাহা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতেছি।

নানা দেশে বিক্ষিপ্ত বঙ্গসন্তানকে এক প্রেমে ও আদর্শে সংহত করার কাজে আপনার দান অতুলনীয়। স্বীয় প্রদেশের প্রতি প্রেম আপনার সমস্ত ভারতের প্রতি প্রেম ও সেবাকে আরও মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। আপনার মঙ্গল হউক।

আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আপনার তপস্যায় দেশমাতা গৌরবান্বিত। আপনার নির্ভীক ও তথ্যানুগ লেখনী আপনার দেশবাসীকে নবশক্তি দান করিয়াছে। আপনার জয় হউক।

ভারতের সংস্কৃতিকে বিশ্বসংস্কৃতির সহিত সঙ্গত করিয়া পূর্ণ পরিণতি দান করিতে এবং জগতের কাছে এই সংস্কৃতির প্রকৃত মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে আপনি আজীবন সাধনা করিয়াছেন। জন্ম, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতায় মানবতার লাঞ্ছনা আপনি কখনও সহ্য করেন নাই। পরাধীনতার বেদনা আপনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন এবং ভারতের

স্বাধীনতার যজ্ঞে আপনার সমস্ত শক্তি আহুতি অর্পণ করিয়াছেন। আপনার সাধনা সিদ্ধ হউক।

আপনার কাম্য ভারতের স্বাধীনতা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য আপনি লাভ করুন। ভগবান্ আপনাকে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রদান করুন। ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আপনাকে নমস্কার। ইতি,

আপনার গুণমুগ্ধ রামানন্দ-জয়ন্তী কমীটির পক্ষে—

রামানন্দ-জয়ন্তী কমীটি
১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ
রবীন্দ্রাব্দ ৮৩

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সভাপতি
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, সম্পাদক

এই মান পত্র তিনটির নক্সা শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর পরিকল্পিত।

মানপত্রের উত্তরে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন—

দেশবাসীর প্রতিনিধিস্বরূপ আপনারা আমার প্রতি যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহার জন্য আমার গভীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া আপনারা উচ্চ-আদর্শের কথা বলিয়াছেন, কাজে তাহার কতটুকু করিতে পারিয়াছি, তাহার বিচার করিবেন ভগবান্ আর আপনারা। এদেশে সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের আদর্শ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন রাজা রামমোহন রায় অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতি, আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজসংস্কার, অর্থনীতি—সকল সমস্যা সমাধানের জন্য যাহা কিছু করা দরকার সব দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি আগাইয়া চলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সারা পৃথিবীর কল্যাণ যদি না হয়, তবে দেশবিশেষের কল্যাণ হইতে পারে না। এই জন্য দক্ষিণ-আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন তিনি টাউন হলে ভোজ দিয়াছিলেন। আবার নেপলস যখন স্বাধীনতা হারায়, তখন তিনি এত বেদনা অনুভব করেন যে, একটা বড় নিমন্ত্রণে যোগদান করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—এদেশ বা অন্য কোন দেশে অত্যাচারীরা কখনও কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। তিনি ইংলণ্ডেরও মঙ্গল চাহিতেন। ইংলণ্ডে যখন একটা রিফর্ম্ম বিল উত্থাপিত হয়, তখন রাজা রামমোহন রায় প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন—ঐ বিল যদি আইনে পরিণত না হয়, তাহা হইলে তিনি ইংলণ্ডের সঙ্গে সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিবেন। সেই সময় কথা উঠিয়াছিল—তিনি আমেরিকায় চলিয়া যাইবেন ও স্বাধীন দেশের নাগরিক হইবেন। বাংলার বাহিরে রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শ প্রচার করেন মহামতি গোবিন্দ রানাডে, এদেশে প্রচার করেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি রামমোহনের তিনটি আদর্শ গ্রহণ করেন (১) বেদান্তের শিক্ষা, (২) দেশপ্রেম, (৩) হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য। স্বামী বিবেকানন্দের মত মহাপুরুষও রামমোহন রায়ের আদর্শের মধ্যে তিনটির বেশী ধরিতে পারেন নাই।

বিশ্বভারতীর মানপত্র

আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং বিশ্বভারতীর প্রধান হিতৈষী শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁর সুপরিণত জীবনের জয়ন্তী উৎসবের শুভ মুহূর্ত্তে আমি বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে আমাদের সকলের হয়ে ও সকল অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

আরো বহু বৎসর আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান থেকে এই মহাকর্মী যেন আমাদের জ্ঞান, কর্ম ও সাধনায় প্রেরণা দেন, যেন গুরুদেবের মহান্ আদর্শকে পরিণতির পথে এগিয়ে দেবার জন্য, কি নবীন, কি প্রবীণ আমাদের সকলের প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করেন—এই প্রার্থনা করি।

দেশ ও দশের সেবায়, সাহিত্য ও শিল্পের উন্নতি প্রচেষ্টায়, সকল দিক থেকে এমন একনিষ্ঠ মানুষ দুর্লভ। সৎসাহসী এবং নির্ভীক এই পুরুষকে দর্শনেই পুণ্য আর বন্ধুভাবে লাভ করলে তো কথাই নেই। তাঁকে আমরা আমাদের পরম সুহৃদ্‌ভাবে পেয়েছি—এ আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য।

তাঁর এই বর্ষপূর্ত্তিতে তাঁকে অভিনন্দিত করে আমরা নিজেকেই ধন্য মনে করছি, কিমধিকমিতি—

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মাল্য চন্দন ও পট্টবস্ত্র উপহার দিয়া এই মানপত্র পাঠ করেন। উত্তরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ জানাইয়া কিছু বলেন।

হাতে-তৈয়ারী কাগজ-শিল্প

ডক্টর এ. করিম, পি-এইচ. ডি (লণ্ডন) ও এম.এ. আজম, এম. এসসি

বর্ত্তমানে আমাদের দেশের লুপ্তপ্রায় হাতে-তৈয়ারী কাগজ-শিল্পের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে। এই প্রচেষ্টায় সরকারী ও বে-সরকারী বহু প্রতিষ্ঠানের সহ-যোগিতা রহিয়াছে। কারণ, দেশের যাঁহারা মঙ্গল চিন্তা করেন, তাঁহাদের অনেকেই এ বিষয়ে একমত যে এই শিল্পের পুনরুত্থানে জনসাধারণ তথা দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। হাতে-তৈয়ারী কাগজ-শিল্পের পুনরুদ্ধার-প্রচেষ্টা প্রথমতঃ রাজনৈতিক প্রেরণা ও 'স্বদেশী' ভাব-প্রবণতায় উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু কোনও শিল্পকে কেবলমাত্র খেয়ালের খোরাকে সঞ্জীবিত রাখা যায় না। শিল্পের সত্যিকার জীবন নির্ভর করে উহার অর্থনৈতিক দৃঢ়তার উপর। বস্তুতঃ, বর্ত্তমান সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হাতে-তৈয়ারী কাগজ-শিল্পের প্রকৃত অর্থনৈতিক মূল্যেরই অনুসন্ধান চলিতেছে।

হাতে-তৈয়ারী কাগজ-শিল্পের ইতিহাস সভ্যতার ইতিহাসের সমসাময়িক। ইহার প্রাচীনত্ব দুই সহস্র বৎসরেরও উর্দ্ধে। কথিত আছে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে চীনদেশে প্রথম কাগজ প্রস্তুত হয়। মিশর দেশে পেপিরাস নামক এক প্রকার উদ্ভিদের তন্তু হইতে স্মরণাতীত কালে কাগজ প্রস্তুত হইত। সে উদ্ভিদের নাম হইতে বর্ত্তমান 'পেপার' বা কাগজ নামের উৎপত্তি হয়। পৌরাণিক যুগে আমাদের দেশে তালপত্র, ভূর্জ্জপত্র প্রভৃতির প্রচলন ছিল। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-তুর্কীস্থান অধিকৃত হওয়ার পর তাঁহারা চীনা কয়েদীগণের নিকট হইতে হাতে-তৈয়ারী কাগজ-শিল্প শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর উহা আরবগণ কর্ত্তৃক ইউরোপে সংক্রমিত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সুলতান মাহমুদ গজনী কর্ত্তৃক পঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রদেশে হাতে-তৈয়ারী কাগজ-শিল্প প্রচলিত হয়। পরবর্ত্তী যুগে মুঘল ও পেশোয়া-গণ কর্ত্তৃক ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। চীনদেশের সন্নিকট-বর্ত্তী বলিয়া এবং উভয় দেশের মধ্যে যাতায়াত ও যোগাযোগ থাকায় নেপালেও হাতে-তৈয়ারী কাগজ-শিল্প বিশেষ প্রসারলাভ করে এবং অদ্যাবধি তথায় এক প্রকার বিশিষ্ট গাছের বল্কল হইতে অতি উৎকৃষ্ট হাতে-তৈয়ারী কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। মনিপুর, কাশ্মীর এবং ব্রহ্ম-দেশের অন্তর্গত শান প্রদেশে অতি উৎকৃষ্ট হাতে-তৈয়ারী কাগজ প্রস্তুত হয়।

নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে যখন সুবা বাংলার শাহী মসনদ ঢাকার গৌরব বর্দ্ধন করিতেছিল, তখন তিনি সরকারী দলিল-পত্রাদি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কাগজ প্রস্তুতের জন্য 'কাগজী' নামক এক শিল্পী-সম্প্রদায়কে শহরতলীতে বসবাসের নিমিত্ত ভূমি দান করেন। ইহাদেরই বংশধর এখন বাংলার প্রায় সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত এবং এখনও 'কাগজী' বলিয়া অভিহিত হয়। এককালে ইহাদের হাতে কাগজ-শিল্পের এতাদৃশ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল যে ঢাকার প্রসিদ্ধ গ্রাম আড়িয়ালের নিকটবর্ত্তী ছুলিহাটা, নাগরপাড়, দীঘির পাড়, ধৈরপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে প্রায় এক লক্ষ মুসলমান কাগজীর বসতি ছিল, এবং ইহারা শুধু বাংলায় নয় অধিকন্তু পার্শ্ববর্ত্তী বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম প্রদেশের কাগজের চাহিদাও পূরণ করিত। ইহা প্রায় ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বকার কাহিনী। বর্ত্তমানে 'কাগজী'-সম্প্রদায়ের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিলে উহা অলীক কাহিনীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। যন্ত্র-যুগের রুধিরাক্ত বিজয় শকট কাগজী সম্প্রদায়কে যেন নির্দ্দয়ভাবে নিষ্পেষিত করিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

কলে প্রস্তুত অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে বিক্রীত কাগজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শারীরিক পরিশ্রমে উৎপাদিত নিকৃষ্ট চেহারার হাতে-তৈয়ারী কাগজ পশ্চাদ্বর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল। পৈত্রিক ব্যবসায় দ্বারা অন্নসমস্যার সমাধান করা দুঃসাধ্য বলিয়া কাগজীদের অনেকেই উহার মোহ ত্যাগ করিয়া হালচাষ, নৌকাচালনা ইত্যাদি স্থূলতর কার্য্যকেই জীবিকা নির্ব্বাহের পক্ষে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে করিল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবসর সময়ে বৎসরের শুষ্ক ঋতুতে সামান্য পরিমাণ কাগজ প্রস্তুত করিয়া হাতে-তৈয়ারী কাগজের অতি সামান্য চাহিদা মিটাইয়া থাকে। এই সকল কাগজী-দের সংখ্যা সমগ্র বাংলায় বর্ত্তমানে এক শতের অধিক হইবে না। হুগলী, ঢাকা, পাবনা, চট্টগ্রাম ও হাওড়া জেলার বিভিন্ন অংশে ইহাদের বাস। ইহারা সাধারণতঃ স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া কাজ করে। কোনও কোনও প্রক্রিয়া—যেমন কাগজে মাড় দেওয়া, কাগজ পালিশ করা ইত্যাদি কেবলমাত্র মেয়েদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী ইহাদের বংশপরম্পরা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, যদিও বিভিন্ন অঞ্চলে কাগজ প্রস্তুতের উপাদানে সামান্য পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। হাওড়ায় মাইনান অঞ্চলে কেবলমাত্র পরিত্যক্ত

কাগজের টুক্‌রা হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়; আবার মুর্শিদাবাদ ধুলিয়ান এলাকায় প্রধানতঃ পাট, শণ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। ঢাকার মুন্সীগঞ্জ ও আড়িয়ালে এবং চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত পটিয়ায় সাধারণতঃ নূতন কাগজ কাটা কিংবা পরিত্যক্ত কাগজের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ পাট অথবা শণ মিশ্রিত হইয়া থাকে। যুগের অগ্রগতির সহিত তাল রাখিবার সামান্য প্রয়াসও এই 'কাগজী'-সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। ইহাদের অধিকাংশই নিরক্ষর। নিজ ব্যবসায়ের দুরবস্থা অদৃষ্টের অনিবার্য্য বা অখণ্ডনীয় পরিণতি মনে করিয়া ইহারা সান্ত্বনা লাভ করে। ইহাদের দ্বারা অবসর সময়ে প্রস্তুত সামান্য পরিমাণ কাগজ যেন এক দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক স্মারকলিপির ন্যায় বিগত যুগের স্মৃতি একান্ত বিশ্বস্তভাবে রক্ষা করিতেছে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, মুন্সীগঞ্জ প্রভৃতি শহরে কোনও কোনও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে ইহাদের নিকট হইতে কিছু পরিমাণ হাতে-তৈয়ারী কাগজ হিসাব-নিকাশের খাতা প্রস্তুত করিবার জন্য প্রতি বৎসর ক্রয় করিয়া থাকেন। কলে প্রস্তুত কাগজ অপেক্ষা হাতে-তৈয়ারী কাগজ অধিকতর টেকসই হয় বলিয়া তাঁহারা ইহার সমাদর করিয়া থাকেন। চট্টগ্রাম সরকারী দপ্তরখানায় ১০০ বৎসরের অধিক পুরাতন হাতে-তৈয়ারী কাগজে লিখিত দলিল অদ্যাবধি অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। হাতে-তৈয়ারী কাগজ পোকার আক্রমণ হইতে অপেক্ষাকৃত অব্যাহত থাকে। কলে প্রস্তুত সাধারণ কাগজে লিগনিন নামক পদার্থ বর্ত্তমান থাকে বলিয়া উহা অল্প সময়ের মধ্যে রৌদ্র বাতাসের সংস্পর্শে মলিন ও ভঙ্গুর হইয়া পড়ে। এই কারণে মূল্যবান্ দলিল-পত্রাদি সংরক্ষণের জন্য হাতে-তৈয়ারী কাগজ অধিকতর উপযোগী। কিন্তু এই গুরুত্ব হাতে-তৈয়ারী কাগজের সাধারণ চাহিদাকে যথেষ্ট পরিমাণ প্রসারিত করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। স্বদেশীভাবাপন্ন কিংবা ভাব-বিলাসী কোনও কোনও ভদ্রলোক হাতে-তৈয়ারী কাগজে চিঠি-পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। পূজাপার্ব্বণ, বিবাহ ইত্যাদিতে নিমন্ত্রণপত্র লিখিবার জন্য হাতে-তৈয়ারী খাঁটি স্বদেশী কাগজের পবিত্রতা অনেক ধর্ম্মপ্রাণ বাঙালী ও অবাঙালী হিন্দুকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

কিন্তু, অর্থকরী ব্যবসায় হিসাবে হাতে-তৈয়ারী কাগজ-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ক্রমশই লোপ পাইতেছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডার্ড হাণ্টার নামে জনৈক মার্কিন-বিশেষজ্ঞ হাতে-তৈয়ারী কাগজ-শিল্পের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। তিনি এই সম্পর্কে ভারতবর্ষ, চীন, শ্যাম (বর্ত্তমান থাইল্যাণ্ড) প্রভৃতির অবস্থা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইলে ভারতীয় লুপ্তপ্রায় হাতে-তৈয়ারী কাগজ-শিল্পকে পুনর্জ্জীবিত করা কিছুমাত্র অসম্ভব হইবে না। হাণ্টার সাহেব আড়িয়াল প্রভৃতি বাংলার সুদূর পল্লীঅঞ্চলে পদার্পণ করিয়া তথাকার স্থানীয় কাগজীদের কাজকর্ম্ম দেখিয়া এবং তাহাদের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। সত্যিকার শিল্প-দরদী এবং হাতে-তৈয়ারী কাগজ-শিল্প সম্বন্ধে বর্ত্তমানে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ হাণ্টারের মতামতের গুরুত্ব ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। হাণ্টার ভারত-সরকার এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে এই শিল্প পুনরুদ্ধারের প্রতি সচেষ্ট হইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তাঁহার উক্ত রূপ ইঙ্গিতেই হউক, কিংবা যুগের নিজস্ব প্রেরণাতেই হউক, অনেকটা সমসাময়িকভাবে বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হাতে-তৈয়ারী কাগজ-শিল্পের উন্নতি সাধনের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে মন ও মস্তিষ্ক উভয়ই বিদ্যমান আছে এবং ইহাদেরই সম্মিলিত প্রচেষ্টা হাতে-তৈয়ারী কাগজ-শিল্পের ভবিষ্যৎকে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর করিয়াছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ওয়ার্দ্ধাস্থিত নিখিল-ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ (All-India Village Industries Association), খাদি প্রতিষ্ঠান (সোদপুর), উষাগ্রাম স্কুল কলোনি (আসানসোল), মাদ্রাজ স্কুল অব আর্টস এণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌স, বঙ্গের সরকারী শিল্প-বিভাগের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ্চ লেবরেটরী, দেরাদুন ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই হাতে-তৈয়ারী কাগজশিল্পের উপাদান এবং প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন করিয়া উহার অর্থনৈতিক ভিত্তিকে দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্য লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, তথাপি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাগজ-শিল্পের বিভিন্ন দিক্ উন্নতি লাভ করিয়াছে। নিখিল-ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ ছোট-খাট দুই-একটি যান্ত্রিক কৌশল প্রয়োগ করিয়া হাতে-তৈয়ারী কাগজ-প্রস্তুতের কষ্টসাধ্য পরিশ্রমের আংশিক লাঘব করিয়াছেন। খাদি প্রতিষ্ঠানের হাতে-তৈয়ারী কাগজে বাঁশের মণ্ড ব্যবহৃত হইতেছে। মাদ্রাজ স্কুল অব্ আর্টস এণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌সে কাপড়ের ছাঁট হইতে উচ্চ শ্রেণীর কাগজ প্রস্তুতের সফল প্রয়াস হইয়াছে। দেরাদুন ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটে কয়েকটি বিশেষ প্রকার বনজ উদ্ভিদ, পরিত্যক্ত কাষ্ঠখণ্ড, ইক্ষুর ছোবড়া ইত্যাদি

লইয়া গবেষণা চলিয়াছে। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিল্প-গবেষণাগারে সাধারণ খড়, পাটকাঠি এবং কচুরীপানা হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় যাদুঘরের (Indian Museum) শিল্পশাখার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এস্. কে. বল মহাশয় এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে প্রায় চল্লিশ প্রকার হাতে-তৈয়ারী কাগজ সংগ্রহ করিয়া যাদুঘরে সাধারণ দর্শকদের জন্য স্থাপন করেন। বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগের পক্ষ হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখকদ্বয় কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রায় বার প্রকার হাতে-তৈয়ারী কাগজ ঐ সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত আছে।

লণ্ডনস্থ ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটের বুলেটিনে (Vol. xxxii, April—June 1932) পত্রিকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে পৃথিবীতে দুই সহস্রেরও অধিক তৃণ, গুল্ম, বৃক্ষাদি আছে যাহাদের তন্তুতে কাগজ প্রস্তুত করা সম্ভবপর। আলেকজাণ্ডার ওয়াট্ নামক জনৈক বিশেষজ্ঞ তৎ-প্রণীত *Art of Paper-making* নামক গ্রন্থে কাগজের মণ্ড প্রস্তুতের উপযোগী প্রায় পঞ্চাশ প্রকার বিভিন্ন উপাদানের উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্জাব-সরকারের প্রাক্তন তন্তু-বিশারদ্ জে. কে. সরকারও এই প্রসঙ্গে কয়েক প্রকার ভারতীয় তন্তুর নাম করিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহাদের যে কয়েকটি কল কিংবা হাতে-তৈয়ারী কাগজের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে উহাদের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। বহুকাল যাবৎ কলে-তৈয়ারী কাগজের জন্য কেবলমাত্র এক প্রকার বিশেষ কাষ্ঠ-মণ্ডই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল: মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলে প্রস্তুত কাগজের উপাদান হিসাবে ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথম বাঁশের প্রচলন হয়। সেবয় (Saboi gran) প্রভৃতি তৃণ-জাতীয় উদ্ভিদের তন্তুও ক্রমে সমাদর লাভ করিয়াছে। কাষ্ঠ-মণ্ডের সহিত সর্ব্বপ্রথম জাপানে শতকরা প্রায় এক ভাগ মাত্র খড় (paddy straw)-এর ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু জাপানের বিখ্যাত Style নামক হাতে-তৈয়ারী কাগজে আদৌ খড় ব্যবহৃত হয় না। জাপানীরা এই নিমিত্ত কোজো, মিৎসুমাতা প্রভৃতি উদ্ভিদ-তন্তু ব্যবহার করিয়া থাকেন। খড় হইতে হাতে-তৈয়ারী কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রথম প্রচেষ্টার গৌরব সম্ভবতঃ নিখিল-ভারত গ্রামোদ্যোগ সমিতির রাসায়নিক কে. বি. জোশীর প্রাপ্য। কিন্তু বঙ্গীয় গবর্ণ-মেণ্টের শিল্প-বিভাগেই কেবলমাত্র খড় হইতে সুন্দর টেকসই লিখিবার কাগজ সাফল্যের সহিত প্রথম প্রস্তুত হয়। শ্রীনিকেতন কুটীরশিল্প-বিভাগে খড় হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শান্তিনিকেতন কর্ত্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শিল্প-বিভাগের গবেষণাগারে কচুরীপানা হইতেও অল্প খরচে কাগজ ও এক প্রকার শক্ত প্রেস্‌ড্ বোর্ড প্রস্তুত করা হইয়াছে।* এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অভিনব ও কচুরীপানা-জর্জ্জরিত বাঙ্গলার পক্ষে সুদূরপ্রসারী। কচুরীপানা বাংলা দেশে প্রায় দশ কোটী টাকার শস্যহানির কারণ বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। অধিকন্তু ইহার অত্যাচারে জলবায়ু দূষিত হইয়া যে স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া থাকে তাহা বোধ হয় টাকার অঙ্কে হিসাব করা সম্ভবপর নহে। ১৯৩৮ সালে কচুরীপানা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে কচুরীপানা হইতে তৈয়ারী কয়েক প্রকার কাগজ ও বোর্ড বাংলার তদানীন্তন পল্লী-উন্নয়ন-বিভাগের ডিরেক্টরকে উপহার দেওয়া হয়। এতৎসঙ্গে তাঁহার নিকট যে পত্র প্রেরিত হয় তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্যতম লেখক কর্ত্তৃক কচুরীপানা হইতে প্রস্তুত কাগজে লিখিত হইয়াছিল। ইম্পিরিয়াল রিসার্চ্চ ব্যুরোর ডিরেক্টর গিলমোর সাহেব কচুরীপানা হইতে কাগজ প্রস্তুতের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে বাংলার গবর্ণর শিল্প-বিভাগ কর্ত্তৃক প্রস্তুত কচুরীপানার কাগজ ও 'বোর্ড' দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হন এবং এ সম্পর্কে শিল্প-গবেষণার মর্য্যাদা ও আবশ্যকতা স্বীকার করেন। বস্তুতঃ সুলভ উপাদান প্রবর্ত্তনের দ্বারাই হাতে-তৈয়ারী কাগজ-শিল্পের ভবিষ্যৎকে নিরাপদ ও উন্নতিশীল করা সম্ভবপর। সাধারণ কাজের জন্য যে-কাগজের প্রয়োজন হয় হাতে-তৈয়ারী খড় কিংবা কচুরী-পানার কাগজ দ্বারা সেই চাহিদার সামান্য পূরণ করিলেও এই শিল্প বাংলা তথা ভারতীয় কুটীর-শিল্পের পর্য্যায়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। কেহ কেহ মনে করেন ইহাতে কাগজের কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা হইবে। প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। হাতে-তৈয়ারী কাগজ যেমন ছাপা-খানায় সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে না, সেইরূপ এমন অনেক প্রয়োজন আছে যাহা কলে-প্রস্তুত কাগজে পূর্ণ করা সম্ভবপর হয় না। ড্রইং, চারুশিল্প প্রভৃতি কাজে আমরা বিদেশ হইতে হাতে-তৈয়ারী কাগজ আমদানী করিয়া ব্যবহার করি। লেখক কর্ত্তৃক সংগৃহীত এক প্রকার বিলাতী হাতে-তৈয়ারী কাগজ বাজারে রীম প্রতি প্রায় দেড় হাজার টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। ইংলণ্ডে হাতে-তৈয়ারী কাগজ-শিল্প মিল প্রভৃতির চরম উৎকর্ষের

* "Utilization of Water Hyacinth in the Manufacture of Paper and Pressed Boards" By M. A. Azam—*Science and Culture*, May, 1941.

সমান্তরালেই বিস্তারলাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে তথায় ৫৫টি হাতে-তৈয়ারী কাগজের কারখানা (vat) আছে। আমেরিকা, জাপান, ইটালী প্রভৃতি দেশেও হাতে-তৈয়ারী কাগজের প্রচলন সামান্য নহে। তথায় উচ্চশ্রেণীর পুস্তক, মলাট কিংবা বিজ্ঞাপন ছাপিবার জন্য হাতে-তৈয়ারী কাগজ বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীর কাগজের চাহিদা নিতান্ত সংকীর্ণ। সুতরাং, সুলভতা ও সুদৃশ্যতায় কলে-প্রস্তুত কাগজের কতকটা সমকক্ষ না হইলে হাতে-প্রস্তুত কাগজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ও বিপজ্জনক মনে করিতে হইবে। তথাপি নূতন কাপড়ের ছাঁট, শণ ইত্যাদি হইতে উচ্চশ্রেণীর কাগজ প্র তের প্রচেষ্টায় বিরত থাকাও বুদ্ধিমানের কাজ নহে। পেপার মালবেরী নামক এক প্রকার উদ্ভিদের বঙ্কল হইতেও অতি অল্প খরচে কাগজ প্রস্তুত করা সম্ভবপর। জাপান, চীন, পলিনেশিয়া, শ্যামদেশে এই বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ব্রহ্মদেশীয় শান-রাজ্যের অন্তর্গত মর্ত্তবন পাহাড়ে ইহারা অগণিত সংখ্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শিবপুর রয়াল বোটানিক্ গার্ডেনে উদ্ভিদের চাষ পরীক্ষিত হইয়াছিল। ফলে, ইহা প্রতিপন্ন হয় যে এই উদ্ভিদ বাংলা দেশে (বিশেষতঃ নিম্ন অঞ্চলে) স্বচ্ছন্দে জন্মিতে পারে। হাতে-তৈয়ারী কাগজ-শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে এই সকল গবেষণার ফলকে কার্য্যক্ষেত্রে নিয়োজিত করিতে হইবে। অধিকন্তু এ সকল গবেষণা মুখ্যতঃ হাতে-তৈয়ারী কাগজ-শিল্পকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলেও এই প্রচেষ্টায় এক দিন সংবাদপত্র মুদ্রণোপযোগী সুলভ ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ তন্তুরও সন্ধান মিলিতে পারে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

প্রত্যহ মহানগরের পথে চলিতে হয়। কর্ম্মব্যস্ততার জন্য দৃষ্টির চারিপাশের বস্তু যে ভাবে অবহেলিত হয়—সৌধ, যান-বাহন, জনস্রোত, পথের আবর্জ্জনা—ইহারাও সেই সঙ্গে আশ্চর্য্য-ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। যখন অপ্রচুর বসনে কোন রকমে লজ্জা বাঁচাইবার অভিনয় না করিয়াই রুগ্ন নারী ক্ষুধাতুর ছেলে কোলে করিয়া হাত পাতিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়—অভ্যাসবশত বিনা বাক্যব্যয়ে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাই। সময় কোথায় যে করুণ আবেদনকে মনে স্থান দিব! কতটুকুই বা সামর্থ্য যে উহাদের দুঃখ মোচন করিব!

পাঁচটা বাজে। আপিস হইতে বাহির হইলাম। আকাশে মেঘের সমারোহ। শ্রাবণের আকাশ জলভারে সর্ব্বদাই থম থম করিতেছে। ক্ষান্তবর্ষণের ফাঁকে যেটুকু পথ ট্রাম বাসকে মাশুল না দিয়া অতিক্রম করা যায় তাহাই লাভ। কলিকাতার পথ—নিতান্ত বিজন মাঠের মত আশ্বাসহীন নহে। প্রশস্ত গাড়ি-বারান্দার উপকারিতা—এই সজল জলদজাল সমাচ্ছন্ন সতত ক্রন্দনপরায়ণ আকাশের দেশে—বিশেষ করিয়াই বুঝিতেছি। সখ বা সৌন্দর্য্য মানুষকে মুগ্ধ করে এবং মানুষকে আশ্বাস দেয়।

খানিকটা পথ চলিতে না চলিতেই বৃষ্টি নামিল। ইম্প্রুভ-মেণ্ট ট্রাষ্টের নূতন প্রশস্ত রাস্তা, কোথাও আশ্রয় নাই। পা চালাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হইতে প্রচণ্ড বাতাস বহিয়া বৃষ্টির বেগ সহসা বাড়াইয়া দিল। সর্ব্বাঙ্গ বাঁচাইয়া পথ চলা দুষ্কর; সুতরাং কোন দেওয়ালের গায়ে দাঁড়াইলে ধারাস্নান হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিব ভাবিয়া প্রকাণ্ড এক সরকারী দপ্তরের

পয়লা আগষ্ট কাটিয়া গিয়াছে, চেতাবনী-বিভীষিকাও সেই সঙ্গে কাটিয়াছে। প্রত্যহ পথ চলিবার সময় ভাবি, সত্যই কি বিভীষিকা কাটিয়াছে? শহরের পথে ভিড় বাড়াইয়াছে নূতন চাকুরিয়া নব যুবকের দল এবং অন্নবঞ্চিত পল্লীর দুর্গত জনসাধারণ। শেষোক্ত হতভাগ্যেরা কি বুঝিয়াছে জানি না—শহরের প্রশস্ত রাজপথে পঙ্গপালের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে এক মুঠা অন্নের আশায়। প্রকাণ্ড সৌধ, মোটরসঙ্কুল পথ এবং সুবেশ চাকুরিয়াদের দেখিয়া হয়ত আশা করিয়াছে—পল্লীর ধানের ক্ষেত হইতে পলাতকা লক্ষ্মী—এই সৌধসমাকীর্ণ মহানগরে স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধিয়াছেন। যুদ্ধের ছবি কাগজের পৃষ্ঠা আশ্রয় করিয়া কতটুকু বিভীষিকা আর দেখাইতে পারিতেছে, এই হতভাগ্য নরনারীরা মহানগরকে তার চেয়ে বেশি আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে! আমরা কাগজে যখন উহাদের কথা পড়ি—সমবেদনায় 'আহা'র চেয়েও অনেক আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া পরস্পরের মন ভিজাইয়া দিবার প্রতিযোগিতা করি; পথে যখন উহাদের দেখি—সভয়ে খানিকটা ব্যবধান রাখিয়া চলি—পাছে উহাদের নোংরা কাপড় বা দেহের সংস্পর্শে আসিয়া কতকগুলি সাংঘাতিক রোগবীজাণু সংগ্রহ করিয়া ফেলি! যে জীবন পথের ধারে এ বেলায় ফোটা ফুলের মত ওবেলা ঝরিয়া পড়িতেছে—তাহাকে আবেগলেশহীন শাদা চোখে দেখিতেই অভ্যস্ত বলিয়া যে মৌখিক আক্ষেপ প্রকাশ করি তাহা আসলে উহাদের অকাল মৃত্যুর জন্য নহে—ব্যাধি সংক্রামতার আশঙ্কায়। অথচ হতভাগ্যদের জন্য আমাদের আন্তরিক টান যে নাই—এমন কথা বলাও দুষ্কর।

বিফল প্রাচীরের (যেহেতু বোমার টুক্‌রাকে বিফল করিয়া মানুষকে বাঁচায়) পিঠে ছাতা মেলিয়া দাঁড়াইলাম। আমি একা নহি—আরও অনেকে আত্মরক্ষার্থ সেইভাবে আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু তাহারা আমার মত সদ্যবিপন্ন আপিসের বাবু নহে। দৃষ্টির সীমানায় থাকিয়া যাহারা অ-দৃষ্ট সেই হতভাগ্যের দল।

মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। আর একটু প্রাচীর ঘেঁষিয়া তাহাদের স্পর্শ বাঁচাইয়া তাহাদের পানে চাহিলাম। গুটিচারেক নারী—রুগ্ন শিশু লইয়া প্রাচীরের পৃষ্ঠে দেহ রাখিয়া হাড় চর্ব্বণ করিতেছে। পরনে তাহাদের ময়লা ছেঁড়া কাপড়, কটি ছাড়াইয়া কিছুটা উর্দ্ধে উঠিয়াছে। ঘরের মধ্যে যে লজ্জা পোষণ করা সামাজিক শালীনতার অপরিহার্য্য অঙ্গ—পথের মাঝে তাহাকে টানিয়া আনা বিড়ম্বনা বলিয়াই হয়ত নিরাবরণ যুবতী-দেহে তাহাকে ধরিয়া রাখিবার সকরুণ চেষ্টা নাই, যুবতী-মুখে লজ্জা বাঁচাইবার সচকিত পাংশু ভাবও নাই। একটি ষাট বছরের বৃদ্ধা—তাহারই গোষ্ঠীভুক্তা আর তিনটি নারী ও দু'টি উলঙ্গ শিশু। কোলের ছেলেটার হাড় চুষিবার বয়স হয় নাই—মায়ের স্তনে মুখ দিয়া জীবনীরস সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে। আট-নয় বছরের ছেলেটি আর একখানি হাড় পাইবার প্রত্যাশায় মায়ের পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ও-পাশে একটি রুগ্না কুক্কুরীও প্রত্যাশাপূর্ণ ভাবে লাঙ্গুল আন্দোলন করিতেছে।

বৃষ্টির বেগ বর্দ্ধিত হইল, মানুষগুলি আর একটু দেওয়াল ঘেঁষিয়া বসিল, কুক্কুরী নড়িল না।

মোটা মোটা হাড়—মাংসের লেশমাত্র ছিল কিনা বলা দুষ্কর—অন্তত উত্তমরূপে লেহিত হইয়া কুক্কুরীর দিকে যখন নিক্ষিপ্ত হইল—তখন তাহার মসৃণ শ্বেতবর্ণ হইতে বিদ্রূপের রশ্মি বিচ্ছুরিত হইতে দেখিলাম। লাঙ্গুল আন্দোলন থামাইয়া কুক্কুরীটা হাড়খানা মুখের মধ্যে পুরিল এবং পর মুহূর্ত্তেই মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিল। মানুষের সাধ্যায়ত্ত যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, সাধ্যেরও অতীত বলিয়া হাড়খানা অচর্ব্বিত রহিয়াছে। কুকুরের দাঁতেও সেই শক্ত হাড় কণামাত্র চূর্ণিত হইল না। জলে ভিজিয়া অতি মসৃণ হাড় দুঃস্থ নারী ও দুর্ব্বল কুক্কুরীকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

বৃষ্টি আর একটু চাপিয়া আসিল। যে মেয়েটির কোলে শিশুটি স্তন্য পান করিতেছিল—বৃদ্ধা তাহাকে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় ধমক দিল। তাহার অর্থ, এই দারুণ বৃষ্টিতে ছেলেটিকে ভিজাইয়া অসুখে ফেলিবার দরকার কি!

বৃদ্ধার শাসনে মেয়েটি কোলের ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া অদূর-স্থিত গাড়ি-বারান্দার উদ্দেশে ছুটিল। আট-দশ বছরের ছেলেটি একটা ভাঙ্গা ঝুড়ি মাথায় দিয়া বৃষ্টিধারা হইতে বৃথা আত্মরক্ষার প্রয়াস করিতেছিল। দ্বিতীয় যুবতী তাহার হাত ধরিয়া সেই গাড়ি-বারান্দা অভিমুখে ছুটিল। তৃতীয় যুবতী কোথাও নড়িল না, আর একটু দেওয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা তখন কাঁপিতে কাঁপিতে আমার ছাতার অদূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার দিকে ছাতাটা আর একটু আগাইয়া দিলাম। আমার এক দিকের কাপড় ভিজিতে লাগিল। কি জানি কেন তাহাতে মনোযোগ না দিয়া উহার শতচ্ছিন্ন পরিধেয়খানি যাহাতে বৃষ্টি-স্নাত না হয় সেই চেষ্টাই হয়তো করিলাম। দয়াপরবশ হইয়া নহে, এমনই অজ্ঞাতসারে ডান হাতসমেত ছাতাটা ওদিকে হেলিল, একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম। বৃদ্ধার শরীর শীর্ণ, মাথার চুল বিরল এবং শুভ্র। রোদে পুড়িয়া ও জলে ভিজিয়া কুঞ্চিত চামড়ার স্বাভাবিক বর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। পায়ের পাতা ফুলিয়াছে। তা ছাড়া সর্ব্বত্র অস্থিরাশি সুপ্রকট। শিথিল মাংসবন্ধনীতে সেগুলি সংযত থাকিতে চাহিতেছে না। চোখে ও মুখে জীবনী-লক্ষণ—বালুগর্ভাশ্রিত নদীস্রোতের মতই অনুমানসাপেক্ষ। মরণের দুয়ারে দাঁড়াইয়া ও বুঝি জীবনকে শেষ বারের মত ব্যঙ্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

প্রবল বৃষ্টিপাতে চারিদিক সাদা দেখাইতেছে—রোগবীজাণুর আশঙ্কা আমার মনের কোথাও নাই। সে যেন ওই দিক্‌-চিহ্নহীন বর্ষণের ঘন পর্দ্দায় ঢাকিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা হইল—আলাপ করিবার।

—কোথায় বাড়ি তোমার?

—আমায়—বলতেছ—বাবা?

—হাঁ, কোথায় বাড়ি?

—এই উলুবেড়েয় বাবা।

—কত দিন শহরে এসেছ?

—তা মাস দুই হবে। হবে নি? ও পাশের যুবতীটিকে প্রশ্ন করিল। যুবতী মুখ বাড়াইয়া ঘাড় কাত করিল।

—কি করতে দেশে?

—মজুরি। ধান ভানা, ধান সেদ্ধ, মুড়ি ভাজা, পেতে কুলো তৈরী—

—তা শহরে এলে কেন?

—কি করি বাবা—খেতে পাই নে। ধানের কল উঠে গেল—জিনিসপত্তর কেউ কেনে না।

—তোমরা একাই এসেছ, না—

—একা? বলে আধখানা গাঁ চলে এল। আর বাবা, কি খাব বলতো? হাঁ বাবা, ভগবান্ কি এমনি করেই মারবে!

—ভগবান্!

এত দুঃখেও ভগবান্‌কে ভুলিতে পারে নাই। সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে অভিযোগ। কাহার বিরুদ্ধে?

—হাঁ বাবা, কত দিন এমনি ধারা চলবে?

উত্তর দেওয়া কঠিন। সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলাম না। পূর্ণ সত্যের অভিমুখীন হইয়া অর্দ্ধ সত্যের প্রলেপ লাগাইয়া আত্ম-প্রবোধ দিয়া লাভ কি?

—তা তোমরা জলে এমন ক'রে ভিজছো কেন? এই গাড়ি-বারান্দার তলায় গিয়ে থাক না কেন?

—থাক্‌তে দেয় না। লাঠি দিয়ে মারে, গায়ে জল ঢেলে দেয়।

—কে মারে ?

—বাবুরা। বলে—দূর দূর।

সংক্রামক রোগবীজাণু—নোংরামি। এসব মনে হইলে করুণা মনের ত্রিসীমানা ত্যাগ করে।

—তা তোমরা ফুটপাথ নোংরা কর কেন ?

প্রশ্ন করিয়াই ভাবিলাম, অসঙ্গত প্রশ্ন। পথের উপর মমতা কে কবে পোষণ করিয়াছে ? আর উহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কাহারাই বা সুব্যবস্থা করিতেছে ! বন্যার উৎপাতের মত উহারাও শহরবাসীকে জ্বালাইতে আসিয়াছে। বন্যা সাময়িক, উহাদের দুঃখ-দাতা ভগবান্ই জানেন কতদিনে এই দুর্ভোগের অবসান ঘটিবে !

—তা শহরে খাও কি ?

—এই কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পাই।

—মাংস কোত্থেকে পেলে ?

—উই বড় বাড়িটা থেকে ফেলে দেয়—কুড়িয়ে আনি।

—ভাত পাচ্ছ কোথায় ?

—ভাত ! ভাত অনেক দিন খাই নি বাবা। এক মাস হ'ল, না রে ?

উদ্দিষ্টা যুবতী মুখ বাহির করিয়া মাথা নাড়িল।

—তা শহরে বাবুরা অন্নসত্র খুলেছেন—সেখানে যাও না কেন। ভাত ডাল একসঙ্গে সেদ্ধ ক'রে দেয়।

—কোথায়—কোথায় বাবা ?

বৃদ্ধার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। বারিবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া যুবতী দেহের অর্দ্ধাংশ বাহির করিল।

—কোথায়—কোথায় গো ?

ঠিকানা বলিয়া দিলাম।

—তা বাবা আমাদের দেবে কেন ?

—তোমাদের জন্যেই তো। রোজ এক এক জায়গায় দেড় হাজার ক'রে লোক খাচ্ছে।

—দেড় হাজার ! কিন্তু আমরা কি খেতে পাব ?

অনাহারে—তাড়নায় কেমন অবিশ্বাস জন্মিয়াছে সব জিনিসের উপর।

—কেন, ঠিক সময়ে গেলে—

—না বাবা, ভিড় ঠেলতে পারব নি। বুড়ো মানুষ—ক্ষ্যামতা নেই।

যুবতী বলিল, কত লোক সেখানে হত্যে দিচ্ছে গো, আমাদের বরাতে জুটবে নি।—চোখের জ্যোতি তাহার নিবিয়া গেল, প্রাচীরের ওপিঠে দেহ ঢাকিবার চেষ্টা করিল।

বলিলাম, এমনিই ত বসে আছ—একবার চেষ্টা দেখ না কেন।

—আমরা যাব—আর কেউ যদি এখানে জায়গা নিয়ে নেয়।

—এই পথের জায়গা নিয়েও মারামারি ?

—হাঁ বাবু। জায়গাটা ভাল। অনেক বাবু আপিস যায়—কিছু ভিক্ষে পাওয়া যায়। ছাতু কি মুড়ি এক মুঠো এ জায়গা ছাড়লে তো পাব না।

মনটা অত্যন্ত কোমল হইয়া আসিয়াছে। কখন পকেটে হাত দিয়া দু-আনির অনুসন্ধান করিতেছি। প্রথমটা ভাবিলাম—দু-আনিই একটা দিব। আহা, চাল থাকিলে চালই দিতাম, কিংবা বাড়ি কাছে হইলে এক বেলা ওই কয়টি প্রাণীকে পেট ভরিয়া খাওয়াইতাম।

দু-আনি হাতে ঠেকিল। পরক্ষণেই মনে হইল, মাসকাবারের মুখে এটিকে হস্তচ্যুত করিলে আমার দুর্গতি রোধ করিবে কে ? দয়া ভাল। সর্ব্বস্ব দানের দুঃখভোগের সহিষ্ণুতা না থাকিলে অনুশোচনাই সার হইবে। হিসাবী মন বলিল, যে দুঃখীর দল পঙ্গপালের মত কলিকাতা ছাইয়া ফেলিতেছে—তাহার প্রতিকার তোমার সাধ্যের বাহিরে। ধনী যদি তাহার শক্ত মুঠা শিথিল না করে—প্রজাপালনের গৌরব বহন করিবে কোন্ শক্তিমান্ ? দায়িত্ব বহন করার যোগ্যতা থাকা চাই তো।

হাতড়াইতে হাতড়াইতে একটা আনি হাতে ঠেকিল। কিন্তু ও তো আমার কাছে এখনও কিছু চাহে নাই। না চাহিতেই দিব কি ? হয়ত ভিক্ষান্নেই জীবন উহাদের ভাল ভাবেই চলিতেছে। দুই মাস এমনি করিয়া চালাইতেছে—আরও কত মাস হয়ত চালাইবে। অভ্যাসে সবই সহজ হইয়া আসিতেছে। জীবন বাঁচিলে তবে ত কুণ্ঠা—সম্ভ্রম !

বৃষ্টি ধরিয়া আসিল। ছাতা বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছি বৃদ্ধা সহসা আমার সামনে হাত পাতিয়া কহিল, ছাতু কিনে খাব একটা পয়সা দে বাবা।

স্বস্তি বোধ করিলাম। মাত্র একটি পয়সাতেই উহার অভাব মিটিবে !

একটি পয়সা দুর্মূল্য। পকেট হাতড়াইয়া ক্ষুদ্রকায় চৌকা ডবল পয়সাটি বাহির করিয়া বুড়ির হাতে দিলাম।

বর্ষার রাজধানীতে সন্ধ্যা নামিতেছে। অন্নহীনের দল পথ আশ্রয় করিয়াছে। ভয়াল ভবিষ্যৎ এমন করিয়াই কি উলঙ্গ সত্যের হাত ধরিয়া প্রকাশিত হইতেছে ?

পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

এই প্রবন্ধে যাঁহার কথা বলিতেছি, তিনি শুধু সাহিত্যিক নহেন—তিনি তাঁহার জীবনে অধিকরূপে রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজসংস্কারক ছিলেন। জন্মভূমির দাসত্বের দুর্দ্দিনের অন্ধকারে যাঁহারা আলোকের সন্ধানে মাতৃচরণে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রণী।

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রথম জীবনে 'বঙ্গদর্শন' ও 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকাদ্বয়ের নাম কাহার নিকট অবিদিত নাই। প্রথমখানির কর্ণধার বঙ্কিমচন্দ্র আজ সাহিত্যের সিংহাসনে সম্রাটরূপে বিরাজ করিতেছেন; আর দ্বিতীয়খানির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ সাহিত্যরাজ্যে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ও সাধারণের নিকট অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছেন!

এই প্রবন্ধে তাঁহার লেখা হইতে যে সামান্য কিছু উদ্ধৃত করিব তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য সত্যই উপেক্ষিত হইবার জিনিষ, কি তাহা আমাদিগের জাতীয় সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য। দেশবাসী যে তাঁহাকে একেবারেই ভুলিয়াছে তাহার একটি কারণ বোধ হয় এই যে, শুধু কথা-সাহিত্য উপন্যাস বা প্রেমের কবিতা না লিখিলে বাংলার বর্ত্তমান সাহিত্য-জগতে লোকের মনে স্থানলাভ করা যায় না। কেহ বলিতে পারেন, তাঁহার লেখাতে ও সাহিত্যে প্রকৃত প্রতিভার ছাপ থাকিলে তাহার জন্য এমন স্থান ভিক্ষা করিতে হইবে কেন? সে তো আপন আসন আপনি প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবে। প্রতিভার জন্য স্থান ভিক্ষা করিতে হয় না সত্য, তবে যিনি 'বঙ্গদর্শনে'র সমকক্ষতা করিয়া 'আর্য্যদর্শন' পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন ও দেশের চিন্তাধারাকে নূতন পথে পরিচালিত করিয়া স্বদেশপ্রেমের একমাত্র সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে কি করিয়া বাংলায় আধুনিক সাহিত্য-যুগের চিত্তাকাশ হইতে কক্ষচ্যুত হইয়া উপেক্ষার অন্ধকারে পড়িয়া গেলেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই মনে হয় যে, তিনি যে সময়ে আমাদিগের এই অভিশপ্ত দেশে তাঁহার প্রতিভান্বিত লেখনী পরিচালনা করিয়াছিলেন তখন সাধারণে তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যের ভাব ও চিন্তাকে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইতে পারে নাই এবং তাঁহার মহত্ত্ব ও ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অনেকেই অন্ধকারে থাকিয়া গিয়াছেন। দেশের সাহিত্য-উদ্যম তখন অন্যান্য মাসিকপত্রের মধ্যে প্রথম 'বঙ্গদর্শন' ও 'আর্য্যদর্শন'—এই দুইখানিকে মুখপাত্র করিয়া প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিতেছিল। একখানির মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অপূর্ব্ব উপন্যাস-গুলিতে শৈবলিনী, কুন্দনন্দিনী, রোহিণী, ভ্রমর, সূর্য্যমুখী প্রভৃতির মধুর ছবি আঁকিয়া নরনারীর প্রণয় ও প্রেমের কথায় সাহিত্যে যে মধুর বাঁশী বাজাইয়াছিলেন তাহা কল্পনাময় বাঙালীর সুকোমল মনপ্রাণকে সহজেই স্পর্শ করিয়াছিল। বঙ্গবাসী বৃন্দাবনের গোপীগণের ন্যায় সে বাঁশীর সুরে আপনাদিগকে ভাসাইয়া দিয়াছিল। যিনি এমন অভিনব সুরে মনপ্রাণ কাড়িয়া লন তাঁহাকে একেবারে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়াছিল এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অসাধারণ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার ঐশ্বর্য্যে তাঁহাকে সাহিত্যের অধীশ্বর করিয়া চিরদিনের জন্য সিংহাসনে বসাইয়াছিল। তাহা করা যে কোনরূপ অন্যায় হইয়াছে তাহা বলিতেছি না। কিন্তু তৎকালে বাংলার অপর পত্রিকাখানি 'আর্য্যদর্শনে' যিনি জননী জন্মভূমির দুর্দ্দশার চিত্র আঁকিয়া তাহা দেশবাসীর সম্মুখে ধরিয়া জননীর শৃঙ্খল মুক্তির জন্য স্বদেশপ্রেমের ভেরী বাজাইয়া দেশবাসিগণকে ডাকের উপর ডাক দিয়া কঠোর ব্রতে জাগরিত করিতে লাগিলেন, নিদ্রাভিভূত বিলাসপালিত দুর্ব্বল বাঙ্গালীচিত্তের নিকট সে আহ্বান অরণ্যে রোদনের ন্যায়, বাতুলের প্রলাপের ন্যায় কোন স্থানই পাইল না—তাহা কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল! স্বদেশপ্রেম ও দেশের জন্য আত্মত্যাগ বড় কঠিন ও কঠোর সাধনার জিনিস,—কয়জন সে সাধনাকে জীবনের ব্রত করিতে পারে? কাজেই যোগেন্দ্রনাথের এই স্বদেশপ্রেমের বাণী তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট স্থান তো পাইলই না, উপরন্তু তাহা বাঙালী-প্রাণে ভীতি ও বিরক্তির সঞ্চার করিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য করিয়া তুলিল। এ মরজগতে তাঁহার লেখনী নিস্তব্ধ হইবার পরই তিনি তাঁহার দেশবাসীর হৃদয় হইতে আরও দূরে অপসৃত হইয়া গেলেন। জনসাধারণ তাঁহাকে ভুলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকিলেও দেশের জাতীয় সাহিত্যে তাঁহার স্মৃতি কখনও মুছিয়া যাইবার নহে। মাতৃভূমির মুক্তি-কামিগণের নিকট তাঁহার স্বদেশপ্রেমের আহ্বান কখন বৃথা হইবার নহে।

এখানে তাঁহার সাহিত্যিক জীবনেরই আলোচনা করিব। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনও সাহিত্যের মধ্য দিয়াই পরিচালিত ও তাহার সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট। তাঁহার 'আর্য্যদর্শন' প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তাঁহার মুখে শুনিয়াছি ভাষা প্রচলন প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র একদিন গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি যাহা লিখিবেন তাহাই বাংলা ভাষা হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বঙ্গভাষাকে পণ্ডিতি আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া চলতি ভাষার ছাঁচে নূতন করিয়া গড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং কালে তাঁহার গর্ব্বই যে সত্য হইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। যোগেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ স্পর্দ্ধার প্রতিযোগিতায় 'আর্য্যদর্শন' বাহির করিয়া যে কৃতিত্বের সহিত বঙ্গদর্শনের সমকক্ষরূপে তাহা চালাইয়াছিলেন, আর্য্যদর্শনের পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। বঙ্গদর্শনে যোগেন্দ্রনাথের লিখিত মিলের জীবনবৃত্ত ইত্যাদি পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইত এবং আর্য্যদর্শনেও বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ-আদি উপন্যাসের বহুল সমালোচনা বাহির হইত। বঙ্গদর্শনের ন্যায় আর্য্যদর্শনেরও তৎকালে বহু কৃতবিদ্য প্রবন্ধলেখক ছিলেন। বঙ্গদর্শন সাধারণতঃ নানা সুন্দর ও রসাত্মক সাহিত্যের মুখপত্র ছিল, আর্য্যদর্শন প্রধানতঃ স্বদেশসেবা ও জননী জন্মভূমির মুক্তিকেই তাহার মূলমন্ত্র করিয়াছিল। বাংলা ভাষার প্রসারতার জন্য যোগেন্দ্রনাথ কত সময় কত নূতন শব্দ গঠন করিয়া ভাষাকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার 'জোসেফ ম্যাটসিনি ও নব্যইতালী' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—

ইউরোপিও রাজনৈতিক ভাবসকল বঙ্গভাষায় প্রতিবিম্বিত করা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার যাঁহারা এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহারা ভিন্ন অপরে তাহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। পদে পদে আমাকে সংস্কৃত ধাতুমূল লইয়া নূতন শব্দ সংগঠিত করিতে হইয়াছে। এরূপ না করিলেও বঙ্গভাষার উন্নতি সাধন করা সম্ভবপর নহে। বঙ্গভাষা দীনা বলিয়া সুশিক্ষিত বঙ্গবাসিগণ ইহাকে অনাদর করিয়া থাকেন। বঙ্গভাষায় কথোপকথন করা বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করা, বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করা অনেকে অর্দ্ধশিক্ষিতের লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। অনেকের সংস্কার যে যাহা শিখিতে হইবে ইংরাজি হইতেই তাহা শিক্ষা করা উচিত। এই সমস্ত ভ্রান্ত লজ্জাকর মতের মূল বঙ্গভাষার দারিদ্র্য। যাঁহারা মাতৃভাষার সেই দারিদ্র্য বিমোচনে জীবন উৎসর্গ করেন তাঁহারাই প্রকৃত দেশহিতৈষী। তাঁহারাই ভবিষ্যপুরুষের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। যাঁহারা ইংরাজিতে লিখিয়া ও ইংরাজিতে বক্তৃতা করিয়া বৈদেশিক ভাষার কলেবর বৃদ্ধি করণে জীবন উৎসর্গ করেন তাঁহারা বিজেত্রী জাতির নিকট আদরণীয় হইতে পারেন, উচ্চপদে আরূঢ় হইতে পারেন কিন্তু তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক স্বদেশের কোন চিরস্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

ইহা হইতেই দেখা যায় তিনি মাতৃভাষার অভাব মোচনে কিরূপ কৃতসঙ্কল্প ছিলেন ও মাতৃভাষার প্রতি কিরূপ আসক্ত ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষাকে এতই ভালবাসিতেন যে, বাংলা ভাষাকে ভারতের জাতীয় ভাষা করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তৎকালে 'আর্য্যদর্শনে' ঐ সম্বন্ধে তাঁহার সুদীর্ঘ লেখা হইতে কিছু এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

আমরা অনেকবার লিখিয়াছি ও এখনও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে জাতীয় শিক্ষা ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না। জাতীয় শিক্ষার দ্বারা আমরা জাতীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছি। ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত এমন দৃষ্টান্ত দেখায় নাই, যেখানে বৈদেশিক ভাষার দ্বারা একটি জাতি সংগঠিত হইয়াছে। বৈদেশিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দুই-চারি জন পণ্ডিত হইতে পারেন কিন্তু একটি সমগ্রজাতি কখন বৈদেশিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারে না…এ জীবন-মরণের সংগ্রামের সময় পরস্পরকে ঠকাইবার সময় নহে। জাতীয় দুর্গের যেখানে যা ভাঙ্গা আছে পরস্পর পড়িয়া তাহা সারিয়া লইতে হইবে। পত্রাবরণে সে ভগ্নস্থান লুকাইলে চলিবে না। ভাষার অভাব থাকে পূরণ করিয়া লও। ভাবের অভাব থাকে তো ভাবিতে আরম্ভ কর। বলের অভাব থাকে তো বলোপচয় কর। পরের বলে পরের ভাবে ও পরের ভাষায় মুগ্ধ হইয়া আপনার জাতীয় ভবিষ্যৎ নষ্ট করিও না। আর যাঁহারা সুনিপুণভাবে বাংলা ভাষার গতি নিরীক্ষণ করিবেন তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। ভারতবর্ষে এমন স্থান নাই যেখানে বাঙালীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাও তথা যায় নাই। যেন ভবিষ্য ভারতীয় ভাষার যোগ্য হইবার জন্য বাংলা ভাষা ধীরে ধীরে স্ফীতাবয়ব হইতেছে। সংস্কৃতের পর প্রাকৃত, প্রাকৃতের পর পালি, পালির পর মাগধী, মাগধীর পর মৈথিলী আর মৈথিলীর পর বাংলা। সংস্কৃত ভাষা ক্রমিক আবর্ত্তনে এই বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। হিমালয় হইতে যেন গঙ্গা বাহির হইয়া নানা তীর্থ পর্য্যটনপূর্ব্বক সাগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।…বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সময় হইতে আধুনিক বাংলার সূত্রপাত। তখনো ইহা মৈথিলী গন্ধবিশিষ্ট ছিল। চৈতন্যের ধর্ম্মপ্রচারের সময় হইতে ভারতচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত ইহার কিঞ্চিৎ গতিমান্দ্য উপলক্ষিত হয়। ভারতচন্দ্রের সময় হইতেই ইহা বেগবতী হইতে আরম্ভ হয়। রামমোহন রায়ের সময় এই বেগ ঘোরতর হইয়া উঠে। সেই অবধিই বাংলা ভাষা প্রচণ্ড স্রোতস্বিনীর ন্যায় উন্নতিসাগরাভিমুখে প্রবল বেগে ধাবিত হইয়াছে। সে আজ অর্দ্ধশতাব্দী মাত্র হইবে—ইহার মধ্যে অসংখ্য প্রতিভাশালী লেখক বাংলা ভাষাকে বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন, অক্ষয়কুমার, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি প্রতিভাশালী লেখকমণ্ডলীর আবির্ভাব এই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেই। যেরূপ ত্বরিত গতিতে বাংলা অগ্রসর হইতেছে ইহাতে আর কোন ভারতীয় ভাষার বাংলার সমকক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি উৎসাহ পায়, যদি গৃহমধ্য হইতে বাধা না পায় তাহা হইলে বাংলা অচিরকালমধ্যে অন্যান্য ভারতীয় ভাষাকে কুক্ষীগত করিয়া লইতে পারে। জাতীয় সম্মিলনের প্রধান অন্তরায় ভাষা-বৈষম্যকে বিদূরিত করিয়া অপূর্ব্ব ভারতীয় জাতীয় ভাষার সৃষ্টি করিতে পারে। বাংলায় অতি সরল ও সুন্দর বর্ণমালা একদিন নিশ্চয়ই জটিল ও কদাকার উড়িয়া বর্ণমালাকে পর্য্যুদস্ত করিবে, দেবনাগর বর্ণমালা অপেক্ষাও বাংলা বর্ণমালা অধিকতর সরল অথচ সমানই সুন্দর। সুতরাং হিন্দির দেবনাগর বর্ণমালাও survival of the fittest মতানুসারে কালে বিলীন হইয়া যাইবে। যেমন ওল্ড ইংলিশ বর্ণমালা অধিকতর ornamental বলিয়া রোমীয় বর্ণমালার দ্বারা পর্য্যুদস্ত হইয়াছে সেইরূপ অধিকতর অলঙ্কৃত দেবনাগর বর্ণমালা সরলতর বাংলা

বর্ণমালার, দ্বারা একদিন নিশ্চয়ই বিতাড়িত হইবে। বৈদেশিক রাজার কৌশলে এ শুভদিন আসিতে বিলম্ব হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু এরূপ দিন যে আসিবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট বৈকেন্দ্রিক নীতি (Decentralisation Policy) অবলম্বন করিয়া বাংলার বিস্তৃতি দুরবিলম্বিত করিতে পারেন বটে, কিন্তু এ গতি একেবারে রোধ করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না…তাই বলিতেছি আইস, ভাই, আমরা আপন জিনিষকে আদর করিতে শিখি। যে মাতৃভাষাকে আমরা অনাদর করিলে জগৎ অনাদর করিবে সে মাতৃভাষার গৌরব বর্দ্ধন করিতে শিখি। যে মাতৃভাষাকে আমরা সুশোভিত না করিলে আর কেহ সুশোভিত করিবে না, নানা দেশ হইতে রত্নরাজি আহরণ করিয়া তাহাকে সাজাই নানা ভাষার মুকুটমণি আনিয়া সেই অনাদৃতা মাতৃভাষার শিরভূষণ করি…ভারত আবার উঠিবে আবার জাতিগণনায় অগ্রণী হইবে আবার সভ্যতালোকে জগৎ ঝলসিত করিবে আবার তাহার জাতীয় ভাষা যুগপৎ অমৃত বর্ষণ ও বিদ্যুৎ উদ্‌গীরণ করিবে। সে জাতীয় ভাষা বাংলা হইবে কিনা তাহা সম্পূর্ণরূপে বঙ্গবাসীর করায়ত্ত।

বাংলা ভাষার জন্য যোগেন্দ্রনাথের এই আন্তরিক কামনা বাঙ্গালী মাত্রেরই মনে সমভাবে জাগিলে বাংলা ভাষা যে ভারতের জাতীয় ভাষায় পরিণত হইত না তাহা বলিতে পারি না। কেননা ভারতের জাতীয় সঙ্গীতরূপে যে 'বন্দে মাতরম্' গান গৃহীত হইয়াছে তাহাও তো বাংলা ভাষারই দান। বাংলা ভাষাকে ভারতের জাতীয় ভাষা করিবার কোন চেষ্টা আর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

যোগেন্দ্রনাথ যখন এইরূপ উদ্দীপনার সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া দেশমাতৃকার পূজা করিতেছিলেন, সে পূজা হইতে বিরত করিবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দিতে ধাবমান হইলেন এবং তিনিও ঐ সময়ে পারিবারিক কোন বিশেষ কারণে তাহা লইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাঁহার লেখনী স্বদেশসেবা হইতে কোনরূপে বিরত হইল না। তিনি তাঁহার চাকরি আমলেও তাঁহার আরাধ্য দেবতা স্বদেশকে পূজা করিতে ও জননী জন্মভূমির দুঃখের প্রতি দেশবাসীর হৃদয় মন আকর্ষণ করিতে কখন বিরত বা বিচলিত হন নাই। তাঁহার অন্তর নির্ভীক ও জন্মভূমির জন্য দুঃখকাতর ছিল। স্বদেশসেবা জীবনের মূলমন্ত্র লইয়া তিনি চাকরিতে কোন দিন সুখী হইতে পারেন নাই। কিরূপ আত্মত্যাগ ও আন্তরিকতার সহিত তিনি তাঁহার স্বদেশসেবার সাধনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহার 'চিন্তাতরঙ্গিণী' ও 'হৃদয়োচ্ছ্বাস' গ্রন্থ হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই দুইখানি পুস্তকে 'স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী', 'জাতীয় সংস্থান', 'স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ', 'অতীত ও বর্ত্তমান ভারত', 'ভারতের ভাবী পরিণাম' ইত্যাদি রাজনৈতিক বিষয়ে এবং 'নব হিন্দুধর্ম্ম', 'বর্ণভেদ', 'সামাজিক নির্যাতন' প্রভৃতি সমাজ-সংস্কার বিষয়ে তিনি বহু মৌলিক চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতের বর্ত্তমান 'কংগ্রেস' জাতীয় মহাসভার পরিকল্পনা ১৮৮৫ সালে হইবার পূর্ব্বে (১৮৮২ সালে) ১২৮৮ সালে মাঘ মাসের 'আর্য্যদর্শনে' স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী নামক প্রবন্ধে যোগেন্দ্রনাথ ঐ জাতীয় মহাসভার চিত্র আঁকিয়া এইরূপে তাহার স্পষ্ট আভাস দিয়া গিয়াছেন—

আমরা জেলার নগরকে শাসনকেন্দ্র করিতে চাহি। এই নগররূপ গ্রহমণ্ডলী আপন আপন প্রদেশে প্রতিদিন ঘুরিয়া বৎসরে একবার ভারতের রাজধানীকে প্রদক্ষিণ করিবে। এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে এবং সেদিন বহু দূরবর্ত্তী নয় যখন এই স্থানীয় সমিতিসকল হইতে দুই জন করিয়া প্রতিনিধি যাইয়া অন্তত বৎসরে একবার করিয়া প্রতি বিভাগীয় রাজধানীতে অধিবেশন করিবে। একজন সরস্বতীর ও অন্যতর লক্ষ্মীর প্রতিনিধি এই সামঞ্জস্য রক্ষাতেই রাজ্যের স্থায়িত্ব। এই স্থানীয় সমিতি সেই ভবিষ্য মহতী জাতীয় সমিতির ভিত্তিভূমি ও অগ্রদূতী।

রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার যে সকল চিন্তা জ্ঞান ও দূরদর্শিতা তিনি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন তাহা শুধু বহুল পরিমাণে প্রচারিত না হওয়ায় অপরে তাহার মৌলিকতা লইয়া যশস্বী হইয়াছেন, আর তিনি তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য গৌরব ও সম্মান হইতে বঞ্চিত হইয়া উপেক্ষার অন্তরালে পড়িয়া আছেন। দেশের বর্ত্তমান ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ডও তাঁহার ঐ স্বায়ত্তশাসনপ্রণালীর লিখিত রূপ যে গঠিত হইয়াছে ঐ প্রবন্ধ হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার 'জোসেফ ম্যাটসিনি ও নবাইতালী' গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" একদিন ভারতের অধিবাসিগণ সমস্বরে এই গান করিয়াছিলেন। জন্মভূমি একদিন তাঁহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর ছিল…কিন্তু আমাদের অন্তর এখন যে আর সে দেবদুর্লভভাবে সমুচ্ছলিত নহে ইহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সেই দেবদুর্লভ ভাবের অভাবে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায়। অধীন জাতি বলিয়া এইরূপ বলিতেছি এমন নহে। অধীন জাতির অভ্যন্তরেও জাতীয় ভাব জ্বলন্ত থাকিতে পারে। অধীনতার অবস্থাতেই আমেরিকার জাতীয়ভাব বিশেষ বিকাশ পাইয়াছিল। রুসপদদলিত পোলাণ্ডের জাতীয় ভাবের নাম অদ্যাপি জগতে কীর্ত্তিত। অধীন আইরিনদিগের অন্তরে জ্বলন্ত জাতীয় ভাব বিদ্যমান। রোমপরাজিত বৃটনের জাতীয় ভাব বিলুপ্ত হয় নাই।…কিন্তু দাসত্ব বিষে ভারতের জীবনীশক্তি বিলুপ্তপ্রায়। বহু দিনের অধীনতায় ভারতবাসী মাত্রেরই অন্তর হইতে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি প্রেমের ভাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। জন্মভূমির মঙ্গলোদ্দেশে ধন প্রাণ বিসর্জ্জন করা স্বজাতির উন্নতি সাধনে জীবন উৎসর্গ করা ভারতবাসীর নিকট অবিশ্বাস্য অলীক ঘটনা…যখন অধিকাংশ ভারতবাসী জননী জন্মভূমির চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখিবেন তখন দেবীপ্রসাদে ভারতবাসীর চরণ হইতে বৈদেশিক শৃঙ্খল আপনিই উন্মুক্ত হইবে। ইতালীবাসীরাও বহুদিনের দাসত্বে জাতীয় জীবন ভুলিয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ও বিশ্বাসশূন্য হইয়া উঠিয়াছিলেন…তখন ইয়োরোপীয় সমাজে তাঁহারা নগণ্য ও ঘৃণাস্পদ ছিলেন। কিন্তু ইতালীই

আবার যখন ম্যাটসিনী প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার উদ্দীপনায় জন্মভূমির চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখিল তখন বৈদেশিক শৃঙ্খল অনায়াসেই ইতালীয়গণের চরণ হইতে উন্মুক্ত হইল। যে যে প্রাতঃস্মরণীয়চরিত মহাত্মাগণের নিরন্তর যত্নে ও অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের মোহিনী শক্তিতে দাসত্বপ্রপীড়িত জাতিসকল আত্ম ভুলিয়া জন্মভূমির চরণে আত্মবিসর্জন করিতে শিখিয়াছে তাঁহাদিগের জীবিতমালা জাতীয় ভাষায় গ্রথিত করা আমার জীবনের একটি প্রধান ব্রত। সেই সকল জীবনের বলবতী উদ্দীপনায় যদি একজন ভারতবাসীও জন্মভূমির চরণে জীবন উৎসর্গ করিতে শিখেন, যদি একজনও আত্মস্বার্থ জাতীয় স্বার্থে বলিদান করিতে শিখেন, যদি সেই সকল জীবনের মোহিনী শক্তিবলে দুইজন ভারতবাসীও ভারতের মঙ্গলোদ্দেশে সমবেত হইতে শিখেন তাহা হইলেও আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

যোগেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্য লইয়া নিজের জীবনের ব্রত স্বরূপ তাঁহার দেশবাসীকে জন্মভূমির চরণে আত্মসমর্পণ শিখাইবার জন্য 'ম্যাটসিনি ও নব্যইতালী' এবং গ্যারিবল্‌ডির জীবনবৃত্ত প্রভৃতি বই বাংলা ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। যোগেন্দ্রনাথ তাঁহার এই জীবনের ব্রতে যে বাহিরের কাহার দ্বারা অনুপ্রেরিত নহেন, একমাত্র নিজের অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও শক্তি লইয়া আজীবন সাহিত্য ও স্বদেশসেবা করিয়া গিয়াছেন উপরে উদ্ধৃত তাঁহার নিজের লেখাই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে ও তাঁহার জীবনই তাহার সম্যক্ পরিচয়।

অনেকেরই ধারণা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের লেখা ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্‌ডি, মিল প্রভৃতির জীবনী শুধু ইংরাজির অনুবাদ তাহা আবার পড়িব কি? কিন্তু স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮৪ সালের আশ্বিন ও পৌষ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' যোগেন্দ্রনাথ-লিখিত মিলের জীবনবৃত্ত গ্রন্থের দীর্ঘ সমালোচনা করিয়া শেষে বলিয়াছেন—

এই গ্রন্থ যে মনুষ্যজাতির দুর্লভ শিক্ষার স্থল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ প্রশংসা করা যাইতে পারে এমত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অতি বিরল। তার পর তার সঙ্কলন গ্রন্থন ও বিচারপ্রণালীও প্রশংসনীয়। প্রধানতঃ তিনি মিলের স্বপ্রণীত জীবন-চরিত অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও উহা অনুবাদ নহে। মিলের জীবনবৃত্তে যে সকল দুরালোচ্য বিষয় বিচারের জন্য উপস্থিত হয় যোগেন্দ্রবাবু সে সকল স্বয়ং বুঝিয়াছেন এবং পাঠককে বুঝাইয়াছেন। অবতরণিকাটী আদ্যন্ত মৌলিক ও সুপাঠ্য। গ্রন্থের ভাষাও বিশুদ্ধ। আমরা এই গ্রন্থখানিকে বিশেষ প্রশংসনীয় বিবেচনা করি এবং ইহা হইতে যুবকগণ মহতী শিক্ষা লাভ করুক এই উদ্দেশ্যে ইহা বিদ্যালয়ের ব্যবহার জন্য অনুরোধ করি।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমালোচনা হইতেই দেখা যায় যোগেন্দ্রনাথের লেখা কেবল ইংরাজির অনুবাদ মাত্র নহে এবং যোগেন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যে কিরূপ উপক্ষিত! যেকালে যোগেন্দ্রনাথের লিখিত মিলের জীবনী বঙ্কিমচন্দ্র যুবকগণের শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয়ে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, বঙ্গভাষা তখন বিজিত জাতির ভাষা বলিয়া অনাদৃত ও বিজেতৃর বাণীমন্দিরে কোন স্থান লাভ করে নাই। পরে মনীষী স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল বাংলা সঙ্কলন পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচিত আছে তাহার ম্যাট্রিক হইতে বি-এ অবধি কোন একখানি সঙ্কলনেও যোগেন্দ্রনাথের কোন লেখা স্থান পায় নাই। অথচ ঐ সকল পুস্তকের ভূমিকাতে দেখিতে পাই বাংলা ভাষার সকল রকম লেখার সহিত ছাত্রদিগকে পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ সকল সঙ্কলন! যোগেন্দ্রনাথের লেখাতে স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ শিক্ষা বিষয়ে যে-সকল প্রবন্ধ আছে তাহা হইতে দূরে থাকিবার অভিপ্রায়ে অথবা অন্য কি কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ যোগেন্দ্রনাথকে এককালীন উপেক্ষা ও বর্জ্জন করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। সমালোচনা-সংগ্রহ নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় নির্ব্বাচিত পুস্তকে সম্পাদকের মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে যে "বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন সেই আদর্শের অনুসরণে সে সময়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জন প্রতিভাশালী লেখক উহার পুষ্টিসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন।" বঙ্গদর্শনের সমসময়ে আর্য্যদর্শনও যে সাহিত্য সমালোচনার একখানি প্রধান আদর্শ পত্র ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সমালোচনা-সংগ্রহকারক তাহার প্রতি কোন দৃষ্টিই করেন নাই। বলা বাহুল্য, জ্ঞাত অজ্ঞাত অনেক লেখকের লেখা তাহাতে স্থান পাইলেও এই উপেক্ষিত সাহিত্যিকের কোন নামগন্ধ বা লেখাই তাহাতে নাই।

যোগেন্দ্রনাথ এখন পরলোকে। জন্মভূমির দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া দেশের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি যে আত্মনিবেদন করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার দেশের ভবিষ্যৎ সন্তানগণের কাছে আজ পৌঁছিয়াছে বলিয়া মনে হয় ও তাঁহার সাহিত্যকে পূজা করিবার সময় এখন পূর্ণরূপে আসিয়াছে। তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ লেখা, তাঁহার চিন্তাধারা, তাঁহার স্বদেশ-প্রেম সবই আজ দেশবাসীর প্রাণে জাগিয়া উঠিতেছে ও উঠিবে। বঙ্গের তরুণ জীবন যে আজ আত্মত্যাগের পথে দাঁড়াইয়াছে, সে তাঁহারই সাহিত্য-সাধনার ফলে। বাংলার তরুণ হৃদয় আজ যে বন্দে মাতরম্ মন্ত্র গাহিতেছে বঙ্কিমচন্দ্রই সে মন্ত্রের স্রষ্টা। তাঁহার আনন্দমঠের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণ প্রাণে সে মন্ত্রের বীজ প্রথম নিহিত হইলেও যোগেন্দ্রনাথের লেখা সমূহ ঐ

এক বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে কিরূপ অনুপ্রাণিত ও তিনি কিরূপ স্বাধীন ভাবে ঐ বন্দে মাতরম্ মন্ত্র গাহিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার গ্যারিবল্ডির জীবনবৃত্তের অবতরণিকা ও উদ্বোধন হইতে প্রতীয়মান হইবে। মাতৃভাষাতে একটি নূতন শক্তি ও অভিনব গতি তিনিই প্রথম আনিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র ভারত-সঙ্গীত ও ভারত-ভিক্ষা ব্যতীত আর অন্য কাহারও কোন লেখাতে ঐ উদ্দীপনা ও চিন্তাধারা দেখিতে পাই না।

আনন্দরঙ্গ পিলের রোজনামচা

শ্রীনক্ষত্রলাল সেন

স্বর্ণপ্রসূ ভারতের ঐশ্বর্য্যের সন্ধানে ইউরোপীয় বহু জাতি এদেশে আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ইংরাজের কপালেই ভাগ্যলক্ষ্মী জয়টীকা পরাইয়া দিলেন। ইংরেজ ভারতের ভাগ্যবিধাতা হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ভারতে প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য ইংরেজদের বৈদেশিক জাতিদের মধ্যে ফরাসী-দের সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই যুগের বিদেশী নায়কদের মধ্যে ক্লাইভ ও ডুপ্লের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

ডুপ্লের নেতৃত্ব করিবার যোগ্যতা ছিল। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার ভারতে ফরাসী-সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন সফল হইল না। কেন হইল না, সেই বিষয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনার অবকাশ নাই। ডুপ্লের পণ্ডিচেরী অবস্থান-কালে আনন্দরঙ্গ পিলে নামে জনৈক ভারতবাসী তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পান। তিনি তাঁহার রোজনামচায় তাঁহার নানা অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। ইহা হইতে তদানীন্তন দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাস, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে নানা খবর পাওয়া যায়। তাঁহার রোজনামচার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

আনন্দরঙ্গ পিলে ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ নগরীর উপকণ্ঠে পেরাম্বুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আনন্দরঙ্গ পিলে, রঙ্গপিলে, রঙ্গাপ্পা প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতা তিরুবেঙ্গদ পিলে মাদ্রাজের এক জন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি পণ্ডিচেরীর গবর্ণর ও তাঁহার আত্মীয় নৈনিয়া পিলের অনুরোধে স্বজনসহ পণ্ডিচেরীতে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন। নৈনিয়া পিলে সেই সময় পণ্ডিচেরীস্থ ফরাসীদের ব্যবসায়-সংক্রান্ত প্রধান দেশীয় এজেন্ট ছিলেন। তিরুবেঙ্গদ ও নৈনিয়া পিলের চেষ্টায় ফরাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। কিন্তু এই সময় পণ্ডিচেরীর শাসনকর্ত্তা মিঃ হাবর্বার্ট নৈনিয়ার বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ আনয়ন করেন এবং তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কথিত আছে, জেলে অত্যাচারের ফলে নৈনিয়ার মৃত্যু হয়। নৈনিয়ার পুত্র গুরুব পিলে এবং তিরুবেঙ্গদ গবর্ণরের আক্রোশে পড়িবার ভয়ে মাদ্রাজে চলিয়া আসেন। ইহার পর গুরুব পিলে ইংলণ্ড হইয়া ফ্রান্সে গমন করেন এবং ফ্রান্সের রাজ-সরকারের নিকট তাঁহার পিতার উপর অত্যাচারের অভিযোগ আনয়ন করেন। ফলে হাবর্বার্টকে ফ্রান্সে চলিয়া যাইতে হয়। ইহার পর গুরুব পিলে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন, ফরাসী সরকার কর্ত্তৃক নানা সম্মানে ভূষিত হন এবং পণ্ডিচেরীস্থ ভারতবাসীদের নেতৃত্বপদে নিযুক্ত হয়েন। অতঃপর গুরুব পিলে তাঁহার নূতন পদ গ্রহণের জন্য পণ্ডি-চেরীতে ফিরিয়া আসেন। ইহার পূর্ব্বে ডে, লা, প্রভিভিস্তিয়ার পণ্ডিচেরীর নূতন শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন এবং আনন্দরঙ্গের পিতা তিরুবেঙ্গদকে মাদ্রাজ হইতে পণ্ডিচেরীতে ফিরাইয়া আনেন। তিরুবেঙ্গদের পরি-চালনায় ফরাসীদের ব্যবসায় ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে গুরুব পিলে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন এবং কিছু দিন পরে তিরুবেঙ্গদও মারা যান। এই সময় লেনয় গবর্ণর হইয়া আসেন। তিরুবেঙ্গদের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। আনন্দরঙ্গের নানা গুণের পরিচয় পাইয়া লেনয় তাঁহাকে পিতার কাজ চালাইতে অনুরোধ করেন। ইহার পর আনন্দরঙ্গের কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্ণর তাঁহাকে পোর্টোনোভোস্থ ফরাসী ফ্যাক্টরীর প্রধান এজেন্ট নিযুক্ত করেন। ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য আনন্দরঙ্গ নিজব্যয়ে আরও দুইটি কুঠী স্থাপন করেন এই দুইটি কুঠী হইতে এদেশীয় পণ্যের সহিত বিদেশী পণ্যের আদান-প্রদান হইতে থাকে।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে ডুপ্লে পণ্ডিচেরীর গবর্ণর হইয়া আসেন।

ইহার পূর্ব্বেও তিনি কয়েক বৎসর পণ্ডিচেরীতে ছিলেন এবং সেই সময় হইতেই আনন্দরঙ্গ ও তাঁহার পিতার সহিত পরিচিত ছিলেন। ডুপ্লের গবর্ণর হইয়া আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দরঙ্গের সৌভাগ্য-সূর্য্য ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকে। ডুপ্লের উপর তাঁহার অপরিসীম প্রভাব ছিল এবং ডুপ্লেও তাঁহার সাধুতা ও যোগ্যতার পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাঁহাকে প্রধান সভাসদ্ নিযুক্ত করেন। তিনি পণ্ডিচেরীর শাসন-ব্যাপারে ডুপ্লের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। ইহার পর যখন গোডটেন কমিশনার নিযুক্ত হইয়া আসেন তখন আনন্দরঙ্গের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতে থাকে। অসুস্থতার জন্য তিনি পূর্ব্বের মত কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করিতে পারিতেন না। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পদচ্যুত হন। তাহার পর চারি বৎসরের অধিক কাল রোগ ভোগ করিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন।

পূর্ব্ব বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে আনন্দরঙ্গ সেকালের একজন কর্ম্মকুশল, বিচক্ষণ ও ধীরবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। নিজ কৃতিত্বের গুণে তিনি বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং বিখ্যাত ফরাসী বীর ডুপ্লের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ও প্রশংসা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আনন্দরঙ্গ পিলের জীবনের কাহিনী ও তাঁহার অপূর্ব্ব রোজনামচার কথা অনেকেই জানেন না। ইহা তামিল ভাষায় লিখিত। আনন্দরঙ্গ কি জন্য ডায়েরী রাখিতেন ঠিক করিয়া বলা যায় না। এই রোজনামচায় তিনি সরল ও অকপট ভাবে এবং নির্ভীক চিত্তে তাঁহার সমসাময়িক নানা বিষয়ে নিজ মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাতে রাজনৈতিক, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় ও সামাজিক নানা বিষয়ের বর্ণনা আছে; আবার পারিবারিক ছোটখাট ঘটনারও উল্লেখ আছে। প্রত্যক্ষদর্শীর সমসাময়িক বিবরণ হিসাবে ইহার মূল্য আছে। ভারতবর্ষে ফরাসীদের উত্থান ও পতন সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইহা হইতে জানা যাইবে। গবর্ণমেণ্ট এই গ্রন্থের মূল্য উপলব্ধি করিয়া বহু খণ্ডে ইহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। অভিজ্ঞ সমালোচক-দের মতে ইহা বিখ্যাত গ্রন্থ 'Diary of Samuel Pepys'-এর সমশ্রেণীর।

অন্নপূর্ণা মা'র মন্দিরে উঠিয়াছে হাহাকার

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ক্ষুধার এমন করুণ মূর্ত্তি দেখি নাই এ জীবনে,
দেখিতে পারি না চোখের সামনে এমন ক্ষুধার জ্বালা
যে জ্বালায় জ্বলে নর-কঙ্কাল, সুদীর্ঘ অনশনে
প্রতি মুহূর্ত্তে জ্বলে নিবে যায় স্তিমিত দীনের আলা।

কে দেখিতে পারে শিশু মরে আছে মায়ের বক্ষ'পরে
মা তা জানে নাক', আড়ষ্ট দেহ ভুঁয়ে যায় গড়াগড়ি,
অনাহারে ক্ষীণ কণ্ঠ কাতর, নয়নে অশ্রু ঝরে
ফুটপাথে রাতে জীবনের সাথে মৃত্যুর জড়াজড়ি।

দেখিতে পারি না ক্ষুধিতা মাতার জলভরা দুটি আঁখি
দেখে গলে যায় পাষাণ হৃদয়, বুকফাটা ক্রন্দনে
নিশুতি রাত্রে জেগে উঠে বসি বুকে দুটি হাত রাখি
শুনি ধরণীর শেষ নিঃশ্বাস চলে দ্রুত স্পন্দনে।

দুগ্ধপোষ্য শিশু বুঝে নাক' মায়েরে জড়ায়ে ধ'রে
হাড়ে হাড়ে জাগে শেষ মুহূর্ত্তে বাঁচিবার ব্যাকুলতা,
মানুষ ত নাই নরকঙ্কালে ফুটপাথ ওঠে ভ'রে
দীপ-নির্ব্বাণ তারি আগে এ কি শিখার চঞ্চলতা?

ভিখারী ভোলার নেশা ছুটে গেছে, শূন্য কৃতাঞ্জলি
অন্নপূর্ণা মা'র মন্দিরে উঠিয়াছে হাহাকার,
আজি বসুধার ক্ষুধার অনল দাউ দাউ ওঠে জ্বলি
শেষ আহুতির এই ত সময় নিদয় বঞ্চনার।

বিবিধ প্রসঙ্গ

মানবতার আহ্বান

পলাশীর যুদ্ধের আট বৎসর পরে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোগল সম্রাটের নিকট হইতে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যায় দেওয়ানী গ্রহণ করে। দেওয়ানী লাভের ৫ বৎসর পরে ১৭৭০-এর মন্বন্তরে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক যখন অনাহারে মারা গেল, দেশে তখন সুগঠিত কোন গবর্মেণ্ট ছিল না, দ্রুত যানবাহন বা সংবাদ আদান-প্রদানের আয়োজনও হয় নাই।

১৭৩ বৎসর পরে ব্রিটিশ-অধিকৃত বাংলায় আবার এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের দিনে দেখা গেল, রেল, ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, খাস শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত সুগঠিত গবর্মেণ্ট প্রভৃতি ব্রিটিশ শাসনের ধ্বজপতাকা কোন কিছুই কাজে লাগিল না, ১৯৪৩ সালে বিংশ শতাব্দীর উন্নত সভ্যতার মধ্য-গগনে সেই ১৭৭০ সালেরই ন্যায় নরনারী শিশু বৃদ্ধ অসহায় পশুর ন্যায় রাজপথে পড়িয়া অনাহারে মরিতে লাগিল। সময় ও দূরত্ব-বিজয়ী গর্বিত ইউরোপ ও আমেরিকা এত বড় করাল দুর্ভিক্ষ প্রশমনে অগ্রসর হইল না; কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা হইতে খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারী শিশুর মুখে অন্নকণা কেহ তুলিয়া দিল না। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে কতক নরনারী নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল উদার ও বদান্য ভারতবাসীর সাহায্যে ও চেষ্টায়, এবারও বাঙালীর এই চরম ও পরম দুর্ভাগ্যের দিনে তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছে ভারতবাসী নিজে। যে-দুর্ভিক্ষের পূর্ণ দায়িত্ব ভারত-সরকারের, সেই গবর্মেণ্টই বাংলার দুর্ভিক্ষের প্রতিবিধানে অক্ষম, শুধু ইস্তাহার জারিতে মুখর। সরকারী উদাসীনতা, অযোগ্যতা ও অক্ষমতার পরিণাম যে কি ভীষণ নৃশংস ও নিষ্ঠুর হইতে পারে, কলিকাতার রাজপথ ও বাংলার পল্লী আজ তাহার জলন্ত প্রমাণ।

পরাধীনতার জ্বালা ভারতবাসী, বিশেষতঃ বাংলা আজ যেভাবে মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছে, এমনটি আর কখনও হয় নাই। ভারতবাসীর টাকায় রেল চলে, তাহারই দেওয়া ট্যাক্সে ভারতবর্ষের গবর্মেণ্ট বিলাসিতা করে; কিন্তু সহস্র সহস্র মানুষ অনশনে রাস্তায় পড়িয়া মরিলেও চাউল ও গম আনিবার জন্য গাড়ী জোটে না, ভারত-সরকার তাহার অধীনস্থ রেল-বিভাগকে মালগাড়ী সরবরাহে বাধ্য করিতে পারেন না, ভারতের 'ট্রাষ্টি' চার্চিল ও আমেরীর দল নীরবে তাকাইয়া থাকে।

বাংলার মহাশ্মশানে দাঁড়াইয়া শৃঙ্খলিত ভারতবাসী পরস্পরের সান্নিধ্য গভীরতর ভাবে অনুভব করুক; জাতি-ধর্ম ও প্রদেশের সকল গণ্ডী মুছিয়া ভারতবাসী আজ মানব-সেবার মহান্ পতাকাতলে সমবেত হউক; মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষে অনশনে কঙ্কালসার নরনারীর হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এই প্রার্থনাই আজ বিশ্বপিতার চরণে ধ্বনিত হউক।

—

বাংলায় মৃত্যুসংখ্যা

দুই সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় কতগুলি নরনারী অনশনে মৃত্যু বরণ করিয়াছে, যুগান্তর তাহার হিসাব দিয়াছেন।

তারিখ	হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা	হাসপাতালে মৃত্যুর সংখ্যা	রাজপথে মৃত্যুর সংখ্যা
১৬ই আগষ্ট	৬০	৪	১৬ই আগষ্ট
১৭ „	৮১	১০	হইতে ১৯শে
১৮ „	৯১	—	আগষ্ট পর্যন্ত
১৯ „	১৮১	১৮	১০৩
২০ „	১৬০	১৯	১৭
২১ „	৪৮	৮	—
২২ „	২০	১২	—
২৩ „	৩৮	৭	২৪
২৪ „	৬৮	৭	১৩
২৫ „	৪৩	১৮	২২
২৬ „	৭৬	২১	১৪
২৭ „	৮৮	১৯	৪০
২৮ „	৫০	৬	৩০
২৯ „	১০৬	২৩	৩১
৩০ „	৮৫	২৪	৩৫
৩১ „	১৩৫	২৩	—
	১৩৩০	২১৯	৩২৯

মোট মৃত্যুসংখ্যা—৫৪৮

মফস্বলের মৃত্যুহার কি ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহার সামান্য আংশিক সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে। সংবাদপত্রে যে অসম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নলিখিত তালিকায় তাহা দেওয়া গেল :

চাঁদপুর-মিউনিসিপালিটির হিসাব অনুসারে জুলাই মাসে মৃত্যুর সংখ্যা ৭৭।৭৮

আগষ্ট মাসে অনুমান ১০০

চাঁদপুরের মুসলিম যুবসমিতির প্রদত্ত মৃত্যুসংখ্যার হিসাব

এপ্রিল	৮
মে	২৯
জুন	৩৫
জুলাই	১৪০
আগষ্ট (২৬এ পর্য্যন্ত)	১৬০

ব্রাহ্মণবাড়িয়া—২৯শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৫ দিনে ৫

নারায়ণগঞ্জ—গত দেড় মাসে ১০০-র অধিক

কুমিল্লা	মোট	১৩৫
মাদারীপুর	তিন সপ্তাহে	৪০
নাটোর	প্রত্যহ ৩ হইতে	৬
উলুবেড়িয়া	২২শে আগষ্ট	৪
বহরমপুর	২১শে আগষ্ট	২

ঢাকা, বরিশাল এবং ভোলায় রাস্তাঘাটে প্রায়ই মৃতদেহ দেখা যায়।

—

ধান ও চাউলের দর নির্ধারণ

ধান ও চাউলের উর্দ্ধতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সিভিল সাপ্লাই বিভাগের জনৈক সহকারী কণ্ট্রোলার ঘুষ খাওয়ার অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন। ধান ও চাউলের দর বাঁধিয়া না দিলে এবং ঘুষখোর সরকারী কর্মচারী ও অতিলোভী ব্যবসায়ীদের ধরিয়া কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত না করিলে অনশনক্লিষ্ট দুঃস্থ জনসাধারণের মুখের গ্রাস লইয়া যে লুট চলিয়াছে তাহা বন্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি।

গুরু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে মিঃ সুরাবর্দ্দী হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা সুসম্পন্ন করিবার ক্ষমতা ও দায়িত্ব যে তাঁহারই, ইহা ভুলিলে চলিবে না। চাউলের দর বাঁধিবার সঙ্গে সঙ্গে চাউল বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। লোকে ৪০।৪৫৲ টাকা দিয়াও যাহা পাইতেছিল, তাহাও এখন একেবারে দুষ্প্রাপ্য। চাউলের অভাবে আটার চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় গমের দর কয়েক দিনের মধ্যেই ১৭৲ টাকা হইতে ৩৭৲ টাকায় চড়িয়াছে। যে-সব আড়তদার ও ব্যবসায়ী বাজার হইতে মাল সরাইয়া চাউলের দর নামাইয়া আনিবার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য ষড়্যন্ত্র করিতেছে, মিঃ সুরাবর্দী তাহাদের কঠিন ভাষায় শাসাইয়াছেন। কিন্তু ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার যে দুইটি অব্যর্থ অস্ত্র আছে তাহা তিনি এখনও প্রয়োগ করেন নাই।

প্রথমতঃ, তিনি যে চারি শত সরকারী দোকান খুলিবার আশ্বাস বহু দিন পূর্ব্বে দিয়াছেন অবিলম্বে তাহা খোলা দরকার। এই সব দোকান হইতে নির্দিষ্ট দরে ক্রেতা-সাধারণকে প্রয়োজনীয় চাউল বিক্রয় আরম্ভ করিলেই অতিলোভী ব্যবসায়ীরা চাউল ধরিয়া রাখিতে ভয় পাইবে। দ্বিতীয়তঃ, বাংলা দেশের যে গোয়েন্দা-বিভাগ এক একটি গুপ্ত ইস্তাহার খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য প্রচুর তৎপরতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে, তাহাদের উপর চাউল খুঁজিয়া বাহির করিবার ভার তিনি দিতে পারেন। যে-দেশে ৪৫৲ টাকা চাউলের দর উঠিবার পর নরনারী রাজপথে পড়িয়া মরিয়াছে, বিদ্রোহের কথাটি মাত্র বলে নাই, মাঞ্চেষ্টার দাঙ্গা (Food Riot) প্রভৃতির ন্যায় বিলাতী আদর্শে অন্নের জন্য যাহারা দেশব্যাপী দাঙ্গায় অবতীর্ণ হয় নাই, সে-দেশে বিপ্লবের বা বিদ্রোহের সম্ভাবনা বর্ত্তমানে যে কিছুমাত্র নাই ইহা আজ এক প্রকার নিঃসংশয়েই বলা চলে। সুতরাং বাংলার বিরাট্ গোয়েন্দা-বিভাগের একটা বড় অংশকে চাউল খুঁজিবার ভার দিলে দেশ রসাতলে যাইবার ভয় নিশ্চয়ই নাই। ভয় আছে শুধু তাহাদের যাহারা অন্যায় অনুগ্রহের আড়ালে দেশের সর্বনাশ করিতেছে।

সরকারের চাউল ক্রয়

বাংলার যে-সব জেলায় আউস ধান বেশী হইয়াছে, গবর্ন্মেণ্ট এবং ব্যবসায়ীর দল সকলেই সেখানে ধান ও চাউল ক্রয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ক্রেতার নিকট বিক্রয় কার্য্যটি নির্দিষ্ট দরে না হইলেও চাষীর নিকট হইতে ক্রয় কার্য্যটি যে সরকারী নির্ধারিত দরেই চলিবে ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। চাউলের বর্তমান বাজার-দর অনুসারে এবং ব্যবসায়ী ক্রেতাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে চাষীদের পক্ষে ধানের দর ২০।২৫৲ টাকা পাওয়া হয়ত অসম্ভব হইত না, কিন্তু সরকার দর বাঁধিয়া দেওয়ায় আর দিন কয়েক পর হইতেই ১০৲ টাকার বেশী চাহিবার উপায় তাহাদের রহিল না। ধানের দর ১০৲ টাকার অনুপাতে চাউলের দর ২০ টাকার নীচে আসা দরকার। এই দরে যদি চাউল বিক্রয় না হয় তবে সরকারী মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ফলে চাষীরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, এবং যে-সব অতিলোভী ব্যবসায়ী দুঃস্থ লোকের রক্তশোষণ

করিয়া এত দিন কোটি কোটি টাকা লুট করিয়াছে তাহাদের লুটের ভাগ আরও বাড়িবে। সরকারের মূল্যনিয়ন্ত্রণের এইটিই সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা।

প্রতিকারের উপায় নাই এমন নহে। দেশের ধনী ব্যবসায়ীরা যে কুৎসিত তস্কর মনোবৃত্তির পরিচয় এত দিন ধরিয়া দিয়া আসিয়াছে তাহাতে অতঃপর ধান চাউল ক্রয়ের সমস্ত লাইসেন্স বাতিল করিয়া দিয়া গবর্মেণ্ট স্বয়ং এই কার্যের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিলে উহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অন্যায় বা অবিচার হইত না। গবর্মেণ্ট ভিন্ন আর কেহ ব্যবসার জন্য ধান বা চাউল ক্রয় করিতে পারিবে না, চাউলের কলগুলি গবর্মেণ্টের নিকট হইতে নির্দিষ্ট মূল্যে ধান ক্রয় করিবে এবং গবর্মেণ্টের নিকটেই নির্দিষ্ট মূল্যে চাউল বিক্রয় করিবে, ক্রেতা-সাধারণকে একমাত্র গবর্মেণ্টের দোকান হইতে চাউল বিক্রয় করা হইবে, এই বন্দোবস্ত করিয়া দেশের সর্বত্র প্রয়োজনানুসারে চারি শতের পরিবর্তে চল্লিশ হাজার চাউলের দোকান খোলা আদৌ অসম্ভব নহে। এই ক্রয়-বিক্রয়কার্যের মধ্যে কোন রকমে যাহাতে ঘুষ বা চুরি চলিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইলে বাংলা দেশের বর্তমান দুর্দশা দূর হইতে অধিক বিলম্ব হইবার কথা নহে। সৎকার্যে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে সরকার অর্থাভাবের যে চিরন্তন কৈফিয়ৎ দিয়া থাকেন তাহাও এখানে খাটিবে না, এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ব্যয় উহার আয় হইতেই নির্বাহ হইতে পারিবে।

—

চাউল ক্রয়ের এজেণ্ট নিয়োগ

বাংলা-সরকার চাউল ক্রয়ের জন্য যে সব এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাদের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। এজেণ্টদের নাম ও চাউল ক্রয়ের এলাকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

মেসার্স ইস্পাহানী লিঃ—ময়মনসিংহ, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা, ফরিদপুর, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা এবং বাঁকুড়া।

মিঃ সি, কে, ঘোষ—যশোহর ও খুলনা।

মিঃ এইচ, কে, দাদা—বীরভূম।

মিঃ এ, কে, দত্ত—নদীয়া।

মিঃ জে, এন, রায়চৌধুরী—মালদহ, বগুড়া ও রাজশাহী

মিঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি।

মিঃ জয়নাল আলি রাজা—বরিশাল।

মিঃ হাসেম প্রেমজী—রংপুর।

মেসার্স বসন্তলাল শিবলাল শা—পাবনা।

গত বৎসরও এই ভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কতিপয় এজেণ্টের মারফৎ চাউল ক্রয় করা হইয়াছে এবং তাহার ফল যাহা ঘটিয়াছে তাহা সুবিদিত। এজেণ্টদের মারফৎ চাউল ক্রয়ে এবারও পূর্বের ন্যায় বিশৃঙ্খলা ঘটিবে এ আশঙ্কা আদৌ অমূলক নহে। বিশেষতঃ ইস্পাহানী কোম্পানীকে এবারও সব চেয়ে বেশী চাউল ক্রয়ের ভার দেওয়া হইয়াছে। ইস্পাহানী কোম্পানী গত বৎসর তাঁহাদের কার্য্যে কি সাফল্য দেখাইয়াছেন, চাউলের সরবরাহে ও মূল্য হ্রাসে ইঁহারা কতখানি সাহায্য করিয়াছেন যে এ বৎসরেও এত বড় ইজারা তাঁহাদেরই উপর অর্পিত হইল? চাউলের বাজারে এই কোম্পানীর আবির্ভাব আকস্মিক, বাংলা-সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত আগাম টাকায় এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইঁহাদের কার-বারের স্ফীতি। গত এক বৎসর কাল ইঁহারা বাংলার ছয় কোটি জনসাধারণের একমাত্র আহার্য্য বস্তুর কারবার করিয়া যে বিপুল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তিন-চারি বৎসর পূর্বেও ধান চাউলের কারবারে ইস্পাহানী কোম্পানীর কোন প্রতিষ্ঠা ছিল বলিয়া আমরা অবগত নহি। তৎসত্ত্বেও ইঁহাদেরই হাতে আটটি বৃহৎ জেলায় চাউল ক্রয়ের ভার দিতে বাংলা-সরকার কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। অল্প দিনের ভিতর ইঁহারা কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন যে ইঁহাদিগকেই প্রধান এজেণ্ট নিযুক্ত করিতে হইল?

বাংলার বর্তমান দুর্ভিক্ষের জন্য ভারত-সরকারের দায়িত্ব সর্ব্বাধিক, কিন্তু বাংলা-সরকারের কার্য্যবিধি যে এ ব্যাপারে দোষমুক্ত নহে এই ধরণের ঘটনা তাহারই পরিচয়। মফস্বলের স্থানীয় এক-একটি আড়তদারকে নিজ নিজ জেলার এজেণ্ট নিযুক্ত করিলে তাহার অর্থ বুঝা যাইত, কিন্তু ইস্পাহানী কোম্পানীর প্রতি বাংলার নাজিম-মন্ত্রিমণ্ডলের এত অনুরাগের কারণ কি এবং ইঁহারা কৃতিত্ব, সততা এবং যোগ্যতার কি অসাধারণ পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলে গবর্মেণ্টের কার্য্য সমর্থন করা যায়।

—

ঔষধের অভাব

অন্ন-বস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে রোগে ঔষধ এবং পথ্য পর্য্যন্ত দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার আকর বাংলা দেশে কুইনাইন পাইবার উপায় নাই। বর্তমানে বাজারে ৬০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে কুইনাইন বিক্রয় হইতেছে, এক বড়ির দাম আট আনা। এই দরে কয় জনে কুইনাইন ক্রয় করিতে পারে, গবর্মেণ্ট তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন কি? অথচ এই কুইনাইনের অভাব একমাত্র তাঁহাদেরই সৃষ্টি। শ্বেতাঙ্গ কিনা বুরোকে লাভবান্

করিবার আগ্রহে কেমন করিয়া ভারতবর্ষের কুইনাইন তৈয়ারি বন্ধ রাখা হইয়াছিল, পূর্বে আমরা তাহা দেখাইয়াছি। যুদ্ধের পূর্বে কুইনাইনের দর ছিল ১৬৲ টাকা, সম্প্রতি উহার সরকারী দর ৫৪৲ টাকা পর্যন্ত। বাজারে ক্রয়-বিক্রয় চলিয়াছে ৬০০৲ টাকা দরে। অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্ববর্তী মূল্যের ৪০ গুণ এবং বর্তমান সরকারী দরের ১০ গুণ চড়া দরে। অন্যান্য ঔষধ এবং সাগু প্রভৃতি পথ্যও এই ভাবেই দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

—

বর্ধমান বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ

বর্ধমান জেলা বন্যা-সাহায্য-সমিতি ঐ জেলার ক্ষতির যে বিবরণ দিয়াছেন নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল। উহা হইতে ক্ষতির পরিমাণ বোঝা যাইবে। প্রাপ্ত এবং প্রয়োজনীয় সাহায্যের হিসাবও ঐ সঙ্গে দেওয়া হইয়াছে।

	সদর মহকুমা	কাটোয়া মহকুমা	কালনা মহকুমা	মোট
প্লাবিত ইউনিয়ন	১৯	২৪/২৮	১৬	৫৯/৬৩
প্লাবিত গ্রাম	২৬৫	২১৩/৩০০	৭৭	৫৪৫/৬৪২
ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা	৮০,০০০	১২০,০০০	৩০,০০০	২,৩০,০০০
আউস ধানের ক্ষতির অনুপাত	২০%	৫০%	২০%	—
আমন ধানের ক্ষতির অনুপাত	৪০%	৬০%	৩০%	—
বিধ্বস্ত গৃহের সংখ্যা	১০,০০০	১৮,০০০	১,৩০০	২৯,৩০০

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রতি সপ্তাহে ৬০০০ মণ চাউল এবং মোট ৫০০০০ জোড়া কাপড় দরকার।

অন্যূন ১৫০০০ কুটীর নির্মাণ অত্যাবশ্যক এবং এই কার্যে প্রতি কুটীরের জন্য ১০০৲ টাকা হিসাবে মোট ১৫,০০,০০০৲ টাকা প্রয়োজন।

আগষ্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত চারি সপ্তাহে মোট ৫৫০০ মণ খাদ্যশস্য বিতরণ করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের শতকরা মাত্র ২৩ জন উপকৃত হইয়াছে। আরও বহু সাহায্য আবশ্যক। বর্ধমান কেন্দ্রীয় বন্যা-সাহায্য-সমিতি এজন্য যে আবেদন বাহির করিয়াছেন হৃদয়বান্ ব্যক্তিমাত্রেই তাহাতে সাড়া দিবেন ইহা নিঃসন্দেহ। টাকা, চাউল অথবা বস্ত্র সাহায্য-সমিতির সম্পাদকের নিকট ৪।৩ বি কলেজ স্কোয়ার, অথবা কোষাধ্যক্ষের নিকট হুগলী ব্যাঙ্ক, ৪৩ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

—

দামোদরের বাঁধ

দামোদর নদ কেন পশ্চিম-বঙ্গের ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে, বার বার দামোদরের যে বন্যায় লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহার জন্য মূলতঃ কাহারা দায়ী ডাঃ মেঘনাদ সাহা অমৃত বাজার পত্রিকায় এক প্রবন্ধে তাহা আলোচনা করিয়াছেন। ডাঃ সাহা লিখিয়াছেন, "১৯১৩ এবং ১৯১৯-এর বন্যার পর বাংলা-সরকারের কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগ্রত হয়। দামোদরের স্রোতের গতি সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিয়া উহার প্রতিকারের পন্থা নির্ধারণের জন্য গবর্মেণ্ট সেচ-বিভাগের উপর ভার দেন। সেচ-বিভাগের বর্তমান চীফ এঞ্জিনীয়ার মিঃ স্থবারওয়ালের উপর ঐ ভার অর্পিত হয় এবং তৎকালীন সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার মিঃ এডামস-উইলিয়ামস উহার পরিদর্শনকার্য্যে নিযুক্ত হন। মিঃ এডামস-উইলিয়ামস পরে বহু দিন চীফ এঞ্জিনীয়ারের কাজও করিয়াছেন। মধ্য-প্রদেশের সেচকার্য্যে অভিজ্ঞ মিঃ ই. এল. গ্লাসকে স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করা হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্যার সকল দিক লইয়া গবেষণার পর আট বৎসর (১৯১৩-১৯২০) পরিশ্রমের ফলে একটি মূল্যবান্ রিপোর্ট প্রদত্ত হয়।

মিঃ গ্লাস সর্ব্বশেষে যে স্থপারিশ দাখিল করেন তাহাতে তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ভুজিদি ষ্টেশন হইতে ১২ মাইল দূরে দামোদরের উজানে পারজোরিতে জল ধরিয়া রাখিবার জন্য একটি বড় বাঁধ নির্মাণ করা হউক। বরাকর নদীর উপর পালকিয়াতে অনুরূপ একটি বৃহৎ বাঁধ এবং বরাকরের উপনদী উস্রীর উপর একটি ছোট বাঁধও এই সঙ্গে নির্মিত হউক। এই তিনটি বাঁধ নির্মাণের আনুমানিক ব্যয় দুই কোটি টাকা পড়িবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল।"

ডাঃ সাহার অভিমত এই যে উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি অতিশয় যুক্তিসঙ্গত হইয়াছিল এবং গবর্মেণ্টও উহার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন। পারজোরিতে বাঁধ নির্মাণের প্রাথমিক আয়োজন স্থরু হইয়া গিয়াছিল। প্রস্তাবগুলি শেষ পর্যন্ত কার্যে পরিণত হইলে দামোদরের বর্তমান রূপ ফিরিয়া যাইত, সমগ্র বৎসর ধরিয়া সমানভাবে দামোদরের জল প্রবাহিত হইত, বর্ষায় পার্বত্য নদীর ন্যায় আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসে বন্যা হইবার কোন সম্ভাবনা আর থাকিত না। ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্বে পশ্চিম-বঙ্গের যে শ্রী ও সমৃদ্ধি ছিল তাহা ফিরিয়া আসিত। বন্যার জলে রেলওয়ে এবং রাজপথ ভাসিয়া ভাঙিয়া যাইবার যে সম্ভাবনা বর্তমানে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, তাহার অবসান ঘটিত।

কিন্তু কয়লার খনির শ্বেতাঙ্গ মালিকদের বাধায় সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া গেল। ডাঃ সাহা

লিখিতেছেন যে, কয়লার খনির মালিকদের এক ধারণা জন্মিল যে পারজোরিতে জল ধরিয়া রাখিবার জন্য বৃহৎ বাঁধ নির্মিত হইলে ঐ জল মাটির নীচে গিয়া কয়লার খনিতে প্রবেশ করিবে এবং উহাতে বহু খনি নষ্ট হইয়া যাইবে। এই আশঙ্কা সত্য কি না তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য জিওলজিকাল সার্ভের জনৈক কর্মচারীকে নিযুক্ত করা হইল। ইনি কয়লাওয়ালাদের সমর্থন করিয়া রিপোর্ট দিলেন। মিঃ গ্লাস বলিয়াছেন যে, জিওলজিকাল সার্ভের অপর একজন বিশিষ্ট কর্মচারী ডাঃ পাস্কো কিন্তু পরিকল্পনা সমর্থন করিয়া অভিমত দিয়াছিলেন যে উহাতে খনিগুলির কোন ভয় নাই। মিঃ এডামস-উইলিয়ামস এবং মিঃ গ্লাস জিওলজিকাল সার্ভের প্রথমোক্ত কর্মচারীর অভিমত মানিয়া লইতে অসম্মত হইলেন। অবশেষে ব্যাপারটি পুনরায় অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হইল জিওলজিকাল সার্ভের তদানীন্তন ডিরেক্টর মিঃ হেডেনের উপর। মিঃ হেডেন উভয় দিক বজায় রাখিয়া ভাসা ভাসা রকমের একটি রিপোর্ট দিলেন। কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া তিনি দেখাইলেন যে জল নীচে যাইতেও বা পারে, ক্ষতিও হয়ত হইতে পারে, আশঙ্কা যে নাই এমন নয়—ইত্যাদি। সেচ-বিভাগের রিপোর্ট কার্যে পরিণত করিবার জন্য গবর্ন্মেণ্টের উৎসাহ কয়লাওয়ালাদের আবির্ভাবের পর মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল, হেডেনের রিপোর্ট তাঁহারা মনের মত করিয়াই পড়িলেন। পারজোরির বাঁধ নির্মাণের যে আয়োজন করা হইয়াছিল তাহা চাপা পড়িল, সমগ্র রিপোর্টটিও সমাহিত হইল।

শ্বেতাঙ্গ কায়েমী স্বার্থের মুখে ভারতীয় গণস্বার্থ যে কত অসহায়, দামোদর বাঁধের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তাহারই আর একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

—

খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে সরকারের বিলম্ব

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের নিকট হইতে হুকুমনামা বাহির করিয়া খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহে যে কি পরিমাণ বিলম্ব ঘটে নিম্নে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। জনৈক ব্যবসায়ী নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বিলম্বের এই বিবরণ দিয়াছেন :

কোন ব্যবসায়ী ভিন্ন প্রদেশে কোন ফসল ক্রয় করিতে গেলে তাহাকে নিজ প্রাদেশিক সরকারের মারফৎ আসিতে হইবে, সরাসরি ভাবে কোন প্রদেশে তিনি ফসল ক্রয় করিতে যাইতে পারেন না। সর্বপ্রথমে আবেদন করিতে হইবে জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট। ইহার আদেশ পাইতে এবং প্রাদেশিক সরকারকে তাহা জানাইতে ৪ দিন হইতে ৭ দিন পর্য্যন্ত সময় লাগে।

প্রাদেশিক সরকার তখন উক্ত দরখাস্ত সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিবেন। ইহাতে সময় লাগে ১০ হইতে ১৫ দিন।

প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে উহা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণের বন্দোবস্ত হইবে। ইহাতে সময় লাগিবে আরও ৭ দিন।

নয়াদিল্লীর কর্তৃপক্ষ দরখাস্ত অনুসারে মাল সরবরাহ করিবার পূর্বে আবার একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন সব বিবরণ ঠিক আছে কি না। ইহাতেও অন্ততঃ ৭ দিন লাগিবে।

কেন্দ্রীয় সরকার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলে পর যে প্রদেশে ফসল ক্রয় করা হইবে সেই প্রদেশের খাদ্যসরবরাহের ডিরেক্টরের নিকট উহা প্রেরণ করা হইবে। দরখাস্তে লিখিত অর্ডার তখন আবার ভাল করিয়া দেখা হইবে, খাতায় লেখা হইবে; তার পর ফসল ক্রয়ের জন্য উহা পাঠানো হইবে কেন্দ্রীয় সরকারী এজেণ্টের নিকট। ইহাতে অন্ততঃ ২ দিন সময় লাগে। মোটের উপর ক্রেতার অর্ডার বিক্রেতার নিকট পৌছিতে প্রায় ৩৩ দিন সময় লাগে।

কেন্দ্রীয় সরকারী এজেণ্টরা ব্যবসায়ী, তাহারা নিজেদের সুবিধা অনুসারে মাল পাঠায়। বিক্রেতা ২।৩ দিনের মধ্যে রেলওয়ে ষ্টেশনে মাল পাঠাইয়া কেন্দ্রীয় এজেণ্টের নিকট মালগাড়ী প্রাপ্তির অনুমতির জন্য দরখাস্ত করে। ফসল বিক্রয়ের অন্যূন ২০ হইতে ৩০ দিন পরে মালগাড়ী পাওয়ার অনুমতি আসে। অনুমতি লাভের পর মালগাড়ীর অপেক্ষায় অনিশ্চিতভাবে বসিয়া থাকা ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না, কারণ গাড়ী কবে পাওয়া যাইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। খাদ্য-বিভাগের ডিরেক্টর, কেন্দ্রীয় এজেণ্ট প্রভৃতি কেহই নিজেরাও এ সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারেন না। মালগাড়ী সময় মত পাওয়া গেলেও তদারক, মালগাড়ী বাছাই, মাল বোঝাই প্রভৃতি নানা কাজে অন্ততঃ ১০ দিন লাগিয়া যায়। ইহার উপর রাস্তায় দশ দিন এবং ক্রেতার প্রদেশে মাল ছাড়াইতে আরও অন্ততঃ চার দিন। অর্ডার দিয়া মাল যদি একান্তই পাওয়া যায় তবে তাহাতে সময় লাগে মোট প্রায় ৮৩ দিন!

বিলম্বের হিসাব ইহা হইতেই অনেকটা আন্দাজ করা যাইবে। কিন্তু এই ৮৩ দিনে আমলাতন্ত্রের কর্মচারীদের নিকট হইতে কাজ আদায় করিবার জন্য তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিতে কোথায় কি নিবেদন করিতে হয়, অতঃপর কোন ব্যবসায়ী তাহা প্রকাশ করিলে ভাল হয়।

—

শরণাগতের সাহায্য

ভারত-সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে আটক ভারতীয় ও অন্যান্য ব্রিটিশ প্রজাদের পোষ্যদিগকে এবং শরণাগতদিগকে অর্থ সাহায্য করার পরিকল্পনা ১৯৪৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত বলবৎ রাখিবেন বলিয়া ভারত-সরকার স্থির করিয়াছেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাস হইতে মাসহারার হার পরিবর্ত্তন করা হইবে। উহার বিবরণ বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছে।

পোষাক কিনিবার ও চিকিৎসার খরচ প্রভৃতি অপরিহার্য্য ব্যয় বাবদ মাসহারার দেড়গুণ পর্য্যন্ত এককালীন বিশেষ সাহায্য মঞ্জুর করা যাইতে পারে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে শরণাগতদিগকে মাসহারা না দিয়া নিজেদের ব্যবসা খুলিবার উদ্দেশ্যে পরিশোধনীয় ঋণ বাবদ থোকে অনধিক ৩৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি লইয়াই এই সকল সাহায্য দেওয়া হয়। সাহায্যের জন্য জেলা-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

মোট কত টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, উহার কত অংশ ভারতীয়েরা পাইয়াছে, এংলো-ইণ্ডিয়ান অথবা ইংরেজরা এই সাহায্যের কোন অংশ পাইয়াছে কি না, পাইলে কত টাকা তাহাদের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে ইত্যাদি জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশে ভারত-সরকার অনিচ্ছুক কেন? ব্রিটিশ প্রজাদের পোষাবর্গ বলিতে কি ইংরেজ ও এংলো-ইণ্ডিয়ানও বুঝায়?

—

ভারত-সরকারের উচ্চপদে দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী?

আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিতেছেন, "দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ইউরোপীয়গণ তথাকার ভারতীয়দিগের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছে, তাহার প্রত্যুত্তরস্বরূপে ভারতীয় আইন-সভায় প্রতিশোধাত্মক আইন গৃহীত হইয়াছে। এই নূতন ব্যবস্থা অনুসারে স্থির হইয়াছে যে, দক্ষিণ-আফ্রিকার ইউরোপীয়দিগকে ভারতবর্ষে কোন সুবিধা দেওয়া হইবে না। দক্ষিণ-আফ্রিকার বহু ইউরোপীয় ভারত-গবর্ন্মেণ্টের ভূতত্ত্ব-বিভাগে আশ্রয় পাইয়াছেন। ইঁহারা ব্রহ্মদেশে খনির মালিক ছিলেন বা খনিতে কাজ করিতেন। তথা হইতে উৎখাত হওয়ায় ভারত-গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের (বিশেষতঃ দেশীয় রাজ্যের) খনিজ সম্পদ আবিষ্কার ও উদ্ধারের কার্য্যে ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইঁহাদিগের সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছে যে, দেশীয় সহকর্ম্মীদিগকে ইঁহারা এই কার্য্যে শিক্ষিত করিয়া তুলিবেন। কিন্তু শোনা যাইতেছে, শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক ইঁহাদের দুর্ব্যবহারে ভারতীয় কর্ম্মচারীরা টিকিতেই পারিতেছে না এবং একটি একটি করিয়া তাহাদিগকে অপসারিত করা হইতেছে।"

দক্ষিণ-আফ্রিকার গবর্ন্মেণ্ট তথাকার প্রবাসী ভারতবাসীদের প্রতি যে অন্যায় ও অবিচার করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ-স্বরূপ ভারতবর্ষে কঠিন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত ছিল। যে-দেশে আইন করিয়া ভারতবাসীকে তাহার বহুকালের আবাসগৃহ হইতে উচ্ছেদ করা হইয়াছে, সেই দেশের লোককে ভারতবর্ষে আনিয়া সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করা চূড়ান্ত অন্যায়ের পরিচয়। ডাঃ খারে বড়লাটের পরিষদে স্থান লাভের পর অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে শাসনকার্য্যে সামান্য দক্ষতার জন্যই তাঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। উপরোক্ত অভিযোগের প্রতিকারে অগ্রসর হইয়া শাসনকার্য্যে দক্ষতার পরিচয় তিনি দিতে পারিবেন কি?

—

চীনা মুসলমান ও ভারতীয় মুসলমান

আমেরিকা হইতে প্রকাশিত 'এশিয়া' নামক পত্রে জনৈক চৈনিক মুসলমান এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষ হইতে পাকিস্থান নামে যে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের ধুয়া উঠিয়াছে, টোকিওর সাম্রাজ্যবাদিসুলভ কূট চালের মধ্য দিয়া উহার গূঢ় রহস্য অবগত আছে বলিয়া চৈনিক মুসলমানেরা উহা কোনোমতেই সমর্থন করে না। চৈনিক জাতির সহিত চৈনিক মুসলমানদেয় বিচ্ছেদ ঘটাইবার মতলবে পাঁচ বৎসর হইতে জাপান ঐ কূটনৈতিক চাল চালিতেছে। তাহারা চৈনিক মুসলমানদিগের সম্মুখে "হুইহুই" অর্থাৎ স্বতন্ত্র চৈনিক মুসলিম রাষ্ট্রের টোপ ফেলিয়া আমাদিগকে তাহাতে আটকাইবার বহু চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু খোদার অনুগ্রহে আমরা তাহাতে ধরা দিই নাই। মিঃ জিন্না যে পাকিস্থানের ধুয়া ধরিয়াছেন তাহার মূলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কূটনৈতিক চাল ছাড়া আর কোন সারবস্তু আছে বলিয়া কল্পনা করা যায় না। যত দিন ভারতে বিচ্ছেদ ও অনৈক্য জিয়াইয়া রাখা সম্ভবপর হইবে, ইংরেজের প্রভুত্বও তত দিন তথায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। মিঃ জিন্না ইংরেজ কূটনীতির ক্রীড়নক হইয়া পাকিস্থানের ধুয়া উঠাইয়া ভারত ও ভারতীয় মুসলমানদিগের গুরুতর অনিষ্টসাধন করিতেছেন মাত্র।"

ভেদনীতির সাম্রাজ্যবাদী টোপ চীনের মুসলমানও

বুঝিয়াছে, কেবল ভারতবর্ষের নকল সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত মুসলমানেরা উহা বুঝিতে অক্ষম। শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে নয়, ভারতবর্ষে পাকিস্থানওয়ালা নেতা মিঃ জিন্না জনসেবার ক্ষেত্রে পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি আমদানি করিতে প্রস্তুত।

পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করিবার নূতন উপায়

ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, মিঃ রামগোপাল মহেশ্বরী কর্তৃক সম্পাদিত ও মিঃ শৈলেন্দ্রকুমার কর্তৃক মুদ্রিত নাগপুরের হিন্দী সাপ্তাহিক পত্রিকা নবজীবনের কর্তৃপক্ষ আগামী সপ্তাহ হইতে উক্ত পত্রিকার প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। গত বৎসরও পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করা হইয়াছিল। সাধারণের নিকট এক বিবৃতিতে কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেন যে, কতকগুলি কারণবশতঃ পত্রিকার প্রকাশ দিনকতক বন্ধ থাকিলেও তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশিত হইবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার, সংবাদপত্রের কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৩-এর ১৮ই জানুয়ারি তারিখে যে-সকল পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাই ঐ সকল পত্রিকা মুদ্রণের জন্য কোন প্রকার কাগজ পাইবে না। এই কারণে কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, যুদ্ধ চলিতে থাকা অবধি নবজীবন পত্রিকা প্রকাশের বিশেষ আশা নাই।

ভারতরক্ষা আইনে সরাসরি আদেশ দিয়া যে-কোন কাগজ বন্ধ করিবার ক্ষমতা ভারত-সরকারের আছে। পত্রিকা বন্ধের সোজা আদেশ না দিয়া কাগজ সরবরাহ আটকাইয়া পরোক্ষভাবে উহা বন্ধ করিতে বাধ্য করা নূতন ব্যবস্থা বটে। প্রত্যেক সংবাদপত্র যাহাতে সমান ভাবে কাগজ পায়, তাহার বন্দোবস্ত করাই কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশের উদ্দেশ্য ছিল। নবজীবনের ঘটনায় দেখা গেল, এই আপাতনিরীহ আদেশেরও রাজনৈতিক প্রয়োগ হইতে পারে।

মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে সর্ তেজ বাহাদুরের বিবৃতি

আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ,—

সর্ তেজ বাহাদুর সপ্রু একটি বিবৃতি "মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ভারত-গবর্ন্মেণ্টের স্বরাষ্ট্র-বিভাগের সহিত মহাত্মা গান্ধীর সম্প্রতি যে পত্রালাপ চলিয়াছে, মিঃ আমেরী ও ভারত-গবর্ন্মেণ্ট তাহা প্রকাশ করিতে অস্বীকার করায় সর্ তেজ বাহাদুর তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "মিঃ আমেরী কমন্স সভার নিকট দায়ী থাকা সত্ত্বেও কি ভাবে এরূপ ঔদ্ধত্যসহকারে জবাব দিলেন? কমন্স সভা কি শেষ পর্য্যন্ত শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হাত-ছাড়া করিতে চলিয়াছেন? ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের অধিকাংশকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া আমাদিগকে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিতে বলা হাস্যকর ব্যাপার। মহাত্মা গান্ধীর মতামত জানিবার অধিকার আমাদের রহিয়াছে। কিন্তু ভারত-গবর্ন্মেণ্ট ও মিঃ আমেরী আমাদিগকে সে সুযোগ দিতে এমন ঔদ্ধত্যসহকারে অস্বীকার করিয়াছেন, ভারতের বর্তমান ইতিহাসে যাহার তুলনা মিলে না। গবর্ন্মেণ্ট শত্রু ও মিত্রের মধ্যে পার্থক্য করিবার মত বুদ্ধিও হারাইয়া ফেলিয়াছেন দেখিয়া দুঃখ হয়। উহা শক্তির পরিচয় নহে—দুর্বলতারই পরিচায়ক।"

ব্রিটেনে বর্তমানে যে গবর্ন্মেণ্ট চলিতেছে তাহা দৃশ্যতঃ গণতান্ত্রিক হইলেও বস্তুতঃ সাম্রাজ্যরক্ষায় দৃঢ়সঙ্কল্প রক্ষণশীল দলের মুষ্টিগত। ভারতবর্ষে অপ্রতিহতভাবে ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখা ইহাদের রাজনৈতিক মূলতন্ত্র, ভারতবর্ষের সহিত চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব অপেক্ষা আপাতস্বার্থের প্রতি ইহাদের লক্ষ্য অধিক। ব্রিটেনের ও ভারতের দূরদর্শী উদারনৈতিক নেতা ও মনীষিবৃন্দের সুপরামর্শ শুনিবার মত উদারতা ইহাদের হৃদয়ে নাই।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনী প্রণয়ন

৯২ নং আপার সার্কুলার রোড কলিকাতাস্থ ভারতীয় বিজ্ঞানবার্তা সমিতি (ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশন) কর্তৃক প্রকাশিত "সায়েন্স এণ্ড কালচার" পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের একখানা নির্ভরযোগ্য জীবনী প্রকাশের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জীবনের কর্ম্মবহুল ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত আচার্য্য রায় অগণিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ধর্মসংঘ, জাতিসংগঠনমূলক কার্য্যাদির সহিত জড়িত ছিলেন। শিক্ষা, ব্যবসা, বাণিজ্য, জাতীয় সমস্যা প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি বহু বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত পত্রাদির মধ্যেও অনেকগুলি জনসাধারণের পক্ষে মূল্যবান্। জীবনী সঙ্কলনের পক্ষে এগুলি অপরিহার্য্য উপাদান। কাজেই "সায়েন্স এণ্ড কালচারে"র সম্পাদকমণ্ডলী আচার্য্যদেব সম্বন্ধে কাহারও কিছু জানা থাকিলে কিংবা তাঁহার বক্তৃতাদির নকল কাহারও কাছে থাকিলে উপরোক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করিতে জনসাধারণকে অনুরোধ

জানাইতেছেন। আচার্য্যদেবের জীবনীগ্রন্থে এগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে এবং কার্য্যশেষে এগুলি মালিকগণকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

—

আমেরিকায় ভারত-কথা

আনন্দবাজার পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ—'ইণ্ডিয়া উইদাউট ফেবল্' গ্রন্থের রচয়িতা এবং 'এশিয়া' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মিঃ ক্যাটেল মিচেল 'নিউ রিপাব্লিক' পত্রিকায় জোর দিয়া লিখিয়াছেন, "ভারতীয় গবর্ন্মেণ্ট স্থাপন করা সম্ভব।" তিনি বলেন, "স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস যখন ভারতে গিয়াছিলেন তখনকার তুলনায় ভারতের অবস্থা এখন অনেক বিষয়ে বেশী সঙ্গীন। তিনি আরও বলেন, এক বৎসর আগের তুলনায় ভারতের অবস্থা এখন বেশী বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও এককালে ব্রিটেন এবং আমেরিকার যাহারা ভারতীয় ব্যাপারে অতটা আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন তাঁহারা আজ ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে কি করিয়া উদাসীন বা নীরব রহিয়াছেন ইহা আমি বুঝিতে পারি না। মনে হয় তাঁহারা এখন ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের সঙ্গে একমত হইয়া ভাবিতেছেন যে, ভারতীয় সমস্যার সমাধান ভারতবাসীদেরই করিতে হইবে।"

কংগ্রেসকে ভারতের অধিকাংশের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিতে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের যে অসম্মতি তাহা বিশ্লেষণ করিয়া মিঃ মিচেল বলেন যে, ভারতে কংগ্রেস সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। উহার অভ্যন্তরে সমস্ত ধর্ম ও অর্থনৈতিক সম্প্রদায়ের লোকই রহিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, **কংগ্রেস এমন কথা কখনও বলে নাই যে, ক্ষমতা তাহারই উপর ন্যস্ত করা হউক বা গবর্ন্মেণ্ট পরিচালনার ভার তাহারই হাতে থাকিবে। এমন কি কংগ্রেস মিঃ জিন্না কর্তৃক গবর্ন্মেণ্ট গঠনের প্রস্তাবও করিয়াছে।** মুসলমানদের দাবী সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন যে, মুসলিম লীগের পাকিস্থানের দাবী একটা মস্ত বড় প্রতিবন্ধক সন্দেহ নাই; কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারকগণ মনে করেন যে, ব্রিটেন যদি জাতীয় গবর্ন্মেণ্ট গঠনের জন্য আহ্বান করেন, তবে কোন দলই তাহাতে যোগদানে অস্বীকার করিতে পারিবে না।

মিঃ গান্ধীর মনোভাব হইতে প্রমাণিত হয় যে, কংগ্রেসকে বিশ্বাস করা যায় না, এই ব্রিটিশ যুক্তির উত্তরে মিঃ মিচেল বলিয়াছেন—যদিও সমগ্রভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উগ্র ও প্রগতিশীল দৃষ্টি লইয়া বিকাশলাভ করিয়াছে এবং মিঃ গান্ধীর শান্তিবাদ সম্বন্ধে অসহিষ্ণু ভাব দেখাইয়াছে, তথাপি এ কথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ভারতীয় জনসাধারণকে যদি কার্যকরীভাবে আন্তরিক ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে মিঃ গান্ধীর পরাজয়ের মনোভাব-সূচক নীতি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না।

ব্রিটিশ-রাজের সহিত সন্ধি দ্বারা রক্ষিত ভারতীয় রাজন্যগণ সম্পর্কে মিঃ মিচেল বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের উচিত রাজন্যবর্গকে জানাইয়া দেওয়া যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে আদর্শের জন্য লড়িতেছে তাহার সহিত দেশীয় নৃপতিদের স্বৈরাচারী শাসনের সামঞ্জস্য হয় না; অতএব তাঁহারা তাঁহাদের প্রজাগণকে ভোটাধিকার দিয়া নূতন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হউন।

মিঃ মিচেলের লেখায় কোন ফল হইবে এ ভ্রম ভারতবাসী করিবে না। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমেরিকায় ব্রিটিশ-প্রচার-দপ্তর হইতে যে-সব অর্ধ-সত্য ও মিথ্যা প্রচার-কার্য চলিয়াছে, এই সব লেখক সত্য প্রচারের দ্বারা তাহার প্রতিবাদের যে চেষ্টা করিতেছেন ভারতবাসী তাহাকে প্রকৃত বন্ধুর কাজ বলিয়া মনে করিবে।

—

কয়লার অভাবের প্রকৃত কারণ

বাংলায় কয়লার অভাব এবারকার মত এত তীব্রভাবে আর কখনও অনুভূত হয় নাই। প্রথমটা বন্যার দোহাই দিয়া বলা হইয়াছিল যে, রেল-লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতেই কয়লা আসিতে পারিতেছে না। বন্যার জল কয়লা আমদানি কমিবার প্রধান কারণ নয় ইহা ভাল করিয়া বুঝা গেল কয়লা কণ্ট্রোলারের প্রস্তাবের মর্ম প্রচারিত হইবার পর। কণ্ট্রোলার মিঃ ফারুক যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা এই যে, এখন যে-সকল খনিতে গাড়ী সরবরাহ করা হয় তাহার কোন কোন খনিতে গাড়ী পাঠান বন্ধ করিলে বড় বড় ও উৎকৃষ্টতর কয়লার খনিতে ঐ সকল গাড়ী পাঠাইয়া মোট কয়লা সরবরাহের পরিমাণ বাড়ান যাইতে পারে। তদনুসারে তিনি নিম্নলিখিত পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, (১) পুরাতন কয়লাখনি ভাগাভাগি করিয়া গত তিন বৎসরের মধ্যে নূতন যে-সকল খনি হইয়াছে, তাহাতে গাড়ী সরবরাহ বন্ধ হইবে, বি. এন. ও ই. আই দুইটি রেলপথের উপরই যে-সকল কয়লাখনির সাইডিং আছে সেই সকল খনির জন্য মাত্র একটি সাইডিংে মাল গাড়ী পাঠান হইবে। তাহা হইলে এক সাইডিং হইতে অন্য সাইডিংে গাড়ী সরাইয়া লওয়ার পরিশ্রম বাঁচিবে। (২) বর্তমানে

গাড়ী সরবরাহের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট কয়লা স্থানান্তরের জন্যই গাড়ী সরবরাহ হওয়া উচিত। বাংলায় ও বিহারে উৎকৃষ্ট বহু কয়লা আছে, অপকৃষ্ট কয়লা স্থানান্তরের জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা করায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট কয়লা স্থানান্তর করা যাইতেছে না। (৩) রেলপথ, লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী এবং অন্যান্য শিল্প কারখানার চাহিদা এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, যাহাতে একসঙ্গে সর্বাধিক পরিমাণে কয়লা স্থানান্তর করা যায় এবং বিশেষ বিশেষ শিল্পে প্রয়োজনীয় কয়লা মাত্র ঐ সকল শিল্পের জন্যই নির্দিষ্ট থাকে। (৪) খনি হইতে এমনভাবে গাড়ী পাঠাইতে হইবে যাহাতে একসঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কয়লা পাঠান যায় এবং রেলপথ ও শিল্পকারখানাগুলি নিকটবর্তী খনি হইতে কয়লা পায়।

প্রস্তাবটি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কয়লা-কমীটি স্থির করিয়াছেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করা হইবে। এত অস্বাভাবিক তৎপরতার সহিত কণ্ট্রোলারের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিয়া ইহার গূঢ় রহস্য অবগত হইবার চেষ্টা হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পত্রান্তরে প্রকাশ, এই আদেশের ফলে ১৭০টি কয়লার খনি বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং ইহাদের অধিকাংশই ভারতীয়। কয়লার ব্যবসায়টা এত কাল শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়েরই করায়ত্ত ছিল, সম্প্রতি উহাতে ভারতীয়েরা প্রবেশ করিতে আরম্ভ করায় শ্বেতাঙ্গ কায়েমী স্বার্থে কিঞ্চিৎ আঘাত পড়িতেছিল। রেলওয়ের অব্যবস্থায় কয়লা রপ্তানী কমিয়া যাওয়ায় শ্বেতাঙ্গ মালিকদের খনিগুলির লাভের অঙ্কও এই বাজারের অনুপাতে স্ফীত হইতে পারিতেছিল না। একজন ভারতীয় কণ্ট্রোলারের সরকারী কর্মচারীর মারফৎ ভারতীয় খনিগুলির সর্বনাশ সাধন করিয়া নিজেদের লাভের অঙ্ক বজায় রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে কিনা, ফারুক সাহেবের প্রস্তাব এবং অতি দ্রুত উহার প্রয়োগ দেখিয়া এই সন্দেহই লোকের মনে হওয়া স্বাভাবিক।

—

রেশনিং সম্বন্ধে ভারত-সরকারের প্রস্তাব

ইউনাইটেড প্রেসের ২২শে আগষ্টের এক সংবাদে প্রকাশ, প্রস্তাবিত রেশনিং-পরিকল্পনার নিম্নলিখিত ১০টি বিষয় যাহাতে সংবাদপত্র-সমূহের সমর্থন লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য ভারত-সরকার প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট-সমূহকে যত্নবান হইতে অনুরোধ করিয়াছেন :—

(১) অল্প পরিমাণ সরবরাহ যাহাতে সমভাবে বণ্টন করা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই রেশনিঙের উদ্দেশ্য। ইহাদ্বারা খাদ্যদ্রব্য ব্যবহারের সঙ্কোচ বুঝায় না।

(২) রেশনিং করিতে হইলে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

(৩-৪) রেশনিং-পরিকল্পনার নীতি এবং সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় যাহাতে সর্বত্র যথাসম্ভব একইরূপ এবং যথাসম্ভব ব্যাপক হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) রেশনিং-ব্যবস্থা আইন-অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক এবং বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মচারিগণের সাহায্যে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিতে হইবে।

(৬) স্থানীয় খাদ্য-পরামর্শ কাউন্সিল অথবা খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ-কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(৭) এই পরিকল্পনা প্রবর্তনের জন্য সুদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে।

(৮) স্থানীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী খাদ্যের দোকানগুলি ব্যবহার করিতে হইবে।

(৯) অবস্থা যাহাতে অচল না হইয়া পড়ে, তজ্জন্য কিছু মাল হাতে রাখিতে হইবে এবং রেশন-খাদ্য সঞ্চয় করিতে হইবে।

(১০) সংবাদপত্রসমূহের সাহায্য এবং সদিচ্ছা লাভ করিতে হইবে।

এই প্রস্তাব দশটির মধ্যে রেশনিঙের সাফল্যের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় কথাটিই নাই। "কিছু মাল হাতে রাখিয়া" রেশনিং চলে না, এই বিরাট কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে পর্য্যাপ্ত মাল আগে মজুত করিতে হয় এবং সরবরাহ যাহাতে এক দিনের জন্যও বন্ধ না হইতে পারে তজ্জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। বাংলায় বহুদিন যাবৎ রেশনিঙের কথা চলিতেছে, এবং প্রতি পদে দেখা যাইতেছে মিঃ সুরাবর্দী এই বিপুল কাজে হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত সাহস সঞ্চয় করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার দ্বিধার কারণ বুঝা কঠিন নয়। রেশনিং আরম্ভ করিতে হইলে যে-পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য হাতে থাকা দরকার, বাংলায় তাহা নাই। ভারত-সরকারের উপর এ ব্যাপারে নির্ভর করা ছাড়া বাংলার কোন উপায় নাই। প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হইবে এমন কোন গ্যারাণ্টি ভারত-সরকারের কথায় বা কাজে প্রকাশিত হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই গ্যারাণ্টি না লইয়া এই কাজে হাত দিলে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে।

ভারতের বাহিরে ফসল রপ্তানী

ভারতের বাহিরে ফসল রপ্তানীর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ উঠিয়াছিল, তাহার ফলে ভারত-সরকার এক ইস্তাহারে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যে, যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে যে-পরিমাণ ফসল রপ্তানী হইত, গত বৎসরের এবং চলতি বৎসরের প্রথম সাত মাসের রপ্তানীর পরিমাণ তাহার তুলনায় অতি সামান্য। প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪২-৪৩ সালে ভারতবর্ষ হইতে মোট ৩৭০,০০০ টন খাদ্যশস্য রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষ হইতে যে-পরিমাণ খাদ্যশস্য রপ্তানী করা হইয়াছে ১৯৪২-৪৩ সালে তাহা অপেক্ষা ৯ লক্ষ টন কম খাদ্যশস্য রপ্তানী করা হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের প্রথম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রতি মাসে নিম্নলিখিত পরিমাণ খাদ্যশস্য রপ্তানী করা হইয়াছে:—জানুয়ারি মাসে—গম ১৪০ টন, চাউল ১৩৮৩০ টন, মোট ১৩৯৭০ টন; ফেব্রুয়ারি মাসে—গম ১৬৬ টন, চাউল ১৯০৫৮ টন, মোট ১৯২২৪ টন; মার্চ মাসে—গম ৬ টন, চাউল ১২৬১২ টন, মোট ১২৬১৮ টন; এপ্রিল মাসে—গম ৩৩ টন, চাউল ৭৮১৯ টন, মোট ৭৮৫২ টন; মে মাসে—গম ২১৬ টন, চাউল ৫৪৭৯ টন, মোট ৫৬৯৫ টন; জুন মাসে—গম ২০৩২১ টন, চাউল ১০১৬৬ টন, মোট ৩০৪৮৭ টন; জুলাই মাসে—গম ২৮৩ টন, চাউল ২০০৮টন, মোট ২২৯১ টন। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারি মাস হইতে জুলাই মাস পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে মোট ২১১৬৫ টন গম ও ৭০৯৭২ টন চাউল এবং চাউল ও গম মিলিয়া মোট ৯২১৩৭ টন খাদ্যশস্য রপ্তানী হইয়াছে। সিংহল, পারস্য-উপসাগর অথবা আফ্রিকার বন্দর এবং দ্বীপসমূহে এই সমস্ত খাদ্যশস্য রপ্তানী করা হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানে ভারতীয়গণের বসবাস আছে।

এই ইস্তাহারের ভিতর যে গোঁজামিল নিহিত আছে, তাহা আবিষ্কার করা খুব শক্ত কাজ নয়। ভারত-সরকার শুধু রপ্তানীর হিসাব দিয়াছেন কিন্তু ঐ সঙ্গে আমদানীর হিসাবটা অতি সতর্কতার সহিত চাপিয়া গিয়াছেন। সাধারণ অবস্থায় ভারতবর্ষে বাহির হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল ও গম আমদানী হয়। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে আমদানী একেবারে বন্ধ, অথচ রপ্তানী অবাধে চলিয়াছে। আমদানী বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়াই উচিত ছিল, এক কণা শস্যও বাহিরে যাইতে দেওয়া সমীচীন হয় নাই। ভারত-সরকারের শাসনযন্ত্র ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে যে-অবস্থায় ছিল তদপেক্ষা খুব বেশী দূর আজও অগ্রসর হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু জনসাধারণ ব্রিটিশ শাসন সত্ত্বেও, সরকারী অর্ধসত্য প্রচারের মধ্যে লুপ্ত তথ্য উদ্ধার করিবার মত জ্ঞানলাভ করিয়াছে—সরকারী সিভিলিয়ানেরা এটা না ভুলিলেই ভাল করিবেন।

সরকারী ইস্তাহারটির সহিত 'বিহার হেরাল্ড' প্রদত্ত নিম্নলিখিত সংবাদগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। চলতি বৎসরের প্রথম সাত মাসে ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে প্রেরিত ২২ লক্ষ ৯৫ হাজার মণ চাউল ও গম ভিন্ন এ দেশেই সৈন্য-বাহিনীর জন্য চাউল ও গম ক্রয় করা হইয়াছে ৭৫ লক্ষ ৬০ হাজার মণ। ১৯৪২ সালে ভারতে অবস্থিত সামরিক বন্দীদের জন্য ৬২ হাজার এবং চীনা, ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্যদের জন্য ২ লক্ষ ১৬ হাজার গরু হত্যা করা হইয়াছে।

—

সর্ নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতা

উত্তরপাড়ায় নাগরিকদের পক্ষ হইতে গত ২২শে আগষ্ট বর্তমান প্রধান মন্ত্রী সর্ নাজিমুদ্দীনকে একটি মানপত্র দেওয়া হয় এবং উহাতে খাদ্যদ্রব্য, জ্বালানী কাঠ ও কয়লা এবং বস্ত্র সরবরাহের স্বল্পতার কথা উল্লেখ করা হয়। উত্তরে সর্ নাজিমুদ্দীন বলেন,

"মূল্য-নিয়ন্ত্রণের নূতন নীতি ঘোষণায় কিছু ফল হইয়াছে; এখন দেখা যাইতেছে, দরের উর্ধগতি যেন বন্ধ হইয়াছে এবং এখন উহার গতি নিম্নগামী হইবে। আমরা ভগবানের কৃপায় মূল্য হ্রাস করিতে পারিব বলিয়া আশা করি। আশু ফল লাভ না হইতে পারে; কিন্তু আমরা আশা করি দর কমিতে থাকিবে, আমাদের নির্দেশ ও আদেশসমূহ যাহাতে পালিত হয় তজ্জন্য আমরা চেষ্টা করিব। এই সমস্যার সমাধান চেষ্টায় দুইটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য ছিল। প্রথমতঃ, জনসাধারণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শের পর আমাদিগকে যাহা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, আমরা নিষ্ঠা ও অকপটতার সহিত তাহা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। জনসাধারণের হিতসাধন ব্যতীত অপর কোন বিষয়দ্বারা আমাদের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয় নাই। আমরা কিছুতেই আমাদের নীতি ও কার্য্যপদ্ধতি হইতে বিচলিত হই নাই। আমরা এই কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্য নিষ্ঠা ও অকপটতার সহিত চেষ্টা করিতেছি।

"এইরূপ একটি বিষয়ে এমন অনেকে অবশ্যই আছেন, যাঁহারা নিজ দৃষ্টিভঙ্গি হইতে ইহার বিচার করিবেন ও কোন বিশেষ পরিকল্পনা বিষয়ে একমত হইবেন না; কিন্তু আমার মনে হয়, যাঁহারা পরামর্শ দিবার ক্ষমতা রাখেন

অথবা যাঁহারা এই ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সহিত সংযুক্ত আছেন অথবা যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, মন্ত্রিসভার পক্ষে এইরূপ ব্যক্তিদের পরামর্শ এবং আস্থাভাজন নেতাদের মারফৎ জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করিয়া একটি পরিকল্পনা গঠন করা কর্তব্য। এমন অনেকে আছেন যাঁহাদের সহিত আমাদের মিল না থাকিতে পারে; কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট সরকারী ও বে-সরকারী সূত্র হইতে উপদেশ লইয়া মানুষের যাহা সাধ্য, আমরা তাহা করিয়াছি বলিয়া আমি দাবী করিতেছি।

"চাউলের মূল্য কমিয়া যাওয়া যদি জনসাধারণের কাম্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের কর্তব্য আমাদের সহায়তা করা এবং যাহারা চোরাবাজারের কারবার করে তাহাদের কোনরূপ উৎসাহ না দেওয়া। এই সকল ব্যক্তির সম্পদ-বৃদ্ধিতে জনসাধারণ যেন কোনরূপ সহায়তা না করে, তাহারা যেন গবন্মে‍ণ্টকে এবং এই অসাধুতা দমনে নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য করে, ইহাই আমার আবেদন।"

ভগবানের কৃপায় মূল্য হ্রাস করিতে পারিবেন বলিয়া সর্ নাজিমুদ্দীন ভরসা দিয়াছেন। কিন্তু মানুষের নিজের হাতে গড়া এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য ভগবানের দয়ার ভরসায় বসিয়া না থাকিয়া মানুষের নিজেরই, বিশেষতঃ এই দুর্ভিক্ষ যাহাদের অদূরদর্শিতা ও অব্যবস্থার ফল, তাহাদেরই বিশেষভাবে অগ্রণী হওয়া দরকার। ঈশ্বর সাহায্য করেন উদ্যোগী পুরুষসিংহকে, অকর্মণ্য অপদার্থকে নয়।

চাউলের মূল্য হ্রাস জনসাধারণের কাম্য কি না, সর্ নাজিমুদ্দীনের এই ইঙ্গিতের কোন জবাব উপস্থিত জনমণ্ডলী দিয়াছিলেন কি না আমরা অবগত নহি। চাউলের দর ৩০৲ টাকার উর্ধে উঠিবার পরও ব্যবস্থা-পরিষদে ভোটাধিক্যে তাঁহার দল জয়লাভ করিয়াছে। ইহার একমাত্র অর্থই এই যে, জনসাধারণ চাউলের মূল্য হ্রাসের চেষ্টা করিবার জন্য তাঁহাকে সর্বপ্রকার সুযোগ দিয়াছে। চোরাবাজার দমনে গবন্মে‍ণ্টকে সাহায্য করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করা নিরর্থক। অসাধু ব্যবসায়ীদের মধ্যে যাহারা প্রধান তাহারা এত বিত্ত ও প্রভাবের অধিকারী যে জনসাধারণ তাহাদের সান্নিধ্যে গমন করিতে পারে না, ইহাদের কার্য্যকলাপের সন্ধান সংগ্রহ করাও তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। এ কাজ গবন্মে‍ণ্টের নিজের এবং পুলিসের সাহায্য এখানে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ হইবার কথা।

—

সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার

হিন্দু নারীর উত্তরাধিকার বিল সমর্থনের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় মহাবোধি সোসাইটি হলে গত ১০ই ভাদ্র এক মহিলা-সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, প্রস্তাবিত হিন্দু উত্তরাধিকার বিলে হিন্দু নারীকে পৈতৃক সম্পত্তিতে যে সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহা সকল দিক দিয়াই সমর্থনযোগ্য। বিলটি আইনে পরিণত হইলে ভারতের সর্বত্র হিন্দুগণ উত্তরাধিকারের একই নিয়মের অধীন হইবে এবং মিতাক্ষরা ও দায়ভাগের প্রভেদ দূর হইবে; উত্তরাধিকারের একই নিয়ম ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হইলে বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুদিগের মধ্যেও কালক্রমে একতাবোধ দৃঢ়তর হইবে।

সভায় ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বিলের একটি ত্রুটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিলটিতে পুত্রসন্তানহীনা বিধবা পুত্র-বধূদের জন্য প্রয়োজনানুরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই। এখনও ইহার সংশোধনের প্রয়োজন আছে। সময়ও আছে।

—

লুকানো চাউল বাহির করিবার দায়িত্ব

খাদ্য-সচিব মিঃ সুরাবর্দী গত ১লা সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, "সরকার কর্তৃক ধান চাউলের দর বাঁধিয়া দেওয়ার পর উহা অদৃশ্য হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। যদি কোন খুচরা দোকানদার দোকান বন্ধ করে তবে থানায় খবর দেওয়া জনসাধারণের কর্তব্য। আর অবিলম্বে প্রতিকার পাওয়ার ইচ্ছা করিলে গোয়েন্দা পুলিসকে খবর দিতে হইবে। খুচরা দোকানদার যদি পাইকারদের নিকট হইতে মাল না পায়, তবে অবশ্য দোকান বন্ধ করা ছাড়া তাহার উপায় নাই। কিন্তু সেজন্য মাল অদৃশ্য হইতে পারে না। ২৭শে আগষ্ট পর্য্যন্ত দোকানে মাল ছিল, কিন্তু সরকারী আদেশের সঙ্গে সঙ্গে ২৮শে আগষ্ট মাল কিরূপে অদৃশ্য হইতে পারে? খুচরা দোকানদারদের যদি দোষ না থাকে, তবে পাইকারদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। যেভাবেই হউক, কলিকাতার জন্য খাদ্যশস্যের সরবরাহের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিতে হইবে। মাল যাহাতে কেহ সরাইতে না পারে, গবন্মে‍ণ্ট তাহার ব্যবস্থা করিবেন এবং ইতিমধ্যে তাহাতে কতকটা কৃতকার্য হইয়াছেন। জনসাধারণ যদি অভিযোগ না করে তবে অনাহারে মৃত্যুই তাহাদের অদৃষ্টে ঘটিবে।"

লুকানো চাউল খুঁজিয়া বাহির করিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে গোয়েন্দা পুলিসের সাহায্যে উহা বাহির করা অসম্ভব বলিয়া কেহ মনে করিবে না। জনসাধারণের সহযোগিতার অভাব এক্ষেত্রে হইবে না বলিয়া মনে

করিবারও কোন কারণ নাই। তবে সংবাদ-দানের সমস্ত দায়িত্ব জনসাধারণের ঘাড়ে না চাপাইয়া সিভিল সাপ্লাই ইন্সপেক্টরদের নিজেদেরও মুদীর দোকানগুলিতে সন্ধান লওয়া উচিত। পুলিস বা গবর্ন্মেণ্টকে সংবাদ দিতে গিয়া হয়রান হওয়া এদেশে নূতন নহে; আহার্য সন্ধানে বিব্রত বাঙালীর পক্ষে সংবাদ-দানে হয়রানির আশঙ্কা এবং সময়ের অভাব উভয়ই ঘটা স্বাভাবিক।

—

অনশনক্লিষ্টদের জন্য সাহায্য-শিবির

অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্যের যে ব্যবস্থা হইতেছে উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ সুরবর্দী তাহার এক বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন :—

"অনশনক্লিষ্ট লোক যাহাতে কলিকাতা আসিয়া ভিড় না করে, সেজন্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অন্নসত্র খোলা হইতেছে, ১৭ শত দুঃস্থ পীড়িত ব্যক্তিকে হাসপাতালে রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা আরও প্রসারিত করা হইবে। ৪৩ নং ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটে দুঃস্থ-শিশুসাহায্যকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এ, আর, পি এম্বুল্যান্সযোগে রাস্তা হইতে সেখানে শিশুদিগকে নেওয়া ও খাওয়ান হইবে। এক হাজার লোকের স্থান হইতে পারে এইরূপ চিকিৎসাকেন্দ্র কলিকাতায় স্থাপন করা হইয়াছে। তাহা প্রসারিত করিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্রে যাহারা চিকিৎসা ও ঔষধপথ্য পাইবে তাহাদের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া অধিকতর দুঃস্থদিগকে ইভ্যাকুয়েশন ক্যাম্প বা আশ্রয়শিবিরে প্রেরণ করা হইবে। এখানে ২০ হাজার লোকের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৎপরে তাহাদিগকে বাড়ীতে পাঠান হইবে। সেখানেও তাহাদিগকে খাওয়ানর ব্যবস্থা করা হইবে। নিতান্ত দুঃস্থদিগকে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ বা বদান্য ব্যক্তি যাঁহারা লোকসেবার ভার লইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ দেওয়া হইবে।"

কয়েকটি অস্থায়ী শিবির খুলিয়া কলিকাতা হইতে অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে সরাইয়া লইবার আয়োজন প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা যেন প্রয়োজনের তুলনায় কম না হয়। এই সব শিবিরের পরিচালন-ভার সরকারী কর্মচারীদের উপর সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া না দিয়া বাংলার জনসেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য এ বিষয়ে গ্রহণ করিলে অধিকতর সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে। বাংলায় এই প্রকার আশ্রয়শিবির পরিচালনা কঠিন বোধ হইলে বাংলা-সরকার বিহার ও আসামে আশ্রয়-শিবির স্থাপন করিয়া সেখানে লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

—

রেলওয়ে-বিভাগের অব্যবস্থা

পঞ্জাবের রাজস্ব-সচিব চৌধুরী সর্ ছোটু রামের এক বিবৃতিতে ভারত-সরকারের ও রেল-বিভাগের যে কার্য্যকলাপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বিস্ময়কর। সর্ ছোটু রাম বলিতেছেন,

"কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট পঞ্জাব গবর্ন্মেণ্টকে মে, জুন ও জুলাই মাসের মধ্যে ৩,৩২,৭৯৭ টন খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে বলেন। কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের এই অর্ডার যদিও ২০ মে পঞ্জাব গবর্ন্মেণ্টের হস্তগত হয়, তথাপি তাঁহারা জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ২,১৮,৬৫৪ টন খাদ্যদ্রব্য কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের জন্য ক্রয় করেন। এই বিপুল খাদ্যশস্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্ট মাত্র ৬২,০০০ টন অর্থাৎ মোট খাদ্যদ্রব্যের ২৮% ভাগ পঞ্জাব হইতে লইতে সমর্থ হইয়াছেন।

ভারত-সরকারের দুইটি বিভাগ—খাদ্য-বিভাগ ও রেলওয়ে-বিভাগের মধ্যে বিন্দুমাত্র সহযোগিতা নাই, বহু ক্ষেত্রে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। সর্ ছোটু রামের বিবৃতিও সেই একই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি মাত্র। সর্ এডোয়ার্ড বেন্থল বাংলা-সরকারের উপর দোষারোপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বাংলায় খাদ্যদ্রব্য ডেলিভারী লইতে অসঙ্গতভাবে বিলম্ব করা হয়। রেল-বিভাগের সাধারণ অব্যবস্থা ও দীর্ঘসূত্রিতা দেখিয়াই সর্ এডোয়ার্ডের উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল। সম্প্রতি বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত একটি ঘটনার সংবাদ অবগত হইয়া পরিষ্কার বুঝা গিয়াছে যে অব্যবস্থার জন্য একা বাংলা-সরকার দায়ী নহেন, রেল-বিভাগের দায়িত্বটাও এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট আছে। ঘটনাটি এই—বাংলায় কতকগুলি মালগাড়ী বোঝাই গম ও চাউল প্রেরিত হয়। গমের গাড়ী পাঠাইবার কথা হাওড়া রামকৃষ্ণপুর সাইডিঙে, কারণ সেখানকার ময়দার কলে সেগুলি পেষা হইবে এবং চাউলের মালগাড়ী যাইবে কলিকাতার চেতলা সাইডিঙে, সেখানকার এজেন্টগণ উহা ডেলিভারী লইবে। সর্ এডোয়ার্ড বেন্থলের বিভাগের কর্মতৎপরতায় [illegible]ল গম গেল চেতলায় এবং চাউল গেল রামকৃষ্ণপুর। ডেলিভারীর যে বন্দোবস্ত পূর্বে হইয়াছে তদনুসারে কোন স্থানেই মাল খালাস করা চলে না। চেতলার গাড়ী রামকৃষ্ণপুর এবং রামকৃষ্ণপুরের গাড়ী চেতলায় পৌঁছিবার পর চাউল ও গম গাড়ী হইতে নামানো সম্ভব হইল। এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়াই সর্

এডোয়ার্ড বাংলা-সরকারের অব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়াছিলেন কিনা মিঃ সুরাবর্দীর পক্ষে তাহা জানান উচিত। এই ধরণের অভিযোগের জবাব না দিলে বাংলার খাদ্য-বিভাগের প্রতি অপর প্রদেশের অনাস্থা জন্মিবে এবং তাহাতে ক্ষতি হইবে বাংলারই।

বাংলা-সরকার ত্রুটিবিহীন এ কথা আমরা অবশ্যই বলি না। কিন্তু বর্তমান দুর্ভিক্ষের উপশম না হওয়ার সর্বপ্রধান দায়িত্ব ভারত-সরকার ও রেল-বিভাগের ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে রেলের জন্য ভারতবাসী পাঁচ শত কোটি টাকারও অধিক মূলধন দিয়াছে, যাহার পরিচালনার জন্য দরিদ্র ভারতবাসী প্রতি বর্ষে এক শত কোটিরও বেশী টাকা দিতেছে, সেই রেলওয়ে ভারতবর্ষের এক মহা দুর্দিনে দেশের কাজে, আর্ত্ত ও বুভুক্ষু মানুষের সেবায় নিয়োজিত হইল না, এ কলঙ্ক কাহিনী ভারতবর্ষের ইতিহাসের ব্রিটিশ-শাসন অধ্যায় হইতে মুছিবার নয়।

নূতন খাদ্যসচিবের আশ্বাস

ভারত-সরকারের নূতন খাদ্যসচিব সর্ জোয়ালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব কলিকাতায় কয়েক দিন অবস্থান করিবার পর দিল্লী যাত্রার প্রাক্কালে এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট এক বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন, "বাংলার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। বাংলার খাদ্যসঙ্কটের আশু সমাধানের প্রয়োজন। উহার জন্য আর কালবিলম্ব করা সঙ্গত হইবে না।" তিনি বলেন যে দলনির্বিশেষে সকলের সহিত তিনি আলোচনা করিয়াছেন। কলিকাতার অলিগলি পরিভ্রমণ করিয়া তিনি স্বচক্ষে বুভুক্ষুদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াছেন। বিভিন্ন অন্নসত্রও তিনি পরিদর্শন করিয়াছেন। সরবরাহের অভাবে এই সমস্ত সাহায্য-কার্যগুলি বন্ধ না হইয়া যায়, তজ্জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। খাদ্যশস্য সমাধানের জন্য বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাদের সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন। এই উদ্দেশ্যে খুব সম্ভব শীঘ্রই বর্তমান খাদ্য-দপ্তরকে শক্তিশালী করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। এই বিষয়ে ভারত-সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। তা[illegible] তিনি বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে, বাংলায় বেশী পরিমাণে খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য তিনি যথাসাধ্য করিবেন। বাংলার জন্য খাদ্যশস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি শীঘ্রই পঞ্জাবে যাইবেন। প্রত্যেক উদ্বৃত্ত প্রদেশ-গুলির নিকট তিনি আবেদন করিয়া বলেন যে সকলেই যেন বাংলার এই দুর্দিনে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হন।

সর্ জোয়ালাপ্রসাদ বলিয়াছেন, ভারত-সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন। বাংলার জনসাধারণ এই চেতনার কোন প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পায় নাই। ভারত-সরকারের প্রধান দায়িত্ব—ভারতের বাহিরে এবং অপর প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য হইতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া অবিলম্বে তাহা বাংলায় প্রেরণ করা। সর্ জোয়ালাপ্রসাদ কানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আমদানীর কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন কিনা তাহা বলেন নাই। অন্যান্য প্রদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আনিবার জন্যও তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে রেলওয়ে-বিভাগের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইতেছে, মালগাড়ী সংগ্রহ বা প্রেরণ কোনটির উপরই তাঁহার কোন জোর নাই, ইহা সুপরিস্ফুট। প্রদেশগুলির মধ্যেও সকলে আন্তরিক সহযোগিতা করে নাই। যুদ্ধের মধ্যে ভারত-শাসন আইনের যে সংশোধন করা হইয়াছে তাহার বলে ভারত-সরকার প্রদেশগুলিকে তাঁহাদের আদেশ পালনে বাধ্য করিতে পারেন। প্রাদেশিক শাসনে হস্তক্ষেপও ভারত-সরকারের পক্ষে নূতন নয়। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রিসভা যখন রাজবন্দীদের মুক্তিদানের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, বড়লাট লর্ড লিনলিথগো তখন উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে দ্বিধা করেন নাই। আর্তসেবায় অনিচ্ছুক প্রদেশগুলিতে কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করিতে ভারত-সরকারের কুণ্ঠা বিস্ময়কর।

সর্ জোয়ালাপ্রসাদ ভারত-সরকারের বিভাগীয় অনৈক্যও দূর করিতে পারেন নাই। আর্ত্ত-সেবায় পূর্ণ সাহায্যদানে রেল-বিভাগকে বাধ্য করিতে না পারিলে সর্ জোয়ালা-প্রসাদের পক্ষে পদত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসাই সঙ্গত হইবে।

দুর্গতদের জন্য স্থায়ী সাহায্য

বর্তমান দুর্ভিক্ষে অন্ন, বস্ত্র, দুগ্ধ, ঔষধ প্রভৃতি বিতরণ ভিন্ন স্থায়ী সাহায্যেরও প্রয়োজন যথেষ্ট রহিয়াছে। যাহারা কায়িক পরিশ্রমে সক্ষম তাহাদিগকে কাজ দিয়া নববিধান রিলিফ মিশন এবং ব্রাহ্মসমাজ রিলিফ মিশন যেভাবে স্থায়ী সাহায্য করিতেছেন তাহা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। নববিধান মিশন মেদিনীপুর ঝটিকার পর তমলুক থানার অন্তর্গত দুইটি ইউনিয়নে সাহায্য দানের ভার গ্রহণ করেন। ইউনিয়ন দুইটির জনসংখ্যা ১৮০০০ ও ১৪০০০। বিনামূল্যে আহার্য্য ও বস্ত্র বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা গত ফেব্রুয়ারি মাস হইতেই সব্জী চাষের জন্য সাহায্য দিতে আরম্ভ করেন। ইঁহাদের প্রদত্ত বীজে ৬০০ বিঘা জমিতে ভুট্টা, ১২ বিঘায় টমাটো, এবং আরও প্রচুর জমিতে শশা, কুমড়া, চিচিঙ্গা, ঢেঁড়স, পালং শাক প্রভৃতি সব্জী উৎপন্ন হইয়াছে

এবং যাহারা চাষ করিয়াছে তাহারাই উহাদ্বারা উপকৃত হইয়াছে। ডোবা পরিষ্কার করিবার জন্য ইঁহারা মজুরি দিয়াছেন। ৫০ গাঁইট পাট ক্রয় করিয়া ইঁহারা দরিদ্র কৃষকদের চাউল দিয়া উহাদের দ্বারা দড়ি তৈরি করিয়া লইয়াছেন এবং ঐ দড়ি ঘর বাঁধিবার জন্য বিলি করিয়াছেন। অন্যান্য উপায়েও স্থানীয় লোকদের কাজ দেওয়া হইয়াছে। মিশনের উদ্যোগে ৫০০ মণ তালের গুড় তৈরি হইয়াছে, তদ্ব্যতীত প্রচুর চাটাই তৈরি হইয়া বিক্রয় হইয়াছে। ২০টি আশ্রয়গৃহ নির্মাণ করাইয়া বর্ষার সময় ঐগুলিতে গৃহহীন অসহায় ব্যক্তিদের আশ্রয় দেওয়া হইতেছে। ইহারা নিজ নিজ কুটীর নির্মাণ করিয়া চলিয়া গেলে এই সব আশ্রয়গৃহে স্কুল খোলা হইতেছে। চার-পাঁচটি স্কুল ইতিমধ্যেই খোলা হইয়াছে।

মে মাস হইতে সুতা বিলি করিয়া স্থানীয় লোকদের দ্বারা কাপড় তৈরি করান আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে ২৫০০৲ টাকার সুতা বিলি করা হইয়াছে এবং উহা হইতে ২৫০ জোড়া ধুতি, ১০০ জোড়া শাড়ী, ২০০ জোড়া বিছানার চাদর, কুড়ি গজ লম্বা ২৫ থান মশারির কাপড় এবং বহু গামছা তোয়ালে ঝাড়ন ইত্যাদি ইতিমধ্যেই তৈরি হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজ রিলিফ মিশন ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার মধুসূদনপুর গ্রামে একটি এবং কাঁথিতে দুঃস্থ মধ্যবিত্তদের জন্য একটি সুলভ শস্যবিক্রয়-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। মধুসূদনপুরে স্থায়ী সাহায্যের জন্য তাঁতের কাজ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ২০ জনকে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং শিক্ষাকালে তাহাদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা হইবে। এই কার্য্যের জন্য ৬৩৮১ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

এই প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের দৃষ্টান্ত বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলসমূহে আর্তত্রাণ-কার্য্যে অনুসরণ করিলে স্থায়ী সুফল হইবে।

—

বাংলার দুর্ভিক্ষে অপর প্রদেশের সাহায্য

বাংলার দুর্ভিক্ষে সাহায্যদানে ভারতের অপর প্রদেশসমূহ পিছাইয়া থাকে নাই। পঞ্জাব ও সিন্ধু বাংলায় গম প্রেরণের জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু যে-পরিমাণ খাদ্যশস্য উহারা প্রেরণে সক্ষম, রেলওয়ের অব্যবস্থায় তাহার সবটা দ্রুত আসিতে পারিতেছে না। বিভিন্ন প্রদেশের সংবাদপত্রসমূহ ফণ্ড খুলিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। এলাহাবাদের লীডার, মাদ্রাজের ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, বোম্বাইয়ের জন্মভূমি, বন্দেমাতরম্, কাশীর আজ, দিল্লীর তেজ, নাগপুরের নবভারত প্রভৃতি সংবাদপত্র এই কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন এবং সহস্র সহস্র টাকা তুলিয়া পাঠাইতেছেন। বাংলা হইতে আগত অনাথা স্ত্রীলোক ও অনাথ শিশুকে আশ্রয়দানের জন্য পিলানীতে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে জয়পুরের দুই জন রাণী উহাতে ২৫ হাজার টাকা দিয়াছেন। বাংলা আজ একা নয়, এই ভরসা বাংলার সেবাব্রতীদের প্রাণে শক্তির সঞ্চার করিবে।

—

বাংলার বাহিরে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের বিবৃতি বন্ধ

বাংলার খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, বাংলার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশের সেন্সর উহার উপর কাঁচি চালাইয়াছেন এবং সম্পূর্ণ বিবৃতি প্রকাশ করিতে দেন নাই। ইহা লইয়া ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু প্রশ্ন করিলে ভারত-সরকারের পক্ষ হইতে ভাসা ভাসা রকমের জবাব দিয়া উহা এড়াইবার চেষ্টা করা হয়। বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য প্রধানতঃ দায়ী ভারত-সরকার উহা নিবারণের জন্য সময় থাকিতে চেষ্টা করেন নাই, এখনও তাঁহারা পর্য্যাপ্ত সাহায্য দিতে পারেন নাই। এই অক্ষমতার পরিচয় বাংলার ও ভারতের বাহিরে প্রকাশে তাঁহাদের অসম্মতি হওয়া স্বাভাবিক। কলিকাতার সরকার-সমর্থক পত্রিকা 'ষ্টেটসম্যান' পর্য্যন্ত দৈনন্দিন করুণ দৃশ্যে বিচলিত হইয়া যে-সব ছবি প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভারত-সরকারের জনৈক প্রতিনিধি তাঁহাতেও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ষ্টেটসম্যানের এই কাজকে অনাবশ্যক এবং নাটকীয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাংলার দুর্ভিক্ষের সংবাদ সঠিকভাবে ভারতের বাহিরে পৌঁছিতেছে কিনা এই সংবাদ সংগ্রহের জন্য রাষ্ট্রীয় পরিষদে কেহ প্রশ্ন করিলে ভাল হয়।

—

যুদ্ধের মধ্যে ভারত ও চীনের শিল্প

'চীনবার্ত্তা'-পত্রে প্রকাশিত একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে যুদ্ধের মধ্যে চীনে শিল্পোন্নতির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় "নিউ ইণ্ডাষ্ট্রী এণ্ড কমার্স" পত্রিকায় এবং উহার লেখক চীনের অর্থনৈতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব ডাঃ ওয়াং ওয়েনহাও। তিনি লিখিয়াছেন,

"যুদ্ধের পূর্বে চীনের শিল্প ও বাণিজ্যের তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমতঃ, ভারী শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলি অনেক বেশী সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমুদ্রোপকূল ও নদীতীরবর্তী এলাকায় সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল; তৃতীয়তঃ, বৃহৎ সমবায় কারবার-বিশেষ প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ভূতপূর্ব শিল্প-

বিভাগের সংখ্যাতথ্য অনুসারে ৪,৫,৭১৪৩ জন শ্রমিক, ও ৩,৭৭,৮৫,৭৪২ ডলার মূলধন লইয়া চীনে ৩,৯৩৫টি কারখানা ছিল। ইহাদের মধ্যে পাঁচ ভাগের তিন ভাগই ছিল খাদ্য-দ্রব্য, বস্ত্র ও হালকা রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা। একমাত্র বস্ত্রশিল্পেই ছিল এক-তৃতীয়াংশ মূলধন, এবং শ্রমিকদের অর্দ্ধেকের উপর এই শিল্পে নিযুক্ত ছিল। ধাতু, শক্তি, যন্ত্রপাতি, বিজলী দ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্রের কারখানার সংখ্যা ছিল কারখানাগুলির শতকরা ১৪·৭২ ভাগ।

৩৯৩৫টি কারখানার মধ্যে ১২৫৫টি অথবা ⅓ অংশ ছিল স্যাংহাইয়ে অবস্থিত; এবং স্যাংহাই, কিয়াংসি ও চেকিয়াঙে সর্বসমেত ২,৩৩৬টি কারখানা ছিল। উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে মোট কারখানার সংখ্যা ছিল তিন শতের নিম্নে।

অধিকাংশ শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি অতি ক্ষুদ্রকায় ছিল। শতকরা ৬১·১৬টি কারখানা ব্যক্তিগত বা যৌথ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত এবং সমবায় ব্যবস্থায় এক-তৃতীয়াংশেরও কম কারখানা নিয়ন্ত্রিত হইত।

উপরোক্ত তিনটি অসুবিধা ব্যতীত, যুদ্ধের পূর্বে চীনা শিল্প ও বাণিজ্যকে বিদেশী ব্যবসায়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইত, এবং এই প্রতিযোগিতা চীনা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত না। চীনে যুদ্ধের পূর্বে ৪৯,৫০,০০০ টাকুর মধ্যে প্রায় ২০,০০,০০০ টাকু ছিল জাপানীদের, এবং ২০০,০০০ ছিল ইংরেজদের। বিদেশী মূলধনের ব্যবহার ছিল আর একটি প্রতিবন্ধক। ১৮৯৩ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত হুপে প্রদেশে তায়ে লৌহখনি হইতে উৎপন্ন ১১০,০০,০০০ টন অসংস্কৃত লৌহের ৭৫,০০,০০০ টনের অধিক জাপান লইয়া যাইত।

চীনের যুদ্ধকালীন শিল্পোন্নতির প্রথম লক্ষণ হইতেছে দেশের অভ্যন্তরে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি। সিচুয়ান, সিকাঙ, হুনান, কোয়াংসি, ইউনান, এবং কোয়াইচাও প্রভৃতি দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে এবং উত্তর-পশ্চিমে কান্সু ও সেন্সি প্রদেশে শতকরা ৯০টি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৪২ সালের শেষে অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপের দপ্তরে ২,৮৫৪টি বেসরকারী কারখানা রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছে।

যুদ্ধকালীন শিল্পোন্নতির দ্বিতীয় লক্ষণ হইতেছে, ভারী শিল্পের কারখানার সংখ্যা পূর্ব হইতে অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তৃতীয় লক্ষণ হইতেছে এক্ষণে অধিকাংশ কারখানাই গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত।

চতুর্থ লক্ষণ হইতেছে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি। ১৯৩৮ সালে উৎপাদনের পরিমাণকে যদি ১০০ ধরা যায় তাহা হইলে ১৯৪২ সালের পরিমাণ হয় ৩০২।

পঞ্চম লক্ষণ হইতেছে যন্ত্রবিদ্যা-সম্পর্কীয় জ্ঞানের উন্নতি। অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপের দপ্তর কর্ত্তৃক আবিষ্কারের জন্য বহু সনন্দ বা পেটেণ্ট দান ইহার প্রমাণ।

যুদ্ধের পর ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় চীনের অভ্যন্তরে সকল স্থানেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪২ সালের শেষে অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপের দপ্তরে ১১৪৩টি সমবায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রেজেষ্ট্রীকৃত ছিল। ১৯৩৮ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ১০২।

যুদ্ধকালীন বাণিজ্যের প্রসারের একটি বিশেষত্ব হইতেছে গবর্ন্মেণ্ট-পরিচালিত ব্যবসায়। জাতীয় সম্পদ কমিশন টাংষ্টেন, এণ্টিমনি, টিন ও পারা প্রভৃতি খনিজ পদার্থের উৎপাদন বিক্রয় ও বণ্টনের জন্য দায়ী। বৈদেশিক বাণিজ্য কমিশন, টাঙ তৈল, চা ও শূকর লোম বিক্রয়ের জন্য দায়ী এবং প্রাত্যহিক প্রয়োজনের সকল দ্রব্য গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টগুলিও তাহাদের স্ব স্ব প্রদেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যত্নবান্। অধিকাংশ প্রদেশেই "ডেভেলপ্‌মেণ্ট করপোরেশন" প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে প্রদেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য। এবং ইহাও চীনের যুদ্ধকালীন বাণিজ্যের একটি বিশেষত্ব।

ভারতবর্ষের অবস্থা এই সঙ্গে তুলনীয়। বর্ত্তমান যুদ্ধে এ দেশে প্রতি পদে শিল্পপ্রসারে বাধা দেওয়া হইয়াছে। নানাবিধ আদেশ, কণ্ট্রোল ও ট্যাক্সের পর্বতপ্রমাণ বাধা সত্ত্বেও ভারতীয় শিল্প উন্নতির পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। অবশেষে ভারত-সরকার চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়া ভারতরক্ষা-আইনে একটি বিশেষ ধারা সংযোজন করিয়া ভারতবর্ষে নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠা এবং পুরাতন কারখানার প্রসার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ভারত-সরকারের আদেশ ব্যতিরেকে কোন নূতন কারখানা ভারতবর্ষের কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

কয়লা-বণ্টনে বৈষম্য

১৯শে ভাদ্র তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় কয়লা-বণ্টনে বৈষম্যের একটি দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন, "সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট ও কণ্ট্রোলার কোল ডিষ্ট্রিবিউশন রেল-লাইনের ডিপোওয়ালাদের কয়লার গাড়ী দেওয়া সম্বন্ধে নিয়ম করিয়াছেন যে,

যাহাদের ডিপো তিন বৎসরের স্থায়ী নয় তাহাদের ওয়াগন দেওয়া হইবে না। কিন্তু ১৫ দিন পূর্বে যাহাদের ডিপো পর্য্যন্ত ছিল না, কালীঘাট ষ্টেশনের লাইন ডিপোতে অল বেঙ্গল সাপ্লাই সিণ্ডিকেট নামীয় নবগঠিত এরূপ একটি কোম্পানীকে পোড়া কয়লার যে ২৫ খানি ওয়াগন আসিবে তাহা হইতে মাসে ১০খানি দিবার আদেশ কর্তৃপক্ষ দিয়াছেন। ১৫।২০ বৎসরের স্থায়ী ডিপোওয়ালারা কেহ মাসিক ২ গাড়ী অথবা ৩ গাড়ী করিয়া পাইতেছেন, কেহ বা পাইতেছেনও না, অথচ এই কোম্পানী কি মহাপুণ্য করিয়াছিল যে, নিজের ডিপো নাই, তবু ১০ গাড়ী পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিল? ইহার মালিক কোন মন্ত্রিপ্রবরের আত্মীয় বলিয়াই কি তাঁহার ক্ষেত্রে আইন-কানুনের প্রয়োজন নাই?"

অভিযোগটি অতি গুরুতর। ইতিপূর্বে এরূপ বহু অন্যায় বৈষম্যের কথা শোনা গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান ভয়াবহ সঙ্কটে এই শ্রেণীর বৈষম্যমূলক ব্যবহার আরও বেশী আপত্তিজনক এই জন্য যে, ইহা দেশে গভীর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিবে।



কবি রূপরাম চক্রবর্ত্তীর স্মৃতিস্তম্ভ

ধর্ম্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্ত্তীর স্মৃতিস্তম্ভ

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ কবি রূপরাম চক্রবর্ত্তী সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। বর্দ্ধমান জেলায় দামোদরের দক্ষিণ তীর হইতে সাত ক্রোশ দূরে কাইতির নিকটবর্ত্তী শ্রীরামপুর গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। বর্দ্ধমান-সাহিত্য-সভার উদ্যোগে, আথিনা গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ নায়কের বদান্যতায় এবং ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন চৌধুরীর চেষ্টায় সম্প্রতি কবির বাস্তুভিটায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে স্মৃতিস্তম্ভের উৎসর্গানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্তের বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন কবি-পরিচিতি পাঠ করেন। তাহার পর সভাপতি মহাশয় দক্ষিণ-রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনা করেন।

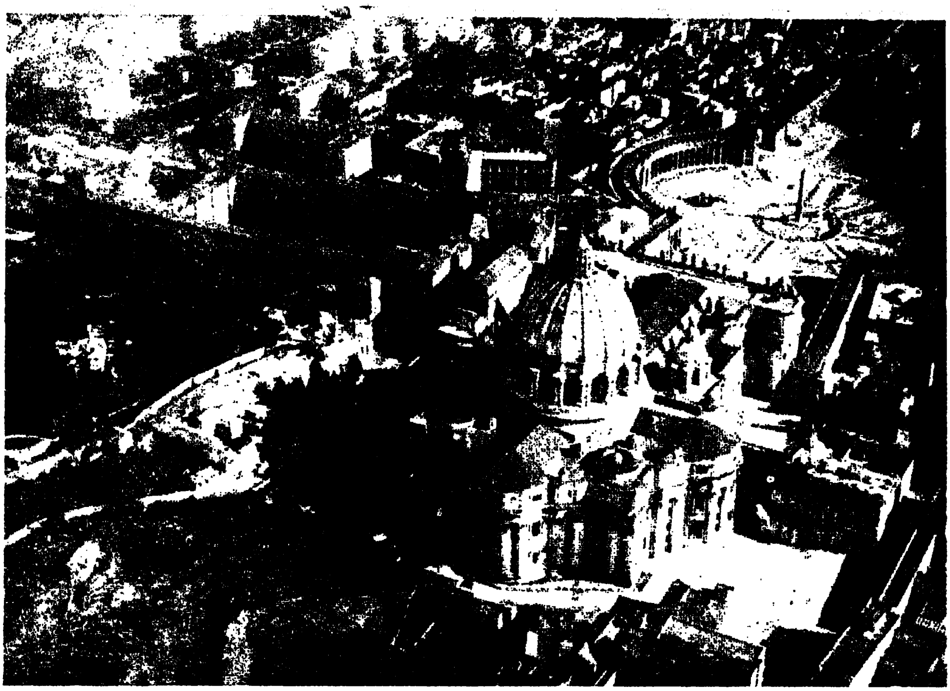
পরদিন স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীযুত সুকুমার সেন রূপরামের আত্মকাহিনী পাঠ করিবার পর সভাপতি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়: (১) স্থানীয় একটি রাজপথকে রূপরামের নামে অভিহিত করা হউক; (২) প্রতি বৎসর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি মেলার অনুষ্ঠান করা হউক এবং (৩) তাঁহার অধুনা-দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রকাশিত রচনাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হউক। প্রথম প্রস্তাবটি ইতিমধ্যেই কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন রূপরামের পুস্তকগুলি সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উহার মুদ্রণ-কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে।



নেপ্‌ল্‌স্। অদূরে বিসুবিয়াস আগ্নেয়গিরি। ইটালীর এই অঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বোমাবর্ষণ হইয়াছে



সিসিলির অন্তর্গত তাওরমিনা ও এৎনা পর্ব্বত। সিসিলির এইখানে অক্ষশক্তি শেষ বারের মত



রোম। সেণ্ট পিটার গীর্জ্জা এবং ভাটিকানের দৃশ্য। ইহা রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদিগের পবিত্র তীর্থ



লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিল-পরিচালিত একটি ঔষধ প্রস্তুতের কারখানায় কর্ম্মরত রমণীগণ



ওয়েম্বলিতে ইংলণ্ড বনাম ওয়েল্‌স ইণ্টারন্যাশনাল ফুটবল খেলা সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে



সমররত ব্রিটেনে দশ হইতে একুশ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাগণকে কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এক দল



বৈমানিক ও প্যারাট্রুপারদের সাহায্যার্থ গাছপালা ও গোলাবাড়ী সমন্বিত পল্লী-অঞ্চলের মডেল নির্ম্মাণরত [illegible] শিল্পিগণ



বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় ব্রিটেনে শুধু নারীদেরই জন্য পল্লী গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে কারখানার নারী-শ্রমিকগণের বাসভবন